মাতৃভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী"

পঞ্চম বর্ষ | মাঘ, ১৩৪৯ | ১ম সংখ্যা

নূতন সমাজ

শ্রীরবীন্দ্রবিনোদ সিংহ, এম-এ

অর্থনীতিক ভিত্তিতে সমাজ বিচার করবার রীতি এ দেশে হালের আমদানী হলেও পাশ্চাত্যে তেমনটি নয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং তারও আগে অর্থনীতিক গবেষণা, এ দু'জিনিষ সে গোলার্ধে অনেক দিন আগে রপ্ত হয়ে গেছে। ভারতবর্ষেও সে তত্ত্বের দোলা এসে লেগেছে। জীবনযাত্রার বিচিত্র চেষ্টার আড়ালে যে আদি সত্যটি প্রতিনিয়ত মানুষের শুভবুদ্ধিও বুদ্ধিবৃত্তিকে স্তর থেকে স্তরান্তরে ঠেলে দিচ্ছে, সে প্রসারণের ভিত্তিটুকু একটা অর্থনীতিক কাঠামো ছাড়া আর কিছু নয়। যে প্রাচীন পটভূমিকায় ভারতবর্ষ এতকাল নিজেকে দাঁড় করে রেখেছিল সে জীর্ণ অন্ধকারময় পর্দাখানা আজ নিশ্চিহ্ন। তাই সমাজের নানা দিকে আজ নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বিজ্ঞান এবং অর্থনীতিকে ব্যবহারিক কার্যকারিতায় কেমন ক'রে নিয়োজিত করা যায়, এ নিয়ে এখন সুরু হয়ে গেছে অফুরন্ত গবেষণা। যুগপ্রবর্তকদের এই সন্ধিক্ষণে ভারতীয় ভারতবর্ষটার রূপ যত ইতরবিশেষ হচ্ছে, তত প্রাচীন এবং নবীনের এ দ্বন্দ্ব যেখানে পরিণতির জন্য ধেয়ে চলেছে, যে বাস্তব আদর্শের পিছনে ছুটে চলেছে সেটাই হবে আগামী কালের ভারতবর্ষ। প্রাচীনের জগদ্দল পাথরটা আমাদের সমাজে এখনো এত অন্যায়ভাবে চেপে আছে যে তাকে একটি কঠিন আঘাতে ধ্বসে না দিলে সে ধ্বসে যাবে না। তাই আজ আবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সমাজবিপ্লবের, সুরু হয়ে গেছে তার স্পেড্ ওয়ার্ক।

যে সময় ভারতবর্ষে রাজতন্ত্রের বিশাল প্রতিপত্তি ছিল, সে সময় সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলারও প্রয়োজন ছিল। কারণ, তা না হলে রাজতন্ত্র বাঁচতে পারতো না। যেখানে ব্যক্তিবিশেষ ছিল রাষ্ট্রের অধিনায়ক, সেখানে তার হুকুম-টাই আইন। আর সে আইনের দাপটে প্রজাকে আয়ত্তে রাখতে হলে যে অস্ত্রটার প্রয়োজন ছিল, সে হলো সমাজ। সে সমাজ রাজার সৃষ্টি, রাজতন্ত্রের খাতিরে। তাই প্রাচীন সমাজকে বিচার করতে গেলে রাজাকেও তার সংগে টানতে হয়। পুরোহিত শ্রেণীর সৃষ্টি হলো সেদিন থেকে যেদিন রাজার রাজতন্ত্রকে মেনে নিয়ে সমাজটা হয়ে দাঁড়ালো বিচার-ক্ষেত্র। বিচারের আসনে দাঁড়িয়ে রাজ-তন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার শক্তি ব্রাহ্মণদের ছিল না। প্রজা-সাধারণের আঘাত থেকে বেঁচে থাকবার জন্যে তৈরি হলো দৃঢ় বর্ম। সে বর্মের নাম দেওয়া হলো ধর্ম। ধর্মকে রাজ-তন্ত্রের বর্ম হিসেবে পেয়ে ব্রাহ্মণ হলেন শক্তিধর, আর সে শক্তির মোহ থেকে একদিন দেখা দিলো কুসংস্কার। কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকায় সমাজটাকে আবৃত করে ব্রাহ্মণ শ্রেণী আগলে রইলো মানুষের মংগলামংগল। রাজ

মুকুটহীন হলো উচ্চে আসীন, ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই নিষ্কণ্টক হলো রাজার রাজত্ব, নির্বিকার রইলো ব্রহ্মণ্য ধর্ম, কিন্তু সুখ-দুঃখটাকে চাপা দেওয়া হলো ভাগ্যের নামে।

এইত গেল ভারতবর্ষের আদি সমাজ। কিন্তু সে রাজা আজ নেই, রাজত্বও নেই। দুর্ধর্ষ রাজশক্তির সংগে পরীক্ষা হলো ক্ষাত্রধর্মের। কিন্তু সে শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল পরাজয়ের ইতিহাসে। একদা সে ভারতীয় রাজশক্তি মুছে গেল ধরাপৃষ্ঠ থেকে। এলো পাঠান, এলো মোগল, এলো মারাঠা, এলো ইংরেজ। বিচিত্র রাজশক্তির পরীক্ষা কেন্দ্র হলো এই ভারতবর্ষ। ইংরেজের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে কায়েম হলো গত দুই শতাব্দীতে। নিশ্চিন্ত আরামে চলছিলো নিয়মতন্ত্রের রাজত্ব। কোথা থেকে এলো মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব—আজ আবার সুরু হয়েছে দাবার ছকে বাজীমাতের খেলা। চারিদিক মেঘাচ্ছন্ন। ঝড় উঠেছে, আরো উঠবে এবং একদিন আবার সব কিছুর সমাপ্তি হবে। এত রাজশক্তির ওলট-পালট হয়ে গেল, পরিবর্তনের উল্কাঝড়ে পৃথিবীর চেহারাটা পর্যন্ত বদলে গেল—কিন্তু ভারতবর্ষের আদি ও অকৃত্রিম সমাজটা আজও মরলো না। এটা কি কম কথা? এই তুচ্ছ তত্ত্বটাকে আঁকড়ে ধরে আজো ভারতবর্ষের গর্বের অন্ত নেই। যেন সৃষ্টি রসাতলে গেলেও আমাদের সমাজ-ফানুসটা মহাশূন্যে ঝুলতে থাকবে। মৃতের নির্মোক নিয়ে প্রেতনৃত্য ভারতবর্ষের মাটিতে যত জমে, দুনিয়ার কোথাও বোধ করি তেমনটি জমে না।

রাষ্ট্রের সংগে সমাজের সম্বন্ধটা ভারতবর্ষে যত অংগাংগী ছিল, আর কোথাও তত ছিল না। অথচ আশ্চর্য, রাষ্ট্র নামে বিশাল অট্টালিকাটা যখন কালের ঝাপটার তাল সামলাতে না পেরে ধরাশায়ী হলো, সমাজ নামে বাহির বারান্দাটা তখনো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য দেশে এ জিনিষ সম্ভব হতো না। কারণ, কুসংস্কার ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বিরাট ভূমিকম্পে প্রাচীনের মন্দির চূড়া ভেঙে গেল, এমন কি মন্দিরের প্রাণশক্তি দেবতার বিগ্রহ পর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে—তথাপি পুরহিত জরাজীর্ণ ধ্বংসরাশির উপর দাঁড়িয়ে কেবল মাত্র কাঁসর-ঘণ্টার নিনাদে আকাশ মুখরিত রেখেই আনন্দে উল্লসিত। মজ্জায় যে মোহ তাকে বশীভূত করেছিল, বাহ্যিক আড়ম্বরের সে কুসংস্কারই তাকে আনন্দে তাথৈ থৈ নাচতে উৎসাহ দিচ্ছে। ভারতবর্ষের সমাজটাও ঐ ভগ্নমন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টার মত। রাজা নেই, রাজার ধ্বজাধারী রাজত্ব নেই, ধর্মের বর্ম নেই এমন কি সভ্যতার খোলটা পর্যন্ত গেল—অথচ মরচেড়া সমাজটা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, কিন্তু মরছে না। সংস্কারের শ্যাওলা এত দৃঢ় হয়ে সমাজদেহে বসে গেছে, ইচ্ছা করলেই তাকে আর মুছে ফেলা যায় না। দেহটাকেই ভেঙে দিতে হবে। আঘাত চাই।

এই ত সেদিন পর্যন্ত উন্মার্গ নিয়ে দেশে হৈ হুল্লোড়ের অভাব ছিল না। বানুক্রমিক রক্ত-শোধনের ধারাটা সেদিন পর্যন্ত হিন্দু-সমাজের মর্মমূলে প্রবাহিত ছিলো। কোথা থেকে একটা অজানো আলোকসম্পাতে সমাজ-দেহের চেহারাটা গেল বদলে। অন্ধকারের একঘেয়েমি থেকে জন্ম নিলো বিপ্লবী এক প্রাণশক্তি যার বাণী হচ্ছে: বর্ণচোরা সমাজের বর্ণটা মিথ্যা বলে স্বীকার করো, বাস্তব অর্থনীতিক ভিত্তি বণ্টনের একমাত্র কারণ বলে মেনে নাও। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে শিরার তাজা রক্ত নয়, করেছে তার নাম অর্থ, তার নাম পুঁজি। যে শক্তি সুখকে ভাগ করে, যে শক্তি মর্যাদা দেয় ভুয়ো আভিজাত্যকে, সে শক্তি সমাজের শক্তি নয়, তার নাম স্বার্থ। উপড়ে ফেলো সে সর্বগ্রাসী শক্তিকে, অস্বীকার করো তার অস্তিত্বকে। সৃষ্টি করো সে উর্বর শক্তির যে-শক্তি নিত্য কালে মানুষের উৎপাদনী কর্ম-ক্ষমতাকে জাগ্রত করে, যে-শক্তি বেঁচে থাকবে অর্থনীতিক একটা সুসম্বদ্ধ কাঠামোকে স্থির করে। সাম্যবাদের উদয় হবে, মরে যাবে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র—শুধু মানুষ নামে বাঁচবার অধিকার পাবে, নর মোহ নির্বাসিত হ চিরকালের জন্যে। বাঁচতে হবে।

এই মার্কসীয় মতবাদ আজ দেশের শিক্ষিত সাধারণ গ্রহণ করছে মন্ত্র হিসেবে। এই মন্ত্রই হবে আগামী কালের কর্মস্রোত। উৎপন্নী শক্তিকে কেন্দ্র করে সমাজ-ব্যবস্থাটা নূতন ধারা চলতে থাকবে। রাষ্ট্রীয় স্বরাজকে আশু আয়ত্ত করবার কৌশল আছে সেখানে

যেখানে সমাজটা এগিয়ে গেছে এই বাণী নিয়ে। শ্রেণীহীন মানবাত্মাকে লক্ষ্য রেখে যে গণশক্তি আজ সমাজের অটল পুঁজিবাদকে টনক দিতে উদ্যত, সে গণশক্তিই হ'লো পুঁজিবাদীর গোড়ার শক্তি। এদেরই হাতে উৎপাদনের রসদ। শ্রমকে কশাঘাতে নির্জীব করে লাভের অঙ্ক চলে যাবে ধনিকের হাতে, এই যদি সত্যি হয় তবে সমাজটা যেখানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তার থেকে এক পা'ও এগোতে পারবে না। শ্রমের মাপকাঠিতে বণ্টনের নিয়মকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে অসাম্য চিরন্তন ছিল চিরন্তনই থেকে যাবে। তাই প্রয়োজন উৎপাদন ও বণ্টনের আমূল পরিবর্তন। দেশের কৃষক, মজুর, কুলি এবং আর যারা ধনতন্ত্রকে আজও তাজা রেখেছে তাদের মধ্যে জাগানো চাই সেই চেতনা যে-চেতনা তার শ্রেণীকে ভুলিয়ে দেয়, নিজেদের সংঘবদ্ধ করে, আর কর্মক্ষম করে। প্রয়োজন হবে সে বিপ্লবের যে-বিপ্লব সমাজটাকে বিজ্ঞানের বিশ্লেষণী শক্তি আর উৎপাদনের কলকজা দিয়ে মজুত করতে সমর্থ হবে। শুধু দশটা বিধবাকে বিয়ে দিলে চলবে না, শুধু পণপ্রথাকে সমাজের অভিশাপ বলে ধিক্কার দিলে চলবে না, শুধু অস্পৃশ্যতা দূর করলে চলবে না, শুধু জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হলেই চলবে না, শুধু কুসংস্কারকে দেশত্যাগী করলে চলবে না—করতে হবে গণচেতনার সৃষ্টি, জনশক্তির উদ্বোধন। মূলমন্ত্রকে সমাজের মনে গেঁথে দিতে পারলে সমাজটাও তার নিজের খোলস পাল্টাবে। মতবাদ মরে গেলে সেই মতের ধ্বজাধারীরাও বাঁচতে পারে না। তার দৃষ্টান্ত রাশ্যা। সামন্ততান্ত্রিক পুঁজিবাদটা যেদিন মরে গেলো, সেদিন থেকে রাশ্যা একটি নূতন দেশ। নূতন মতবাদের পূর্ণফল হয়ে দেখা দিলো নূতন সমাজ। এ না হয়ে পারে না, এটা বিজ্ঞানের গোড়ার কথা। অতীত গৌরবের মোহে আর পরাধীনতার দৈন্য ও আত্মগ্লানিতে দেশটা যেখানে এসে ঠেক্‌না দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানটায় করতে হবে প্রচণ্ড আঘাত। বড় আঘাত না হলে বড় কিছু হতে পারে না। ধর্মের আর প্রাচীন ইতিহাসের মেয়েলি ভাবালুতাকে নির্বাসন দিয়ে আমদানী করতে হবে বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধিবৃত্তির আর বিচারবুদ্ধির। যে-ধারণা জাতিকে পারমার্থিক চিন্তায় অন্ধ করে রেখেছে তাকে বিপরীতধর্মী আর্থিক বিচারশক্তি দিয়ে উপড়ে ফেলা চাই। তার কারণ আমরা ট্র্যাডিসনে অন্ধবিশ্বাসী। ট্র্যাডিসনটাকে একমাত্র সত্যি বলে মেনে নেওয়ার অনেক মূঢ়তা। সে মূঢ়তাকে প্রশ্রয় দিলে সমাজ হবে বীর্যহীন। বীর্যহীন সমাজ দিয়ে আমাদের লাভ?

সমাজের দর্পণ হিসেবে সাহিত্যকে মেনে নিলে সে সাহিত্যই হবে এ নূতন সমাজের কাণ্ডারী। নূতন সমাজকে অর্থনৈতিক সাম্যবাদে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সাহিত্যের পুরণো খোলস পাল্টাতে হবে। উনিশ শতাব্দীর চোখ ঝল্‌সানো আদর্শবাদকে সাহিত্যের ধর্ম হিসেবে আর টেনে নেওয়া চলে না। চাই নূতন স্রোত। যে স্রোতে চলছে—শতাব্দীর ছন্দ নেই, সে স্রোত প্রবাহমান থেকেও মৃত। তার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু তারও স্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে গেছে। যার মৃত্যুই দুর্লংঘ্য পরিণতি, তাকে আর গোর থেকে টেনে তুলবার চেষ্টা কেন? 'সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, শিক্ষা, ব্যবসা ও বাণিজ্য, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি—এ সব কিছুরই গোড়ার গলদ ঐ অর্থের অসাম্য। সে অসাম্য নিয়মতান্ত্রিক। গোড়ার গলদ ঘোচাতে হলে বিপ্লবী মনোবৃত্তি চাই। সে মনোবৃত্তির জীবনীশক্তি দৃঢ় করতে পারে জাতীয় সাহিত্য। সেদিনও যা সম্ভব হয়নি আজ তাই হচ্ছে ও হবে।

ইয়োর-এমেরিকার সমাজনৈতিক মত-যুদ্ধ অনেক কাল আগে থেকেই চলে আসছে। সে সংঘর্ষ এদেশের মাটিতেও শিকড় নিচ্ছে। বিজাতীয় ভাবধারা বলে ইয়োর-এমেরিকার মতবাদকে উড়িয়ে দিতে পারি, কিন্তু বৈষম্য আর বৈক্লব্যের কঠিন মরচেপরা খোলসটা দূর করতে হলে বিজাতীয় বলে তাকে ঘৃণা করলে চলবে না। ভারতবর্ষে যেমন অর্থনৈতিক কারণেই চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি অর্থনৈতিক কারণেই আজ তাকে আবার অস্বীকার করতে হবে। বিজাতীয় হলেও যে-ভাবধারা তা করতে সাহায্য করবে তাকেই আমরা চাই।

মা

(উপন্যাস)

শ্রীসুপ্রভা দেবী

ষোল

আরক্ত দুই চোখ মেলে একবার চেয়ে দেখল সবিতা। রাত না ভোরবেলা, সে কোথায় আছে প্রথমটা বুঝে উঠতে পারল না। তার পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার চোখ বুঁজল।

হঠাৎ কেন আবার জ্বর এল এতদিন পরে? কী জোরেই না এসেছে। রাঁধতে বসেছিল সে। বিকেল থেকেই অবিশ্যি শরীরটা তার ভালো নেই, দুপুরবেলা খেতে বসে কিছুই খেতে পারে নি। তার পরে এক সময়ে শীত শীত করতে লাগলো, হাড়ে হাড়ে ঠকাঠক কাঁপুনি ধরলো, চোখ জড়িয়ে আসতে লাগলো, তেষ্টায় ঠোঁট জিভ শুকিয়ে এল, সব মিলিয়ে সবিতাকে ভালো করেই বুঝিয়ে দিল অনেক দিন পরে আবার পুরনো বন্ধু ম্যালেরিয়া তাকে স্মরণ করেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে একটু ভালো বোধ করে সে জেগে উঠল। শরীরে অসীম ক্লান্তি ও অবসাদ, কিন্তু মাথার ভেতরে সেই ঝিমিয়ে পড়া ভাবটা কেটে গিয়েছে। অতসী বাড়ী নেই। অন্ধকার ঘরে একলা বিছানায় শুয়ে অন্য দিন নিজেকে যেমন অসহায় ও একা বোধ হয় এখন তেমন মনে হচ্ছে না। অলস ভাবনা ভাবতে ভালই লাগছে বরং। রোগশয্যায় শুয়ে রোগীর মনটা যেমন ছুটি পায় তার মনটাও তেমনি ছুটি পেয়েছে অনেক দিন পরে।

বয়েস তার হোল প্রায় চল্লিশ। মাথার চুলে পাক ধরেছে। তবে তার শরীরের গড়ন ছিপছিপে বলে এখনও বয়েস এত বেশী বলে মনে হয় না। অতসীর পাশে থাকে তার কোন বয়স্কা দিদি ব'লে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু চেহারা দেখে মনে হোক্ না হোক্ কাল তো অপেক্ষা করে না। তাই এক-দুই ক'রে কখন এতগুলো বছর কেটে গিয়েছে জীবনের। ছোটবেলার স্মৃতি সুখের নয়, তাই সে ইচ্ছে ক'রেই সে-সব দিনের কথা ভাবতে চায় না কিন্তু মনে আছে সবই। বাবাকে বা মাকে প্রায় কিছুই মনে পড়ে না, একটা অতি অস্পষ্ট ধারণা শুধু রয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য—তার বাবার গম্ভীর বাজখাই গলার স্বরটা আজও তার খুব মনে আছে। বড্ড আদর করতেন তাকে। মা মনে মনে খুসী হ'লেও মুখে বলতেন—"কালো মেয়ের অত আদর কেন? বিয়ে দিতে তো জিভ বেরোবে।" বাবা কপট রাগ দেখিয়ে বলতেন—"ভারী আস্পর্দ্ধা তোমার, আমার মেয়ের রূপের নিন্দে? তোমার চেয়ে ঢের ভালো বিয়ে হবে দেখে নিও।" মা বলতেন—"বললেই হোল? ওর বাপের আমার বাপের আধা মুরদ নেই তার আবার আমার মেয়ে ভালো বিয়ে দেবে।" কাল সমুদ্র পেরিয়ে ২।১টা এ রকম কথা আজও মনে অক্ষয় হ'য়ে রয়েছে। যে জায়গায় বাবার চাকুরী ছিল সে জায়গাটার স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেছে। পাহাড়ে দেশ ছিল। সেই বাল্যকালের পরে আর সে পাহাড় দেখে নি। পাহাড় কেমন দেখতে কিছু ধারণা তার নেই, তবু সে মনে করতে চেষ্টা করে শৈশব স্মৃতির সেই অরণ্য-ঘেরা পাহাড়ে জায়গার নীচু বাংলো। তার জন্যে এক নেপালী আয়া ছিল, পিঠে তাকে বেঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। সে যখন মাত্র পুতুল খেলা শিখেছে তখনই জীবনের প্রথম খেলাঘর তার ভেঙে গিয়েছিল। এ সব কথা কেউ জানে না। কোন দিন সে এ সব কথা খোকা খুকীকে বলে নি। আর শম্ভুনাথের তো তার কুমারী জীবনের প্রতি কোন কৌতূহলই ছিল না। উৎপল অতসী কেউ জানে না, এই কলকাতায় একটি বাড়ী আছে

(এখনো আছে কিনা কে জানে) যেখানে তার বাবা তাকে ও তার মাকে এনে রেখে গিয়েছিলেন, দু-দিন পরেই ঘুরে আসবেন। পার্কে ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা ক'রে বেড়াতো—পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার ছেলেমেয়েরা। সে চেয়ে চেয়ে দেখতো, দোলনায় দুলতো তাদের সঙ্গে। তার পর একদিন খবর এল তার বাবা নেই। সেই গম্ভীর বাজখাঁই গলার আওয়াজ চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। তার মা খুব কাঁদলেন, চোখের জলের আর বিরাম ছিল না যতদিন বেঁচে ছিলেন। সে নিজে কিছুই বুঝতে পারে নি, এমন কি মণ্টুদার তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও না। তার পরে এক রাত্তিরে তার মা তাকে ফাঁকি দিয়ে তার কথা একবারও না ভেবে চলে গেলেন। শুনেছিল তার ভাই হবে। ছোট্ট হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ উদ্যত হয়ে উঠেছিল সেই অজ্ঞাত শিশুর উদ্দেশে। কিন্তু সে আর এল না। তার মায়ের মৃত্যুর আগের কয়েকটা রাত্রির কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। তাকে বুকে চেপে ধরে কেবলই কাঁদতেন, "ওরে খুকু আমাকে তো তুই ফাঁকি দিবি নে? তোকে অত ভালো-বাসতেন, তোর মায়াতেও কি আটকালো না?" সেইসব রাত্তিরে শিশুমনের অন্ধ আকুল সহানুভূতি দিয়ে তার মাকে সজোরে সে আঁকড়ে ধরে থাকতো। তার পর তো তিনি নিজেই পালালেন। আজ চল্লিশ বছর বয়সে মনে হয় সেও ভগবানের দয়া। সে নিজে দুঃখ পেয়েছে জীবনে—অনেক দুঃখ। তবু তার জীবনে একটা ভবিষ্যতের আশা ছিল এবং সদয় জীবন-দেবতা তার ভবিষ্যৎ ব্যর্থও করেন নি। তার জীবন সুখ-সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছিলেন। কিন্তু তার মা যদি বেঁচে থাকতেন তবে ভাসুরের সংসারে দাসীবৃত্তি করে তাঁর জীবন কাটতো। বলা যায় কি, হয়তো আজও তিনি বেঁচে থাকতেন দুর্বিসহ দুঃখ সইবার জন্যে; তিলে তিলে ক্ষয় হতেন, তুষানলে দগ্ধ হতেন, তবু আয়ু ফুরতো না। ভালই হয়েছিল সে সব দুঃখ তাঁকে সইতে হয় নি। স্বামীর সংসারে সোহাগে আদরে গরবিনী রাজরাণী ছিলেন—দাসীবৃত্তি তাঁকে দিয়ে পোষাতো না।

কিন্তু সে যাই হোক্, ভগবান দয়া করে মাকে সরিয়ে নিয়ে মেয়েকে ফেলেছিলেন কী দুঃখের মধ্যে আজও মনে পড়ে চোখে জল আসতে চায়। তার শিশু-মনের ধারণা শক্তি আর কতটুকুই বা ছিল—তা দিয়ে সেই বিরাট একাকীত্বের সবটুকু আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না এই রক্ষে। নতুবা সমস্ত হৃদয় খান্‌খান হ'য়ে যেতো। জীবনের প্রথম পাঁচটি বৎসর তার যত সুখে কেটেছিল, তার নিজের ছেলে-মেয়ের জীবনে তার অর্দ্ধেকও ঘটে নি। কী মানুষ ছিলেন তার বাবা! সে তুলনায় শম্ভুনাথ তো ছেলেমেয়েকে আদর করতে জানতেনই না বলতে হয়। তার বাবা যখন তাকে অনেকটা উঁচুতে তুলে ধরে বলতেন, "খুকী ফেলে দিই—ফেলে দিই তোকে!" তখন ভয়ের সঙ্গে কৌতুক মিশে কী যে মজা লাগতো—বুক গুরগুর করতো অথচ শূন্য থেকে মাটিতে নামতেও ইচ্ছে হোত না। বাবার বন্ধু আসতেন; তাঁকে ডাকতো কাকাবাবু। তাঁর মোটা লাঠিগাছটিকে ঘোড়া বানিয়ে সে বাড়ীময় টহল দিয়ে আসতো। কাকাবাবু এসেই মাকে হুকুম দিতেন—"ঠাকরুণ, চা করুন কড়া করে।" তার মা খুব বড় বড় মোটা পেয়ালায় চা তৈরী করে দুজনকে দিতেন, নিজেও খেতেন। তিন জনে মিলে গল্প জমাতেন, আর সে তার বাবার কোলে আরাম ক'রে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে তাঁর চায়ে ভাগ বসাতো। পিরীচে ঢেলে একটু একটু তাকে তিনি দিতেন। দার্জ্জিলিং সহর থেকে তার জন্যে তার বাবা জামা জুতো কিনে আনতেন। রাত্তিরে মা ঘুম পাড়াতেন মস্ত বিছানায় শুইয়ে। তাঁর মুখে ছড়ার গুন-গুনানি শুনতে শুনতে চোখে পরীরাজ্যের মখমল-নরম ঘুম নেমে আস্‌তো

সতু যাবে শ্বশুর-বাড়ি সঙ্গে যাবে কে?
ঘরে আছে কুনো বেড়াল কোমর বেঁধেছে।

সেই অজস্র আদর ও স্বাচ্ছন্দ্যের সুখস্বর্গ থেকে হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে তার পতন হোল জ্যাঠামশায়ের সংসারের অভাব, শাসন ও নিরানন্দের মধ্যে। তার বাবা বলতেন, শিক্ষা-দীক্ষায় তাকে মেমের মেয়েদের মত চতুর ক'রে তুলবেন। বেঁচে থাকলে সে সাধ কতটুকু তাঁর পূর্ণ হোত কে জানে, কিন্তু স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যলোকের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করতে পারলে সতুর শিক্ষা-দীক্ষার আয়োজন দেখে তার

বাবার মনোভাব কি হয়েছিল অনুমান করা কঠিন নয়। প্রথম বছর-দুই সে বড় বেশী ছোট ছিল বলে তাকে কঠিন কাজ বড় একটা করানো যেতো না। তবে জ্যাঠাইমা কাকীমাদের কোলে যে যখন ছোট থাকতো তাকে বয়ে বেড়ানোর জন্যে আর তাদের ভাবনা ছিলো না। সারাদিন তার কোলে একটি না একটি ক্ষুদ্র মানুষ চড়ে থাকতো। তার ওপরে ছিল ঠাকুরমায়ের নানা ফাই ফরমাস। যত বড় হতে লাগলো একান্নবর্ত্তী সংসারের খুচরো সব কাজ আপনা-আপনি এসে জুটতে লাগলো তার চারদিকে। বিয়ের আগ পর্য্যন্ত ধোপাবাড়ির ভারবাহী গাধার মত দিনে রাত্রে অজস্র কাজের চাপে তাকে যেন পিষে ফেলা হোত। যে বয়সে ছোট ছেলেমেয়েরা খেলে বেড়ায়, বড় জোর বই শেলেট নিয়ে পাঠশালায় গিয়ে লেখাপড়ার অভিনয় করে সে-বয়েসটা কোন্ ফাঁক দিয়ে কেটে গিয়েছে সে টেরও পায় নি। শুধু যখন পূজো-পার্ব্বনে তার সমবয়সীরা সব সেজেগুজে উৎসবে মত্ত হয়ে প্রজাপতির মত নেচে বেড়াতো তখন বাসন মাজতে বা কাপড় কাচতে বা ঠাকুরমার ওষুধ তৈরী করতে বসে তার নিজের একান্ত নিরানন্দময় অস্তিত্বের বেদনায় চোখে জল এসে পড়তো, মনের ভেতরটায় এমন একটা হাহাকার উঠতো যে শুধু চোখের জলে তাকে প্রকাশ করা যায় না। যাক্ তবু ভালো সেই দুর্দ্দিনেরও শেষ ছিল। প্রজাপতিকে ভগবান তার মুক্তিদূত ক'রে পাঠালেন—শ্বশুর ঘরে এসে সে যেন পুনর্জ্জীবন লাভ করলে।

তার জীবনের সব চেয়ে সুখের দিনগুলি ছিল খোকা ও খুকীর ছোটবেলায়। শম্ভুনাথ বেঁচে ছিলেন। আর্থিক স্বচ্ছলতা তেমন না থাকলেও অভাব ছিল না এবং অভিযোগ তো ছিলই না। চাঁদের মত সুন্দর তার ছেলে-মেয়েরা ঘর-বাড়ি উঠান আলো করে খেলা ক'রে বেড়াতো। খুকীর তখনও ভালো করে বুলি ফোটে নি—তাই নিয়ে খোকা তাকে ক্ষেপাতো—খুকী এসে ছল-ছল চোখে তাকে নালিশ জানাতো। তখন তাদের তাকে নইলে চলতো না। শম্ভুনাথের সেবা-যত্ন, খোকা-খুকীর সব কাজ আবার সংসারের সব কাজ—সারাদিনই খাটতে হোত, কিন্তু কি মধুর সেই দাসত্ব। আজ ছেলেমেয়েরা কত বড় হয়েছে, তাদের কত ভাবনা চিন্তা, কত রকমের কাজ, তাদের পৃথিবীতে সবিতা আজ অনেকের মধ্যে একজন, একমাত্র জন নয়। হঠাৎ পাশ থেকে কে ডাকল—'মা'।

চমকে উঠে চোখ মেলে সবিতা দেখল 'রমেশ'। ঠিক এই মুহূর্ত্তে উৎপল বা অতসী কাছে এলেও সে এত খুশী হোত না। সাগ্রহে নিজের বিছানার পাশটিতে জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বলল—"বোস রমেশ, ক'দিন আস নি, বড্ড ফাঁকা লাগতো আমার। কেমন আছ?"

তার কপালে হাত রেখে রমেশ বলল—"আপনি তো ভালো নেই দেখতে পাচ্ছি। কবে থেকে জর?"

"এই সন্ধ্যে থেকে। হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে জরটা খুব জোরে এসেছিল, এখন কমেছে।"

চারদিকে চেয়ে রমেশ জিজ্ঞাসা করল—"এরা কোথায়? জরের মধ্যে একলা পড়ে আছেন?"

সবিতা কৈফিয়তের সুরে বলল—"এরা তো জানে না যে আমার জর হয়েছে? খোকা এখনও ফেরে নি, তবে ফেরবার সময় হয়েছে। আর খুকী রান্না সেরে রেখে একটু স্টেশনে গিয়েছে, তার এক বন্ধু আসবে আজ। গেছে তো অনেকক্ষণ—ফিরছে না কেন কি জানি।"

রমেশ চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল—"বীণা কেমন আছে?"

"ভালই আছে, এখন সকালে বিকেলে একটু [illegible], একবেলা ভাত খাচ্ছে।" একটু পরে সবিতা ব[illegible]—"বীণা একেবারে সেরে উঠলেই খোকার বিয়ের ঠিক কোরব ভেবেছি। তোমাকেই ভার নিতে হবে। সব করতে কর্ম্মাতে হবে। আমার তো আর কেউ ভরসা নেই। তবে খোকার বড়দাদা অমরকে অবিশ্যি লিখতে হবে এসে কর্ম্মকর্ত্তা হবার জন্যে, তা সে কি আর আসবে?"

রমেশ এদের পরিবারের সব খবরই জানতো, বলল—"তা না হয় হোল, কিন্তু বিয়ের অত তাড়াতাড়ি কি মা? তা ছাড়া উৎপল বিয়ে করতে রাজী হয়েছে তো? আজকাল ছেলেমেয়েদের মতামত নিতে হয় যে। তাকে ভাল করে জিজ্ঞেস করেছেন?"

"হ্যাঁ, খোকাকে আমি আজ সকালে জিজ্ঞেস

করেছিলাম, সে রাজী হয়েছে। আমি বলছি রমেশ, এ বিয়ে হ'লে খোকা সুখীই হবে। বীণাকে দেখতে তেমন সুন্দর নয়, কিন্তু ওর মন বড় ভালো। মা-মরা মেয়ে, মেয়ে হয়ে থাকবে ও আমার ঘরে।"

রমেশ একটু বিস্মিত হোল উৎপল বীণাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে শুনে। এমন সময় উৎপল এসে ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে বলল—"বাঃ রমেশদা যে, দিব্বি জমিয়ে বসেছ। মা শুয়ে কেন ?"

খবর শুনে তার মুখ ম্লান হয়ে গেল। "এতকাল পরে আবার ম্যালেরিয়া? আমি তো ভেবেছিলাম গঙ্গার হাওয়ায় সে সব পালিয়েছে। খুকী কোথায় ?"

সবিতা বলল—"সে গেছে স্টেশনে তার বন্ধুকে আনতে, সেই যে হিমানী একবার এসে দুদিন ছিল আমাদের কাছে। সে আজ আসছে।"

উৎপল খুসী হয়ে বলল—"বেশ হবে। কিন্তু মা ক্ষিদে যা পেয়েছে! ঘরে আছে কিছু ?"

সবিতা ব্যস্ত হয়ে বলল—"দেখেছ কী ভুল আমার। যা হাত মুখ ধুয়ে আয়, ভাত বেড়ে দিচ্ছি—দুজনে বসে খাবে।"

রমেশ বলল—"মা চুপ করে শুয়ে থাকুন—আমরা খাবার ঠিক বেড়ে নিতে পারবো। উৎপল এস এ ঘরে।"

পাশের ঘরে গিয়ে খাওয়া সেরে দুজনে জানালার সামনে দাঁড়াল। রমেশের সিগারেট খাওয়া অভ্যেস। সে সিগারেট ধরালে। তারপর বলল—"উৎপল, মা বলছেন তুমি বীণাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছ। সত্যি ?"

"হ্যাঁ সত্যি।"

"কিন্তু আমার তো ধারণা ছিল বীণাকে বিয়ে করতে তোমার আগ্রহ নেই। নইলে এ বিয়ে তো অনেক আগেই ঘটতে পারতো। তুমিই বলেছিলে বীণার মা বেঁচে থাকতে তোমার পেছনে খুব লেগেছিলেন, তুমি কোন রকমে পালিয়েছিলে ?"

উৎপলের মুখে, যে সকৌতুক হাসি রমেশের চির-পরিচিত—সেই হাসি ফুটে উঠলো। "আরে সে যে তিন বছর আগেকার কথা। তখন যে বন্ধন হয়তো ফাঁস মনে হয়েছিল, এখন যদি তাকেই মালা মনে হয়, তোমার আপত্তি কি বলতো ?"

ধমকের সুরে রমেশ বলল—"আমাকে ধাপ্পা দিও না উৎপল। বীণার অসুখের সময় তোমাকে লক্ষ্য করে বুঝেছি বীণার প্রতি আজও তোমার মন নিরুৎসুক। তবে কেন তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ? জীবন নিয়ে তো খেলা নয়।"

এবার উৎপলের মুখ গম্ভীর হ'য়ে এল। বলল—"আচ্ছা রমেশদা, তুমি নিয়তি বিশ্বাস কর ?"

"করি কিনা তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নি।"

"আমি বিশ্বাস করি। বীণাকে বিয়ে করতে হবে—এ হচ্ছে আমার নিয়তি। বুঝলে ?"

"তুমি বুঝলে কিসে ?"

"শোন তবে। বীণার মা খুব চেষ্টা করছিলেন বীণার সঙ্গে আমাকে বিয়ে দিতে, তা তুমিও জানো। তখন আমি তা স্বীকার করিনি, জোর করে পালিয়েছিলাম, কিন্তু আমার মার কাছ থেকে আমি পালাব কোথায় বল ? মা বীণাকে এখন প্রায় আমাদের মত স্নেহ করেন। মা-মরা মেয়ে তাঁর কাছে এসে আশ্রয় চেয়েছে, তাকে তা দিতেই হবে এই হচ্ছে তাঁর সঙ্কল্প, তাঁর তো আর দ্বিতীয় ছেলে নেই যে বীণাকে বিয়ে করে তাঁর ইচ্ছে পূর্ণ করবে ? তাই আমাকেই তা করতে হোল। তা ছাড়া ভেবে দেখলাম বীণাও খুসী হবে এ বিয়েতে।"

"কিন্তু তুমি কি সুখী হবে উৎপল ?"

আকাশে অনেক তারা, একটুক্ষণ সেই দিকে চেয়ে রইল উৎপল। রাত্রি কি অপরূপ রূপসী। কেমন ক'রে অগোচরে মনের মধ্যে ঘনিয়ে আসে টের পাওয়া যায় না।

"রমেশদা, সুখী হব না কেন ? মা সুখী হবেন, বীণা সুখী হবে, আমি নিজেও অসার্থক হব না। এমন মুহূর্ত্ত আসবে যখন মনে বড় দুঃখ হবে, জীবন শূন্য বোধ হবে। কিন্তু আবার এমন মুহূর্ত্তও আসবে যখন মনে হবে যা হয়েছে তা ভালই হয়েছে। হয় তো বললে সেন্টিমেন্টাল মনে করবে তুমি, কিন্তু জানো—আমার মায়ের মুখে তৃপ্তির হাসি দেখতে পেলে জীবনে অনেক কঠিন কাজ সহজ হ'য়ে ওঠে। আমি তো অতসীর মত দৃঢ়মনা নই! জীবন-পণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা নেই আমার। দুর্ব্বল মন—কোন কিছুই করতে

পারলাম না, পারবোও না। অতি সাধারণ জীবন কাটিয়ে যাবো। এরি মধ্যে মায়ের প্রসন্ন মুখ মনে সাহস জাগাবে। মা বড় দুঃখ পেয়েছেন জীবনে, কিন্তু তবু জীবনকে কোন দিন ফিরে আঘাত করেন নি। নির্ব্বিচারে সহ্য করেছেন আর কেবল আমাদের ভাইবোনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। জানো রমেশদা, দেশের কথা যখনি ভাবি আমার মায়ের মুখ মনে পড়ে। দুজনে এক হয়ে আছেন আমার মনের মধ্যে।"

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর উৎপল নীরবতা ভঙ্গ করলে। "রমেশদা, আমি যে বীণাকে বিয়ে করছি তার আর একটা কারণ আছে। তুমি তো জানই মার মনে কত ইচ্ছে তোমার সঙ্গে অতসীর বিয়ে দেন। তুমি কোন দিন মুখে কিছু বলনি বটে, কিন্তু আমি জানি তোমার মনের কথা। কিন্তু অতসীর মন কোথায়? সে তীব্রবেগে তার লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে, বিচার বিতর্ক বিবেচনা কিছুর অবসর নেই। সেই গতিকে কেউ ঠেকাতে পারবে না, মাও নয়। অতসীর কাছ থেকে যে আঘাত পাবেন তার সামান্য একটু লাঘব করতে পারি, যদি আমি বীণাকে বিয়ে করি।"

ঘরে আলো নেই; অন্ধকারে রমেশের মুখের ভাব বোঝা গেল না।

এমন সময় হঠাৎ সবিতার কাতরোক্তি শুনে দুজনে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সিঁড়ির মাথায় আলো জ্বলছে। সবিতা সেখানে দাঁড়িয়ে কার গায়ে হাত দিয়ে কি যেন বলছে। একটি মেয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। তার শরীর থেকে থেকে কেঁপে উঠছে আর একটা অস্পষ্ট গোঙানি শোনা যাচ্ছে। দুজনেরই এক সঙ্গে মনে হোল এ বুঝি অতসী, তার কোন বিপদ ঘটেছে। ত্রস্তপদে দুজনে এগিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ততক্ষণে সবিতার কোলে মাথা গুঁজে মেয়েটি শুয়ে পড়েছে। তার মুখের কাপড় সরে যেতে উৎপল তার দিকে চেয়ে চমকে উঠল। অতসী নয়, মেয়েটি হিমানী, তার মুখ অসহ্য যন্ত্রণায় বিকৃত। সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। রমেশের ডাক্তারী কর্ত্তব্যজ্ঞান ততক্ষণে সজাগ হয়ে উঠেছে।

সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে হিমানীর হাতটা ধরে নাড়ী পরীক্ষা করলে।

তার পর সবিতাকে বলল, "মা ওঁকে এক্ষুনী ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতে হবে, চলুন।" সকলে মিলে সাহায্য করে হিমানীকে ঘরে নিয়ে এল। সে যে অতটুকু পথ হেঁটে এল তা কেবল মাত্র মনের জোরে। বিছানায় শুয়ে সে অচেতনপ্রায় হয়ে চোখ বুজলে।

রমেশ সবিতাকে জিজ্ঞেস করল—"ইনি কে?" সবিতা সংক্ষেপে পরিচয় দিল। রমেশ ও উৎপল পাশের ঘরে উঠে যাবার একটু পরেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হয়। সে ভেবেছিল অতসী এসেছে; কিন্তু শব্দটা হঠাৎ থমকে যাওয়ায় সে দু-একবার ডাকাডাকি ক'রে কোন সাড়া না পেয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে আসে। এসে দেখে হিমানী চুপ ক'রে বসে আছে, তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল—"অতসী কোথায়?"

সবিতা আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে বলল,—"সে কি—সে তো তোমাকে আনতে ষ্টেশনে গিয়েছে। তুমি তাকে দেখনি?"

হিমানী বলে "অতসী আমাকে ষ্টেশনে কোথায় পাবে? আমি এতদিন হাওড়ার কাছে এক গ্রামে ছিলাম। বাসে চড়ে আসছি। এইমাত্র এসে পৌছলাম। শীগ্‌গির আমাকে দয়া করে হাঁসপাতালে পৌছে দিন। আর সময় নেই।"

তার অবস্থা দেখে সবিতা স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। তার পরেই উৎপল ও রমেশ এসে পড়ল।

রমেশ বললে—হাঁসপাতালে পাঠানো এখন আর সম্ভব নয়। Too late—যা পারা যায় এখানেই করতে হবে। মা আপনি শীগ্‌গির গরম জল চড়ান। আর উৎপল তুমি এক্ষুনী যাও—একটা ট্যাক্সি নিয়ে যাও বরং—আমার পার্টনার ডাঃ সেনের চেম্বার থেকে আমি যা যা লিখে দিই—সেই ওষুধগুলি নিয়ে এস। বলে খস্ খস্ করে কাগজে কয়েকটি ওষুধের নাম লিখে উৎপলের হাতে দিয়ে ঠিকানা বলে দিল, উৎপল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো।

সে যখন রমেশের নির্দ্দেশমত ওষুধপত্র নিয়ে ফিরছে তখন বাড়ীর দরজায় অতসীর সঙ্গে দেখা হোল। সেও

ফিরছে। দু-এক কথায় তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে দুজনেই একসঙ্গে উপরে এল। রমেশ তাদের বলল পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে। সবিতা হিমানীর হাত ধরে বসে আছে বিছানায় আর হিমানীকে নিয়ে রমেশ নীরবে মৃত্যুর সঙ্গে যুঝচে। নিঃশব্দ পায়ে প্রহর গড়িয়ে যেতে লাগল। হিমানী সেই যে অচেতন হয়েছিল এখনও জ্ঞান ফিরে আসে নি। সবিতা ব্যাকুল কণ্ঠে কয়েক বার রমেশকে জিজ্ঞাসা করেছে—"রমেশ, হিমানী বাঁচবে তো বাবা?" রমেশ বলেছে—"দেখা যাক্ মা, কিছুই বলা যায় না।" সবিতা একদৃষ্টে চেয়ে ছিল হিমানীর মৃত্যুকাতর মুখের দিকে। আসন্নপ্রসবা সেই মেয়েটি কি অসহ্য যন্ত্রণাই না সহ্য করছে। কবে যে এর বিয়ে হোল অতসী তো কিছুই বলে নি। সিঁথিতে অস্পষ্ট সিঁদুরের রেখা আছে বটে, কিন্তু কোথায় এর স্বামী, কি বৃত্তান্ত, এখানে এত রাস্তিরে এলই বা কোথা থেকে—এই অবস্থায় লোকে কখনো ঘরের বার হয়—এই সব প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করে আসতে লাগল তার। কিন্তু উত্তর দেবার কেউ নেই, সময়ও নেই। যাক্—ওসব কথা। এ সব প্রশ্নের উত্তর না হয় নাই মিলবে, কিন্তু প্রত্যক্ষ সত্য হচ্ছে এই যে, হিমানী মা হ'তে চলেছে—পৃথিবীতে জন্ম নিতে চলেছে আর একটি মানুষ। রাত্রির বক্ষ ভেদ করে যেমন প্রভাতের জন্ম, তমসার বক্ষ ভেদ ক'রে যেমন সূর্য্যের জন্ম, তেমনি একজন মানুষ আপন জীবনের অমৃত পরিবেশন ক'রে আবাহন করছে আর একটি মানুষকে, আপনার বক্ষ ভেদ ক'রে তাকে প্রকাশ করবে। কী অদ্ভুত, কী অপরূপ। সবিতার সমস্ত হৃদয় স্নেহসিক্ত হ'য়ে উঠল। আবার তার কোলে আসছে নব শিশু, হিমানীর শিশু। তার ধাত্রী সবিতা।

পাশের ঘরে বসে ছট্‌ফট করতে করতে একবার বেরিয়ে এল অতসী। এই মাত্র উৎপলকে আবার কি আনতে পাঠিয়েছে রমেশ। সে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। কী হচ্ছে ওঘরে? হিমানীর সন্তানের জন্ম হচ্ছে? হিমানী অবশেষে চরম বিপদের মুহূর্ত্তে অতসীকে স্মরণ করে তার কাছেই এসেছে। ভালই করেছে, এখানে মা আছেন। আর রক্ষে এই যে রমেশদা এই সময় এখানে উপস্থিত। নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে হিমানী। ভারী মজা হবে। একটি ছোট শিশু এখন থেকে থাকবে এ বাড়ীতে। মার জন্যে আর ভাবনা নেই। সময় কাটাবার জন্যে তাঁকে আর ভাবতে হবে না। ছোট ছেলে যা ভালবাসেন তিনি। হিমানীর ছেলেকে নেড়েচেড়ে বেশ সময় কেটে যাবে তাঁর। আর বেচারা হিমানীও একটা অবলম্বন পেয়ে বাঁচবে। তার স্বামীর তো কবেই ফাঁসী হয়েছে—সে কিন্তু বিধবার সাজ করেনি। প্রাণ ধ'রে পারেনি বোধ হয় তার অত সাধের এয়োতির চিহ্ন মুছে ফেলতে। এখন স্পষ্ট হ'য়ে গেল কেন হিমানী তার স্বামীর সঙ্গে নিজেও ধরা দেয়নি, কেন পালিয়েছিল।

কিন্তু ঠিক এই মুহূর্ত্তে কী হচ্ছে সেখানে? বীরেশ্বরদের যা কাজ তা তো রাত দশটার মধ্যেই হবার কথা ছিল। নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে কিনা কে জানে? তার নিজের বিষয় সে প্রায় নিশ্চিন্ত। বেশ গুছিয়ে সে সব করতে পেরেছে। তবে একটা খট্‌কা আছে বটে। বাড়ী ঢোকবার আগে মুখ ফিরিয়ে একবার সে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ মনে হোল অনেকদূর থেকে একজন লোক যেন তাকে লক্ষ্য করছে। না-ও হ'তে পারে। তার দিকে রাস্তার কত লোকেই তো তাকায়। তাকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছে এমন কথা সন্দেহ হবার কারণ নেই।

হঠাৎ রোগীর ঘরে ব্যস্ততা যেন বেড়ে গেল আর নৈশ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে শিশুকণ্ঠের প্রথম ক্রন্দনে বায়ুস্তর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। অতসী উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতেই শুনতে পেল রমেশ ডাকছে, অতসী ঘরে এস শীগ্‌গির।

সবিতা গামলার গরম জলে একটা গোলাপী রংএর ডলিপুতুলের মত মানুষকে স্নান করাচ্ছে। তাকে দেখে আনন্দউজ্জল মুখে বলল—"মেয়ে হয়েছে রে খুকী—টুকটুকে মেয়ে।"

রমেশ বলল—"অতসী, মা বেবীকে দেখতে পারবেন, তুমি এস এখানে। 'মাদার'কে এটেণ্ড করা এখন বেশী দরকার। আমি ইন্‌জেকসেন্ দিচ্ছি—তুমি একটু সাহায্য

কর দেখি।" অতসী দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে সব গুছিয়ে তার হাতে তুলে দিতে লাগল। রমেশ মৃদুকণ্ঠে বলল—"বেবীর সম্বন্ধে তেমন ভাবনা নেই—তবে মাদার যদি এই ইন্‌জেকসেনটাতেও রেস্‌পণ্ড না করে তবেই মুস্কিল। ইন্‌জেকসেন দিয়ে তারা দুজনেই ব্যগ্র হ'য়ে হিমানীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। প্রায় দশ মিনিট পরে হিমানীর মুখে কুঞ্চন দেখা দিলে। সে যেন খুব কষ্টকর নিদ্রা থেকে জেগে উঠছে। রমেশের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল—সে বলল—"বোধ হয় বেঁচে যাবে।"

একটু পরেই হিমানী চোখ মেলে চাইল। অতসী ঝুকে বলল—হিমানী দি, শুনছো—তোমার যে খুকু হয়েছে—সুন্দর খুকু।

হিমানী কিন্তু কিছু বুঝতে পেরেছে বলে মনে হোল না।

ন্যাকড়া ও কম্বল দিয়ে জড়িয়ে সবিতা ছোট্ট মানুষটিকে কোলে নিয়ে বসেছে। অতসী বলল—"মা খুব খুসী হয়েছ তো?" বলে হাসল—কিন্তু রমেশের মুখের দিকে চেয়ে সেই হাসি তক্ষুনি মিলিয়ে গেল। রমেশ হিমানীর নাড়ী ধরে ছিল। অতসীর মুখে চেয়ে সে মাথা নাড়ল। তার পর অত্যন্ত ধীরে ধীরে হিমানীর গায়ের চাদরটা তার মুখের ওপর টেনে দিল। বিবর্ণমুখে অতসী অভিভূত হ'য়ে চেয়ে রইল, একটা শব্দও তার কণ্ঠ ফুটে বেরুল না।

ভোর হবার অল্প আগে সবিতা পাশের ঘরে ছোট্ট খুকুকে কোলে নিয়ে বসেছিল। দুই চোখ দিয়ে জল পড়ছিল তার। অতসী কাছে এসে দাঁড়াল। "মা হিমানীদিকে নিয়ে যাবে এখনি, তুমি দেখবে? তোমার কথামতই সাজিয়ে দিয়েছি।"

সবিতা মাথা নেড়ে জানাল দেখবে না। অতসী হিমানীকে যতক্ষণ চেয়ে দেখা যায় দেখলে, লাল পাড় শাড়ী সিঁদুর আলতায় সে আবার আজ বাসর যাত্রা করেছে। হিমানীর দেহ নিয়ে উৎপল রমেশ তারা যখন গলির মোড়ে অদৃশ্য হোল তখন সে ফিরে এসে সবিতার কাছ ঘেঁসে বসে পড়ল।

রমেশ ও উৎপল দোতলার ছেলেদের সাহায্য নিয়ে শ্মশানের কাজ শেষ করে যখন বাড়ী ফিরল তখন বেলা প্রায় আটটা। তারা এসে দেখল, বাড়ীতে পুলিশ, ইনস্‌পেক্টর জনদুই সহকর্মীকে নিয়ে অপেক্ষা করছেন। উৎপলকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"আপনি উৎপল বাবু?"

"হ্যাঁ, আপনি?"

"আমি হচ্ছি পুলিশ ইনস্‌পেক্টর। আপনার জন্তেই অপেক্ষা করছি। আপনার বোন শ্রীমতী অতসী দেবীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এই দেখুন, তিনি প্রস্তুত হয়েছেন। আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা করছেন। কাইগুলি একটু তাড়াতাড়ি সেরে নেবেন, আমরা অনেকক্ষণ এসেছি।"

উৎপল ও রমেশ ওপরে এল। সবিতার কোলে হিমানীর শিশু, তাঁর কাঁধে মাথা রেখে বুকের কাছ ঘেসে বসে আছে অতসী, তার ভঙ্গিটাও শিশুর মতই, পাশে চা ও খাবারের বাটিগুলি পড়ে রয়েছে। সবিতার চোখ দুটি লাল। উৎপল ও রমেশকে দেখে অতসী উঠে দাঁড়াল। দুজনকেই প্রণাম করল নিঃশব্দে। তারপরে উৎপলকে বলল—"বীরেশ্বর বাবুদের গোটা দলটাই ধরা পড়েছে দাদা।" রমেশ কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, উৎপলের মুখ দিয়েও বিদায় সম্ভাষণ বেরুল না।

সবিতাকে প্রণাম করতে সে মাথায় হাত রেখে কপালে চুম্বন করলে। ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল—'খুকী'—

"মা, তুমি কিন্তু কথা দিয়েছ কাঁদবে না। মনে আছে তো?"

সবিতা মাথা নেড়ে জানাল—মনে আছে। তার বুকের নীচে কাপড়ের তলায় লুকানো একটা বাণ্ডিলের ওপরে সে হাত রাখলে। তাতে মনে জোর এল। খুকী বলেছে—দেশের কত বীরসন্তানের জীবন জড়ানো আছে সেই বাণ্ডিলের জিনিষপত্র ও কাগজ পত্রগুলির সঙ্গে। আজ থেকে সে রক্ষা করবে সেগুলির। সে আর শুধু উৎপল অতসীর মা নয়—বহু সন্তানের জননী। তাই হোক্।

ইনস্‌পেক্টর দরজায় এসে দাঁড়ালেন—"আর দেরী নয়।"

"না, আর দেরী নয়", বলল অতসী—"বন্দেমাতরম্"।

সমাপ্ত

উজানী নদীর বাঁকে

(গল্প)

শ্রীভবেশচন্দ্র দত্ত

ধানকাটার মাস।

উজানীর ধার যেন সোনায় সোনা হ'য়ে গেছে সোনালী ধানে। ধানের ভারে গাছ নুয়ে পড়েছে মাটিতে। সোনালী ধানের শীষ গা এলিয়ে দিয়েছে উজানীর পাড়ে। ফুরফুরে বাতাসে উজানীও নাচে ধানও নাচে।

এই উজানীর বাঁকেই কাকপাথর গ্রাম।

ধানের নাচন দেখে কাকপাথর গ্রামও নাচে। বহু লোকের বাস এই গাঁয়ে। কারও কারও ঘরের চালে খড় নেই—কেউ বা গোলা বাঁধতে বাঁধতে অসমাপ্ত রেখে দিয়েছে। সবারই আশা ধান কাটা হ'লে সব তৈরী কোরবে। ছোট্ট ছেলে মার বুকে শুয়ে কেঁদে উঠল—জীর্ণবস্ত্র দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে মা বলে ওঠে—কাঁদিসনে বাবা, ধানকাটা হ'লে তোমার জামা প্যান্ট সব কিনে দেবো।

কাকপাথরের সবারই আশা ধান কাটা হলেই যার যা ইচ্ছা সব পূরণ হ'বে।

ষাট বছরের বৃদ্ধ ছিদাম মণ্ডল তার ঘরের দাওয়ায় বসে চেয়ে থাকে আগামী ফসলের দিকে আর বসে বসে হুঁকো টানে। একটু রোদ বেশী হলেই ভাবে ঐ বুঝি ধান পুড়ে গেলো, আবার একটু বেশী বৃষ্টি হলেই ভাবে ঐ বুঝি সব ডুবে গেলো। কত কি ভাবে আর হুঁকো টানে।

স্ত্রী সেবাদাসী এসে অভিযোগ করে—রাতদিন হুকো টানলেই হোল, আর কিছু দেখবার দরকার নেই। বলি ছেলেটার যে বয়েস বাড়তে লাগলো, তার একটা হিল্লে কোরতে হবে না। এইবার দেখে-শুনে একটা বিয়ে দাও—আহা ছেলেটা যেন রাতদিন মন-মরা হ'য়ে থাকে।

ছিদাম কোন উত্তর দেয় না।

সেবাদাসী বলতে থাকে—"সেই যে গত সনে আমার একরত্তি মেয়ে গৌরী শ্বশুর-বাড়ী গেছে; ওকে আর আনবারও দরকার নেই? আজ কত দিন যে তাকে দেখি নি—।"

একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে আবার বলে যায়—"কেষ্টর একখানাও কাপড় নেই। বাছা আমার জোড়াতালি দিয়েই কোন মতে হাট-ঘাট করে বেড়ায়—ওর দিকেও তো একটু চাইতে হয়, ও তো আর ফেলনা নয়।"

ছিদাম একটু হেসে বলল—আর তোমার কথা বললে না, একটু তামাক নেই যে দাঁতে দিয়ে বাঁচি।

হো হো করে এক গাল হেসে আবার বলল—দাঁড়াও ভগবান যখন মুখ তুলে চেয়েছেন তখন সব কিছুই হ'বে। শুধু বড় ছেলে কেন, কেষ্টরও বিয়ে দিয়ে দেবো।

—"আহা কি যে কথা বলে, আট বছরের ছেলের আবার বিয়ে।"

সেবাদাসী চলে যায়।

ঠুন! ঠুন!! ঠুন!!!

অভিলাষ আগুনের সামনে বসে হাতুড়ি দিয়ে তৈরী করে কাস্তে, দা, হেঁসো। একদণ্ডও তার সময় নেই। সব সময়ের জন্যই লোক দাঁড়িয়ে আছে। এ বলে, "আমায় আগে দাও অভিলেষ খুড়ো" ও বলে, "হাটের বেলা হয়ে গেলো যে অভিলেষ দা।"

সন্ধ্যার কিছু আগে ছিদাম আসে চার-পাঁচখানা কাস্তে ধার করাতে, চোখে মুখে আনন্দের ছায়া। বাঁশের মাচাটার ওপর বসে সে আপন মনেই বলে ওঠল—বুঝলে অভিলেষ, তোমার খুড়ীর যেন আমাকে বিশ্বাসই হয় না। ছেলের বিয়ে যেন আমি ইচ্ছে করেই দিচ্ছি নে, গৌরীকে যেন আনবার মন আমার নেই। বুঝলে এবার আমার গৌরীমার জন্যে ছোট দেখে একটা বঁটি তৈরী করে দিতে হ'বে। তা কাস্তেগুলো—"

অভিলাষ পোড়ানো কাস্তের ওপর সজোরে একটা

হাতুড়ির ঘা মেরে বলল—খুড়ো, আজ কি আর হবে! কাল সকালেই নিয়ে যেও।

—বেশ! তাই-ই দিও—দেখো ধার যেন ভাল হয়, দুটো পোচ দিতেই যেন ভোঁতা না হয়ে যায়।

ছিদাম হাসতে হাসতে চলে যায়।

বাড়ী আসতেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরল। কেউ বলল—বাবা, ধান কাটা হলেই জামা চাই, ঠিক ও পাড়ার পেহ্লাদের মত লাল জামা। কেউ বলল—পুতুলের গলায় কিছু নেই, কামরাঙার হাট থেকে পুতি কিনে দিতে হবে।

ছিদাম তাদের থামিয়ে বলল—হবে রে হবে, সব হবে —আর কটা দিন সবুর কর।

ছিদাম তামাক টানতে বসে যায়।

ধান কাটা সুরু হয়েছে—

ছিদাম মাঠে বসে তামাক টানে আর ছেলেদের লক্ষ্য করে বলে—কেষ্ট বাবা ধান যে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে—ভাল করে কুড়িয়ে গাড়ীতে তুলে দে।

পথ-ঘাট ভরে যায় কচি ধানের গন্ধে। উলংগ ছেলে-মেয়েরা গাড়ীর পেছন পেছন ছুটতে থাকে।

ছিদাম মনে মনে হাসে আর ভাবে—গৌরীর মা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে ধান কাটা হলেই সব হবে। না! বড় ছেলের বিয়েটা আসছে বোশেখে না দিলে আর চলছে না। আসছে হাটে কিছু ধান বেচে গৌরীর জন্যে একখানা ভাল শাড়ী আনতে হবে।

"খুড়ো"

ছিদামের চিন্তাধারা ভেসে যায়। বলে ওঠে—আরে অভিলেষ যে, এসো এসো, একছিলিম খেয়ে স্বাখে দিখিন, খাঁটি বালাখানা, বুঝলে একেবারে খাঁটি।

তামাক টানতে টানতে অভিলাষ বলল—খুড়ো, কাস্তের দরুণ আজ কিছু দাও না, কামরাঙার হাটে ভাল ভাল হুকো আসে, একটা কিনে নিয়ে আসবো।

—নিও হে নিও, ধান কাটা শেষ হোক সব হবে।

এমন সময় কেষ্ট গাড়ী হাঁকিয়ে এসে পড়লো।

ছিদাম আবার মাঠে নেমে পড়ে কাস্তে হাতে নিয়ে—গুনগুন করে মেঠো সুরে গান ধরে।

কেষ্ট ধান কাটতে কাটতে হঠাৎ বলে ওঠে—দাদা, মাধবীদি তোমায় আজ যেতে বলেছে—কি দরকার আছে।

নিতাই কোন উত্তর দেয় না।

ছিদাম বলে ওঠে—নিতাই, তোর মা আমাকে বিশ্বাস করতেই চায় না। এ মাসটা আগে যাক তার পর দেখবো—মালক্ষকেও আমি শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দেবো। তখন টের পাবে মজাটা কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিলেও আনবার নামটি পর্য্যন্ত করবো না।

নিতাই বাবার দিকে কৌতূহল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—তার বাবা বলে কি? মালক্ষ তো সবে এই পাঁচ বছরের মাত্র। এখনি এই বয়েস বিয়ে কিসের।

* * *

একদিন কাকপাথর গ্রামের একটা কোণ হাসি-গানে মেতে উঠল। কোন এক মন-ভুলানো গোধুলিতে নিতাই এর সাথে মাধবীর বিয়ে হয়ে গেলো। আকাশে চাঁদ ছিল সেদিনও—জ্যোৎস্নার হাটও বসেছিল। পথে পালকীর ভিতর মাধবী চুপ করে বসে ছিল। আজ মাধবীকে অন্য রকম দেখাচ্ছিল—কপালে চন্দনের টিপ—সীমন্তে রক্তরাঙা সিন্দুর।

নিতাই বললে—এদিকে মুখ ফিরে বোস না।

—ধোৎ, পাশ দিয়ে কত লোক যাচ্ছে যে—

—তাতে কি!

মাধবী মুখ ঘুরিয়ে বলে—কি বলো।

—কথা বলো।

—কি কথা—

—আহা-হা তুমি যেন জান না, এতটা পথ কি ক'রে যাওয়া যায়।

—আচ্ছা তুমি আমাকে ভালবেসে সুখী হয়েছো তো?

—শোন, বলছি কানে কানে—

নিতাই মাধবীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেলো—শুনবে—

—যাও তুমি, ভারী—

দু-পাশে বন-ঝোপ—কোথাও বনফুলের তীব্র গন্ধ ভেসে আসছিল। একটা পাখী ডেকেই চলেছে—বৌ কথা কও, বৌ কথা কও।

বাইরে পালকীর বেহারাদের অবিরাম চীৎকার—হেঁইও, ভুরও, হেঁইও! ওদের পালকী এসে বাড়ীর মধ্যে ঢুকল।

মাধবী মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে বসে রইল।

পালকী নামাতেই পাড়ার ছেলেমেয়েরা চার পাশ ঘিরে দাঁড়ালো। কেউ বলে—নিতাই দুগ্‌গো পিরতিমেই এনেচে দেখ্‌চি।

কেউ বললে—আহা দুটিতে সুখে থাকুক!

কেউ ঠাট্টা করে বললে—শীগ্‌গির শীগ্‌গির একটা সোনার চাঁদ ছেলে আসুক।

নিতাই ও মাধবী ছিদামকে একসঙ্গে প্রণাম করে দাঁড়াল, ছিদাম চীৎকার ক'রে ডাকলো—কই গো গৌরীর মা, আমি বলি নি ধান কাটা হলেই সব হ'বে। কেমন এবার আমাকে বিশ্বাস হ'ল তো!

* * *

একটা কুকুরের একটানা চীৎকারে ছিদামের ঘুম ভেঙে যায়। অনাহারে অনিদ্রায় তার চোখ বসে গেছে—

একি, স্বপ্ন দেখছিল নাকি সে?

এ বছর অনাবৃষ্টিতে তার সমস্ত ফসলই তো নষ্ট হয়ে গেছে। একটা ফসলও তো সে পায় নি। গৌরী তো বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে আজ চার মাস। আর নিতাই তো মাধবী মরে যাওয়ার পর থেকেই পাগল হ'য়ে গেছে। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল উঠানের দিকে—

নিতাই উঠানের মাঝখানে একটা লাউগাছ পুঁতছে আর বলছে—এ গাছটা বড় হ'লে, একটা ভাল করে মাচা তৈরী কোরতে হবে। মাধবী যে মাচার তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে ভালবাসে।

পরে হঠাৎ পকেট থেকে একখানা ছেঁড়া বর্ণপরিচয় বের করে বলতে লাগল—বা রে মাধবী, পড়, বলো মাধবী, এই তো অ আ ই ঈ। পড়ো। বা-রে আমি যে ভিটে-কুমারীর হাট থেকে এটা কিনে এনেছি।

ছিদামকে দেখতে পেয়ে তার সামনে গিয়ে বললে—বাবা কেষ্ট খবর দিল, মাধবী আমায় ডেকেছে, হ্যা বাবা মাধবী আমায় ডেকেছে আমি যাচ্ছি—হ্যাঁ এখুনই যাচ্ছি।

নিতাই পথ বেয়ে ছুট দিল।

ও পাশের জীর্ণ নোংরা বিছানার ওপর শুয়ে কেষ্ট তার রোগক্লিষ্ট মুখখানা তুলে ছিদামের দিকে চেয়ে বলল—বাবা বড় ক্ষিধে।

ছিদামের চোখ দিয়ে অজস্রধারায় জল পড়তে থাকে। তার মনে হয় সে চীৎকার করে বলে—ওরে কাঁদিস নে ধানকাটা হলেই সব হবে, ওরে কাঁদিস নে।

বাংলার ভূমি-ব্যবস্থা

(শেষ অংশ)

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল

১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর সর্ব্বপ্রথম উহার উল্লেখযোগ্য সংশোধন হয় ১৯২৮ সালে। এই সংশোধনের পূর্ব্বে বাংলা দেশে কৃষকদের মধ্যে জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। ১৯২১ সনের পূর্ব্বে এই আন্দোলন একেবারেই যে ছিল না তাহা নয়, কিন্তু উহা কেবল স্থানীয় আন্দোলনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ইহার কারণও দুর্ব্বোধ্য নয়। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব্বে বাংলার কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে কোন চেতনা জাগ্রত হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। বঙ্গ-ভঙ্গের পর যে স্বদেশী আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হয় তাহা বাংলার কৃষকদিগকে স্পর্শ করে নাই। বাংলার কৃষকগণ অধিকাংশই মুসলমান। কায়েমী স্বার্থবাদী উচ্চশ্রেণীর মুসলমানগণ এই আন্দোলনকে

নিজেদের কায়েমী স্বার্থের বিরোধী মনে করিয়া বাংলার মুসলিম জনসাধারণকে সযত্নে এই আন্দোলন হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং বাংলার কৃষকদিগের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হওয়ার একটা সুযোগ ব্যর্থ হইয়া গেল।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব বাংলার সকল স্তরের লোককেই প্রভাবিত করিয়াছিল। এই আন্দোলন বাংলার কৃষকদিগকেও সচেতন করিয়া তুলিল। আন্দোলন থামিয়া গেলে বাংলার গ্রামে গ্রামে গঠিত কংগ্রেস কমিটিগুলি এবং চরকা ও তাঁতের প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব যখন রহিল না, তখন জনকতক কংগ্রেসকর্মীই কৃষকদিগের মধ্যে গঠনমূলক কাজ করিতেছিলেন। এই সময় হইতে সমাজতন্ত্রবাদ কিছু কিছু দেশে প্রচারিত হইতেছিল। যে সকল কর্মী কৃষকদের মধ্যে কাজ করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমাজতন্ত্রবাদ দ্বারা অল্পাধিক প্রভাবিত ছিলেন। তাঁহাদেরই চেষ্টায় প্রজাস্বত্ব আইন কৃষকদের অনুকূলে সংশোধন হওয়ার জন্য একটা আন্দোলন গড়িয়া উঠে। বাংলার সব জেলাতেই যে এইরূপ আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা নয়, তবে অনেক জেলাতেই হইয়াছিল। এই বিষয়ে অগ্রণী ছিল পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলা।

১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন যে এই আন্দোলনেরই ফল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু এই সংশোধন দ্বারা কৃষকদের মূল্যবান লাভ কিছুই হয় নাই। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা সারবান ও ফলবান বৃক্ষ ছেদন, ইমারৎ নির্ম্মাণ ও পুকুর খননের অধিকার পাইল। এই অধিকার তাহাদের পক্ষে একটা রাজনৈতিক লাভ বটে, কিন্তু দরিদ্র কৃষকের কাছে উহা মূল্যহীন। খাজানা বৃদ্ধির ধারাটি রহিয়াই গেল। কৃষক দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোত বিক্রয়ের অধিকার পাইল বটে, কিন্তু জমিদারদের সেলামী পাওয়ার অধিকার আইনসঙ্গত করা হইল এবং তাহারা পাইলেন অগ্রক্রয়ের অধিকার। প্রজা জমি বিক্রয় করিলে জমিদার মূল্যের টাকা এবং উহার উপর শতকরা ১০ টাকা বেশী দিলেই ঐ বিক্রীত জোত নিজে ক্রয় করিতে পারিতেন। জমিদারের এই অধিকার প্রজার স্বার্থকে আরও বেশী ক্ষুন্ন করিল। জোত ক্রয়ের কাওলা রেজেষ্ট্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নজরানা দাখিল করিতে হয় বলিয়া ক্রেতা পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর ছিল জমিদারের অগ্রক্রয়ের অধিকার প্রয়োগের ভয়। ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের পর প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের আমলে নূতন সংশোধনহওয়া পর্য্যন্ত মোট জোত বিক্রয়ের শতকরা কয়টি ক্ষেত্রে জমিদারগণ অগ্রক্রয়ের অধিকার প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার কোন হিসাব প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি না। তবে অগ্রক্রয়ের অধিকার প্রয়োগের ভয় দেখাইয়া জমিদার যে কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী নজর সেলামী আদায় করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও কিছু কিছু আমাদের আছে। এই সংশোধন আইন যখন পুরাতন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পাশ হয় তখন ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী দল কৃষকের অনুকূলে কিছুই করেন তো নাই-ই, বরং কৃষকদের প্রতিকূল ব্যবস্থাই সমর্থন করিয়াছিলেন। বাংলার মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেস যে এ পর্য্যন্ত তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই ইহা তাহার একটি প্রধানতম কারণ।

১৯২৮ সনের প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের পরে বাংলার কৃষকরা দেখিতে পাইল, এই সংশোধনের ফলে রাজনৈতিক দিক হইতে তাহাদের কিঞ্চিৎ অধিকার লাভ হইলেও, অর্থনৈতিক দিক হইতে তাহাদের কিছুই লাভ হয় নাই। এই সময় হইতেই বাংলার কৃষক-আন্দোলন একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। বাংলার কৃষকপ্রজাদল তারই পরিণাম। কৃষকপ্রজাদল গঠিত হওয়ার পর কৃষকদের অধিকার অর্জ্জনের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে আন্দোলন পরিচালিত হইতে থাকে। কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের কোন প্রভাব নাই। এই আন্দোলনের যাঁহারা নেতা সমাজতন্ত্রবাদ তাঁহারা পছন্দ করেন না। তবে কর্মীদের মধ্যে অনেকে সমাজ-তন্ত্রবাদ দ্বারা প্রভাবিত বটেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই কৃষক-প্রজা দল যে প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল, ১৯৩৭ সালের নির্ব্বাচনে তাহার ফল আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। লীগপন্থীরা কায়েমী স্বার্থবাদী

হইলেও নির্ব্বাচন প্রতিশ্রুতিতে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি না দিয়া পারেন নাই। নির্ব্বাচনের পরে দেখা গেল, পৃথক পৃথক দল হিসাবে কংগ্রেসের স্থান সর্ব্বপ্রথম, তার পরই কৃষক-প্রজা দলের স্থান। অনেকের মনেই তখন আশা হইয়াছিল, কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা দলের কোয়ালিশনে মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। অন্ততঃ কংগ্রেস সমর্থনে কৃষকপ্রজাদলই মন্ত্রিসভা গঠন করিবে। কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। পরে তাঁহারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণও করিলেন, কিন্তু বাংলার বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা করিতে তাহারা রাজী হন নাই। ইহার কুফল বাংলার কৃষককেই বেশী করিয়া ভোগ করিতে হইতেছে।

নির্ব্বাচনের পর যে ভাবে বাংলার কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল তাহা আমরা জানি, তাহার ফল এখনও আমরা ভোগ করিতেছি। এই মন্ত্রিসভা কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন করিলেন বটে, কিন্তু কৃষকদের কোন অধিকার লাভ হইল না। ১৯২৮ সালের সংশোধনে জমিদারকে সেলামী পাওয়ার ও অগ্রক্রয়ের অধিকার দিয়া কৃষকদের উপর যে অন্যায় করা হইয়াছিল এই সংশোধনে তাহারই শুধু প্রতিকার করা হইয়াছে—বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন হইতে সেলামী ও অগ্রক্রয়ের ধারা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কৃষকের খাজনা হ্রাসের বিধান করা তো দূরের কথা, খাজনা বৃদ্ধির ধারাটি পর্য্যন্ত তুলিয়া দেওয়া হয় নাই, কেবল ঐ ধারার কার্য্যকারিতা পনর বৎসরের জন্য বন্ধ রাখা হইয়াছে। ইহাতে কৃষকদের বিশেষ কিছুই লাভ হয় নাই। একবার খাজনা বৃদ্ধি হইলে, জমিবৃদ্ধির দরুণ ব্যতীত পনর বৎসরের মধ্যে জমিদার প্রজার খাজনা আর বৃদ্ধি করিতে অধিকারী নহেন, প্রজাস্বত্ব আইনে এইরূপ বিধান রহিয়াছে। জমিদার যে ইতিপূর্ব্বে খাজনা বৃদ্ধির কোন সুযোগই ছাড়েন নাই, বাংলা দেশে প্রতিবৎসর কি পরিমাণ খাজনা বৃদ্ধির জন্য মোকদ্দমা রুজু করা হইয়াছে, তাহার হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। ১৯৩৭ সনের প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের পর হইতে পনর বৎসরের মধ্যে যে-সকল প্রজার খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারিত তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী হইবে না। প্রকৃত পক্ষে অতি কমসংখ্যক প্রজাই এই ধারার সুবিধা পাইয়াছে এবং তাহাও সাময়িক।

বাংলার ভূমি-ব্যবস্থার ইতিহাস মোটামুটি ভাবে আলোচনা করা আমাদের শেষ হইল। বাংলার ভূমিব্যবস্থায় তিন শ্রেণীর লোকের সন্ধান আমরা পাই: (১) খাজনাজীবী, (২) কৃষিজীবী এবং (৩) ক্ষেত-মজুর। জমিদার এবং তালুকদারগণ খাজনাজীবী। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা, কোর্ফাপ্রজা প্রভৃতিরা কৃষিজীবী এই কৃষিজীবীদের মধ্যে অনেকে বর্গাদার। ইহারা নিজেদের জমি চাষ করার সঙ্গে সঙ্গে জমিদার ও তালুক-দারদের খাসের জমিও বর্গা চাষ করে। যে-সকল কৃষক ক্রমে ভূমি হীন হইয়া অপর কৃষকের ক্ষেতে চাষাবাদের কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে তাহারাই ক্ষেত-মজুর। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নিজের জমিও সামান্য কিছু আছে, কিন্তু অধিকাংই একেবারে ভূমিহীন। ইহাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। বাংলার জনসংখ্যার বৃদ্ধিই এই বৃদ্ধির কারণ নয়,—প্রতিনিয়তই কৃষক ভূমিহীন হইয়া ক্ষেতমজুরের শ্রেণী পরিপুষ্ট করিতেছে। বাংলার খাজনাজীবী, কৃষিজীবী এবং ক্ষেতমজুরের সংখ্যা কি ভাবে বাড়িতেছে তাহা দেখিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

খাজনাজীবী

১৯০১—৯৭৮০১৬
১৯১১—১২০৫২৬৬
১৯২১—১৩১৯৩০২
১৯৩১—১৫০০০০০

কৃষিজীবী

১৯০১—২৭৪৬৬২৯৩
১৯১১—২৯৭৪৮৬৬৬
১৯২১—৩০৫৪৩৫৭৭
১৯৩১—৩৩৪০০০০০

ক্ষেতমজুর

১৯০১—১২০৪৯১৫
১৯১১—৩৪৩২০৯৯
১৯২১—৪৩৮৯১৪৪

বাংলা দেশের মোট জমির শতকরা ৮৪·৯ ভাগ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন। অস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন শতকরা ৭'২ ভাগ। সরকারী খাসমহল শতকরা ৭'৯ ভাগ। বাংলা দেশে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ১৯৩১ সনের আদমসুমারী অনুসারে ২ কোটি ৮৯ লক্ষ একর। তন্মধ্যে জমিদার ও তালুকদারদের খাসের জমির পরিমাণ ৪০ লক্ষ একর। এই জমির অধিকাংশ বর্গা দিয়া এবং কতক চাকর খাটাইয়া আবাদ করা হয়। বাংলা দেশে প্রতি কৃষক পরিবারের জমির পরিমাণ ৩'২ একর। কিন্তু ইহা গড়পরতা হিসাব, প্রত্যেক কৃষক পরিবারের জমির পরিমাণ নহে। অধিকাংশ কৃষক পরিবারের জমির পরিমাণ উহা অপেক্ষা অনেক কম। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্গত জমিতে কৃষকের দেয় খাজনা একর প্রতি গড়ে ৩৲ টাকা ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই একর প্রতি নিরিখ ৭৲ টাকা হইতে ১০।১২৲ টাকা পর্য্যন্তও আছে। ইহার উপর খাজনা বৃদ্ধি হইয়াছে টাকা প্রতি ৴৹ আনা হইতে ।৴৹ আনা পর্য্যন্ত। সুতরাং গড়পরতা হিসাবও যে একর প্রতি ৩৲ টাকার বেশী তাহা নিম্নলিখিত হিসাব হইতে আমরা বুঝিতে পারি।

বাংলা দেশে ১৯৩৬ সালে খাজানা বাবদ মোট ১৬ কোটি ৯৯ লক্ষ ৬৯ হাজার ২২৩ টাকা। বাংলা দেশে আবাদী জমির পরিমাণ আমরা জানি ২ কোটি ৮৯ লক্ষ একর, তন্মধ্যে মালিকের খাসের জমি আছে ৪০ লক্ষ একর। এই চল্লিশ লক্ষ একর বাদ দিলে পাওয়া যায় ২ কোটি ৪৯ লক্ষ একর। কৃষকদের বাড়ীঘর ইত্যাদি বাবদও কতক জমি আছে। সুতরাং সর্ব্বসাকুল্যে বাংলার কৃষকদের মোট জমির পরিমাণ ৩ কোটি ৫১ লক্ষ ৭ হাজার ৪৯ একর। তাহা হইলে একর প্রতি খাজানার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৸৴৹ আনা। ইহার উপর কৃষককে সেস ও ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দিতে হয়। এইবার মোটের উপর বাংলার কৃষকের মোটামুটি আয়-ব্যয়ের একটী হিসাব করিতে চেষ্টা করিব।

১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে বাংলার আবাদী জমিতে মোট উৎপন্ন ফসলের মূল্য ২০০ কোটি টাকা। এই সংখ্যাটিকে ভিত্তি করিয়াই আমরা হিসাব করিব যদিও ইহার হ্রাস বর্ত্তমানে হইয়াছে। এই দুইশত কোটি টাকা হইতে জমিদার তালুকদারদের খাসের জমির ফসলের মূল্য বাদ দিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা পাইব ১৭০ কোটি টাকা। ইহাই হইল বাংলার সমগ্র কৃষিজীবীর মোট প্রাপ্য। ইহা হইতে জমি আবাদের ব্যয়, জমিদারের খাজানা, সেস, ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স এবং মহাজনের সুদ বাদ দিতে হইবে। সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট অনুসারে ফসলের মোট মূল্যের অন্ততঃ অর্দ্ধেক চাষাবাদের ব্যয় বাবদ লাগিয়া থাকে। তাহা হইলে ফসল উৎপাদনের ব্যয় বাদে বাংলার কৃষকদের হাতে রহিল মাত্র ৮৫ কোটি টাকা। ইহা হইতে মালিকের খাজানা বাদ যাইবে প্রায় ১৭ কোটি টাকা। রহিল ৬৮ কোটি টাকা। এইবার খাজানা সেস, চৌকিদারী ট্যাক্স ও মহাজনের সুদের হিসাব করিতে হইবে।

জমিদারদের প্রাপ্য খাজানা বাবদ বৎসরে প্রায় ১৭ কোটি টাকা দিতে হয়। এই ১৭ কোটি টাকা বাদ দিলে রহিল ৬৮ কোটি টাকা; ১৯৩৬-৩৭ সনে ৮৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৮৬৯ টাকা সেস আদায় হইয়াছে; ১৯৩৫ ৩৬ সনে চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় হইয়াছে ৭২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮৫৫ টাকা। সেস ও চৌকিদারী ট্যাক্সের পরিমাণ দেড় কোটি টাকারও বেশী। উহা বাদ দিলে থাকে ৬৬৷৷৹ কোটি টাকা। বাংলার কৃষকরা তাহাদের ঋণের সুদ বৎসরে মোট কত টাকা দেয় তাহার হিসা[illegible] কোথায়ও পাইবার উপায় নাই। প্রাদেশিক ব[illegible]ং কমিটির হিসাব অনুযায়ী (১৯২৯ সনে) বাংলার কৃষকদিগের ঋণের মোট পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ প্রতি কৃষক পরিবারের ঋণের পরিমাণ ১৬০৲ টাকা। এই ঋণ যে কত দ্রুত বাড়িতেছে তাহা ১৯৩১ সনের আদম সুমারীর রিপোর্ট হইতে বুঝিতে পারা যায়। উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, এক বৎসরে এই ঋণের পরিমাণ পরিবার পিছু ৬৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি দুই বৎসরে বাংলার কৃষকের ঋণ দুই কোটি টাকা বাড়িতেছে। সুতরাং গত দশ বৎসরে অন্ততঃ আরও ৫ কোটি টাকা ঋণ বাড়িয়াছে। সমবায় সমিতিগুলিই শতকরা বার্ষিক ১২৷৷৹ টাকা হইতে ১৮৷৷৹ টাকা পর্য্যন্ত

সুদ আদায় করিয়া থাকে। বাংলার মহাজনরা শতকরা মাসিক ৩৵০ টাকা হইতে ১২॥০ টাকা, এমন কি তাহারও বেশী সুদ আদায় করিয়া থাকেন। ১৯১৮ সালের সুদ আইন (Usurious Loans Act) পাশ হওয়ার পর হইতে আদালত শতকরা মাসিক ৩৵০ টাকা হারের বেশী সুদ ডিক্রী দেন না। চাষী-খাতক আইন ও বঙ্গীয় মহাজনী আইনেও উহার বেশী সুদ ডিক্রী দিবার উপায় নাই। শতকরা মাসিক সুদের হার ৩৵০ টাকা হইলে একশত টাকার সুদ বৎসরে দাঁড়ায় ৩৭॥০ টাকা, সুতরাং একশত কোটি টাকার সুদ বৎসরে হয় ৩৭॥০ কোটি টাকা। বৎসরের সুদ বৎসরে পরিশোধ করা কৃষকের পক্ষে সম্ভব হয় না এবং শোধ করিতে গেলে অন্ততঃ ৩৭॥ কোটি টাকা প্রয়োজন, কিন্তু প্রতি বৎসরই কৃষকরা সুদ এবং আসলে কতক ঋণ শোধ করে। তাহা না হইলে বাংলার মহাজনদিগকে বায়ু ভক্ষণ করিয়াই দিন কাটাইতে হইত। অন্ততঃ পক্ষে বৎসরে মোট সুদের অর্দ্ধেক আদায় হয় তাহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। তাহা হইলে বৎসরে ১৮৳ কোটি টাকা অন্ততঃ সুদ বাবদ দিতে হয়। তাহা হইলে ৬৬·৩৯ কোটি টাকা হইতে ১৮·৫০ কোটি টাকা সুদ বাবদ বাদ গেলে বাংলার কৃষকের হাতে রহিল মাত্র ৪৭·৮৯ কোটি টাকা। সুতরাং বাংলার প্রতি কৃষক-পরিবারের বার্ষিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বৎসরে ৬৮৲ টাকার বেশী থাকে না। যদি প্রতি কৃষক-পরিবারের বার্ষিক ব্যয় ১২৫৲ টাকাও ধরা যায়, তাহা হইলে আরও ৫৭৲ টাকা বৎসরে তাহার প্রয়োজন। ইহাই বাংলার কৃষকের অবস্থা।

আমরা বাংলার কৃষকের দুরবস্থা প্রসঙ্গে ভূমি-ব্যবস্থা হইতে অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছি। এবার মূল প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বাংলার ভূমি ব্যবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে বাংলার অধিকাংশ কৃষকই ছিল 'খোদখস্ত' রায়ত। মহাদেব গোবিন্দ রানাডে তাঁহার Essays on Indian Economics গ্রন্থে (পৃঃ ২৬৯-৭২.) খোদখস্ত রায়ত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"The old Khoodkhast ryot, no doubt, did possess customary rights and interest in land long before the permanent settlement was made and he was not in principle subject to arbitrary enhancement and eviction. His position was seriously damaged by the settlement which, in order to secure the prompt payment of revenue under the sunset law, armed Zamindars with extraordinary powers and these powers made serious encroachments on ryots independence. * * * * * the old Khoodkhast ryots were by force of circumstances transformed to a large extent into tenants-at-will.

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহু পূর্ব্বেই পুরাতন খোদখস্ত রায়ত প্রথা অনুযায়ী ভূমিতে কতকগুলি অধিকার ও স্বার্থ অর্জ্জন করিয়াছিল সন্দেহ নাই। স্বেচ্ছানুযায়ী তাহার খাজানা বৃদ্ধি ও তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইত না সূর্য্যাস্ত আইনের দ্বারা সহজে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য খোদখস্ত রায়তের অধিকারকে গুরুতররূপে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে এবং জমিদারদিগকে অসাধারণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষমতা রায়তের স্বাধীনতার গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে। * * * পুরাতন খোদখস্ত রায়তরা অবস্থার চাপে প্রায় জমিদারের ইচ্ছাক্রমে উচ্ছেদযোগ্য প্রজায় পরিণত হইয়াছে।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিপ্লব আনিয়াছে বটে, কিন্তু এই বিপ্লব একশ্রেণীর সম্পত্তি রক্ষা করিতে যাইয়া আর একশ্রেণীর সম্পত্তির ক্ষতি করিয়াছে—জমিদারের অধিকার রক্ষা করিতে প্রজার অধিকার ধ্বংস করিয়াছে। ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত এই নূতন নয়। গ্রীসের ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি, গ্রীসের অধিকাংশ ভূমিই এক সময়ে মহাজনের নিকট দেনায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। সোলোন খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৯৪ অব্দে খাতকদিগকে রক্ষা করিবার যে বিপ্লবাত্মক আইন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তাহাতে মহাজনদের অধিকার ও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছিল—সমস্ত রেহনী দেনা দেওয়া হইয়াছিল বাতিল করিয়া। ফরাসী বিপ্লব বুর্জ্জোয়াদের সম্পত্তি রক্ষা করিতে যাইয়া ফিউডাল লর্ডদের সম্পত্তি ধ্বংস করিয়াছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত খাজানা আদায়কারী ইজারাদারদিগকে প্রথমে ভূ-স্বামী করিল। তাঁহাদের এই ভূস্বামিত্ব রক্ষার জন্য প্রজার স্বত্বকে বলি দেওয়া হইল। প্রজাস্বত্ব আইনে প্রজা তাহার নষ্ট অধিকার ফিরিয়া পায় নাই, বরং জমিদারকে খাজানা

ভাগ্যকে ছেড়ে দিয়ে ও নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। তা ছাড়া কাজে কথায় একটু একটু করে সুরমার চেতনা বর্ষীয়সীর-ভাবে এসে ধাক্কা খাচ্ছে কেমন যেন। রেখা নিজে বি-এ পাশ করা মেয়ে, কিন্তু কোনো দিন তার নিজস্ব মননপদ্ধতি এমন পথ আবিষ্কার করেনি। সে সুরমাকে একদিন সরাসরি জিজ্ঞাসা করে বসলো—সুরমা, দিন দিন তোর হচ্ছে কি বলতো? কেমন যেন উদাস হয়ে যাচ্ছিস? কাঁচা বয়স তোদের, নাচবি, গান করবি, বেড়াবি—মনের আনন্দে কাটাবি রাত-দিন, তা নয় শুধু ভাবনা নিয়েই আছিস সদাসর্ব্বদা; সত্যি করে বলতো আমার কাছে—কি ভাবিস্ অত?

সুরমা এক মুহূর্ত্ত চুপ করে রইলো। তারুণ্যের উন্মাদনা শেষ হয়ে গেছে। জীবনের প্রশান্ত স্থৈর্য্য যেন উঁকি দিচ্ছে সুরমার মানসলীলায়—এটা যেমন দৃষ্টিকটু, তেমনিধারা আকস্মিক। তাই সুরমা যে কোন ক্ষণিক অথচ লঘু হাওয়ায় আর আন্দোলিত হতে পারে না। কিন্তু সত্য হলেও স্বীকার্য্য নয়। সুরমা এক ঝলক হেসে নেয়। মা বলেই সব কথা বলতে পারবে না সে। আর মার কাছে কি ছাই বা বলবে? নিজের মনের সমস্ত অনুকরণগুলিকে বিচার বা বিশ্লেষণ করতে পারে না সে, চেষ্টা করেও পারে নি কোনো দিন এর একটা কারণ খাড়া করতে। মাঝে মাঝে মনে হয়, কোথায় যেন কাঁটা বিঁধছে খচ্ খচ্ করে—অথচ স্থান নির্দ্দেশ সঠিক হচ্ছে না বলেই প্রতীকার ঘটছে না তার। হয়তো একটা অসূয়াপীড়িত বৈক্লব্য এসে কিছু ক্লেদের সৃষ্টি করে যাচ্ছে অজ্ঞাতসারে,—যদি তাই হয়…সুরমা শিহরণে কাতর হয়ে ওঠে। ঈর্ষ্যা? নিজের গর্ভধারিণী মায়ের প্রতি ঈর্ষ্যা পোষণ করবার মত অপকৃষ্টি কোথা থেকে আসবে তার? আর কি লাভ অমন অসূয়ায়। সুরমা তাই হেসে ফেলে মার প্রশ্নে—তুমি মা আমাকে দেখছি ভাবতেও দেবে না আর সামনে পরীক্ষা এসে পড়েছে, সেই চিন্তাই মাথায় ঢুকেছে আমার, হাসি-খেলা স্থগিত রয়ে গেছে কিছুদিনের জন্যে।

রেখা বললে—রাতদিন ত দেখছি বই নিয়ে পড়িস্! পাশকোর্সের পড়া—

সুরমা চমকে ওঠে—পাশকোর্স কি বলছ মা? হিষ্ট্রীতে অনার্স রয়েছে না?

রেখা নিজেও একদা ইংরাজীতে অনার্স পড়বার শুরু চেষ্টা করে সাধারণভাবে বি-এ পাশ করেছে, সেই থেকে ধারণা হয়েছে মেয়েরা প্রথমে যত্ন নিয়ে অনার্স পড়লেও অবশেষে পাশকোর্সে কোনো রকমে গড়ায়।

নীচে থেকে প্রণববাবুর গলা শোনা গেল; এই মাত্র অফিস থেকে ফিরলেন: কই গো—কোথায় গেলে? বাড়ীতে কেউ নেই নাকি? ওরে ও সুরমা, তোর মা কোথায়?

রেখা স্বল্পচিৎকারের সঙ্গে জবাব দিলে—এই যে এখানে আছি, ওপরে।

সিঁড়িতে আবার প্রণববাবুর কণ্ঠধ্বনিত হল—সারা-দিনের অদর্শন!—

ওপরে উঠে সুরমার প্রতি চোখ পড়তেই তিনি অপ্রস্তুত হয়ে উঠলেন। সুরমাও অত্যন্ত দ্রুত আর সংক্ষেপে সেখান থেকে চলে গেল, রেডিয়োর কাছে।

রেখা ও প্রণববাবুর চার চোখের মিলন ঘটলো বোধ হয়। সারাদিনের অদর্শন!

মাঝে মাঝে মনে হয় সুরমার অন্তরে অশিথিল উৎসাহ এখনো প্রচুর আছে। কাঁচা বয়সের অনুভূতির প্রবলতা এখনো আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ; তাই যৌবন-দীপ্তির কোনো বাজে খরচ না থাকলেও বিশ্লেষণ বিবর্ত্তন জাগে সুরমার,—অনুভূতির সঙ্গে গড়ে ওঠে পর্য্যবেক্ষণের খুঁটিনাটি। চশমা চোখে যে ভদ্রলোকটি প্রায়ই কলেজ যাবার সময় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন,—তার আচরণটি অদ্ভুত মনে হয়। লোকটি বোধ হয় কোনো ঈপ্সিত মেয়েকে দেখবার জন্য অপেক্ষা করেন। কিন্তু সুরমার তাকে ভালো লাগে না। ওরকম ঢোল পাঞ্জাবী চাপিয়ে অতি সূক্ষ্ম রেখার সমষ্টি দশ ইঞ্চি চওড়া মুগার পাড় কাপড় পরে উর্দ্ধমুখ জলপায়ী পক্ষিবিশেষের মতো আচরণ বরদাস্ত করা যায় না। ট্রামের কনডাক্টারকে মনে পড়লো। আজকে যে ট্রামে চেপেছিল কলেজ যাবার সময়, সেই ট্রামের কনডাক্টারকে। ভদ্রতায়, সৌজন্যে নয় শুধু স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যে, কান্তিক সুষমায় সুরমার শ্রদ্ধা জাগল কনডাক্টারের উপরে। যে কোনো মুহূর্ত্তে

সুরমা ওকে স্বামী বলে স্বীকার করে নিতে পারে। অবশ্য সমাজের অনুমোদন এখানে থাকবে না। বিত্তাবত্তার পার্থক্যের কথা শুধু নয়, সামঞ্জস্যবোধের অর্থহীন প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দেবে সমাজের চোখে। এই বৈষম্য ঘোচাবার চেষ্টা নেই দেশে, অথচ সুরমা বেশ জানে তথাকথিত আধুনিকদের মধ্যে একটা প্রবল ধুয়া আছে সাম্যবাদের। কিন্তু সত্যকার সমতার মর্য্যাদা নেই তাদের চেতনায়। সমতার যে কোনো করুণ সংঘাত মনের তটরেখায় ধাক্কা দিক না কেন—স্মৃতির ভেল্‌কিতে এদের অদৃশ্যমানতা বড় হয়ে দেখা দেবে।

ক্লাশে একদিন তর্ক হলো সতীর সঙ্গে। সতী বলে—কম্যুনিজমের সত্যকার আবেদন তোর মধ্যে জাগে নি এখনো, তাই ওকথা তুই বলছিস!

কোনো কথাই বলি নি আমি—সুরমা তর্ককে প্রসার করবার প্রয়াসে সে সোজা হয়ে বসলে বেঞ্চে,—শুধু এইটুকু বলছি, সাম্যবাদের বোধ এসেছে মানুষের মধ্যে বৈষম্যের গোড়ার কথা থেকে। আর এ বৈষম্য এক দিনের সৃষ্টি নয়। শত সহস্র যুগ আগে এর উদ্ভব হয়েছে, যুগ যুগ ধরে লালন চলেছে এর। কিন্তু এখন সত্যকার বোধ আনতে হলে এই বিভেদকে দূর করতে হবে, জনগণের জীবনের সত্যকার মূল্য দিতে হবে সাম্যবাদের যথার্থ মাপকাঠিতে। কথার চটকে জনগণের অসহায়তাকে, তাদের বাধ্যতামূলক আত্ম অপচয়কে প্রশ্রয় দিলে চলবে না, বাঁচিয়ে রাখলে চলবে না। সে দিকটায় দৃষ্টি দিতে হবে প্রথমে। যেমন ধারা একজন চাকর—

সতী সুরমাকে থামিয়ে দিয়ে বললে—তুই থাম সুরমা, তোর চাকরের উদাহরণ শুনে শুনে কান পচে গেল। কথায় কথায় বাড়ীর চাকরের এত উদাহরণ কেন ছাড়িস বলতো?

মীনাক্ষী বসিয়ে বসিয়ে দু-মিনিট হাসবার পর বললে—সায়কলজি কি বলে? যে যার নাম যত বেশী বার করে—তাকে সে তত বেশী পোষণ করে চিন্তাকোষে। তাই অজ্ঞাতসারেই প্রিয়জনের নামটা বের হয়ে আসে ফস্ করে।

সাম্যবাদের বৈষম্যের কাঠগড়া থেকে সুরমাকে ব্যক্তিক উপকথনে নেমে আসতে হয়। সে মৃদু হেসে বললে—অগত্যা এই বিতর্ক সভায় সুরমা দেবী সম্বন্ধে তা হ'লে স্থিরীকৃত হ'ল যে জনৈক চাকরের সঙ্গে তার আশু-বিবাহের আয়োজন চলছে, কেমন?

কয়েকটি মেয়ে হেসে উঠলো লঘুচাপল্যে, মীনাক্ষী সরু গলায় প্রতিবাদ করলে—তা কেন, মানে ইয়ে—

রোজ বাড়ী ফেরার সময় একাই আসতে হয় সুরমাকে। অনার্স ক্লাস শেষে হয়—এ দিকে আসার পরিচিত কোনো মেয়েকে তখন আর পাওয়া যায় না। ট্রামে উঠে সুরমার মনটা কেমন যেন দুর্ব্বল হয়ে ওঠে, একেবারে অসহায়, অভাবনীয় ভাবে শ্লথ। বর্ত্তমান জীবনের সঞ্চিত অবচেতন অভিজ্ঞতাপুঞ্জ তার অনুভবশক্তিকে নাড়া দিয়ে অত্যন্ত লঘিষ্ঠ করে তোলে, তখন তার রিক্ততা ভেসে ওঠে স্পষ্ট এবং নিখুঁত ভাবে, তাই এমন জরাজর্জ্জর দুর্ব্বল বোধ হয় নিজেকে। অথচ কোনো সুস্থ সচেতন চিন্তাকে লালন করবার সময় কেবলই তার কোনো বিশেষ চরিত্রকে মনে পড়ে অপরিহার্য্য ভাবে। তাই যখনই সে পুরুষের দীপ্ত স্বাস্থ্যের কথা ভাবতে যায়, আশ্চর্য্য, তখনই তার মনে হয়েছে তাদের বাড়ীর চাকর বলরামকে। এক টাকার বাজার করতে দিলে অন্ততঃ চারআনা নিজের ট্যাঁকে গোঁজে যে। যখনই কোনো বঞ্চিত অনভিজ্ঞ জনের কথা স্বপ্নের বা স্মরণের পথে এসেছে—আশ্চর্য্য, বলরামকেই মনে পড়ে যায় সব চেয়ে আগে। সুরমা আরো গভীর ভাবে ডুবে গেল এই চিন্তাশীল অনুভবের নিপীড়নে। এর একমাত্র স্বচ্ছন্দ বিশ্লেষণ হতে পারে—চব্বিশ ঘণ্টা অবহেলিত বলরামকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে বলে—অনুকম্পার অজ্ঞাত এবং ভীরু প্রকাশের মতো। এ ছাড়া, সুরমার দৃঢ় মন আবার সতেজ হয়ে উঠলো, রুচির এবং সংস্কৃতির উপঢৌকনে যে মন প্রবুদ্ধ এবং সংবৃত, সে মন রূঢ় ভাষণেই জানালো—এ ছাড়া আর কিছু নয়। কিছু নয়।

বাড়ী পৌছতেই সন্ধ্যা হয়ে এল। কোলকাতায়ও সন্ধ্যার একটা স্বচ্ছ সুষমা আছে। এখানে আমাদের চোখ নষ্ট হয়ে গেছে—মন গেছে বেঁকে, তাই সবটুকু

সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করতে পারি না। বড় বড় পিচের রাস্তার ধূসর ধূলোর ওপর আস্তে আস্তে নামছে সন্ধ্যা, নত পায়ে, ভীরু এবং লজ্জানম্র নূতন কোন বধূর কুণ্ঠা নিয়ে। চঞ্চল কোলাহলের মধ্যে এ সময়টা কেমন যেন স্তিমিত হয়ে ওঠে, কখনও কখনও এক-আধ ঝাঁক বালুহাঁস উড়ে যায় মাথা ডিঙিয়ে দূরের মস্ত বড় বাড়ীটার ছাদের আড়ালেরো ওপারে। এখানের আকাশেও স্বর্ণস্পর্শের আয়োজন আছে। এর মধ্যেও সারি দিয়ে কর্ম্মক্লান্ত কেরাণীকুল চলেছে হাতে খাবারের ঠোঙা নিয়ে, সাবুর মোড়া কিংবা সস্তা একখানা ডুরে শাড়ী কিনে। সুরমার বেশ লাগলো। সন্ধ্যা এখানে ধূসর, কিন্তু স্তিমিত এবং স্বর্ণস্পৃষ্ট।

বাড়ী ঢুকতে বলরামেরই সঙ্গে প্রথম দেখা। সে বললে—দিদিমণি, মা বাবা বায়স্কোপে গেছেন, আপনার খাবার ঢাকা আছে আপনার ঘরে, চা আমাকে ক'রে দিতে বলে গেছেন মা। আপনি হাত মুখ ধুয়ে আমাকে ডাকবেন একবার।

সুরমার চোখের ওপর থেকে বলরাম চোখ নামিয়ে নিয়ে অন্যত্র সরে গেল। সুরমা বিষণ্ণ হ'য়ে উঠলো অকারণে। এ সপ্তাহের সব কটা দিনই মা বায়স্কোপ দেখে কাটিয়ে দিলে। সুরমার আর ভালো লাগে না। বি-এ পরীক্ষাটা শেষ হ'লেই বাঁচা চায়। লেখপড়া নিয়ে থাকার বিড়ম্বনা থেকে নিষ্কৃতি চায় সুরমা। যখন-তখন কারণে-অকারণে তার চিত্তবিঘোভনা ঘটুক—এইটাই ত কাম্য। কিন্তু অবসর উপভোগের আনন্দেও খামকা মন খারাপের হাওয়া এসে এমনি ধারা মলিন করে তুলবে কেন সুরমার মন?

টেবিলে খাবার ঢাকা রয়েছে। হাত মুখ ধুয়ে খাবার খেতে বসবার সময় মনে হ'ল বলরামকে চা তৈরী করতে বলে—কিন্তু থাক, বেচারী সারাটা দিনই ত খেটে মরছে। তবু এইটুকু পরিশ্রম থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া যাক না কেন তাকে!

দোতলার ভেতরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল সুরমা। নীচে কলতলায় বসে বলরাম নিজের জামা-কাপড় সাবান দিয়ে কাচছে। দুটো হাতে কাপড় মাথার ওপরে তুলছে আর সজোরে সিমেন্টের ওপর আছাড় মারছে। কাপড় কাচবার বিজ্ঞান ততটা খুপ্ত নেই বলরামের, কিন্তু মাংসপেশীর স্ফীতি দেখে সুরমার চমক লেগে গেল। দুটো হাত যখন মাথার ওপর তুলছে—বলিষ্ঠ বলরামের পেশীতে পেশীতে রক্তের যৌবন নেচে বেড়াতে লাগে—এ রকম মোটা পেশী, এই দীপ্ত স্বাস্থ্য—সত্যিই সুরমার আশ্চর্য্য লেগে যায়।

সতীর কথা ছেড়ে দেওয়া যাক; মীনাক্ষী কি বলেছে সুরমাকে ইঙ্গিত করে? সুরমা মুহূর্ত্তেই সচেতন হয়ে ওঠে। এই ক্ষণ-কালীন বিহ্বলতায় নিজের মননক্রিয়াকে সে এমনই আলগা আর এমনই বিকল করে ফেলেছিল—যাতে তার সমস্ত ঐতিহ্যের অহঙ্কার, সংস্কৃতির সকল গর্ব্বকে ধূলিসাৎ করতে হ'ল।

রেখা ফিরে এসে সুরমাকে আবিষ্কার করল দোতলার ভেতরের বারান্দার রেলিং ধরে কলতলার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে! সে মেয়েকে অমন চিন্তিত দেখে বিগলিত হয়ে পড়লো—কি রে এখানে অমন ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছিস যে!

সুরমা সম্পূর্ণ সজীব হ'ল যেন। সন্ধ্যায় কখন যে সে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে বলরামের দীপ্ত স্বাস্থ্যচ্ছটার বিচ্ছুরণ দেখতে,—তার পর থেকেই কেমন যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে সে। তার অন্তর্জ চলমানতা যেন এতক্ষণ নিস্তেজ হয়ে ছিল, এইবার আব' গতি সুরু হ'ল।

মিথ্যা বলতে হ'ল সুরমাকে: না এইত এলাম এখানে! এতক্ষণ পড়ছিলাম!

রেখা বিস্মিত হ'ল—কি হয়েচে তোর বল তো? কলেজের জুতো পর্য্যন্ত পায়ে রয়েছে এখনো—মিথ্যে কথা বলছিস তুই সুরমা!

সুরমা অত্যন্ত ম্লানভাবে বললে—পড়াশুনোর বড্ড চাপ পড়েছে মা, সামলে উঠতে পারছি না। ভাবছি পড়াশুনো এবার ছেড়ে দিই।

সে ফিরে—রেখার চোখ উর্দ্ধগতি হবার চেষ্টা করলে।

সুরমা নীচের দিকে চেয়ে বললে—পড়াশুনো যেন দিন দিন তেমন ভালো লাগছে না আর।

রেখা দৌড়ে গেল স্বামীর কাছে।

প্রণববাবু বললেন—ওর পেছনে রাতদিন লেগে থাকো কেন বলো ত? তুমি ওর কেরিয়ার মাটী করছ।

রেখা কৃত্রিম রোষে উগ্র হবার চেষ্টা করলে—রেখে দাও তোমার কেরিয়ার; স্বামী ছাড়া মেয়েদের কোনো কেরিয়ার নেই, আমি তা বুঝতে পাচ্ছি।

প্রণববাবু রেখার কাছে সরে এলেন একটু—যেমন তোমার কোনো কেরিয়ার নেই আমাকে ছাড়া।

রেখার শাড়ীতে স্বল্প আকর্ষণের আবেদন বাজলো।

রেখা বললে—আঃ ছাড়ো। দরজা খোলা রয়েছে না?

সেই উন্মুক্ত দরজার অনুসরণ করে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দেখতে পেলেন—তাদের কন্যা সুরমার একজোড়া ডাগর চোখ সজাগ এবং তীক্ষ্ণ হয়ে এ দিকে ব্যস্ত রয়েছে। সুরমার সে চোখে ঈর্ষ্যা কি বেদনা ঝরছে—তা অনুধাবন করবার সহিষ্ণুতা বা প্রয়োজন নেই এদের। তাই দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন আলতোভাবে, শব্দ না করে। এঁরা পাকা হিসেবিয়ানার উচ্চ চূড়ায় অধিরূঢ় হয়েছেন কিনা!

এক মিনিট পরে বলরাম বাইরে থেকে খবর দিলে—মা, শীগ্‌গির আসুন, দিদিমণির ফিট্ হয়েছে।

শিশুর স্বাস্থ্য ও খাদ্য-বিচার

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে অনবধানতায় জাতীয় জীবনের যথেষ্ট অপচয় ঘটে। সমাজ ও জাতির আশা-স্থল শিশু, কিন্তু আমরা সে কথা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করি না। এদের লালনপালন ও যত্ন লওয়া সম্বন্ধে না আছে আমাদের আগ্রহ, না আছে প্রকৃত জ্ঞান। আমাদের দেশের সহস্র সহস্র শিশুর দেহের গঠনে ও ওজনে চরম শোচনীয় অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এই সব শিশু বিদ্যালয়ে যায় এবং হৃষ্টপুষ্ট শিশুদের মতই লেখাপড়া ও খেলাধুলা করে। এদের খর্ব্বাকৃতি দেহে যতটা পরিশ্রম দরকার তত শ্রমসহিষ্ণু এরা মোটেই নয়, অল্পতেই ক্লান্তি অনুভব করে। মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতাই এর মূল কারণ। শিশু-খাদ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি না থাকায় শিশু-স্বাস্থ্যের এই পরিণতি। উপযুক্ত খাদ্যাভাবে শিশু-দেহের উন্নতি ও পরিপুষ্টির পক্ষে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং এ কথা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে খাদ্যসামগ্রীর উপরেই শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি নির্ভর করে।

শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্ব্বে একটা কথা এখানে বলা দরকার। শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রত্যেক পিতামাতার সজাগ থাকা কর্ত্তব্য। অবশ্য পিতাকে অর্থ অর্জ্জনের জন্য গৃহের বাহিরে ব্যস্ত থাকতে হয়, সর্ব্বক্ষণ ছেলেপুলের দিকে তাঁর পক্ষে দৃষ্টি রাখা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং শিশুস্বাস্থ্য মায়ের তত্ত্বাবধান ও লালনপালনের উপর সমধিক নির্ভর করে—মায়ের দায়িত্ব যে এ স্থলে অত্যন্ত বেশী তা বলাই বাহুল্য। প্রতিটি গৃহে শিশু-স্বাস্থ্যের প্রতি মায়েদের সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি সমাজ ও জাতির ভবিষ্যৎ শিশুদের কল্যাণের জন্য একান্তই প্রয়োজন। সমাজের ভিতর যখন এই শুভবুদ্ধির উদয় হবে, অনেক দিনকার জমে-উঠা অমনোযোগিতা যখন কেটে যাবে, তখন ফুটে উঠবে শিশুর দেহে নিটোল স্বাস্থ্যের অপূর্ব্ব কমনীয়তা। গৃহে মায়েদের কর্ত্তব্য ছাড়াও সমাজ ও জাতির দিক থেকেও মস্ত বড় কর্ত্তব্য রয়েছে, তা হচ্ছে শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা। প্রশ্ন উঠে, কি ভাবে এই শিক্ষা বিস্তার করা যায়। প্রথমতঃ স্বাস্থ্য-সংঘ গড়ে তুলতে হবে। প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে জ্ঞাতব্য বিষয়ে জনসাধারণের মনে আগ্রহের সৃষ্টি করাই হবে এই স্বাস্থ্যসংঘগুলির লক্ষ্য। বিজ্ঞান-

সম্মত পন্থায় শিশুখাদ্য সম্পর্কে জ্ঞান সহজেই প্রচার করা যেতে পারে।

খাদ্য সম্বন্ধে বিচার করবার পূর্ব্বে আরও একটা কথা স্বতঃই মনে পড়ে যে, আমাদের দেশে খাদ্য নির্ব্বাচনে প্রচুর গলদ ও ভুলভ্রান্তি দেখতে পাওয়া যায়। খাঁটি দুগ্ধ, টাটকা ফলমূল প্রভৃতি যা আমাদের দেহের পরিপুষ্টির পক্ষে অপরিহার্য্য সেগুলোর দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। ভেজাল-মিশ্রিত জিনিস খেয়ে আমরা এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, ভালমন্দ বিচার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছে। আমি কতকগুলি খাদ্যের নাম উল্লেখ করছি, এগুলি প্রচুর ভিটামিন যুক্ত। যে-শিশু বড় হ'তে চলছে এবং বয়স্ক উভয়ের দেহের পক্ষে এগুলি সমান প্রয়োজনীয়। এই জাতীয় খাদ্যের অপ্রচুরতায় কোন কোনও ব্যাধির আবির্ভাব হয়। কমলালেবু, আনারস, কলা, টমেটো প্রভৃতি ও টাটকা উদ্ভিজ্জাদি আহারের অভাবে দন্তমূলের কোমলতা, রক্তস্রাবশীলতা এবং চর্ম্মে বেগুনী রংয়ের কালিমা লক্ষণবিশিষ্ট এক প্রকার স্কার্ভি (Scurvy) রোগ জন্মে। টমেটো অতি উপাদেয় খাদ্য, এতে ব্যয়বাহুল্য নেই, কমলালেবু প্রভৃতির মত ইহা দেহের যথেষ্ট পরিপুষ্টি সাধন করে। উদ্ভিজ্জাদির মধ্যে গাজর (Carrot), বাঁধাকপি (Cabbages), ও যাবতীয় কাঁচা শাকসব্জী (Salads) যেমন পালং শাক, নটে শাক, পুঁই শাক, কল্মি শাক ইত্যাদি শিশুদেহের পরিপুষ্টি সাধন করে।

বাড়ন্ত শিশুর প্রত্যহ অন্ততঃ তিনপোয়া খাঁটি দুগ্ধ পান করা উচিত। যাবতীয় খাদ্যের মধ্যে দুগ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা বলকারক। দুগ্ধে শিশুদের শরীর পুষ্ট ও দন্তমূল দৃঢ় হয়। এ স্থলে একটা ঘটনা উল্লেখ করা যায়—একটি শিশুকে স্তন্য ছাড়ানর পর সে আদৌ দুগ্ধ পান করতে চাইত না; দশ বৎসর বয়স হ'লে দেখা গেল, তার দাঁত অপটু। দেহের পরিপুষ্টির জন্য এই বয়সে তাকে যে-সব খাদ্য দেওয়া উচিত ছিল তা থেকে সে বঞ্চিত ছিল। পরে এর জন্য তার পিতামাতা যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেছেন, কিন্তু তাতেও কোন সুফল হয়নি।

শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার দেহের পরিমাপ এক হাতের বেশী হয় না, ওজনও তিন-চার সের মাত্র। ধীরে ধীরে দেহ পরিপুষ্ট হয়ে উঠে এবং বড় হ'তে থাকে। বয়স কালে তার শরীরের দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাত হয় এবং ওজনও প্রায় দেড় মণ হয়। শিশু-শরীরের বৃদ্ধি খাদ্যের গুণেই হয়ে থাকে। শিশু যা আহার করে তা থেকে রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতি পরিণত হয়। এই ভাবে শরীর গঠন হয়। খাদ্যে শুধু ক্ষয়পূরণ হয় তা নয়, দেহ গঠন ও শরীর বৃদ্ধির জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। খাদ্যদ্রব্য শরীরের তাপ উৎপাদন করে ও কাজ করবার শক্তি জন্মায়। সুতরাং খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে সকলেরই অবহিত হওয়া উচিত, নিম্নলিখিত চারি প্রকার কার্য্যের জন্য শরীরের পক্ষে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের বিশেষ আবশ্যকতা, যথা :—

(১) দেহের বৃদ্ধি সাধন
(২) দেহের ক্ষয়পূরণ
(৩) দেহের তাপ উৎপাদন
(৪) তাপের সাহায্যে শক্তি উৎপাদন।

শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তাহার খাদ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকা আবশ্যক, যথা :—

(১) আমিষ জাতীয় উপাদান (Proteid)
(২) তৈল জাতীয় উপাদান (Fat)
(৩) শর্করা জাতীয় উপাদান (Carbohydrate)
(৪) লবণ-জাতীয় উপাদান (Salt)
(৫) জল (Water)
(৬) ভাইটামিন (Vitamin)

একমাত্র দুগ্ধে এই ছয় প্রকারের উপাদান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এজন্য শিশুর শরীর পরিপুষ্টির জন্য খাঁটি দুগ্ধই একমাত্র খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুগ্ধের নানাপ্রকার গুণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে গো-পালনের কোন ব্যবস্থা নাই, খাঁটি দুধ দুর্লভ। নানারূপ ভেজাল-মিশ্রিত দুগ্ধ পানে আমাদের দেশের শিশুর দেহ পরিপুষ্ট হ'তে পারে না, এই ভেজাল দুগ্ধই বাজারে বেশী মূল্যে বিক্রয় হয়, বাজারে যা চলছে নির্ব্বিচারে সকলেই তা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে শিশুর স্বাস্থ্য অর্থাৎ জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ছে! এ কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, শিশুকাল থেকে

বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য অটুট রাখতে হ'লে গো-দুগ্ধের ন্যায় পুষ্টিকর খাদ্য আর নাই।

কয়েকটি খাদ্যের নাম এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে। এগুলি শিশুকে দেওয়া যেতে পারে। চাল, আটা, ময়দা, গম প্রভৃতি শরীর বৃদ্ধি করে, পেটের পীড়া না থাকলে জইয়ের ছাতু (Oatmeal) সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। ডিমের মধ্যে শর্করা জাতীয় উপাদান ব্যতীত মনুষ্যদেহ গঠনোপযোগী সকল উপাদানই আছে। ডিমের শ্বেতাংশ অপেক্ষা হরিদ্রাংশে আমিষ, তৈল ও লবণ জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে থাকে। শ্বেতাংশে প্রচুর পরিমাণে য়্যালবুমেন নামক আমিষ জাতীয় উপাদান আছে। ফলের রস (Fruit juice) কমলালেবু, আঙ্গুর, আপেল, আনারস, কলা, পেঁপে, টমেটো প্রভৃতি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং পাকস্থলীর বায়ু নাশ করে।

এক বৎসর বয়স অতীত হ'লে শিশুকে অন্ততঃ একটি সজী খেতে দেওয়া উচিত। এই সময় আলুসিদ্ধ, ডিমের কুসুম, গরম ভাত, রুটী, টোষ্ট অল্প অল্প করে খাওয়া অভ্যাস করান উচিত। এ সব জিনিস চিবিয়ে খেতে শিখলে মাড়ী শক্ত হয়, ও লালার সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত হ'য়ে হজমশক্তি বাড়ে। কিছুদিন পরে শিশু এ সব জিনিষ খেতে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ে। শিশুকে কখনও চা বা কফি (Coffee) দেওয়া উচিত নয়। এতে স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে।

নিম্নে শিশুর খাদ্যের সময় নির্দ্ধারণ করা গেল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচবার খেতে দিতে হবে, এর থেকে রাত্রি আট ঘণ্টা বাদ যাবে। খাদ্য বিরতি কালে একমাত্র জল ব্যতীত অন্য কিছু দেওয়া উচিত নয়, জল প্রচুর পরিমাণে দেওয়া যেতে পারে, বিশেষ ক'রে উত্তপ্ত আবহাওয়ায়।

সকাল ৬টা—৩ ছটাক গরম গরুর দুগ্ধ ও সঙ্গে ১ ছটাক বার্লি, তার সঙ্গে সামান্য চিনি বা তালমিছরীর গুঁড়ো।

বেলা ১০টা—নরম ভাত, আলুসিদ্ধ ও অর্দ্ধসিদ্ধ ডিমের লাল অংশ, তরকারী ও সজী ভাতের সঙ্গে।

বেলা ২টা—কমলালেবুর রস, আনারস, পাকা কলা, পেঁপে, টমেটো ইত্যাদি ও আধ পোয়া দুগ্ধ।

সন্ধ্যা ৬টা—রুটী, টোষ্ট ও দুগ্ধ

রাত্রি ১০টা—সকাল ৬টার মত।

"ধীরে বহে ডন্"

(অনুবাদ-উপন্যাস)

মিখেল্ শোলকভ্

[আজকের দিনে মিখেল্ শোলকভের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক ব'লেই মনে হয়। ডন্-কসাকদের জীবনকে কেন্দ্র ক'রে এই প্রসিদ্ধ রুশ লেখক যে তিনখানি উপন্যাস রচনা করেছেন, তার প্রত্যেকখানিই আজ সুপ্রসিদ্ধ এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে শোলকভ্ও ইতিমধ্যে বিশ্বসাহিত্যের আসরে উচ্চস্থান দখল করেছেন। তিনি নিজে একজন ডন্-কসাক্। ইতিপূর্বে এমন তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও দরদের সাহায্যে আর কোন রুশ গ্রন্থকার কসাকদের জীবন-চিত্র এঁকেছেন ব'লে আমাদের জানা নেই। তাঁর প্রথম উপন্যাস And Quiet Flows the Donএর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে 'ধীরে বহে ডন'-নামে মাতৃভূমিতে প্রকাশিত হবে। আশা করি প্রাক্-বিপ্লব যুগের ডন্-কসাকদের এই অপূর্ব চরিত্র-চিত্রণ 'মাতৃভূমি'র পাঠক-পাঠিকাদের তৃপ্তিবিধান করতে পারবে।

—সম্পাদক : মাতৃভূমি।]

প্রথম অধ্যায়

তাতারস্ক গ্রামের ঠিক প্রান্তেই মেলেকভের ফার্ম। দক্ষিণে খিরিমাটির পাহাড়। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দুটো পথ গেছে দুই দিকে। বাঁ-দিকের রাস্তাটা স্কোয়ার পার হ'য়ে চলে গেছে গো-চারণ ভূমি পর্য্যন্ত; আর খেসিং মিলের

পিচ্ছিল একটি নবজাত শিশু—অনবরত চীৎকার করে কাঁদছে।

* * *

প্রোকোফীর স্ত্রী সেদিন সন্ধ্যাবেলাই মারা যায়। নবজাত শিশুটিকে দেখাশোনা করবার ভার প্রোকোফীর বৃদ্ধা মা-ই নিলেন। ছেলেটিকে দেখে বৃদ্ধার কেমন যেন মায়া হয়েছিল। অপূর্ণ মাসে জন্মেছে, ভূষির গুঁড়ো মাখিয়ে, ঘোড়ার দুধ খাইয়ে মাসখানেক যখন কাটল, তখন ভরসা হ'ল;—ছেলেটা বাঁচলেও বাঁচতে পারে। গীর্জ্জায় নিয়ে গিয়ে নামকরণ হ'য়ে গেলো,—ঠাকুর্দার নাম অনুসারেই নাম রাখল, প্যাণ্টালীমন।

বছর বার পরে। প্রোকোফী নির্ব্বাসন থেকে যখন ফেরে, তার ছাটা সোনালী দাড়িতে জায়গায় জায়গায় তখন সাদা ছোপ লেগে গেছে। রুশ পোষাকে তাকে এমন দেখাচ্ছিলো যে হঠাৎ দেখে চেনাই ভার। এসেই সে ছেলেকে নিয়ে নিজের ফার্ম্মে উঠল গিয়ে।

প্যাণ্টালীমন দেখতে অনেকটা মায়ের মতই হয়েছিল,—চেহারায় পুরোপুরি তুর্কী ছাপ। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাগে আনা দুষ্কর হ'য়ে উঠল। বেশী দেরী না করে প্রোকোফী পরশী এক কসাকের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললে। সেই থেকেই কসাক-ধমনীতেও তুর্কী-রক্ত প্রবাহের সুরু হয়।

মেলেকভ্ পরিবারের গোড়াপত্তনের ইতিহাস এইটুকুই। গ্রামে এই তুর্কী-কসাক জোয়ান পরিবারটিকে সবাই ডাকত 'তুর্কী' বলে।

বাবা মারা গেলে ফার্ম্ম দেখাশুনা করবার ভার প্যাণ্টালীমন নিজেই নিলে। কিনে দু-এক একর জমি-জমাও বাড়াল। নতুন করে ঘরের চালে ছাউনি দিলে, টিনের একখানা নতুন গোলাঘর তুলে কাটছাট টিন দিয়ে দুটো মোরগ তৈয়ারী করিয়ে চালের মাথায় আটকে দিলে। প্যাণ্টালীমনের যত্নে তার প্রচেষ্টায় কিছুদিনের মধ্যেই মেলেকভ ফার্ম্মের রূপ যেন কিছু বদ্‌লে গেল, দেখলেই মনে হ'ত বেশ নিশ্চিন্ত সন্তুষ্টি নিয়ে দিন কাটাচ্ছে এরা।

বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে প্যাণ্টালীমন প্রোকোফীভিচ্ বেশ ভারীভুরি হয়ে উঠল, তবু তাকে দেখে তখনও বেশ সুস্থ এবং বলিষ্ঠ বলেই মনে হ'ত। অনেক দিন আগে সম্রাটের সৈন্য পরিদর্শন করবার সময়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে বাঁ পা'খানা ভেঙে যায়। সেই থেকে পা'খানা টেনে একটু খুঁড়িয়ে সে চ'লত। বাঁ কানে ছিলো একটা অর্দ্ধচন্দ্র ইয়ারিং। মৃত্যু পর্যন্ত তার ঘনকৃষ্ণ, দাঁড়কাকের মত চুলদাড়ির কোন অপহ্নবই ঘটেনি। দোষ ছিল, রাগ হ'লে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকত না। আর এই গোঁয়ার্তুমিই বোধ হয় ওর স্ত্রী ইলিনিস্‌নার অকাল-বার্দ্ধক্যের জন্য দায়ী। হাঁ, এককালে মুখখানা দেখতে বেশ ভালই ছিল। কিন্তু আজ চাইলে কুঞ্চিত রেখার ভাঁজ ছাড়া অন্য কিছু দেখবার জো' নেই। মনে হয় যেন, মাকড়সা জাল বুনে রেখেছে। বড় ছেলে পিয়োত্রা দেখতে মায়েরই মত, থ্যাবড়া নাক, কটা কটা চোখ আর এক মাথা ঝাঁকড়া সোনালী চুল। বুদ্ধিও কিছুটা সোজাসোজাই ছিল। কিন্তু ছোট ছেলে গ্রীগর ছিল হুবহু বাপের মত। সেই বঁড়শীর মত নাক, ময়লা রঙ, বাঁকানো চিবুকের কাছে লাল্‌চে ভাব, বাপের মতই একটু সাম্‌নে ঝুঁকে চলে, এমন কি দু'জনে হাসে পর্য্যন্ত এক ভাবে,—আশ্চর্য্য মিল! জন্তুদেরই থাকে শুনেছি। প্রোকোফীর আদুরে মেয়ে দুনিয়া দেখতে ভালই, লম্বাপনা চেহারা, টানা টানা চোখ—বেশ!

আর বাকী রইল পিয়োত্রার স্ত্রী ডোরিয়া, কোলে ছোট্ট একটি ছেলে!—এই নিয়েই প্যাণ্টোলীমনের পরিবার!

(ক্রমশঃ)

অন্ধকারের আফ্রিকা

(ভ্রমণ)

[পূর্ব্বানুবর্ত্তী]

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

আফ্রিকার ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে যা কিছু লিখা হয়েছে তার সবটাই লিখেছেন ইউরোপীয়গণ। এশিয়ার কেউ আজ পর্যন্ত আফ্রিকা সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নি। আমাদের দেশে একটি মজার জিনিস দেখতে পাওয়া যায়, তা হ'ল এই যে, কতকগুলি সংবাদপত্রে আফ্রিকা সম্বন্ধে এমন কতকগুলি প্রবন্ধ বের হয় যেন লেখক স্বচক্ষে সবই দেখে এসেছেন। তাই পাঠ করে সাধারণ পাঠক মহা ফাসাদে পড়েন। এসব লেখকদের শ্রীহট্টের ভাষায় বলা হয় "ঘটি চোর"। ঘটি চোরের সংখ্যা আমাদের দেশে যেমন দিন দিন বেড়ে উঠেছে, ইউরোপে সেরূপ ভাবেই কমে যাচ্ছে। ইউরোপীয়দের মধ্যে সংগুণ না থাকলে তারা এত বড় হতে পারত না, এটা আমাদের ভুলা উচিত নয়। কিন্তু অনেক ইউরোপীয় পর্যটক এবং সাহিত্যিক অনেক সময়ই কলোনিয়েল দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেই অনেক কথা লিখেছেন। বর্তমান যুগ হ'ল সোসিয়েলিজমের, এখন কলোনিয়েল দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে কোন বিষয়ে অনুধাবন করতে যাওয়া বড়ই অন্যায় এবং বিপজ্জনক। চেক লোকটি কলোনিয়েল দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন। তিনি যা কিছু বললেন তাতে আমি আমি কোন মতেই সায় দিতে পারি নি।

উত্তর-আফ্রিকাতে গ্রীক, আরব, ইহুদী প্রভৃতি জাত এসে কখন যে কলোনী করেছিল অথবা উত্তর-আফ্রিকা হ'তে কখন যে শ্বেতকায়রা চলে গিয়ে ইউরোপে বসবাস করছিল সে সংবাদ ঐতিহাসিকগণই ভাল করে জানেন। আমার মত পর্যটক এসব সংবাদ রাখবার ফুরসত পায়ও নি, হয়ত আর পাবেও না। এখন কথা হ'ল ভারতের সঙ্গে আফ্রিকার কোন সম্বন্ধ আছে কি না? তাই নিয়ে আমি কথা বলেছিলাম। ভারতের ঐতিহাসিক সংবাদ আমি অতি অল্পই রাখি, এবং যা রাখি তা আমার মনগড়া কতকগুলি কথা মাত্র, যার পেছনে কোনও প্রমাণ নেই। অতএব এখানে এসব কথা না তুলে শুধু বলব, আমি চেক লোকটিকে বলেছিলাম, হয়ত ভারতের সঙ্গে আফ্রিকার বিশেষ সম্বন্ধই ছিল, কিন্তু তা এত পুরাতন যার সংগে বর্তমান ঘটনার কোন সম্বন্ধে সেই।

আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন শিখ ড্রাইভার বলল, "তব তুম রামায়ণ ইতবার নেহি করতাহে, হামলোক সমঝতাহে কি ইদারমেই সোনেকি লংকা হোগা"। এদের কথার তাৎপর্য বুঝতে আর বাকি রইল না। প্রতিবাদ না করে প্রথমত বুঝতে চেষ্টা করলাম, এদিকে যে সকল নিগ্রো দাঁতের অগ্রভাগ পশুর দাঁতের মত ক'রে সূক্ষ্ম করে, এটা হ'ল তাদের একটা ফেসন, এরা ত মানুষের মাংস খায় না। এ কথাটা সকলেই বলে, তার পরও যদি তোমরা এখানেই স্বর্ণ লংকা পেতে চাও ভাল কথাই, আমিও তাতে ভাগ বসাব। চেক ভদ্রলোকটি একেবারে মস্তিষ্ক শূন্য নয়, তাই তিনি আমার কথাই মেনে নিয়ে সোনার লংকা না খুঁজে স্বর্ণখনির অনুসন্ধানে যাবেন বলেই বললেন।

ভিক্টোরিয়া হ্রদ কাছেই। তাতে অনেকগুলি দ্বীপ এবং উপদ্বীপ আছে। এদের ধারণা, এসব দ্বীপ উপদ্বীপে প্রচুর স্বর্ণ জমা করা আছে, গোপনে তারই অনুসন্ধান করে বের করবে এই তাদের ইচ্ছা। আমার তাতে বাধা দেবার মত কিছুই ছিল না, কিন্তু এসব বাজে কাজে আমি মাথা ঘামাতে রাজি ছিলাম না। এই পৃথিবীতে এমন কতকগুলি লোক আছে যারা সঞ্চিত ধনের অন্বেষণে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। অবশ্য তার পেছনে পুরাতন

কথায় অনেক নজির আছে। জেনারেল ক্রুগারের সঞ্চিত অর্থ, ভারতীয় মোংগল বাদশাদের হীরা-মাণিক; জুলোদের পুরাতন হীরা এসবের অন্বেষণে আফ্রিকার বনে জংগলে অনেকেই ঘুরে বেড়ান। সে জন্যই এদের দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই।

এখন আমি বুঝতে পারলাম, আমাকে কেন এমন কষ্টকর স্থানে আনা হয়েছে। চেক লোকটির সংগে তিন দিন থাকার পর ঠিক হ'ল, আমরা আর এগিয়ে যাব না, নিকটস্থ গ্রাম হতে চামড়া এবং সিসেল বোঝাই করে যেখান থেকে এসেছিলাম সেখানেই ফিরে যাব। ইউরোপীয় লোকটি আমার কথা বুঝেছিল, কিন্তু সাথের দুজন পাঞ্জাবী উল্টা বুঝলে। তাদের ধারণা হ'ল, আমি বাঙালী নই, আমি দেশীয় খৃষ্টান। নতুবা এতে প্রতিবাদ করার চেয়ে সায় দেওয়াই আমার উচিত ছিল। ফেরবার পথে মানসিক কষ্ট অনেক সহ্য করতে হয়েছিল। অতি কষ্টে কিজাবীতে ফিরে এসে কয়েক দিন বিশ্রাম ক'রেই আবার আমার নতুন পথে বের হতে হয়েছিল।

কিজাবী হ'তে নাইআশা পর্যন্ত সুন্দর বাঁধান পথ রয়েছে। নাইআশাকে স্থানীয় লোক নেওয়াশা বলেই বলে। কিজাবী হতে নাইআশা পর্যন্ত বাস-সারভিসও আছে। অনেক বাস-সারভিসের লোক আমাকে বাসে করে যাবার জন্য বলতেছিল, কিন্তু এদের অনুরোধ আমি রক্ষা না করে সাইকেলে করেই যেতে লাগলাম। উদ্দেশ্য পথে হয়ত আবিসিনিয়ার লোকের সংগে সাক্ষাৎও হ'তে পারে। যত আবিসিনিয়ার হাবাসি এদিকে পালিয়ে আসছিল তাদের কেনিয়াতে আসা মাত্রই ইনটার্ণ ক'রে রাখা হচ্ছিল। মাঝে মাঝে দু-একটা লোক ছিটকে বের হ'য়ে এসে অন্য লোকের সংগে আত্মগোপন করে বসবাস করত। এরূপ দু-একটি লোকের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে অনেক সংবাদও সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি।

নাইআশাতে পৌছতে একরাত্র আমাকে পথে কাটাতে হয়েছিল। এটা হ'ল কেনিয়ার হাইলেণ্ড, এখানে সাদা লোক ছাড়া আর কেউ রেষ্ট-হাউস অথবা ডাক বাংলোতে থাকতে পারে না। আমার কাছে প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও আমি রাত্র কাটাবার জন্য একটি নিগ্রো কুটিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। যারা উত্তর-আফ্রিকা ভ্রমণ ক'রে মনে করেন, অনেক দেখেছেন তাদেরে আমি এ অঞ্চলটা দেখতে বলছি। এ অঞ্চল দেখলে উত্তর-আফ্রিকার কথা ভুলে যেতে হবে, তাদের প্রকৃত আফ্রিকা দেখা হবে। এ অঞ্চলের পরিবর্তন হ'তে আরও সময় লাগবে। অতএব আমি যা লিখছি, অবিকল তাই দেখতে পাবেন। কাঁটা চামচ, বয় বাবুর্চির কথা ভুলে যেতে হবে। অনেক বাবুর হয়ত হার্টও ফেল করতে পারে বন্যজন্তু দেখে। কিন্তু এদিকে সেই তথাকথিত সাহিত্যিক এবং বয়-বাবুর্চিওয়ালা পর্যটকদের নামগন্ধও নেই। মহাশয়দের একটু নতুন সংবাদ দেই, যাতে করে উত্তর আফ্রিকার গরম মাথা এদিকে আসলে হয়ত ঠাণ্ডাও হতে পারে। বরদার মহারাজা এবং হিজ হাইনেস দি আগাখান নাইরবীতে গিয়েছেন। বরদার মহারাজা বেঁচে নেই, হিস হাইনেস আগাখান এখনও বেঁচে আছেন। হিস হাইনেস ইণ্ডিয়ান বলেই কেনিয়ার উঁচুভূমিতে কোন ভূমি-সম্পত্তি কিনতে সক্ষম হন নি, তার ইচ্ছা ছিল তাঁর ফলোয়ারদের থাকার জন্য ভূমি ক্রয় করবেন। শেষটায় সামান্য ভূমি তাঁর ফরাসী স্ত্রীর নামে কিনতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সেই ভূমিতে তাঁর স্ত্রী বসবাস এবং হাল চাষ করতে সক্ষম হবেন এই ছিল অর্থ। একজন ভারতীয় বলেছিলেন, "সাদা চামড়ার গুণে জার্মানরাও নাইরবীতে এসে এসে জমি কিনে তথায় হাল চাষ কর'তে সক্ষম হয়, আর ভারতীয়রা বৃটিশের প্রজা হয়েও তথায় হাল-চাষ করবার জন্য জমি কিনতে সক্ষম হয় না। এতেই বুঝা যাবে ভারতবাসীর অবস্থা কেনিয়ার উঁচু ভূমিতে কি অবস্থাতে পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরের পূর্বেই নাইআশাতে পৌছে স্থানীয় ভারতীয় এলাকায় একটি আর্য সমাজের গৃহে থাকবার স্থান ক'রে নিলাম। অনেক ভারতবাসীই আমাকে তাদের বাড়ীতে রাখতে চেয়েছিলেন। আমি তাতে রাজি হই নি। কারণ এতে মনের স্বাধীনতা মোটেই থাকে না। আর্য-সমাজ গৃহটি যে কোন ভারতবাসীর জন্য খোলা রয়েছে।

তথায় থাকতে হ'লে কোনরূপ চার্জ দিতে হয় না, অথচ ব্যবহারের জন্য বিছানা দেওয়া হয়, এবং একটি বয়ও তথায় আছে, তাকে বললেই বাজার হতে খাবার এনে দিয়ে থাকে। আর্যসমাজ গৃহে আরাম করে দুদিন থেকে সর্বপ্রথম যাই নাইআশা হ্রদ দেখতে। নাইআশা হ্রদটি সহর হ'তে দু-মাইল দূরে। দু-মাইল পথ চলে হ্রদের তীরে উপস্থিত হ'য়ে দেখি তথায় লক্ষ লক্ষ সারস পাখী হ্রদের জলে আনন্দে মাছ ধরছে, খাচ্ছে এবং খেলা করছে। হ্রদটিকে দূর থেকে দেখলে ভুল হয়, মনে হয়, এতে জল নেই, আছে একঝাঁক সারস পাখী। এখানের সারস পাখীকে হত্যা করতে দেওয়া হয় না বলেই এদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং হ্রদের গভীরতাও কমে আসছে। আমার মনে হয় আর পঞ্চাশ বৎসর মাত্র এই হ্রদে জল থাকবে, তারপর শুকিয়ে গিয়ে হ্রদটি বেশ সুন্দর একটি মাঠে পরিণত হবে।

হ্রদের তীরে অনেকক্ষণ বসে হ্রদের নানারূপ ছবি নিয়ে সহরে ফিরে এলাম। আমি যেখানে থাকতাম সেই ঘরটি শহরের বাইরে। শহরের ব্যবসা দেখবার জন্যে একদিন সকালে বাজারে যাই। নিগ্রোরা ভুট্টা, চামড়া, ফল-মূল, বন্যজীবের হাড়, গুড় এবং তাদের তৈরী মাটির পাত্র বিক্রি করার জন্য শহরে এসেছে। নিগ্রোদের ঠকাবার জন্য ভারতীয় মধ্যম ব্যক্তিরা দল বেঁধে যে জিনিসের দাম একবার যত বলে দিচ্ছে তার চেয়ে এক সেণ্টও বাড়াচ্ছে না। প্রকৃত পক্ষে যে দামে জিনিস কিনল এবং তার বিনিময়ে যা দিল তার দাম অতি সামান্য। ভারতীয় মধ্যম ব্যক্তিদের ঠগবাজি দেখে আমি বড়ই দুঃখিত হলাম এবং কয়েকজনকে বাজারেই বললাম, এরূপ করে ক্রমাগত নিগ্রোদের ঠকালে আপনাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আর এদেশে থাকতে পারবেন না বলেই আমার মনে হয়। আমার কথা শুনে অনেকেই রাগ করল বটে, কিন্তু রাত্রের বেলা লেকচার দেবার সময় বলেছিলাম, এরূপ করে ঠকানের পরিণামে সাইগণ হতে যেমন ক'রে ভারতীয়দের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তেমনি করে এদেশ হ'তেও আপনারা তাড়িত হবেন যখনই নিগ্রোরা একটু শিক্ষিত হ'য়ে উঠবে। যারা একবার ঠকানো বিদ্যা শিক্ষা করে তারা সহজে সত্বর এবং বিনা কষ্টে অর্থ উপার্জ্জনের পথ পরিত্যাগ করে না।

নাইআশা একটি ছোট শহরমাত্র। এত শহরটিতেও একটি ইউরোপীয়ান পাড়া আছে। তথায় ইণ্ডিয়ান অথবা নিগ্রোরা বিনা কারণে যেতে পারে না। আমার কারণ এবং অকারণ একই। ঘুরতে ঘুরতে ইউরোপীয় পাড়াতে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। কেউ আমার দিকে আড়নয়নে তাকাল আর কেউ তাকালই না। কিন্তু কতকগুলি যুবক আমার দিকে শুধু তাকাল না, তারা এসে আমার সংগে বেশ ভাবের আদান-প্রদান সুরু করেছিল। এদেরই সংগে কথা বলে জানলাম, যারা মামুলী কাজ করে তারাও একশ শিলিং মাসে পেয়ে থাকে। সেই কাজটা যদি কোন নিগ্রো অথবা ইণ্ডিয়ান করে তবে দশ শিলিং এর বেশি পেতে পারে না। যথায় মাইনের বেলা এত প্রভেদ রয়েছে তথায় বর্ণ-বিদ্বেষ আপনিই গজিয়ে উঠে। আপনার কমিউনিটির দিকে লক্ষ্য রাখতে লোক আপনা হতেই ঝুঁকে পড়ে। আমি এদের সংগে এসব কথা মোটেই না বলে তাদের সংখ্যা কত তাই জিজ্ঞাসা করে অবগত হ'লাম, নাইআশাতে আটটি মাত্র ইউরোপীয় পরিবার বাস করেন। আটটি পরিবার মিলে একটি পাড়া। সেই পাড়া হ'ল নাইআশার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। ছেলে-বুড়ো যথায় শাসন কাজ চালিয়ে যায় তথায় অত্যাচার ব্যভিচার হবে না ত আর কোথায় হবে।

ক্রমশঃ

দুরধিগম্য

(গল্প)

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ কথা যখন মনে হয় যে কমলা আমাদের সঙ্গে আর কখনো আমার দেখা হবে না তখন আন্তরিক দুঃখ বোধ করি। মনে হয়, আমার মসৃণ দিনগুলির চারদিকে আকস্মিক অকাল বর্ষার ছায়া নেমেছে; যেখানে আশা করেছিলাম উজ্জ্বল চন্দ্রালোকের রূপালী আভাষ, সেখানে হঠাৎই দেখা গেল ঝড়ের মেঘ, বজ্র আর বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ ছুরীর ফলা তার মধ্যে লুকান। তাই মনে হয়, আমরা মাঝে মাঝে কি ভুলই না করি, একটুও ভাবি না যে আমার এ কাজ ঠিক হচ্ছে না, যা কোন ত্রুটির বীজ এর মধ্যে আমি রোপণ ক'রে যাচ্ছি সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। আশ্চর্য্য! একটুও আমরা তা ভাবি না।

সেই রাত্রির টুণ্ডলা ষ্টেশনের সামান্য একটা ঘটনা যে আমার জীবনে এত অসামান্য হ'য়ে গভীরতর স্মরণ-চিহ্ন ফেলে যাবে এ কথা সত্যিই আমি কোন দিন কল্পনা করতে পারি নি। সেই রাত্রিকে আমি চোখ বুজলে আজও স্পষ্ট অনুভব করতে পারি। সেই রাত্রি আমার দেহের প্রতি শিরা এবং উপশিরার মধ্যে যেন চিরকালের জন্যে একটা শিথিল অথচ তীব্র অনুরণন জাগিয়ে গেছে। শিথিল বললাম এই জন্যে যে তার সূচনা ছিল কোমলতার মধ্যে, যা থেকে কোন দিনই মনে করা যায় না, যে এটাই একদিন হিমালয়ের মত শক্ত পাথর হ'য়ে উঁচু হ'য়ে উঠবে।

সময়টা তখন কার্ত্তিক মাস। কয়েক দিনের ছুটীতে আগ্রা গিয়েছিলাম, আমার এক বন্ধু সঙ্গে ছিলেন। ভালোই লাগলো। উপভোগ করলাম আগ্রাকে, তার পরে দুজনে একরাত্রে বিছানা-পত্র বেঁধে টুণ্ডলা এসে পৌছলাম।

দুর্দৈব! আমাদের নির্দ্দিষ্ট গাড়ীকে ছেড়ে দিতে হোল। ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমের উপরে এতো ভীড় এই আমি প্রথম দেখলাম। আগের দিন মথুরাতে কি একটা উৎসব ছিলো, বোধ হয় ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার, অসংখ্য যাত্রী গিয়েছিল সেখানে—যমুনায় পুণ্য স্নানই তাদের লক্ষ্য; তারই এ নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়া!

ফিরছিলাম কাণপুরে, আমার কর্ম্মস্থলে। অস্পষ্ট ধোঁয়ার মতো মনে পড়ে একদিন ভোরবেলা আমি একলা এই অতি অপরিচিত এবং সম্পূর্ণ নূতন জায়গায় এসে পৌঁছেছিলাম। তখন আমার বয়েস বারো বছরের কিছু বেশী। শীতকাল, পরণে ছিলো শুধু একটা খাকী প্যাণ্ট, আর একটা ছেঁড়া কোট। ষ্টেশনের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলাম। বুকের মধ্যে কে যেন আমার হাতুড়ি পিটছিলে, কেবলি মনে হচ্ছিলো, কেন এলাম, কেন এ দুর্বুদ্ধি জাগলো আমার মনে। আমার গ্রামের সেই ছোট 'তুরাণ' নদীকে মনে পড়লো, মনে পড়লো আমার শৈশব সঙ্গীদের। এ কথা আজো আমি বেশ মনে করতে পারি যে সেই শীতের তীব্র কন্‌কনানির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার চোখে জল এসেছিলো।

তখন কি জানতাম এই কাণপুরের আকাশ আর বাতাস আমারই জন্যে অপেক্ষা ক'রেছিলো? সেই ভোরের ঠাণ্ডা এবং কনকনে হাওয়ার মধ্যে কাণপুর আমাকে গ্রাস করলো, আমি মিশে গেলাম জনস্রোতে, আমার পিছনে-ফেলা ইতিহাসের উপরে যবনিকা নামলো।

যখন পৃথিবীর মাটিতে শক্ত হ'য়ে দাঁড়াবার আমার অবস্থা হোল, তখন দেখলাম, 'দি এম্‌পায়ার লেদার ওয়ার্কস্' আমাকে একটা ছোট্ট বলের মতো লুফে নিয়েছে, আমার

বয়েস তখন ষোলো। দি এম্পায়ার লেদার ওয়ার্কস্-এর উপরে আমার অসাধারণ শ্রদ্ধা নিবেদিত আছে। আমার সেই নিদারুণ ষোলো বছর বয়সের অনাহার ক্লিষ্ট জীবনের দিনগুলির মধ্যে যদি তাঁদের আহ্বান না আসতো তাহলে আমার আগামী দিনে যে কী হোত, তা সহজেই কল্পনা করা যায়!

প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হোত। কাঁচা চামড়ার গন্ধে আমার পেটের সমস্ত নাড়ী যেন উলটে আসতে চাইতো। কয়েকদিন বাড়ী এসে রীতিমত অসুস্থ হ'য়ে পড়েছি—তারপরে এক এক করে আটটা বছর পার হ'য়ে গেলো; দেখলাম আর আমার সেই চামড়ার গন্ধে নাড়ী উল্‌টে আসতে চায় না, বরং তাদের কর্ম্মশক্তি আরো বেড়েছে; দ্বিগুণ উৎসাহে আমি এখন কাজ করতে পারি, বরং অন্য কোনো নূতন লোকের এ-অবস্থার কথা শুন্‌লে আমার হাসি পায়।

তবু, আমি ভেবে দেখেছি, আমার মনের মধ্যে আরো একটা অদ্ভুত এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র লোক বাস করে—যে আমার মতো সহজেই এই চামড়া আর কাণপুরকে স্বীকার ক'রে নেয় নি। মাঝে মাঝে সে নিদারুণ বিদ্রোহ করে, আমার দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলিকে টান দিয়ে সচেতন হ'তে বলে, চোখ লাল করে এসে আমার সামনে দাঁড়ায়।

তখনই আমি বিপদে পড়ি। তখনই আমার একটানা সুন্দর জীবনে ঝড় ওঠে, তখনই যেন আবার নূতন ক'রে অনুভব করি সেই কাঁচা চামড়ার গন্ধ, মেশিনের বিশ্রী আওয়াজ ভগবানদাসের সেই বিকৃত মুখের বিকৃততর অভিব্যক্তি, আমাকে এরা বিপর্য্যস্ত করে।

ঠিক সেই রকম একটি নিদারুণ মুহূর্ত্ত এলো যখন আমি আগ্রা ছাড়লাম। এ কয়টা দিন যেন আমার জীবন স্বপ্নের মতো এসেছিলো, স্বপ্নের মতোই তারা ভেসে গেলো। ট্রেণের জানলা দিয়ে আবার আমি নূতন ক'রে সেই কাঁচা চামড়ার গন্ধ পেলাম।

বরাত ভালো। টুণ্ডলা থেকে অনেক কষ্টে রাত দুটোর কাছাকাছি একটা ট্রেণ ধরলাম। এ ট্রেণ ধরবার ইতিহাসটাও অভিনব। একখানা অন্ধকার বগী দূরে দাঁড় করানো ছিলো, দেখি অনেক লোক সেটাতে হুড়মুড় ক'রে ঢুকছে। শুন্‌লাম এটা ডাউন দিল্লী মেলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'বে—দেরী না করে আমরাও সে সুযোগটা ছাড়লাম না।

বন্ধু একেবারে একটা জানলার ধার ঘেঁষে বসেছিলেন, হঠাৎ খানিকটা জল জান্‌লা বেয়ে নীচে এসে পড়লো—সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যেই সমস্ত কাম্পার্টমেণ্টের মধ্যে এই দিকটায় একটু চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম। আমি তখন সবে সতরঞ্চিটা এক কোণে বিছিয়েছি, এমন সময় সামনে থেকে অনেকগুলি মানুষের একটা ঠেলার ঢেউ এসে লাগলো আমার গায়ে, একটা ভারী কোমল আর সসংঙ্কোচ স্পর্শ অনুভব করলাম, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলি কণ্ঠের একটি সুর ভেসে এলো: sorry!

আমি এ বারে রীতিমত সচেতন হোলাম। সেই অন্ধকারেই বেশ অনুভব করলাম আমার সমীপবর্ত্তিনী বেশ একটু কুণ্ঠিতা হ'য়েছেন, আমিও তাই; সপ্রতিভ ভাবে এককোণে ব'সে তাঁকে আমি খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিলাম। ডাউন দিল্লী মেল এসে তখন এর সঙ্গে লেগেছে।

আলো জলে উঠলো। ভালো ক'রে দেখলাম, পশুর মতো সমস্ত কামরাটাকে যেন বোঝাই করা হয়েছে, আমার সমীপবর্ত্তিনীকেও দেখলাম—সমস্ত চুল এলোমেলো, নিদারুণ পরিশ্রমের চিহ্ন তার সারা শরীরে, সমস্ত মুখে একটা শান্ত অথচ বিষণ্ণ ক্লান্তির ছায়া, নীচু হ'য়ে পা থেকে উঁচু হিল-তোলা জুতোটা খুলছে।

আরো একটু ভালো ভাবে লক্ষ্য ক'রে বুঝলাম. ও বাঙালী নয়, সঙ্গে তারই বোধ হয় একজন আত্মীয়া। একটু স্থূল দেহিনী, মুখের সঙ্গে তার অনেক সাদৃশ্য আছে—তিনিও জিনিষ পত্রগুলি গুছিয়ে রাখছেন।

মিনিট পনেরো পরেই ট্রেন ছেড়ে দিলো।

আমি যথাসম্ভব সংকুচিত হ'য়েই একধারে ব'সে রইলাম। লক্ষ্য করলাম তার আত্মীয়াটি ইতিমধ্যেই সেই অতি অল্পপরিসর জায়গায় ভিতরে স্থান সংগ্রহ ক'রে নিয়ে হাতের উপরে মাথা রেখে চোখ বুজেছেন, গাড়ীর প্রায় সমস্ত যাত্রীই ব'সে ব'সে ঢুলছে।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আমারও সারা শরীরে যেন একটা ক্লান্তির স্রোত নেমেছিলো, আমারো দুই চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসতে লাগলো। তার পরে এক সময়ে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লাম।

একটা ঝাঁকানিতে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। দেখলাম কামরার মধ্যে খানিকটা পরিবর্তন ঘটেছে।—আমার পার্শ্ববর্তিনীর সেই আত্মীয়টি, সামনের থেকে গিয়ে খানিকট স্থান সংগ্রহ করে নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘুমচ্ছেন, আর আমার পার্শ্ববর্তিনী আরো কাছে সরে এসেছে। আন্দাজ করলাম পাশের মাড়োয়ারীটি তাঁর বিরাট দেহ নিয়ে এসে পিষে ফেলবার উপক্রম করছিলেন, তাই এই স্থানচ্যুতি! ওদিকের বেঞ্চ থেকে একটি লোক এক দৃষ্টে চেয়ে আছে তাঁর দিকে।

লক্ষ্য করলাম, ঘুমে মেয়েটির সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হ'য়ে আসছে। তার দেহের সেই শিথিল ভংগী ভারী সকরুণ মনে হোল। হঠাৎই উঠে দাঁড়ালাম, তার পরে ইংরেজীতে বললাম, যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে এই কোণে আপনি বসতে পারেন।

স্পষ্ট দেখলাম, মেয়েটি সোজা হ'য়ে বসলো, তার পরে বড়ো বড়ো চোখ তুলে আমার দিকে চাইলে। একটু হেসে ইংরেজিতেই বললে, ধন্যবাদ; তার পরে গিয়ে আমার জায়গাটায় বসলো।

সেই বড়ো বড়ো চোখ দুটির কথা আমার আজো যেন মনে আছে।

বন্ধু আমার দিকে চেয়ে বসেছিলেন, চোখ পড়তেই একটু হাসলেন, তার পরে কানের কাছে এসে বললেন, হঠাৎ এ দিকে এলে যে?

অবস্থাটা বুঝিয়ে বললাম। গাড়ী তখন ছুটে চলেছে।

বাকী রাত্রি আর আমার ঘুম এলো না। অবশ্য ঐ নিদারুণ ভিড়ের মধ্যে কাঠ হ'য়ে বসে থাকা অবস্থায় ঘুম আসাটা সত্যিই অস্বাভাবিক। কিন্তু আমার তাও আসতে পারতো, শরীরটাকে সেদিক থেকে আমি যথেষ্ট প্রস্তুত করে রেখেছিলাম।

ভোরের দিকে মেয়েটি সোজা হ'য়ে উঠে বসলো; আমার দিকে একবার লজ্জাজড়িত দৃষ্টিতে সে সেই বড়ো বড়ো চোখ তুলে আবার চাইলো, কিন্তু সে মাত্র মুহূর্তের জন্যেই—তার পরেই চোখ দুটি নামিয়ে নিলে।

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে একটু যেন সুস্থ বোধ করলাম, বাইরের অন্ধকার তরল হ'য়ে এসেছে, দুদিকের মাঠ আর টেলিগ্রাফ পোষ্ট ছুটে চলেছে!

জিগেস করলাম, রাত্রিতে কোন অসুবিধা হয় নি তো আপনার?

একটু হেসে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, না, ধন্যবাদ। আমি বেশ ভালো ভাবে বসতে পেরেছি। বলে হাত দিয়ে মুখের উপরে এসে পড়া চুলগুলিকে একটু ঠিক ক'রে নিলে।

বললাম, না, ভীড়ের মধ্যে সত্যিই আর ভদ্রভাবে চলা যায় না।

আবার একটু হাসলো সে, বললে, হ্যাঁ, বড়ো অসুবিধায় পড়তে হয়। তার পরে আর কোন কথা বললো না। জানালাদিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ব'সে রইলো।

আমাদের সব কথাবার্ত্তা ইংরেজীতেই হচ্ছিলো, একটু পরে আমিই প্রশ্ন করলাম, কোথায় যাচ্ছেন?

এবার আমার চোখের দিকে চেয়ে আবার হাসলো সে, বললে—কাণপুর, আপনি কোথায়?

কেন জানিনা, ভারী আনন্দ হোল, বললাম, আমিও তো কাণপুরে, কোথায় থাকেন আপনি?

আগের মতোই হেসে বললে. পাটকাপুর, ওখানকার ইসাডোরা গার্লস স্কুলেই আমার চাকরী।

মনে মনে সেই রকম একটা কিছু আন্দাজ আমিও করেছিলাম, বললাম, হাউ নাইস? আমিও যে আপনার কাছে থাকি।

তাই নাকি, কোথায়?

বললাম, দি এম্পায়ার লেদার ওয়ার্কস-এ, ওখানেই কোয়ার্টার পেয়েছি।

একটা ভারী শান্ত আর উজ্জ্বল হাসিতে ওর সমস্ত মুখ ভরে উঠলো, বললে, চমৎকার, আশা করি আবার দেখা হবে আপনার সংগে।

বললাম, নিশ্চয়ই!

চারদিকে ভোরের আলো যেন ফুটে উঠেছে। গাড়ীর গতি মন্থর হয়ে আসছে, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, কাছেই ষ্টেশন এসে গেছে। উঠে দাঁড়ালাম।

ষ্টেশনের বাইরে এসে দুটো টাঙা ঠিক করা হোল। আমাদের যাত্রা একদিকেই। গাড়ীতে উঠবার একটু আগে তার সেই স্থূলদেহিনী আত্মীয়াটিকে ডেকে বললে, তোমার সংগে এঁদের তো আলাপই হোল না, অথচ এঁরা আমার যে কি উপকার করেছেন তা বলবার নয়। তার পরে আমার দিকে চেয়ে বললে, ইনি আমার দিদি, এখানকার হাচিন্‌সন্ হাসপাতালের নার্স—আর এঁরা—

দিদি হেসে একটু মাথা নীচু করলেন।

আমিও হেসে গড় করলাম, বললাম, আমাকে আপনারা রায় বলে ডাকবেন, আর ইনি মিষ্টার বসু।

দুজনেই হাসলো। আমার সহযাত্রিনী কুলিকে গাড়ীতে জিনিষগুলি তুলবার ইংগিত ক'রে আমার কাছে এগিয়ে এলো, বললে, আর আমার পরিচয় আমি নিজেই দিই—খানিকটা তো আগেই শুনেছেন, আমার নাম কমলা আয়ার, একদিন দেখা করলে খুসী হবো।

দিদিও মাথা দুলিয়ে হেসে বললেন, সত্যি মিষ্টার রায়, আমরা খুব আনন্দিত হবো।

তার পরে ওদের টাঙা চলে গেলো। আমরাও ঘুরলাম।

টাঙায় বসে কমলা আয়ারকে ভাবতে লাগলাম। ভারী ভালো লাগছিলো।

দিন তিনেক পরে বন্ধু কলকাতা ফিরলেন। তাঁর বিশেষ প্রয়োজন ছিলো, আর তা ছাড়া এক রকম আমার অনুরোধেই তিনি কাণপুরে এ কয়দিন কাটিয়ে গেলেন। যাবার সময় একটু হেসে বলে গেলেন, তুমি জয়যুক্ত হও, এই কামনা করি। আমিও হাসলাম। তখন তো বুঝতে পারিনি এ সব কিছু!

বন্ধু চলে যাবার পরেও আরো গোটাতিনেক দিন কেটে গেলো। ফ্যাক্টরীর কাজে এতো ব্যস্ত ছিলাম যে অন্য কোন কথা ভাববার অবসরই ছিলো না। ভগবান দাসের মেজাজ আজকাল আরো ধারালো হ'য়ে উঠেছে—সেদিন ইন্‌স্‌পেক্টর ইব্রাহিম সাহেবকে যে রকমভাবে আক্রমণ করলে তা ভয়াবহ। আমাকেও যে ঠিক ওই ভাবে কোন দিন বলতে পারে—আজকাল লক্ষ্য করেছি ভগবান দাসের কর্তৃত্ব অনেক বেড়েছে, বিশেষ করে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট হওয়ার পর থেকে। সাবধানে থাকতে হচ্ছে। ওর ওই বৃহৎ আর বিকৃত মুখের কদর্য্য গালাগালির কথা মনে হ'লে আমার সমস্ত শরীর ঘৃণায় শিরশির করে।

সে দিন ফ্যাক্টরী থেকে একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরছিলাম। মল রোডের দিকে একটু দরকার ছিলো। কাজ সেরে ফিরছি। দেখি রাস্তার মোড়ের উপরেই কমলা আয়ার। দূর থেকেই ও আমাকে দেখতে পেয়েছিলো। কাছাকাছি আসতে মাথা নীচু ক'রে বললে, গুড্ ইভনিং মিষ্টার রায়! আমি এর মধ্যে বহুবার আপনাকে আশা ক'রেছিলাম, আপনার বোধ হয় সময় হয় নি?

সেই বড়ো বড়ো দুটি শান্ত আর কোমল চোখের দিকে আমি চাইলাম। আনন্দ যেন চোখ দুটিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, মাথা নীচু করে বললাম, সত্যি তাই, অথচ আমার প্রায়ই আপনার কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করতো।

কমলা আয়ার আবার হাসলে, বললে, আমার পরম সৌভাগ্য মিষ্টার রায়। তবু যাহোক আজকে দেখা হোল। আসবেন আমার ওখানে? সময় হবে এখন?

বললাম, সময়? হাঁ নিশ্চয়ই! চলুন না!

দুজনে চলতে লাগলাম। অনেক কথা হোল। ওর স্কুলের গল্পই বেশী। খানিকটা গিয়েই বাসা। দুজনে ঘরে ঢুকলাম।

সামনে ছোট্ট একটুকরো ফুলের বাগান—দুটো সিঁড়ি পার হ'লেই একখানি সরু বারান্দা। বেশ পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে।

আমাকে নিয়ে গিয়ে ভিতরে বসালো। ছোট্ট একটি ঘর,

কিন্তু বেশ পরিষ্কার। কয়েকখানি ছবি। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের ছবিটা সকলের আগেই চোখে পড়ে। বললে, পাশের ঘরেই দিদি থাকেন। বেরিয়ে গেছেন—আর আপনার সঙ্গে বোধ হয় দেখা হ'বে না।

বললাম, বেশ তো আর একদিন আসবো। কমলা আমার চোখের দিকে চেয়ে আবার একটু হাসলো, আমি দেখেছি, হাসলেই ওর ঠোঁটের কোণে ভারী সুন্দর একটা ভাঁজ পড়তো—ভারী চমৎকার!

বললে, নিশ্চয়ই, আসবেন বই কি! আপনি কি ভাবছেন না হ'লে আমিই আপনাকে সুস্থ থাকৃতে দেবো?

বললাম, না, না, অতোটা কষ্ট আপনাকে করতে হবে না—এবার সময় পেলেই আসবো।

আমার মুখের দিকে চেয়ে বললো, আমার সঙ্গে আপনার আলাপের কথাটা কিন্তু ভারী অদ্ভুত মনে হয়—আপনি নিশ্চয়ই সে রাত্রিতে খুব বিরক্ত হয়েছিলেন?

বললাম, না—তো! বিরক্ত হবো কেন? বরং অন্ধকারে আপনার গায়ের ওপরে প'ড়ে গিয়ে—

কথাটা শেষ করতে দিলে না, হো হো ক'রে কমলা আবার হেসে উঠলো, বললে, কী আশ্চর্য, আপনি পড়ে গেলেন কোথা থেকে? আমিই তো অভদ্রের মতো আপনার পিঠের উপরে পড়েছিলাম—ছি ছি, হাউ রিডিকিউলাস্!

তার মুখে তখনো সেই চাপা হাসির আভাষ!

বললাম, যাই হোক ব্যাপারটা আমাদের তুজনের পক্ষেই ভারী অভিনব।

সেদিন আরো অনেক কথা হলো। তারপরে উঠলাম, বললাম, আজকে চলি, আবার একদিন সময় ক'রে আসা যাবে।

কমলা আয়ার উঠে আমাকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলে, বললে, খুব আনন্দিত হলাম আপনার সঙ্গে কথা বলে, জানেন, মাঝে মাঝে আমি ভারী নিঃসংগ বোধ করি, তখন যদি কাউকে পাই তো বড়ো ভালো লাগে, আজকের সন্ধ্যাটির জন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

একটা ক্ষীণ আত্মপ্রসাদের আবেগ এলো মনে, হেসে বললাম, মিস্ আয়ার, আপনি কি জানেন, আজ আমিই কতোখানি সৌভাগ্যবান? আজকের সন্ধ্যার কথা আমার জীবনে স্মরণীয়, এ আমার মনে থাকবে।

দরজার ওপরে দাঁড়িয়ে আবার ও হাসলে—সত্যিই হাসলে সুন্দর দেখাতো কমলা আয়ারকে!

তিন্‌টে মাস কাটলো তার পরে। আজকাল প্রায়ই সময় পেলে কমলা আয়ারের কাছে যাই। দিদির সঙ্গেও আলাপ হয়েছে, বেশ মানুষ, তবে একটু গম্ভীর, খুব খাসা কথা বলেন, সব থেকে অসুবিধে ওঁকে পাওয়াই মুস্কিল, দিনরাত হাসপাতালের কাজে এতো ব্যস্ত থাকেন যে বলবার নয়।

আজকাল কমলা আয়ারকে যেন আরো নিবিড়ভাবে কাছে পেয়েছি মনে হয়। কথাবার্ত্তার মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতার সুর লক্ষ্য করছি—যা আমার জীবনে একটা স্মরণীয় পরিবর্ত্তন আসতে পারে এ রকম মনে হচ্ছে।

ভাবলাম আমার এই শুক্‌নো চামড়ায় ঘেরা জীবনে কোন অদ্ভুত স্রোত নামবে নাকি? এ কি তারই উপক্রমণিকা।

এদিকেও খানিকটা পরিবর্ত্তন এলো। আজ এই দীর্ঘ আট বছর কাজ করবার পর আমাকে ইন্‌স্পেক্টার করা হোল—ভগবান দাসের অবশ্য এ ইচ্ছাটা একেবারেই ছিলো না, কিন্তু স্বয়ং কর্ত্তা যেখানে উৎসাহিত সেখানে ভগবান দাসের কিছুই করবার নেই!

আমার বেশীর ভাগ সময়ই কমলা আয়ারের সঙ্গে দেশের শিক্ষার বিষয় নিয়ে আলোচনা হোত। একটা জিনিষ আমি ওর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম, সেটা হচ্ছে সমস্ত দেশের জন্যে ওর চিন্তা। বিলেত থেকে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকগুলো বই নিজে খরচ করিয়ে আনিয়েছিলো, প্রায়ই বলতো, দেখুন আমরা বিশেষ ক'রে আমাদের দেশের লোকেরা ছোট ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে বড়ো উদাসীন—অথচ ভেবে দেখুন ওরাই তো জাতির ভবিষ্যৎ, ওদের যদি গোড়া থেকে ভালো ভাবে না গড়ে যায়—তাহলে একটা জাত কি করে আশা করতে পারে তাদের থেকে মহত্তী এবং বিরাট কল্যাণের, আপনারো কি তাই মনে হয় না মিঃ রায়?

মনে আমার অনেক কিছুই হোত, মাথা নেড়ে

বলতাম, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে মিস্ আয়ার? আমারো তো তাই ইচ্ছা করে যে ওদের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা প্রথম থেকেই সচেতন থাকি।

লক্ষ্য করতাম এ প্রয়াসে কমলা আয়ারের চোখে যেন নূতন উদ্যম ভেসে উঠতো, বলতো, জানেন, আমার জীবনের সব থেকে একটা বড়ো এ্যাম্বিশান হচ্ছে ওদের সম্বন্ধে কিছু করে যাওয়া, তাইতো আমি নিজে ইচ্ছে করে এই শিক্ষয়িত্রী-জীবন বেছে নিয়েছি মিষ্টার রায়; এই আমার ভালো লাগে, আমি পড়াতে পড়াতে এক এক দিন এতো আনন্দ পাই যে আপনাকে কি বলবো? কেবলি মনে হয়, আমার হাতে সমাজের কতো বড়ো একটা দায়িত্বের ভার অর্পিত আছে—আমারই হাত থেকে হয় তো একদিন একটি সরোজিনী নাইডু আত্মপ্রকাশ করবে। আপনি ভাবুন মিষ্টার রায় আমার জীবনে সেটা কি কম গৌরবের? কম গর্বের? সে আত্মপ্রসাদ আমি রাখবো কোথায়?

আমি হাসতাম, বলতাম, মিস্ আয়ার, আমার মনে হয়, আপনার মতো এতো বিরাট উদারতার সঙ্গে ক'জন এই শিক্ষাব্রতকে গ্রহণ করেছে জানতে ইচ্ছে হয়—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনার মঙ্গল হোক্। আপনি পারবেন।

কমলা আয়ার মাথা নীচু করতো—এতগুলি কথা বোধ হয় সে আমার কাছে আশা করতে পারে নি, তার পরে একটু ম্লান হেসে বলতো, এইটাই আমার জীবনে সব থেকে বড়ো সাধনা মিস্টার রায়, তবে শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকৃতে পারবো কিনা জানি না।

আশা দিতাম, বলতাম, নিশ্চয়ই হবে—কেন হবে না মিস্ আয়ার?

মাথা নীচু ক'রে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকতো সে, তারপরে বলতো, জানেন, আমি সেদিন আমার ক্লাসের বড় আর ভালো কয়েকটি মেয়েকে ডেকে জিগেস করেছিলাম, তোমাদের জীবনে সব থেকে বড়ো এ্যাম্বিশান কি? তারা কেউ বললে, ডাক্তার হবে, কেউ বললে প্রফেসার, কেউ বললে আইন পড়বে, কারুর ইচ্ছে বিলেত গিয়ে ভালো নার্সিং শিখে আসবে, অনেকে অনেক কথাই বললে, সকলের শেষে একটি মেয়ে এসে আমাকে জানালো, যে সে লেখাপড়া শিখবে বটে কিন্তু কিছু হতে চায় না সে, শুধু তার ভবিষ্যৎ জীবনে সে যেন ভালো ভাবে চলতে পারে।

মেয়েটির কথাগুলি আমার ভারী ভালো লাগলো, সকলকে চলে যেতে বলে আমি তার সংগেই কথা বলতে লাগলাম, দেখলাম তার মধ্যে অতি শৈশব থেকেই সুগৃহিনী হয়ে ওঠার উপাদান বড়ো বেশী—সে স্পষ্টই স্বীকার করলে, সে যাতে তার বিবাহিতা জীবনে সুখী হতে পারে তারই একমাত্র সাধনা তার—এর বেশী আর সে কিছু চায় না। প্রথমতঃ লজ্জায় কিছু বলতে চায় নি। তার পরে আমি অনেক ক'রে ধরাতে এ কথা বলেছে। আমার কিন্তু ভারী ভালো লাগলো মেয়েটিকে মিস্টার রায়! সত্যিই এর সাহস আছে, ভারী আনন্দ হোল, তাকে আশীর্বাদ করলাম যে সে বড়ো হোক—সে উন্নতি করুক। দেখবেন, এই মেয়েটিই হয় তো কালে একদিন উন্নতি করবে।

বললাম, অনেকের থেকেই এ মেয়েটির মনের প্রসার বেশী, অন্ততঃ সত্যি কথা বলবার এর সাহস আছে—আপনি তো বুঝতেই পারছেন, আপনার কাছে যারা প্রফেসার আর ডাক্তার হবার কথা বলেছে তারা মনে প্রাণে নিজের গোপন ইচ্ছাটাকেই চাপা দিয়ে গেছে—হয় তো তারা ইতিমধ্যেই—

বলে থেমে গেলাম, ইংগিতটা প্রচ্ছন্ন রাখলাম।

কমলা আয়ার সেই রকম মুখ নীচু ক'রে আবার ঈষৎ লজ্জার সংগে হাসলো, বললে, শতকরা নিরানব্বই জন মেয়েই ওই রকম মিস্টার রায়, তাই তো মনে হয় এতো বঞ্চনা আর প্রতারণার মধ্যে আমি আমার আদর্শকে গড়বো কি করে? সেই জন্যে মাঝে মাঝে ভয় করে, আমি যা চেয়েছি তা হবে না—শেষ পর্য্যন্ত আমার জীবনে এই স্কুলে পড়ানোর কথাটাই বড়ো হয়ে উঠবে—আয়োজনটাই প্রচুরতরো হবে, ফসল ফলবে না।

আমি হাসতাম এবং তাকে প্রচুর আশা দিতাম, বলতাম, আমার তো মনে হয় না মিস্ আয়ার, আপনার এ নিষ্ঠার দাম আপনি একদিন পাবেনই।

সেদিন বড়ো ফিরতে একটু রাত হয়ে গেলো। বিছানায় শুয়ে কেবলই আমার ঘুরে ঘুরে কমলা আয়ারকে মনে পড়তে লাগলো। বিশেষ করে ওর চোখ—যখন ওর আদর্শ নিয়ে কথা বলছিলো তখন লক্ষ্য করেছি কি উজ্জ্বল জ্যোতি ওর চোখে!

ভগবান দাসের কয়েক দিন থেকে শরীরটা ভালো ছিলো না—ষড়যন্ত্রে পড়ে আমার নাইট ডিউটি আরম্ভ হয়েছে—অনেক আগে কিছুদিন নাইট ডিউটি করেছিলাম। বহু দিন অভ্যাস নেই, কষ্ট হতে লাগলো—বুঝতে পারলাম ভগবান দাস শোধ নিয়েছে—তাকে ডিঙিয়ে ইনসপেক্টার হওয়াটা সে সহ্য করতে পারেনি।

আমার শরীরটা বড়ো অকৃতজ্ঞ। আমার মনে যখন শতবর্ষার উচ্ছল প্লাবনের সমারোহ ঠিক তখনই কিনা আমার এই অপদার্থ শরীর বিদ্রোহ ঘোষণা করলো! আমি শয্যা নিলাম।

ফ্যাক্টরীর কয়েক জন সহকর্মী আমাকে দেখতে এলেন, দেখে তাঁরা বিশেষ ভাবেই চিন্তান্বিত হলেন। তার পরে সব ঘটনা মনে নেই, বোধ হয় ওরা সেই দিনই ডাক্তার এনেছিলো, আমাদেরই ফ্যাক্টরীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চামুরিয়া কোলাপ্পাকে। তার পর আমার কয়েকটা নিশ্ছিদ্র চেতনাহীন দিন কেটে গেছে—যেদিন জাগলাম, সেদিন দেখি ভোর হচ্ছে। অস্পষ্ট অন্ধকারের ছায়া কাঁপছে আমার জানলার বাইরে। আকাশের বড়ো তারাটা আমার চোখের সামনে; একটু ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগলো।

এ-ভোরকে আমার বহু দিন মনে থাকবে। সে যে রঙ নিয়ে আমার জীবনের ওপরে প্রতিফলিত হোল তা স্মরণীয়। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, সেই অন্ধকারের ঈষৎ ছায়ার মধ্যে উৎকণ্ঠিত চোখে, ক্লান্ত শরীরে আমার সামনে কমলা আয়ার বসে রয়েছে।

একটু নড়লাম। চেয়ার টেনে নিয়ে সে আমার আরো কাছে এসে বসলো, খুব আস্তে বললো, একটু ভালো লাগছে মিস্টার রায়?

অতি আস্তে মাথা নাড়লাম। জানাতে চেষ্টা করলাম, ভালো আছি, কিন্তু ঠিক পারলাম না, নিস্তব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম শুধু।

কমলা আয়ার উঠে আমার ওষুধ এবং জল নিয়ে এলো, ভোরেই ওষুধটা বোধ হয় খেতে হবে।

আমি তার দিকে সেই আগের মতোই আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম, একবার মনে হোল ওকি আমার কাছে সারা রাত বসে ছিলো, অনেক কষ্টে বললাম, মিস্ আয়ার, সারা রাত আপনি ছিলেন এখানে?

কমলা আয়ার আবার মুখ নীচু করলো, বোধ হয়। হাসলো একটু, বললে, ও কিছু না, আপনার শরীর এখন ভালো লাগছে তো?

বেশ বুঝলাম, সে খুব আস্তে কথাগুলো উচ্চারণ করছে, কিন্তু ওর সমস্ত চোখে মুখে নিদারুণ উৎকণ্ঠা ফেটে পড়ছে, অথচ কথার মধ্যে দিয়ে তার অত্যন্ত সংযত-প্রকাশ।

বললাম, আন্তরিক ধন্যবাদ মিস্ আয়ার, আমার বেশ ভালো লাগছে—আপনি কেন শুধু শুধু কষ্ট করে সারা রাত এখানে থাকলেন?

কিন্তু লজ্জা পেলাম তখনই যখন ডাক্তার কোলাপ্পা এসে কমলা আয়ারকে দেখিয়ে বললেন, আপনি সৌভাগ্য-বান মিষ্টার রায়, সত্যি কথা বলতে গেলে ইনিই আপনাকে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। আজ চার দিন চার রাত যে অক্লান্ত সেবা আমি দেখেছি—

এর পরে ডাক্তার কোলাপ্পা হয়তো আরো অনেক কথা বলেছিলেন, কি সে সব আজ আর আ[illegible] মনে পড়ে না। মনে পড়ে শুধু স্তব্ধ হয়ে আমি কমলা আয়ারের দিকে চেয়ে মূকবেদনায় আমার সেই রোগশয্যায় শুয়ে ছিলাম, কমলা আয়ার সেখানে থেকে আস্তে আস্তে উঠে গিয়েছিলো। তার পরে যখন সে ফিরলো তখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। মনে হোল সেদিনই যেন আমায় প্রথম ভোর হোল জীবনে।

বিকেলের দিকে অন্যমনস্ক হ'য়ে জান্‌লার দিকে চেয়ে শুয়েছিলাম, কমলা আয়ার এসে ঘরে ঢুকলো, আস্তে চেয়ারটা টেনে নিয়ে আমার কাছে বসলো, বললে, একেবারে প্রথমেই বললে, আপনি বড়ো বেশী ভাবেন মিষ্টার রায়!

বললাম, কি রকম?

কমলা আয়ার হাসলে, বললে, আমার তাই মনে হয়, এতো বেশী ভেবে যদি শরীরকে আপনি উৎপীড়ন করেন তাহ'লে সেটা তো খুবই ক্ষতিকর হবে মিষ্টার রায়!

ভারী ভালো লাগছিলো ওর এই সব কথা উচ্চারণের ভঙ্গী, আমি ওর দিকে চেয়ে রইলাম। তার পরে আস্তে বললাম, মিস্ আয়ার, আমার একটা নিবেদন আছে আপনার কাছে—আপনি কি শুনবেন?

ও হাস্‌লো। সেই অপূর্ব্ব ঠোঁটের উপরে সুন্দর ভাঁজ-পড়া হাসি, বললে, নিশ্চয়ই শুনবো—কি আপনার নিবেদন?

একটু পাশ ফিরে শুলাম, বললাম, আমার প্রতি আপনার এই করুণা চিরকাল মনে থাকবে। মিস্ আয়ার, জানিনা, অনেক সৌভাগ্য ছিল তাই আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়। কিন্তু আমার দিক থেকেও বলবার আছে, আপনিও নিজেকে এই ভাবে আর কষ্ট দেবেন না, অনেক করেছেন, আমি তার জন্যে কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি—শুধু কামনা করি, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

কমলা আয়ার চুপ ক'রে পাথরের ম'তো ব'সে রইলো, কোন উত্তর দিল না। আমিও চুপ ক'রে রইলাম। আমারও সমস্ত কথা যেন গোলমাল হ'য়ে যেতে লাগলো। ভাবলাম আমি হয়তো সম্পূর্ণ অতর্কিতে আঘাত দিলাম ওকে, কেমন যেন একটা ভারী আর বিষণ্ণ ছায়া নামলো আমার মনে।

কমলা আয়ার চুপ করেই বসে রইলো। আমি সব পারি; কিন্তু এই ভীষণ নিস্তব্ধতা সহ্য করতে পারি না। নিজেকে সংশোধন করতে চাইলাম। ঠিক সেই রকমই আস্তে অতি ধীরে বললাম, মিস্ আয়ার, আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না, আমি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা আপনাকে নিবেদন করছি। আমি আ-শৈশব স্নেহের প্রত্যাশী, আমার অতীত জীবনে কখনো কারো হাতের স্নেহের স্পর্শ এসে লাগে নি। জ্ঞান হ'য়ে দেখেছিলাম সামনে আমার অনন্তবিস্তৃত পথ, আজো দেখছি তাই; এবং আমার শেষ দিনের ইতিহাসও সেই পথের সঙ্গে মিলবে—ভয় করে, আপনার মতো পুণ্যবতীর জীবনে এই হতভাগ্যের ছায়া লেগে কোন বিপদ না ঘটে, তাই আমি একথা বলেছি। আপনাকে আমি আঘাত করতে চাই নি মিস্ আয়ার!

তার পরে বেশ মনে আছে, আঙুরের রস খাওয়া নিয়ে আমাদের প্রথম কথা হ'য়েছিলো, সামান্য দু-একটা ছাড়া ছাড়া কথা। তার পরে যাবার সময়ে বলেছিলো, চলি মিষ্টার রায়, আবার দেখা হবে।

আমি হেসে অভিবাদন জানিয়েছিলাম।

পরের দিন কমলা আয়ার এলো না, আমি জানতাম সে আসবে না। সে যে আসবে না, সে কথা তো আমিই বলে দিয়েছি। তবু সমস্ত দিন আমার দেহের প্রত্যেক শিরা উপশিরা উৎকর্ণ হয়ে রইল, মনে হ'ল কে যেন আসছে, সে যেন আসবে, তারই পায়ের শব্দ আমি এখনি শুনবো।

কয়েকটা দিন কাটলো। আজকাল বিছানা থেকে উঠে বাইরে বারান্দার উপরের ইজিচেয়ারটায় গিয়ে বসতে পারি। পারি বটে, কিন্তু তার জন্যে আমাকে অনেক মূল্য দিতে হয়—সমস্ত শরীর আমার থরথর ক'রে কাঁপে, বুকের মধ্যেটা কেমন যেন খালি খালি মনে হয়—চোখে ভালো দেখতে পাই না, কোন রকমে এসে ইজিচেয়ারটায় বসি।

সেদিন বিকেলেও বারান্দার ধারে এসে বসেছিলাম। সামনে মাঠের উপরে ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছে, আকাশের কোণে কোণে সাদা মেঘ ইতস্তত: ছড়িয়ে রয়েছে, চারদিকেই যেন চমৎকার একটা আনন্দের প্রবাহ। আমি বসে রইলাম।

চার দিন হ'ল কমলা আয়ার আসে নি। জানি না, সে কি ভেবেছে, আমি তো তাকে একেবারে আসতে বারণ করি নি। মাঝে মাঝে মনে হয়, সেও কি অসুস্থ হ'য়ে পড়লো আমারই মতো? ইচ্ছে করে চাকরটাকে পাঠাই—কিন্তু পারি না, কেমন যেন সংকোচ আসে, কেমন যেন দ্বিধা।

ক্লান্ত চোখে সামনের রাস্তার দিকে চেয়েছিলাম, দেখলাম কমলা আয়ার আসছে, হাতে তার সেই ছোট্ট একটা ভ্যানিটী ব্যাগ আর ছাতা!

ইজিচেয়ার থেকে উঠবার চেষ্টা করলাম, কমলা আয়ার হেসে বসে থাকতে ইংগিত করলো, আমি বললাম, আপনি দীর্ঘকাল বাঁচবেন মিস্ আয়ার। এই মাত্র আমি আপনার কথা ভাবছিলাম।

কাছেই একটা মোড়া ছিলো, টেনে নিয়ে কমলা আয়ার বসলো, বললে, ধন্যবাদ, কিন্তু নিজের কথার থেকেও বড়ো সংবাদ আমার দরকার, সেটা আপনার শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে, কেমন আছেন?

বললাম, আপনাদের শুভকামনায় ভালোই, তার পরে একটু থেমে বলতে যাচ্ছিলাম, কেন আসেন নি এতদিন, কি ক'রে যে সময় কাটিয়েছি আমি—সামলে নিলাম, বললাম, অনেক দিন আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি, মিস্ আয়ার।

কমলা আয়ার হাসলো, বললে, হ্যাঁ সময়ই পাচ্ছিলাম না মোটেই—নানা রকম কাজের ভীড়ে হাঁপিয়ে উঠেছি, তার ওপরে দিদি আবার ব্যাঙ্গালোর চলে গেলেন।

তাই নাকি? আমি বললাম।

হ্যাঁ, কমলা আয়ার ব্যাগটা টেবিলের উপরে রেখে দিলে, ওর এক বন্ধুর বিয়ে, না গেলে খুবই দুঃখিত হ'ত।

অনেক কথা হ'ল সেদিন। সমস্ত সন্ধ্যেটা বেশ কাটলো আমাদের।

অনেক রাত্রে কমলা আয়ার উঠলো, যাওয়ার সময়ে বলে গেলো আবার দেখা হবে।

তা তো হবেই—হবে না এ কথা তো কোন দিন আমি ভাবি নি।

কমলা আয়ার কি আমার মনের সূক্ষ্ম শিরা উপশিরা-গুলিকে পড়তে পারতো? তাই কি বারে বারে যাবার সময়ে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতো, আবার দেখা হবে?

হয়তো তাই!

কয়েকটা দিন কাটলো। 'দি এম্পায়ার লেদার ওয়ার্কস' আমাকে আরো ছুটি দিলো—অনেক দিনের পুরোনো চাকর আমি, আর তার ওপরে রীতিমত প্রভুভক্ত, দীর্ঘদিন আমার ছুটির প্রয়োজন হয় নি, ভগবান দাসের ঘোরতর বাধার প্রাচীরের মধ্য দিয়েও ছুটির আলো এসে আমার ঘরকে উদ্ভাসিত করলো।

ডাক্তার কোলাপ্পা একদিন বিকেলে এসেছিলেন, বলে গেলেন, একটু বিশ্রাম করুন মিষ্টার রায়—অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রমে আপনি ভেঙে পড়েছেন। রেষ্ট নিলেই ভালো হয়ে যাবেন।

তাই নিলাম। সত্যিই বিশ্রাম দরকার।

আজকাল সন্ধ্যার আগে একটু রাস্তা দিয়ে বেড়িয়ে আসি, মন্দ লাগে না, একদিন সেই রকম সন্ধ্যার আগে বেড়াতে বেড়াতে এসে কমলা আয়ারের ঘরে ঢুকলাম।

কমলা আয়ার বাড়ী ছিলেন না, চাকরটা আমাকে যত্ন করে বসালে, বললে, মিস্ আয়ার এখুনি আসবেন, আপনি বসুন।

একটু পরেই কমলা আয়ার এলো, আমাকে দেখে আনন্দে সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো, বললো, আপনি এসেছেন মিষ্টার রায়, আমি কাল সারাদিনের মধ্যেও একবার যেতে পারি নি—শরীর বেশ ভালো আছে তো?

বললাম, খুব সুস্থ বোধ করছি, একটা বনচারী পশুর মতো আমি সুস্থ মিস্ আয়ার!

কমলা আয়ার এবারে হো হো ক'রে হেসে উঠলো, বললে, চমৎকার কথা বলেন আপনি মিষ্টার রায়—বসুন একটু চা করি।

তার পর কমলা আয়ার নিজের হাতে সেদিন আমার জন্যে চা তৈরী করলো, তার সঙ্গে আরো নানা রকম উপকরণ, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের গল্প হোল।

যাবার সময়ে বললাম, একটা কথা ছিলো মিস্ আয়ার, এতক্ষণ সুযোগ পাচ্ছিলাম না, আপনি কি শুনবেন এখন?

আমার চোখের দিকে একটু তাকালো সে, তার পরে বললে, বেশ তো, বলুন না।

কিন্তু ভারী সঙ্কোচ বোধ করছি, আমি বললাম, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহ'লে বলি।

কমলা আয়ার হাসলো, বললে, কোন সংকোচেরই প্রয়োজন নেই আপনার। আপনি বলুন, আমি আনন্দের সঙ্গে শুনছি।

আগামী বারে সমাপ্য

সঞ্চয়ন

বিদেশী পত্রিকা হইতে

ভারতীয় অচল অবস্থার অবসান

[এশিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত বার্ট্রাণ্ড রাসেলের To End the Deadlock in India শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ]

[এই প্রবন্ধের রচয়িতা বার্ট্রাণ্ড রাসেল সুবিজ্ঞ গণিতশাস্ত্রবিদ্ এবং দার্শনিক হিসাবে পৃথিবীপ্রসিদ্ধ। ভারতীয় জনমত কর্ত্তৃক স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ভারতে বর্ত্তমানে যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে অন্যান্য অনেক উদারনৈতিক ইংরেজের মত মিঃ রাসেলও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি যে কিরূপ ব্যগ্র, তা আমেরিকার 'এশিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত বর্ত্তমান প্রবন্ধটি পড়লেই বোঝা যাবে।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের ব্যর্থতার ফলে ভারতীয় সমস্যা আজ সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের অন্যতম সমস্যায় পরিণত হয়েছে—কারণ যুদ্ধে জয়ী হতে হলে এ সমস্যা সমাধানের একান্ত প্রয়োজন। সমস্যাটিকে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা প্রয়োজন: ভারত ও গ্রেট বৃটেনের পারস্পরিক সম্বন্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে, যুদ্ধ পরিচালনার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সমরোত্তর বিধিব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে। অবশ্য এর সবগুলোর মধ্যেই অন্তর্সংযোগ আছে।

ভারতবর্ষ এবং গ্রেট বৃটেনের সম্বন্ধের দিক থেকে দেখতে গেলে, স্পষ্টই বোঝা যায় যে ক্রিপসের প্রস্তাব বহু বৎসর পূর্ব্বেই উপস্থিত করা উচিত ছিল; ক্রিপস এবং তাঁর মত উদারনৈতিক ইংরেজের মনোভাব তাই। প্রকৃত প্রস্তাবটি নানা দিক থেকে কংগ্রেস দলের দাবী মেটাতে পারে নি। তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান কথা এই যে তারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন চায় নি—চেয়েছিল পূর্ণ স্বাধীনতা; কিন্তু যখন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে বহির্গমনের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, তখন এ প্রশ্নটা তত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজাদের সঙ্গে তাদের সন্ধি অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিল—এ সব সন্ধি করা অবশ্য উচিত হয় নি—কিন্তু বর্ত্তমানে ন্যায়ই হোক্ আর অন্যায়ই হোক্, রাজাদের রাজ্যে প্রাচীন এবং প্রায় ক্ষেত্রেই খারাপ এক প্রকার শাসনপদ্ধতিকে সমর্থন করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। আমার মনে হয় যে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর কোন সমাধানের উপায় খুঁজে পাওয়া যেত। তৃতীয়ত, এই প্রস্তাবে কোন প্রদেশকে উপনিবেশের বাইরে থাকবার কিংবা অন্যান্য বহির্গমনেচ্ছু প্রদেশের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভিন্ন উপনিবেশ স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস দল প্রস্তাবের এই অংশের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু আমার মনে হয় যে সেটা তাদের পক্ষে অন্যায় হয়েছিল। হিন্দুদের যেমন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হাত থেকে স্বাধীন হবার অধিকার আছে, তেমনি ভারতের কোন রাজনৈতিক দল যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দ্বারা শাসিত হতে না চায়, তবে তাদেরও হিন্দুদের হাত থেকে মুক্তি পাবার অধিকার থাকা উচিত। কংগ্রেস নেতারা দাবী ক'রেছিলেন যে, ভারতকে অখণ্ডভাবে গ্রহণ করতে হবে কিন্তু এ সমস্যাটা আয়র্লণ্ডের সমস্যারই অনুরূপ। ডি ভ্যালেরা স্বীকার করতে চান না যে দক্ষিণাংশবাসী আইরিশদের যেমন বৃটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার অধিকার আছে উত্তরাংশ-বাসী আইরিশদেরও তেমনি দক্ষিণাংশবাসীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার অধিকার আছে। এই সব এবং অন্যান্য দিক থেকে বিচার করে আমার মনে হয় যে, ভারতবর্ষ ক্রিপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ভুল করেছে।

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে যুদ্ধ পরিচালনা বিষয়ক প্রশ্নও জড়িত ছিল। এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান আমার নেই—কাজেই এ বিষয়ে ন্যায়-অন্যায় বিচার করা মুস্কিল। স্পষ্টতই যুদ্ধ পরিচালনা বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়ার সমান মর্যাদা ভারতবর্ষকে দেওয়া উচিত ছিল। এ বিষয়ে অবশ্য অসুবিধা ছিল এই যে অতীত বৃটিশ রাজনীতির

ফলে সমরপরিচালনা বিষয়ক যথোপযুক্ত অভিজ্ঞতা ভারতীয়দের নেই।

এ যুদ্ধের বাস্তবতা সম্বন্ধে বৃটিশ এবং ভারতীয় উভয়েই অন্ধ বলে মনে হয়। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ইচ্ছা যাই হোক্, এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এশিয়ায় বৃটিশের সাম্রাজ্য শেষ হয়েছে এবং বিচার করে দেখতে গেলে জাপানের মত নিকৃষ্টতর সাম্রাজ্যবাদ যদি সেখানে বিস্তার না করে, তবে এতে অনুতাপের কোন কারণ নেই।

বৃটিশরা যখন ভারত জয় করেছিল তখনকার দিনের সঙ্গে আজকের দিনের অনেক তফাৎ। তখন তাদের একমাত্র প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ফরাসী জাতি—তারাও বৃটিশ নৌশক্তির কাছে পরাজিত হয়েছিল। ভারতীয়দের মধ্যে কোন জাতীয় প্রেরণা ছিল না; বিজয়ী মুসলমান বিদেশী শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন দুশ্চরিত্র, শাসনকার্য্যে অযোগ্য এবং অত্যাচারী। খুব সামান্য সৈন্যের সাহায্যে ভারতীয় সাম্রাজ্য দখল করা হয়েছিল এবং মর্যাদা ও ভাঁওতার জোরেই সে সাম্রাজ্য টিঁকে ছিল। দেশের অসামরিক শাসনকার্যের ভার ন্যস্ত আছে ছয় শত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হাতে এবং সশস্ত্র সৈন্যের সংখ্যা খুবই কম। গবর্ণমেন্ট যদি সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন না হত এবং সাধারণত বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদ যেমন প্রশংসনীয় হয়, সেরূপ না হত, তবে ত্রিশ কোটি লোককে এরূপ কমসংখ্যক সৈন্য দিয়ে শাসন করা অসম্ভব হত। এখন প্রাচ্যে একটি বড় সামরিক শক্তি ইংরেজদের যুদ্ধার্থে আহ্বান করেছে বলেই, একটা ভ্রান্তিজনক অযোগ্যতার প্রশ্ন উঠেছে—কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় শুধু মর্যাদায় আর চলে না। বর্ত্তমানের ব্যর্থতায় নয়—অতীতের সাফল্যই আশ্চর্য্যজনক।

যখন আমরা গ্রেট-বৃটেনের লোকসংখ্যার কথা বিবেচনা করি, তখন স্পষ্টই বোঝা যায় যে আধুনিক অবস্থায় সাম্রাজ্য রক্ষা সম্ভব নয়—যদি বৃটিশরা আজ সম্পূর্ণরূপে সামরিক জাতিতে পরিণত হয় এবং পরিপূর্ণ ভাবে সামরিক বৃত্তিতে আত্মনিয়োগ করে, তবুও নয়; অবশ্য সাম্রাজ্য হারানোর চেয়ে এর ফল হবে আরও বেশী শোচনীয়—অন্যের সাহায্য ছাড়া সমান সামরিক শক্তিসম্পন্ন লোকসংখ্যায় দিক থেকে বৃহত্তর এবং আলোচ্য অঞ্চল থেকে নিকটতর একটি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারব না। তা ছাড়া বিজয়ের ভিত্তিতে সংগঠিত সাম্রাজ্য প্রায়ই অবশ্যম্ভাবী রূপে ক্ষণস্থায়ী হয় এবং তাই হওয়াও উচিত। যে রকমের নৈপুণ্যের দ্বারাই সে বিজয় সম্ভব হোক না—কালে বিজিত জাতি সে নৈপুণ্য শিখবে কিম্বা বিজয়ীরা সে নৈপুণ্য হারাবে। প্রথমে যদি বিজয়ীদের মধ্যে উচ্চতর স্তরের সভ্যতা থাকে, তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে বিভিন্নতা কমে আসতে বাধ্য। বিজিত দেশকে শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য একত্রীভূত করতে হবে এবং বিজিত জাতি, আজ হোক্ কাল হোক্, তাদের স্বাধীনতা দাবী করবে এবং ফিরিয়ে নেবে।

আর তা ছাড়া বর্ত্তমানে সাম্রাজ্য আর আগের মত প্রয়োজনীয় নয়। স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী থাকা সত্ত্বেও আমাদিগকে শীঘ্রই জার্মানদের মত কৃত্রিম রবার ব্যবহার করতে হবে এবং অন্য কোন জায়গা থেকে যদি টিন সরবরাহ যথেষ্ট পরিমাণে না হয়, তবে টিনের পরিবর্ত্তে অন্য কিছু আবিষ্কার করতে হবে। তখন আর আমাদের কাছে মালয়ের কোন গুরুত্ব থাকবে না। যান্ত্রিক উন্নতির ফলে বিশেষ বিশেষ কাঁচা মালের মূল্য আগের চেয়ে কমে আসছে—অবশ্য যদি অন্য কাঁচা মাল তার বদলে পাওয়া যায়। বুদ্ধির প্রাখর্য এবং বৈজ্ঞানিক নিপুণতার ফলে পৃথিবীর সুদূর ভূখণ্ডের উপর অধিকার বিস্তারের প্রয়োজন আমাদের কমে আসছে।

এই সব দিক থেকে বিবেচনা করলে এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, এশিয়া কি স্বাধীনতা পাবে, না জাপান এবং জার্মানী তাকে ভাগভাগি ক'রে নেবে। জাপানীদের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভারতে দেশপ্রেমের প্রবল উৎসাহ জাগানো এবং জাপানীরা পরাজিত হ'লে ভারতবাসীরা যে স্বাধীন হবে অসন্দিগ্ধভাবে এ কথাটা বিজ্ঞাপিত না হ'লে, এটা করা সম্ভব নয়। ইংলণ্ড যদি ভারতবর্ষের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার নীতি ঘোষণা করে এবং বিশ্বাস জাগানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র যদি সে নীতির জামিন হয়, তবে ইংলণ্ডের পক্ষ থেকে

সেটা শুধু উদার মনোবৃত্তির পরিচয় হবে না, সমর-কৌশলের দিক থেকেও সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রক্ষণশীল সভ্যদের মনে যদি এশিয়ার সাম্রাজ্যরক্ষার কিঞ্চিৎমাত্র আশাও থাকে, তবে নিরাশ-জনক ঐতিহাসিক ভুল ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। ব্রহ্মদেশে ইতিমধ্যেই ফলাফল নির্দ্ধারিত হয়ে গেছে; ভারতেও একই ফল হবে। আমরা জাপানীদের পরাজিত ক'রে উপকার করতে পারি কিংবা অপকার করার চেষ্টায় জাপানীদের দ্বারা পরাজিত হ'তে পারি। কিন্তু বৃটিশ রক্ষণশীল সভ্যরা একথা অনুধাবন করতে চাইবেন না। ভারতীয়রাও সমানভাবে অন্ধ। জাপানীরা যদি পরাজিত হয়, তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা একথা স্বীকার করতে যতই অনিচ্ছুক হোক—ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আসবে; কিন্তু জাপানীরা যদি জেতে, তবে ভারত ইংলণ্ডের অধীনতার চেয়েও নিকৃষ্টতর দাসত্ব-যন্ত্রণা ভোগ করবে। কাজেই ব্রিটিশ নীতির প্রতি বিরাগ থাকা সত্ত্বেও ভারতের পক্ষে নিজের মঙ্গলের জন্য এ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করা উচিত।

এ যুদ্ধে জাপানের প্রবেশের ফলে এশিয়ার স্বাধীনতা-বিষয়ক নতুন একটি প্রশ্নের উদ্ভব হ'য়েছে। একমাত্র চীনদেশে ছাড়া, এটা অবশ্য আমাদের যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এটাই আমাদের বিজয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে। জাপানকে যদি সহজে এবং তাড়াতাড়ি হারিয়ে দেওয়া যেত, তবে অবশ্য এ পরিণতি নাও হ'তে পারত; কিন্তু ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে তাতে ব্রিটিশরা মালয় দেশ পুনরায় জয় করা কিংবা ভারত ও ব্রহ্মদেশকে অধীন জাতি হিসাবে ধরে রাখার আশা করতে পারে না এবং সে রকম ইচ্ছা তাদের থাকাও উচিত নয়। এই কথা উপলব্ধি করা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় এবং যে জন্য আমরা যুদ্ধ করছি তার ফল স্বরূপ এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের অবসান আমাদের সজোরে ঘোষণা করা উচিত। এ বিষয়ে আমেরিকার জনমত খুব প্রভাবশালী। এটা আশা করা যায় যে, সুযোগ ফুরিয়ে যাবার আগেই ব্রিটিশদের উদ্যোগে না হোক, আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের বন্ধুতাপূর্ণ মধ্যস্থতার ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সাথে আবার আলাপ-আলোচনা সুরু হবে। চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থতা ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক হবে এবং হয়ত সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের পক্ষেও বিপজ্জনক হবে।

মিঃ চার্চিল যে একজন পুরোদস্তুর সাম্রাজ্যবাদী—যুক্তরাষ্ট্রে একথা যথেষ্টভাবে উপলব্ধি হয় বলে আমার মনে হয় না। রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্ট যখন ভারতে কিছু পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের জন্য একটি বিল উপস্থাপিত করেছিলেন—তখন মিঃ চার্চিল তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন; অবশ্য তাঁর প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও বিলটি পাশ হয়েছিল। এ বিষয়ে তিনি রক্ষণশীলদের চেয়ে নিজেকে আরও বেশী রক্ষণশীল বলে প্রমাণিত করেছিলেন। যুদ্ধের প্রয়োজনের ফলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা বদলেছে বটে, তবে যথেষ্ট বদলায় নি; অদূর ভবিষ্যতে যথেষ্ট পরিমাণে বদলাবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তাঁর সাহস এবং বিপদের দিনে লোকের মনে বিশ্বাস জাগানোর ক্ষমতার প্রশংসা না করে পারা যায় না; কিন্তু তিনি অতীতকালের মধ্যে বেঁচে আছেন—তার মধ্য থেকেই তাঁর গুণগুলির বেশীর ভাগের উদ্ভব হয়েছে; তখন পৃথিবীতে ব্রিটেন যে অংশ অভিনয় করতে পারত আজ আর সেটা সম্ভব নয়।

তাই ব'লে প্রাচীন ধরণের সাম্রাজ্যবাদের অবসানই শুধু একমাত্র কাম্য নয়। নামে পূর্ণ স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্যবাদী আদর্শ—আজকের দিনে কোন দেশের পক্ষে সেটা আর সম্ভব নয়। ডেনমার্ক, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, রুমানিয়া, গ্রীস এবং যুগোশ্লাভিয়া—এরা প্রত্যেকেই পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিল—কিন্তু এর ফলে দেখা গেল, শেষ পর্য্যন্ত তারা নাৎসীদের দ্বারা বিজিত হয়েছে। যদি কোন দেশ স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনতা চায়—তবে বিদেশী শত্রুর পক্ষে সে দেশ বিজয় সহজ হবে—যুক্তরাষ্ট্রও এ বিষয়ে ব্যতিক্রম নয়। প্রত্যেক দেশের মত আত্মরক্ষা বিষয়ে ভারতেরও সাহায্যের দরকার আছে; অন্যান্য দেশের মত সেও এই স্পষ্ট কথাটা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকতে চায়, তবে যে সব দেশ বিজয় করতেও চায় না কিংবা বিজিত হ'তেও চায় না, তাদের সঙ্গে তাকে আত্মরক্ষামূলক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হ'তে হবে। ভারতীয়

জাতীয়তাবাদীরা ব্রিটিশদের অধীন স্বায়ত্ত-শাসন-সম্পন্ন জাতিসঙ্ঘে যোগ দিতে আপত্তি করেন; কিন্তু শুধু ব্রিটিশ শাসিত নয় এমন একটি জাতিসঙ্ঘে যোগ দিতে তাঁরা বোধ হয় আপত্তি করবেন না—বিশেষ ক'রে এই জাতি-সঙ্ঘকে যদি ভৌগোলিক বিভাগে বিভক্ত করা হয় এবং ভারত যদি প্রাচ্য বিভাগের অন্তর্গত হয়। এ বিষয়ে আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যগুলোকে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার ইচ্ছার অভাব আছে। যদি আমরা এ ধরণের একটা জাতি-সঙ্ঘ গঠন আমাদের যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করতাম, তবে শান্তি স্থাপিত হলে ভারতকে তার সভ্যপদ আমরা অর্পণ করতে পারতাম। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে অংশীদার করতে পারি কিংবা তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে পারি। শেষোক্ত ব্যাপারটি ভারতীয় জনমতের কাছে যতই লোভনীয় হোক্, এটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

কেহ কেহ মনে করেন যে জার্মানী, জাপান আর ইটালী পরাজিত হলেই আমরা সুখী হব এবং পরে চিরকাল ধর্ম্মভাবে জীবনযাপন করব। অবশ্য এ মতটা নিতান্তই শিশুসুলভ। জাতিবিশেষ তখনই আক্রমণোদ্যত হয়, যখন সে মনে করে যে আক্রমণের ফলে তার লাভ হবে। এমন কোন প্রতিষ্ঠান যদি না থাকে যার অস্তিত্বের ফলে আক্রমণকারীরা নিশ্চিতরূপে পরাজিত হবে, তবে বর্ত্তমান শান্তির বিঘ্নোৎপাদনকারী দস্যুরা পরাজিত হ'লেও, নতুন দস্যুর আবির্ভাব হবে। আর আন্তর্জাতিক ব্যাপারে মামুলি স্বাধীনতাই যদি ঠিক নীতি বলে বিবেচিত হয়, তবে এ রকম কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

এই সব কথা বিবেচনা ক'রে ভারতীয় অচল অবস্থার সমাধানের জন্য কি করা উচিত?

প্রথমত, সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের ঘোষণা করা উচিত যে তাঁরা যুদ্ধের পরে আত্মরক্ষামূলক এমন একটি জাতিসঙ্ঘ গঠন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যার কাজ হবে এই জাতি-সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত কোন সভ্যের বিরুদ্ধে অন্য কোন শক্তির আক্রমণে সম্মিলিত সশস্ত্র প্রতিরোধ।

দ্বিতীয়ত, ভারতকে যুদ্ধের পরে জাতিসঙ্ঘের প্রাচ্য-বিভাগে যোগদানের সর্ত্তে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে; যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে অছি থাকবে।

তৃতীয়ত, যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন ভারতবর্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্গত যে কোন জাতির যত সংখ্যক খুসী সশস্ত্র সৈন্য পাঠানোর অধিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর-পরিষদের থাকবে। এই রকম সৈন্যদলের সেনাপতি ইংরেজও হবে না—ভারতীয়ও হবে না।

চতুর্থত, আত্মরক্ষার জন্য ভারতকে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করতে হবে; ভারতের বাইরে এসব সৈন্যকে পাঠানো হবে না বটে—তবে সামরিক কর্ত্তব্যে নিযুক্ত থাকার সময় ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ তাদের মেনে চলতে হবে। এই আত্মরক্ষায় নিযুক্ত সৈন্যদলের বে-সামরিক অংশের কর্তৃত্বভার কিন্তু থাকবে ভারতীয়দেরই হাতে। অষ্ট্রেলিয়ায়ও ঠিক এমনি পরিস্থিতি বিদ্যমান।

ভারতের সর্বপ্রকার আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন, যেমন রাজাদের অবস্থা, হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ এবং কোন বিশেষ প্রদেশ কিংবা কয়েকটি প্রদেশের বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার অধিকার প্রভৃতি ভারতীয় জনমতের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। যুদ্ধের পরে যথাসম্ভব শীঘ্র একটি সর্বভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ গঠন ক'রে সেখানে এসব প্রশ্নের সমাধান হবে। এ ব্যবস্থার ফলে যদি গৃহ-যুদ্ধের উদ্ভব হয়, সেটা সম্পূর্ণ ভারতেরই ব্যাপার, অন্য কারও নয়। আমাদের কালে আমরা সবাই গৃহ-যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু তার জন্যে বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপকে অভ্যর্থনা করিনি।

সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহ যদি অদূর ভবিষ্যতে আত্মরক্ষামূলক জাতিসঙ্ঘ গঠন বিষয়ে একমত হতে পারেন, তবে উপরোক্ত প্রথম দফা এবং দ্বিতীয় দফায় জাতিসঙ্ঘের উল্লেখ বাদ দিতে হবে—কারণ সময় বড় কম।

এইরূপ পরিকল্পনার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি আছে।

প্রথমত, ভারত যে এটা গ্রহণ করবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই এবং বর্ত্তমানের উৎসাহশূন্যতা কাটিয়ে সে যুদ্ধ প্রচেষ্টা সর্বান্তকরণে সমর্থন করবে।

দ্বিতীয়ত, এরূপ প্রস্তাবে আমাদের যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা

খুব বেশী বেড়ে যাবে এবং বিশেষ ক'রে এর ফলে নাৎসী ও জাপানীদের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত এ প্রস্তাবে ভারতকে তার ন্যায্য দাবীর চেয়ে বেশী কিছু দেওয়া হচ্ছে না; আমরা বলি যে, আমরা স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করছি, কিন্তু বর্তমানে একমাত্র চীন ছাড়া এশিয়ার সকল অংশের বিষয়ে এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

চতুর্থত, তখন নিঃসন্দেহে এ যুদ্ধের এমন একটা উদ্দেশ্য দাঁড়িয়ে যাবে যার অন্তর্নিহিত কল্যাণ-প্রচেষ্টা যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিশালতার সঙ্গেই তুলনীয় হবে; তখন যুক্তরাষ্ট্রের ও স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দেশগুলোর স্বাধীনতা রক্ষা এবং ইউরোপের বিজিত দেশগুলোর স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনাই এ যুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য হবে না—প্রাচ্যের বিপুল জনগণকে সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি দেওয়াও এ যুদ্ধের একটি লক্ষ্য হবে।

এ রকম উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ জয় করায় লাভ আছে এবং যুদ্ধ জয় করা সম্ভব। এ রকম উদ্দেশ্য না থাকলে, হয়ত ঘৃণ্য মারামারির মধ্যেই এ যুদ্ধে হারতে হবে।*

উরালের পরে

[সোভিয়েট ইউনিয়ন নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মর্মানুবাদ]

সোভিয়েট রাশিয়ার উপর জার্মান আক্রমণের পূর্বে রাশিয়ার যে বৃহত্তর অংশ উরাল পর্বতশ্রেণী ও সুদূর প্রাচ্য সীমার মধ্যে অবস্থিত তার প্রতি খুব কম সংখ্যক লোকই দৃষ্টি দিত। অবশ্য এই সুবৃহৎ ভূ-খণ্ডটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকেরা সচেতন ছিল এবং তারা ওমস্ক্, চৌমস্ক প্রভৃতি অদ্ভুত নামধারী ট্রান্স্-সাইবেরীয় সহরগুলোর কথাও বলত, কিন্তু অন্যথা কেউ এশিয়াস্থিত এই সুবৃহৎ সোভিয়েট রাজ্য নিয়ে মাথা ঘামাত না।

এশিয়াস্থিত রাশিয়ার যে গুরুত্ব নেই সোভিয়েট রাশিয়াই এই ধারণা লোকের মনে সৃষ্টি করে দিয়েছিল—তার কারণ এই যে এই বিস্তৃত রাজ্যে তাদের অনেক কিছু করার ছিল এবং তারা মনে করত যে বাইরের জগতের বাধা না পেলে তারা তাদের উদ্দেশ্য আরও সহজে সিদ্ধ করতে পারবে। ট্রান্স-সাইবেরীয় রেলপথে মস্কো এবং ভাডিভোস্টকের মধ্যে কোন বিদেশী ভ্রমণকারী নামতে পারবে না—এই মর্মে একটি আইন পাশ করা হয়েছিল। আকস্মিক ভ্রমণকারীরা যাতে কাস্পিয়ান সাগর পার না হয় তার চেষ্টা করা হ'ত এবং ইউরোপীয় রাশিয়া দেখার জন্য এত সুন্দর ভ্রমণ ব্যবস্থা করা হ'ত যে বিদেশী ভ্রমণকারীরা সহজেই ভৌগোলিক জ্ঞান হারিয়ে মনে করত যে ইউরোপীয় ঔৎসুক্যের বাধাস্বরূপ যে উরাল পর্বতশ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে সেখানে যে রাশিয়া শেষ হ'য়ে গেছে তারই শুধু গুরুত্ব আছে।

অথচ রাশিয়ার মধ্যে সবাই তাকিয়ে থাকত পূর্ব দিকে—সবাই বলত: "আপনার এশিয়াস্থিত রাশিয়া দেখা প্রয়োজন"। আমি এ কথাটা এতবার শুনেছিলাম যে এটা আমার কাছে একটা পরিচিত গানের অংশ বিশেষ হ'য়ে উঠেছিল এবং আমি বুঝতে সুরু করেছিলাম যে নতুন রাশিয়ার সমৃদ্ধির গোপন তথ্য লুকিয়েছিল সাইবেরিয়া ও তুর্কিস্তানের অভ্যন্তরে। কাজান, স্ট্যালিন-গ্রাড প্রভৃতি ভলগার সহরে আমি এটা বিশেষ করে অনুভব করেছিলাম এবং আমি যে স্থানকে রাশিয়ার হৃদয় ব'লে মনে করতাম সেখানে যাবার সুযোগ পাওয়া মাত্রই সেটা সানন্দে গ্রহণ করেছিলাম।

আমি যে কি দেখতে পাব সে সম্বন্ধে আমার তখনও কোন ধারণা ছিল না। ভার্ডলোভস্ক্ না দেখা পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে সহরও বোধ হয় একটা ধ্বংসোন্মুখ দৃশ্য ছাড়া আর কিছু হবে না। আমি বিস্মিত হ'য়ে দেখলাম যে এ সহরটা দ্বিতীয় খারকোভ্—বিরাট বিরাট আকাশচুম্বী বাড়ী, আলো-বাতাসভরা শ্রমিকদের আবাস-গৃহগুলিতে সুন্দর আধুনিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও শ্রম-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আর পার্কে লোকেরা মস্কোর সুমধুর অর্কেষ্ট্রা শুনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাচ্ছিল। স্কুলগুলিতে রাশিয়ান যুবকেরা ভার্ডলোভস্কের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যবসার এঞ্জিনিয়ারিঙে প্রবেশের জন্য সাগ্রহে পড়াশুনো করছিল।

আমি যে-যে রুশ সহরে ভ্রমণ করেছি, সর্বত্র আমি

কারখানায়, রেলপথে, স্থাপত্যে ও এঞ্জিনিয়ারিংএ নারী কর্মীদের দেখেছি—তারা পুরুষদের সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করে এবং অনেক সময় আমার মনে হ'ত যে তারা কেউ কেউ তাদের শারীরিক শক্তির অতি ব্যবহার করছিল—কেন না ত্রিশ বৎসরের এমন অনেক জীর্ণ-শীর্ণ মেয়েকে দেখেছি যারা বস্তুত নুয়ে পড়েছিল; কিন্তু ভার্ডলোভস্কে দেখেছি সব বীর রমণী যারা বিস্ময়জনক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কঠিন কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের কাজ অনায়াসে সম্পন্ন করে। ভোরবেলা যখন এই সব দৃঢ়-কায়া বর্গ-স্কন্ধাকৃতি মেয়েরা শোভাযাত্রা ক'রে কারখানায় যেত তখন আমি বিস্মিত হয়ে সেই দৃশ্য দেখতাম। উজ্জ্বল নেত্রে বাদামী রঙের মুখ নিয়ে তারা প্রফুল্ল চিত্তে রাস্তা দিয়ে দুলতে দুলতে যেত এবং আমি যখন ভীরুতার সঙ্গে তাদের দু-এক জনের কাছে মন্তব্য করেছিলাম যে তাদের কাজ অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হয়, তখন তারা আমার মন্তব্যকে একটা সুবৃহৎ পরিহাস ব'লে মনে করেছিল।

খুব শীঘ্র ভার্ডলোভস্কের দিন কেটে গেল এবং অতি শীঘ্রই আমার সাইবেরিয়ার বুকের উপর দিয়ে ভ্লাডি-ভোস্টকেযাবার সময় হ'য়ে এল। এই ভ্রমণ সম্বন্ধে আমি এত খারাপ সব কথা শুনেছিলাম ও পড়েছিলাম যে আমি যাবার দিন সকালে আমার চৌদ্দ দিনের উপযোগী টিনে রক্ষিত খাবার কিনে নিলাম।

সাত দিন পরে আমি নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে সোভিয়েট রাশিয়ার সুদূর প্রাচ্যের বন্দরে পৌঁছালাম—আমার টিনের খাবার তখনও অস্পৃষ্ট ছিল, কারণ ট্রান্স-সাইবেরীয় রেলগাড়ীটা ভ্রমণের পক্ষে পরম আরামদায়ক বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর কামরার যাত্রীর মতই আমি স্বচ্ছন্দ আরামে ভ্রমণ করেছিলাম। আমার পর বার্থের কামরায় ছিলেন একজন এঞ্জিনিয়ার (তিনি বৈকাল হ্রদের কাছে কার্যে নিযুক্ত ছিলেন), এক জন মঙ্গল জাতীয় ক্যাপ্টেন ও একজন নারী ডাক্তার—এঁরা সবাই বুদ্ধিমান্ ও সৌজন্যপরায়ণ এবং পরম আগ্রহে আমাদের ভ্রমণ-পথের বিবরণ আমাকে দিয়েছিলেন। একজন পরিচারক আনীত চা পান করে ও সুন্দর গরম জলে স্নান ক'রে আমাদের দিন সুরু হ'ত—তারপর আমরা খাবার গাড়ীতে যেতাম, সেখানে প্রচুর পরিমাণে ডিম, শূকরের মাংস, মাছ, কালো রুটি, নানা প্রকারের রক্ষিত দ্রব্য ও টাটকা ফল ধ্বংস করতাম। ভরা পেটেআমরা সুদীর্ঘ ট্রেনে বাকী সকালটা পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে বলে পায়চারি করতাম কিংবা দাবা খেলায় বসে যেতাম—আমি কখনও জিতিনি বটে—তবে অনেক কিছু শিখেছি। দ্বি-প্রাহরিক ভোজনটা প্রাতরাশের চেয়ে আরও বড় হ'ত—এত বড় হ'ত যে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাইকে প্রয়োজনীয় ব্যায়ামের জন্য এবং সুবৃহৎ নৈশ ভোজের উপযুক্ত ক্ষুধার উদ্রেকের জন্য সারা বিকালটা ট্রেণের করিডরে হেঁটে বেড়াতে হ'ত।

বর্তমান খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের দিনে আমি আকাঙ্ক্ষিত অনু-তাপের সঙ্গে ট্রান্স-সাইবেরীয় ট্রেণের খাবারের কথা স্মরণ করি। সে সময় আমি বিস্মিত হয়ে ভাবতাম যে যে-সব বন্ধু আমাকে ভ্রমণের অসুবিধা সম্বন্ধে ভয়ংকর গল্প বলেছিল, তাদের কি কোন মানসিক রোগ ছিল? রেলপথে এত আরামদায়ক ভ্রমণ আমার ভাগ্যে খুব কমই জুটেছে। প্রতি রাত্রে আমাদের পরিষ্কার তোয়ালে ও বস্ত্র দেওয়া হ'ত; লড়াইয়ের মোরগের মত আমাদের খাওয়ান হ'ত এবং যে পরিমাণ চা ও সুরুয়া আমি খেয়েছিলাম তার পরিমাণ নির্দেশ করা মুস্কিল। সত্য বটে প্রাতরাশ একদিন সকাল ৭টায় দেওয়া হ'ত আবার আরেক দিন দুপুরেও দেওয়া হ'ত, কিন্তু এ তুচ্ছ বস্তু নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যায়—বিশেষ ক'রে রুশদের যে উষ্ণ বন্ধুত্বের ফলে দীর্ঘতম ভ্রমণও রঙীন হ'য়ে ওঠে তারই প্রাচুর্য যখন থাকে চতুর্দিকে? যখন বড় বড় মালগাড়ীগুলি এশিয়াস্থিত রাশিয়ার উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে মস্কোর দিকে এগিয়ে যায়, তখন গাড়ী সান্টিং ক'রে কয়েক ঘণ্টার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে কে-ই বা আপত্তি করে?

গাড়ী থামলে আমরা নেমে প্ল্যাটফর্মে ছুটোছুটি করতাম—আরও চা খেতাম এবং বিস্মিত হ'য়ে দেখতাম—অন্তত আমি দেখতাম—কি ক'রে স্তেপের বুকে বড় বড় নতুন সহর জন্ম নিচ্ছে—কি ক'রে যে সীমাহীন সাইবেরিয়ার শীতরাজ্যে পূর্বে রাজনৈতিক অপরাধীদের নির্বাসিত করা হ'ত, সেই সাইবেরিয়া ধীরে ধীরে নতুন

রাশিয়ার ধনভাণ্ডারে পরিণত হচ্ছে। একবার ইউক্রেনে আমি রাশিয়ার অখণ্ড বিস্তৃতি দেখে ভয় পেয়েছিলাম, সাইবেরিয়ায় এসে আমি ইউক্রেনকে একটা খেলার মাঠের মত অনুভব করলাম—কেননা সাইবেরিয়ায় মাইলের পর মাইল ধরে শস্য বপনের উপযোগী বাদামী মাটি পড়ে ছিল। আমি ট্রেনের জানালার মধ্য দিয়ে তাকিয়ে সাইবেরিয়ায় বসন্তের অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলাম।

ট্রেনে অনেক বন্ধু জুটেছিল—তাদের কাছে বিদায় নেওয়া একটা করুণ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে সৌভাগ্যের বিষয় মঙ্গোলীয় সামরিক কর্মচারীটি কয়েক দিনের জন্য ভ্লাডিভোস্টকে থাকতে মনস্থ করেছিলেন। কাজেই তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে এই সুদূর সহরের সব দর্শনীয় বস্তু দেখিয়েছিলেন। এ সহরটিকে দেখে মনে হয় যে শান্ত উপসাগরের পাশে দাঁড়িয়ে সে নিস্তব্ধভাবে স্বপ্ন দেখছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সহরটি যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের কারখানাবিশেষ।

মঙ্গোল সামরিক কমচারী ক্ষমা-প্রার্থনার সুরে বলেছিলেন, "এ সহরে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে আপনার যাওয়া উচিত নয়। তবে মনে রাখবেন যে এ সহরটি একটি দুর্গবিশেষ।"

আমরা জলের ধারের কাফেতে চীনা খাবার খেতাম এবং ফুটপাথে গেটারের (এক প্রকার চীনা বাদ্য-যন্ত্র) ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনতে শুনতে ধান থেকে তৈরী মদ ছোট পাত্রে ক'রে পান করতাম, কারণ ভ্লাডিভোস্টকে শুধু চীনা অধিবাসীতে পরিপূর্ণ অনেক পাড়া আছে এবং নীল বসন্তের সন্ধ্যায় ঝোলানো লণ্ঠনের আলোকে সেই সব পাড়া আলোকিত হ'ত। আমরা সৈন্য-নিবাসের মধ্যে গিয়ে লালফৌজের কুচকাওয়াজ দেখতাম।

ইত্যবসরে নীরব পটভূমিতে ভ্লাডিভোস্টকের প্রকৃত কাজ এগিয়ে চলছিল। এ কাজটা ছিল রাশিয়ার অবশিষ্টাংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন—এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা—এই নীরবতার জন্যই এ কাজটি লোকের ভীতি উৎপাদন করত, কারণ উপরে ব্যস্ততার কোন লক্ষণই ছিল না। শুধু এখানে ওখানে বেড়িয়ে বেড়ালে মাঝে মাঝে শান্ত্রীর ডাকে থেমে দাঁড়াতে হ'ত—তারা শুধু ভদ্রভাবে ফিরে যেতে বলত এবং সন্ধ্যায় পথে-ঘাটে ও সিনেমায় সৈন্যদের আধিক্য অনুভব করা যেত। রেলওয়ে লাইনের সেতু পেরিয়ে গেলে দেখা যেত যে সারি সারি ত্রিপল-আবৃত মালগাড়ীতে সুবৃহৎ অথচ সুগুপ্ত লালফৌজের জন্য অস্ত্রশস্ত্র চালান দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু ভ্লাডিভোস্টকের রাজপথে যে বিবিধ জাতির এশিয়াবাসী লোক দেখেছি তাদের একতা-বোধই আমাকে সব চেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছিল। পামীর ও তুর্কিস্তানের লোক, মঙ্গোলিয়া ও সাইবেরিয়ার অধিবাসী, কুর্দ ও উজবেক—সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন—রাশিয়ার উন্নতি করা।

ইর্কুটস্কে ফেরার পথে সময় কাটানোর জন্য আমি ভ্লাডিভোস্টক স্টেশন সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক কিনেছিলাম। গ্রন্থকারের নাম ছিল ডি, এস্, মলোটোভ এবং গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিল সোভিয়েটের সুদূর প্রাচ্যের বাণিজ্যের দ্রুত বৃদ্ধি। গ্রন্থখানিতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল—নীরস অথচ আশ্চর্যজনকভাবে গ্রন্থকার এশিয়াস্থিত রাশিয়ায় স্থাপিত কাপড়ের কলের ও চীন ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশে প্রেরিত বস্ত্রের হিসাব দিয়েছিলেন। আমি পড়তে পড়তে হঠাৎ পায়ে একজন সহযাত্রীর মৃদু আঘাতে সচেতন হ'য়ে উঠলাম।

"ওই গম দেখছেন? দশ বৎসর পূর্বে যে কেউ আপনাকে বলত যে এ অঞ্চলে গমের চাষ অসম্ভব।"

আমি মৃদুভাবে মন্তব্য করলাম যে আমি তুলোর হিসাব দেখছিলাম এবং তাঁকে বইখানি দেখিয়ে বললাম, "আমি মলোটোভের খুব প্রশংসা করি।"

"হ'তে পারে," তাঁর বিরাট হাতখানা নেড়ে তিনি বললেন, "আমার তুলোর ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই। আমি শস্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং আপনাকে এ কথা বলছি যে রাশিয়ার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে গমের চাষের বিস্তার-সাধন। প্রত্যেক বৎসর গমের চাষ উত্তর দিকে কিছু বিস্তৃত হয় এবং এমন একদিন আসবে যখন উত্তর মেরুর তুন্দ্রা অঞ্চলে আমরা শস্য জন্মাব। দেখুন একজন ইংরেজ আমাদের এ বিষয়ে খুব সাহায্য

ভোগও করতে হবে। কিন্তু আমাদের নিজেদের ভাগ্যও এর মধ্যে বিজড়িত। আমেরিকায় ভারতের বিরুদ্ধে যে গালাগালি, নিন্দা ও বিকৃতির আবরণ বিস্তার করা হচ্ছে—সে আবরণ আমাদের ভেদ করতে হবে। বুদ্ধিমান নাগরিক মাত্রই জানেন যে কলিকাতা ও দিল্লীর ব্রিটিশ সেন্সরের চোখ এড়িয়ে প্রকৃত ভারতীয় সমস্যা আমেরিকায় এসে পৌঁছায় না। ভারতবর্ষের খবর ভুল, অসম্পূর্ণ এবং প্রায় ক্ষেত্রেই বিকৃতরূপে পাওয়া যায়। এটা মানব-প্রকৃতির নিয়ম যে আমরা যাদের আঘাত করি তাদের গালাগালিও করি—প্রমাণ করতে চাই যে তাদের ভালর জন্যই আমরা তাদের আঘাত করছি। মানবের এই প্রাকৃতিক নিয়ম চলা উচিত এবং চলবেও; গান্ধী শান্তি-বাদী, গান্ধী চতুর এবং কুটিল রাষ্ট্রনীতিবিদ্। গান্ধীর বাস্তববোধ নেই—তিনি শুধু ব্রিটিশদের ধ্বংস কামনা করেন।

প্রশ্ন এই: গান্ধী এরূপ মূর্খ কেন? নেহরুর মত এবং অন্যান্য কংগ্রেস-নেতাদের মত লোকেরা এত মূর্খ কেন? অনেক আমেরিকান সমালোচক ও সম্পাদকের কাছে হিন্দুদের কথা কিছু কিছু দুর্বোধ্য। গান্ধী মূর্খ—কেন না, জর্জ ওয়াশিংটন যে জন্য যুদ্ধ করেছিলেন—তিনিও তাই করছেন—ইংলণ্ডের—হাত থেকে তাঁর স্বদেশকে মুক্ত করার প্রয়াস পাচ্ছেন। নেহরু এরূপ মূর্খ কেন না ওয়াশিংটন ও টমাস পেনের মত তিনিও ছোট 'স্বাধীনতা' কথাটার অর্থ তীব্র-ভাবে অনুভব করেন। তেরটি উপনিবেশ তাদের দেশের স্বাধীনতার অভাব যেমন তীব্রভাবে অনুভব করেছিল—সমগ্র ভারতীয় জাতিও আজ সে অভাব তেমনি ভাবে অনুভব করছে। ওয়াশিংটন্ যেমন অনমনীয় ছিলেন—ডি ভ্যালেরা যেমন অনমনীয়—গান্ধী ও নেহরুও তেমনি অনমনীয়। অতীতে আমেরিকার উপনিবেশে এবং আয়র্ল্যাণ্ডে যেরূপ অন্যায় করা হ'ত—ভারতেও আজ তেমনি অন্যায় করা হচ্ছে—আমেরিকানরা এখন স্বাধীনতা পেয়েছে বলে পরাধীন একটা জাতির কাছে ওই ছোট কথাটির মূল্য কতখানি সে কথাও তারা ভুলে গেছে। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এই জিনিসটাই দুর্বোধ্য।

গান্ধী ও নেহরু আজ সেই ভয়ঙ্কর শক্তির উৎস-মুখ খুলে দিয়েছেন; ওয়াশিংটনকে তাঁরা উভয়েই শ্রদ্ধা করেন—ওয়াশিংটনের আত্মা থেকেও এই শক্তি স্ফুরিত হয়েছিল,—আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের সময় একটা বিরাট্ জাতির জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিরাট্ আর্তনাদ। সম্প্রতি সেক্রেটারী হলে জাতিসমূহকে স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন—ভারতীয়রা তাঁর আহ্বান অনুযায়ীই কাজ করছে। হাল ফিরে দাঁড়িয়ে ভারতীয়দের বলতে পারেন না: "তোমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করো না!" আমরা গ্রীস্, যুগোশ্লোভিয়া কিংবা অধিকৃত ফ্রান্সের স্বাধীনতার জন্য উদ্বিগ্ন, কিন্তু আমরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতীয় আন্দোলনকে চোখ বুঁজে উপেক্ষা করে চলেছি।

ভারত স্বাধীনতা চায়। ক্রিপস্ তা দিতে পারেন নি; তারা স্বাধীন জাতি হিসাবে সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে চায়। কংগ্রেস-প্রস্তাবে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে ভারতকে স্বাধীন ও সমানধিকারসম্পন্ন বলে স্বীকার করে নিলে মিত্রশক্তির সৈন্য ভারতে থেকে ভারত রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে পারবে। অবিলম্বে স্বাধীনতার দাবীতে ভারতবর্ষ একতাবদ্ধ।...আমি সতর্ক ক'রে দিচ্ছি যে ভারত স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত তার বিরোধ থামবে না। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস? — printed: "দন্ ইয়ুটাঙ্")

আর্য মতবাদ

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ প্রাচ্যভাষাবিদ্ স্যার উইলিয়াম জোন্স্ সংস্কৃত, কেল্টিক ও জার্মানীক ভাষার সঙ্গে পারস্য, গ্রীস্ ও রোমের ভাষার যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন; তিনি আরও বলেছিলেন যে এ সব ভাষারই উৎপত্তিস্থল এক। এই ভাবে তিনিই তুলনামূলক শব্দ-বিজ্ঞান ও আর্য মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। আর্য কথাটি যে প্রাচীন পদ থেকে উদ্ভূত তার মানে সম্মানার্হ কিংবা মহৎ; এর দ্বারা বিশুদ্ধ-রক্ত এমন এক জাতীয় লোককে বোঝানো হয় যাদের পূর্ব-পুরুষেরা এই ভাষাগোষ্ঠীর সাহায্যে কথা বলত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই বিষয় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধ হয়েছিল এবং তাঁদের মধ্যে দুটি বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়েছিল, এঁদের মধ্যে একদল ছিলেন জাতিতত্ত্ববিদ—তাঁরা দাবী করতেন যে সুদূর অতীতে নিশ্চয়ই শ্বেতকায় আর্যজাতির অস্তিত্ব ছিল; আর শব্দতত্ত্ববিদ্‌রা বলতেন যে ভাষাগত সাম্যের উপরই আর্য মতবাদের ভিত্তি স্থাপিত। তাঁরা বলতেন যে বিভিন্ন ধরণের অনেক জাতি আর্য ভাষায় কথা বলত; কোন একটি বিশেষ জাতিকে এই সব ভাষার উদ্ভাবক হিসাবে কিংবা কোন বিশেষ দেশকে এই জাতির আদি বাসস্থান নির্দেশ করা অসম্ভব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দুই মতবাদের বিরোধিতা কমে' এসেছে; এখন প্রচলিত মত এই যে শ্বেতকায় একটি আর্য জাতি কিংবা কয়েকটি জাতি ছিল, তারা বিশেষ একটা দেশ থেকে তাদের বিজয়দৃপ্ত উপনিবেশ স্থাপন কার্যে অগ্রসর হয়েছিল; অনার্য জাতি সমূহের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে দেশ-বিজয় ক'রে ও উপনিবেশ স্থাপন ক'রে তারাপৃথিবীর বহু স্থানে তাদের ভাষার প্রচার ও প্রসার করেছিল।

আর্যদের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে গবেষণার আর অন্ত নেই এবং বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমে স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া থেকে পূর্ব্বে তুর্কিস্থান পর্য্যন্ত তাদের বাসস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রই পৃথিবীতে বর্তমান আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য এবং গোঁড়া ভারতীয় মত ভারতকেই আর্যজাতির আদি বাসস্থান ব'লে দাবী করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত কিন্তু তিনটি কারণের জন্য এ দাবীকে স্বীকার করে না। প্রথমত প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে এমন সব উদ্ভিদ, আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক ইতিহাসের উল্লেখ পাওয়া যায় যে তার থেকে মনে হয় আর্যদের জন্ম হয়েছিল কোন শীত-প্রধান উত্তরাঞ্চলে; তা ছাড়া শ্বেতকায় জাতি কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে উত্তর ভারত জয় করেছিল—এ উল্লেখও আছে। দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত ভাষা আর্যভাষা সমূহের জ্যেষ্ঠা ভগিনী, মাতা নয়—সেটাও প্রমাণিত আছে। তৃতীয়ত, শ্বেতকায় ভারতীয় জাতিরা ভারতের উত্তরাংশে বাস করে—উপদ্বীপের দক্ষিণাংশে বাস করে কৃষ্ণকায় দ্রাবিড় জাতি সমূহ—এর দ্বারা উত্তর দিক থেকে আক্রমণই সূচিত হয়। আর্যরা যে প্রথমতঃ মধ্য এশিয়ায় বাস করত এ বিষয়ে অধুনা বেশীর ভাগ পণ্ডিতই একমত; সেখান থেকে তারা দক্ষিণে ভারতের দিকে, দক্ষিণ-পশ্চিমে পারশ্যে ও পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ মতের বিরুদ্ধে বলা হয় যে গোচারণশীল কিংবা অংশত কৃষিজীবী বহুসংখ্যক লোককে প্রতিপালন করার ক্ষমতা মধ্য এশিয়ার ছিল না—কিন্তু আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক ও আবিষ্কারকেরা প্রমাণ করেন যে প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে জনবসতি ছিল—আবহাওয়ার কোন হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে এ অঞ্চল সম্প্রতি শুষ্ক হয়ে পড়েছে—এ অঞ্চলে এখন বৃষ্টিপাত ভয়ানক কম। পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ পারশ্যের বিস্তৃত অঞ্চলেও ঠিক একই ঘটনা ঘটে গেছে।

একটি আধুনিক ও সম্ভবত নিশ্চিত মতবাদ এই যে ইউক্রেন থেকে লিথুয়ানিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপেই আর্য্য জাতির উদ্ভব হয়েছিল এবং পরে-তারা বাইরের দিকে—পূর্ব এবং পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রধানত ভাষার সাক্ষ্যের উপরই এই মতবাদের ভিত্তি। আর্য অথবা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সমূহের মধ্যে দুটি প্রধান ভাগ আছে: পাশ্চাত্য ভাগটি প্রধানত ইউরোপে সীমাবদ্ধ (অবশ্য দু-একটি ব্যতিক্রম আছে) —আর প্রাচ্য ভাগটি প্রধানত এশিয়ায় সীমাবদ্ধ (একটি ব্যতিক্রম আছে)। এই দুটি ভাগের মধ্যস্থলে যে আর্যদের বাসভূমি ছিল এরূপ ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত। তা ছাড়া লিথুয়ানীয় ভাষার সাক্ষ্যও আছে: বর্ত্তমানে পৃথিবীতে এইটাই বোধ হয় প্রাচীনতম কথ্য আর্যভাষা। বলা হয় যে চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্যরা যখন তাদের অভিযান সুরু করেছিল ব'লে মনে হয় তখন লিথুয়ানীয়রা যেখানে ছিল আজও তারা সেখানেই আছে।

আগে মনে করা হ'ত যে আর্যরা খৃষ্টের জন্মের চার-পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভারত আক্রমণ করেছিল। কিন্তু প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে হারাপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ যে বিস্ময়কর আবিষ্কার করেছেন তাতে দেখা যায় যে ভারতে এমন একটি অজ্ঞাত সভ্যতা ছিল যার বিস্তৃতি ছিল পাঞ্জাব থেকে সিন্ধু দেশ

পর্যন্ত—সমগ্র সিন্ধু নদের উপত্যকা জুড়ে। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে এর যোগাযোগ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এ সভ্যতার অস্তিত্ব কাল আনুমানিক ২৫০০—৩০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ। প্রকৃতির দিক থেকে এ সভ্যতা ছিল অনার্য এবং তারিখের দিক থেকে আর্য-পূর্ব; হয়ত শেষ পর্যন্ত আর্যদের আক্রমণেই এর ধ্বংস হয়েছিল—এখন ২০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ ও তন্নিকটবর্ত্তী কালকে আর্যদের ভারত আক্রমণের সময় বলে নির্দেশ করা হয়। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের প্রাচীনতম অংশ ১৫০০ খৃঃ পূর্বাব্দে লেখা বলে মনে করা হয়। জাতির দিক থেকে আর্য মতবাদের শ্রেষ্ঠ প্রচারক ছিলেন কাউন্ট জে. এ. দ্য গোবিনো (J. A de Gobineau) নামে একজন পণ্ডিত ফরাসী রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌। ১৮৫৩-৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি Essai Sur l'inégalité des races humaines, নামক তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রকাশিত করেছিলেন; গ্রন্থখানি ছয় ভাগে বিভক্ত। এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সমস্ত পৃথিবীর মানবজাতি। এতে সমস্ত প্রধান প্রধান মানবজাতির উদ্ভব, উন্নতি ও অতীত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার জাতির বিশুদ্ধতার উপর খুব জোর দিয়েছেন এবং বুদ্ধি, উৎসাহ ও উদ্ভাবনী শক্তির দিক থেকে আর্য জাতিকে সকল জাতির শ্রেষ্ঠ ব'লে গেছেন। তাঁর ষষ্ঠ এবং শেষ খণ্ডে জার্মান আর্যদের উদ্ভব, রীতিনীতি ও কৃতকার্যতার বর্ণনা আছে—তিনি শ্বেতকায় আর্যদের মধ্যে জার্মান আর্যদের শ্রেষ্ঠ ব'লে প্রশংসা করেছেন। তিনি ধ্বংসোন্মুখ রোম সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থায় জার্মান প্রভাব বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর ধারণা ছিল যে অতীতের জন্ম থেকে শেষ পর্যন্ত ইউরোপে যে নববিধান গড়ে উঠেছিল তারও মূলে ছিল জার্মানরা। তিনি প্রাচীন জার্মান সমাজের একটি বর্ণনা দিয়ে গেছেন: তাতে দেখি যে মানুষ প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। জার্ল (Jarl) অথবা জার্মান সামন্তসম্প্রদায়—এরা ছিল বিশুদ্ধ আর্য-বংশ সম্ভূত। পরিবার-পরিজন নিয়ে এরা কাঠের দেয়াল দেওয়া বিচিত্র রঙ-করা কাঠের তৈরী গৃহে বাস করত। কার্ল (Karl) অথবা স্লাভোনিক কিংবা কেল্টিক প্রজা—এদের রক্ত ততটা বিশুদ্ধ ছিল না—এরা জার্মান প্রভুদের জন্য কাজ এবং যুদ্ধ করতে বাধ্য ছিল, তবে এদের কিছুটা সুবিধাও দেওয়া হ'ত এবং এরা লুণ্ঠিত দ্রব্যেরও একটা অংশ পেত! আর সর্বশেষে ছিল ক্রীতদাসরা—এরা ছিল নীচ জাতির। এদের ভাগ্যে পরিশ্রম আর শোষণ; গোমহিষের মত এদের কেনাবেচাও করা হ'ত।

জার্মানীতে এ বইখানির খুব আদর হ'য়েছিল—বিশেষ ক'রে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্য স্থাপনের পর এ বই নিয়ে আর উৎসাহের অন্ত ছিল না। ফ্রান্সে এবং অন্যান্য পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশে এ বই ততটা সাফল্যলাভ করে নি। জার্মাদের সম্মান ও শ্রদ্ধার অনেক নিদর্শনই গ্রন্থকার পেয়েছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে দ্য গোবিনোর নির্ধারিত পথে অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য জার্মানীতে গোবিনো সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। এই সব ভাবধারা বুদ্ধিজীবী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রচারিত হয়েছিল এবং বর্ত্তমান জার্মানীতেও একটা জীবন্ত শক্তি হিসাবে কাজ করছে। যদিও বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে জার্মানরা মিশ্রিত জাতি, তবু হিটলার এবং তাঁর নাৎসী সহযোগীরা আর্য মতবাদকে বহুদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন—এমন কি অনেক জার্মান আর্য পৌত্তলিক উৎসবের পুনঃপ্রবর্তন হয়েছে। এবং অনেক আর্য দেবতার পূজাও সুরু হয়েছে হিটলার এ পর্যন্ত ইউরোপে যতটা নববিধান সৃষ্টি করতে পেরেছেন তার থেকে দেখা যায় যে কাউন্ট দ্য গোবিনো বর্ণিত আদিম জার্মান আর্য সমাজের সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এতে আমরা জার্মানদের দেখতে পাই প্রভুর জাতি রূপে (Herren rasse); তার পরেই আছে সেই সব জাতি যারা বিজয়ীদের কাছে এবং আত্মসমর্পণ ক'রে তাদের কাজ এবং সেবার পরিবর্তে কিছু প্রতিদান পায়; সর্বশেষে আছে সেই সব শোষিত জাতি যাদের সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিক জীবন নিয়মিত ভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে এবং জাতি হিসাবে যাদের অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে বিপদগ্রস্ত।*

* Empire Review পত্রিকায় প্রকাশিত D. Bourke Borrowes-এর প্রবন্ধ থেকে অনূদিত।

দেশী পত্রিকা হইতে

সর্বভারতীয় লেখক ও শিল্পী-সংঘ

[১৯৪২। ডিসেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিয়্যু পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক বিনয়ভূষণ রক্ষিতের প্রবন্ধের অনুবাদ]

আমাদের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে ইংরেজী ও দেশীয় সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় একটি সর্ব ভারতীয় লেখক ও শিল্পী-সংঘের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করেছেন। যদিও এ পর্যন্ত এ আলোচনার কোন প্রত্যক্ষ ফল আমরা পাই নি, তবু বর্তমান সময়ে এরূপ একটি সংঘের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য বর্তমান যুদ্ধ আরও অনেক জটিল সমস্যাকে সামনে টেনে এনেছে এবং শান্তিতে শিল্পকলা চর্চা করার মত অবসর কিংবা মানসিক স্থৈর্যও আছে এখন কম। কিন্তু কোন দেশ তার সাহিত্য কিংবা সুকুমার শিল্পকে ক্ষয়ে যেতে কিংবা ধ্বংস হ'য়ে যেতে দিতে পারে না। যদি এ রকম হয় তবে ভবিষ্যৎ প্রকৃতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অন্যান্য দেশের সমপর্যায়ে রাখতে হ'লে আমাদের চিন্তাশীল লেখক ও শিল্পীদের মনে প্রেরণা জোগাতে যা কিছু করা প্রয়োজন তা' সবই করতে হবে। আরও কথা এই যে ভাষা ও জাতীয় স্বার্থের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভারতবর্ষ যখন অখণ্ড, তখন তার বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার জন্যও এবং পৃথিবীর অন্যান্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কাছে ভারতীয় মন ও ভাবধারা প্রচারের জন্য একটি ক্ষমতাশালী সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। এর কর্তব্য ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমি (French Academy) কিংবা ব্রিটেনের রয়াল অ্যাকাডেমির (Royal Academy) সমান সমান না হ'লেও অনেকটা তাদেরই মত হবে এবং কোন গ্রন্থকার, কবি কিংবা শিল্পীর পক্ষে এই সংঘের সভ্য হওয়া একটা বিশেষ সম্মানের ব্যাপার ব'লে পরিগণিত হবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের উপযুক্ত চিন্তাশীল লেখক ও শিল্পীদের গুণ বিচার ক'রে যথোপযুক্ত উৎসাহ ও প্রেরণা দান এবং সম্ভব হ'লে জগতের সামনে তাঁদের পরিচিত করা হবে এই সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ডাঃ জে, এইচ, কাজিন্‌স্ সর্বপ্রথম এইরূপ একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছিলেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে এই পরিকল্পনাটি প্রচারিত করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যথেষ্ট উৎসাহের অভাবে কোন ফল লাভ সম্ভব হয় নি। পরে এই বৎসরই কলিকাতার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীর মিঃ জে, এ, চ্যাপমান 'স্টেটস্‌ম্যান্' পত্রিকার পৃষ্ঠায় একটা চিঠিতে এই পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এডওয়ার্ড টমসন ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁর 'ভারতবর্ষ থেকে চিঠি'তে (A Letter from India) এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। পরে পরিকল্পনাটি ভারতের কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী লোকের ও কয়েকটি প্রধান প্রধান ভারতীয় সংবাদপত্রের সহানুভূতি ও সমর্থন পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়া এণ্ড দি ওয়ার্ল্ড (India and the World) নামক পত্রিকায় ডাঃ কালিদাস নাগের আবেদন, (১৯৩৫), ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের 'মডার্ণ রিভিয়্যু' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ, টাইমস্ লিটারারী সাপ্লিমেণ্টের (Times Literary Supplement) (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬) ও ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মার্চের ইণ্ডিয়ান্ পি. ই. এন্-এর (The Indian P. E, N.) সম্পাদকীয় নিবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা সবাই সাহিত্যের জন্য পুরস্কার ঘোষণার পক্ষে ছিলেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে অধিষ্ঠিত ভারতীয় দার্শনিক কংগ্রেসে এইরূপ একটি ভারতীয় সংঘের প্রতিষ্ঠা সমর্থন ক'রে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল; এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সর্বভারতীয় প্রাচ্য সমিতিও এমনই একটা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এই সমিতির সাধারণ সম্পাদক 'ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকোয়ারি' (Indian Antiquary) পত্রিকায় এই বিষয়ে একটি আলোচনা প্রকাশিত করেছিলেন।

সুতরাং এ ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা নতুন নয়; বহুদিন হ'ল এ পরিকল্পনার জন্ম হ'য়েছে।

তাহার আকাঙ্খিত অধিকার লাভ করে। ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে, তুরস্ক রাষ্ট্রসঙ্ঘে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাইলে যে-কোন সময়ে ঐ সকল প্রণালীর মুখবন্ধ করিয়া দিতে পারিবে। ইহার পর তুরস্ক আলেকজান্দ্রেত্তার অধিকার লাভ করে। ফ্রান্সের সহিত এই বন্দর লইয়া যে মতবিরোধ দেখা দিয়াছিল, এই সময় ইহারও অবসান ঘটে। তাহার কিছু দিন পরেই ১৯৩৯ সালে তুরস্ক, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের মধ্যে ত্রিশক্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে তুরস্কের নীতি—নিরপেক্ষ নীতি। কিন্তু আধুনিক জগতে এই নিরপেক্ষ নীতি অপেক্ষা কঠোর ব্যবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না। এই যুদ্ধে তুরস্ককে জড়াইয়া ফেলিবার জন্য জার্ম্মান রাষ্ট্রদূত ভন প্যাপেন প্রাণপণ করিয়াও তুরস্ককে বিচলিত করিতে পারেন নাই। চক্রশক্তির আঘাতে যখন আশপাশের রাষ্ট্রগুলি বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল, তখনও অবিচল থাকার মত সাহসিকতা তুরস্ক প্রদর্শন করিয়াছে।

যুদ্ধরত রাষ্ট্রসমূহের কাহারও সহিত তাহার অসৌহার্দ্দ্যও নাই। কামালের পর ইসমেত ইউনুছুও তাঁহারই আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার সময়ে ডাঃ রফিক সৈয়দাম যতদিন প্রধান মন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে এই দূরদর্শিতার অভাব ঘটে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর সারাজগলুর সময়ও সেই নীতি অব্যাহত রহিয়াছে।

যে-ত্রিশক্তি চুক্তির কথা উপরে বলা হইয়াছে, উহার একশক্তি ফ্রান্স জার্ম্মান কবলিত হওয়ায় তুরস্কের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। ঐ চুক্তির ফল স্বরূপ ফ্রান্সের নিকট হইতে তুরস্কের যে সকল সামরিক উপকরণ পাইবার কথা ছিল, তাহা তাহারা পায় নাই। কিন্তু বৃটেন ও আমেরিকা তাহার অভাব পূরণ করিয়াছে। তুরস্কের সহিত জার্ম্মানীর বাণিজ্য সম্পর্ক ছাড়াও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সকল ব্যাপরে তুরস্ক চুক্তির প্রত্যেকটি সর্ত্তে অবিচলিত থাকায় অপর রাষ্ট্রসমূহের সহিতও তাহার কোন মতবিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। বাণিজ্য-ব্যাপারে এমন একটি অবস্থার উদ্ভব কোন কোন সময় হইতেছিল, যাহাতে তুরস্কের নিরপেক্ষতা রক্ষা করা মুস্কিল হইয়া পড়িতেছিল। জার্ম্মানীকে কোন কোন কাঁচা মাল সরবরাহ ব্যাপারে তুরস্কের সহিত অন্য শক্তি-সমূহের মতবিরোধ দেখা দিবার কারণও যে ঘটিতেছিল না, তাহা নয়। এক ক্রোমের ব্যাপারেই অবস্থা জটিল হইয়া উঠিতেছিল। জার্ম্মানীর তুরস্কের সমুদয় ক্রোম পাইবার দাবী করিতেছিল অথচ এই ক্রোম বৃটেনকেও দিতে হইবে। সে ক্ষেত্রে তুরস্ক যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছে এবং জার্ম্মানীকে ক্রোমের যে কোটা দিবার প্রতিশ্রুতি বাণিজ্য-যুক্তিতে দেওয়া হইয়াছিল, আগামী বৎসরের পূর্ব্বে তাহাপেক্ষা একবিন্দুও বেশী দিতে তুরস্ক সম্মত হয় নাই। চক্রশক্তি যত প্রকারে সম্ভব এই বিষয়ে সঙ্কট সৃষ্টির চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে।

বর্ত্তমানে জার্ম্মানীর সহিত রাশিয়ার যুদ্ধ বাধিয়াছে। কিন্তু তুরস্কের সহিত রাশিয়ার পারস্পরিক সাহায্য চুক্তিও তুরস্ককে রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিতে পারে নাই। অন্যান্য রাষ্ট্র এবং রাশিয়ার সহিতও তুরস্কের যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বিচার করিলে সেই পারস্পরিক চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তুরস্ককে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইবে, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। চুক্তি সম্পাদনের সময় এই যে দূরদর্শিতা ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়। মিত্রশক্তি সম্পর্কেও তুরস্কের এই কথাই খাটে।

রাশিয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও এই দৃশ্যই দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইটালী, জার্ম্মানী এবং বুলগেরিয়া মিলিত হইয়া যখন গ্রীস আক্রমণ করিল, তখনও ঐ সকল রাষ্ট্রের সহিত তুরস্কের বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু তুরস্ক তখন সিদ্ধান্ত করিল, যে-পর্য্যন্ত তাহার নিরাপত্তা ব্যাহত না হয়, সে পর্য্যন্ত তুরস্ক কোনক্রমেই যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না। আজ পর্য্যন্ত তুরস্কের এই নীতি অক্ষুন্ন রহিয়াছে। এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যেখানে তাহার নিজের স্বার্থ অক্ষুন্ন রহিয়াছে, সেখানে কাহারও সহিত পায়ে পা দিয়া বিবাদ করিতে তুরস্ক প্রস্তুত নহে।

(মৌলবী আবদুল মজিদ)

কবিতা

তবু এস

শ্রীনিভা দেবী

দুঃখানলে দহন ক'রে
শোধন ক'রে নিয়ে
তোমার কোলে লও সবারে টানি
এই জনমের এই বারতা
সবাই বলে, জানি।
দুঃখ ব্যথা রাশি রাশি
এল আমায় ভালবাসি,
ঝলসে দিল আমার তনুমন,
তুমি তো কই এলে না তো
হে মোর নারায়ণ!
এই যে আজও আছি বসে
অতীত দিনের দুঃখপাশে,
বর্ত্তমানের দুঃখ-শিশু এই তো
আমার কোলে,
অনাগত দুঃখ-শিশু
(জাগে) জীর্ণ বুকের তলে।
তবুও যদি না যায় দেখা
তোমার পথের উজল রেখা,
দাও তবে দাও ঝুরঝুরিয়ে
শিউলি ফুলের মত
দুঃখ, জ্বালা, ব্যাধির বেদন
আছে তোমার যত।
সইব শত দুঃখ-ব্যথা
তবুও এস হে দেবতা
ব্যথার যাহা বাকি থাকে
পূর্ণ ক'রে দাও
আমায় শুধু বক্ষে তোমার নাও।

দুঃখিনী

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

জানি না কাহার মেয়ে,
রোজই সকালে কোথা যেন যায়,
গুন্ গুন্ গান গেয়ে।
ডান হাতে তার ডালা,
বাম হাতে শোভে বেল, চাঁপা, যুঁই,
বকুল ফুলের মালা।
শুধালাম একদিন,—
ওগো মেয়ে, কোথা তুমি যাও
ত্বরা করি প্রতিদিন?
হাসিয়া কহিল বালা,—
তুমি ধনী বাবু, গরীব যে আমি,
কি বুঝিবে মোর জ্বালা?
আবার কহিল হাসি,
দোলাইয়া কেশরাশি,—
কি হইবে বাবু, শুনে মোর কথা,
আমি দুইদিন উপবাসী।
চোখ ভ'রে এল তার জল,
নবকিশলয়ে প্রভাত-শিশির,
করে যেন টলমল।
আঁচলে মুছিয়া আঁখি,
গেল সে চলিয়া; চারিদিক যেন
বিষাদে ভরিয়া রাখি।

অবলুপ্ত

শামসুদ্দীন্

উহাদের বড় দোষ জানি :
গড়িয়াছে প্রাসাদ সুন্দর,
বিন্দু বিন্দু স্বেদ রক্তকণা
দানিয়াছে নিঙাড়ি অন্তর।

স্বার্থ তার শুধু দেখিবার,
পূর্ণ ভোগ তোমাদের করে,
জল জল শুধু আঁখিজল
দীপ্ত রবে প্রাসাদের ঘরে!

বিজলীর আলো-শিখা ঝলে
সবাকার আঁধিয়ার ঘরে;
ঘর নাই—পথ যার ঘর
আলো তার কোন্ কর্ম তরে?

চমৎকার বিচার সবার;
প্রাণশক্তি জাগে কোন্‌খানে?
তোমাদের উহাদের মাঝে
অবহেলে শুধু পিছু টানে।

মৃত্তিকার পুষ্প-ঘেরা রথে
মুক্তি-মন্ত্র উহাদের মনে,
অভিশাপ : অযুত যুগের
অধিকার নাই কোন ক্ষণে।

মিনতি

শ্রীবটকৃষ্ণ বসু

উপহার দেওয়া শকতি নাহিক প্রভু
ডালাভরা শুধু ছিন্ন কুসুম-রাজি;
রিক্ত পরাণে শতেক কামনা তবু,
অঞ্জলিভরা আবেগ দৈন্য সাজি।
মন্দির মাঝে তোমারি শয়ন গড়া,
আরতি-প্রদীপে বিগলিত প্রাণ ঢালা;
কত সাঁঝে শুধু নিরখি' পাষাণে হারা,
প্রাণময় তুমি, নহত নিকষ শিলা।
কা'র প্রাণে তুমি আসন বিছাবে জানি,
আঁখিতে তোমার অযুত হৃদয়-ছবি;
অভিমানে যা'র ঢাকিয়াছে মুখখানি
অনাকাঙ্ক্ষা জন একটি মরমী কবি।
ভাঙা তারে তুমি স্বয়ং কলস্বর,
বেদনার গানে আকুলিত মূর্চ্ছনা;
সাধকের প্রাণে অমরা মরতপুর,
শ্রবণে কখনো হয়নিক আনমনা।
ব্যাকুল প্রাণের সাড়াতে তুমি হে অধীর,
প্রেমডোরে তুমি ধরা দাও দয়াময়;
পথহারা আজি না মানে বাধার প্রাচীর,
ছলনে তোমার টুটে গেছে সংশয়।
তবু, তোমারে পাইতেছিল কত সাধ,
হেরিতে তোমারে হয়েছে বিফল আশা;
তব পরশে আজিকে মুছে গেল অবসাদ,
নিরাশ আঁধারে জ্বালায়েছ ভালবাসা।

পুস্তক-পরিচয়

বৃত্ত—সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রণীত। পূর্বাশা প্রেস থেকে শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

সঞ্জয়বাবু প্রধানতঃ কবি। কবির রচিত উপন্যাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তব জীবন ধর্ম অপেক্ষা অন্তর্নিহিত কোনো একটি সুরধর্মই বড় হয়ে ওঠবার আশঙ্কা থাকে। অর্থাৎ উপন্যাসটি গড়ে ওঠে একটি ideaর উপরে নয়, একটি moodএর উপরে। সেই জন্য কবির পক্ষে উপন্যাস-রচনার পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল পথ। এই পিচ্ছিল পথ সঞ্জয়বাবু অক্লেশে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর 'বৃত্ত' বর্তমান সমাজের যৌন সমস্যা নিয়ে রচিত—সেই বৃত্তের অন্তর্গত নর-নারীদের আন্তর জীবন ও ব্যক্তিগত যৌন-সমস্যার সম্বন্ধে তাদের নানাবিধ সমাধান, তাদের ব্যর্থতাবোধ, তাদের দ্বিধার অনিশ্চয়তাকে তিনি স্বচ্ছন্দ রূপ দিয়েছেন। এই বৃত্তের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়েও ধরা পড়ে গ্রন্থকারের ভবিষ্যতের প্রতি ইঙ্গিত। বনানীর মধ্য দিয়ে কিছু পরিমাণে তিনি ভবিষ্যতের সুস্থ সমাজের সুস্থ নারীকে দেখতে চেয়েছেন।

Lawrenceএর মতে আধুনিক জগতে—We have even our sex in our heads. Intellectএর পূজার ফলে আধুনিক জগতে দেহের প্রতি যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয় না। সঞ্জয়বাবুর রচনার মধ্যে একটি সহজ দেহবোধ আছে—দেহকে কোথাও তিনি মনের চেয়ে ছোটো করে দেখেন নি। ভবিষ্যতের নারীর মধ্যেও তিনি দেখতে পেয়েছেন এই পরিস্ফুট দেহবোধ।

কিন্তু ভবিষ্যতের প্রতি নানা ইঙ্গিত সত্ত্বেও 'বৃত্ত' আত্মসম্পূর্ণ বৃত্তই। এর অন্তর্গত জীবেরা পুরাতনকে ভাঙছে, Sex-tabooকে ধ্বংস করছে, বয়সের ভীতিকে ধ্বংস করছে, তবু ভবিষ্যতের সুনিশ্চিত আলোকের পথ তারা দেখতে পাচ্ছে না, কেবলি বৃত্তের মধ্যে ঘুরে ফিরতে হচ্ছে বন্দী পশুর মতো। যে রজত অনায়াসে নিজের ভাইতে অনেক বড়ো সুরমাদির সঙ্গে প্রণয় স্থাপন করে, সেই আবার কাকার আদেশে, টাকার লালসায় সুবোধ ছেলের মতন সামাজিক আদর্শে ফিরে গিয়ে বিবাহ করে। যে সুরমা স্বামীকে ত্যাগ করে চলে আসেন, তাঁর কমলের ক্ষণিকবাদে বিশ্বাস নেই, নিজের কোনো সুনির্দিষ্ট পথ নেই, অনিশ্চয়তায় ব্যর্থতায় সে জীবন ধূসর, মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিষাদগ্রস্ত। সত্যবানের মনও আত্মবিশ্লেষণের বিফলতায় শেষ পর্যন্ত সতীর নিরাসক্ত নিষ্ঠার কাছে পরাজয় মানে। সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে সে বনানীর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতায় বটে, কিন্তু সমাজের ভিত্তি টলাতে যে পরিবর্তন দরকার সেই পরিবর্তনের স্বরূপ ওর বোধ নেই, মার্ক্সবাদ ওর কাছে বুর্জোয়া অর্থনীতির শেষ অধ্যায় মাত্র। কেবল বনানীর মধ্যেই একটি সুস্থ গতির আভাষ। তবুও যখন সুরমার মুখে শুনি—"মানসিক বিলাস আমাদের মজ্জাগত। উনিশ শতাব্দীতে ধর্ম নিয়ে এ বিলাস হয়েছে—এ শতাব্দীতে সুরু হয়েছে বড় কথার বিলাস। এ রোগ থেকে নিজেও আমি মুক্ত নই—তুমিও মুক্ত নও—বনানী বলে সে কাজ করে কিন্তু আমি জানি কথাই বলে বেশী!"—তখন দেখি বনানীও সেই বিলাসের আবর্তেই বাঁধা পড়েছে। মার্ক্সবাদী, রবিঠাকুরী, নিছক আত্মকেন্দ্রিক, নিছক ব্যবসাদারীদের নানা বিচিত্র মনোবৃত্তি এক সমস্যাকে কেন্দ্র করে একই বৃত্তের মধ্যে অবিশ্রাম ঘুরে চলেছে, কোনো স্থির উদ্দেশ্য নেই, পথ নেই, সমাধান নেই। সমাজের সঙ্গে তাদের বন্ধন, তারা বদলায় নি সে-সমাজের ভিত্তি এখনো নড়ে ওঠেনি বলে। 'সমাজের ভিত্তি টলাতে যে পরিবর্তন দরকার তা হয়তো আমাদের জীবনে এসে দেখা দেয় না, তাই বলে কি সমাজের অন্তরের আলোড়নকে অনুভব করিনে? যে-পথে সমাজের পূর্ণ পরিণতি তার এক কণা আলো তো চোখে পেতে পারি, সমাজের দুঃসহ গ্লানির অন্ধকারে একটুও ত ব্যাকুল হয়ে উঠি।—সমাজের পরিণতিকে এগিয়ে আনবার প্রয়াসের অভাবেই, ব্যাকুলতার মধ্যেই সান্ত্বনা পাওয়াতে

এই বৃত্তের ট্রাজিডি, এর অন্তর্গত জীবগুলির একটানা পরিক্রমা। এই ট্রাজিডিকে সঞ্জয়বাবু ফুটিয়ে তুলেছেন।

কিন্তু কেবল মাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে উপন্যাসটির পরিধি একটু অতিরিক্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। সমগ্র বিচিত্ররূপী, প্রাণ-চঞ্চল বিরাট সমাজ জীবনের প্রতি যে সমবেদনাপূর্ণ দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে প্রেরণা যোগায় তার একান্তই অভাব। তা'ছাড়া চরিত্রগুলির প্রতি গ্রন্থকারের কিছু পরিমাণে অনাসক্তি ও নিরপেক্ষতা থাকার ফলে মানুষের মৌল অনুভূতিগুলির প্রতি উপন্যাসখানির বিশিষ্ট কোনো আবেদন নেই। প্রেমের ঘটনাগুলিকে গ্রন্থকার দেখেছেন ডাক্তারের মতো ছুরি চালিয়ে, বিশ্লেষক মন নিয়ে, তাই সেগুলির মধ্যে এমন কোনো প্রাণস্পন্দন নেই যা পাঠকের মনেও নাড়া দিতে পারে। বনানী ও সত্যবানের প্রেমে সামাজিক বাধাকে জয় করবার যে উত্তেজনা ও আনন্দ, সংস্কারের যে স্বাভাবিক পিছুটান, মনের নানা আঘাত ও আনন্দের দোলা থাকা স্বাভাবিক এবং যা তাদের প্রেমকে পাঠকের মনে সত্য করে তুলতে পারে লেখক তাকে অপেক্ষাকৃত অবহেলা করে তাদের সম্বন্ধে ideaটির দিকেই বেশী দৃষ্টি দিয়েছেন।

সমাজ ও সাহিত্য —গোপাল ভৌমিক। পূর্বাশা সিরিজ। পূর্বাশা প্রেস থেকে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

Art Life and Politics are indivisible and inseparable. Alexander Blokএর এই উক্তিটি দিয়ে লেখক আরম্ভ করেছেন। পূর্বাশা সিরিজের অন্যান্য সংখ্যার মতো এইখানিতেও কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যে একটি জটিল বিষয়কে প্রগতিশীল দৃষ্টিতে বিচার করে একটি সমাধানের ইঙ্গিত করা হয়েছে। বামপন্থী দৃষ্টিতে জড়বাদী দর্শনের ভূমিকায় সাহিত্য বিচারকে এখনো বাংলা দেশের বহু সাহিত্যিক ও পাঠক বিভীষিকার চক্ষে দেখেন। তার কারণ এই যে, এই জাতীয় সাহিত্য এখন পর্যন্ত আমাদের ভাষায় বেশী রচিত হয় নি, যা হয়েছে তার মধ্যেও খুব কম অংশই রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে। দ্বিতীয় কারণ এই সাহিত্যকে সামাজিক ভূমিকায় বিশ্লেষণ করে তার প্রয়োজন ও তার সার্থকতাকে প্রমাণ করার মতো সমালোচনা-সাহিত্যেরও অভাব আছে। পূর্বাশা সিরিজ এই বিষয় দুরূহ কাজটিতে হাত দিয়েছেন। এ পর্যন্ত তাঁরা যে শ্রেণীর পুস্তিকা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন তাতে সাফল্যের সূচনা করে। বামপন্থী দৃষ্টিতে সমাজ ও সাহিত্য বিচার যদি তাঁরা পূর্ণ ভাবে করতে পারেন তা হলে নতুন বাংলা সাহিত্যের একটি বড়ো অভাব কিছু পরিমাণে পূর্ণ হবে তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীযুত গোপাল ভৌমিক ধ্রুপদী চালকে অপেক্ষাকৃত পরিহার ক'রে সাবলীল ভাষায় বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইতিহাসের ধারাকে অনুসরণ করে এসে মার্ক্সবাদের ফলে মানুষের চিন্তাজগতে যে আলোড়ন উঠেছে, তাকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, ও তাঁর দৃষ্টিতে সামাজিক চিন্তার সঙ্গে সাহিত্যিক ভাবধারার একমুখীত্বের প্রয়োজনকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। সাহিত্য জীবনের মুখাপেক্ষী, কিন্তু জীবন সাহিত্যের মুখাপেক্ষী নয়। সুতরাং সামাজিক জীবনে যে আলোড়ন আসবে, যে নতুন চিন্তাধারা আস্‌বে তার প্রতিফলন সাহিত্যে হবেই, নিছক সাহিত্য বলে কোনো একটি আত্মসম্পূর্ণ বৃত্ত রচনা করে বসে থাকলে সাহিত্যের ধর্ম থেকে সাহিত্যের বিচ্যুতি ঘটে। মার্ক্সবাদ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আনছে, তাতে সাহিত্যও সেই পরিবর্তনকে এড়াতে পারবে না। সাহিত্যকে হতে হবে পূর্ণভাবে সমাজ-সচেতন। এই নতুন মতবাদকে শ্রীযুত ভৌমিক অতি সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

মাত্র তিন আনা মূল্যের হিসাবে পুস্তিকাখানি অতিশয় সুদৃশ্য। ছাপা, কাগজ ইত্যাদি ভালো।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

গত পৌষ সংখ্যা 'মাতৃভূমি'তে প্রকাশিত 'ভবিষ্যতের সাহিত্য' নামক প্রবন্ধের লেখকের নাম ভুলক্রমে ছাপা হয় নি; তজ্জন্য আমরা দুঃখিত। এই প্রবন্ধ লেখকের নাম চিদানন্দ দাশগুপ্ত। সম্পাদক: মাতৃভূমি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

'মাতৃভূমি'র পঞ্চম বর্ষ

মঙ্গলময় ভগবানের কৃপায় বিশ্বব্যাপী মহাসমরের দুর্য্যোগ সত্ত্বেও 'মাতৃভূমি' পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিল। নূতন বৎসরের প্রথম প্রভাতে আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে ভগবানের উদ্দেশ্যে নতি নিবেদন করিতেছি এবং মাতৃভূমির গ্রাহক, অনুগ্রাহক, লেখক-লেখিকা এবং বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে প্রীতি-নমস্কার ও সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি।

গত চারি বৎসর 'মাতৃভূমি' মাতৃভূমির কতটুকু সেবা করিতে পারিয়াছে, তাহা বিচার করিবার অধিকার সেবকের নাই। দেশ ও দশের সেবা করা এবং সেবার উদ্দেশ্যে বাঁচিয়া থাকাই তাহার আকাঙ্ক্ষা। ভগবানের কৃপায় 'মাতৃভূমি'র শৈশব অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে। সেবা-প্রয়োজনের তাগিদে মাতৃভূমির আকার বৃদ্ধি করার সময় উপস্থিত। এই দুঃসময়ে আকার বৃদ্ধি করা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য হইলেও পঞ্চম বৎসরের প্রথম হইতেই 'মাতৃভূমি'র আকার আরও ১৬ পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করা হইল। কাজেই মূল্যও সামান্য বৃদ্ধি না করিয়া পারা গেল না। যুদ্ধের জন্য নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও 'মাতৃভূমি' তাহার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সেবার উদ্দেশ্যে টিকিয়া আছে, নূতন বৎসর হইতে তাহার আকার বৃদ্ধি করা সম্ভব হইল, ইহা আমাদের পরম কৃতার্থতা। ভগবানের আশীর্ব্বাদ এবং দেশবাসীর সহযোগিতা ও সহানুভূতি দুরতিগম্য চলার পথে আমাদের সহায়। এই যাত্রাপথে যাঁহাদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি আমরা লাভ করিয়াছি, ভবিষ্যতেও আশা করি তাঁহাদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না।

—

কলিকাতায় জাপ বিমানের হানা

গত ২০শে ডিসেম্বর রবিবার রাত্রে সর্ব্বপ্রথম জাপানী বিমান কলিকাতা অঞ্চলে হানা দেয়। তারপর এ পর্য্যন্ত জাপানী বিমান আরও চার বার কলিকাতা অঞ্চলে বোমাবর্ষণ করিয়াছে। মোটের উপর এ পর্য্যন্ত জাপানী বিমান পাঁচ বার কলিকাতায় হানা দিয়াছে। প্রথমে ২০শে ডিসেম্বর হইতে পর পর তিন রাত্রি কলিকাতা অঞ্চলে জাপানী বিমান হানা দেয়। তারপর ২৪শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাত্রে কলিকাতার উপর জাপ বিমানের চতুর্থ আক্রমণ হয়। জাপ বিমান পঞ্চম বার কলিকাতায় হানা দেয় ২৭শে ডিসেম্বর শেষ রাত্রির দিকে। ঐ রাত্রে চট্টগ্রাম ও ফেণীতেও জাপানী বিমান হানা দিয়া বোমাবর্ষণ করে।

উল্লিখিত পাঁচ বার বিমান হানায় সামরিক কোন ক্ষতি হয় নাই, কিম্বা সামরিক ব্যবস্থারও কোন ক্ষতি হয় নাই। বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা অতি সামান্যই হইয়াছে, ক্ষতিও হইয়াছে অতি সামান্যই। এই বিমান হানায় কলিকাতাবাসী যথেষ্ট মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছে—তাহাদের সাহস ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বিমান হানার অভিজ্ঞতার পর কলিকাতার নাগরিকগণ যথেষ্ট সাহস ও নৈতিক দৃঢ়তার পরিচয় দিলেও কলিকাতার অবস্থা সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের অ-সামরিক জনরক্ষা সচিব স্যার ওয়ালা-প্রসাদ শ্রীবাস্তব কাণপুর হইতে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার সহিতও বাস্তব অবস্থার মিল নাই। তিনি বলিয়াছেন,

"জাপানীরা আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে ভয়ানক ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। রাজপথ এবং রেলপথে কলিকাতা নগরী খালি হইয়া যাইতেছে, এই সংবাদের মধ্যে কিছুমাত্র সত্য নাই। গতকল্য অপরাহ্নে লোকজন পূর্ব্বের মতই কাজকর্ম্ম করিয়াছে এবং রাজপথগুলি জনাকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বড়দিনের উৎসব ছাড়া আর কোন চিন্তা তাহাদের ছিল না।" স্যার শ্রীবাস্তব অবশ্য নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে এই উক্তি করেন নাই। কলিকাতায় অবস্থিত তাঁহার ডিরেক্টার-জেনারেলের সহিত টেলিফোনে আলাপ করিয়া এই তথ্য লাভ করিয়াছেন।

গত বৎসর বিমান আক্রমণের আশঙ্কাতেই বহু লোক কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিল। পরে অবশ্য অনেকে যে ফিরিয়া আসে নাই তাহা নয়। এবার সত্যসত্যই জাপ-

বিমানের আক্রমণের পর কলিকাতাবাসী সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিলেও ইহার অর্থ এই নয় যে, কলিকাতার জনসাধারণের মনে আদপেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় নাই, কিম্বা কলিকাতা হইতে কতক লোক চলিয়া যায় নাই। কলিকাতা ত্যাগের ভীড় এখন কমিয়াছে। এবং যাহারা কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে অবাঙ্গালীর সংখ্যাই বেশী হইলেও তাহাদিগকে দোষ দিয়া লাভ নাই। প্রয়োজন প্রকৃত অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কলিকাতা যাহারা ত্যাগ করে নাই তাহাদের নৈতিক দৃঢ়তা বজায় াখিবার ব্যবস্থা করা।

—

জাপানের উদ্দেশ্য কি ?

রাত্রিকালে জাপানী বিমানের হানা কলিকাতাতেই বাধ হয় প্রথম হইল। রেঙ্গুনে প্রথম বিমান আক্রমণ দিনের বেলাতেই হইয়াছিল। চট্টগ্রামে সর্ব্বপ্রথম ৮ই মে অপরাহ্নে এবং পরের দিন প্রাতে জাপানী বিমান হানা দিয়া বোমাবর্ষণ করে। ইহার পর জাপ বিমান পূর্ব্ব-াসামে হানা দিলেও ২৫শে অক্টোবরের পূর্ব্বে বাংলায় ার হানা দেয় নাই। ২৫শে অক্টোবর পুনরায় চট্টগ্রামের ্পর জাপ বিমানের আক্রমণ হয়। নবেম্বর মাসে বাংলা া আসামের কোথাও বিমান আক্রমণ হয় নাই। অতঃপর ই হইতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এগার দিনে তিন বার াপানী বিমান চট্টগ্রামের উপর হানা দেয়। তারপর লিকাতা অঞ্চলে ২০শে ডিসেম্বর জাপানী বিমানের প্রথম ানা।

কলিকাতায় পাঁচবার বিমান হানার পর এ পর্য্যন্ত আর মান হানা না হইলেও, আরও বিমানহানা হইবে কিনা াহা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারে না। তিন দিন মান হানার পর বাংলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক হেব বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "গত তিন রাত্রির না হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আমরা র্ঘদিনব্যাপী কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি মাত্র।"

কলিকাতার উপর বিমান হানা দিবার মধ্যে জাপানের উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, এই প্রশ্ন লোকের মনে গ্রত হওয়া আশ্চর্য্য নয়। চট্টগ্রামের উপর বিমান-হানাও সসৈন্য আক্রমণের পূর্ব্বাভাষ বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিছু দিন পূর্ব্বেও কেহ কেহ জাপ আক্রমণের আশঙ্কা করিলেও বর্ত্তমানে অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জাপ নৌবহরকে যতদিন পর্য্যন্ত মার্কিন আক্রমণের সম্মুখীন থাকিতে হইবে, ততদিন ভারত আক্রমণ করা জাপানের পক্ষে সম্ভব নয়। কেহ কেহ অবশ্য এইরূপ মনে করেন যে, অষ্ট্রেলিয়ার দিকে বাধা পাইয়া জাপান ভারতের দিকে পা বাড়াইতে পারে। জাপানের মনে মনে এইরূপ মতলব থাকা আশ্চর্য্য কিছু নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলা ও আরাকান সীমান্তের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন আর জাপানের সহিত আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম চলিতেছে না, বৃটিশ পক্ষীয় সৈন্য আরাকান সীমান্ত হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়ায় আক্রমণাত্মক সংগ্রাম সুরু হইয়াছে। অক্ষশক্তি সসৈন্য আক্রমণের পূর্ব্বে যেমন বিমান আক্রমণ চালায়, তেমনি আক্রান্ত হইয়াও প্রতিপক্ষের দেশে বোমাবর্ষণ করিয়া থাকে। কলিকাতার উপর বিমান আক্রমণ শেষোক্ত শ্রেণীর হওয়াই সম্ভব। জাপানের সহিত সংঘর্ষ ঘনীভূত হইয়া উঠিলে ইহাই জাপ বিমানের শেষ হানা না-ও হইতে পারে। কাজেই প্রস্তুত থাকাই সমীচীন।

—

বিমান-হানায় দৃঢ়তা রক্ষার উপায়

কলিকাতাবাসী প্রথম পাঁচ দফা বিমান আক্রমণ নিরাতঙ্ক ভাবেই গ্রহণ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে বিমান আক্রমণ হইলেও করিবে, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বিমান আক্রমণে জনসাধারণের বিপদ আশঙ্কা আছে বলিয়াই তাহাদের নৈতিক দৃঢ়তাকে বজায় রাখিবারও ব্যবস্থা করা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য। বাংলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক কলিকাতাবাসীকে দৃঢ়তা ও উৎসাহ বহাল রাখিতে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছেন, "স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে অগ্রগামীদের মধ্যে স্থান পাওয়ার অধিকার প্রমাণ করিবার সময় এখন তাহাদের আসিয়াছে।" প্রধান মন্ত্রী সত্য কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু শুধু কথা দ্বারা মানুষের

আবেগকে উদ্দীপ্ত করিয়া দীর্ঘ দিন তাহার দৃঢ়তা ও উৎসাহ বজায় রাখিতে পারা যায় না।

জাপানী বোমার বিপদ জনসাধারণেরও যখন কোন অংশেই কম নয় তখন তাহাদের সাবধানতা অবলম্বন এবং সাহস ও দৃঢ়তা বজায় রাখার গুরুত্বও বলিয়া শেষ করা যায় না। সাবধানতা অবলম্বন এবং সাহস ও দৃঢ়তা বজায় রাখার ব্যবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্বও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দায়িত্বকে সামরিক এবং অসামরিক দুই দিক দিয়াই বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই করিয়াছেন। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রকাশ, কলিকাতা ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের সামরিক গুরুত্বপূর্ণস্থানে বিমান-বিধ্বংসী কামান যে-কোন মুহূর্ত্তে কার্য্যে নিয়োজিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। আর একটি সংবাদে প্রকাশ, গত ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রে কলিকাতায় বিমান হানার সময় একখানি জাপ বোমারু বিমান বিনষ্ট এবং দুইখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই সংবাদ কলিকাতাবাসীর মনে অবশ্যই সাহসের সঞ্চার করিয়াছে। এই সাহসকে সুদৃঢ় এবং স্থায়ী করা প্রয়োজন। জনসাধারণের সহিত সামরিক কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা দ্বারাই তাহা সম্ভব। এই সহযোগিতার জন্য যেমন জনসাধারণের তেমনি সামরিক কর্তৃপক্ষেরও দায়িত্ব আছে। এই সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষেরই অগ্রবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি।

অসামরিক ব্যবস্থার মধ্যে উপযুক্ত আশ্রয়-স্থানের ব্যবস্থা, বিমান আক্রমণে আহতদের চিকিৎসা এবং গৃহহীনদের আশ্রয় ও আহার্য্যের ব্যবস্থা এবং কলিকাতার জীবনযাত্রার ব্যবস্থা অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপযুক্ত আশ্রয়স্থানে অবস্থান করিলে বিমান হানায় হতাহতের সংখ্যা কম হয়। যথাসম্ভব সত্বর আহতদিগকে উদ্ধার করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলে আহতদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যাও অনেক কম হইয়া থাকে। এই তিনটির উপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারাও লোকের মনে সাহস সঞ্চার হইয়া থাকে। মানুষের মন যে চঞ্চল এবং সহজে ভয়-প্রবণ এই মনস্তাত্ত্বিক দিকটা উপেক্ষার বিষয় নহে। দেহ-ই মানুষের সাহস ও শক্তির উৎস। সুতরাং কলিকাতার সর্ব্বসাধারণের জীবন-যাত্রা যাহাতে ব্যাহত না হয়, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিতে পাওয়া যায়, পানীয় জলের অভাব না ঘটে, ট্রাম, বাস, রিক্সা প্রভৃতির চলাচল যাহাতে বন্ধ হইয়া না যায়, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বিমান আক্রমণের মধ্যেও মানুষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়া কলিকাতায় বাস করিতে পারে, কিন্তু খাদ্য ও পানীয় না হইলে একদিনও থাকা চলে না।

কলিকাতায় বিমান হানা দিবার মূলে জাপানের যে উদ্দেশ্যই থাকুক, জনগণের সাহস ও দৃঢ়তা দ্বারা তাহা ব্যর্থ করা সম্ভব। সাহস ও দৃঢ়তা রক্ষা করিবার জন্য যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন, তাহার আলোচনা এখানে আমরা করিলাম। প্রয়োজনের দাবী মিটাইতে কর্তৃপক্ষ দূরদৃষ্টি ও সুবিবেচনার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, ইহাই আমরা আশা করিতেছি।

—

বড়লাটের বক্তৃতা

বরাবরের মত এবারও বড়দিনের প্রাক্কালে বড়লাট শ্বেতাঙ্গ বণিকদের সভা এসোসিয়েটেড্ চেম্বার্স অব কমার্সের অধিবেশনে বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘ-বক্তৃতার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) ভৌগোলিক হিসাবে ধরিলে ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রকারেই এক ও অখণ্ড। এই ঐক্য রক্ষা করিবার প্রয়োজন অতীতে যেমন ছিল এখনও তেমনই রহিয়াছে, বরং আরও বাড়িয়াছে।

(২) গ্রেট বৃটেন ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে সম্মত নয় বলিয়াই ভারতে গোলযোগ দেখা দিয়াছে, এইরূপ মতবাদের সহিত তাঁহারা পরিচিত আছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা উহার বিপরীত। গ্রেট বৃটেন ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত বলিয়াই এই গোলযোগ দেখা দিয়াছে।

(৩) ভারতের বিভিন্ন বিরোধী স্বার্থের মধ্যে কোন সমন্বয় সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হয় নাই। গ্রেট বৃটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য একেবারে উন্মুখ হইয়াছেন, কিন্তু দায়িত্ব

কে গ্রহণ করিবে স্থির না হওয়াতেই অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ক্ষমতা হস্তান্তরে গবর্ণমেণ্টের অনিচ্ছা ইহার কারণ নহে।

ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবী কড়াক্রান্তি পর্য্যন্ত মিটাইবার সর্ত্তও তাঁহার বক্তৃতায় আছে। উহা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা না দিবার পক্ষে বৃটেনের তরফ হইতে প্রদত্ত চিরন্তন যুক্তি। বহুবার ইহার উত্তর দেওয়া হইলেও বৃটেন এই যুক্তি ত্যাগ করিতে রাজী নহেন। কাজেই নূতন করিয়া তাহার আলোচনা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। ভারতের ঐক্য খুব বড় কথা এবং বড়লাট তাহার উপর খুব জোরও দিয়াছেন। কিন্তু ক্রিপস-প্রস্তাবে ভারতের যে কোন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যকে ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে পৃথক থাকিবার অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ বিবেচনা করিয়া এই প্রস্তাবে উপনীত হইয়াছেন এবং এই প্রস্তাব এখনও বহাল আছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। ক্রিপস প্রস্তাবের পৃথক থাকিবার অধিকার এবং বড়লাটের ভারতীয় ভৌগোলিক ঐক্যের বাণীর মধ্যে কোন সামঞ্জস্য আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। ইহা কি গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিবার মতই ব্যবস্থা নয়? ক্রিপস-প্রস্তাবের ভারত ব্যবচ্ছেদের সম্ভাবনা মিঃ জিন্নার মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু হিন্দু মহাসভা ভারী চটিয়া গিয়াছিলেন। বড়লাটের ঐক্যের বাণীতে হিন্দু মহাসভার নেতারা লাফাইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু লীগপন্থীরা মুখ বেজার করিয়াছেন।

বৃটেন ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে ইচ্ছুক হওয়াতেই বর্ত্তমান অশান্তি কেন সৃষ্টি হইল বড়লাট সে সম্বন্ধে নীরব। নীরবতাটা কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তর বলিয়া গণ্য হইলেও এখানে হইতে পারে না। ক্ষমতা যাহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক এবং যাহারা ইচ্ছুক নয় এই গোলযোগটি তাহাদের মধ্যে? অর্থাৎ এক দল ক্ষমতা গ্রহণ করিতে চায় এবং আর একদল তাহাতে বাধা দিতেছে? অথবা দুই দলই নিজের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়া অপরকে ধ্বংস করিবার জন্য এই গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছে? ইহার কোন্‌টি ঠিক, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। গোলমালের কারণ সম্বন্ধে মিঃ চার্চ্চিল ও মিঃ আমেরীর উক্তি আমরা শুনিয়াছি। এদেশের অকংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ যাহা বলিয়াছে তাহাও আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু কোন উক্তির সহিত বড়লাটের উক্তির সামঞ্জস্য আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না।

বৃটেন ক্ষমতা ত্যাগ করিতে উন্মুখ হইয়া থাকার কথা বড়লাট বলিয়াছেন। কিন্তু উহা কিরূপ ক্ষমতা তাহা তিনি বলেন নাই। উহা কি জাতীয় গবর্ণমেণ্ট, না তাঁহার বর্ত্তমান সম্প্রসারিত শাসনপরিষদ? আগষ্টের ঘোষণায় প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন কথা নাই। ক্রিপস-প্রস্তাবেও যুদ্ধ চলিত থাকা অবস্থায় শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে কোন কথা নাই। মিঃ আমেরী বলিয়াছিলেন, যত দিন যুদ্ধ চলিবে ততদিন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দায়িত্ব ত্যাগ করিতে পারেন না। স্যার ক্রিপস বলিয়াছিলেন, সকল দল মিলিয়া দাবী করিলেও দেশ রক্ষার দায়িত্ব ভারতবাসীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। বড়লাটের ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা রহিত করার দাবীর উত্তরে তিনি কংগ্রেসী নেতাদিগকে বড়লাটের প্রাসাদের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং বৃটেনের ক্ষমতা হস্তান্তরের আগ্রহের ফলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল কিরূপে তাহা আমরা বুঝিলাম না। তবে বড়লাটের ভেটো দিবার ক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার আগ্রহকে অচল অবস্থার কারণ বলিলে অ অবস্থার কারণ কতকটা বুঝিতে পারা যায় বটে।

জমিদারী প্রথা ও হক সাহেবের প্রস্তাব

ভূমিরাজস্ব কমিশনের সুপারিশ সম্বন্ধে মৌলবী ফজলুল হক সাহেব সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়াছেন। বাংলার প্রধান মন্ত্রী হিসাবে এই বিবৃতি দেন নাই, দেশবাসীর বিবেচনার জন্য তাঁহার ব্যক্তিগত প্রস্তাব তিনি উপস্থিত করিয়াছেন। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বাংলার সমস্ত ভূ-স্বামীদের স্বত্ব গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ক্রয় করা অসম্ভব, এই স্বীকার্য্যের উপর তাঁহার প্রস্তাব প্রতিষ্ঠিত।

হক সাহেব তাহার প্রস্তাবকে বিপ্লবাত্মক বলিলেও আসলে জমিদার ও জমিদারী রাখিয়াই তিনি জমিদারী

ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে চান। আইন করিয়া বলা হইবে, এখন হইতে বাংলার সমস্ত ভূমি, জলাশয়, বন এবং খনির মালিকান স্বত্ব গবর্ণমেণ্টে বর্ত্তাইল। কৃষকদের দখল অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহারা উৎপন্ন ফসলের এক ষষ্ঠাংশ সরাসরি ভাবে গবর্ণমেণ্টকে খাজানা দিবে। ইহা ছাড়া পথকর, বনকর, চৌকিদারী ট্যাক্স প্রভৃতি কিছুই তাহাদিগকে দিতে হইবে না। কিন্তু জমিদারও রহিল, তাহাদের জমিদারীও গেল না, তবে তাঁহাদের আয়টা অর্দ্ধেক কমিয়া যাইবে। জমিদারগণ তাঁহাদের জমিদারীর অন্তর্গত: কৃষকদের নিকট গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে খাজানা আদায়কারী হিসাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরে গড়ে তাহাদের যে আয় হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক পাইবেন। খাজানা, রাজস্ব, ট্যাক্স কিছুই তাঁহাদের দিতে হইবে না। এই 'অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' নীতি গ্রহণ করিতে জমিদারগণ রাজী হইবেন কি না জানি না; কিন্তু এই ব্যবস্থায় কৃষকদের কি লাভ হইবে?

খাজানা ইত্যাদির বোঝা তাহাদের লাঘব হইবে বটে, কিন্তু তাহাদের দুরবস্থা দূর হইবে কি? কৃষকদের জোতের আয়তন যেমন ছিল তেমনি থাকিবে। কোন কৃষক ৫০ বিঘা জমির বেশী পাইবে না। যাহাদের ৫০ বিঘার বেশী আছে তাহাদের ৫০ বিঘা রাখিয়া বাকী জমি ছোট ছোট কৃষকদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। ৫০ বিঘার বেশী জমি আছে, এরূপ কৃষকদের সংখ্যা দশ গ্রামে একজন মিলিবে কি না সন্দেহ। কাজেই উদ্বৃত্ত জমি এমন কিছু পাওয়া যাইবে না যাহা বণ্টন করিয়া দিলে ছোট ছোট কৃষকদের কিছু লাভ হইবে। অথচ ইহাদের সংখ্যাই বোধ হয় শতকরা ৯৯ জন। সুতরাং হক সাহেবের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলেও কৃষকদের অবস্থা পূর্ব্বের মতই থাকিবে।

—

মার্কিন গবর্ণমেণ্টের শ্বেত-পত্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট একটি শ্বেত-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। পার্লবন্দর আক্রান্ত হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরে দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম নিবারণের জন্য মার্কিন গবর্ণমেণ্ট কি কি করিয়াছেন তাহা এই শ্বেত-পত্রে বিবৃত হইয়াছে। ১৯৩১ সালে জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রান্ত হয়, ১৯৪১ সালে জাপান অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে পার্লবন্দর আক্রমণ করে। এই দশ বৎসরে জার্ম্মানী, ইটালী এবং জাপানের আক্রমণাত্মক কার্য্যাবলীও এই শ্বেত-পত্রে আলোচিত হইয়াছে।

জাপানই সর্ব্বপ্রথম ১৯৩১সালে মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করিয়া আন্তর্জ্জাতিক জাতি-সঙ্ঘের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের পথ প্রদর্শন করিল। তাহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ১৯৩৫ সনে ইটালী করিল আবেসিনিয়া অধিকার। তার পরই জার্ম্মানী ও ইটালীর সাহায্যে পুষ্ট হইয়া জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনে গৃহ-যুদ্ধের সূচনা করিলেন এবং বৃটেনের হস্তক্ষেপ না করার নীতির ফলে শেষ পর্য্যন্ত জেনারেল ফ্রাঙ্কোরই জয়লাভ করার সুবিধা হইয়াছিল। রয়টার পরিবেশিত শ্বেত-পত্রের বিবরণে স্পেনের গৃহ-যুদ্ধের উল্লেখ আমরা দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু ইহার পরই ইউরোপ অতিক্রুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। হিটলারের উদ্দেশ্য সহজেই সকলের নিকট পরিস্ফুট হইতেছিল। লোকার্নো চুক্তি ভঙ্গ, রাইনল্যাণ্ডে দুর্গ নির্ম্মাণ, অষ্ট্রিয়া অধিকারের ভিতর দিয়া হিটলারের কূটনীতি মিউনিক চুক্তিতে পরিণতি লাভ করিল। তার পর হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ এবং বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত। জার্ম্মেনী ক্রমে প্রায় সমগ্র ইউরোপ অধিকার করিয়া ১৯৪১ সালের জুন মাসে রাশিয়া আক্রমণ করিল। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে জাপান কর্ত্তৃক অতর্কিতে পার্লবন্দর আক্রান্ত হওয়া এবং আমেরিকার বিশ্বযুদ্ধে যোগদান।

মার্কিন শ্বেত-পত্রে বলা হইয়াছে, "যে আন্তর্জ্জাতিক নীতি অনুসরণ করিলে পৃথিবীর জাতিসমূহ নিরাপত্তা, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতদিন এই নীতিই প্রচার করিয়াছেন, উহাকে কার্য্যকরী রূপ দিয়াছেন এবং অন্যান্য গবর্ণমেণ্টকে উক্ত নীতি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।" জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপানের রাজ্য লোভই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ। লোভ করিও না, এই নীতি প্রচার করিয়া সাম্রাজ্য লোভ নিবারণ করা যায় না। সাম্রাজ্যলোভীরা সাম্রাজ্যরক্ষীদের সদুপদেশে কর্ণপাত না করিলে তাহা-

দিগকে উপদেশ গ্রহণে বাধ্য করিবার উপায় কি? মার্কিন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নীতিকে কার্য্যকরী রূপ দিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবে কার্য্যকরী রূপ দিয়াছেন, তাহার আভাস আমরা পাইলাম না। আক্রমণাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র বিসর্জ্জন দিবার জন্য জেনেভা কন্‌ফারেন্সে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সুপারিশের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সাম্রাজ্য থাকিলে সাম্রাজ্য লোভও থাকিবে, কাজেই সাম্রাজ্য রক্ষায় প্রয়োজন থাকিবেই। ফ্রান্সের সন্দেহটা বোধ হয় একেবারে অমূলক ছিল না। নিরস্ত্রকরণের সঙ্গে নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততাও ফ্রান্স দাবী করিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদ রক্ষা করিয়া তাহা করা কঠিন। কেহ অস্ত্র-শস্ত্র বৃদ্ধি করিলে তাহাতে বাধা দিবার উপায় কি?

জাপান যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে তাহা টোকিয়স্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ১৯৩২ সালেই মার্কিন গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া সতর্ক করিয়াছিলেন। কিন্তু জাপানকে সন্তুষ্ট করিয়া শান্তিরক্ষার নীতিই কি মার্কিন রাষ্ট্র গ্রহণ করেন নাই? জাপান যখন সমস্ত নীতি বিসর্জ্জন দিয়া চীন আক্রমণ করিল তখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপান তোষণ নীতি বর্জ্জন করেন নাই। পার্লবন্দর আক্রান্ত হওয়া পর্য্যন্ত জাপানকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টাই কি চলে নাই?

শ্বেত-পত্রের যেটুকু বিবরণ আমরা পাইয়াছি তাহাতে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিবারণের জন্য মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা আসলে বিভিন্ন শক্তির Status quo বজায় রাখারই প্রচেষ্টা। সাম্রাজ্য লোভের মীমাংসা শান্তিপূর্ণ উপায়ে হওয়া কি সম্ভব? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গত বৎসরের প্রচেষ্টা সার্থক হয় নাই। যুদ্ধের পরে স্থায়ী শান্তি প্রচেষ্টায় সুযোগ আবার আসিতেছে। কি জন্য ১০ বৎসরের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভাবী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে না।

—

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বাণী

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মার্কিন কংগ্রেসের নিকট যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্ব-সংগ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুদ্ধের অবস্থা পর্য্যালোচনা করা এবং ইউরোপে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণের ইঙ্গিত দেওয়ার সঙ্গে যুদ্ধোত্তর বিশ্বের সুখশান্তি এবং আমেরিকার নিজের ঘরের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার কথাও আলোচিত হইয়াছে।

যুদ্ধের পর পরাজিত শত্রুকে নিরস্ত্র রাখার উপরেই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বিশেষ জোর দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই কি স্থায়ী শান্তি এবং বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতা ও ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে? বিজয়ী শক্তিবর্গ যদি নিজেদের অধীনস্থ দেশগুলিকে স্বাধীনতা না দেন, তাহা হইলে শুধু অস্ত্রবলের দ্বারা যুদ্ধের মূল কারণ সাম্রাজ্য লোভ নিবারণ করা সম্ভব হইবে কি? চারি প্রকার স্বাধীনতার কথা প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ইতিপূর্ব্বে অনেক বার বলিয়াছেন, আলোচ্য বাণীতেও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। জার্ম্মানী ও জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত দেশ-গুলির জন্যই শুধু উক্ত চারি প্রকারের স্বাধীনতার প্রয়োজন নয়, মিত্রশক্তিবর্গের অধীন এসিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির জন্যও তাহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এসিয়া ও আফ্রিকার যে-সকল দেশ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই বৈদেশিক শাসনাধীন তাহাদের সম্বন্ধে ঐ চারি প্রকার স্বাধীনতা কি ভাবে প্রযোজ্য হইবে, তাহা এ পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলেন নাই।

আমেরিকার নিজের ঘরের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আমেরিকাবাসী যথেষ্ট সজাগ। কাজেই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বাণীতেও তাহা থাকা ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিশেষত ১৯৪৪ সালে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের সময় আসিতেছে। সম্প্রতি আমেরিকায় যে নির্ব্বাচন হইয়া গেল তাহাতে রিপাবলিকান দলের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডিমোক্রাটরাই এখনও সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইলেও যুদ্ধের পরে আমেরিকায় যে-সকল দাবী উত্থিত হইবে তাহা তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি ঐগুলিকে 'ইস্যু' করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে না যাইয়া বড় বড় উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিন্ত আছেন, তবে যুদ্ধের পর আমেরিকার ঘরোয়া ব্যাপার যে খুব সহজ হইবে না তাঁহার বাণী হইতে তাহা বোধ হয় অনুমান করা যায়।

—

বীর সাভারকরের অভিভাষণ

বীর সাভারকরের সভাপতিত্বে কাণপুরে নিখিল-ভারত হিন্দু মহাসভার চতুর্ব্বিংশতি অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি বীর সাভারকর তাঁহার অভিভাষণে মিঃ জিন্নার পাল্টা সুর ধরিয়া হিন্দুস্থানে হিন্দুদিগকেই তাহাদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের জন্য নেশন বা রাষ্ট্রজাতি রূপে দাবী করিয়াছেন। তাঁহার মতে মুসলমানগণ একটি সম্প্রদায় ছাড়া আর কিছু নয়। ইহা যে মিঃ জিন্নার দ্বৈত রাষ্ট্রজাতি মতবাদের (Two Nations Theory) পাল্টা জবাব ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুই বীরের চাপান-উতোরে ভারতে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার বিঘ্নই শুধু হইতেছে। গোত্রজাতি (race) হিসাবে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট নৈকট্য আছে,—ভারত-বাসীরা একটা মিশ্র গোত্রজাতি। বহুদিন একসঙ্গে বাস করিয়া তাহারা একজাতিত্ব লাভ করিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর ভারতের একরাষ্ট্রজাতিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে মুসলিম লীগ ও হিন্দুমহাসভা শুধু বাধাই জন্মাইতেছে। এই সত্য লীগ এবং মহাসভার নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ইহাতে যে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই অনিষ্ট হইতেছে, সাম্প্রদায়িক নেতা হিসাবে সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্যও তাহা তাঁহাদের উপলব্ধি করা উচিত।

বীর সাভারকরের অভিভাষণে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ভারতের অখণ্ডত্ব। মিঃ জিন্না দ্বৈতজাতির ধুয়া তুলিয়া ভারতকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবার পক্ষপাতী। বীর সাভারকরের দাবী 'কোন প্রদেশকে তাহা যেরূপ প্রদেশই হউক না কেন তাহার নিজের ইচ্ছামত হিন্দুস্থানের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র হইতে বাহিরে থাকিবার দাবী স্বীকার করা হইবে না।' তিনি কোন প্রদেশেরই কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছার বিরোধিতা করিবার অধিকার স্বীকার করিতে চান না। ইহা অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রদেশের থাকিবে, কংগ্রেসের এই প্রস্তাবেরও প্রতিবাদ।

ভৌগোলিক ভারত এক ও অখণ্ড হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র ভারতবাসী মিলিয়া একরাষ্ট্রজাতি হওয়া সত্ত্বেও প্রাদেশিক বিভিন্নতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতের অখণ্ডত্ব রক্ষা করিতে হইলে উহাকে বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যের প্রজাবৃন্দের স্বাধীন ইচ্ছার উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, কেন্দ্রীয় সরকার বাহির হইতে তাহা কাহারও উপর চাপাইয়া দিতে অধিকারী নয়। এইখানেই ভারতীয় ঐক্য ও অখণ্ডত্বের বিশেষত্ব। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও এই সত্যের যাথার্থ্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। মিঃ জিন্নার দাবীর ন্যায় বীর সাভারকরের দাবীও ভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বিঘ্নই করিতেছে।

—

নিখিল-ভারত শিক্ষা-সম্মেলন

এবার নিখিল-ভারত শিক্ষা-সম্মেলনের অধিবেশন ইন্দোরে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ এম. আর. জয়াকর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাঃ জয়াকর তাঁহার অভিভাষণে ভারতের জনসাধারণের জন্য একটা নূতন শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। এই শিক্ষাপ্রণালী অধিকতর ব্যাপক ও নির্দোষ হইবে এবং উদ্দেশ্য হইবে 'সত্য', 'সুন্দর' ও 'স্বাধীনতা'র জন্য জীবন্ত আগ্রহ জাগাইয়া দেওয়া এবং জাতীয় ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। শিক্ষার এই মূল নীতি সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উহাকে বাস্তব রূপ দিবার ধারাটি কি হইবে এবং কি ভাবে তাহাকে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব, তাহা লইয়া বিতর্কের সম্ভাবনা বোধ হয় উপেক্ষা করা যায় না।

শিক্ষার ধারা সম্পর্কে ডাঃ জয়াকর বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষে শিক্ষার যে ধারা চলিয়া আসিয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেই ভিত্তির উপরেই আমাদের শিক্ষাপ্রণালী গঠন করিতে হইবে।" তিনি মনে করেন, ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে সেই ভারতীয় শিক্ষার ধারার পরিচয় পাওয়া যায় এবং উহার লক্ষ্য ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা। তিনি বলিয়াছেন, "ইহা শাস্ত্রের অসঙ্গত বিধান মানিবে না, রাজনীতি বা ধর্ম্মের নেতাদের গোঁড়ামি দ্বারা বাধ্য হইবে না।" খুবই ভাল কথা। প্রাচীন সাহিত্যে কিরূপ শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় এবং প্রাচীন সাহিত্য বলিতে ভারতের কোন্ যুগের সাহিত্যকে

লক্ষ্য করিতেছেন, ইহা একটা বড় প্রশ্ন। এই দ্বিতীয় প্রশ্ন—এই শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিবেন কে বা কাহারা?

শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষাব্রতীদের কোন হাত নাই। অধ্যাপক শর্ম্মা শিক্ষা-সম্মেলনে স্পষ্ট করিয়াই একথা জানাইয়াছেন। তাঁহার কথা অত্যন্ত সত্য। শিক্ষা-ব্রতীদেরও প্রত্যেকেরই নিজস্ব রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মমত আছে। তাহার প্রভাব কি তাঁহারা অতিক্রম করিতে সমর্থ? দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রের তহবিল হইতে উহার ব্যয় বহন না করিলে শিক্ষাব্যবস্থা চলিতে পারে না। সর্ব্বোপরি সমগ্র দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ঐক্য থাকা প্রয়োজন। এই ঐক্য-বিধান করিবার ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রেরই আছে। রাষ্ট্র যাঁহারা পরিচালন করিবেন তাঁহাদের রাজনৈতিক মতামত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করিবে না, একথা বলা অসম্ভব।

প্রাচীন ভারতে লেখাপড়া শিক্ষাটা শ্রেণীবিশেষের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। জনসাধারণের জন্য ছিল বৃত্তিমূলক শিক্ষা যাহা কালক্রমে জাতিভেদে রূপান্তরিত হইয়াছে। জনসাধারণেরও যে লেখাপড়া জানার প্রয়োজন আছে, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে খুব বেশী দিনের কথা নয়। আমাদের দেশে এই স্বীকৃতি আজও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। শিক্ষাকে ব্যাপক এবং নির্দ্দোষ করিতে হইলে প্রয়োজন গণরাষ্ট্রের। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তি সমাজের অঙ্গ, সমাজের নিকট তাহার দায়িত্ব তাহার ব্যক্তিস্বাধীনতার সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। দেশের সকলকে লইয়াই সমাজ। এই দিক দিয়াও একমাত্র গণরাষ্ট্র ব্যাপক এবং নির্দ্দোষ শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ।

—

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ত্রিংশ অধিবেশন কলিকাতায় সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিগত অধিবেশনে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তিনি কারারুদ্ধ থাকায় মিঃ ডি, এন ওয়াদিয়া এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব, কৃষি-পতঙ্গ তত্ত্ব, রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, ভূগোল ও ভূতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, গণিত ও সংখ্যাবিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন শাখা আছে। এই সকল শাখা-সভার সভাপতিগণ যে সকল মূল্যবান সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা আমাদের সীমাবদ্ধ স্বল্প স্থানে অসম্ভব। আমরা মূল সভাপতি মিঃ ওয়াদিয়ার অভিভাষণই এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

মূল সভাপতি মিঃ ওয়াদিয়া তাঁহার অভিভাষণে খনিজ সম্পদের উৎস হিসাবে ভারতের গুরুত্ব এবং শান্তি ও যুদ্ধের দিক হইতে পৃথিবীর খনিজ-সম্পদ সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ বিশ্ব-যুদ্ধ নিবারণের জন্য তিনি পৃথিবীর খনিজ-সম্পদ বণ্টন-নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দিয়াছেন। মানুষ ধাতু এবং অন্যান্য খনিজ-সম্পদ ব্যবহার করিতে শিখিয়াই শিকার ও কৃষিস্তর অতিক্রম করিয়া সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। আবার সুসভ্য মানুষ এই ধাতু ও অন্যান্য খনিজ সম্পদকে রণসম্ভার নির্ম্মাণের কাজে নিয়োজিত করিয়া যুদ্ধরূপ ধ্বংস-দানবকে সৃষ্টি করিয়াছে। যুদ্ধের ফলে খনিজ সম্পদের কিরূপ অপচয় হইতেছে তাহা উল্লেখ করিয়া মিঃ ওয়াদিয়া বলিয়াছেন, "দুইটি মহাযুদ্ধের ফলে যে পরিমাণ খনিজ পদার্থের অপচয় ঘটিয়াছে ভবিষ্যতেও যদি পুনঃপুনঃ যুদ্ধের ফলে সেইরূপ খনিজ পদার্থের অপচয় ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীর খনিজ সম্পদও কয়েক পুরুষের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

খনিজ সম্পদের অপচয় নিবারণ এবং যুদ্ধ নিবারণ দুই-এর মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। মিঃ ওয়াদিয়া বলিয়াছেন, "এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, শেষের দিকে যে সকল যুদ্ধ বাধিয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক যুদ্ধ এই খনিজ সম্পদের লোভেই বাধিয়াছে।" বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে যে অক্ষশক্তিবর্গ ইচ্ছামত যুদ্ধে ব্যবহার্য্য খনিজ-পদার্থ সংগ্রহ করিয়াছে এবং সেই মজুত খনিজ পদার্থের জোরেই তাহারা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। খনিজ সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

দ্বারাই ভবিষ্যৎ যুদ্ধ নিবারণ করা সম্ভব, ইহাই তাঁহার অভিমত। এই প্রসঙ্গে মিঃ ওয়াদিয়া আটলান্টিক সনদের চতুর্থ ধারা আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত ধারায় সমগ্রপৃথিবীর কাঁচামাল সমসর্তে পাইবার অধিকার সমস্ত দেশের থাকিবে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মিঃ ওয়াদিয়া মনে করেন, "আটলান্টিক সনদ দ্বারা যদি পৃথিবীর সমুদয় শান্তিপ্রিয় দেশ উপকৃত না হয়, তাহা হইলে উহার আংশিক প্রয়োগে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে খনিজ-সম্ভার বিতরণ ব্যবস্থা সার্থক হইবে না এবং পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যুদ্ধ ব্যাধির সংক্রমণ বন্ধ করার চেষ্টা সার্থক হইবে না।" শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "আন্তর্জ্জাতিক কোন নিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘের সুচিন্তিত ও ন্যায্যভাবে পরিকল্পিত আন্তর্জ্জাতিক খনিজ-নীতি অনুসরণ দ্বারাই প্রকৃতিদত্ত খনিজ সম্পদে বিভিন্ন ভাবে সমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব বজায় রাখা সম্ভব।"

মিঃ ওয়াদিয়ার প্রস্তাবকে আমরা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে না পারিলেও যুদ্ধ নিবারণের উহা অন্যতম উপায় বলিয়া মনে করি। কারণ পৃথিবীর সমস্ত দেশে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাঁহার প্রস্তাবিত আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘ সার্থকতার সহিত কাজ করিতে সমর্থ হইবে ইহাতে যুদ্ধের জন্য খনিজ পদার্থ সংগ্রহের ইচ্ছা আর থাকিবে না, মানুষের সুখ শান্তির জন্য খনিজ সম্পদ নিয়োজিত হইতে পারিবে।

—

ভারতীয় সংখ্যাবিজ্ঞান সম্মেলন

ভারতীয় সংখ্যাবিজ্ঞান কংগ্রেসের ষষ্ঠবার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায় সম্পন্ন হইয়াছে। সভাপতি ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার অভিভাষণে জাতিগঠন কার্য্যে সংখ্যাবিজ্ঞানের প্রয়োজনীতার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুত সরকার যথার্থই বলিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংগৃহীত প্রয়োজনীয় সাংখ্যিক তথ্যাদির সাহায্য ছাড়া কোন খাঁটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গঠন করা সম্ভব নয়। তাঁহার কথাগুলিও যে কত সত্য তাহা রাশিয়ার তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্য্যালোচনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত সংখ্যাবিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞের দ্বারা নির্ভুল ভাবে সাংখ্যিক তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু দুই-একটি ক্ষেত্র ছাড়া ভারতে যে ঐ রূপ কোন ব্যবস্থা নাই তাহা শ্রীযুত সরকার স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যিক তথ্যাদি সম্বন্ধে জনসাধারণ সহজে সচেতন কোন সময়ই হয় না। জাতি-গঠনের দায়িত্ব যাঁহাদের তাঁহারাই নির্ভুল ভাবে উহা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সুতরাং সাংখ্যিক তথ্য সংগ্রহ এবং জাতি-গঠন কার্য্যে উহার নিয়োগের সহিত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা না থাকায় এতদিন যে ভারতের জাতিগঠন কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা শ্রীযুত সরকারও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আশার বাণী শুনাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পর ভারতবাসী যে নিজেদের অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার স্বাধীনতা পাইবে, তাহার যথেষ্ট লক্ষণ তিনি দেখিতে পাইয়াছেন।

যুদ্ধের সময়ই হউক আর শান্তির সময়ই হউক পরিকল্পনার জন্য সাংখ্যিক তথ্যাদির প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে শ্রীযুত সরকারের সহিত আমরা একমত। কিন্তু শুধু সাংখ্যিক তথ্যাদি সংগৃহীত হইলেই কি পরিকল্পনা সার্থক হয়? সাংখ্যিক তথ্যাদি যে আমাদের দেশে সংগৃহীত হইতেছে না, তাহা নয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আমাদের দেশে ব্যর্থ হইল কেন? গবর্ণমেণ্ট যখন যে জিনিষের দাম বাঁধিয়া দেন, তখনই বাজারে সেই জিনিষের দুর্ভিক্ষ হয়, কিন্তু অত্যধিক দাম দিয়া ব্ল্যাক মার্কেটে প্রচুর পরিমাণেই তাহা কিনিতে পাওয়া যায়। পাট চাষের যে পূর্ব্বাভাষ আমাদের দেশে প্রকাশিত হয়, তাহাও সাংখ্যিক তথ্য। কিন্তু উহা দ্বারা পাট-চাষীর কল্যাণ না হইয়া ফাটকাওয়ালা ও পাটকলের মালিকগণ কর্ত্তৃক পাট-চাষীদের শোষণেরই সহায়তা হইয়া থাকে। যুদ্ধের পরে অনেক নূতন নূতন অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইবে। প্রত্যেক সমস্যার জন্য পূর্ব্ব হইতেই আমরা যদি সংখ্যাবিজ্ঞান পরিকল্পিত পটভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলেই ঐ সমস্যার কার্য্যকরী সমাধান সম্ভব হইবে। এ সম্বন্ধেও শ্রীযুত সরকারের সহিত

আমরা একমত। কিন্তু শুধু সাংখ্যিক তথ্যদ্বারাই কি এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব? সাংখ্যিক তথ্য নিষ্ক্রিয় পদার্থ, উহা দ্বারা জনগণের কল্যাণও করা যায়, আবার শোষণের ব্যবস্থাও করা যায়। উহা কোন্ কাজে নিয়োজিত হইবে, তাহা নির্ভর করে পরিকল্পনা গঠনকারীদের উপরে। প্রকৃত সমস্যা এইখানেই।

—

নিখিল-ভারত রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলন

আগ্রায় নিখিল-ভারত রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছেন অধ্যক্ষ গুরুমুখ সিং। তিনি তাঁহার অভিভাষণে যে-সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যার সমাধানের উপায় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাধানের প্রচেষ্টা কি করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে তাহা নির্দেশ করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন, মিশ্র-মন্ত্রিসভা গঠন, ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতার গ্যারাণ্টি এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা উত্তম সূচনা সূচিত হইতে পারে। তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে এবং আইন ও রাষ্ট্র নীতিকে ব্যক্তি, স্থান বা সম্প্রদায়ের দিক হইতে না দেখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি আশা করেন, এই পন্থা অনুসরণ করিয়া কালক্রমে জাতীয়তাবিহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিতে তিনি কি বুঝেন অধ্যক্ষ গুরুমুখ সিং তাহা বলেন নাই। মনে হয়, বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তিনি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন করিবার আশা করেন। কিন্তু তাহা সম্ভব কি? একমাত্র রাশিয়াতেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যাও সেখানে নাই। বিলাতের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক মিঃ এইচ, জি, ওয়েলস সাম্যবাদ পছন্দ করেন না। কিন্তু তিনিও সম্প্রতি এক প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন যে, ষ্টালিন রাশিয়ান সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমস্যা চিরদিনের জন্য সমাধান করিতে পারিয়াছেন। মিঃ ওয়েলস্ মনে করেন, ধর্ম ও ভাষার দিকদিয়া মানচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা যতদিন থাকিবে ততদিন সংখ্যালঘিষ্ঠের সমস্যাও থাকিবে। কিন্তু শুধু মানচিত্র অঙ্কনের পদ্ধতির পরিবর্ত্তন দ্বারা সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যার সমাধান রাশিয়া করে নাই। রাশিয়া তাহার সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া তাহারই উপর শাসনতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বলিয়াই সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যার সমাধান হইয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্র হইতে ভারতের শাসনতন্ত্র গঠনের উপাদান অনায়াসেই সংগ্রহ করা যাইতে পারে এবং তাহাতেই প্রকৃত পক্ষে সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব।

—

নিখিল-ভারত ভেষজ-সম্মেলন

অধ্যাপক এম. এল. স্বরফের সভাপতিত্বে নিখিল-ভারত ভেষজ সম্মেলনের অধিবেশন কাশীতে সম্পন্ন হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে ঔষধ প্রস্তুত সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্যের কথা উল্লেখ করেন। জনস্বাস্থ্যের দিক দিয়া ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষার গুরুত্ব বলিয়া শেষ করা যায় না। গবর্ণমেণ্ট কেন ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছেন না, তাহা কি সত্যই বিস্ময়ের বিষয় নয়? অধ্যাপক স্বরফ বলেন, ঔষধ প্রস্তুত করা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশে কয়েকটি কলেজ চালু করিবার জন্য ডাক্তার সাপিরো দুই লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। বাংলা দেশে যাঁহারা ঔষধ প্রস্তুত করেন তাঁহারা নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে যে গবর্ণমেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুতর দায়িত্ব আছে তাহা তাঁহারা কবে উপলব্ধি করিবেন?

—

বঙ্গীয় চিকিৎসক-সম্মেলন

বঙ্গীয় চিকিৎসক-সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতি ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ডাক্তারী শিক্ষার ব্যবস্থা এবং ডাক্তারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মেডিকেল স্কুলের শিক্ষা অন্ততঃ পাঁচ বৎসর হওয়া প্রয়োজন বলিয়া তিনি মনে করেন। আমাদের মনে হয় মেডিকেল গ্রাজুয়েট এবং লাইসেন্সিয়েট এই বিভাগ তুলিয়া দেওয়া উচিত। লাইসেন্সিয়েট ডাক্তারগণও

অনেক দিন ধরিয়া এই দাবী করিয়া আসিতেছেন। মেডিকেল স্কুলগুলি কলেজে পরিণত করা অসুবিধাজনক হইলে স্কুলের শিক্ষা শেষ করার পর দুই বৎসর মেডিকেল কলেজে পড়িবার ব্যবস্থা করিলেই সহজে এই কৃত্রিম পার্থক্য দূর করা সম্ভব।

মেডিকেল গ্রাজুয়েট হওয়ার পর পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার চর্চ্চা সম্বন্ধে ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর সহিত আমরা একমত। কিন্তু আমাদের দেশে ঐরূপ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ফ্যাকালটির এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত। চিকিৎসক ব্যবস্থা লাভজনক নয়, এই ধারণার ফলেই ডাক্তারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাঃ চ্যাটার্জ্জী মনে করেন, জন-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সুপরিচালিত ও সুপরিকল্পিত নীতির অভাবেই এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। জন-স্বাস্থ্য এবং পল্লী-চিকিৎসক সম্বন্ধে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া একমাত্র গবর্ণমেণ্টই ইহার প্রতিকার করিতে পারেন।

পরলোকে স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ

পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁর অপ্রত্যাশিত অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীর দুঃখ অনুভব করিতেছি। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হইল তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথম জীবনে তিনি সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে রাজনীতিকের জীবন গ্রহণ করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নরমপন্থী। তাঁহার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। পাঞ্জাবের ইউনিয়নিষ্ট পার্টি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত দল। এই দলের নেতারূপেই তিনি ১৯৩৭ সনের নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়াই পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। যে কারণেই হউক, পরে তিনি মুসলিম লীগ দলে যোগদান করিলেও লীগের সাম্প্রদায়িক নীতি তিনি পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পাকিস্থানের নীতিও তাঁহার সমর্থন লাভে বঞ্চিত ছিল। মনে প্রাণে তিনি লীগপন্থী হইতে পারেন নাই। লীগ দলে যোগ দিয়াও তিনি ইউনিয়নিষ্ট পার্টির নেতা ছিলেন। হিন্দু এবং শিখদের মনে যাহাতে আঘাত না লাগে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে তিনি মন্ত্রি-সভার নীতি পরিচালন করিয়াছেন। তিনি বরাবরই ঐক্যের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার মনে হয়ত আশা ছিল লীগ একদিন তাহার আত্মঘাতী নীতি বর্জ্জন করিবে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, দেশের এই সঙ্কট সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার জীবনাবসান হইল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

খুচরা মুদ্রার দুর্ভিক্ষ

তামার পয়সার অভাব আমাদের রহিয়াই গিয়াছে। বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সমিতি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক পত্রে ভারতের টাকশালগুলি অষ্ট্রেলিয়ার জন্য তাম্র মুদ্রা তৈয়ারে ব্যাপৃত থাকার কথা উল্লেখ করেন। উক্ত সংবাদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ভারতের টাকশাল-গুলিতে অষ্ট্রেলিয়ার জন্য তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত করিতেছেন না এই সংবাদে আমরা আশ্বস্ত হইলেও রেজগীর অভাব আমাদের মিটিতেছে না; বাজারে ভাঙ্গানী আর পাওয়া যায় না। ব্যক্তিগত এবং ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় রেজগীর অতিরিক্ত রাখা ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে দণ্ডনীয় করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও রেজগীর অভাবের কোন প্রতিকার হইয়াছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে না। প্রত্যেক দোকানদারই ঠিক ঠিক দামটি চায়, ভাঙ্গানী দিতে রাজী নয়। কাজেই জিনিষ যাহাদের কিনিতে হয় রেজগী দিয়াই তাহারা জিনিষ কিনে। দোকানদাররা রেজগী শুধু পায়ই, কিন্তু তাহারা ভাঙ্গানী দেয় না। বাজার করিতে যাইয়া মোকদ্দমা সৃষ্টি করা জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। কর্ত্তৃপক্ষের এবিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মত উহাও যেন ব্যর্থ না হয়।

চীনে বিদেশীদের বিশেষ অধিকার

চীনে বৃটিশের বিশেষ অধিকার লোপ করিয়া গত ১১ই জানুয়ারী বৃটেন এবং চীনের মধ্যে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত

হইয়াছে। চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অনুরূপ একটি সন্ধি হইয়াছে। চীনে এতদিন তাঁহারা যে বিশেষ অধিকার ভোগ করিতেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা ভোগ করিবার অধিকার তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং এই সন্ধিদ্বারা উহার সংশোধন হইল মাত্র। হংকং সম্বন্ধে এখনও কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই। যুদ্ধের পর হংকং চীনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে কিনা, ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

—

ব্রহ্ম পুনরাধিকারের সংগ্রাম আরম্ভ

কলিকাতায় প্রথম বিমানহানার কয়েকদিন পূর্ব্বে বৃটিশবাহিনী আরাকানের সীমা হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া পশ্চিম ব্রহ্মে অভিযান করে। এই অভিযানের দ্বারা ব্রহ্মদেশ পুনরধিকারের সংগ্রাম সুরু হইয়াছে। ১৯শে ডিসেম্বরের সম্মিলিত সামরিক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, বৃটিশ সৈন্য আকিয়াবের ৬০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মংদ এবং বুথিডং এলাকা দখল করিয়াছে। জাপানীরা কোনপ্রকার বাধা না দিয়া বৃটিশ সৈন্য পৌছিবার পূর্ব্বে ঐ স্থান হইতে সরিয়া যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বৃটিশ চলিয়া আসিবার পর জাপানীরা ঐ অঞ্চল দখল করিয়া সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিল।

বৃটিশ সৈন্য কিছুদিন পূর্ব্বে মাউং সহর দখল করিয়াছে। বর্ত্তমানে আরাকান জেলায় মাযু নদীর দুই দিকে মাযু উপত্যকায় এবং রাথেডাউং-এর নিকট যুদ্ধ চলিতেছে। একটি প্যাগোডা সম্বলিত পাহাড় অধিকৃত হইয়াছে এবং ডনবেক দখল করার যুদ্ধেও কিছু সাফল্য লাভ করা গিয়াছে। কিছুটা অগ্রগতি সম্ভব হইলেও শত্রুপক্ষ প্রবলভাবে বাধা দিতেছে। ব্রিটিশ ও মার্কিন বিমানবহর আকিয়াবে এবং ব্রহ্মের অন্যান্য জাপ ঘাঁটিতে হানা দিয়া বোমাবর্ষণ করিতেছে। উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্মের প্রধান সংযোগ মিট্‌লে সেতুটি ভাঙ্গিয়া দিবার দাবী করা হইয়াছে।

—

সোভিয়েট রণাঙ্গন

রুশ রণাঙ্গনের সংবাদই বর্ত্তমানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রাশিয়ার লালফৌজ ষ্টালিনগ্রাডের সম্মুখবর্ত্তী অঞ্চলে, ককেশাসে এবং মধ্য রণাঙ্গনে বিরাট আক্রমণ চালাইতেছে। লালফৌজের অগ্রগতির ফলে ককেশাসে জার্ম্মান বাহিনীর বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। ককেশাসস্থ জার্ম্মান বাহিনী পশ্চাৎ অপসরণ করিলেও লালফৌজ এত দ্রুত অগ্রসর হইতেছে যে তাহারা সময় থাকিতে পলাইয়া আসিতে পারিতেছে না। সোভিয়েট সৈন্য উত্তর-ককেশাসের কালমুগ প্রান্তরের মধ্য দিয়া বুডেনভস্ক-এর নিকটে সোভিয়েট ককেশাস বাহিনীর সহিত মিলিত:হইয়াছে।

ডন অঞ্চলে রুশসৈন্যরা কোটেলনিকাভো দখল করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী জিমোভিলিকি দখল করে এবং পরে আরও অগ্রসর হয়। তাহারা এখন গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে-কেন্দ্র সালস্কের নিকটবর্ত্তী। জার্ম্মানরা প্রবল ভাবে পাল্টা আক্রমণ চালাইলেও লালফৌজের অগ্রগতি রোধ করিতে পারে নাই। বাইশ হাজার বর্গ মাইল বিস্তৃত ডন নদীর বাঁক এখন প্রায় জার্ম্মানীর কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে। মধ্য রণাঙ্গনে জার্ম্মানরা সোভিয়েট সৈন্যকে প্রবল ভাবে বাধা দিতেছে এবং পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে।

দক্ষিণে সোভিয়েট সৈন্যের লক্ষ্যস্থল রোষ্টভ। রোষ্টভের পরই ককেশাসস্থ জার্ম্মান বাহিনীর একমাত্র সংযোগ পথ। লালফৌজ রোষ্টভ দখল করিলে ককেশাসের জার্ম্মান বাহিনী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে।

—

উত্তর-আফ্রিকার যুদ্ধ

উত্তর-আফ্রিকা হইতে যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য কোন খবর পাওয়া যাইতেছে না লিবিয়া ও তিউনিসিয়াতে এখন বড় যুদ্ধ কিছু হইতেছে না। লিবিয়ায় মণ্টগোমেরির সৈন্যরা রোমেল বাহিনীর পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া ৪০ মাইল পশ্চিমে বুয়েরত পর্য্যন্ত গিয়াছে। জেনারেল ল্য ক্লেয়র্কের অধীনস্থ ফরাসী বাহিনী শাদ অঞ্চল হইতে তিউনিসিয়া-লিবিয়া সীমান্তে প্রবেশ করিয়াছে এবং কে[illegible] দখল করিয়াছে।

বৃষ্টি এবং ভূমির অবস্থার জন্য ফেব্রুয়ারী মাসের আগে বড় আক্রমণ সম্ভব হইবে না বলিয়া অনেকে মনে করেন।

—

নিউগিনির যুদ্ধ

নিউগিনিতে মিত্রশক্তির সহিত জাপানীদের লড়াই চলিতেছে। ম্যাক আর্থারের সৈন্যদল বুনা মিশন দখল করিয়াছে। পাপুয়া এখনও সম্পূর্ণ মিত্রশক্তিবর্গের করতলগত হয় নাই। মিত্রশক্তিবর্গের পাপুয়া অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে জাপান লায়ে হইতে আরম্ভ করিয়া নিউগিনির সমগ্র উত্তর উপকূল সুরক্ষিত করিয়াছে। নিউ বৃটেন হইতে একটি জাপানী কনভয় লায়ে যাইতেছিল। মার্কিন ও অষ্ট্রেলিয়ার নৌবহর উহাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

—

ইতিহাস রচনায় শিল্প-বাণিজ্যের প্রভাব

শ্রীপ্রিয়নাথ নিয়োগী

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর গুরুত্ব নির্ভর করে তাহাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইতে পরবর্ত্তী কালে যে-সকল ঘটনার উদ্ভব হয় তাহাদেরই উপরে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনার গতি নির্দ্ধারিত হয় অর্থনৈতিক শক্তিগুলির ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা। এই হিসাবে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত কাল ইংলণ্ড ও ভারতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় যুগ। এই সময় রাজ্ঞী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের সিংহাসনে সমাসীন, আর ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সম্রাট আকবর। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ই আধুনিক ইংলণ্ডের গোড়াপত্তন হয়। স্যার জে, আর সীলি The Expansion of England গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"And thus, if we put together all the items, we arrive at the conclusion that the England we know, the supreme maritime commercial and industrial Power, is quite of modern growth, that it did not clearly exhibit its principal features till the eighteenth century, and that the seventeenth century is the period when it was gradually assuming this form. If we ask when it began to do so, the answer is particulary easy and distinct. It was in the Elizabethan Age."

এই রূপে আমরা যদি সমগ্র বিষয়গুলি একত্র সন্নিবেশিত করি, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই যে, যে-ইংলণ্ডকে আমরা শ্রেষ্ঠ নৌ, শিল্প এবং বাণিজ্য শক্তি বলিয়া জানি তাহা আধুনিক কালে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উহার প্রধান লক্ষণগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতেই ইংলণ্ড এই রূপটি ক্রমশঃ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইংলণ্ড কখন এইরূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার উত্তর বিশেষ ভাবেই সহজ এবং স্পষ্ট। ইহা এলিজাবেথীয় যুগ।

যে একটি সাধারণ ঘটনা শতাধিক বৎসর পরে ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ নিকটতর করিয়া তোলে— ভারতে ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করে তাহাও এই সময়েই— সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সংঘটিত হয়। এই ঘটনাটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন এবং রাজ্ঞী এলিজাবেথের সনন্দ লাভ। বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাস যে-বিপুল ঘটনাপুঞ্জের তরঙ্গসজ্ঘাতে ভাবী জাতীয় ঐক্যের সুনির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে তাহার প্রথম আভাস সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালেই পাওয়া যায়। তৈমুরের আক্রমণে ভারতে পাঠান রাজত্বের ভিত্তিভূমি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। বাবর পাঠান রাজত্বের জীর্ণ ভিত্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া মোগল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিলেও সম্রাট আকবরই দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধে মোগল রাজত্বকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য যে প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে বাবর কর্ত্তৃক ভারতে মোগল রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আটাশ বৎসর পূর্ব্বে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজরা ভারতে আগমন করে। সম্রাট আকবর জায়গীর প্রথা তুলিয়া দিয়া যে ভূমি-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন তাহাতেই ভারতে সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি শিথিল হইয়া যায়। ভারতে সামন্ততন্ত্র আজও বিলুপ্ত হয় নাই কেন, তাহার কারণ এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। সম্রাট আকবরের নিকট হইতে পর্ত্তুগীজ বণিকগণ সাহায্য পাইয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর দুইটি শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার সাধিত হয়। একটি পশ্চিম গোলার্দ্ধের আবিষ্কার আর একটি জলপথে ভারতের সহিত ইউরোপের সংযোগ। এই দুই আবিষ্কার ইউরোপের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। নূতন মহাদেশ আবিষ্কারের প্রায় শত বৎসর পরে রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালেই আমেরিকায় বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টা সুরু হইয়া বৃহত্তর ইংলণ্ডের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহারই রাজত্বকালে ফ্রান্সিস ড্রেক জলপথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। নূতন মহাদেশ হইতে আহরিত ধনরত্নই ইংরেজ বণিকদিগের মনে ভারতের সহিত বাণিজ্য

করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া তোলে। এই ধনরত্ন দ্বারা ভারতের সহিত বাণিজ্য করিবার সুবিধাও তাহাদের হইয়াছিল। কারণ ভারতের সহিত বাণিজ্যে পণ্য বিনিময় চলিত না, মূল্যবান ধাতুদ্রব্যের বিনিময়ে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য আহরণ করিতে হইত। বস্তুতঃ নূতন মহাদেশ আবিষ্কৃত না হইলে ভারতের সহিত ইউরোপের জলপথে সংযোগ মূল্যহীন হইয়া পড়িত। জর্জ্জ মিলার তাঁহার Modern History নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"But if the naval communication with India, was thus critically necessary to the interest of Europe, the discovery of America could not have been delayed without detriment to those interests, since precious metals of the new world had then become necessary to the commerce of the old so that the discovery of De Gama must have been of much less value without that of Columbus." Vol. II, p. 403.

যদিও ইউরোপের স্বার্থের জন্যই সমুদ্রপথে ভারতের সহিত সংযোগ অপরিহার্য্য ভাবেই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি এই স্বার্থে ক্ষতি না হইয়া আমেরিকা আবিষ্কারে বিলম্ব করা চলিত না। কারণ নূতন মহাদেশের মূল্যবান ধাতু পুরাতন মহাদেশের সহিত বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন ছিল। সুতরাং কলম্বসের আবিষ্কার ব্যতীত ভি গামার আবিষ্কারের মূল্য অনেক কমিয়া যাইত।

যে সকল কারণে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য বিরাট্ নৌবহর—স্পেনিশ আরমাডা—প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা আলোচনা করার এখানে স্থানাভাব। স্পেনিশ আরমাডা পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়াই বৃটিশ নৌবাহিনী সর্ব্বপ্রথম সমুদ্রপথে প্রাধান্য লাভ করে। এইরূপে রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্ব কালেই বৃটেনের নৌশক্তি এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে বাণিজ্য করিবার আকাঙ্ক্ষায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন এবং নামকরণ আকস্মিক ঘটনা নয়। ইহার মূলে ছিল ভারতের সহিত ইউরোপীয় বাণিজ্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস। প্রাচীন ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশী পর্য্যটক এবং লেখকদিগের বিভিন্ন গ্রন্থের বিক্ষিপ্ত এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়, শুধু আফগানিস্থান ও পারস্য, আরব, তুরস্ক, চীন, জাপান এবং সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি পূর্ব্বভারতী দ্বীপপুঞ্জের মধ্যেই ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য আবদ্ধ ছিল না, আফ্রিকার পূর্ব্ব-উপকূল ভাগ এবং ভূমধ্য সাগরের তীরবর্ত্তী দেশসমূহেও ইহা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। গ্রী... পৌরাণিক যুগেও গ্রীসের সহিত এশিয়ার বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। ট্রোজান যুদ্ধের কারণ শুধু পেরিস... হেলেনে অপহরণই নয়; অবশ্য এই অপহরণে... মেনিলাসে মনে প্রতিশোধ লওয়ার আকাঙ্ক্ষা... আক্রমণে অব্যবহিত কারণ যোগাইয়াছিল, কিন্তু ... সহিত নূ... বাণিজ্য-পথ উন্মুক্ত করাই ছিল ইহার ... উদ্দে... এই জন্য বিভিন্ন গ্রীস কৌম (tribe) ... ধ্বংস করি... হেলেনকে উদ্ধার করিবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হই... পারিয়াছিল। ট্রোজান যুদ্ধের সময় হইতে গ্রীস নৌবিদ্যায় বিশেষ ভাবে মনোযোগ দেয়। এশিয়ার সহি... বাণিজ্যের জন্য উহাকে উপেক্ষা করা তাহাদের প... সম্ভব হয় নাই। ক্রুসেডের কারণ সম্বন্ধে অ... কথাই আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু ইহা অতি ... কথা পূর্ব্ব-এশিয়ার বাণিজ্যে ভেনিস ও জেনোয়া ... প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তুর্কী জাতির আবির্ভাব ... ক্রুসেডের কারণ। প্রথম ক্রুসেডের সময়ই ... দের স... ক্রুসেডারদের পরিচয় হয় এবং ইউরোপে নূতন ... প্রচেষ্টা জাগাইয়া তোলে।

রোমের সামরিক অভ্যুদয়ের ফলে, বিশেষ ক... কার্থেজ ধ্বংসের সময় হইতে, প্রাচীর সহিত ইউরো... বাণিজ্য-সম্বন্ধে একরূপ ছিন্ন হইয়া যায়। অগাষ্টাস সিজারই সর্ব্বপ্রথম এই বাণিজ্যিক সম্বন্ধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার চে... করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ভারতের সহিত ইউরোপের বাণিজ্যের পুরাতন পথ ভারত মহাসাগর, লোহিতসা... এবং নীল নদীর পথে ভারতের সহিত ইউরোপের পুনরায় বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পরবর্ত্তী রো... সম্রাটগণ অগাষ্টাস সিজারের নীতিই অনুসরণ করি... চলিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য রোম সাম্রাজ্যের পতনের... এশিয়ার সহিত ইউরোপের বাণিজ্যিক সম্বন্ধে আবার এক বিপর্য্যয় ঘটিল যদিও বাণিজ্য-সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন হ...

না। অতঃপর কনষ্টান্টিনোপলই হইল প্রাচীর সহিত পাশ্চাত্যের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। আলেকজান্দ্রিয়ার সহিতও গ্রীকদের বাণিজ্য কিছু ছিল। কিন্তু ৬৪০ খৃষ্টাব্দে আরবরা যখন মিশর দখল করিয়া বসিল, তখন আলেকজান্দ্রিয়ার সহিত গ্রীকদের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গেল। প্রাচীর পণ্যদ্রব্যের একটি প্রধান কেন্দ্রীয় বাজার ছিল আলেকজান্দ্রিয়া। ইহার সহিত গ্রীকদের সম্বন্ধ আর রহিল না। ইতিপূর্ব্বে পারস্যেও আরবদের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল। সুতরাং প্রাচীর সহিত বাণিজ্যের পুরাতন পথগুলি সমস্তই অবরুদ্ধ হইয়া গেল। উত্তর-এশিয়ার দেশগুলির ভিতর দিয়া বাণিজ্যের নূতন সংযোগ স্থাপিত হইল। চীনদেশ হইতে রেশম অক্সাস নদীর তীরে লইয়া যাওয়া হইত। এই নদীপথে উহা নীত হইত কাস্পিয়ান হ্রদে, তারপর সাইরাজ নদীপথে কতক দূর নীত হইয়া স্থলপথে ফানিশ নদীতীরে লইয়া যাওয়া হইত। এই নদীপথে উহা কৃষ্ণসাগরে পৌছিত এবং তথা হইতে পৌছিত কনষ্টান্টিনোপলে। ভারতীয় পণ্য সিন্ধু নদীর তীর হইতে অক্সাস্ নদীতীরে অথবা সোজাসুজি কাস্পিয়ান হ্রদের তীরে লইয়া যাওয়া হইত তথা হইতে পূর্ব্বোক্ত পথে কনষ্টান্টিনোপলে পৌছিত। এইরূপে কনষ্টান্টিনোপল ভারতবর্ষ ও চীনদেশের পণ্যসমূহের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইল। ইহাতে কনষ্টন্টিনোপলের ঐশ্বর্য্য প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটিতে বিলম্ব হওয়ার ইহাও একটা কারণ।

মিশরে আরব-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে ১৬০ বৎসর কনষ্টান্টিনোপলই ছিল পাশ্চাত্যের সহিত প্রাচীর বাণিজ্যের একমাত্র সংযোগকেন্দ্র। কিন্তু বাণিজ্য যে লাভের একটা মস্ত উপায়, বিশেষত প্রতিচীর সহিত বাণিজ্যে যে প্রচুর লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আরবদের তাহা বুঝিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। যখন বুঝিল তখন মিশর এবং সিরিয়ার বন্দরগুলির ভিতর দিয়া প্রাচীর সহিত ইউরোপের বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। ক্রুসেড পর্য্যন্ত এই বাণিজ্য-পথ অব্যাহত ছিল, কিন্তু এই বাণিজ্যের যোগসূত্র ছিল আরব বণিকগণ। পাশ্চাত্য রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ইটালীর শিল্প-বাণিজ্য যে একেবারে কিছু ছিল না তাহা নয়, তবে প্রায় না থাকারই সামিল। সালিম্যান রোম সম্রাটের মুকুট ধারণ করার পর ইটালীর শিল্প-বাণিজ্যে আবার নূতন জীবন সঞ্চার হয়। তিনি ইটালীতে যে সকল সহর পুনর্গঠন করেন তাহাদের মধ্যে জেনোয়া এবং ফ্লোরেন্সের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার পর হইতেই জেনোয়া প্রাচীর বাণিজ্যে ভেনিসের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায় এবং ফ্লোরেন্স ইটালীর প্রধান শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হয়। নবম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ইউরোপের সহিত প্রাচীর বাণিজ্যে ভেনিসেরই ছিল একচ্ছত্র প্রতিপত্তি। অতঃপর উহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিল জেনোয়া। সালিম্যানের চেষ্টাতেই বোগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রসিদ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ বাণিজ্য-পথ পুনরায় উন্মুক্ত হইয়াছিল। উহা পুনরায় বন্ধ হইল ক্রুসেডের সময়। পূর্ব্ব রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ভেনিসের বণিকদের চেষ্টায় পুনরায় এই বাণিজ্য-পথ উন্মুক্ত হয়।

মিশরের ভিতর দিয়া প্যালেষ্টাইন আক্রমণের প্রস্তাব যে উদ্দেশ্যে করা হইয়াছিল তাহা এখানে আলোচনা করিবার স্থলাভাব। ক্রুসেডারদের প্রচেষ্টায় বাধা দিবার জন্য মিশরের সুলতান বলিষ্ঠদেহ 'মেমেলুক'দিগের সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়াছিল, কিন্তু ফরাসী সম্রাট একাদশ লুইয়ের পরাজয়ের পরেই ১২৫০ খৃষ্টাব্দে মেমেলুকরা সুলতানকে হত্যা করিয়া মিশরের সিংহাসন দখল করিয়া বসিল। এই মেমেলুক সুলতানেরাই ভারতের সহিত বাণিজ্যে ভেনেসীয় বণিক-দিগকে সাহায্য এবং উৎসাহিত করিয়াছিল। যে পর্য্যন্ত না ভারতের ঐশ্বর্য্য দ্বারা লুব্ধ ইউরোপীয়গণ ভারতের সহিত বাণিজ্যের সহজ পথ সন্ধানে অনুপ্রাণিত হইয়া সমুদ্রপথে ভারতে যাতায়াতের পথ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, সে পর্য্যন্ত ঐ পথেই ভারতের সহিত ভেনেসীয় বণিকদের বাণিজ্য চলিয়াছিল। ভাস্কো-ডি-গামা সমুদ্রপথে ভারতে পৌছিবার ১৮ বৎসর পর তুরস্ক সম্রাট মেমেলুকদিগকে পরাজিত করিয়া মিশর অধিকার করেন।

তুর্কীরা কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করিলে জেনোয়ার বণিকদের প্রাচীর সহিত বাণিজ্য লুপ্ত হইল এবং একমাত্র ভেনিসীয় বণিকরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ইউরোপের সহিত

প্রাচীর বাণিজ্যের সংযোগ রক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু ভেনেসীয় বণিকদের কারবার সোজাসুজি ভারতের সহিত ছিল না, তাহাদের বাণিজ্যের কারবার ছিল মিশর ও সিরিয়ার সহিত। সিরিয়া এবং বিশেষভাবে মিশর ছিল ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের শ্রেষ্ঠ বাজার। দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রারম্ভে জার্ম্মানীতে আবিষ্কৃত রৌপ্য খনিগুলি ভেনেসীয় বণিকদিগের ভারতীয় পণ্যক্রয়ের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তুর্কী সাম্রাজ্যের ক্রম বিস্তৃতিতে তাহাদের বাণিজ্য-পথগুলি ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল। ভারতের সহিত ইউরোপের বাণিজ্যের যখন এই অবস্থা তখন ইউরোপের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারে মনোযোগী হইয়া উঠিয়াছিল। এই দেশটির নাম পর্ত্তুগাল।

পর্ত্তুগীজদিগের আবিষ্কারে ভারতের সহিত ইউরোপের সমুদ্রপথে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই ইউরোপের অন্তর্ব্বাণিজ্যের গতি এবং শিল্পপ্রচেষ্টা ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। এই উন্নতির প্রেরণা যোগাইয়াছিল ক্রুসেড। ট্রোজান যুদ্ধ যেমন গ্রীকদের বাণিজ্যস্পৃহা বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিল, ক্রুসেড তেমনি পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলিকে শিল্প ও বাণিজ্য প্রচেষ্টার প্রেরণা যোগাইয়াছিল। পশ্চিম-ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা শিল্পপ্রচেষ্টার অনুকূল ছিল না। কাজেই শিল্পেরও কোন উন্নতি হয় নাই। নেদারল্যাণ্ডের ফ্লেন্ডার্সে অবশ্য পশমশিল্পের কাজ চলিতেছিল এবং পশ্চিম-ইউরোপে নেদারল্যাণ্ডসই প্রথম দেশ যেখানে শিল্প-প্রচেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইবার প্রেরণা পাইয়াছিল। সুফলা ফরাসীদেশের অধিবাসীরা এখানকার পশমী বস্ত্র ক্রয় করিতে। কাজেই ফ্লেণ্ডার্সের পশমশিল্পের উন্নতির পক্ষে কোন বাধা হয় নাই। এই পশম শিল্প তিন শতাব্দী পরে যে ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেরণা জোগাইয়াছিল পরে তাহা আমরা আলোচনা করিবার সুযোগ পাইব। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তৎকালে নেদারল্যাণ্ডস্ বা লো কাণ্ট্রি বলিতে শুধু বর্ত্তমান হল্যাণ্ডকেই বুঝাইত না, সমগ্র বেলজিয়ম দেশটিও উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফ্রান্সেও যে শিল্পপ্রচেষ্টার একেবারে অভাব ছিল তাহা নয়। সার্লিম্যানের সময়েও দক্ষিণ-ফ্রান্সের সহর গুলিতে পশম, লৌহ এবং কাচ শিল্পের কাজ চলিতেছিল।

ক্রুসেডের সময়ে পশ্চিম-ইউরোপের বহু অর্থ ইটালীর হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইটালীর বণিকরা পশ্চিম-ইউরোপের রাজাদের সঙ্গে এইরূপ চুক্তি করিয়াছিলেন যে, বণিকগণ জাহাজে করিয়া সৈন্যদিগকে এসিয়ার উপকূলে পৌছাইয়া দিবে এবং সেখানে তাহাদের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই সরবরাহ করিবে। ক্রুসেডের সময় ইটালীর বণিকরা পশ্চিম ইউরোপ হইতে যে অর্থ পাইয়াছিল তাহাতে তাহাদের শিল্পবাণিজ্য প্রচেষ্টার আরও উন্নতি সাধিত হয়।

ফ্লোরেন্সের প্রতিপত্তি তাহার পশমশিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ভেনিসের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত তাহার বাণিজ্যের উপর। দক্ষিণ-ইউরোপের এই অর্থনৈতিক শক্তি ক্রুসেডের পর হইতেই ধীরে ধীরে পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপের দেশগুলির হস্তগত হইতেছিল। ইহার পূর্ণ পরিণতি ঘটিয়াছিল আমেরিকা এবং সমুদ্রপথে ভারতের সহিত সংযোগ স্থাপিত হইবার পর। ভেনেসীয় বণিকদের একচেটিয়া অধিকার ইউরোপের অন্যান্য দেশের কাছে অসহ্য মনে হইবে, তাহাদের শিল্প-বাণিজ্য প্রচেষ্টার প্রেরণা যোগাইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। জার্ম্মানী এবং টাইরলের রৌপ্যখনি হইতে প্রাপ্ত রূপা তাহাদের এই আগ্রহকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল।

"Long before the southward march of the Turks cut the last of the great route from the East, the Venetian monopoly was felt to be intolerable. Long before the plunder of Mexico and the silver of Potosi flooded Europe with treasure, the mines of Germany and the Tyrol were yielding increasing if still slender, stream of bullion, which stimulated rather than allayed its thirst. (R. H. Tawney—Religion and the Rise of capitalism, p. 75).

ইটালীর শিল্পবাণিজ্যকে সমগ্র ইউরোপে প্রসারিত করিতে বিশেষ ভাবে সহায় হইয়াছিল 'হ্যান্‌সিয়াটিক লীগ'। এই লীগ ১২৪১ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয়। নিজেদের বাণিজ্যের স্বার্থরক্ষা এবং ইউরোপের আভ্যন্তরিক বাণিজ্য পরিচালনের জন্য জার্ম্মানীর সমৃদ্ধ সহরগুলির বণিকগণ

সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই লীগ গঠন করে। আমেরিকা আবিষ্কার এবং সমুদ্র পথে ভারতের সহিত সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হ্যানসিয়াটিক লীগের অবাধ প্রতিপত্তি ছিল। বল্টিক সাগরের পথে ইউরোপে যে বাণিজ্য পরিচালিত হইত তাহার সহিত ইটালীর বাণিজ্যের সংযোগ হ্যানসিয়াটিক লীগ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। এই হ্যানসিয়াটিক লীগই বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতম বাহন যৌথকারবারের আদি পুরুষ, এ কথা বলিলে বোধ হয় ভুল বলা হয় না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আর দুইটি প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্ক এবং বিল অব্ এক্সচেঞ্জের সৃষ্টিও এই সময়ের কাছাকাছিই হয়। ভেনিস রিপাবলিকের বাণিজ্য সমৃদ্ধি গ্রীক সম্রাটদের ঈর্ষ্যার উদ্রেক করিয়াছিল। তাঁহাদের সহিত সংগ্রামে ভেনিস রিপাবলিক একরূপ ফতুর হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। কাজেই ভেনিস নাগরিকদের আর্থিক অবস্থার অনুপাতে সকলের নিকট হইতেই ঋণ গ্রহণ করা ছাড়া আর তাহার উপায় ছিল না। এই সরকারী ঋণের বন্দোবস্ত করিবার জন্যই ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে ভেনিসে সর্ব্বপ্রথম ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়। আমানত গ্রহণ এবং বিনিময় কার্য্য পরিচালনের জন্য সর্ব্বপ্রথম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা হয় বারসেলোনাতে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। সিসিলি অধিকার করিবার জন্য রোমান পন্টিফ সিয়েথা এবং ফ্লোরেন্সের বণিকদের নিকট হইতে ঋণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ইংরেজ ধর্ম্মাচার্য্যদের নিকট হইতে ঐ টাকা আদায়ের অধিকার ঐ সকল বণিকদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা ১২৫৫ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক যুগের বণিকগণ বিল অব্ এক্সচেঞ্জের জন্য এই ঘটনার নিকট ঋণী।

আমেরিকা আবিষ্কার এবং সমুদ্রপথে ভারতের সহিত ইউরোপের সংযোগ ভেনিস ও হ্যানসিয়াটিক লীগের পতনের এবং স্পেন ও পর্ত্তুগালের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ। কিন্তু এই দুইটি আবিষ্কার যে কোন আকস্মিক শুভ ঘটনা নয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বিজ্ঞানের নিস্বার্থ কৌতূহলও এই আবিষ্কার দুইটির জনক নয়। প্রথমে ভেনিসের বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দাঁড়াইবার আকাঙ্ক্ষা হইতেই সমুদ্রপথে ভারতের সহিত সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলিতে থাকে। তুর্কী সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে প্রাচীন বাণিজ্য-পথ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতে থাকায় এই আগ্রহ প্রবলতর হইয়া উঠে।

"First attempted as a counter-poise to be Italian monopolist, then pressed home with ever greater eagerness to turn the flank of the Turk, as his strangle-hold on the eastern commerce tightened, the Discoveries were neither a happy accident nor the fruit of the disinterested curiosity of science. They were the climax of almost a century of patient economic effort. They were as practical in their economic motive as the steam-engine. (Religion and the Rise of capitalism, p. 75).

সমুদ্রপথে ভারতের সহিত সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা হইতেই দৈবাৎ আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহু প্রাচীন কালে জলপথে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করা হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। কথিত আছে যীশুখ্রীষ্টের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে মিশরের রাজা নেকোর প্রেরণায় জলপথে আফ্রিকার চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নূতন মহাদেশের অস্তিত্ব আবিষ্কারের চেষ্টাও নাকি প্রাচীন কালে হইয়াছিল। শোনা যায়, আইসল্যাণ্ডের জনৈক অধিবাসী ১০০১ খৃষ্টাব্দে লাব্রাডোর অথবা নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের উপকূল ভাগ আবিষ্কার করেন, ঐ স্থানে অনেক দ্রাক্ষালতা থাকায় উহার নাম রাখা হইয়াছিল Vinland বা দ্রাক্ষাভূমি। কিন্তু আইসল্যাণ্ডের পূর্ব্বাবস্থা আর না থাকায় এই আবিষ্কার বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া যায়। হেনো নামক জনৈক কার্থেজবাসীও জলপথে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। পরবর্ত্তী কালে এই সকল আবিষ্কারের কথা বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গেলে পর্ত্তুগীজদের মধ্যে এই সকল আবিষ্কারের কাহিনী কতক পরিমাণে প্রচলিত ছিল, যদিও অনেকেই উহাকে কাল্পনিক বলিয়াই মনে করিত। এই সকল প্রাচীন আবিষ্কারের কাহিনী, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার এবং ভারতের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিবার আগ্রহ মিলিত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগকে সমুদ্রপথে নূতন দেশ আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ

করিয়াছিল। কিন্তু আমেরিকা আবিষ্কারের গৌরব লাভ করিবার সৌভাগ্য পর্তুগীজদের হয় নাই।

১৪১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পর্তুগীজদের আবিষ্কারপ্রচেষ্টা সুরু হয়। রাজা হেনরীর উৎসাহই ছিল উহার মূল। কিন্তু ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতে পৌঁছিতে আরও তের বৎসরের প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইয়াছিল। উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার এবং জলপথে ভাসক-ডি-গামার ভারতে আগমনের মধ্যবর্ত্তী সময়ে কলম্বস সর্ব্বপ্রথম নূতন মহাদেশের সন্ধান পান। কলম্বস প্রথমে পর্তুগালের নিকটই এই সমুদ্র যাত্রার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। এই জন্যই স্পেন নূতন মহাদেশ আবিষ্কারের গৌরব লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমেরিকা নামটি ফ্লোরেন্সের জনৈক অধিবাসী Amerigo Vespucci-এর নামে রাখা হইয়াছে। এই ভদ্রলোকটি ১৪৯৯ সালে সমুদ্রপথে দেশ আবিষ্কারে বাহির হন এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি তাঁহার ভ্রমণের এক বিবরণ বাহির করেন। এই বিবরণে তিনি বলেন যে, ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদ্রযাত্রায় তিনিই প্রথম নূতন মহাদেশে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার এই সমুদ্রযাত্রার বিবরণ এত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল যে, কিছু দিন পর নূতন আবিষ্কৃত মহাদেশের নাম তাঁহারই নাম অনুসারে রাখা হয়।

সমুদ্রপথে ভারতের সংযোগ পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় ভেনিসের বাণিজ্য যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও বিলুপ্ত হইল। এই আবিষ্কারের ফলে ভেনিসের বাণিজ্য যে মরণ-আঘাত পাইল তাহা যে ভেনিসের বণিকরা বুঝিতে পারে নাই তাহা নহে। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল এবং প্রতিবিধানের চেষ্টাও কম করে নাই। মিশরের সুলতানের সাহায্যে তাঁহারা এই সঙ্কট এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ভেনিসের বাণিজ্য-গৌরব ধ্বংস করিবার জন্য ১৫০৮ সালে কেমব্রাই লীগ (Cambrai League) গঠিত হয়। এই লীগ ভেনিস রিপাবলিকের সঙ্গে যেমন যুদ্ধ চালাইয়াছিল তেমনি পর্তুগীজদের বাণিজ্যের প্রসারেও সাহায্য করিয়া-

ইতিমধ্যে ইউরোপের শিল্প-প্রচেষ্টা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। পর্তুগীজরা ভারতের সহিত প্রত্যক্ষ বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করায় এই শিল্প-প্রচেষ্টা আরও নূতন প্রেরণা লাভ করিল। ভেনেসীয় বণিকরা ভারতীয় পণ্য ইউরোপে যে দামে বিক্রয় করিত, পর্তুগীজরা বিক্রয় করিত তাহার অর্দ্ধেক দামে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, প্রচলিত দামের চারি ভাগের এক ভাগ দামে পর্তুগীজরা ভারতীয় পণ্য বিক্রয় করিত। মূল্যের এই হ্রাসও ভেনেসীয় বণিকদের বাণিজ্য নষ্ট হইবার একটা কারণ। সস্তা দামের জন্য ইউরোপে ভারতীয় পণ্যের প্রচলন বাড়িয়া গেল। উহাই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্প প্রচেষ্টার প্রেরণাও যোগাইয়াছিল।

ফ্লেণ্ডার্সের পশম শিল্পের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই শিল্পের জন্য ইংলণ্ডের পশমের চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছিল। পরে ইংলণ্ডে যেভাবে এই শিল্পের প্রচলন তাহা পরে আমরা আলোচনা করিব। ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ড শুধু চামড়া, টিন, দস্তা এবং শস্য রপ্তানী করিত, পশম রপ্তানী দ্বারা তাহার বাণিজ্য আরও কিছু বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু এই সময়ে ইংলণ্ডের বাণিজ্য প্রধানতঃ জার্ম্মান এবং ইটালীয় বণিকদের হাতেই ছিল। ইংরেজ বণিককর্ত্তৃক পরিচালিত বাণিজ্য তৃতীয় এডওয়ার্ডের রাজত্বের পূর্ব্বে বিশেষ কিছুই ছিল না।

আমরা ইতিপূর্ব্বে হ্যানসিয়াটিক লীগের কথা বলিয়াছি। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নেদারল্যাণ্ডস্ ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়। নিজেদের পশম শিল্প থাকায় এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেদারল্যাণ্ডের পক্ষে সহজ হইয়াছিল। তা ছাড়া তাহারা আরও একটা বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিল। বাল্টিক সাগরের বাণিজ্যে এই লীগের ছিল সম্পূর্ণ প্রভাব প্রতিপত্তি। ডেনমার্কের রাজা ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে নেদারল্যাণ্ডসের নৌ-শক্তির সাহায্যে এই লীগকে ঘায়েল করেন। অতঃপর অতিক্রত নেদারল্যাণ্ডের প্রভাব বৃদ্ধি এবং হ্যানসিয়াটিক লীগের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতে লাগিল। এক শতাব্দীর মধ্যে এই লীগের কোন প্রতিপত্তিই আর রহিল না।

ফ্লাণ্ডার্সের বার্গেস অনেক দিন পর্য্যন্ত ভূমধ্যসাগর

এবং বাল্টিক সাগরের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রতিদ্বন্দ্বী এণ্টোয়ার্পের নিকট তাহাকে পরাজিত হইতে হয়। অতঃপর এণ্টোয়ার্পই সমগ্র ইউরোপের অর্থনৈতিক রাজধানীতে পরিণত হয়। এণ্টোয়ার্পে হ্যানসিয়াটিক লীগের একটি আড্ডা ছিল। ইটালীর ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি এণ্টোয়ার্পে তাহাদের শাখা প্রতিষ্ঠা করিল। তামার ব্যবসাও ভেনিস হইতে এণ্টোয়ার্পে স্থানান্তরিত হয়। আমেরিকা আবিষ্কার এবং ভারতের সহিত সমুদ্রপথে সংযোগ স্থাপন ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা। এই আবিষ্কারের ফলে যে নূতন বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হইল তাহাই উহাকে সমগ্র ইউরোপের অর্থনৈতিক রাজধানীতে পরিণত করিয়াছিল। ইউরোপের অর্থনৈতিক রাজধানী কিরূপে এণ্টোয়ার্প হইতে লণ্ডনে স্থানান্তরিত হইল, অতঃপর তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, ইউরোপের অর্থনৈতিক রাজধানী শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভূমধ্যসাগরের তীর হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগরের কাছাকাছি নেদারল্যাণ্ডসে প্রতিষ্ঠিত হইল। কলম্বসের আবিষ্কার নূতন মহাদেশে স্পেনের এবং ভাসকো-ডি-গামার আবিষ্কার ভারতীয় বাণিজ্যে পর্ত্তুগীজদের এক-চেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে দ্বিতীয় ফিলিপের অধীনে স্পেন এবং পর্ত্তুগাল একরাষ্ট্রে পরিণত হয়। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের ইতিহাস প্রধানতঃ নূতন মহাদেশ এবং ভারতের বাণিজ্যে অধিকার স্থাপন লইয়া ইউরোপের পাঁচটি দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতার ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। এই পাঁচটি দেশ স্পেন, পর্ত্তুগাল, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ড।

সমুদ্রপথে ভারতের সহিত ইউরোপের সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় শতাধিক বৎসর পর ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয় এবং ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য রাজ্ঞী এলিজাবেথ এই কোম্পানীকে সনন্দ প্রদান করেন। এই কোম্পানী ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের নিকট হইতে ভারতে বাণিজ্য করিবার সনদ প্রাপ্ত হইয়া সুরাটে কুঠি নির্ম্মাণ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন কোন একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। ইহার পিছনে রহিয়াছে ইউরোপের একশত বৎসরের শিল্প-বাণিজ্য ইতিহাস। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ই ইংলণ্ড ইউরোপের বহির্ব্বাণিজ্যের প্রধান ধারার সহিত সংযুক্ত হয়, তাহার শক্তি নিয়োজিত নূতন মহা-দেশের এবং ভারতের বাণিজ্যের দিকে। কিন্তু ইহার জন্য ইরোপের বহির্ব্বাণিজ্যে স্পেন পর্ত্তুগালের একচেটিয়া অধিকার এবং ইউরোপের অর্থনৈতিক রাজধানী এণ্টোয়ার্পের প্রাধান্য খর্ব্ব হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়া-ছিল। যে-প্রধান ঘটনায় নূতন মহাদেশ এবং ভারতের বাণিজ্যে ইংলণ্ডের প্রভাব সৃষ্টির সূচনা হয় তাহা স্পেনিশ আর্ম্মাডা।

কলম্বসের আবিষ্কারের উত্তরাধিকারীরূপে নূতন মহাদেশে স্পেনের ছিল একচেটিয়া অধিকার। এই একচেটিয়া অধিকার ক্ষুণ্ণ হইল কিরূপে এবং কাহার দ্বারা? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া Sir j. R, Seeley তাঁহার The Expansions of England নাম গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

> "Not by the Hotspurs of medieval chivalry, nor by the archers who won Crecy for us, but by a new race of men, such as medieval England had not known, by the hero-buccaneers, the Drakes and Hawkinses, whose lives had been passed in tossing upon that ocean which to their fathers had been an unexplored, unprofitable desert."

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সামুদ্রিক স্বার্থ লইয়া ইউরোপের পাঁচটি শক্তির মধ্যে বুঝাপড়া চলিয়াছিল। এই পাঁচটি শক্তির নাম আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই বুঝাপড়ার মূলকেন্দ্র ছিল স্পেন। কারণ ইউরোপের সামুদ্রিক স্বার্থের সহিত স্পেনের ছিল খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, নেদারল্যাণ্ড ছিল স্পেনের অধীন এবং নূতন মহাদেশে এবং প্রাচীতেও তাহার অধীনে রাজ্য ছিল। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্ব কালেই ডাচ্ রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার এবং ইংলণ্ডের সামুদ্রিক প্রচেষ্টার প্রেরণা যুগাইয়াছিল। এই প্রেরণাটিকে বুঝিতে হইলে পর্ত্তুগালের কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রাচীর বাণিজ্যই জেনোয়া এবং ভেনিসের গৌরব

প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠার মূল কারণ ছিল। কিন্তু ভারতের সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না, প্রাচীতে তাঁহারা কোন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নাই। কিন্তু পর্তুগীজরা বাণিজ্য করিতে আসিয়া প্রাচীতে সাম্রাজ্যেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলে সোফালা, মোজাম্বিক এবং মেলিণ্ডায়, পারস্য উপসাগরে ওরমুজ দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল সহ মালাবারের সমগ্র উপকূল ভাগ, মালাক্কা, মলুক্কা দ্বীপের কতক অংশ এবং চীনের মেকাও-এ পর্তুগীজদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হওয়ার দশ বৎসর পর পর্তুগাল স্পেনের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি নেদারল্যাণ্ডস ছিল স্পেনের অধিকারে, নূতন মহাদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান ধাতুর যোগান স্পেন পাইতেছিল। অতঃপর পর্তুগালও স্পেনের অঙ্গীভূত হওয়ায় প্রাচীর বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যও তাহার অধিকারে আসিল।

রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় পর্য্যন্ত পশমশিল্পের কেন্দ্র ফ্লাণ্ডার্সের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। ইংলণ্ড পশম উৎপন্ন করিত এবং ইংলণ্ডের উৎপন্ন ফসল হইতে ফ্লাণ্ডার্সের কারিগররা পশমীবস্ত্র বয়ন করিত। স্পেনের সহিত নেদারল্যাণ্ডের যুদ্ধে ফ্লোণ্ডার্সের পশমশিল্প যখন ধ্বংস হইল তখন বহু কারিগর ইংলণ্ডে চলিয়া আসায় ইংলণ্ডে পশমশিল্পের প্রবর্ত্তন হইল। ক্রমশঃ



মাতৃভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী"

চতুর্থ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৪৮ | ২য় সংখ্যা

গৌতম বুদ্ধ ও তৎসংসৃষ্ট যুগের প্রকৃত কাল

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিগান্‌ডেট্‌ (Bigandet) প্রণীত 'গৌতম চরিত' (Life of Gaudama) নামক পুস্তকে বুদ্ধদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা কোন কোন বারে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কয়েকটি বারের আলোচনা করিয়া দেওয়ান বাহাদুর এল, ডি স্বামী কন্নু পিল্লাই দেখিতে পান যে, এই বারগুলির সহিত খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭৮ অব্দের ১লা এপ্রিল মঙ্গলবারের একটা সামঞ্জস্য আছে। সুতরাং এই তারিখটিকেই তিনি গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর প্রকৃত তারিখ বলিয়া স্থির করেন।* কিন্তু এই সঙ্গে একথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বিগান্‌ডেট তাঁহার পুস্তকে চারিটি বারের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭৮ অব্দের ১লা এপ্রিল মঙ্গলবারকে গৌতম-বুদ্ধের মৃত্যু-তারিখ বলিয়া স্বীকার করিলে উল্লিখিত চারিটি বারের মধ্যে শুধু একটি বারের সহিতই তাঁহার জীবনের একটি মাত্র ঘটনার মিল দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থোল্লিখিত জ্যোতিষিক সমাবেশের যদি কিছু মূল্য থাকে, তাহা হইলে খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭৮ অব্দকে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর বৎসর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। স্বামীকন্নুর সিদ্ধান্ত অনুসারে খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭৮ অব্দকে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যু-বৎসর মানিয়া লইলে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫৮ অব্দকে তাঁহার জন্মবৎসর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। গৌতম বুদ্ধের জন্ম শুক্রবার বৈশাখী পূর্ণিমাতে হইয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫৮ অব্দে ১৫ই এপ্রিল রবিবারে বৈশাখী পূর্ণিমা হইয়াছিল। কাজেই স্বামী কন্নুকে পরবর্ত্তী বৎসর খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫৭ অব্দকে গৌতম বুদ্ধের জন্মবৎসর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, সর্ব্ববাদীসম্মতক্রমে স্বীকৃত বুদ্ধদেবের জীবন-কাল ৮০ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৭৯ বৎসর হইয়াছে, অর্থাৎ এক বৎসর কম হইয়া পড়িয়াছে। তেমনি স্বামী কন্নুর সিদ্ধান্ত অনুসারে বুদ্ধদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের তারিখ সোম-বারের পরিবর্ত্তে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫২৯ অব্দের আষাঢ়ী পূর্ণিমা ২২শে জুন রবিবার হয়। স্বামী কন্নু অবশ্য পরের দিন সোমবারে গৌতম বুদ্ধ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু তখন তিথি পূর্ণিমা ছিল না। তাঁহার নিজের হিসাব অনুসারেই পূর্ব্ববর্ত্তী রাত্রিতে প্রায় আটটার সময় পূর্ণিমা তিথি শেষ হইয়া গিয়াছিল অর্থাৎ মধ্যরাত্রিতে গৌতম কপিলাবস্তু পরিত্যাগের বহু পূর্ব্বেই পূর্ণিমান্ত হইয়া-ছিল। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে সন্ন্যাস গ্রহণের ছয় বৎসর পর—৫২৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বুধ-বারের পরিবর্ত্তে ১৮ই এপ্রিল শুক্রবার বৈশাখী পূর্ণিমা গৌতমের বুদ্ধত্ব অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভের তারিখ হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য স্বামী কন্নু গৌতমের নির্ব্বাণ লাভের তারিখের সন্ধান পরবর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের ছয় বৎসর পরের পরিবর্ত্তে সাত বৎসর পরে লইয়াছেন এবং খৃষ্টপূর্ব্ব ৫২২ অব্দের ৮ই এপ্রিল বুধবার বৈশাখী পূর্ণিমায়

*Indian Antiquary, Vol. XLII. pp. 197-204.

গৌতম নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু তাঁহার নিজের হিসাব অনুসারেই এই দিন পূর্ণিমান্ত হইয়াছে অপরাহ্ণ ২টা ৪০ মিনিটের সময়। কিন্তু প্রচলিত বিশ্বাস হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ণিমা তিথি পরের দিন পূর্ব্বাহ্ণ পর্য্যন্তও ছিল। "বৈশাখী পূর্ণিমা দিন প্রাতে সুজাতা তাঁহার পূজোপহার সাজাইতে ছিলেন.........সন্ধ্যা কালে বুদ্ধ মারকে পরাজিত করেন। পূর্ণিমা দিবস (অর্থাৎ বুধবার রাত্রিশেষে) সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে তিনি মহাসত্য লাভ করিলেন, তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভ হইল।'

গৌতম বুদ্ধের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা যে যে বারে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া কথিত, প্রস্তাবিত খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮৩, ৪৮৬ অথবা ৪৮৭ অব্দের একটির তারিখের সহিতও তাহার সামঞ্জস্য নাই। স্বামী কন্নুপিল্লাইও প্রমাণিত করিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৪, ৫৪৩ অথবা ৪৮৩ অব্দের তারিখের সহিত উল্লিখিত বারের মিল হয় না। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮৩, ৪৮৬ অথবা ৪৮৭ অব্দের কল্পনা বিজয় সিংহের সিংহলের সিংহাসনে আরোহণের সহিত সংসৃষ্ট অব্দ হিসাবে উদ্ভব হইয়া থাকিবে। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যু-বৎসরেই বিজয়সিংহ সিংহলে অবতরণ করেন। কিন্তু ঐ বৎসরই তিনি সিংহলের রাজসিংহাসনেও আরোহণ করিয়াছিলেন এইরূপ কল্পনা করা অসম্ভব। ইতিবৃত্তীয় ঘটনাবলী হইতেও প্রমাণিত হয় যে, সিংহলে পৌঁছিয়া কয়েক বৎসর আত্মগোপনে থাকিবার পরে তিনি সিংহলের রাজা হইয়াছিলেন।

সিংহলের বর্ত্তমান হিসাব অনুযায়ী ১৯৩২ সালের মে মাসে গৌতম বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের ২৪৭৬ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার নির্ব্বাণ লাভের বৎসর পাওয়া যায় ২৪৭৬—১৯৩১ = ৫৪৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। ১৯৩২ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত অতীত ২৪৭৫ বৎসর ছিল। সামান্য অসাবধানতার ফলে এই বৎসরটি (২৪৭৬—১৯৩২) অথবা (২৪৭৫—১৯৩২), ৫৪৪ কিম্বা ৫৪৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে পারে। চলতি বৎসর ধরিয়া হিসাব করিলে অবশ্য ৫৪৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দই পাওয়া যায়। প্রাচীন কাল হইতেই সিংহলে ৫৪৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ গৌতমবুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের তারিখ বলিয়া প্রচলিত আছে। সিংহলের ওরিয়েণ্টাল মেগাজিন পত্রিকায় এই অব্দটি বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের বৎসর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। জেমস্ প্রিন্সেপও তাঁহার "Indian Antiquities" গ্রন্থে* উক্ত পত্রিকা হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উত্তর-ভারতবর্ষের বৌদ্ধদের মতেও শেষ বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের বৎসর খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৬ অব্দ।† গৌতম বুদ্ধের নির্ব্বাণ অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভের এই অব্দ হইতে বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধদেবের জীবনের সমস্ত ঘটনার তারিখ হুবহু মিলিয়া যায়। সুতরাং এই অব্দ হইতে আমরা পাইতেছি যে, গৌতম বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮১ অব্দের ৩০ শে মার্চ্চ শুক্রবার বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করেন। উজ্জয়িনীর সময় অনুযায়ী রাত্রি দশটা ৩০ মিনিটে পূর্ণিমা তিথি আরম্ভ হইয়া পরের দিন রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিটে শেষ হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫৩ অব্দের ১৭ই জুন মধ্য রাত্রিতে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সিদ্ধার্থ কপিলাবস্তু ত্যাগ করেন। উজ্জয়িনীর সময় অনুযায়ী রাত্রি ৮টা দশ মিনিটে পূর্ণিমা আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় পরের দিন সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে। পরের দিন সোমবার প্রাতে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫৩ অব্দের ১৮ই জুন আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ২৯ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৬ অব্দের ৩রা এপ্রিল বুধবার বৈশাখী পূর্ণিমায় তিনি পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বুদ্ধত্ব বা নির্ব্বাণ লাভ করেন। ৪ঠা এপ্রিল প্রাতে উজ্জয়িনীর সময় ১১টা ৪৫ মিনিটে সময় পূর্ণিমা শেষ হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০১ অব্দের ১৫ই এপ্রিল মঙ্গলবার বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে গৌতম বুদ্ধ আশী বৎসর বয়সে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। পূর্ব্ব রাত্রিতে উজ্জয়িনী সময়ের ৪টা ৩০ মিনিটের সময় পূর্ণিমা আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং গণিত জ্যোতিষের প্রমাণের সহিত এই তারিখগুলি যথাযথ ভাবে মিলিয়া যায়। বুদ্ধের নির্ব্বাণ অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভ এবং তাঁহার পরিনির্ব্বাণ বা মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্যটা মিঃ কার্টারই সর্ব্বপ্রথম বিশেষ সুকৌশলে প্রদর্শন করেন।* কিন্তু

*1858, Vol. II p. 165.
†Weber, History of Indian Literature, p. 287.
**Vide* Cunningham's Indian Eras, p. 36.

উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তিনি গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর প্রকৃত তারিখ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। ডাঃ ভাণ্ডারকরও বুদ্ধের নির্ব্বাণ এবং পরিনির্ব্বাণের পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন।*

গৌতম বুদ্ধের জীবনের উল্লিখিত তারিখগুলি হইতে আমরা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য এবং তাঁহার পৌত্র অশোকের প্রকৃত কাল নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

পৌরাণিক এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি, অজাতশত্রু পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হর্ষক বা দর্শক রাজত্ব করেন চব্বিশ বৎসর। বায়ুপুরাণের কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে হর্ষক নামটি পাওয়া যায়।† অজাতশত্রুর জামাতা উদয়নের রাজত্বকাল তেত্রিশ বৎসর। (এ সম্পর্কে পরে আমরা আরও আলোচনা করিব।) তার পর নন্দীবর্দ্ধন এবং মহানন্দী প্রভৃতি রাজাদের রাজত্বকাল। ডাঃ আর, সি, মজুমদার এই দুইজন রাজাকে নন্দবংশোদ্ভব বলিয়া মনে করেন।‡ ডাঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথের অভিমতও তাহাই।(১) পুরাণগুলিতে নন্দবংশীয় রাজাদের মোট রাজত্বকাল একশত বৎসর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মিঃ পার্জ্জিটার তাঁহার "Dynasties of the Kali Age", p. 24,-এ বলিয়াছেন,

"The time assigned to Mahapadma may mean the entire length of his life, as the Matsya Purana seems to imply; and if so, the whole dynasty may have lasted about a hundred years as stated."

'মৎস্য পুরাণ হইতে যাহা বোঝা যায় তাহাতে মনে হয়, মহাপদ্মর যে সময়কাল উল্লিখিত হইয়াছে তাহা তাঁহার সমগ্র জীবনকাল। তাই যদি হয়, তাহা হইলে পুরাণে লিখিতরূপ সমগ্র বংশ একশত বৎসরই রাজত্ব করিয়াছিল।' কিন্তু পুরাণগুলিতে কখনও রাজাদের রাজত্বকালের পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনকালের গণনা করা হয় নাই। কিন্তু নন্দীবর্দ্ধন এবং মহানন্দীকে যদি আমরা নন্দবংশের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাদের রাজত্বকালকেও হিসাবের মধ্যে ধরি, তাহা হইলে নন্দবংশের রাজত্বকাল যে একশত বৎসর তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। অজাতশত্রু হইতে শেষ নন্দরাজের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত হিসাব করিলে আমরা মোট ১৮২ বৎসর পাই :—

অজাতশত্রু	২৫ বৎসর
হর্ষক বা দর্শক	২৪ "
উদয়াশ্ব	৩৩ "
নন্দীবর্দ্ধন হইতে শেষ নন্দরাজা পর্য্যন্ত সমগ্র নন্দবংশের রাজত্বকাল	১০০ "
মোট	১৮২ বৎসর

আমরা জানি, অজাতশত্রু সিংহাসনে আরোহণ করিবার আট বৎসর পরে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যু হয়। সুতরাং গৌতম বুদ্ধের মৃত্যু এবং শেষ নন্দরাজের মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী সময়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮২—৮=১৭৪ বৎসর। ইহার সহিত চন্দ্রগুপ্তের ২৪ এবং বিন্দুসারের ২৫ বৎসর যদি আমরা যোগ করি, তাহা হইলে পাই (১৭৪+২৪+২৫=২২৩) ২২৩ বৎসর। এই দুইশত তেইশ বৎসর হইল গৌতম বুদ্ধের মৃত্যু এবং অশোকের সিংহাসনে আরোহণের মধ্যবর্ত্তী সময়ের পরিমাণ। কিন্তু বুদ্ধঘোষ তাঁহার 'সমন্ত পসাদিকা' ('বিনয়ে'র ভাষ্য) গ্রন্থে এই সময়ের পরিমাণ ২২৪ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মাত্র একখানি পাণ্ডুলিপি হইতে হিসাব করিয়া এই সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে। পুরাণে আমরা যে সংখ্যা পাই তাহার সহিত ইহার পার্থক্য মাত্র এক বৎসর। বোধ হয় নন্দবংশ এবং মৌর্য্যবংশের রাজত্বকালের মধ্যবর্ত্তী একবৎসর অরাজক অবস্থার জন্যই এই পার্থক্য হইয়াছে। অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যু এবং অশোকের সিংহাসনে আরোহণের মধ্যবর্ত্তী সময়ের পরিমাণ ২১৪ বৎসর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 'কিন্তু পরবর্ত্তী ইতিবৃত্তের আদি বর্ণনাগুলিতে নিয়মিত ভাবেই এই দশ বৎসরের পার্থক্য রহিয়াছে',* এই কথা মনে রাখিলে এই দশ বৎসর ব্যতিক্রমের কারণ সহজেই আমরা বুঝিতে পারি।

*Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol. X, p. 268.

†Vide Wilson, Vishnu Purana Book, IV, ch. 24.

‡*Vide* Journal of the Behar and Orissa Research Society, 1923, p. 418.

1. Early History of India, 4th ed., p. 41.

*James Prinsep, Indian Antiquities, Vol. II Useful Tables, p. 165.

দশ বৎসরের গোলমাল যে সত্য সত্যই হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃতাংশ হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে :—

"Regarding the subsequent rulers there is no argument in our sources. The sum total of years which elapsed between the death of D. Tishya and the occasion of Abhaya Dutthagamini is gievn as 96 (or 106)."*

'আমরা যে সকল গ্রন্থ হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি তাহাতে পরবর্ত্তী রাজাদের সম্পর্কে একমত পাওয়া যায় না। দেবানাম্পিয় তিষ্যের মৃত্যু এবং অভয় দুথগামিনীর সিংহাসনে আরোহণের মধ্যবর্ত্তী সময়কে ৯৬ বৎসর (বা ১০৬) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।' নিম্নে এ সম্বন্ধে আরও একটি অংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

"If we wish to weigh against each other the value of the Southern and that of the Northern Sources we must begin by leaving out of the reckoning all unwarranted additions, either by the Sinhalese or by others. By so doing and by waiving points of secondary importance, we perceive that the difference turns about ten years. The Pali canon fixing the Council at Vaisali at 100 years after Nirvana and whereas most Northern traditions gives 110 years."†

'আমরা যদি দক্ষিণ-ভারতে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক উপাদানের সহিত উত্তর-ভারতে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক উপাদানের তুলনা করিতে চাই, তাহা হইলে সিংহলবাসী কর্তৃকই হউক আর যে কেহ কর্তৃকই হউক সমর্থনের অযোগ্য বিষয় যে সকল সংযুক্ত করা হইয়াছে, সেগুলি আমাদের বিবেচনায় বাদ দিতে হইবে। এগুলি যদি বাদ দেওয়া যায় এবং যে সকল বিষয়ের গুরুত্ব গৌণ তাহাও যদি আমরা উপেক্ষা করি, তাহা হইলে দেখা যাইবে পার্থক্যটা প্রায় দশ বৎসরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পালি সূত্র অনুসারে গৌতম-বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের একশত বৎসর পরে বৈশালীতে বৌদ্ধদের প্রথম সভার অধিবেশন হইয়াছিল, আর উত্তর-ভারতে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী উহা হইয়াছিল নির্ব্বাণ লাভের একশত দশ বৎসর পরে।'

এই বিষয় সম্পর্কে জৈন গ্রন্থাদি হইতে কি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহারও আলোচনা করা যাউক। জৈন ইতিবৃত্ত হইতে আমরা পাই, জিন-নির্ব্বাণ এবং শেষ নন্দরাজের মৃত্যুর মধ্যে ২১৯ বৎসরের ব্যবধান। কোন কোন ইতিবৃত্তের মতে ২১৫ বৎসর। জৈন গুরু স্থূলভদ্র এবং শেষ নন্দরাজার মৃত্যু একই সময়ে সংঘটিত হয়। আমরা জানি বুদ্ধ এবং মহাবীর উভয়কেই 'জিন' নামে অভিহিত করা হয়। তাঁহাদের জীবন-কালের কতক অংশ সম-সাময়িক। বৌদ্ধ এবং জৈন এই যে দুইটি ধর্ম্মের পাশাপাশি উদ্ভব হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে আশ্চর্য্য মিল ছিল।* জিন মহাবীরের মৃত্যু নির্ব্বাণ বলিয়া কথিত। জিন বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভকে বলা হয় নির্ব্বাণ এবং তাঁহার মৃত্যুকে বলা হয় পরিনির্ব্বাণ। সুতরাং বুদ্ধের নির্ব্বাণ এবং পরিনির্ব্বাণ এবং বুদ্ধ এবং মহাবীরের নির্ব্বাণের মধ্যে গোল পাকাইয়া সময় সময় অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। জিন বুদ্ধ তাঁহার মৃত্যুর ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বাণ লাভ করেন। সুতরাং জিন নির্ব্বাণ এবং শেষ নন্দরাজার মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী এই যে ২১৯ বৎসর কাল তাহা জিন বুদ্ধের নির্ব্বাণ এবং শেষ নন্দ রাজার মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী কালের সমান। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, পুরাণের হিসাব অনুযায়ী বুদ্ধের মৃত্যু এবং শেষ নন্দ রাজার মৃত্যুর মধ্যে ১৭৪ বৎসরের ব্যবধান। এই ১৭৪ বৎসরের সঙ্গে যদি গৌতম বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভ এবং মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী ৪৫ বৎসর যোগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমরা পাই ১৭৪+৪৫=২১৯ বৎসর। জৈন ইতিবৃত্ত হইতে যে বৎসরসংখ্যা (২১৯) পাই তাহার সহিত উহা ঠিক মিলিয়া যায়। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, পুরাণ, জৈন ইতিবৃত্ত এবং বৌদ্ধ ইতিবৃত্ত হইতে প্রাপ্ত প্রমাণের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। সামান্য যে ব্যতিক্রম রহিয়াছে তাহার সমাধান সহজেই করা যায়।

কোন কোন জৈন ইতিবৃত্তে জিন-নির্ব্বাণ এবং বিক্রমের মধ্যবর্ত্তী কাল ৪৭০ বৎসর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই হিসাব অনুযায়ী মহাবীরের মৃত্যু হয় ৪৭০+৫৮=৫২৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে, অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের নির্ব্বাণ বা বুদ্ধত্ব লাভের (৫৪৬ খৃঃ পূঃ অঃ) ১৮ বৎসর পরে। অন্যান্য জৈন ইতিবৃত্তে বলা হইয়াছে, জিন-

*Kern, Manual of Buddhism, p. 119.
†Ibid, p. 107.

*Vide P. V. Bapat, M.A., 'A Comparative Study of a Few Jaina & Ardha-Magadhi Texts with Texts of the Buddhist Pali Canon' in the Sir Asutosh Memorial Volume.

নির্ব্বাণের ৪৭০ বৎসর পরে বিক্রমের জন্ম হয় এবং ১৬ বৎসর পরে অর্থাৎ জিন নির্ব্বাণের ৪৮৬ বৎসর পরে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ডাঃ হোর্ণলির (Dr. Hoernle) হিসাব মতে জিন-নির্ব্বাণ এবং বিক্রমের সিংহাসনে আরোহণের মধ্যে ৪৮৮ বৎসর ব্যবধান।* বিক্রমঅব্দারম্ভ খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮ অব্দের সহিত ৪৮৬ বা ৪৮৮ বৎসর যোগ করিলে আমরা পাই ৫৪৪ বা ৫৪৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ। এই অব্দটি যে বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের বৎসর তাহা আমরা পাইয়াছি। ডাঃ হোর্ণলিও (Dr. Hoernle) বলিয়াছেন, "In any case the coincidence of the years of the Mahavira's and Bnddha's Nirvana is a curious result" †—'যে ভাবেই হউক মহাবীরের নির্ব্বাণের বৎসরের সহিত বুদ্ধের নির্ব্বাণের বৎসরের মিল এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।' বোঝা যাইতেছে, মহাবীরের নির্ব্বাণের সহিত বুদ্ধের নির্ব্বাণ গোলমাল করিয়া ফেলাতেই ১৬ বা ১৮ বৎসরের ব্যতিক্রম হইয়া পড়িয়াছে।

সিংহলবাসীরা যে ৪৮৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের কথা বলে অথবা ক্যানটন-দেশ-প্রাপ্ত প্রমাণ হইতে যে ৪৮৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ আইসে উল্লিখিত ভ্রান্তির দ্বারা তাহারও সন্তোষ-জনক ব্যাখ্যা করা যায়। কোন বৌদ্ধ হয়ত জিন-নির্ব্বাণের বৎসরকে (৫২৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ) জিন বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের বৎসর বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন এবং তাহা হইতে ৪৫ বৎসর বাদ দিয়া (৫২৮-৪৫) ৪৮৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে গ্রহণ করিয়াছেন।

জিন-নির্ব্বাণ এবং বিক্রমাদিত্যের অব্দের মধ্যে মোট ৪৮৮ বৎসরের ব্যবধান। এই ৪৮৮ বৎসর হইতে ২১৯ বাদ দিলে আমরা পাই ৪৮৮—২১৯=২৬৯ বৎসর। চন্দ্রগুপ্ত এবং বিক্রমাদিত্যের মধ্যে ব্যবধান এই ২৬৯ বৎসরের। এই ২৬৯ বৎসরের সহিত বিক্রমাব্দ খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮ অব্দ যোগ করিলে পাওয়া যাইবে ২৬৯+৫৮=৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। ইহাই হইল শেষ নন্দরাজার মৃত্যুবৎসর। আবার ৫৪৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে ২১৯ বৎসর (জৈন ইতিবৃত্ত অনুসারে) বাদ দিলে ৫৪৬—২১৯=৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ অথবা গৌতমবুদ্ধের মৃত্যু বৎসর ৫০১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে ১৭৪ বৎসর (পুরাণ অনুসারে) বাদ দিলেও ঠিক ৫০১—১৭৪=৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ অর্থাৎ শেষ নন্দরাজের মৃত্যু বৎসর পাওয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর এক বৎসর অরাজক অবস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় এবং তাহার পর খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাই যে সত্য তাহা নিম্ন উদ্ধৃতাংশ হইতে প্রমাণিত হইবে :—

"While Alexander was stopped in his advance at the Hyphasis in 326 B.C. he was informed by a native chieftain Bhagala or Bhagela whose statements were confirmed by Poros, that the king of the Gangaridae and Parsii nations on the banks of the Ganges was named, as nearly as the Greeks could catch the unfamiliar sounds, Xandrames or Agrammes.....The reigning king was alleged to be extremely unpopular owing to his wickedness and base origin....."*

(অনুবাদ) আলেকজাণ্ডার ৩২৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তাঁহার অগ্রগতির পথে যখন হিফাসিসে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ভগল বা ভগেল নামক জনৈক স্থানীয় প্রধান তাঁহাকে জানাইয়া ছিলেন যে, গঙ্গানদীর তীরবর্ত্তী 'গঙ্গারাড়ী' এবং 'প্রাচ্য' জাতির রাজার নাম জান্দ্রমেস বা অগ্রমেস। গ্রীকদের কাছে অপরিচিত বিদেশী শব্দ যেরূপ শুনাইয়াছিল তদনুসারে নাম উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত রাজা দুর্বৃত্ত এবং নীচবংশজাত বলিয়া জনসাধারণ তাঁহাকে মোটেই দেখিতে পারিত না। উক্ত প্রধান যাহা বলিয়াছিলেন পুরুরাজা কর্ত্তৃকও তাহা সমর্থিত হইয়াছে।

ভগলকে 'মুদ্রারাক্ষসে উল্লিখিত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের প্রধান সেনাপতির ভ্রাতা ভাগুরায়ণ বলিয়াই মনে হয়। জান্দ্রমেস যে চন্দ্রমস্ (চন্দ্র) অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ৩২৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে আলেকজাণ্ডারের আগমনের সময় রাজসিংহাসনে যিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তিনি চন্দ্রগুপ্ত ছাড়া আর কেহই নহেন। 'মুদ্রারাক্ষস' হইতে আমরা জানিতে পারি, চন্দ্রগুপ্ত নীচজন্ম এবং নন্দবংশজাত ছিলেন। ইহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, তিনি শেষ নন্দরাজার রাণী মোরিয়া কুলজাত ক্ষত্রিয় কন্যা মুরার গর্ভজাত। রাণীর নাপিত প্রণয়ীর ঔরস তাঁহার জন্ম। তাঁহার এই জন্মদোষের জন্যই তিনি জনসাধারণের অত্যন্ত অপ্রিয় ছিলেন এবং নন্দবংশকে ধ্বংস করা হইতেই

*I. A. Vol. XX p. 359.
†Ibid pp. 341-61.

*Vincent Smith, E.H.I., 4th Ed., p. 42.

তাঁহার দুর্ব্বৃত্ততার পরিচয়। বস্তুতঃ চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের জারজ সন্তান এবং তাঁহার পিতা নাপিত বলিয়া তিনি নীচকুলজাত। এইজন্য তিনি মাতার নামে নিজকে পরিচিত করিয়াছিলেন। (ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীতে জোন্স সাহেব সংগৃহীত বায়ুপুরাণের পাণ্ডুলিপিতে মৌর্য্যদিগকে "নন্দসম্ভূত" বলা হইয়াছে।) এই জন্য তাঁহার বংশ মৌর্য্যবংশ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার ফলেই চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজসিংহাসন তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল ছিল এবং চাণক্যকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী হইতে তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের মধ্যে প্রচলিত গল্প হইতে জানা যায়, জনৈক স্ত্রীলোক এবং তাহার সন্তানদের মধ্যে কথোপকথন হইতে চন্দ্রগুপ্ত এবং চাণক্য শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের স্থবিরাবলী চরিতে গল্পটি এইরূপ :—

"সন্ধ্যা কালে তাঁহারা (চন্দ্রগুপ্ত এবং চাণক্য) এক গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন। আহার্য্যের সন্ধানে তাঁহারা এক দরিদ্র রমণীর কুটীরে যাইয়া দেখিলেন, উক্ত স্ত্রীলোকটি পুত্রকন্যাদের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছে। অতি লোভবশতঃ তাহার একটি সন্তান থালার মধ্যস্থল হইতে আহার্য্য তুলিতে যাইয়া হাত পুড়াইয়া ফেলিল এবং যন্ত্রণায় কাঁদিতে আরম্ভ করিল। মাতা তাহাকে চাণক্যের মত মস্ত বড় এক বোকা বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এই ভাবে তাঁহার নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া চাণক্য কুটীরে প্রবেশ করিলেন এবং স্ত্রীলোকটি এইমাত্র যাহা বলিল তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, থালার কিনারার অংশের খাদ্য ঠাণ্ডা হইয়াছে, কিন্তু তাহার ছেলে থালার কিনারা হইতে খাদ্য না লইয়া থালার মধ্য হইতে খাদ্য লইতে যাইয়া হাত পুড়াইয়া ফেলিয়াছে। তেমনি চাণক্যের পরাজয় হইয়াছে, কারণ তিনি শত্রুর সুদৃঢ় দুর্গ আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী দেশ জয় করেন নাই।"

চন্দ্রগুপ্ত এই সময়ে ছদ্মবেশে আলেকজাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে পাটলীপুত্র আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং চন্দ্রগুপ্ত অতি সত্বর পলায়ন করিয়া রক্ষা পান। আলেকজাণ্ডারের প্রস্থানের পর তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য চন্দ্রগুপ্ত ফিলিপ্পসকে প্রণোদিত করিয়াছিলেন। 'মুদ্রারাক্ষসে'র 'পর্ব্বতক'ই এই ফিলিপ্পস বলিয়া মনে হয়। অতঃপর ৩২৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত ফিলিপ্পসকে হত্যা করেন এবং শত্রুদিগকে পরাভূত করিয়া পুনরায় পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'মুদ্রারাক্ষসে'র মলয়কেতু বোধ হয় সেনাপতি মেলিয়াগার (General Meleager) অথবা সেলুকাস। সম্ভবতঃ তিনি ফিলিপ্পসের সঙ্গে কিছুদিন ভারতবর্ষে ছিলেন। মিঃ কে, পি, জয়শোয়ালও মলয়কেতুকে সেলুকাস বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।* উক্ত নাটকে উল্লিখিত বৈরোচক বোধ হয় দ্বিতীয় পুরু। ভাগুরায়ন যে 'ভগেল' তাহ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

সমস্ত জৈন গ্রন্থেই আমরা পাই, জিন-নির্ব্বাণের পরে 'পালকে'র বংশ ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন, তাহার পর নন্দবংশ রাজত্ব করেন ১৫৫ বৎসর। হেমচন্দ্র জিন নির্ব্বাণের ১৫৫ বৎসর পর চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জৈন গ্রন্থাদিতে নন্দবংশের যে রাজত্বকালের উল্লেখ করা হইয়াছে, হেমচন্দ্র যে সেই কাল পরিমাণের কথাই বলিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। মেরুতুঙ্গ তাঁহার 'বিচারশ্রেণী' নামক পুস্তকে হেমচন্দ্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থাদিদ্বারা সমর্থিত হয় না বলিয়া উহার প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। ঐ সকল গ্রন্থাদিতে শেষ নন্দরাজার মৃত্যু আরও ৬০ বৎসর পরে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মহাবীরের মৃত্যু এবং শেষ নন্দরাজার মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী সময় যে ১৫৫ বৎসর হওয়া অসম্ভব তাহা কলিঙ্গের জৈন রাজা খারবেলের শিলালিপি হইতেও প্রমাণিত হয়। উক্ত লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নন্দরাজের পর ৩০০ বৎসর মৌর্য্য রাজার (চন্দ্রগুপ্ত) পরবর্ত্তী ১৬৪ বৎসরের সমান। সুতরাং নন্দবংশের রাজত্বকাল ৩০০ — ১৬৪ = ১৩৬ বৎসর। প্রথম

*Ind. Ant. XLII, p. 265.

নন্দ অর্থাৎ উদয়-অশ্ব বা অশোক হইতে শেষ নন্দরাজা পর্য্যন্ত রাজত্বকাল পুরাণ অনুসারে ১৩৭ বৎসর। উদয়ন বৎসদেশের রাজারূপে চারি বৎসর রাজত্ব করেন। তার পর তিনি ৩৩ বৎসর রাজত্ব করেন পাটুলীপুত্রের রাজা হিসাবে। নন্দীবর্দ্ধন হইতে শেষ নন্দ পর্য্যন্ত একশত বৎসরের সহিত উক্ত ৪+৩৩=৩৭ বৎসর যোগ দিলে ১৩৭ বৎসর পাওয়া যায়। এই কাল-পরিমাণকেই জৈন গ্রন্থাদিতে ১৫৫ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে ১৮ বৎসর ভ্রম হইয়াছে। এই ১৮ বৎসর ভ্রম হওয়ার কারণ পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং প্রথম নন্দ এবং শেষ নন্দরাজার মধ্যবর্ত্তী সময় ১৩৬ বা ১৩৭ বৎসর। সুতরাং, প্রথম নন্দরাজার ১৮ বৎসর পূর্ব্বে মহাবীরের মৃত্যু এবং ২৮ বৎসর পর গৌতম বুদ্ধের মৃত্যু হইয়াছিল কাহারও কাহারও এই অভিমত স্বীকার করা অসম্ভব।

ক্রমশঃ

অতৃপ্তি

শ্রীশতদল গোস্বামী

আমার মৃত্যু হ'বে ফাল্গুনের চঞ্চল নিশীথে,
পরিপূর্ণ আলোক-মালায় চারি দিকে রচিবে কবর ;
বনানীর উচ্চ-শির দুলিবে দুরন্ত সঙ্গীতে—
তখন মৃত্যু হ'বে, লুপ্ত হ'বে রমণীয় স্বর।
আমার গানের সুর ভাসিবে না দখিনা পবনে
বসন্তের উন্মত্ত জ্যোৎস্না রহিবে না মোর প্রতীক্ষায়,
অজস্র তারকা-রাশি অট্টহাসি হাসিবে গগনে
তখন মৃত্যু হবে ধরণীর অতৃপ্ত নিশায়।
মোহ মোর কেটে গেছে, গেছে ছিঁড়ে পার্থিব-বন্ধন
উন্মুক্ত প্রান্তরে আমি মিছে কত কাটায়েছে দিন,
কাননের মর্ম্মস্থলে ওঠে শুধু করুণ ক্রন্দন
দিগন্তে মিলায় তাহা, ক্রমে ক্রমে হয়ে আসে লীন।
তবু মোর মৃত্যু হ'বে ধরণীর অতৃপ্ত নিশায়,
ব্যাকুল হৃদয়ে প্রিয়, রহিও মোর প্রতীক্ষায়।

দাঁড়াবে। কি বিচিত্র তার মনের জগত! সবসময়ে যেন দুটো মন। সে এখানে বসে চা খাচ্ছে মলিনার সঙ্গে গল্প করতে করতে, তার একটা মন যেমন এই সন্ধ্যার প্রতিটি কথা প্রত্যেক ভঙ্গী, মুখের সামান্য পরিবর্ত্তন-গুলিও মনে ক'রে রাখবে, অবকাশের সময় সে সব দিয়ে স্বপ্ন রচনা করবে, তেমনি তার আর একটা মন এখন দেখতে পাচ্ছে তিন জায়গায় সেলাই-করা (এসব উৎপলের নজর এড়ায় না) রং-জলে-যাওয়া একটা নীল শাড়ীর আঁচল কোমরে আঁট করে জড়িয়ে অতসী এতক্ষণে রান্না সেরে ফেলে মায়ের জন্য রুটি বেলতে বসেছে। সবিতা বসেছে জানলার কাছে পা ছড়িয়ে, হাতপাখা নেড়ে নেড়ে একটু ঠাণ্ডা হবার চেষ্টা করছে। কোন গিন্নী হয়ত এসে তার সঙ্গে নানা সাংসারিক গল্প জমিয়েছেন, কিন্তু অতসী কোন কথায় যোগ দিচ্ছে না, তার পাতলা লালচে ঠোঁট দুটি দৃঢ়নিবদ্ধ, হাতের কাজ নিয়ে সে ব্যস্ত, মুখ দেখে মনের ভাব একটুও টের পাবার জো নেই। এরকম কতবার সে অতসীকে দেখেছে, মুখ চেয়ে মনের ভাব আঁচ করতে চেষ্টা করেছে, কি কথা ভাবছে ওই অতটুকু মেয়েটি অমন তন্ময় হয়ে? হাতের আঙুলগুলি কি সুনিপুণ ভাবে কাজ করে যাচ্ছে, বিছানা পাতাই হোক্ ঘর ঝাঁট দেওয়াই হোক্, তরকারী কোটাই হোক্, কি সেলাই-এর কাজ হোক। অতসীকে সে কিছু বুঝতে পারে না, আবার মলিনাকেও পারে না। বিশেষ করে অন্য লোকের সামনে মলিনাকে তার হেঁয়ালি বলে মনে হয়। কি কথা যে বলবে, কি যে সে বলবে না কিছুই আন্দাজ করা যায় না। কিন্তু পথে ঘাটে লাইব্রেরীতে বা কলেজে মাঝে মাঝে যখন তার সঙ্গে কথা হয় তাকে যেন ধরাছোঁয়া যায়, কোথায় যেন তাদের মন পরস্পরকে স্পর্শ করে। কিন্তু সে যাই হোক্ এই মুহূর্ত্তে আমি কত একলা, উৎপল মনে মনে ভাবল, ওই মেয়ে আমার চেয়ে কত যোজন পথ দূরে, আবার কতদূরে অতসী তার মনের সব সুখ দুঃখ আশা ও কল্পনা নিয়ে। শুধু একজন সবসময়ে তার কাছে, সে তার মা। এইখানেই সব মেয়ের চেয়ে মা তার বেশী আপন, তার অনেক কাছে, মাকে সে বুঝতে

(২)

রমেশকে ঘরে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলে অতসী কাছে এসে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর থেকে সবিতাও হাসিমুখে ডাকল, 'এসো রমেশ এইখানটায় বোসো' ব'লে নিজের পাশে জায়গা দেখিয়ে দিলে। এই ঘরখানি তার অধিবাসীদের আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে সবসময়ে তার প্রতি উন্মুখ রমেশ বেশ অনুভব করতে পারে। এখানে এলেই তার অন্যরকম লাগে। নিজেকে আর মোটেই একা মনে করা যায় না। সবিতা ও অতসীর কাছে শুনে শুনে রাজগঞ্জের অনেক খবর, অনেক গল্প তার জানা হয়ে গিয়েছে। তার নিজেরও সব পারিবারিক কাহিনী যা এতদিনের পরিচয়েও উৎপলের কাছে ব'লবার দরকারই হয়নি এরা সে সব না শুনে ছাড়েনি। তার মা নেই, বিমাতার সংসার, বাপের টাকা আছে, তবে বুড়ো হ'য়ে অকর্ম্মন্য হয়ে পড়েছেন। বাপের টাকা-পয়সায় রমেশ কোনই দাবী করবে না। এসব গল্প সবিতার একেবারে মনের কাছে তাকে এনে দিয়েছে, নিজেকে সে এখন রমেশের একজন অভিভাবকের মতই মনে করে। আবার অতসীও অত্যন্ত নিঃসঙ্কোচে মিশেছে তার সঙ্গে, তার ভবিষ্যতের আশা ও কল্পনা সবই [illegible] নির্ভর করে আছে রমেশের উপরে। অতসী যা [illegible]কে ভুলেও কখনও শোনায় না, যেমন তাদের সাংসারিক অবস্থার খুঁটিনাটি, রমেশকে সে সব বলতে সে দ্বিধা বোধ করে না। সে যেন রমেশের কাছে অন্য মানুষ হয়ে যায়। তার মধ্যে যে বালিকা আছে যা সবিতা ও উৎপলের কাছে নিজেকে গোপন ক'রে রাখে, সেই নিরাবরণ বালিকা-মূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ করে রমেশের কাছে, সে কথা অতসী নিজেও জানে না, কিন্তু রমেশ তা বুঝতে পারে। এই মেয়েটি কৈশোরও প্রায় ছাড়িয়ে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেচে। কৈশোরে ছিল কেবলই কল্পনা আর স্বপ্ন, এখন এসে মিলেছে যৌবনের আত্ম-প্রত্যয় আর দুঃসাহস, শুধু স্বপ্ন দেখা নয়, স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষা। সে জানে সংসারে নিজের পথ তাকে নিজেই ক'রে নিতে হবে এবং [illegible]

প্রতিদিন। তবু এ সকলের পেছনে একটি বিমূঢ় বালিকা এখনও তার অবাক্ দৃষ্টি, তার অসহায় চোখ মেলে সামনে চেয়ে দিশেহারা হ'য়ে গিয়েছে, রমেশের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় কত সময়ে তা ধরা পড়ে যায়। অতসী তাকে বলে, দেখুন রমেশদা, দাদা বেচারী কাজ খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে সন্ধ্যে বেলায় যখন বাড়ী ফেরে, তখন কি তাকে মুখ ফুটে বলা যায় যে কাল দুপুরে রাঁধব কি, ঘরে তো চাল ডাল নেই। ক'লকাতায় এসে আমরা যে কি অবস্থায় পড়ে গিয়েছি সে কথা আপনি ছাড়া দ্বিতীয় লোকে জানে না। মাকেও বলি না, মার মনে ভয়ানক লাগবে। আমি ওদের বলি আমার হাতে এখনও কিছু আছে—তাই থেকে চল্‌ছে। মা দুর্ভাবনা করেন, কিন্তু বেশীক্ষণ এ নিয়ে ভাবতে পারেন না আর ভেবেই বা তিনি করবেন কি? রাজগঞ্জে দেখি নি কি, কত সময় এমনও ঘটেছে ঘরে এক বেলার রান্নার যোগাড়ে নেই, মা এর তার কাছ থেকে ধার করে এনে কত কষ্টে চালিয়েছেন, কিন্তু সে আমাদের ছোটবেলায়। এখনও যদি মাকে এর তার কাছে হাত পাততে হয়, তবে কি রকম লাগে বলুন তো? অথচ আমার কাছে কি যে পুঁজি আছে, আমিই জানি।

রমেশ ভেবে পায় না এদের কি উপায় সে করতে পারে। নিজের অবস্থা এমন নয় যে পরকে সাহায্য করা চলে। তবুও অতসীর দুল যোড়া নিজের কাছে রেখে সে অনেক কষ্টে টাকা এনে দিয়েছে, বিক্রী করতে পারে নি। কথাটা তাদের দু-জনের মধ্যেই ছিল। উৎপল বা সবিতা ঘুণাক্ষরেও জানতো না। রমেশের ভালো লাগে নি ব্যাপারটা, কিন্তু এ না করেই বা উপায় কি? সে না নিলেও অতসীকে দুল বিক্রী করতেই হবে, নইলে পরের দিন হাঁড়ি চড়বে কি করে?

সে উৎপল আর অতসী দু'জনের জন্যেই খুব চেষ্টা করছিল, কিন্তু মুস্কিল এই যে তার নিজের অবসর প্রায় ছিলই না। পরীক্ষা আসন্ন, আবার হস্পিটালের বহু কাজ, দুইয়ে মিলে তাকে বিব্রত করে রেখেছিল, এখন টিউসানী সন্ধানে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়। অতসীর পড়াশোনা নিয়েও কম সমস্যা নয়। মেডিকেল স্কুলে এখনও সিট্ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু অতসী যা চায়, সাহায্য, বৃত্তি তা এ বৎসর সবই বিলি হ'য়ে গিয়েছে, নিজের খরচ করে পড়ার সাধ্য অতসীর নেই। দ্বিতীয় হচ্ছে নার্সিং স্কুল। সেখানে বিনা খরচে পড়বার ব্যবস্থা হ'তে পারে, কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে অতসীকে পড়াশুনো ছেড়ে এখুনি না চাকরী খুঁজতে হয়। তবে সেদিকেও চট্ ক'রে কিছু সুরাহা হবার আশা নেই। ম্যাট্রিক পাশ মেয়ে কলকাতায় আজকাল এত আছে যে, শিক্ষয়িত্রীর কাজ জোটানো তাদের পক্ষে প্রায় ছেলেদের চাকরী জোটানোর মতই কঠিন। অতসীর সঙ্গে এ সব কথা সে কয়েকদিনই আলোচনা করেছে, কিন্তু দু-জনে মিলেও কোন মীমাংসা করতে পারে নি।

আজ সে একটা খবর নিয়ে এসেছিল, যদিও তার মনে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল, নিজেই বুঝতে পারছিল না অতসীকে এ বিষয়ে কি পরামর্শ দেওয়া যায়। দু' মাসের পরিচয়। তবু দু'মাসে মানুষের মনের কতটুকু জানা যায়? কিন্তু নিত্যকার মতই যখন অতসী প্রফুল্ল মুখে তার সঙ্গে গল্প করতে লাগল, সবিতার আদেশে চায়ের জল চড়িয়ে দিল, উৎপলের কবিতা নিয়ে তাকে আজ কি রকম জব্দ করেছে উচ্ছলিত হাসির সেই বর্ণনা করল, তখন রমেশের চোখে এড়াল না তার চোখের নীচের কালির দাগ, কণ্ঠের হাড় ভেসে উঠেছে, পুরন্ত মুখখানা শুকিয়ে উঠ্‌ছে। তার মনে আর দ্বিধা রইল না। সবিতাকে বলল, "মা, আপনার সঙ্গে বিশেষ একটা পরামর্শ আছে আজ। অতসী, চা দিতে হ'লে শীগ্‌গির দাও, চায়ের পেয়ালাটা হাতে না নিলে পরামর্শ ভাল করে জমবে না।"

সবিতা অত্যন্ত উৎসুক হ'য়ে উঠল। রমেশের কথায় সর্ব্বদাই এমন একটা ভাব থাকে যেন সবিতার পরামর্শ মতামতের কতই মূল্য আছে। এই ছলনাটুকু সবিতা ধরতে পারে না, তার খুব ভাল লাগে। তার নিজের ছেলে-মেয়ে এমন করে তার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসে না। তারা সবই নিজেরা ঠিক করে তবে তাকে জানায়। রমেশ তার এই অভিমানটুকু তৃপ্ত করতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করতো। অতসীর হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিয়ে চুমুক দিয়ে সে বলল, "আচ্ছা মা বলুন তো মেয়েদের চাকরী করা সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

সবিতা এ বিষয় কোন দিনই মাথা ঘামায় নি, সে বলল, "কেন বল দেখি, কে চাকরী করবে?"

রমেশ উত্তর দিল, "ধরুন অতসী যদি একটা কাজ নেয়, সংসারের আয়ও বাড়বে, নিজেও তো সে সারাদিন ঘরে বসে কাটাতে ভালবাসে না, আপনিও বলেন অতসী আপনার সব কাজ কেড়ে নিয়ে আপনাকে কুঁড়ে বানিয়ে দিচ্ছে, সব দিকই তা হ'লে ভাল হয় না কি?"

সবিতা হতবুদ্ধির মত একটুক্ষণ চুপ করে রইল, তার পর বলল, "খুকী এই মস্ত সহরে কোথায় চাকরী করতে যাবে, ও কি কোথাও বেরিয়েছে? রাস্তাঘাট জানে না, প্রথম দিনেই তো হারিয়ে যাবে। ও সব মুখেও এন না।"

এবার অতসী বলল, "মা-লক্ষ্মীটি অমত কোরো না। আমি হারিয়ে যাবো না, রাস্তাঘাট দাদার সঙ্গে বেরিয়ে দু'দিনে সব চিনে নেবো। দেখো না রাস্তা দিয়ে সমস্তক্ষণ কত মেয়ে একা চলাচল করে?"

"রমেশদা চাকরীটা কি, বলুন তো?"

রমেশ একটু ইতস্ততঃ করে বলল, "কাজটা হচ্ছে হাওড়া ষ্টেশনে মেয়েদের কাছে রেলের টিকিট বিক্রী করা। রোজই যে এক সময়ে তোমার ডিউটি থাকবে তা নয়। কোন দিন সকালে, কোন দিন দুপুরে, কোন দিন সন্ধ্যায়। তবে বেশী রাত অবধি কোন দিনই থাকতে হবে না। সাধারণতঃ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েরাই এ কাজ করে এবং পায়। আমার চেনা একটি এ্যাংলো মেয়েই আমাকে খোঁজ দিলে। সে এ কাজ ছেড়ে দিচ্ছে, তোমাকে তার বদলে চেষ্টা করে ঢুকিয়ে দিতে পারে হয় তো। এখন তোমরা ভেবে দেখ।"

সবিতা বলল, "তুমি বাবা খোকাকে এ কাজে ঢুকিয়ে দাও না কেন, সে তো চাকরী, চাকরী করে হেদিয়ে মরছে, রোজই শুকনো মুখে ফিরে আসে। তারই তো ভাল হবে।"

রমেশ হেসে ফেলল "এ যে মেয়েদের কাজ, মেয়েদের কাছে টিকিট বিক্রী, মেয়েরা ছাড়া এ কাজ পাবে কেন? ছেলেদের চাকরী পাওয়া আজকাল যে সীতার

অতসী বলল, "রমেশদা আমি নেবো এ কাজ। ভাল না লাগলে, সুবিধে না হ'লে, না হয় ছেড়ে দেবো, কিন্তু ঘরে বসে মিছিমিছি সময় কাটাতে আমি আর পারি নে। দাদা এলে তাকে ভাল করে বলে রাখবো, আপনি মাকে বুঝিয়ে, সুঝিয়ে রাজী করুন।"

তার গলার সুর শুনে সবিতার মুখ শুকিয়ে গেল। এ সুর, এ কণ্ঠ সে চেনে। এমনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে মেয়ে যখন কথা বলে, সবিতা জানে তার আর সাধ্য নেই তাকে ঠেকিয়ে রাখে। রমেশ তাকে বোঝাবে? মেয়ের গলায় এই সুর শোনবার পরে তাকে বোঝানোর আর কোন দরকার আছে কি? এ তো আর নতুন নয়।

(৩)

না এ নতুন নয়। রাত্রে শুয়ে শুয়ে সবিতার মনে হোল, সে আবার যেন রাজগঞ্জে ফিরে গিয়েছে। অনেকগুলো বছর মাঝখানে থেকে খসে গিয়েছে। তখনও তার অল্প বয়স, একদিন তার সাধ হয়েছিল পাড়ার কয়েকজন মেয়েকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে। কোন পুরুষ অতিথি নয়। সবাই সবিতার বন্ধু। রাত্তিরে খাওয়া হবে, খাওয়া চুকলে সেদিন পাড়ায় যাত্রা ছিল, মেয়েদের বসবার ভাল জায়গা বন্দোবস্ত হ'য়েছিল। রথীবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ভারী ছেলেমানুষ। যাত্রা দেখার সখটা তারই বেশী ছিল। সবিতা সর্ব্বদাই তার স্বামীকে একটু সমীহ করে চলে, বলি বলি করে কথাটা দু'দিন সে বলতে পারে নি। শেষটায় বিকেলে জল খাবার খেতে দিয়ে বলে ফেলল কথাটা। শম্ভুনাথ আপত্তি করলেন না। তখন খুকী হয় নি, খোকাও একেবারে শিশু নয়। রাত্রে ঘুম পাড়িয়ে গেলে কোন হাঙ্গামা করবে না। সারাদিন আয়োজন করে সে রান্না করল পরিপাটী ক'রে তার সব বিদ্যা জাহির ক'রে। খোকা কাছে বসে এটা চাখছে, ওটা ধরছে, সেটা ফেলে দিচ্ছে, কেবলি বিরক্ত করছে আর মায়ের বকুনী শুনছে। সন্ধ্যে হয়ে গেল, নিমন্ত্রিতারা যার যার বাড়ীর কাজ-কর্ম্ম সেরে একে একে এসে জুটতে লাগলেন। এখন খেয়ে নিয়েই যাত্রা

নেবে, সহজ কথা নয়। শম্ভুনাথ খেয়ে গেছেন, কিন্তু খোকা তো ঘুমোয় না। আজ তার কি হয়েছে, কেবলি বলছে, মা আমিও যাব যাত্রা দেখতে। তাদের নিজেদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল, রাতও একটু হয়েছে। ঢাক ঢোলের শব্দ শোনা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে লোকজন জমতে সুরু হয়েছে। বহু কষ্টে মেরে ধরে কাঁদিয়ে সে যখন ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে বেরিয়ে এল ততক্ষণে তার বন্ধুরা অধীর হয়ে উঠেছেন। নেহাৎ যার বাড়ী খাওয়া দাওয়া করেছেন তাকে ফেলে যাওয়া চলে না। সে ভেবেছিল যাবে না, কিন্তু তাও তারা কিছুতেই মানেন না। শেষে তারা গিয়ে যখন উপস্থিত হোল চিকের সামনের ভাল জায়গা ততক্ষণে দখল হয়ে গিয়েছে। অনেক কষ্টে, অনেক মন্তব্য হজম ক'রে ঠেলে ঠুলে তারা একটু জায়গা করে নিল। ততক্ষণে সখীদের গান সুরু হয়েছে; তারপরে সে কি সব দৃশ্য। যেমনি পোষাক-আসাক, তেমনি গলা, তেমনি গান। রাজার রাজত্ব গিয়েছে, বনে এসেছেন। সেখানেও ছেলেকে সাপে কেটেছে, রাণীকে এক দস্যু এসে কেড়ে নিয়ে যেতে উদ্যত, অস্ত্রহীন রাজা শুধু হাতেই যুদ্ধ ক'রে ক'রে অবসন্ন হ'য়ে পড়েছেন। দস্যু তার বুকে চড়ে বসেছে, আলু-থালু চুলে রাণী মৃত ছেলেকে নিয়ে করুণ স্বরে বিলাপের গান ধরেছেন, এমন সময়, ভাবলে এত বছর পরেও সবিতার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, কোথা থেকে গম্ভীর কণ্ঠে "ক্ষান্ত হও দুর্বৃত্ত," বলতে বলতে দীর্ঘকেশা কৃষ্ণমূর্ত্তি এক ভৈরবী ত্রিশূল হাতে এসে উপস্থিত। তিনি সেই বনের মধ্যে মন্দিরের পূজারিণী। তাঁর তেজোময় মূর্ত্তি আর আগুন-ঝরা চোখের দৃষ্টি দস্যু সহ্য করতে পারে না, সে এক পা দু-পা করে পিছু হটে হটে পালিয়ে যায়। ভৈরবী মন্ত্র-পড়া কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে রাজপুত্রকে বাঁচিয়ে দেন, রাজা ও রাণী রাজ্য ফিরে পান ইত্যাদি। সারারাত জেগে চোখ লাল করে ক্লান্ত হয়ে সে ভোরের দিকে বাড়ী ফিরেছিল। এতক্ষণ ঘর সংসারের কথা, এমন কি খোকার কথা পর্য্যন্ত প্রায় ভুলেছিল, এখন বাড়ী ফিরতে ফিরতে মনে হোল, খোকা না জানি কি করবে যদি রাত্তিরে হঠাৎ জেগে তাকে না দেখতে পায়। ফিরে এসে দেখে—ভয়ানক ব্যাপার। সারারাত কান্নাকাটি করে খোকা শম্ভুনাথকে বিষম জ্বালিয়েছে, তিনি তাকে নিয়ে বারান্দায় পায়চারি ক'রে কাটিয়েছেন, তবু শান্ত করতে পারেন নি। এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। গা বেশ গরম। তার পরে তিন-চার দিন যা করে কাটল। জ্বর, হাম হ'য়ে খোকা কি ভয়ানক কষ্ট পেল, সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপে ও দুশ্চিন্তায় ভুগে সেও সারা হোল। খোকা যেতে দিতে চায় নি, সে জোর করে যাত্রা শুনতে গিয়েছিল, এই অভিমানে ছেলে এমন অসুখ বাধিয়ে তাকে শাস্তি দিয়েছে, এই ভাব বহুদিন সবিতার মন থেকে যায় নি। যাক্ সে পুরোনো কথা, কিন্তু সবিতা জানে স্বর্গের দেবতারা তাকে সব দিয়েছেন, এমন ছেলেমেয়ে দিয়েছেন যাদের মধ্যে এক তিল দোষ নেই, এ রকম ছেলেমেয়ে পেলে যে কোন মা ধন্য হ'য়ে যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে একেবারে তুচ্ছ করে গড়েছেন, অবহেলায় গড়েছেন—সে যোগ্য নয় এদের মা হবার। ওদের দোষ কী? ওদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পেরে সে যদি কেবলি পিছিয়ে যায় তবে চির-জীবন তারাও কি পিছিয়ে থাকবে? সে সারাজীবন কাটিয়েছে ভাগ্যের মুখ চেয়ে। আজ মনেও পড়ে না তার শৈশব জীবনের কথা। মা-বাবাকে কিছু মনে নেই, তার-পরে তাদের দেশের বাড়ী, সেখানে কোনদিন সে কিছু চাইতে সাহস করে নি, জানতো চেয়েও পাবে না। টিন ভর্ত্তি করে ময়লা কাপড় সোডা দিয়ে সেদ্ধ করে পুকুরঘাটে কাচতে যেতো ঠিক তার স্নানের আগে। বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের খাওয়া হ'য়ে গিয়েছে, বাবুরা খেতে বসেছেন। বেলা বারোটার কম নয়। এতক্ষণ সে জ্যাঠাইমাকে রান্নাঘরে সাহায্য করেছে, ঠাকুরমার রান্নার যোগাড় করে দিয়েছে, তাঁর ওষুধ তৈরী করে খাইয়েছে, ছোট দু' একটি ছেলেমেয়েকে নাইয়ে দিয়েছে। কাপড় আছড়াবার জন্যে পুকুরঘাটে একটা চওড়া তক্তা কাৎ ক'রে ফেলা আছে। পেছনের পুকুর এখন একেবারে নির্জ্জন। পাশেই আম বাগানে থেকে থেকে কাক ডাকছে। পুকুর ছাড়িয়ে যে মাঠটা দেখা যায় নলিন দাদার বাড়ী ছাড়িয়ে আরো অনেক—অনেক দূরে যেখানে দৃষ্টি চলে, সেখানে দুপুরের রোদে গাছের ছায়া খুঁজে, খুঁজে গরু চরছে, আকাশে খুব উঁচুতে চিল উড়ছে। কাপড় আছড়াতে আছড়াতে,

তার হাতে খিল ধরে যেত। খিদেয় পেটে জ্বালা ধরতো, সে এক একবার দম নিয়ে একটু জিরিয়ে নিতো আর চারদিকের প্রকৃতি তার মনে কেমন করে যেন ঘনিয়ে আসতো। তার শরীরে যতই কষ্ট হোক্ মনে দুঃখ হোত না, সে কোন জটিল ভাবনা ভাবতো না। যে সব অতি ছোট ছোট সাধ তার পূর্ণ হোত না, বা যতটুকু ভবিষ্যতের কল্পনা করতে তার মন সমর্থ হোত তাই নিয়ে ভেবে ভেবে সময় কেটে যেত। সে ভাবতো আমারও তো বয়স হোল, সানুর চেয়ে আমি বড়, সানুর বিয়ে হয়ে গেল, আমার বিয়ে দেবার এরা নামও করেন না। তার একটা প্রিয় কল্পনা ছিল, সে যেন খুব বড়লোকের ঘরের বউ হয়েছে, বিয়ের পরে লোক-লস্কর গয়নাগাটি, অনেক জিনিষপত্র নিয়ে এ বাড়ীতে দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে। যারা এতদিন তাকে খুব মুখঝাম্‌টা দিয়েছে তারাই সমীহ করে কথা কইছে, তার ঐশ্বর্য্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছে। বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে কি করে? না, এক মস্ত ধনীর ছেলে পণ করেছে সে বড়লোকের মেয়ে চায় না, খুব গরীব ঘরের একটি শান্ত সুশীলা লক্ষ্মী মেয়ে চায় (সবাই অলক্ষ্মী বলে গাল দিলেও সবিতার চিরদিনই ধারণা সে লক্ষ্মী মেয়ে)। খুঁজতে খুঁজতে বরপক্ষের লোকজন তাদের গ্রামে এসে পড়ল। জ্যাঠাইমা তাঁর নিজের মেয়েদের দেখালেন। আরো কত লোক তাদের মেয়ে দেখালো। ধনীর ছেলের আর পছন্দ হয় না। শেষটায় তারা খবর পেল এ বাড়ীতে আর একটি মেয়ে আছে। বাপ-মা-মরা, বড় লক্ষ্মী মেয়ে, ভারী কাজের আর সাতচড়েও তার মুখে কথাটি নেই। তারপরে তারাই উদ্যোগ করে দেখে শুনে পছন্দ করে বেনারসী পরিয়ে পাল্কী চড়িয়ে তাকে নিয়ে গেল।

সে ভাগ্যকে চিরদিন মেনে নিয়েছে, এতটুকু বিদ্রোহ করার কথাও তার মনে হয়নি। ভাগ্যও তাকে লাঞ্ছিত করে নি; শুধু তাকে রাজরাণী করেও কোথায় একটা ফাঁক রেখে দিয়েছিল; তার বুদ্ধির ত্রুটিটা ভরিয়ে দেয় নি। তার যদি আর একটু বুদ্ধি থাকতো, বুঝতে পারতো সে তার ছেলেমেয়ের ভাল-মন্দ, তাদের কাছে এত তুচ্ছ হয়ে যেতো না তার মতামত! ক্রমশঃ

পরেশনাথের পথে

(ভ্রমণ)

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

দেওয়াল-পঞ্জীর লাল কালির দাগগুলি বিশেষ করিয়া একত্রে সন্নিবিষ্ট দশ-বারটি ঐরূপ তারিখ দেশ ভ্রমণের নেশায় মাতাল মনকে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করিয়া সর্ব্বদাই ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে। সংসারিক অভাব অনটন, পরিজনবর্গের অসুস্থতা, এমন কি অপরিহার্য্য বিশেষ বিশেষ জরুরী কার্য্যাবলীও তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। তারিখ ষষ্ঠী-কল্পারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধেয় বন্ধু চারুচন্দ্র দত্ত ও আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া গিরিডি ও পরেশনাথের পথে টানিয়া বাহির করিল। পথের সম্বল লোটা-কম্বল ভরসা করিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে দিল্লী এক্সপ্রেস ধরিয়া শারদীয়া সপ্তমীর রাত্রে রওনা হইলাম।

কলিকাতার জনকোলাহল ছাড়াইয়া শুভ্র জ্যোৎস্না-বিধৌত মুক্ত প্রান্তরের বুক চিরিয়া সোদপুরের গোশালা,

দৈত্যের মত চিমনীগুলি পিছনে ফেলিয়া ট্রেনখানি একদৌড়ে আসিয়া বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত নৈহাটি তীর্থে হু-উ-স শব্দে হাঁফ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। পুনরায় যাত্রা সুরু হইতেই হুগলীর জুবিলী ব্রীজ, ইমামবারার সুউচ্চ মিনার, ব্যাণ্ডেলের গীর্জ্জা প্রভৃতি পিছনে ফেলিয়া বিদ্যাসুন্দরের লীলা-নিকেতন বর্দ্ধমানে আসিয়া থামিল।

পূজার সময়। ট্রেনে অত্যন্ত ভীড়। সুতরাং আমরা রাত্রি জাগরণের জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া ডেলি-প্যাসেঞ্জার-বাঞ্ছিত বেঞ্চের কোণ দখল করিয়া বসিয়াছিলাম। শিয়ালদহ হইতে আমরা যে বগীখানাতে উঠিয়াছিলাম তাহা বর্দ্ধমানে কাটিয়া হাওড়া হইতে আগত দিল্লী এক্সপ্রেসের সঙ্গে জুড়িয়া দিল। প্লাটফরমে ফেরী-ওয়ালারা নানা প্রকার বিকৃতস্বরে আপন-আপন পসরা লইয়া হাঁকিতেছে। সীতাভোগ-মিহিদানা-ওয়ালা বেশ মিঠা সুরে হাঁকিয়া গেল। পুরী-তরকারী-মিঠাই-ওয়ালা খৈনি-টেপা মুখে কর্কশ কণ্ঠে আপন দ্রব্যের গুণ গাহিল। রোটি-গোস-কাবাবওয়ালা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে গালভরা আওয়াজ করিল। পান বিড়ী সিগারেট মিনতির স্বরে হাঁকিল। হিন্দু চাওয়ালা গরম চা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে বলিয়া জলদ হাঁকিয়া ফিরিল আর তাহার সমব্যবসায়ী মুসলমান চাওয়ালা ঢিমে তালে পা ফেলিয়া চলিল।

বর্দ্ধমান ছাড়িয়া ট্রেন খানা-জংসন, অণ্ডাল, রাণীগঞ্জ আসানসোল পার হইয়া সাঁওতাল পরগণায় প্রবেশ করিয়া রাত্র সাড়ে তিনটার সময় আমাদের মধুপুরে নামাইয়া দিল। এখান হইতে ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেনে গিরিডি। গিরিডি পৌঁছিলাম সকাল সাতটায়। তারপর টাঙ্গা করিয়া বন্ধু মিঃ ভিঃ রায়ের বাংলোর ফটকে হাজির। চারুদা মিঃ রায়ের নাম ধরিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অবাক করিয়া দিব বলিয়া পূর্ব্বে কোনও সংবাদ দেওয়া হয় নাই। মিঃ রায় বাহিরে আসিয়া হঠাৎ যেন বিস্মিত ভাবে ক্ষণিক থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পরক্ষণেই একগাল হাসিয়া আমাদের দুইজনকেই একসঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া বৈঠকখানায় নিয়া বসাইলেন।

মিঃ রায় বলিলেন, "তোমরা যে পূজার সময় গৃহকোণ এবং গৃহিণীর অঞ্চল ছেড়ে এখানে কেমন করে এলে তা আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না চারু। আমার তো বরাবরই ধারণা ছিল ঐ দুইটিই তোমাদের পথে বেরুবার দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়।

আমি বলিলাম, "মিঃ রায়ের সার্টিফিকেটের জোরে এখন হতে আমাদের গৃহিণীর নিকট অকৃতজ্ঞতার অপবাদ দূর হ'ল।"

সরস আলাপ-আলোচনার মধ্যে চা, টোষ্ট, জেলি আসিয়া উপস্থিত হইল। চা খাইয়া আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম। পথে মিঃ রায় বলিলেন, "ওহে চারু, আমাদের সেই জেলাস্কুলের মাষ্টার নরেনবাবু এখানে আছেন। চল আগে তাঁর ওখান থেকে ঘুরে আসা যাক, বহুদিন পরে তোমায় দেখলে নিশ্চয়ই তিনি খুব খুসী হবেন।"

চারুদা বললেন, "দেখ বীরু, নরেন বাবুর নাম শুনেই আমার বাল্য স্মৃতি জেগে উঠ্ছে। স্কুলের ছুটির পর শঙ্করপুরের গেটের পাশের মাঠে প্রিয়দর্শন যুবক শিক্ষক গ্রাম্য রাখাল বালকের ন্যায় কণ্ঠ ছেড়ে যে গান গাইতেন —সাধন করনা চাই রে মনুয়া ভজন করনা চাই—আজ বহু বৎসর পরে সেই সুপরিচিত কণ্ঠসঙ্গীত কানের পর্দ্দায় যেন ঝঙ্কার দিচ্ছে।

মিঃ রায় বলিলেন, "ঠিক বলেছ। কিন্তু আমি তাঁকে প্রায়ই দেখি বলে তাঁর সঙ্গে জড়িত পুরান দিনের কথা কচিৎ স্মৃতির দুয়ারে ঘা দেয়। তোমার কথা শুনে আজ বহুদিন পরে আমারও বাল্যকালের সঙ্গী পুণ্যদা, রাজেন-দা, মন্মথ, কান্তি ও যতীন চোখের সামনে ভেসে উঠ্ছে। স্কুল পালিয়ে সেই ভৈরবের ধারের বটগাছে দোল খাওয়া, খয়েরতলার মাঠে গাছে খেজুর-রস চুরি, হরিণার বিলে মটরসুঁটি খাওয়া, ঘোষের পুকুরে মাছ ধরা, খড়কীর মাঠে কুল খাওয়া, বড় উমেশ বাবুর বাগানে দুপুরে টিফিনের সময় চুপি চুপি পেয়ারা পাড়া, পূজার সময় দল বেঁধে চাঁচড়ায় দশমহাবিদ্যা ও রাজবাড়ীর অতি বৃহৎ দুর্গাপ্রতিমা দেখা, সম্মিলনী স্কুলের সঙ্গে পাল্লাদিয়া সরস্বতী পূজা করা আরও সব কত কি?"

ইঁহারা দুইজনেই মধুর বাল্যস্মৃতির আলোচনায় বিভোর। আমার কিন্তু গিরিডির বাল্যস্মৃতি মনে উদিত হইয়া মন ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মায়ের ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরাইবার জন্য আমরা একবার গিরিডি আসিয়াছিলাম। ষ্টেশনে নামিয়াই দেখিলাম কাঠের ছৈ দেওয়া গরুর গাড়ী – তাহা আবার চারজন মানুষে টানিতেছে ও ঠেলিতেছে। মনে পড়িল ঐ পুসপুস গাড়ী চড়িয়া আমাদের দুই ভাই-বোনের সে দিনের আনন্দের কথা। পথ চলিতে চলিতে মনে পড়িল, এই রাস্তায়ই ত আমরা দুই ভাই-বোনে হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইয়াছি। একটি বাংলোর সামনে আসিতেই মনে পড়িল ছোট বোনটির আবদার রক্ষা করিবার জন্য অন্যায় মতে অনধিকার প্রবেশপূর্ব্বক গোলাপফুল তুলিবার সময় মালীর হাতে আমার লাঞ্ছনার কথা। অদূরের খৃষ্টান হিল দেখিয়া মনে পড়িল দুইজনে একত্রে উপরে উঠিতে সুরু করিয়া ছোট বোনটিকে পিছনে ফেলিয়া পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার বিজয় গর্ব্ব, মনে পড়িল সাহেবদের দুটি ছোট ছেলেমেয়ের একত্রে সাইকেল চড়িয়া আনাগোনা করিতে দেখিয়া নিজেদের ঐ রূপ সাইকেল চালাইয়া হঠাৎ পথিকের পিছনে ক্রিড়িং করিয়া বেল বাজাইয়া তাহাকে চমকাইয়া দেওয়ার কল্পনা। মনে পড়িল গিরিডির হাটে যাইয়া পয়সার অভাবে এদোকান-ওদোকান ঘুরিয়া কুলের নমুনা সংগ্রহ করিয়া পকেট ভর্ত্তি করার কথা। রাস্তার পাশের বালিকা বিদ্যালয় দেখিয়া মনে পড়িল দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অসুবিধার জন্য আমার বোনের উচ্চশিক্ষা লাভ করার অন্তরায়ের দুঃখ প্রকাশ করা—মনে পড়িল আরও হাজার রকম বেদনাদায়ক আমার গিরিডির বাল্য-স্মৃতি যাহা আমার পরলোকগত ছোট বোনটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

নরেন বাবুর বাংলোয় পৌঁছিয়া দেখিলাম বাড়ীর সামনের খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া তিনি বই পড়িতেছেন। মিঃ রায়কে দেখিয়া বলিলেন, "আরে এস এস বীরু এস। খবর পেলাম তুমি এসেছ প্রায় ১০।১৫ দিন, কিন্তু আমার সঙ্গে ত দেখা করো নি? ভাল কথা, খোকা বিলেতে পৌঁছে অক্সফোর্ডে ভর্ত্তি হয়ে পত্র লিখেছে, কাল সে চিঠি পেলাম। তোমাকে সে সংবাদ দেবো বলে এই সকালেই মনে করছিলাম তোমায় ডেকে পাঠাই —তা তুমিই এসে পড়েছ—অন্তরে একান্ত ভাবে চিন্তা করলেই ফলপ্রসূ হয়—হয় না? তুমি কি বল?

মিঃ রায় বলিলেন "তা হয় বৈকি।

আমাদের দিকে চাহিয়া নরেন বাবু বলিলেন, "কিন্তু ওঁদের ত চিনতে পাচ্ছি না?"

মিঃ রায় হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "আচ্ছা ওঁকে না হয় না চিনতে পারেন"—বলিয়া আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন, "কিন্তু চারুকে আপনার চেনা উচিত ছিল।"

নরেন বাবু সবিস্ময়ে বললেন—"হ্যাঁ চারু! কিন্তু চেহারা যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়েছে তাতে ত্রিশ বৎসর পরে যুবক চারুকে বৃদ্ধের মত দেখলে কি ক'রে চিনবো বল? না চিনতে পারা কি আমার পক্ষে খুব দোষের হয়েছে? তুমিই বল চারু।"

চারু-দা বলিলেন, "আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছি বীরু এ কথা আগে আমায় না বললে আমিও আপনাকে চিনতে পারতাম না। যাক তাহোলে "প্লাস মাইনাসে কেটে গেল।" বলিয়া চারু-দা হাসিয়া উঠিলেন।

নরেন বাবু বলিলেন—আরে খোকার কাণ্ড দেখেছ আই-সি-এস পড়তে ওর নাকি ভাল লাগল না, ...ই অক্সফোর্ডে বি-এ পড়তে লেগে গেল। সে লিখেছে কি জান? My temperament will not sound harmoniously with the hectic life of an Indian civil servant so I have been admitted to the Oxford B. A. class. I think here I shall have ample opportunity of saying my prayers in the temple of muses and on my return within your arms I shall be proud to follow in your footsteps by devoting my life for the cause of education," তার কাণ্ডটা দেখলে একবার? স্কুল মাষ্টারীই হলো তার কাম্য?" একটু থেমে বললেন, "যে যে রাস্তায় চললে আনন্দ পায় তাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়, কি বল?"

বেলা হইল বলিয়া আমরা উঠিতে চাহিলাম, কিন্তু

তিনি উঠিতে দিলেন না, মিঃ রায়কে বলিলেন—"ভাল কথা, তোমার সেই ইউক্যালিটাস সিটাডোরা গাছটি বাঁচাতে পেরেছ? হ্যাঁ, এবার তুমি আমার জন্য যশোর থেকে কি কি গাছ আনলে তা তো বললে না? গত বারে তুমি যে ভাণ্ডিল ফুল গাছ এনে দিয়েছিলে তার কি চমৎকার ফুল ফুটেছে দেখ একবার।" বলিয়া বাগানের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। "কিন্তু তোমার ঐ লতানে ফুল ছোহারা না কি ওটাকে কিছুতেই বাঁচাতে পারলাম না, তবে ঐ কেলেকোঁড়া চমৎকার লেগেছে। আরে এটা দেখছি আহার ওষুদ তুই-ই,—দিব্যি কাঁটা বেড়া হয়েছে আবার শিরীষ ফুলের মত সুন্দর ফুলও ফোটে।"

নরেনবাবুর বাসা হইতে আসিয়া স্নানাহার সারিয়া দুপুরে গভীর নিদ্রা দিয়া গতরাত্রের অনিদ্রার ক্ষতিপূরণ করা গেল। বিকালে সহর ও বাজার দেখিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীরা দশভুজার যে অকাল বোধন করিয়াছেন সেই পূজামণ্ডপে মহাষ্টমীর আরতির পর প্রসাদগ্রহণান্তর বাসায় ফিরিলাম। আসিয়া দেখি মিঃ রায়ের মাসতুতো ভাই প্রফেসার সেন সপরিবারে গিরিডি বেড়াইতে আসিয়াছেন। কলেজে পাঠ্যাবস্থায় কলিকাতার ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে ইঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ পরিচয় হইয়াছিল প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে। আমাদের দেশের মহেন্দ্র, ধরণী ও মিঃ সেন একই ঘরে থাকিতেন। সেই সূত্রে আলাপ। কিন্তু দীর্ঘ দিন পরেও তাঁহাকে দেখিয়া আমি চিনিলাম আর তিনি চিনি চিনি করিতেছেন অথচ ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এই অস্বস্তিকর পীড়াদায়ক অবস্থায় স্মৃতি-পটের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হাতড়াইয়া আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া আমার দিকে চাহিলেন। আমি ইডেন হিন্দু হোষ্টেল ও মহেন্দ্রর নাম উল্লেখ করিতেই তাঁহার লুপ্তপ্রায় স্মৃতি সঞ্জীবিত হইল। যে কয়দিন এখানে ছিলাম মিঃ সেন আমার সহিত পুরানো দিনের বিষয়ই প্রধানতঃ আলোচনা করিতেন আর মিঃ রায়, চারুদার সহিত বাল্যস্মৃতির রথে ভ্রমণ করিতেন।

গিরিডিতে বহু বাঙ্গালী পরিবার প্রবাসী হইয়াছেন। সাঁওতাল পরগণার এই নিভৃত অঞ্চলটি যখন গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার স্রষ্টাগণ প্রায় সকলেই আধুনিক মার্জ্জিত রুচি অনুসারে সহরের রাস্তা-ঘাট, বাড়ীঘর, বাগান প্রভৃতি সাজাইয়া মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে উচ্ছ্ নদীর তীরে এই স্বাস্থ্যকর স্থানটির শোভা ও সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। গিরিডির ভূপৃষ্ঠ যেমন নয়নানন্দকর শ্যামায়মান বনানী বেষ্টিত, ভূগর্ভও তেমন পাথুরে কয়লা ও অভ্র প্রভৃতি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। আর ঐ খনিজ পদার্থকে সূত্র ধরিয়া বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া নরনারীর অন্ন সংস্থান করিতেছে। ঐ অসংখ্য নরনারীর প্রয়োজনানুরূপ চাহিদা মিটাইবার জন্য আরও নানা প্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠিয়াছে।

এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত সকাল দুপুর বিকাল সন্ধ্যা সকল সময়েই কেবল ঘুরিয়া বেড়ান হইল কাজ। আর এইরূপ ঘুরিয়া বেড়ান আবশ্যকও হইয়াছিল মিসেস্ রায়ের অতিথি-সেবার প্রাচুর্য্যে। তিনি বোধ হয় সপ্তাহ মধ্যে আদর, যত্ন, সেবা ও প্রচুর আহার্য্য দ্রব্য এবং সর্ব্বোপরি গিরিডির স্বাস্থ্যকর পানীয় জলের সাহায্যে মোটা করিয়া আমাদের ফিরাইয়া পাঠাইতে মতলব করিয়াছিলেন। একদিন দেখিলাম তিনি সকাল হইতেই নিজ হাতে নানা প্রকার খাবার তৈয়ারী করিতে ব্যস্ত এবং সারাদিন নিজে উপবাসী থাকিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বসাইয়া মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণার মত পরিবেশন করিতেছেন। মিঃ রায় বলিলেন, তাঁহাদের একমাত্র পুত্র যে দিন হইতে তাঁহাদের ছাড়িয়া গিয়াছে প্রতিমাসের সেই নির্দ্দিষ্ট তারিখে মিসেস্ রায় নিজে অভুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের প্রিয় পুত্রের প্রিয় খাদ্যসমূহ নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একত্র বসাইয়া খাওয়াইয়া থাকেন। আর সন্ধ্যার পর মৃত পুত্রের ফটো ফুল দিয়া সাজাইয়া কোলে করিয়া অপলক নেত্রে সারা-রাত্র জাগিয়া বসিয়া থাকেন। উঃ, স্মৃতির কি তীব্র দংশন, বলিয়া মিঃ রায়ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কয়েক মিনিট চোখ বুঁজিয়া নিজ দেহ ইজিচেয়ারে এলাইয়া দিলেন—সকলেই নিস্তব্ধ। স্বজনবিয়োগবিধুর স্মৃতি কি জ্বালাময়ী!

কিছুক্ষণ পরে মিঃ রায় বলিলেন, "হ্যাঁ তাহলে কাল কি তোমরা পরেশনাথ যাবে?"

চারুদা বলিলেন, "আর তো সময় নেই, কাজেই কাল না গেলে আর যাওয়া হবে না।"

পরদিন সকালে স্নান করিয়া পুরাদস্তুর জলখাবার চা খাওয়া গেল এবং সে রাত্রে গিরিডি ফিরিয়া আসা সম্ভব হইবে না বলিয়া মিসেস্ রায় একটি ছোট বিছানা ও ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুটের টিন ভর্ত্তি করিয়া লুচি, তরকারী, মিষ্টি, চাটনি, কয়েকটি কমলালেবু, পাতিলেবু, এক ফ্লাস্ক চা, এক বোতল খাওয়ার জল গুছাইয়া দিলেন এবং পাহাড়ে উঠিবার সময় জল পিপাসা পাইলেই পাতি লেবু খাইতে বলিয়া দিলেন। ঢোকে ঢোকে জল খাইলে বেশী কষ্ট হইবে, আর খাবার জল ও চা সঙ্গে লইয়া পাহাড়ে উঠিতে বলিলেন। আরও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন রাত্রে বিনা মশারিতে কদাচ যেন নিদ্রা না যাই।

পরেশনাথ পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব্ব পাড়ের নাম মধুবন। সেখানে মাড়োয়ারীদিগের নির্ম্মিত ধর্ম্মশালাই একমাত্র আশ্রয়স্থান। কিন্তু মধুবনে ম্যালেরিয়া-মধু এমন ছড়ান যে, সে মধু একবার আহরণ করিলে এক বৎসরের কমে কিছুতেই সে মিষ্টরস দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করা সম্ভব নয়। গিরিডি হইতে হাজারীবাগ যে মোটর বাস চলে তাহাতেই আমাদের যাইয়া মধুবন approach Roadএ নামিতে হইবে ও বাকী দুই মাইল রাস্তা হাঁটিয়া পরেশনাথের পাদদেশে পৌছাইতে হইবে। সকাল ৮টার সময় মোটর বাসে রওনা হওয়া গেল।

গিরিডি-হাজারীবাগ রাস্তা এবং তাহার দৃশ্য এত সুন্দর যে বহু ভ্রমণকারী ছুটির দিনে এই রাস্তায় মোটর চালাইয়া অফুরন্ত আনন্দ উপভোগ করেন। আঁকা-বাঁকা উঁচু নীচু মসৃণ পীচঢালা রাস্তায় মোটর সবেগে গোঁ-গোঁ শব্দে সেকেণ্ড গীয়ারে উপরে উঠিতেছে এবং পর মুহূর্ত্তে চড়াই রাস্তা উঠিবার কালের সঞ্চিত গতিবেগের সাহায্যে ড্রাইভার এক্সিলারেটার ছাড়িয়া এঞ্জিন নিউট্রাল করিয়া কেবল মাত্র ষ্টীয়ারিং ঘুরাইয়া নীচে নামিতেছে। মোটর যখন এইরূপে নীচের দিকে নামে তখন সারা অঙ্গে কেমন যেন শিহরণ বহিয়া যায়। রাস্তার দু-পাশের প্রসন্ন বনশ্রী মনে যে আনন্দরস সঞ্চারিত করে তাহাতে অতি বড় কঠিন হৃদয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিরও অজ্ঞাতে মুখ হইতে বাহির হইয়া যায়—বাঃ কি সুন্দর! আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় সেই আনন্দের প্রতিচ্ছবি।

দুই ঘণ্টার মধ্যেই পরেশনাথ-হাজারীবাগ রাস্তার সংযোগস্থলে মোটর বাস আমাদের নামাইয়া দিল। অধিক সংখ্যক যাত্রী থাকিলে মোটর কোং পরেশনাথের দুয়ার পর্য্যন্ত যায়। কিন্তু আমরা বেশী ভাড়া দিতে চাহিলেও তাহারা রাজী হইল না। তীর্থক্ষেত্রে যাত্রী পৌছাইলেই তাহাদিগকে পাণ্ডার দল—তীর্থগুরু—ছাঁকিয়া ধরে। কিন্তু এখানে সে উৎপাত নাই। আছে কতকগুলি সাঁওতাল, তাহারা যাত্রীদিগের মোট বয় এবং পাহাড়ে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইয়া পথ-প্রদর্শকের কাজও করে। সুতরাং তাহাদের পয়সা দিতে দ্বিধা হয় না। সে দিন আমাদের দুই জনকে মাত্র দর্শক দেখিয়া তাহারা নিজেদের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিল। চারুদার মধ্যস্থতায় তাহারা শান্ত হইলে আমরা একটি বলিষ্ঠ যুবককে মনোনীত করিয়া তাহার মাথায় বোঝা চাপাইয়া ধর্ম্মশালার পথে তাহার পিছু পিছু চলিলাম। কিছু দূর যাইবার পর আমরা পাহাড়ে উঠিব শুনিয়া সে আমাদের সহিত যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল এবং দরকষাকষি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি চারু-দা'কে বলিলাম, "ব্যাটার দুষ্টামি দেখছেন চারু-দা? গরজ বুঝে কেমন দর হাঁকছে। সাঁওতালদের সরলতা ও সত্যবাদিতা এক সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও মুগ্ধ করেছিল, আর সেই সময় হতে তা প্রবাদ বাক্য হিসাবে চলে আসছে। কিন্তু দেখুন এদের মধ্যে যারা সভ্যতার আলোক বা সভ্য লোকদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছে তাদের মধ্যেই কেমন শঠতা, মিথ্যাকথন প্রভৃতি আবিলতা প্রবেশ করেছে।"

প্রায় দুই মাইল রাস্তা হাঁটিয়া মধুবনে পৌছাইলাম। ধর্ম্মশালা দেখিয়া মনে হইল, যেন একটা রাজবাড়ী। প্রধান প্রবেশ পথটি খুব উঁচু খিলানওয়ালা দরজা, তাহার মধ্য দিয়া বড় বড় হাতীও অবাধে যাইতে পারে। উপরে নহবৎখানা। সুবিস্তীর্ণ প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে প্রাসাদোপম অট্টালিকার সারি বিভিন্ন শ্রেণীর

যাত্রীদিগের প্রয়োজন এবং সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নির্ম্মিত। বিধিমত সুব্যবস্থার জন্য ধর্ম্মশালায় কর্ত্তৃপক্ষের গদী আছে। তাঁহাদিগকে জানাইলে সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা তাঁহারা যাত্রীনির্ব্বিশেষে করিয়া থাকেন। এখানে যেরূপ সুবন্দোবস্ত ও শৃঙ্খলা দেখিলাম তেমনটি আর কোথাও দেখি নাই। এমন কি ধর্ম্মশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ বিনামূল্যে যাত্রীদিগের ব্যবহারোপযোগী হাঁড়ী কড়াই ঘটি বাল্তি প্রভৃতি তৈজসপত্র, সতরঞ্চ মশারী কম্বল প্রভৃতি শয্যাদ্রব্যও যোগাইয়া থাকেন। ইহাদের দূরদর্শিতার জন্য যাত্রীদিগের ঘরে লাগাইবার তালা-চাবিটির পর্য্যন্তও অভাব হয় না। রান্না করা, জল তোলা, জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করা, বাসনমাজা প্রভৃতি লোকের জন্য সুব্যবস্থার গুণে কোন অসুবিধা হয় না। কেবলমাত্র ধর্ম্মশালার আফিসে নিজ প্রয়োজন লিখিয়া একখান দরখাস্ত দাখিল করার ওয়াস্তা। ধর্ম্মশালার হাতার মধ্যেই মুদীখানা, মিঠাইয়ের দোকান, মনিহারী দোকান, এমন কি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার পর্য্যন্ত আছে।

জৈন ধর্ম্মাবলম্বীরা শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এখানে দুই দলেরই ধর্ম্মশালা আছে এবং যাত্রী লইয়াও তাহারা প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে।

আমরা সামনেই যে ধর্ম্মশালা পাইলাম তাহাতেই উঠিয়া পড়িলাম। সেখানে জিনিসপত্র যথাসম্ভব গুছাইয়া রাখিতে আমাদের কিছু বিলম্ব হইতে লাগিল। আমাদের গাইড তখন দরজার সামনে থামে হেলান দিয়া দুই হাঁটু উঁচু করিয়া তাহার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া নাক ডাকাইতে সুরু করিল। এরও দেখিতেছি "কেষ্টার মত নিদ্রাটি সাধা" আছে। আবার মাঝে মাঝে চমকাইয়া উঠিয়া পাহাড়ে রওনা হইবার জন্য তাগিদ দিতে লাগিল। "বাবুজী বহুত দের হোতা লোট্‌নেমে কুবের হো যায়েগা।"

ব্যাটা বলে কি? এইটুকু পাহাড় থেকে ফিরে আসতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। কতকক্ষণ লাগবে এইটুকু পাহাড় থেকে নেমে আসতে?

আমাদের কথা শুনিয়া সে একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল এবং মনে মনে বোধ হয় বলিল—কত বড় বড় যোয়ান প্রথমে এইরূপ তোমাদের মত মুখ-জোর ক'রে মাঝ পথে ঘায়েল হয়েছে তা তোমরা তো কোন্ ছার। বেলা হইতেছে দেখিয়া আমিও চারু-দা'কে তাগিদ দিতে সুরু করিলাম এবং তিনি ঘর-গৃহস্থালীর ব্যাপার কিছু সংক্ষেপ করিয়া তৈরী হইলেন।

আমরা যে রাস্তা হইয়া আসিয়াছি ইহা ছাড়া পরেশনাথে উঠিবার আর একটি রাস্তা আছে, কিন্তু তাহাতে যানবাহনাদির সুবিধা কিছু কম। ই, আই, রেলের গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনে ইস্রি ষ্টেশনে (অধুনা পরেশনাথ ষ্টেশন নামকরণ হইয়াছে) নামিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ পশ্চিম দিক হইতে উঠিয়া মাঝ পথে দুইটি রাস্তাই একত্রে মিলিয়াছে।

গাইড বলিল, "বাবুজী খাবার, পানি, কম্বল, যো কুছ লেনোকো হায় হামকো দিজিয়ে?" আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া বেলা ১১টার সময় পাহাড়ে উঠিতে সুরু করিলাম। বাঃ চমৎকার রাস্তা তো। গাইড বলিল, "হাঁ বাবুজী সরকার বাহাদুর বানাই দিছে।" কিছুদূর ওঠার পর দেখিলাম রাস্তার পাশে সাদা রং-করা পাথরের গায়ে কাল কালী দিয়া লেখা পথের দূরত্ব নির্দ্দেশকে ফার্লং-পোষ্ট পোঁতা রহিয়াছে। আমরা প্রথম চোটে প্রায় আধমাইল খুব দ্রুত উঠিলাম। তাহার পর হইতেই চারুদা পিছাইয়া পড়িতে লাগিলেন। গাইড বলিল, "বাবুজী ওতনা জলদী মাৎ জাইয়ে, এইছা "ছমিল" চড় না হায়।" ব্যাটা বলে কি? ছয় মাইল—বললেই হোলো। ঐ তো মন্দির দেখা যাচ্ছে, ছয় মাইল কি কম রাস্তা নাকি? শিয়ালদহ হইতে দমদম সে কি কম রাস্তা?

আমরা অজানা পথের দূরত্ব আন্দাজ করিতে হইলে অতি পরিচিত রাস্তার দূরত্ব মনে মনে কল্পনা করিয়া নূতন রাস্তার দূরত্ব অনুমান করিয়া থাকি।

যতই আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম নীচের ঘরবাড়ী গাছপালা প্রভৃতি দূরে সরিয়া সরিয়া ব্যবধানের সৃষ্টি করিতে লাগিল। আমরা নীচে যে সকল পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট দেখিয়া আসিয়াছিলাম সেগুলি ক্রমেই যেন ক্ষুদ্র কলেবর ধারণ করিল। (আগামী সংখ্যায় শেষ হইবে)

চিনুর অভিযান

(গল্প)

শ্রীহীরেন বসু

চিনুর সঙ্গে সম্বন্ধটা আমার নিবিড় হইয়াই দাঁড়াইল। মাথায় একরাশ কোঁকড়ান কাল চুল, লম্বা একহারা চেহারা, রংটা ধবধবে ফর্সা না হইলেও ময়লা নয়, মুখে হাসি লাগিয়াই আছে, কারণ অকারণে খুসীর আভায় মুখখানা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, বসিতে বলিলেই হাসিয়া বলে,—আমার কি বসবার উপায় আছে জামাই বাবু, কত কাজ এখনও পড়ে আছে।

এমনি করিয়াই কথার বিনিময়ে তাহার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা দিন দিন বাড়িয়াই চলিল।

চিনু যেন এ বয়সেই পাকা গৃহিণী হইয়া পড়িয়াছে। তাহার এই নয়-দশ বৎসর বয়সেই সংসারটা সে চিনিয়া ফেলিয়াছে। কাহার কোন্ জিনিষটা কোন্ সময় প্রয়োজন এ সব সে দেখিয়া শুনিয়া শিখিয়া লইয়াছে। কে কি খায়, কোন্ স্থানে শুইবে এগুলো তাহার নখাগ্রে, এমনি কি খাবারের পর পান দেওয়া হইয়াছে কি না এ বিষয়েও তাহার সুতীব্র দৃষ্টি অব্যাহত।

চিনুদের বাড়ী গিয়াছি। প্রতি বৎসরই যাওয়া হইয়া উঠে না। আবার কোন বৎসর দুই-তিন বারও যে না যাই তাহা নয়। সেদিন সবে সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া ফিরিয়াছি—চিনু ঝড়ের বেগে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিল,—জামাইবাবু, এবার আমি কয়েকটা প্রাইজ পাবো।

কিছু বলিবারও অবসর পাইলাম না। ঘাড় ফিরাইয়া দেখি সে আমার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

সময় অসময়ে চিনু আসিয়া বসে। তাহার সঙ্গে সংসারের খুঁটিনাটি লইয়াই আলাপ-আলোচনা চলে। চাউলের দরটা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে, কি করিয়া যে চলিবে! কোন্ জিনিষটাই বা সস্তা। তরীতরকারী হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারের প্রতিটি জিনিষের দরই আক্‌কাড়া হইয়া উঠিতেছে। কাপড় ত' কিনিবার উপায়ই নাই। আর দাম না বাড়াইলেই বা চলিবে কেন, অসময়ে বৃষ্টি। ধানগুলো একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মানুষের বাঁচাই মস্ত বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। চিনু একা-একাই অনর্গল বকিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে আমাকে হুঁ, হাঁ করিতে হয়। তাহা না করিলে তুমুল কাণ্ড করিয়া বসে। মনে হয়, এ সব কথাগুলি তাহার বাবা এবং কাকার কথোপকথন হইতে শুনিয়া শিখিয়া রাখিয়াছে, অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা সে বরদাস্ত করিতে পারে না। লেখাপড়ার বিষয় কিছু বলিবার অবসর সে প্রায়ই দেয় না। কিছু বলিলেই সে এমনি সব অদ্ভুত প্রশ্ন তুলিয়া বসে যে, তাহার উত্তর দিতে দিতেই সে উঠিয়া যায়। যাইবার পূর্ব্বে হয়ত বলিয়া যায় কাজগুলো সারিয়া আবার সে আসিবে। মনে মনে হাসি এই ভাবিয়া যে, তাহার চালাকিটুকু যে ধরা পড়িয়াছে সে তাহা মোটেই বুঝিতে পারে নাই। সেদিন ওর দিদি অর্থাৎ আমার স্ত্রী বলিল,—ওকে একটু শাসন করো। দিন রাত বড় জ্বালাতন কচ্ছে তোমায়, এখন শাসন না করলে পরে আর শোধরাবে না। পরের ঘর ত' করতে হবে? ব্যাটা ছেলে ত' নয়?

হাসি আর দমন করিতে পারিলাম না, হোঃ হোঃ করিয়া খানিকটা হাসিয়া লইয়া বাঁচিলাম,—কিন্তু ওটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে ও মেয়ে। ওর বয়সে তুমিও ওরকমই ছিলে। এখন না করলে আর করবে কবে? ওর জন্য শাসনের প্রয়োজন হয় না। আপনিই শুধরে যাবে।

বিকেল বেলা বেড়াইতে বাহির হইয়া ছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি চিনু আমার তক্তপোষটা দখল

করিয়া লইয়াছে। কোথা হইতে একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়ম সংগ্রহ করিয়া তাহাকে বাজাইতে ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। মাঝে মাঝে তাহা হইতে বিকট শব্দ বাহির হইতেছিল। তাহার সঙ্গে তাল মিলাইয়া চিন্নু অবিরাম চীৎকার করিয়া যাইতেছে। তাহার গানের বহর দেখিয়া আমার গলদ-ঘর্ম্ম হইবার উপক্রম হইল। ঘরে ঢুকিয়া তাহার এই সাধনাটুকুর ব্যাঘাত ঘটাইতে ইচ্ছা হইল না। বাহিরেই পাদচারণা করিতে করিতে তাহার উদ্যমের প্রশংসা নিজ মনেই করিতে লাগিলাম। যখন কিছুতেই সে অৰ্দ্ধ ঘণ্টার ভিতর নিরস্ত হইল না তখন অগত্যা আমাকেই ঘরে ঢুকিতে হইল। আমাকে দেখিয়াই চিন্নু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কখন এলেন জামাইবাবু?

আমার উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই চিন্নু পুনরায় বলিল,—জামাইবাবু, আজকাল আমি বেশ গাইতে শিখেছি, একটা গান গাইব?

জামাটা খুলিতে খুলিতে বলিলাম,—নিশ্চয়ই। তোমার গান শুনবার জন্যই তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

বুঝিলাম চিন্নু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কার গান গাইব,—শচীন বাবু, পঙ্কজ, পাহাড়ী, কানন, রেণুকা—বলেন না ছাই।

হাসিয়া বলিলাম,—তুমি যেটা ভাল জান সেটাই গাও।

তাহার পর চিন্নু পুনরায় হারমোনিয়মটা কোলের উপর কিছুটা টানিয়া লইয়া বসিল। চিন্নুর সুন্দর ছোট ছোট আঙ্গুল সজোরে তাহার উপর চাপ দিতে লাগিল; কিন্তু তাহা হইতে মাঝে মাঝে বিকট শব্দ ছাড়া আর কিছুই বাহির হইল না। মনে হইল চিন্নুর সব রকম প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। নিরাশ হইয়া বলিল,—দেখুন ত' জামাইবাবু, এটার কি হলো? কেউ বাজাতে জানে না, অথচ সবাই এ'টা নিয়ে নাড়াচাড়া করবে? এখন হলো ত? কোথায় একটা গান গেয়ে জামাইবাবুকে শোনাব তা বোধ হয় আজ হলো না, বাড়ীর লোকজন যা হয়েছে।

তাহার গান শোনার হাত হইতে যে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি—এজন্য ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ। অবশ্য জানিতাম এ রকম একটা কিছু ঘটিবেই। এ কারণে নিজেও খানিকটা প্রস্তুত ছিলাম এবং সেই আশাতেই তাহাকে গান গাইতেও বলিয়াছিলাম। হাসিয়া বলিলাম—এখন থাক্, পরে এক সময় দেখব।

চিন্নু যাইবার পূর্ব্বে জানাইয়া গেল সে আবার আসিবে। অবশ্য সে রাত্রিতে তাহার আর দর্শন মেলে নাই।

ইহার কয়েক দিন পর চিন্নুর পারিতোষিক বিতরণের নির্দ্দিষ্ট দিন ঘনাইয়া আসিল। সেদিন চিন্নুর দিদি ঘষিয়া মাজিয়া তাহাকে পরিষ্কার করিয়া সাজাইয়া দিল। তাহার লম্বা চুলের দুইটি বেণী কানের পাশ দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া সাপের মত বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। চিন্নু পরিয়াছে গোলাপী রংয়ের একখানা শাড়ী। তাহাকে মানাইয়াছেও চমৎকার। বহু কান্নাকাটি করিয়া কাপড়-খানা সংগ্রহ করিয়াছে তাহার দিদির নিকট হইতে। ফ্রক পরিয়া প্রাইজ আনিতে যাইবে না, এমন কি তাহার পুরোণো কাপড় আছে তাহাতেও তাহার চলিবে না। সুতরাং দিদিকে তাহার কাপড় দিতে হইয়াছে। কিন্তু কাপড়খানাকে সে কিছুতেই বশে আনিতে পারিতেছিল না। হাইহিলের জুতা পরিয়া খুশী মনে বাড়ীর গুরুজনদের প্রণাম করিয়া স্কুলের দিকে পা বাড়াইল। লজ্জানত মুখে প্রত্যেকের দিকে একবার তাকাইয়া গাড়ীতে যাইয়া বসিল।

সময় কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। দেখিতে দেখিতে একটা দুইটা করিয়া পাঁচটা বাজিয়া গেল। তথাপি চিন্নুর সাক্ষাৎ নাই। এই সঙ্কীর্ণ তিন-চার ঘণ্টা চিন্নুর অনুপস্থিত আমাকে অত্যন্ত পীড়া দিতেছিল। যদিও তাহার অত্যাচার আমার উপর দিন-দিনই বাড়িয়া যাইতেছিল, তথাপি তাহার সঙ্গ আমার খুবই কাম্য। মাঝে মাঝেই অসংলগ্ন কথা এক-এক সময় শুনিতে মন্দ লাগিত না। চিন্নু একদিন বলিয়া যাইতেছিল ও পাড়ার চাটুয্যেদের সেজমেয়ের বর কারও সঙ্গেই কথাবার্ত্তা বলে না। সে নাকি অত্যন্ত অহঙ্কারী। মাটিতে পা দিচ্ছেই

চায় না। তবু যদি সেরকম একটা কাজটাজ কিছু করত।

একটু গম্ভীর হইয়াই বলিলাম—ও-সব বলতে নেই চিনু। কারও আলোচনা অসাক্ষাতে করো না।

চিনু মাথা দুলাইয়া জবাব দিল,—বা রে, এত' সবাই জানে জামাইবাবু।

যাহা হোক্, সে এসব তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিত তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইত না।

সেই যে চিনু স্কুলে চলিয়া গিয়াছে তাহার পর ছয়-সাত ঘণ্টা তাহার আর দর্শন নাই। ভাবিলাম, যখন ঘুমাইয়াছিলাম হয়ত চিনু আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। বিকালের জলযোগ শেষ করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। ফিরিয়া আসিয়া জানিলাম চিনু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। প্রাইজ পায় নাই বলিয়া কাহারও সাথে সে বড় একটা কথাবার্ত্তা বলে নাই। বুঝিলাম, এজন্যই সে আমার সাথে দেখা করিতে পারে নাই।

পর দিন প্রাতেই চিনুর সঙ্গে অতর্কিতে দেখা হইয়া গেল। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—প্রাইজ এনে আর দেখাই করলে না যে দিদি। ব্যাপারখানা কি?

মুখখানা যথাসম্ভব নীচু করিয়া লজ্জিতমুখে চিনু বলিল,—প্রাইজ ওরা দিলে না জামাইবাবু, সেই জন্যই ত' আপনাকে দেখাতে পারলাম না।

মুচকি হাসিয়া বলিলাম—দিলে না কেন?

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের ভাব বজায় রাখিয়া চিনু উত্তর দিল,—বা রে, কি করে দেবে? আমাদের ক্লাশে ত' তিন জন ছাত্রী ছিল। যে দু'টো মেয়ে ফাষ্ট আর সেকেণ্ড হয়েছিল ওরা চলে গেছে এখান থেকে। মীরাদি বলেছিলেন,—ও প্রাইজগুলো ত' তুই পাবি চিনু, তাইত আমি গিয়েছিলাম। মাষ্টার মশায় বললেন,—'ও প্রাইজ-গুলো ওদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন'। যে না প্রাইজ, ও আমি কিনেই নিতে পারব। তাই না জামাইবাবু?

হাসিয়া বলিলাম,—হুঁ।

চিনু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তর তর করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

একটানা প্রায় চার বছর চিনুদের বাড়ী যাইতে পারি নাই, তবে পত্রালাপ যে না হইত তাহা নয়। তথা হইতেই জ্ঞাত হইয়াছিলাম চিনু এখন বড় হইয়াছে। তাহার সে পূর্ব্বাভ্যাস একটুও বদলায় নাই। তাহার জন্য বিবাহের চেষ্টা চলিতেছে। আমাকেও খোঁজখবর রাখিতে পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছেন। যাহাও দুই-চারিটা সম্বন্ধ তাহার আসিয়াছিল, তাহাদের সাথে সে এমন সব ব্যবহার করিয়াছে যাহার দরুণ তাহারা আর পুনরায় অগ্রসর হয় নাই। অবশ্য এসব সংবাদ শ্বশুরমহাশয়ের পত্রেই জ্ঞাত হইয়াছিলাম।

দেখিতে দেখিতে আরও দেড়টা বছর নির্ব্বিবাদেই কাটিয়া গেল। ইহার মাঝে একবার কার্য্যোপলক্ষে চিনুদের বাড়ী গিয়াছিলাম। চিনু এখন বেশ বড় হইয়াছে। যৌবন তাহার সারাদেহে লুটাইয়া পড়িয়াছে। আসিবার মুখে শ্বশুর মহাশয় পুনঃ পুনঃ চিনুর বিবাহের খোঁজ করিতে বলিলেন। বুঝিলাম চিনুর বিবাহের জন্য খুব তোড়জোড় চলিতেছে।

হঠাৎ একদিন অতর্কিতে চিনুর বিবাহে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র আসিল। দলবল সহ রওনা হইলাম। বাড়ীতে ঢুকিতে না ঢুকিতেই চিনু আসিয়া হাসিয়া দাঁড়াইল। বিজ্ঞের মত জিজ্ঞাসা করিল,—আসতে খুব কষ্ট হয়েছে জামাইবাবু? জানতাম, আমার এ আনন্দের দিনে আপনি আসবেনই।

একরাশ লোকের মধ্যে এই কথাগুলি বলিতে চিনুর একটুকুও লজ্জা করিল না। তাহার প্রশ্নের আর জবাব দেওয়া হইয়া উঠিল না। তাহার জন্য চিন্তিত হইয়াই পড়িলাম।

নির্দ্ধারিত দিনে নির্ব্বিঘ্নে বিবাহকার্য্য সমাধা হইয়া গেল। সমারোহের কোন ত্রুটিই পরিলক্ষিত হয় নাই। চিনুরও আনন্দের পরিসীমা ছিল না। সে এখন শ্বশুর-ঘর করিতে যাইবে। তাহার সঙ্গে আমাকে যাইবার জন্য শ্বশুর মহাশয় পুনঃ পুনঃ বলিলেন। অস্বীকার করিতেও পারিলাম না। যাইবার পূর্ব্বে চিনু একটুও চোখের জল ফেলিল না। সবাই অবাক হইয়া গেল। আশ্চর্য্য হইলাম না শুধু আমি। জানিতাম—চিনু এটা খেলাই মনে করিতেছে। সংসার কি, কেমন করিয়া তাল রাখিয়া চলিতে হইবে এর বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারে

নাই। সারাপথ চিনুকে নানা উপদেশ দিতে দিতে চলিলাম।

চিনুর শ্বশুরবাড়ী যাইয়া পৌঁছিলাম। আমার উপদেশানুসারে চিনু চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে আসিয়া বলিত—জামাইবাবু, মাথায় আবার কাপড় দেব কেন ?

হাসিয়া বলিতাম,—বিয়ের পর স্বামীর বাড়ী এলে দিতে হয়। তা না হলে লোকে নিন্দে করবে।

—নিন্দে করলেই হলো। সারাদিন মাথায় কাপড় দিয়ে মানুষে থাকতে পারে ?

—ও দু'চার দিন দিলেই অভ্যাস হয়ে যাবে। তোমার দিদিও ত' মাথায় কাপড় দেয়।

এভাবেই তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিলাম।

সেদিন ছিল শুভরাত, শুইতে শুইতে অনেক রাত হইয়া গিয়াছিল। সবে চোখটা লাগিয়াছে, চিনু আসিয়া ডাকিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি হয়েছে চিনু ?

চিনু রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে বলিল,—জামাইবাবু, বরটা কি অসভ্য, বলছে—তুমি আমায় ভালবাস ? আমি ওখানে থাকব না। আর ওকে ভালবাসবই বা কেন ?

হাসি আসিতেছিল। হাত ধরিয়া ওকে ঘরের দিকে লইয়া যাইতে যাইতে বলিলাম,—ও বলবেই ত'। ওতে রাগ করতে নেই, যা বলে মন দিয়ে শুন। ওকেই ত' ভালবাসবে। এসব কথা কারও কাছেই বলতে নেই।

চিনু মাথা দুলাইয়া বলিল,—ওকে আমার ভালবাসতে বয়েই গেছে। তুমি ওকে বারণ করে দিয়ে যাও। আর যেন ওসব না বলে।

আগাইয়া আসিয়া প্রকাশকে বলিলাম—সামলে নিও হে, বড্ড ছেলেমানুষ।

হাসিতে হাসিতে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, ইহাকে লইয়া সংসার করাও এক মস্ত বড় বিড়ম্বনা।

তাহার পর অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। চিনুর সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। শুনিতাম সে ভালই আছে। নিজের কাজকর্ম্মের চাপে কাহারও সাথে ভদ্রতা মিলাইয়া চলিতে পারি না। এভাবেই দিনগুলি টানাহিঁচড়া করিয়া কাটিয়া যাইতেছিল।

বছর কয়েক কাটিয়া গিয়াছে। হঠাৎ চিনুর ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম। বহু অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছে যাইবার জন্য। সস্ত্রীক না যাইয়া একাই রওনা হইলাম।

যথাসময়ে চিনুদের বাড়ী গিয়া পৌঁছলাম। চিনু ছেলে কোলে লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটি দেখিতে বেশ সুন্দর হইয়াছে। প্রকাশকে দেখিতে না পাইয়া বলিলাম,—অসভ্যটা কই রে ?

চিনু কানে আঙুল দিয়া বলিল,—ওসব শুনতে নেই জামাইবাবু। ওর মত লোকই হয় না, তা জানেন ?

—তা আর জানি না ? বলিতে বলিতে চেয়ারটায় বসিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম,—দুনিয়ায় এটাই সম্ভব।

অদ্ভুত প্রকৃতির মাছ

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সেন

মানুষ যেমন তীর ছুঁড়িয়া শিকার করে, কোন কোন মাছও তেমনি জলের ফোঁটা ছুঁড়িয়া শিকার করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা এবিষয়ে অনেক বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত এটা একটা কাল্পনিক ব্যাপার বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রাচ্য মৎস্য-বিশেষজ্ঞগণ কেহ কেহ জ্যাকুলেটর মাছের ফোঁটা ছুঁড়িয়া কীটপতঙ্গ শিকারের ক্ষমতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াও এই ঘটনাটাকে দেখার ভুল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ডাঃ ফ্রান্সিস ডে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মৎস্য সম্বন্ধে প্রায় ২৫ বৎসরকাল গবেষণা করিয়াছেন। তিনি ফনা বৃটিশ ইণ্ডিয়ায় লিখিয়াছেন—শোনা যায় জলের ফোঁটা ফেলিয়া এই মাছেরা কীটপতঙ্গ শিকার করে, কিন্তু ব্লিকার, কিংসলি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা এই অদ্ভুত ক্ষমতার কথা অস্বীকার করেন। বিশেষতঃ এই মাছের মুখাকৃতি ও আভ্যান্তরিক গঠনে এমন কিছু যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নাই যাহার সাহায্যে ইহারা জল ছুঁড়িয়া পোকামাকড় শিকার করিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক জেলে-নিস্কি এই মাছ সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া এই অদ্ভুত শিকার সম্বন্ধে সকলের সন্দেহ দূর করিয়াছেন। তিনি সিঙ্গাপুর হইতে এই জাতীয় জীবন্ত মাছ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের কীটপতঙ্গ শিকারের কৌশল ও অন্যান্য স্বভাব প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন—যে সমস্ত কীটপতঙ্গ জলের উপর উড়িয়া বেড়ায় বা জলের উপরিস্থিত লতা-পাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে তাহারাই ইহাদের খাদ্য। কোন কীটপতঙ্গ উড়িতে দেখিলে বা লতাপাতার উপর বসিয়া থাকিতে দেখিলে ইহারা অতি সতর্কার সহিত নিকটে আসে এবং একদৃষ্টে শিকারকে লক্ষ্য করিতে থাকে। সুযোগ বুঝিয়া ঠোঁট জলের উপর তুলিয়া এক ফোঁটা জল ছুঁড়িয়া মারে। ইহাদের লক্ষ্য প্রায়ই ব্যর্থ হয় না। একবার —১—বার বার জলের ফোঁটা ছুঁড়িয়া মারিতে থাকে! জলের ফোঁটা গায়ে লাগিয়া পোকাটি জলে পড়িবার মাত্র মাছটা উহাকে গিলিয়া ফেলে। সময় সময় শিকারের সুবিধার জন্য সাঁতরাইয়া পিছু হটিয়া যায় বা সামনে আগাইয়া আসে আবার সময় সময় ৪।৫ ফুট দূর হইতেও শিকারের উপর আক্রমণ করে।

যাহা হউক সম্প্রতি এই তীরন্দাজ মাছের শিকার করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন। Mr. H. M. Smith এই মাছ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া সম্প্রতি তার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।.. ইহাদের আভ্যন্তরিক গঠনও যে জল ছুঁড়িবার উপযুক্ত তাহাও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি এই মাছের জল ছুঁড়িয়া শিকার করিবার চলচ্চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই মাছকে নাকি ছোট টিকটিকী শিকার করিতেও দেখিয়াছেন। একবার তাহার এক বন্ধু এই মাছ রক্ষিত চৌবাচ্চার ধারে বসিয়া চুরুট টানিতেছিলেন। বেরসিক মাছ দু-একবার জল ছুঁড়িয়া তাঁহার চুরুটটি নিভাইয়া দিয়াছিল।

এই জাতীয় তীরন্দাজ মাছ বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র ও নদীর মোহনায় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার বাজারেও এই মাছ বিক্রয় হইয়া থাকে। এদেশে উহাদিগকে পোচা বা কাঠ কৈ বলে।

স্কেনডিন ডিনায়ার নামক মৎস্যবিশেষজ্ঞ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, 'ইল ফিস্' ইংলণ্ডের নদী ও পুকুর হইতে ডিম্ব প্রসবের নিমিত্ত মেক্সিকো সমুদ্র পর্য্যন্ত যায়, এবং সমুদ্রের আঠার হাজার ফিট নীচে ডিম্ব প্রসব করে। আমরা এই 'ইল ফিস'কে কুইচা মাছ বলি।

গভীর সমুদ্রের তলদেশে এক প্রকার বিকট আকৃতির মাছ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার নাম ফটোষ্টমিয়াস গুয়েনাই। ইহার মুখের গঠন অদ্ভুত। নিম্ন চোয়ালের পশ্চাৎভাগ পিছনের দিকে অনেক দূর অবধি বর্দ্ধিত

শরীরের উভয় পার্শ্বে একটু নীচের দিকে এবং মুখের চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া সারবন্দি ছোটবড় অনেকগুলি ফোঁটা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক ফোঁটাই যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টর্চের মত। শিকারের সুবিধার জন্যই হয়তো এই আলোক-উৎপাদক যন্ত্রের সমাবেশ।

ফটোষ্টমিয়াসের মধ্যে আর এক প্রকার জাতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের নীচে চোয়াল হইতে একটি বোটা ঝুলিয়া থাকে। বোটার অগ্রভাগ পিণ্ডাকৃতি। এই অংশটা বাতির মত আলো বিকীরণ করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া ইহাদের সর্ব্ব শরীরে আলো-বিকীরণকারী ছোট ছোট গোল দাগ বর্ত্তমান।

আমাদের দেশে আলো-বিকীরণকারী কীটপতঙ্গ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কেঁচো, জোনাকী প্রভৃতির আলো প্রায়ই আমাদের নজরে পড়িয়া থাকে বলিয়া এ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন কৌতূহল জাগ্রত হয় না। আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতের মৃত চিংড়ির শরীর হইতে একপ্রকার নীলাভ আলোক নির্গত হইতে দেখা যায়। ন্যাদস ইলিশ প্রভৃতি মাছ বাসি করিলে সময় সময় তাহাদের শরীর হইতে এরূপ আলোক নিঃসৃত হইতে দেখা যায়। কিন্তু ঐরূপ আলো-প্রদানকারী কোন জলজ প্রাণী বা মাছ আছে কিনা জানা যায় নাই। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের সমুদ্র-জলে বিচিত্র আকৃতির আলোক-মাছ ও অন্যান্য অনেক অদ্ভুত আলো-বিকীরণ-কারী প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়।

আত্মরক্ষা অথবা শিকার ধরিবার নিমিত্ত, অন্য যে কোন কারণেই হউক না কেন মাছের শরীর হইতে যেমন আলোক নির্গত হয়, তেমনি কতকগুলি মাছ দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা উপরিউক্ত কারণেই শরীর হইতে আলোর পরিবর্ত্তে তড়িৎ উৎপাদন করিয়া থাকে। সময় সময় এই জৈব তড়িৎ এত প্রবল শক্তিসম্পন্ন হয় যে, অতি বলশালী প্রাণীও তাহার আঘাতে অচৈতন্য হইয়া পড়ে। দক্ষিণ আমেরিকার তাড়িতিক বানমাছ এই জৈব তড়িৎ উৎপন্ন করিতে অদ্বিতীয়। অরিনকো এমাজন প্রভৃতি নদীর অগভীর জলে এবং আশেপাশের জলাভূমিতে এক জাতীয় অদ্ভুত বানমাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম জিমনোটাস্ ইলেক্‌ট্রিকাস্। ইহাদের শরীর হইতে এত অধিক পরিমাণ তড়িৎশক্তি নির্গত হয় যে, সময় সময় ঘোড়া, গরু প্রভৃতি পশুরা জলপান করিতে গিয়া এই বানমাছের তড়িতাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। ইহাদের শরীরের পাঁচ ভাগের চার ভাগই লেজ। ইহার উভয় পার্শ্বেই তড়িৎ-উৎপাদক কোষগুলি লম্বা ভাবে অবস্থিত। সম্মুখ ও পশ্চাতের দিকে দুই বিপরীতধর্ম্মী তড়িৎ সঞ্চিত থাকে। কাহাকেও তড়িতাঘাত করিবার সময় শরীরটাকে বাঁকাইয়া উভয় প্রান্ত একসঙ্গে স্পর্শ করাইয়া দেয়।

নীল নদের নিম্নভাগে দুইহাত লম্বা এক জাতীয় দাড়িওয়ালা মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মাছের বৈজ্ঞানিক নাম ম্যাল্প টেরুরাস্ ইলেক্‌ট্রিকাস্। ইহাদের তড়িৎ উৎপাদক শক্তি অসাধারণ। পরিমাপ করিয়া দেখা গিয়াছে, এক একটি মাছের শরীর হইতে উৎপন্ন তাড়িতিক শক্তি ৪৫০ ভোল্টের কম নহে।

ভূমধ্যসাগরে আমাদের দেশের শঙ্কর মাছের মত 'টরপেডো মার মোরাটা' নামক এক প্রকার অদ্ভুত মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মুখ ও কানকোর মধ্যস্থলে শক্তিশালী তড়িৎ-উৎপাদক কোষসমূহ সজ্জিত থাকে। উত্তেজিত হইলেই ইহাদের তড়িৎ-শক্তির বিকাশ ঘটে। সেই সময় ইহাদিগকে হাত দিয়া ধরিলে তড়িতাঘাতে হাত অবশ হইয়া যায়, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে।

পাখীরাই নীড় বাঁধিয়া থাকে, কিন্তু জলতলবিহারী মৎস্যও নীড় রচনা করিয়া তন্মধ্যে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ইহা বিচিত্র নহে কি? সমুদ্রচারী মৎস্যকুলের মধ্যে এক জাতীয় মৎস্য আছে তাহারা সমুদ্রজাত লতাগুল্ম এবং সৈকত সন্নিহিত তৃণাদির সাহায্যে সত্যসত্যই নীড় রচনা করিয়া থাকে। বহুরূপীর ন্যায় এই জাতীয় মৎস্য ইচ্ছানুরূপ বর্ণও পরিবর্ত্তন করিতে পারে। শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য বা শিকার ধরিবার জন্য তাহারা এইরূপ প্রকৃতি লাভ করিয়াছে।

বাউল

(গান)

নিশিকান্ত

এ যে কোন্   কর্মনাশা,
এ যে কোন্   কর্মনাশা গানের ভ্রমর
                মর্মেতে মোর বাঁধল বাসা !
সে যে গো   দিনে রাতে সকাল সাঁঝে
                গান করে আর আমায় গাওয়ায়
                থামায় না গান, থামে না যে !
তারি সেই   সুর শুনে মোর মন বসে না
                এ সংসারের কোনোই কাজে।
বুঝি বা   বিফল হবে,
বুঝি বা   বিফল হবে এই তোমাদের
            কাজের ভবে
                আমার এ-গান গাইতে আসা।

করি না   বেচা-কেনা,
করি না   বেচা-কেনা কোনো হাটে
                কোনো বাটে কাল কাটে না।
শুনি না   কারো কথা, শুধু শুনি
                অন্তরে গুন্‌গুন করে গো
                কোন্ উদাসী, কোন্ সে-গুণী !
তারি সেই   গুঞ্জনে মোর জীবন হোলো
                তারি সুরের সুরধনী

একদিনের ঘটনা

(গল্প)

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

রাঁচিতে মাত্র একদিন ছিলাম বটে, কিন্তু সেই একদিনের স্মৃতিই আমার মনে এমন দাগ কেটে দিয়েছিল যে, তা' এখনও ভুলিনি কর্ম্মময় জীবনের শত কোলাহলের মধ্যেও।

রাঁচিতে গিয়েছিলুম কোন কাজের জন্য,—সেটা সফল হওয়াতে মনের আনন্দে দেখতে গিয়েছিলুম পাগলা গারদ।

নানারকম পাগল দেখে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি—এমন সময় পেছন থেকে কে ডাকল, 'শুনেছেন ও মশায়!'

ফিরে তাকিয়ে দেখি মাঠের মধ্যে আমার চেয়ে কিছু বেশী বয়সের একটি লোক বসে আছে একটা বেঞ্চির উপর। সে-ই আমাকে ডাকছিলো। চেহারা দিব্যি ভদ্রলোকের মতন, আর ভারী সুন্দর। কেমন একটা মায়া ও সম্ভ্রম জেগে উঠল মনে। তিনি একটু মৃদু হেসে বললেন, "কি, ভয় ক'রছে নাকি পাগল বলে?"

আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। এ কি রকম পাগল! নিজেই নিজেকে পাগল ব'লছেন আবার! উনি কি সত্যই পাগল? কথার যেমন ধরণ—তা'তে কে বলবে পাগল!

ভয়ানক আশ্চর্য্য লাগল। তাই, যদিও এমন অদ্ভুত পাগলের সঙ্গে একটু পরিচয় করবার খুবই ইচ্ছা হ'ল,—তথাপি এমন অদ্ভুত বলে কাছে যেতেও সাহসে কুলোচ্ছিল না।

আমার ইতস্ততঃ ভাব দেখে তিনি (পাগল) আবার বললেন, "ভয় নেই, কিচ্ছু ভয় নেই, চলে আসুন। এত দ্বিধা করছেন কেন?"

বলতে কি, একটু লজ্জাই পেলুম। তাঁর কাছে এগিয়ে যেতে হ'ল। তিনি বললেন, 'বসুন না পাশে।'

• বসলুম। তিনি বললেন, 'আপনার নাম কি মশায়?' বেশ শান্ত ভাবে বললেন। আমি নাম বললুম,—তারপর তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করাতে তিনিও বললেন। আরও কয়েকটা কথা আদান প্রদানের পর এক সময়ে তাঁকে বলে ফেললুম, "আচ্ছা আপনি তো বেশ সুস্থ দেখছি,—তা' মিছামিছি এই গারদে থাকার মানে কি? এসেছেন কতদিন?"

তিনি এইবার যেন রাগে ফুলতে লাগলেন, কেঁপে-কেঁপে বললেন, "শুনতে চান? শুনুন। আমি মশাই মোটেই পাগল নই। আমায় জোর করে আমার আত্মীয়রা এখানে রেখে গেছে আজ তিন বছর হ'ল।"

চমকে উঠলুম, বললুম, "বলেন কি? জোর করে রেখে গেছে! তারা মানুষ না পশু? কিন্তু, এ করে তাদের কি লাভ হয়েছে?"

তিনি বললেন, "লাভ? লাভ হয়েছে বৈকি। বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান আমি। বাবা মরে গেছেন। কিন্তু যাবার আগে আমার বিয়ে দিয়ে যান। সেই স্ত্রীই আমার এই সর্ব্বনাশ করেছে। সে-ই ষড়যন্ত্র করে আমাকে 'পাগল' বলে সকলের কাছে প্রচার করে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। বলেন কি এর মধ্যে ডাক্তারদেরও ষড়যন্ত্র আছে,—তারাও যে পেয়েছে।"

বললুম, "সেইটাই বলুন না, কি পেয়েছে?"

তিনি গোল গোল চোখ করে বললেন, "টাকা—টাকা, মশাই, টাকা, এও বুঝতে পারছেন না? বাবার অনেক টাকা ছিল যে, আর সে তো আমিই পেয়েছিলুম। এমন আশ্চর্য্য মশাই, আমার টাকা মানে তো আমার স্ত্রীরও? কিন্তু সে তা বুঝল না। টাকাই তার কাছে বেশী হ'ল আমার চেয়ে। সে যে আগের থেকেই টাকাটা পাওয়ার জন্য এমন সাঙ্ঘাতিক মতলব ভাঁজছিল—তা তো আর আমি বুঝতে পারি নি আগে। তাহলে তো একটা হেস্তনেস্ত করতুম।"

বললুম, "বুঝলেন কবে?"

তিনি বললেন, "বুঝলুম কবে ? একটা মেয়ে হয়েছিল আমার। খুব ভালবাসতুম। কিন্তু মশাই টিকল না। মরে গেল। তার পর আমার অসুখ হয় খুব। আহা! অসুখ থেকে যেদিন জ্ঞান হ'ল,—সেইদিনই দেখি বাড়ীশুদ্ধ সবাই আমার দিকে কেমন ভাবে চেয়ে রয়েছে—দূরে দূরে দাঁড়িয়ে। একজনকে ডাকলুম। সে "ওরে বাবা" বলে দৌড়ে চলে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে আর সবও চলে গেল। এর মধ্যে আমার স্ত্রী এল। তাকেও দেখলুম আমার কাছে ঘেঁসছে না। বললুম, শোন না। কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমি যেই বলতে গেছি,—কি, কথা কানে যাচ্ছে না ?—অমনি সেও পালাবার জন্য পা বাড়াল।

"এমন সময় "আমাদের ডাক্তারকে আসতে দেখে আমার স্ত্রী বলল, 'ডাক্তারবাবু, আবার পাগলামী সুরু হয়েছে, ওঁকে শীগ্‌গির ধরুন।'

"ডাক্তার এসে আমায় চেপে ধরল। তার পর আমার স্ত্রীকে বলল, "তাহলে রাঁচি এ্যাসাইলামেই পাঠাব ?"

স্ত্রী বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় নিশ্চয়।"

"শুনে, আমি যেই একটু উঠে বলেছি, কেন, আমার কি হয়েছে যে পাগলা গারদে পাঠাতে হবে ?—অমনি ডাক্তার আমাকে আরও জোর করে শুইয়ে দিয়ে আমার স্ত্রীকে বলল, "শীগ্‌গির, দু' একজনকে এখানে পাঠিয়ে দিন। এখনই পাগলামী বাড়তে আরম্ভ করবে।" স্ত্রী ছুটে গেল।

"তার পর আমার আর কিছু মনে নাই। অসুখ হয়েছিল বলেছি। শরীরটা খুব দুর্ব্বল ছিল। বিছানায় শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—ঐ যে ডাক্তার চেপে ধরেছিল।" বলে তিনি চুপ করে গেলেন।

বললুম, 'তার পর ?'

তিনি যেন হতাশ ভাবে বললেন, "আর কি ? তার পর আমাকে এখানে জোর করে রেখে গেল। এখানকার ডাক্তারগুলো কম শয়তান মশাই। আমাকে 'পাগল' বানিয়ে সমস্ত টাকাকড়ি যে আমার স্ত্রী গাপ্ করেছে তাতে এরাও সাহায্য করেছে তাকে, পেয়েছে-ও কিছু। ওঃ! টাকার জন্য এ রকম কেউ করে শুনেছেন ? আমায় বলে কিনা আমি পাগল!"

তিনি গুম্ হয়ে বসে রইলেন।

মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। এ রকম ঘটনা আর কোনদিন শুনি নি! স্ত্রী হয়ে স্বামীর এমন সর্ব্বনাশ করতে পারে এ ধারণাও যে করা যায় না! সঙ্গে সঙ্গে রাগে শরীর কাঁপতে লাগল। ইচ্ছা হল—সেই 'স্ত্রীটিকে' পেলে এখনই খুন করে ফেলি,—ভাগ্যে যা' হয় হোক! হঠাৎ মনে পড়ে গেল—এ সম্বন্ধে একটা কিছু করা যায় না! দেখা যাক, পাগলা গারদের বড় ডাক্তারকে বলে। নইলে পুলিশের শরণাপন্ন হতে হবে। যে-ভাবেই হোক এঁকে মুক্তি দিতে হবে! এই ভেবে যেই তাঁকে 'আচ্ছা, আমি এখুনি আসছি' বলে উঠতে গেছি—অমনি তিনি বললেন, 'যাচ্ছেন কোথায় ?—আমার গান শুনে গেলেন না ? আমি খু-ব ভাল গান গাইতে পারি।' বলেই, আমাকে দুই হাতে ধরে গান গেয়ে উঠলেন—"তোমায় প্রিয় ছাড়তে যে পা-রি-না।"

অবাক হয়ে গেলুম! এ আবার কি হ'ল ? কিন্তু, তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আরও জোরে গান ধরলেন—"প্রিয় গো-ও-ও-ও! ও-গো প্রিয়!" তার পরই আমায় আলিঙ্গনাবদ্ধ করে তিনি বললেন, 'সুন্দরী! বল তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না ?'

সমস্ত কিছু এক নিমেষে পরিষ্কার হয়ে গেল। [illegible]ন পাগলও আছে! ভয়ে তাঁর কাছ থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু তিনি বললেন, 'কোথায় যাবে ? আমার মেয়েকে যেখান থেকে পার নিয়ে এস। তাকে দিতে হবে।' বলে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। আমিও ব্যাকুল হয়ে উঠলুম।

এমন সময় পাগলা গারদের একজন ডাক্তার ও কয়েকজন পাহারা-আলা এসে আমায় মুক্ত করল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

ডাক্তার আমায় বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

তাঁর সঙ্গে গিয়ে একটা ঘরে বসলুম। তিনি বললেন, 'আপনি করেছেন কি মশাই ? ওর কাছে কেন গিয়েছিলেন ?'

সমস্তই ডাক্তারকে বললুম। শুনে তিনি হাসলেন। একটু পরে বললেন, "ও ঐ রকম। বলে ওকে জোর

করে পাগল বানিয়ে এখানে রাখা হয়েছে, কিন্তু তা' নয়।"

বললুম, "তা তো বুঝেছি, কিন্তু, ব্যাপার কি বলুন তো?"

ডাক্তার বললেন, "ওর একটি মেয়ে ছিল। তাকে খুবই ভালবাসত, যাকে বলে প্রাণ দিয়ে। তা, ঐ মেয়ে হঠাৎ মারা যাওয়াতে সেই শোকে পাগল হয়ে গেছে। বড় লোকের ছেলে। টাকাও আছে। অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ কিছুই হচ্ছে না। পাগলামী আর ভাল হচ্ছে না। ওর স্ত্রী আসে;—কত কাঁদেন।"

বললুম, "তা' তো হল, কিন্তু, যখন এই রকম পাগল তখন বাইরে ওকে ছেড়ে দেন কেন?"

ডাক্তার বললেন, "মাঝে মাঝে ওকে বের করা হয়। ওতে ওরই উপকার হবে কিনা। এ-ও এক প্রকার আমাদের চিকিৎসা-প্রণালী। ওর কাছে যাওয়াই তো আপনার ভুল হয়েছে। এটা পাগলা গারদ—আপনার মনে রাখা উচিত ছিল।"

আমি হাঁ করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম। ভাবলুম—ভাগ্যের কথা যে তিনি (পাগল) গান গেয়ে ছিলেন, নইলে তাঁর হয়ে ডাক্তারকে কিছু বলতে গেলে, আমাকেই হয়ত একটি খাঁটি পাগল ভেবে গারদে—।

যুগ-প্রকাশক শরৎচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান যে বৎসর বঙ্গ ও বঙ্গের বাহিরে সাড়ম্বরে চলিতেছিল, সেই ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গ-সাহিত্য-গগনের ভাস্বর চন্দ্র শরৎ-চন্দ্রের তিরোধান হয়। আজ হ'তে প্রায় ৪৮ বৎসর পূর্ব্বে বিগত ১৩০০ সালের চৈত্র মাসে যে দিন বঙ্কিমচন্দ্র মহা-প্রয়াণ করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-চরিতকার বলেন, সে দিন সমগ্র বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া এক মহা হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। শরতচন্দ্রের মৃত্যুতেও তেমনি সমগ্র বাঙ্গালা দেশে ও বাঙ্গালার বাহিরে এক গভীর শোকের ছায়া পতিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য এবং ততোধিক বাঙ্গালী জাতির দুর্ভাগ্য যে, প্রায়ই দেখা যায় বাঙ্গালার কৃতী সন্তানগণ তাঁহাদের প্রতিভার পূর্ণ দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় যে বয়সে মনীষিগণ মাত্র কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, বাঙ্গালায় দেখা যায় সেই বয়সে তাঁদের অন্তর্দ্ধান হয়।

অনেক সাহিত্যিক ও মনীষী তাঁহাদের কর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভে বহু তিরস্কার, বহু শ্লেষ, বহু লাঞ্ছনার ভাজন হইয়া-ছিলেন। শরৎচন্দ্রেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। কিন্তু প্রতিভা কখনও চাপা থাকে না। বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে শত সহস্র বাধা বিঘ্ন ও বিপত্তি সত্ত্বেও প্রতিভার আলোক প্রদীপ্ত হইয়া উঠে—কিন্তু ইহাও দেখা গিয়াছে যে, সেই প্রতিভা-রবি মধ্যাহ্ন-গগনে উঠিতে না-উঠিতেই অস্তমিত হইয়া গিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুও সেইরূপ। যে বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, সে বয়সের পর এখনও বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেন এবং নানাবিধ নব নব পুষ্প-সম্ভারে বঙ্গবাণীর পাদ-পীঠ সাজাইতে পারিতেন।

শরৎচন্দ্র বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশে উল্কার মত হঠাৎ দেখা দিয়াছিলেন। "দুর্গেশ-নন্দিনী" প্রকাশের পূর্ব্ব যুগের আবিলতাপূর্ণ অমার্জ্জিত সাহিত্যকে বঙ্কিমচন্দ্র নব ধারায় নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে এক অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছিলেন।

সেই ইন্দ্রজালের সম্মুখে পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনারাশি আর মাথা তুলিতে পারে নাই। সেই মহা সাহিত্য-রথী বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষার পাঠক সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের যুগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—"পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম, তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি! কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! মুষলধারে ভাব বর্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্ব্ব-বাহিনী, পশ্চিম-বাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দ-বেগে ধাবিত হইতে লাগিল।"

বাস্তবিক পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের এক-একখানি গ্রন্থ বাঙ্গালার পাঠককে আত্মহারা এবং বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল বঙ্কিমচন্দ্রকে "যুগস্রষ্টা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু মনে হয় সেই যুগ-স্রষ্টা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও যেন বাঙ্গালীর প্রাণের ক্ষুধা মিটাইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীর সোনার কাঠির স্পর্শে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া ছিল বটে, কিন্তু কালস্রোতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত বাঙ্গালী আরো কি যেন চাহিতেছিল—আরো কি যেন খুঁজিতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যাহা দিয়াও দেন নাই, বঙ্কিম-সাহিত্যে যাহা পাইয়াও পাওয়া যায় নাই, বাঙ্গালী যেন তাহারই সন্ধান করিতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারে স্বর্ণ-মুষ্টি দান করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু যেন অকৃপণ করে দান করেন নাই। আরো প্রাণভরা দানের জন্য বাঙ্গালী উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল,—স্বর্ণ-মুষ্টি যাহাতে অকৃপণ হস্তের দান হইতে পারে, এমন একজন দাতাকে বাঙ্গালী পাঠক খুঁজিতেছিল। ঠিক সেই সময় প্রজ্জ্বলিত উল্কার মত বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। শরৎ-চন্দ্রকে স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল—"যুগ-প্রকাশক শরৎচন্দ্র" বলিয়া নাম দিয়া ছিলেন। যুগস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম "[illegible]" [illegible] হইবার দিন যেমন সারা বাঙ্গালায় এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তার প্রায় ৪৭ বৎসর পরে যুগ-প্রকাশক শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ। এই এক উপন্যাসেই শরৎচন্দ্রের নাম চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ভারতী-পত্রিকায় তাঁর "বড়দিদি" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠক তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিল। তাঁর একখানা বই পড়িয়াই বাঙ্গালী পাঠক বলিতে লাগিল, এই অ-পূর্ব্ব-পরিচিত লেখক কে? কোথায় থাকেন? আরও কি লিখিবেন? তাঁর এক লেখাতে তো পাঠক পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছে না! শোনা যায়, সাহিত্য-জগতে আর একবার এইরূপ হইয়াছিল। অতুল প্রতিভাবান মেকলে যখন কলেজের একজন সাধারণ ছাত্র, তখন তিনি তাঁর Essay on Milton লিখিয়া ছিলেন। সেই সময়কার Edinburgh Reviewতে যে দিন মেকলের ঐ প্রবন্ধ বাহির হইল সেই দিন সমগ্র ইংরাজ-সমাজ চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে প্রবন্ধ এমনই প্রাণোন্মাদিনী চিত্তাকর্ষক সুললিত অথচ তেজস্বী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল যে, একদিনেই কলেজের একজন সাধারণ ছাত্র মেকলের নাম সারা গ্রেট বৃটেনে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছিল। উত্তরকালে এই প্রতিভাবান মেকলেই নানাবিধ অবদানে ইংরাজী ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রও সেইরূপ। শরৎচন্দ্র সাধারণ গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন উচ্চ ডিগ্রী তিনি পান নাই, ভগবানের কাছে পাইয়াছিলেন মহতী প্রতিভা। এই প্রতিভাই স্বতঃস্ফূরিত হইয়া শরৎচন্দ্রকে কথা-সাহিত্য-জগতের শীর্ষ স্থানে বসাইয়াছে। তিনি এমন এক সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন যাহা প্রাণ-স্পর্শী, মনোরম, অবাধ-গতি এবং সাবলীল। বাঙ্গালীর ঘরে যাহা সর্ব্বদা হয়, বাঙ্গালীর সংসারে যাহা অঘটনীয় নহে, বাঙ্গালীর সমাজে যাহা প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারই সংমিশ্রণে সমগ্র শরৎ-সাহিত্য প্রাণবন্ত, তাহাই মূর্ত্ত হইয়া আজ শরৎ-সাহিত্যকে আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। আমরা নবাব-নন্দিনী আয়েসা, তিলোত্তমা, দলনী বেগম, মেহেরুন্নিসা, চঞ্চলকুমারী, জেবুন্নিসা, মৃণালিনীকে দেখিয়াছি—কিন্তু তাঁহাদের কথা বলিতেছি না—কারণ

তাঁহারা আমাদের ঘরের নহেন। জয়ন্তী, শ্রী, শান্তি, কপালকুণ্ডলা, রজনী, শৈবলিনী, প্রফুল্ল নিপুণ চিত্রকরের প্রাণস্পর্শী তুলিকায় আমাদের সম্মুখে এক অলৌকিক সৌন্দর্য্য এবং এক অনন্যসাধারণ রোমান্স সৃষ্টি করে। বহুবার তাঁহাদিগকে দেখিয়াও অতৃপ্ত থাকিতে হয়, কিন্তু তাঁহারাও আমাদের ঘরের নহেন। যতবার সীতারাম, আনন্দমঠ, কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর, দেবী চৌধুরাণী পাঠ করা যায় ততবারই তাহা নূতন—কিন্তু বাঙ্গালীর গৃহ-কোণের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ অল্প বলিয়াই মনে হয়। অপর পক্ষে দেখা যায় সূর্য্যমুখী, কমলমণি, ভ্রমর, কুন্দ-নন্দিনী, রোহিণী, শ্যামাসুন্দরী, ইন্দিরা সম্পূর্ণরূপে আমাদের ঘরের মেয়ের মতই,—কিন্তু তথাপি যেন বাঙ্গালী পাঠকের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। বাঙ্গালী পাঠক আমাদের সংসারের আরো যেন কোন নিকটতম আত্মীয়কে খুঁজিতেছিল। বাঙ্গালী সংসারের আবেষ্টনীর মধ্যে আরো যেন কেহ আছে যাহাকে পাইবার জন্য বাঙ্গালী আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। যাহারা অত্যাচারিত, যাহারা নিগৃহীত, সমাজচক্রের আবর্ত্তনে যাহারা নিষ্পেষিত, যাহারা সমাজের নিম্ন স্তরে জন্মিয়া লোকলোচনের অদৃশ্যে থাকিয়া নিম্ন স্তরেই বিলীন হইয়া যায়, এক দিনের এক মুহূর্ত্তের পদ-স্খলনে যাহারা পতিত, যাহাদের দেখিবার, যাহাদের কোলে টানিয়া লইবার, যাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার কেহ নাই, তাহাদিগকে ত সাহিত্যের মধ্য দিয়া এ যাবৎ আমরা পাই নাই। বাঙ্গালী সমাজের এই সমস্ত শেষ প্রশ্নের সমাধান বা নিষ্পত্তির চূড়ান্ত কেহ করেন নাই,—কিন্তু তাহাদিগকে লইয়াই সমগ্র শরৎ-সাহিত্য পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিদ্রোহী কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র বাঙ্গালীর সমাজের প্রচ্ছন্ন দুর্নীতি, ভণ্ডামি, আপাত-মনোহর সমাজবন্ধন—সমস্তের বিরুদ্ধে যে এক মহা বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী পাঠকও যেন তাহাই চাহিতে ছিল। যাহা নগ্ন সত্য, তাহাই তিনি লেখনী-মুখে প্রকাশিত করিতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও দ্বিধা বোধ করেন নাই।

সাহিত্য-জগতে অবশ্য মতভেদ আছে এবং উহা চিরকালই থাকিবে। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট কোন কোন চরিত্রকে তাহাদের সমাজ-বিধ্বংসী মতবাদ সহ হয়ত অনেকে নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অসামান্যা প্রতিভাশালিনী লেখিকা অনুরূপা দেবী সে দিনও সরল চিত্তে প্রচার করিয়াছেন যে, তিনিও শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট সকল চরিত্রের মতবাদে নিজেই শ্রদ্ধান্বিতা নহেন। কিন্তু তিনি শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব কথা-শিল্পে মুগ্ধ। এরূপ বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি সর্ব্ব দেশে সর্ব্বকালে সর্ব্ব সাহিত্যের সম্বন্ধেই আছে ও থাকিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখেও যেমন নানাবিধ বাধা-বিপত্তি আসিয়াছিল, তদানীন্তন পণ্ডিত-সমাজের তৎপূর্ব্ব যুগোচিত বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা যেমন বঙ্কিম-প্রতিভাকে দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, শরৎচন্দ্রকেও তেমনি তাহার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু নির্ভীক যোদ্ধা যেমন তরবারির সাহায্যে সম্মুখের ব্যবধান তিরোহিত করিয়া নিজের গন্তব্য পথ পরিষ্কার করিয়া লইয়া থাকেন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রও সেইরূপ অকুণ্ঠিত চিত্তে অতি সাহসে অগ্রসর হইয়াছেন। শরৎচন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনি কিছুই অন্যায় করেন নাই। যাহা সরল এবং সত্য, যাহা শাশ্বত তাহা সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রচার করিয়া কোন অপরাধের কার্য্য করেন নাই। সুতরাং তার জন্য কোনও কালে তিনি মাথা নীচু করিবেন না। ইহাই শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য এবং ঐখানেই শরৎ-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "নষ্ট নীড়" ও "গোরা" প্রভৃতি গ্রন্থে যে চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, মনস্তত্ত্বের যে পরিচয় দিয়াছেন, শরৎচন্দ্রে হইয়াছে তাহারই পূর্ণ পরিণতি। বাঙ্গালী-জীবনের সর্ব্বস্তরের চিত্র যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শরৎচন্দ্র তাঁহার দরদী দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছেন, নর-নারীর জীবনের দুর্ব্বোধ্য রহস্য তিনি যেমন অন্তরের দরদ দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তেমন দৃষ্টি-ভঙ্গী, মানুষের প্রতি তেমন আন্তরিক দরদ খুব কম কথা-সাহিত্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

শরৎচন্দ্রের বড়দিদি, শ্রীকান্ত, দত্তা, পল্লী-সমাজ, অরক্ষণীয়া, বৈকুণ্ঠের উইল, নব-বিধান, বিরাজ বৌ, বিন্দুর ছেলে, পণ্ডিত মশাই প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বঙ্গ-সাহিত্যের ভাণ্ডারে এক একখানি অমূল্য রত্ন। এই সমস্ত রত্নের আকর বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও

অপরাজেয় কথাশিল্পি শরৎচন্দ্র প্রায় ২৬ বৎসর কাল স্বদেশ ও স্বদেশীয় সাহিত্যের সেবা করিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে প্রীতি-ভালবাসার গৌরবময় আসন অধিকার করিয়াছেন, সে আসন আগত কাল পর্য্যন্ত অক্ষয় ও অব্যয় হইয়া থাকিবে।

বঙ্গবাণীর সেই একনিষ্ঠ সন্তান তেজস্বী অথচ আত্মগরিমাহীন শরৎচন্দ্রের পবিত্র আত্মার উদ্দেশে আজ এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলি—"যাও শরৎচন্দ্র, সেই অনন্তধামে যাও, যেখানে কষ্ট নাই, মোহ নাই, পাপ নাই সেইখানে যাও। যেখানে প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে যাও।" *

* বনগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত।

অভিনয়ে বিপর্য্যয়

(গল্প)

শ্রীপ্রসাদ রায়

আজ "মাকড়দহ নিধিরাম যুভেনাইল ড্রামেটিক ক্লাব" কর্ত্তৃক "দেবাসুরের" প্রথম অভিনয় রজনী। স্থান জমিদার নিধিরাম চাটুয্যের চণ্ডীমণ্ডপ, সময় সন্ধ্যা ৮টা। ক্লাবের সভাপতি নিধু চাটুয্যে আমার বাল্যবন্ধু। বিশেষ অনুরোধ করে পত্র দিয়েছে আমার যাওয়া চাই।

চাটুয্যেরা বনিয়াদি জমিদার, অনেক বড় বড় চাকুরীয়া আত্মীয়-কুটুম্ব। ছেলেছুটো পাশ করে ব'সে আছে। চাটুয্যে ইচ্ছা করলে তাদের একটা হিল্লে করে দেওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। সুতরাং এ হেন বন্ধুর অনুরোধ অগ্রাহ্য করা চলে না। বিকেলে বেরিয়ে পড়লুম। হাওড়া থেকে মাত্র কয়েকটা স্টেশন দূরে মাকড়দহ। স্টেশনের গেটের উপরেই দেবদারু-পাতা-জড়ান নবনির্ম্মিত বাঁশের তোরণ, বাঁ ধারে একটি আলো দেবার পোস্টের গায়ে পিচবোর্ডের উপর কাগজ মেরে মানুষের হাত আঁকা, হাতের সবকয়টি আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ, কেবল তর্জ্জনী প্রসারিত থেকে একটি বিশিষ্ট দিক নির্দ্দেশ করছে, ঠিক তার নিচে লেখা "দি মাকড়দহ নিধিরাম যুভেনাইল ড্রামেটিক ক্লাব।" অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে প্রথমে এই তোরণ নির্ম্মিত হয়, কিন্তু অভিনয়ের স্থান ও পথ-নির্দ্দেশক রূপে উহা যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় অনেক যুক্তি পরামর্শের পর উপরোক্ত সাইন বোর্ডের ব্যবস্থা হয়েছে।

ক্লাব স্থাপনার পেছনে একটু ইতিহাস আছে ঐ গ্রামের ঘোষেদের নলিনাক্ষ কিছুদিন হ'ল কলকাতায় পড়া শেষ করে গাঁয়ে এসে বসেছে। পড়া শেষ বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি ইউনিভারসিটীর পরীক্ষাগুলি পাশ করে পড়ার আর বাকি কিছু না রাখা। কিন্তু নলিনাক্ষের বেলায় ব্যাপারটা অন্য রকমের অর্থাৎ পাঠে ইস্তফা—ভবিষ্যতের জন্য পাঠ্য পুস্তকগুলি আর কোন দিন স্পর্শ না করার সঙ্কল্প। কিন্তু তাই বলে কলকাতায় এই কয় বছর সে বৃথায় কাটায় নি। কলেজের মাহিনার টাকায় যথাসম্ভব নূতন ফিল্‌মগুলি এবং প্রত্যেক নূতন নাটকের অভিনয় দেখতে সে ছাড়েনি। সিনেমা ফিল্ম এবং অভিনয় সংক্রান্ত যাবতীয় সাময়িক পত্রিকাগুলির সে সংবাদ রাখত। তা ছাড়া একেবারে শ্রেষ্ঠ না হোক হাত-তালি দেওয়া চলে এমন বহু নট-নটীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য তার হয়েছে এবং তাদের ডিরেক্‌সান

মত অভিনয়-কলার চর্চ্চাও সে করেছে। রীতিমত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখভাবের বিভিন্ন অভিব্যক্তিগুলি অভ্যাস করা ছাড়া আধুনিক এবং পৌরাণিক যে কোন নাটকের প্রধান ভূমিকায় অভিনয় উপযোগী একখানি চমৎকার বাবরী সে ইতিমধ্যে তৈরী করে ফেলেছে। তার আশা আছে, একদিন এই বাবরীর জোরেই রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলে সে গণ্য হতে পারবে। নলিনাক্ষের ধারণা, আজকাল ডিরেক্টারগুলো মার্চেণ্ট অফিসের বড়বাবুদের মত শুধু খোসামোদ করতে পারলেই সন্তুষ্ট হয়, গুণের কদর বোঝে না। না হলে অমন একখানা বাবরী যা দেখলে লুফে নেবার কথা, কতবার কত ছোট বড় ডিরেক্টারের সামনে ঝাঁকি দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখান সত্ত্বেও কেউ আকৃষ্ট হ'ল না। তাছাড়া ওর মতে অভিনয় করতে হলে শুধু গলার স্বর আর ভাল চেহারা থাকলেই হয় না, যে ভূমিকায় অভিনয় করবে সেই চরিত্রের যথার্থ রূপ বোঝবার মত যথেষ্ট শিক্ষাও থাকা চাই। আজকালকার অভিনেতাদের বিদ্যার দৌড় তার অজানা নেই। কিন্তু ওর বিষয়ে সে কথা খাটে না; পাশ করুক আর নাই করুক, চার পাঁচ বছর কলেজে যে পড়লে তার ত একটা মূল্য আছে।

প্রধানতঃ তারই চেষ্টায় গ্রামের যুভেনাইল জিমন্যাষ্টিক ক্লাবটি ড্রামেটিক ক্লাবে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু জিমন্যাষ্টিকের খোলা মাঠে ত আর থিয়েটার ক্লাব চলে না, বিশেষতঃ অভিনয়ের সময় দস্তুর মত পয়সা খরচ আছে। সুতরাং বেশ শাঁসাল পৃষ্ঠপোষক থাকা চাই। কাজেই সকলকে একদিন নিধু চাটুয্যের কাছে হাজির হতে হ'ল। মুখপাত্র হিসাবে নলিনাক্ষ বললে, "চাটুয্যে মশায়, আপনার কাছে আমাদের একটা দরবার আছে।"

চাটুয্যে প্রাতঃকালীন চা পানের পর মোসাহেব-পরিবেষ্টিত হয়ে তামাক টানতে টানতে চোক বুঁজে চাটু-বাক্য শুনছিলেন। মোসাহেব ধর্ম্মদাস ঘোষাল ফট্ করে বলে উঠলেন, "তা দরবার চাটুয্যে মশায়ের কাছে না কার কি পঞ্চা মুদির কাছে করতে যাবে? হেঁ হেঁ তা তোমাদের দরবারটা কি? সরস্বতী পূজার চাঁদা বুঝি।"

এবার চাটুয্যে চোখ খুললেন, বললেন, "কি নলিন যে, কি তোমাদের সব মতলব কি? বোসো বোসো।"

সদলে ফরাসের একধারে আসন গ্রহণ করে নলিনাক্ষ বললে, "আপনাকে আমাদের ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট হতে হবে।"

ঘোষাল বললেন, "তা উনি ছাড়া প্রেসিডেণ্ট হবার লোকই বা কে আছে?—হেঁ হেঁ তা তোমাদের ক্লাবটা কিসের?"

নলিনাক্ষ তার উদ্দেশ্য যথাসম্ভব জানালে এবং আরও জানালে যে চাটুয্যে মশায়ের বৈঠকখানাতেই রিহার্সাল চলবে। শুধু তাই নয় ফিনিশিং টাচ্ রূপে কার্য্যসিদ্ধির জন্য অব্যর্থ টোট্‌কা প্রয়োগ করে বলল, "আপনি অনেক অভিনয় দেখেছেন, এ সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট; আপনাকে আমাদের ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দিতে হবে, অধিকন্তু আপনাকে একটা পার্টও নিতে হবে।"

নলিনাক্ষ জানে যে একবার কোন রকম পার্ট নেওয়াতে পারলে অভিনয়ের সম্পূর্ণ না হোক পনের আনা খরচা চাটুয্যে গাঁট থেকে বার করবেই।

আত্ম-প্রসাদে চাটুয্যে একেবারে গলে জল হয়ে গেলেন, এক গাল হেসে বললেন, "বুড়ো বয়সে আমরা আর কি পার্ট করব? তোমরা সব আজ-কালকার ছেলেরা রয়েছ; কেমন হে ঘোষাল।"

ঘোষাল সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললেন, "হেঁ হেঁ তা বটে। তবুও বলি আপনি পার্ট ধরলে এই সব আজকালকার ছেলেরা কি আর কল্কে পায়; কথায় বলে পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে।"

সুতরাং চাটুয্যের সম্মতি মিলতে দেরী হ'ল না। নলিনাক্ষ দলবল নিয়ে উঠে পড়ল, জানিয়ে গেল বই এবং মোটামুটি একটা কাষ্টিং ঠিক করে কাল থেকেই তারা রিহার্সাল আরম্ভ করবে।

নলিনাক্ষ চলে যেতে ঘোষালই প্রথম কথাটা পাড়লে, "আচ্ছা চাটুয্যে মশায়, আপনি হলেন ক্লাবের সভাপতি, আপনার এখানেই ক্লাব বসবে, তার মানে দৈনিক পান-তামাকের খরচটাও আপনারই, শুধু ক্লাবের নামটাই তাহলে অন্য হবে কেন? আমার মনে হয় নিধিরাম

ড্রামেটিক ক্লাব নাম থাকলেই ঠিক্ হবে, কেমন হে নিতাই চন্দর ?”

বৈষ্ণব নিতাই বোস এতক্ষণ চুপ করে বোধ হয় হরিনাম করতে ছিল, বলে উঠল, “ঠিক বলেছ ঘোষাল, আমিও এতক্ষণ ঠিক ঐ কথাটিই মনে মনে ভেবেছিলুম।”

—তা তোমরা পাঁচজনে যা বল, তোমাদের পরামর্শ ছাড়া আমি নিজে আর কোন্ কাজটা করি ? বলে নিধু চাটুয্যে জোরে জোরে তামাকে টান দিতে লাগলেন।

বিকালে নলিনাক্ষর কাছে সংবাদ গেল চাটুয্যে মশায়ের বৈঠকখানায় অনবরত লোকজন আসে, কাযেই ক্লাব-টাব ওখানে সুবিধা হবে না।

হঠাৎ আবার কি হ'ল বুঝতে না পেরে নলিনাক্ষ তাড়াতাড়ি এসে হাজির।

ঘোষাল ওৎ পেতে ছিল, ওকে আসতে দেখে ইঙ্গিতে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, “নলিন! কোন ভয় নেই, আমি সব ঠিক করে নিয়েছি। বড়মানুষের মেজাজ, তার ওপর যত সব মোসাহেব জুটেছেন; গ্রামের একটা ভালত কেউ দেখতে পারেন না।”

নলিনাক্ষ জিজ্ঞাসা করলে, “ব্যাপার কি ?”

—ব্যাপার জেনে দরকার নেই; তোমরা এক কায কর, ওসব যুভেনাইল ইংরাজী নাম না রেখে নিধিরাম ড্রামেটিক ক্লাব রাখ তা হলেই হবে। সেই তোমরা যাবার পর থেকেই আমি বোঝাচ্ছি বলি নামটা কার হবে শুনি, আপনার জমিদারী, আপনি প্রেসিডেন্ট, আপনার নামে ক্লাব, আপনার মণ্ডপে হবে অভিনয়, এতে কি লোকে নলিনের নাম করবে ? না আমার নাম করবে ? লোকে বলে সাপের কামড়ের ওষুধ আছে, কিন্তু মানুষের কামড়ের ওষুধ নেই। তা যাক্ তুমি গিয়ে সরাসরি বল যে চাটুয্যে মশায় আমরা ঠিক করছি ক্লাবের নামটাও আপনার নামে থাকবে। নিধিরাম ড্রামেটিক ক্লাব।

কিন্তু তার সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ না করে নলিনাক্ষ এরকম একটা প্রস্তাব কিছুতেই করতে পারে না, বিশেষতঃ নামটা তার পছন্দও নয়। কাযেই আর সকলকে ডেকে আনবার কথা বলে ঐখান থেকেই ফিরে গেল, ঘোষাল আর একবার বলে দিলে, “নলিন, এবিষয়ে অমত করো না যেন।”

তরুণদের কাছে থিয়েটার ক্লাবের এরকম একটা সেকেলে বুড়ুটে নাম আদৌ ভাল লাগল না। তারা ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে বললে, বরং চাঁদা কিছু বেশী দিয়ে মাঠের মধ্যে স্টেজ বেঁধে প্লে করবে তবুও ঐ নামে ক্লাবের পরিচয় দিতে পারবে না।

নলিনাক্ষ দেখলে তার এতদিনের আর্টের চর্চ্চা বুঝি বৃথা হয়। শেষ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষকে অনেক বুঝিয়ে একটা রফা হ'ল, ক্লাবের নাম থাকল “দি মাকড়দহ নিধিরাম যুভেনাইল ড্রামেটিক ক্লাব।” বই ঠিক হল “দেবাসুর”। বইখানি সকলেরই পছন্দমত। নলিনাক্ষ কলকাতায় থাকা-কালীন ষ্টার থিয়েটারে ‘দেবাসুর’ অভিনয় কয়েকবার দেখেছে। সেই সময় থেকেই ইন্দ্রের ভূমিকার প্রতি ওর বিশেষ লোভ আছে। তাছাড়া বইখানিতে পুরা তেত্রিশ কোটি নাহোক বহু দেবদেবী ও অসুর-চরিত্র থাকায় পাড়ার সমস্ত ছেলেই একটা না একটা পার্ট পেয়েছে; কারো মনঃক্ষুন্ন হবার কারণ নেই। সুতরাং ক্লাব স্থায়ী হবে বলে আশাকরা যায়। নিধু চাটুয্যেকে দেওয়া হ'ল মহাদেবের পার্ট।

—আমাকে আর কেন ? তোমরা সব ছেলেছোকরা রয়েছ; আমরা দেখব শুনব।

নলিনাক্ষ জানে যে এটা কর্ত্তার বিনয় প্রকাশ, বলল, “তা কি হয় চাটুয্যে মশায়, এ সব কি ছেলেছোকরার কায; অন্ততঃ প্রথম নাইট-টা ত করেন, আমরা সব শিখে নিই আগে, তার পর দেখা যাবে।”

ঘোষাল বলেন, “হেঁ হেঁ তা নলিন যা বলেছে, আপনার কাছে কি আর—হেঁ হেঁ।”

“আমার কিন্তু একটু প্ল্যান আছে চাটুয্যে মশায়, অভিনয়টা ন্যাচারাল করতে হবে” নলিনাক্ষ বলতে থাকে।

“সে আবার কি হে ?” চাটুয্যে প্রশ্ন করেন।

—ধরুন এই মহাদেবের সাজ-পোষাক, ভাং তামাক মায় ষাঁড় পর্য্যন্ত আসল জিনিষ দিয়ে হবে। আপনাকে সত্যিকারের ষাঁড়ের পিঠে চড়ে এ্যাপিয়ার হতে হবে।

—সে কিহে, লোকে বলবে কি ?

—কি বলছেন চাটুয্যে মশায়; লোকের তাক্ লেগে যাবে; কলকাতা থেকে সব বড় বড় লোক নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসব। বলতে হবে হ্যাঁ মাকড়দহ চাটুয্যে বাড়ীতে একটা প্লে দেখেছি বটে! কেমন ঘোষাল মশায়?

—তা বটে! নলিন কথাটা নেহাৎ মন্দ বলে নি—হেঁ হেঁ লোককে বলতে হবে বই কি।

চাটুয্যে কি বলতে যাচ্ছিলেন নলিনাক্ষ বাধা দিয়ে বলে উঠল,. "আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না, আমি সমস্ত ঠিক করে নেব। দেখবেন কলকাতার বড় বড় আসর থেকে প্লে করবার জন্য আমাদের কল আসে কি না?"

—তোমরা যা ভাল বোঝো করো, তবে দেখো বাবু যেন কোন গোলমাল না হয়।

ব্যাস্! কলকাতার নট ও পরিচালকদের ডেকে এনে নলিনাক্ষ এবার দেখিয়ে দেবে তার কৃতিত্ব; বুঝিয়ে দেবে যে তারা ছাড়াও প্লে করতে জানে এমন লোক আছে। হুঁ হুঁ বাব্বা! শুধু আর ইনিয়ে বিনিয়ে পার্ট মুখস্থ বললেই অভিনয় হয় না; পেটে বিদ্যে থাকা চাই। আই-এ-তে চার পাঁচ বছর ধরে গ্রীক হিষ্ট্রি পড়েছে সে। সেই প্রাচীন কালের গ্রীক থিয়েটারের মত স্টেজ এবং প্লেকে ন্যাচারাল করবে তার এই অভিনবত্বে। একটা ভাবনা হয় ওর—আচ্ছা! একবার দেখলেই ত সকলে ওর অনুকরণে এইরূপ করবে, তখন আর ওর বিশেষত্ব থাকবে কি? এর কি কোন কপিরাইট পাওয়া যায় না যে ওর বিনা অনুমতিতে কেউ এ রকম করতে পারবে না, যেমন কোন বৈজ্ঞানিক নূতন আবিষ্কারের বেলায় আছে। যাক্ গে ও সব ভাবনা এখন থাক। প্রথম বারের সক্সেস্টা দেখে যা হয় একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

নন্দীর ভূমিকায় আবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। শেষে সামন্তদের পাগলা সতেকে ডেকে নলিনাক্ষ বললে, "সতীশ! তুই একটা পার্ট-টার্ট কিছু করবি না?"

প্রস্তাবে সতীশের মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল, বললে, "তোমরা বললে করতে পারি; সেবার সেই ভাণ্ডারী অপেরা এল, তার যে সেই নারদ সেজেছিল, সে ত আমাকে নে যাবার জন্যে কত উপরোধ।

—তা জানি বই কি, তোর এ সব বিষয়ে খুব এলেম আছে; তাই ত তোকে বলছি। তা তুই নন্দীর পার্টটা নে।

কিন্তু নন্দীর কথায় সতীশের আগ্রহ কমে গেল। কারণ সে বছর পূজার সময় চাটুয্যে-বাড়ীতে "দক্ষযজ্ঞ" যাত্রায় সে দেখেছিল সব লোকেরই জরি দেওয়া ভেলভেটের পোষাক, সকলেরই কোমরে তলোয়ার এবং পিঠে তীর ধনুক, কিন্তু যে লোকটা নন্দী সেজেছিল তার খালি গা, শুধু লাল রং-এর একখানা ছোট কাপড় মালকোঁচা দিয়ে পরা। কাজেই সে স্পষ্ট বলে ফেললে, "ও পাট করবো না।"

অগত্যা নিধু চাটুয্যেকে দিয়ে একবার বলাতে হ'ল। তখন আর না বলবার উপায় নাই, কারণ তাঁর নিষ্কর জমিতে ওদের বাস।

কয়েক মাস ধরে দস্তুর মত রিহার্স'াল দিয়ে বই তৈরী হয়েছে এবং একটি হৃষ্ট-পুষ্ট নিরীহ প্রকৃতির ষণ্ডকে তালিম দিয়ে রাখা হয়েছে। প্রথম প্রথম ষণ্ডটি পৃষ্ঠে আরোহণ করতে গেলেই আপত্তি জানাত। বেশ শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দুই-চার জন লোকের সাহায্যে চড়ে বসতে বসতে ক্রমশঃ একটু বশে এসেছে এবং নিধু চাটুয্যেরও ভরসা হয়েছে কোন রকমে মিনিট পাঁচেকের একটা দৃশ্য ষণ্ডারোহণে চালিয়ে নিতে পারবেন।

ঘণ্টাকর্ণ পূজাকে উপলক্ষ করে আজ অভিনয়। চাটুয্যে-বাড়ীর প্রশস্ত চণ্ডী-মণ্ডপে পাল টাঙ্গিয়ে আসর হয়েছে; একধারে চিকের আড়াল দিয়ে মেয়েদের বসবার স্থান। পুরাতন আমলের বহু ঝাড়-লণ্ঠন চারিদিকে সজ্জিত। প্রায় সমস্ত স্থান বহু পূর্ব্ব হতেই লোকে ভর্ত্তি হয়ে গেছে। অভিনেতারা সারাদিন ম্যারাপ বাঁধার জন্য পরিশ্রান্ত, কাজেই নির্দ্দিষ্ট সময় ৮টায় প্লে আরম্ভ করা গেল না, প্রায় ১০॥টার সময় ড্রপ উঠল।

প্রথম কয়েকটা দৃশ্য নির্ব্বিবাদে দর্শকদের দারুণ হাততালি ও কৌতুহলের মধ্যে কেটে গেল। এইবার স্টেজের উপর ষণ্ড আনা হবে।

স্থান কৈলাসপুরীর বাহিরের বারান্দা, মহাদেব ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট, অপর পার্শ্বে ভৃঙ্গী সীল পাতিয়া সিদ্ধি বাটিতেছে, নিকটে বারকোষের উপর স্তূপীকৃত

বাদাম পেস্তা ইত্যাদি মেওয়া (সিদ্ধির সঙ্গে বেটে দেওয়া হবে) এবং একটি পিতলের বালতিতে দুগ্ধ। এত অধিক পরিমাণে সিদ্ধি প্রস্তুতের উদ্দেশ্য অভিনেতারা সকলেই একটু আধটু চাখবে, অবশ্য নলিনাক্ষর কড়া নজর আছে কেউ না মাত্রা অধিক করে ফেলে।

মহাদেব বোধ করি চোখ বুঁজে ভাবছিলেন ব্যাটা রতনা (ভৃঙ্গী) সিদ্ধি তৈরী করতে এত দেরী করছে কেন? এখন একবার খাওয়া হবে বলে বিকেল বেলার প্রাত্যহিক সিদ্ধিপান আজ বাদ গেছে, পাছে ডবল খেয়ে বেসামাল হতে হয়। এমন সময় নন্দী এসে দাঁড়াল, পদশব্দে মহাদেব চোখ খুলে প্রশ্ন করলেন, "কি সংবাদ নন্দী?"

নন্দীর কথা বলতে গেলেই বাক্যের আদির তৃতীয়-বর্ণগুলি প্রায়ই সেই বর্গের প্রথম বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তার উপর উচ্চারণে একটু জোর দিতে গেলেই সেটা আবার দ্বিত্ব হয়ে যায়। সে জবাব দিলে, "প্রভু! ত্তেবতারা সব নন্দন-ময়দানে এসে জড়ো হয়েছেন, অসুরদের প্রর্ত্তমান আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা হবে, সভা আরম্ভ হতে ত্তেরী নেই; ত্তেবরাজ আপনাকে যেতে সংবাদ পাঠিয়েছেন।"

মহাদেব আজ্ঞা দিলেন, "আচ্ছা যা, ষণ্ড সজ্জিত করে নিয়ে আয়" (নন্দীর প্রস্থান)। ভৃঙ্গীর দিকে ফিরে বললেন, "কিরে বাপু তোর সিদ্ধির কতদূর? একটু তাড়াতাড়ি কর আমাকে এখনই এই সভায় যেতে হবে।"

ভৃঙ্গী 'আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু হয়ে গেছে' বলে কমণ্ডলুতে করে সিদ্ধি এনে বড় এক পাথরবাটী ভরে মহাদেবকে দিল। মহাদেব সবটুকু পান করে মনে মনে ভাবতে লাগলেন, রতনা ব্যাটা মালটা বড় খাসা বানিয়েছে আর এক বাটী হ'লে মন্দ হ'ত না। কিন্তু নলিনাক্ষর নিষেধ; যাকৃগে! প্রকাশ্যে ভৃঙ্গীকে উদ্দেশ করে বললেন, "তামাক।"

"যাই প্রভু" বলিয়া বড় তামাক আনিবার উদ্দেশ্যে ভৃঙ্গীর বহির্গমন।

এদিকে ষণ্ডটিকে সর্ব্বাঙ্গে গিরিমাটির ছাপ ও ঘুমুর ঘণ্টা ইত্যাদি দিয়ে খুব জাঁক-জমকের সহিত সজ্জিত করা হয়েছে, একখানি দামী বেনারসী সাড়ী ভাঁজ করে পিঠের উপর পেতে হয়েছে আসন এবং শিং দুটি সোনালী রাংতায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ অভিনয় হলেও সকলে ত আর মহাদেবকে দেখবে না, দেখবে নিধু চাটুয্যেকে, কাজেই তাঁর ষাঁড়ের সাজ-পোষাকেও যেন জমিদারীর আভিজাত্য বজায় থাকে। সুতরাং দেখলে কালীঘাটের শিবদুর্গার পটে আঁকা ষণ্ডের ছবি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট বলে মনে হয় না।

স্টেজের পিছনে ষণ্ডের মালিক চাষীর দুই ছেলে দড়ি ধরে দাঁড়িয়েছিল; মহাদেবের হুকুম পেয়ে নন্দী ষণ্ড আনতে গেল। কিন্তু নন্দীর সাজসজ্জা এবং স্টেজের জাঁকজমক দেখে ষণ্ডবর একটু ভয় পেয়েছে বলে মনে হ'ল। সে কিছুতেই স্টেজের মধ্যে আসতে চায় না; ওরা গলার দড়ি ধরে যত টানে সে শরীরের সমস্ত ভারটা পিছন দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে তত বসবার চেষ্টা করে। কে একজন লেজ মুলতে যাচ্ছিল, চাষীপুত্রেরা দেখতে পেয়ে হাঁ হাঁ করে উঠল।

—লেজে হাত দেবেন না মশায়, তাহ'লে "শনে"কে (ষণ্ডের নাম) এখানে রাখবে কার বাপে।

ম্যানেজার নলিনাক্ষ বললে, "ওরে গরুতে বড় বাঁশ-পাতা ভালবাসে, এক গোছা বাঁশপাতা এনে সামনে ধর সুড় সুড় করে এগিয়ে আসবে।"

বাঁশপাতা এল, নন্দী হাতে নিয়ে ষাঁড়ের মুখের কাছে নাড়তেও লাগল, কিন্তু আজ ওর ওসবে ভ্রূক্ষেপ নেই। এদিকে অপেক্ষা করতে করতে মহাদেব ও দর্শকরা অধীর হয়ে উঠছে; টানা-হেঁচড়ার শব্দ যতই কানে যাচ্ছে নিধু চাটুয্যের উৎকণ্ঠা ততই বাড়ছে। শেষ পর্য্যন্ত নন্দীর টানাটানি এবং চাষীপুত্রদের ঠেলাঠেলিতে কোনমতে ষাঁড়কে স্টেজে তোলা হ'ল, নলিনাক্ষ নন্দীর কানে কানে কি বলে দিলে।

কিন্তু এত আলোক-সজ্জিত আসর, লোকজন এবং সবার উপর মহাদেবের অদ্ভুত পোষাক ও তৎসহ কৃত্রিম সর্প ইত্যাদি দেখে ষাঁড় রীতিমত ঘাবড়ে গেল। কেবলই চং মং করে এদিক-ওদিক চায় ও শিরদাঁড়া ধনুকের মত নীচু দিকে বাঁকিয়ে ক্রমাগত দড়িতে টান দিতে থাকে;

নন্দী প্রাণপণে গলার দড়ি ধরে আছে; প্রম্প্‌টার-এর ইঙ্গিত পেয়ে বললে, "প্রভু ষণ্ড প্রস্তুত।"

ব্যাপার দেখে চাটুয্যের আরোহণ করতে মোটেই সাহস হচ্ছে না, স্টেজের পাশে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন যেন কোন কিছু খুঁজছেন। এদিকে দর্শকরা কৌতূহলে অধীর হয়ে পড়েছে; আসরে একটা চাপা গোলমালও উঠতে সুরু হয়েছে। নলিনাক্ষ পাশ থেকে ফিস্ ফিস্ করে বললে, "চাটুয্যেমশায় আর দেরী করবেন না, শুধু একবার চড়ে উইংস্-এর ধার পর্য্যন্ত আসুন, আমরা রেডি আছি নামিয়ে নেব, কোন ভয় নাই।"

অগত্যা মহাদেব ষাঁড়ের দিকে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু পিঠে হাত দিয়ে চড়বার চেষ্টা করতেই সে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। হায়রে! নলিনাক্ষর এমন অরিজিন্যাল প্ল্যানটা বুঝি ষাঁড়ের বোকামীতে মাঠে মারা যায়। সে বললে, "চাটুয্যে মশায় ভয় পাবেন না। কলকাতা থেকে সব বড় বড় লোকেরা এসেছে, তাদের কাছে আপনার সম্মান যেন বজায় থাকে। আচ্ছা আমি ব্যবস্থা করছি।"

বলে পার্শ্বে দণ্ডায়মান চাষীপুত্রদ্বয়কে যথারীতি উপদেশ দিয়ে স্টেজে পাঠিয়ে দিলে। তারা দুজনে এসে ষণ্ডের দু-পাশে দাঁড়াল।

তাদের সাহায্যে মহাদেব কোন রকমে চড়ে বসেছেন; কিন্তু নন্দী ও ষণ্ডের মধ্যে রীতিমত দ্বন্দ্বযুদ্ধ বেঁধে গেছে। চাটুয্যের সবে সিদ্ধির মৌতাত আসছিল, এখন মৌতাত ছুটে গিয়ে কান ভোঁ ভোঁ করতে আরম্ভ ক'রেছে। ষাঁড়ের গলার দড়িটা দু-হাতে শক্ত করে ধরে আড়চোখে নন্দীর দিকে চেয়ে চাপা গলায় বললেন, "এই সতে বেশ ভাল করে ধরে থাকিস।"

সহিসের কর্ত্তব্যমত ষাঁড়কে ঠাণ্ডা করবার উদ্দেশ্যে নন্দী "আরে হো হো ব্যাটা!" বলে তার ঘাড়ে দুই থাপ্পড় বসিয়ে দিল।

কিন্তু এতেই হ'ল বিপরীত। ষণ্ডবর আর সংযত থাকতে পারলে না, ঝট্ করে ডান দিকে ঘুরেই এক লম্ফ। প্রথম নম্বর মহাদেবের আসন, সিদ্ধির সরঞ্জাম, গাঁজার কলিকা ইত্যাদি ছত্রভঙ্গ করে পিছনের তিনখানি সিন ও একখানি উইং-এর দফারফা করে চাটুয্যেকে পিঠে নিয়েই একেবারে স্টেজের বাইরে। নন্দীর হাতে গলার লাগাম শক্ত করে ধরা ছিল; ঝট্‌কার চোটে ছিট্‌কে গিয়ে সে পড়ল কনসার্ট পার্টির সেই বড় বেহালাটার উপর যেটা একখানা চেয়ারের উপর রেখে বাজান হয়।

লোকজন নিকটেই ছিল, চাটুয্যেকে ধরে তুলে ফেললে। হাঁটু কনুই ইত্যাদি স্থানেস্থানে একটু থেঁতলে যাওয়া ছাড়া চোট বিশেষ লাগে নি।

এদিকে আসরে মহা গণ্ডগোল, লোকজন সব উঠে যায়; দেবরাজের বেশে সজ্জিত অবস্থাতেই বেরিয়ে এসে নলিনাক্ষ জোড়হাত করে সকলকে শান্ত হবার অনুরোধ করে পুনরায় প্লে হবার সম্ভাবনা জানালে।

এদিকে ক্ষতস্থানে আইডিন প্রলেপের জ্বালায় চাটুয্যে অস্থির; নলিনাক্ষ পুনরায় অভিনয়ের প্রস্তাব জানাতে তিনি সরাসরি অস্বীকার করে বসলেন।

অনেক অনুরোধ উপরোধ, বিশেষতঃ তাঁর কলকাতার বন্ধুদের দোহাই এবং তিনিই সভাপতি ও নিমন্ত্রণকর্ত্তা, সুতরাং লোকে বিফল মনে ফিরে গেলে তাঁরই অপযশ; "আমাদের আর কে চেনে" ইত্যাদি বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শনের পর এবং বাকি দৃশ্যগুলি যাতে তিনি আসনে বসে বসেই অভিনয় করতে পারেন সে ব্যবস্থা করবার আশ্বাস দেওয়ায় রাজী হলেন। গ্রীণরুমে ফিরে এসে সতেকে দেখেই তিনি মহা খাপ্পা হয়ে বললেন, "হারামজাদা, তুই থাপ্পড় দিতে গেলি কেন? কাল তোকে দেখাব মজা।"

যাই হোক লোকজন ডেকে প্লে সেদিন পুনরায় হ'ল বটে, তবে কনসার্ট পার্টির সেই বড় বেহালাটা আর বাজল না এবং দু-এক দৃশ্য পরে নন্দীকেও আর খুঁজে পাওয়া গেল না; অগত্যা তার স্থানে প্রক্সি দিয়ে চালাতে হ'ল। বলা বাহুল্য নলিনাক্ষর ন্যাচারাল প্লের পেটেণ্ট নেবার আশাও নির্ম্মূল হ'ল।

সিঙ্গাপুর

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল

সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আজ সিঙ্গাপুরের প্রতি নিবদ্ধ। মালয়ের মূল ভূ-খণ্ড জাপান সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে সমর্থ হওয়ায় সিঙ্গাপুরের উপর প্রচণ্ড জাপ-আক্রমণ সুরু হইয়াছে। সুদূর প্রাচীর যুদ্ধ প্রকৃত পক্ষে সিঙ্গাপুরের যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরের সামরিক গুরুত্ব লাভ খুব বেশী দিনের কথা নয়। একশত বাইশ বৎসর পূর্ব্বে ১৮১৯ সালে জহোরের সুলতান যখন সিঙ্গাপুর দ্বীপটি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে স্যার ষ্ট্যামফোর্ড রাফ্লেসের হস্তে অর্পণ করেন, তখন সিঙ্গাপুর যে এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব লাভ করিবে তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রাচীতে বৃটিশ অধিকার তখন সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, স্যার ষ্ট্যামফোর্ড রাফ্লেসের দূরদৃষ্টিতে সিঙ্গাপুরের গুরুত্ব এড়াইতে পারে নাই। জহোরের সুলতানের নিকট হইতে সিঙ্গাপুর ক্রয় করিয়া উহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গভুক্ত করিবার সময়ই তিনি বলিয়াছিলেন,

"It gives us the command of China and Japan, with Siam and Cambodia, to say nothing of the (East Indian) islands."

ইহা (সিঙ্গাপুর) আমাদিগকে শ্যাম এবং কাম্বোডিয়া সহ চীন এবং জাপানের উপর ক্ষমতা বিস্তারের অধিকার প্রদান করিয়াছে। পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কথা বলাই বাহুল্য।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সিঙ্গাপুরের গুরুত্ব কোন সময়েই উপেক্ষা না করিলেও বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতেই ইহার আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবহিত হন এবং সিঙ্গাপুরকে প্রাচীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৌঘাঁটি করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

সিঙ্গাপুরের প্রাচীন ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। বিংশ শতাব্দীর উন্নত যুগেও সিঙ্গাপুরের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ করা অসম্ভব। যাহা হইতে ইতিহাস রচিত হইবে সিঙ্গাপুরের সেই পুরাতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইবে কোথায়? সিঙ্গাপুরের অতীত ইতিহাস এখনও বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত। সম্বল একমাত্র পৌরাণিক কাহিনী। প্রচলিত কাহিনীগুলি গবেষণার কষ্টি-পাথরে কষিয়া সিঙ্গাপুরের অতীত ইতিহাস রচনা করিবার চেষ্টা হইয়াছে বলিয়াও জানা যায় না। অনেকে মনে করেন 'সিঙ্গাপুর' নামটি 'সিংহপুর' শব্দের অপভ্রংশ। প্রাচীন ভারতের পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী বিশাল কলিঙ্গ সাম্রাজ্যেরও প্রাচীন রাজধানীর নাম ছিল সিংহপুর। খৃষ্টজন্মের অন্ততঃ আটশত বৎসর পূর্ব্বে এই সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, সুতরাং কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের গৌরবময় দিনে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা অন্যায় হয় না। মিসেস্ ই, ডি ডেভিস ১৯৪০ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় "Singapore's Dim Past" শীর্ষক প্রবন্ধে এসম্পর্কে বলিয়াছেন, "সিঙ্গাপুর এবং মালয় ভারতের পূর্ব্ব-উপকূলবর্ত্তী অধিবাসীদিগকে সাধারণতঃ "আরাং ক্লিং" বলা হয়। যদিও এই শব্দটি ঘৃণাসূচক অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তথাপি উহা ভারতীয়দের উপনিবেশ স্থাপনের গৌরবময় ইতিহাসের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।"

সিঙ্গাপুর প্রতিষ্ঠার পৌরাণিক কাহিনী পূর্ব্বভারতের জনৈক প্রতাপশালী রাজা রাজেন্দ্র চোলের নামের সহিত সংসৃষ্ট। সিঙ্গাপুর বা সিংহপুর নাম হইবার পূর্ব্বে উহা 'তুসামিকে' নামে পরিচিত ছিল। তিনি নাকি চীন আক্রমণের ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহার করিবার জন্য ঐ দ্বীপটি অধিকার করেন। ইহা অবশ্য পৌরাণিক কাহিনী। তথাপি এই কাহিনী হইতে অনুমান করা বোধ হয় অন্যায় হইবে

না যে, সিঙ্গাপুরকে নৌঘাঁটি করিবার কল্পনা শুধু উনবিংশ এবং বিংশশতাব্দীতেই প্রথম হয় নাই, সহস্র সহস্র পূর্ব্বেও সিঙ্গাপুর নৌঘাঁটি হইবার উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। মালয়ে প্রচলিত কিম্বদন্তী হইতে জানা যায়, সিঙ্গাপুর বহুবার রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীর সহিত সহস্র বৎসরের সঞ্চিত কল্পনারাশি ভেদ করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সিঙ্গাপুরের মাটি লাল আভাযুক্ত। মালয়ে প্রচলিত প্রবাদ এই যে, বহুশতাব্দী পূর্ব্বে এই দ্বীপে যে প্রবল রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে সিঙ্গাপুরের মাটি লাল হইয়াছে।

সিঙ্গাপুরের বিস্মৃত অতীত সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিবার স্থলাভাব। বৃটিশের হাতে আসিবার পর হইতে সিঙ্গাপুর আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি লাভ করিলেও গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জাহাজের নাবিক ছাড়া আর কাহারও সহিত সিঙ্গাপুরের বড় বিশেষ পরিচয় ছিল না। যেটুকু পরিচয় ছিল তাহা শুধু রোমাঞ্চকর উপন্যাস এবং ছায়াচিত্রের ভিতর দিয়া। সিঙ্গাপুর সমগ্র পৃথিবীতে উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের পটভূমিকার উৎস রূপেই অনেক দিন পর্য্যন্ত সকলের নিকট পরিচিত ছিল। সিঙ্গাপুর এখনও তাহার সেই রোমান্টিক রূপ হারায় নাই বটে, প্রাচীর প্রভৃত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সিঙ্গাপুর এখনও কবি ও শিল্পীর চক্ষে স্বপ্নজাল রচনা করিতে সমর্থ বটে, কিন্তু ধনতন্ত্রের আবির্ভাব সিঙ্গাপুরকে প্রথমে প্রদান করে বাণিজ্যিক গুরুত্ব, তারপর মালয় এবং পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতি সম্পদ-সঞ্চয় অহরণের সুবিধার জন্য প্রদান করিয়াছে সামরিক গুরুত্ব। ১৯২৪ সালের ১৮ই মার্চ্চ পার্লামেণ্টে সিঙ্গাপুরের সামরিক গুরুত্ব বর্ণনা করিতে যাইয়া ফার্ষ্ট লর্ড অব এডমিরাল্টি বলিয়াছিলেন,

"Singapore is essentially in British part of the world. It is actually the point of one of the richest and most progressive parts of the Empire. It is the key to the Indian Ocean, round which lies three quarters of the land territory of the Empire. The great Southern Dominions, India and our East African possessions lie round that ocean. Three quarters of population of the Empire is around it also. We have not a single base in all that vast ocean in which a modern ship could be filled or repaired···There passes through the ocean every year something like £1000,000. worth of our traffic and great deal of other traffic belonging to the rest of the Empire."

'পৃথিবীর বৃটিশ অধিকৃত অংশেই সিঙ্গাপুর অবস্থিত। ইহা সাম্রাজ্যের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী এবং উন্নতিশীল অংশে অবস্থিত। ভারত মহাসাগরের প্রবেশের চাবিকাঠিই হইল সিঙ্গাপুর এবং এই ভারত মহাসাগরের চতুর্দ্দিকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের তিন-চতুর্থ ভূ-ভাগ অবস্থিত। দক্ষিণ-দিকস্থ বৃহৎ ডোমিনিয়নগুলি, ভারতবর্ষ এবং পূর্ব্ব-আফ্রিকায়' আমাদের অধিকৃত অঞ্চলসমূহ ভারত মহাসাগরের উপকূলেই অবস্থিত। এই মহাসাগরের চারিদিকেই সাম্রাজ্যের তিন-চতুর্থ সংখ্যক লোকের বাস। এই মহাসাগরের এমন কোন ঘাঁটি আমাদের নাই যেখানে আধুনিক জাহাজ সংযেজিত এবং মেরামত করা যাইতে পারে। প্রতি বৎসর এই মহাসাগর দিয়াই আমাদের ১০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের বাণিজ্য-সম্ভার চলাচল করে, সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট অংশের বাণিজ্য সম্ভারেরও চলাচলের পথও ইহাই।

সিঙ্গাপুরকে সুদৃঢ় করিবার পরিকল্পনা গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদদের মনে উদিত হয় নাই। মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে এডমিরাল জেলিকো সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া সুয়েজ খালের পূর্ব্বাঞ্চলের সমুদ্রে বৃটিশ নৌবহর গড়িয়া তোলা, নৌবহরকে স্বাধীন ভাবে বিচরণের সুবিধা প্রদান এবং সিঙ্গাপুরকে সুদৃঢ় করিবার জন্য সুপারিশ করেন। ১৯২১ সালের সাম্রাজ্য-সম্মেলনে তাঁহারই সুপারিশ গৃহীত হইয়া সিঙ্গাপুরকে সুদৃঢ় করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সিঙ্গাপুরে বৃহৎ নৌঘাঁটি ও ডক্-ইয়ার্ড প্রতিষ্ঠার জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্ট ১৯২১ সালে ১০,৫০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় মঞ্জুর করেন। পরে উহা কমাইয়া ৭,৭০০,০০০ পাউণ্ড করা হয়। সিঙ্গাপুরে নৌঘাঁটি

নির্ম্মাণ সম্বন্ধে সকল বৃটিশ-রাষ্ট্র-নীতিবিদ্ একমত হইতে পারেন নাই। কেহ কেহ সিঙ্গাপুরের জন্য অর্থ ব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেন। কেহ কেহ আবার সিঙ্গাপুরকে সুদৃঢ় করিলে জাপান অসন্তুষ্ট হইবে এই ভাবিয়া উহা সমর্থন করেন নাই। জাপান যে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল তাহা ঠিকই, কিন্তু তাহাতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম হয় নাই। গত আঠার বৎসরের চেষ্টায় সিঙ্গাপুরকে সুদৃঢ় করা হইয়াছে।

সিঙ্গাপুরে বৃহত্তম ডক্ দুইটি, একটি কিং জর্জ্জ দি সিক্সথ্ ডক এবং অপরটি ভাসমান ডক। এই ভাসমান ডকই সিঙ্গাপুরের ডক দি নাইন্থ নামে অভিহিত। ইহা পৃথিবীতে তৃতীয় বৃহত্তম ভাসমান ডক। মাল্টা এবং সাউদামটনের ভাসমান ডকের পরেই উহার স্থান। এই ডক ইংলণ্ডে নির্ম্মাণ করাইয়া ১৯২৮ সালে গুটান অবস্থায় সিঙ্গাপুরে আনিয়া যথাস্থানে স্থাপিত করা হয়। কিং জর্জ্জ দি সিকস্থের ডকের উদ্বোধন হয় দুই বৎসর পূর্ব্বে। এই ডকে পৃথিবীর যে কোন বৃহত্তম জাহাজ মেরামত ও সংযোজন করা চলে। ভাসমান ডকটি পাঁচ হাজার টন ওজনের জিনিষ লইয়া ভাসিয়া থাকিতে পারে, অর্থাৎ যে কোন যুদ্ধ জাহাজকেই উহার সর্ব্বপ্রকার সাজ-সরঞ্জাম সহ বক্ষে ধারণ করিতে সক্ষম। কোন জাহাজ এই ডকে তুলিতে হইলে উহা জলে নিমজ্জিত করা হয় এবং জাহাজ বক্ষে ধারণ করিয়া ভাসিয়া উঠে।

সিঙ্গাপুরে এক সময়ে ম্যালেরিয়া জ্বরের খুব প্রাবল্য ছিল। আজ বোম্বাই হইতে সাংহাই পর্য্যন্ত সমস্ত সামুদ্রিক বন্দরের মধ্যে সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। সিঙ্গাপুর দ্বীপের দৈর্ঘ্য ২৭ মাইল, প্রস্থ ১৪ মাইল। এই দ্বীপের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ছয় লক্ষ। তন্মধ্যে ৪৯০১৫৫ লোক সিঙ্গাপুর সহরে বাস করে। অধিবাসীদের মধ্যে চীনাদের সংখ্যাই বেশী—প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। চীনাদের পরই ভারতীয়দের সংখ্যা। ভারতীয়দের সংখ্যা ৪৭ হাজার ৪০২ জন এবং মালয়জাতীয় অধিবাসীর সংখ্যা ৪৫ হাজার ৭৭ জন। ইউরোপীয়দের সংখ্যা ৮৩৩৮ জন। ইউরো-এসিয় ৭১৫১ জন।

সিঙ্গাপুরকে সাত সমুদ্রের মিলনস্থল বলিলে ভুল বলা হয় না। দুইটি বিখ্যাত বাণিজ্য-পথের সংযোগ হইয়াছে সিঙ্গাপুরে। পূর্ব্ব এসিয়ার সহিত ভারতবর্ষ এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের বাণিজ্যপথ সিঙ্গাপুরে মিলিত হইয়াছে। সিঙ্গাপুরের মত স্বাভাবিক পোতাশ্রয় পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। সিঙ্গাপুর সহরের কাছেই অসামরিক বিমান অবতরণের স্থান। সহর হইতে বার মাইল দূরে সর্ব্বোত্তরে জোহর প্রণালীর উপরে সিঙ্গাপুরের নৌঘাঁটি অবস্থিত। অসামরিক বিমান ষ্টেশন এবং নৌঘাঁটির মাঝামাঝি সামরিক বিমান ঘাটি। সিঙ্গাপুরের অস্ত্রাগার ও সঞ্চিত তৈলাধার ভূগর্ভে নির্ম্মিত হইয়াছে। রক্ষা-ব্যবস্থার দিক হইতে ইহা জিব্রাল্টার অপেক্ষা সুদৃঢ় বলিয়া কথিত। জাপ-আক্রমণে এই সিঙ্গাপুর আজ বিপন্ন। ইহার পরিণাম কি কে জানে?



বাহাই ধর্ম্ম

মোহাম্মদ ইমান উদ্দীন

বাহাই ধর্ম্মের সহিত এদেশের লোকের পরিচয় অতি সামান্যই। বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্যের দিনে অসংখ্য ধর্ম্মপ্লাবিত পৃথিবীতে কোন ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত ভাবধারার প্রতি মানুষের আগ্রহ আজকাল আর তেমন দেখা যায় না। কিন্তু বাহাই ধর্ম্ম তাহার আধ্যাত্মিক ভাবধারাকে শুধু অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব ও মানুষের পারত্রিক কল্যাণ সাধনের মধ্যেই আবদ্ধ রাখে নাই, মানুষের ঐহিক তাহার রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজরীতি প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নতি ও পরিপুষ্টির জন্যও নিয়োজিত করিয়াছে। এই প্রবন্ধে বাহাই ধর্ম্মের যৎসামান্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইল।

প্রাচীনকাল হইতেই পৃথিবীর ইতিহাসে পারস্যের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। পারস্য বা ইরাণ পৃথিবীকে অনেক ধর্ম্মপ্রচারক ও দার্শনিক, অনেক বিখ্যাত নরপতি, অতুলনীয় বুদ্ধিসম্পন্ন রাষ্ট্রনীতিবিদ, বিশ্ববিখ্যাত কবি এবং নিপুণশিল্পী দান করিয়াছে। হাফিজ, ফিরদৌসী, সাদি, ওমরখৈয়াম প্রভৃতি ইরাণের অমর সন্তানগণ পৃথিবীতে ইরাণের অতুলনীয় মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। জোরোয়াষ্টার এইখানেই প্রসিদ্ধ জেন্দাবেস্তা রচনা করিয়াছিলেন। বাহাই ধর্ম্মের উৎপত্তি এই পারস্যেই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ধর্ম্মের যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য আমি আবির্ভূত হই। তাঁহার এই বাণী কোন দেশ বা কাল বিশেষের বিশেষত্ব নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সত্যদ্রষ্টাগণের মধ্যে এই মহতী বাণী যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়াছে। শুধু বাণীই আবির্ভূত হয় নাই, সমাজের গ্লানি দূর করিবার জন্য সত্যদ্রষ্টারও আবির্ভাব হইয়াছে। বাহাই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মীর্জ্জা হোসেন আলী সম্বন্ধেও একথা সত্য। ইনিই বাহাউল্লা অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রভা এই নামে জগতের সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছেন।

মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব যেমন প্রয়োজনীয় কালের অপেক্ষা করে, তেমনি তাঁহাদের প্রকাশও আকস্মিক ভাবে হয় না—আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বেই তাঁহাদের আগমন-বার্ত্তা ঘোষিত হয়। হজরত মুসা, ঈশা, মহম্মদ (দঃ) প্রভৃতি সমস্ত প্রেরিত পুরুষ সম্বন্ধেই একথা সত্য। বাহাউল্লার আবির্ভাবের পূর্ব্বেও তাঁহার আগমন-বার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছিল। বাহাউল্লার আবির্ভাবে উনবিংশ বৎসর পূর্ব্বে যে মহাপুরুষ তাঁহার আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সৈয়দ মীর্জ্জা আলী মোহাম্মদ। ইনিই পরে 'বা'ব' বা নবযুগের প্রবেশ পথ এই নাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর, হিজরী ১২৩৫ অব্দের পহেলা মোহরম পারস্যের প্রসিদ্ধ শিরাজ সহরে মীর্জ্জা আলী মোহাম্মদ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন সর্ব্বজন-পরিচিত সঙ্গতিসম্পন্ন বণিক ছিলেন। জন্মের কিছুদিন পরেই পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। পনর বৎসর বয়সে তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। যৌবনেই তিনি মধুর ব্যবহার, অনন্যসাধারণ চরিত্র-মাহাত্ম্য এবং ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি ঈশ্বরের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে অর্থাৎ হিজরী ১২৬০ অব্দের ৫ই জামাদিয়ল আউওয়াল 'সায়খি' সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিত মোল্লা হোসেন বুশরুই-এর নিকট আত্ম প্রকাশ করেন। ছয় বৎসর কাল তাঁহার মতবাদ প্রচারের পরে একত্রিশ বৎসর বয়সে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই 'বা'ব'কে হিংস্রধর্ম্মান্ধতার বেদীমূলে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। পারস্যের তৎকালীন প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান তেবরিজের সৈন্যাবাস-চত্বরে ঈশ্বরে নিবেদিত জীবন 'বা'ব' শহীদ হইলেন, তাঁহার আত্মোৎসর্গ বা'ব-ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে অভিনব অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করিল।

মহাপুরুষ বা'ব ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে যখন নিজেকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন, সেই সময় বাহাউল্লা ২৭ বৎসরের যুবক। বা'বের নূতন ধর্ম্ম তাঁহাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি উহার একজন বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতারূপে খ্যাতি লাভ করিলেন। পারশ্যের রাজধানী তেহরাণ নগরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বর মীর্জ্জা হোসেন আলি (পরে যিনি বাহাউল্লা নামে খ্যাত হইয়াছেন) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা উজীর ছিলেন। দেশে তাঁহাদের পরিবারের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এই পরিবারের বহু ব্যক্তিই রাজ-সরকারের উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন। বাল্যকাল হইতে বাহাউল্লার অসামান্য প্রতিভার স্ফুরণ দেখা গিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃপদ গ্রহণের জন্য পারশ্যের রাজ-সরকার হইতে তাঁহার আহ্বান আসিয়াছিল। কিন্তু বাহাউল্লা তাহা গ্রহণ করেন নাই।

বহু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হজরত বাহাউল্লা এবং তাঁহার অনুগামীদের বিরুদ্ধে সমবেত হইয়াছিল। তেহারাণে তিনি এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ বন্দী হইলেন, তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত নাগরিক অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল। তাঁহাদের বিরুদ্ধে পারশ্যের শাহের প্রাণনাশের চেষ্টায় অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। কিন্তু শাহের প্রাণনাশের চেষ্টার সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব ছিল না, তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইলে প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে মেসোপোটামিয়ার ইরাকে-আরব স্থানে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিবার আদেশ দেওয়া হইল। তিনি তাঁহার পরিবার ও শিষ্যবর্গ সহ নির্ব্বাসন-স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিন্তু বাগদাদ সহরে যখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহারা কপর্দ্দকশূন্য। এইখানে তিনি কিছুদিন অবস্থান করিলেন। অতঃপর পারশ্য রাজ-সরকারের অনুরোধে তুর্কী-সরকার তাঁহাকে কনষ্টান্টিনোপলে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। কনষ্টান্টিনোপলে পৌঁছিবার কিছুদিন পরে তাঁহার প্রতি আদ্রিয়ানোপলে যাওয়ার আদেশ হইল। এখানে তিনি এবং তাঁহার অনুগামিগণ কিঞ্চিদধিক সাড়ে চারি বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানেও তিনি তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন। বা'বী ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রায় সকলেই হজরত বাহাউল্লার অবতারত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, কেবল অল্পসংখ্যক তাঁহাকে স্বীকার করেন নাই। যাঁহারা তাঁহাকে মানিলেন তাঁহারা সকলেই এই সময় হইতে বাহাই নামে পরিচিত হইলেন। হজরত বাহাউল্লার পক্ষে এখানেও আর থাকা সম্ভব হইল না। তুর্কী সরকার তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুগামীদিগকে প্যালেষ্টাইনের আক্কা নামক স্থানে নির্ব্বাসিত করিলেন। এখানে একটি পুরাতন সেনানিবাসে তিনি এবং তাঁহার মতাবলম্বিগণ বন্দী হইয়া রহিলেন। এখানে তাঁহাদিগকে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। দুই বৎসর কাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করিবার পর মোহম্মদ শেখ নামক বাহাউল্লার জনৈক আক্কাবাসী ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ভক্ত সোলতান আবদুল আজিজের নিষেধ আজ্ঞা সত্ত্বেও তাঁহাকে নিজ প্রাসাদে লইয়া যান। আইনতঃ তখনও তিনি বন্দী। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে বন্দী অবস্থাতেই তিনি পরলোকগমন করেন।

বাহাউল্লার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্বাস এফেন্দি পিতার স্থলাভিষিক্ত হইয়া আবদুল বাহা নাম গ্রহণ করেন। আবদুল বাহা শব্দের অর্থ বাহার (প্রভু) ভৃত্য। তিনিও আক্কাতেই বন্দী অবস্থায় থাকিয়া বাহাই ধর্ম্মের মর্য্যাদা, গৌরব ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালে তুরস্কে যে নব্যতুর্কী আন্দোলনের অভ্যুদয় হয় সেই সময় তিনি মুক্তিলাভ করেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় তিনি হাইফা নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। বৃটিশ-বাহিনী হাইফাতে প্রবেশ করিলে আবদুল বাহার জনসেবা এবং উদারতা দর্শন করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে নাইট উপাধিতে বিভূষিত করেন। ১৯২১ সালের ২৫শে নবেম্বর তিনি মহাপ্রস্থান করেন। আবদুল বাহার পৌত্র শোঘী রব্বানী বর্ত্তমানে বাহাই ধর্ম্মের গুরু।

বাহাই ধর্ম্মের মূল শিক্ষা দ্বাদশটি :—(১) মানবজাতির একত্ব, (২) সত্যের স্বাধীন অনুসন্ধিৎসা, (৩) সমস্ত ধর্ম্মেরই মূলভিত্তি এক, (৪) ধর্ম্মকে অবশ্যই ঐক্যের ভিত্তি করিতে হইবে, (৫) বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের ঐক্য ও সহযোগিতা থাকিবে, (৬) স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে

সাম্য, (৭) সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারের উচ্ছেদ, (৮) বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা, (৯) শিক্ষা সার্ব্বজনীন ও ব্যাপকতম হইবে, (১০) জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার এমন সামঞ্জস্য করিতে হইবে যাহাতে পৃথিবী হইতে দারিদ্র্য বিদূরিত হয়, (১১) সার্ব্বজনীন ভাষার প্রতিষ্ঠা, (১২) আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা।

বর্ত্তমান যুগ মানব-জাতির একত্বের যুগ, জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানব-সমাজ আজ একত্বের পথে অগ্রসর হইতেছে। হজরত বাহাউল্লা এই একত্বের বাণী প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমার দেশকে আমি ভালবাসি, ইহা বলিয়া যেন কোন ব্যক্তি অহঙ্কার না করে। মানব-জাতিকে ভালবাসাই একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহাতেই উল্লসিত হওয়া উচিত।

সত্যের সন্ধান কিরূপে করিতে হইবে তাহার যে পথ বাহাই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞানীর পথ,—প্রত্যেক বিজ্ঞানীই তাঁহার পরীক্ষাগারে এই পথেই বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান করিয়া থাকেন। আবদুল বাহা বলিয়াছেন, "সত্যান্বেষণ করিতে হইলে আমাদের সমস্ত কুসংস্কার, আমাদের সমস্ত ছোটখাটো অকিঞ্চিৎকর ধারণা পরিত্যাগ করিতে হইবে। উন্মুক্ত স্বাধীন মনোবৃত্তি সত্যানুসন্ধানের জন্য একান্ত প্রয়োজন।" বস্তুতঃ আমরা যদি আমাদের পূর্ব্বপুরুষের বিশ্বাস ও ভাবধারাকে অন্ধ ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকি, তাহা হ'লে সত্যের সন্ধান কোন দিনই আমরা পাইব না। সত্যানুসন্ধানের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আবদুল বাহা বলিয়াছেন, "আমরা এ যাবৎ যাহা কিছু শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সমস্তই আমাদের অন্তর হইতে অপসারিত করিতে হইবে, কেন না সত্যের পথে তাহা আমাদের অগ্রগতির পরিপন্থী।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "তোমরা উপলব্ধি করিবে, যদি সত্যের স্বর্গীয় আলোক যীশুখৃষ্টে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা হজরত মুসা ও বুদ্ধদেবেও দীপ্তিমান হইছিল। ইহাই সত্যান্বেষণের তাৎপর্য্য।"

• সমস্ত ধর্ম্মের ভিত্তিই এক, ইহাই বাহাই ধর্ম্মের শিক্ষা। বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধ সৃষ্টি কখনও প্রকৃত ধর্ম্মের কারণে হয় নাই। বরং প্রকৃত ধর্ম্মের অভাবই ইহার কারণ। আবদুল বাহা বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম যদি বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং বিরোধের কারণ, তাহা হইলে এই ধর্ম্ম থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল এবং তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকাই প্রকৃত ধর্ম্ম কার্য্য হইবে।"

বাহাই ধর্ম্ম ধর্ম্মকেই মানব-জাতির ঐক্যের ভিত্তি করিবার উপদেশ দিয়াছে। বিদ্বেষ এবং ঘৃণা ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্ম নিপীড়ন ও অন্যায় নয়। আবদুল বাহা বলিয়াছেন, 'ধর্ম্মই সমস্ত হৃদয়কে একত্র সম্মিলিত করিবে এবং ধরাপৃষ্ঠ হইতে যুদ্ধবিগ্রহকে চিরতরে বিতাড়িত করিবে। ধর্ম্ম আধ্যাত্মিকতার জন্মদান করিবে এবং প্রত্যেক আত্মায় আলোক ও জীবন সঞ্চারিত করিবে।"

ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের একটা বিরোধ আছে বলিয়া অনেকের ধারণা। এই ধারণা ভ্রান্ত নয়, কিন্তু ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধিতার মূল কারণ ভ্রান্তি। হজরত মোহাম্মদের জামাতা হজরত আলী বলিয়াছিলেন, "বিজ্ঞানের সহিত যাহার সঙ্গতি আছে, বুঝিতে হইবে যে ধর্ম্মের সহিতও তাহার সঙ্গতি আছে।" বাহাই ধর্ম্মের শিক্ষা তাহাই। প্রকৃত বিজ্ঞানের সহিত প্রকৃত ধর্ম্মের সহযোগিতা থাকিবে। আবদুল বাহা বলিয়াছেন, "মানবের বুদ্ধিশক্তি দ্বারা যাহা বোধগম্য হয় না ধর্ম্মের দিক হইতেও তাহা স্বীকার করা উচিত নহে। ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান যুগ্ম বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চলিবে। বিজ্ঞানের পরিপন্থী ধর্ম্ম কখনও সত্য হইতে পারে না।"

নারীর অধিকার সম্পর্কে বাহাই ধর্ম্মের যে শিক্ষা তাহা সাম্যবাদের শিক্ষারই অনুরূপ। বাহাই ধর্ম্মের প্রধান উপদেশাবলীর মধ্যে নারী পুরুষের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইবে, শিক্ষা, অধিকার, সুযোগ সকল দিক দিয়াই সমান ও উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে, ইহা অন্যতম উপদেশ। বস্তুতঃ বাহাই ধর্ম্ম নারীজাতির জন্য নূতন আশার বাণী শুনাইয়াছে।

প্রত্যেক অবতার ঐক্যের বাণী লইয়াই জগতে আসিয়াছেন। সুতরাং জাতি ও বর্ণগত সমস্ত কুসংস্কার, স্বদেশিকতার কুসংস্কার, ধর্ম্মের কুসংস্কার, রাষ্ট্রের কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে বাহাই ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছে। সমস্ত কুসংস্কার বর্জ্জন করিলেই সমগ্র মানব-সমাজের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা

হইবে। বিশ্বশান্তি আজ সমগ্র বিশ্বের প্রধান সমস্যা। বাহাই ধর্ম্ম এই বিশ্বশান্তির বাণী প্রচার করিয়াছে। মহা-সমরের দুর্য্যোগের অবসানে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করাই মানুষের প্রধানতম কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইবে।

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যুগে যুগেই স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ব্যাপক ভাবে শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে বেশী দিনের কথা নয়। বাহাউল্লা বলিয়াছেন, "শিক্ষা সার্ব্বজনীন ও ব্যাপকতম হইবে। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দেওয়া বাধ্যতামূলক হইবে। পিতৃমাতৃহীন ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবে সমাজ।" ইহাই বাহাই ধর্ম্মের শিক্ষা।

অতীতে কোন মহাপুরুষই আর্থিক সমস্যার কথা চিন্তা করেন নাই। সমস্ত ধর্ম্মই অর্থনৈতিক সমস্যাকে ধর্ম্মজগতের বাহিরে স্থান দিয়াছে, কিন্তু বাহাই ধর্ম্মকে ইহার ব্যতিক্রম বলিতে হইবে। হজরত বাহাউল্লা তাঁহার উপদেশাবলীতে আর্থিক ব্যবস্থা সংস্কারের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। অপরিমিত ধনশালিতা এবং চরম দারিদ্র্য এই বিপুল বৈষম্য দূর করিবার জন্য বাহাই ধর্ম্মে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীতা স্বীকৃত হইয়াছে। আবদুল বাহা বলিতেছেন, "জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ করিতে হইবে যে, পৃথিবী হইতে দারিদ্র্য দূরীভূত হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের পদ ও মর্য্যাদা অনুসারে সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবে।"

হজরত বাহাউল্লা সার্ব্বজনীন ভাষা প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যতদিন একটি আন্ত-র্জ্জাতিক ভাষা পৃথিবীর জনসাধারণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত না হইতেছে, ততদিন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের জনগণের একত্র সম্মিলিত হইবার কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইবে না। আবদুল বাহা বলিয়াছেন, কোন এক জন ব্যক্তির পক্ষে সার্ব্বজনীন ভাষা সৃষ্টি করা অসম্ভব। সকল দেশের প্রতিনিধি লইয়া একটি সমিতি গঠন করিয়া এবং সর্ব্বদেশের ভাষা হইতে শব্দ আহরণ করিয়া সার্ব্ব-জনীন ভাষা সৃষ্টির উপদেশ তিনি দিয়াছেন। পোল্যাণ্ডের লুডেভিক জ্যামেন্‌হফ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত 'এস্‌পেরাণ্টো' ভাষার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বশান্তির জন্য আন্তর্জ্জা[illegible] মহাসভার প্রয়োজনীয়তাও বাহাই ধর্ম্মে স্বীকৃত [illegible]ছে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আবদুল বাহা আন্তর্জ্জাতিক [illegible]সভা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন। আবদুল বা[illegible] বলিয়াছেন, "এই সর্ব্বশক্তিমান্ সন্ধিপত্রের ভিত্তি এমন সুদৃঢ় করিতে হইবে যে, যদি কোন দেশ বা রাষ্ট্র ইহার একটি বাক্যও লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র মিলিত হইয়া তাহার শাস্তিবিধান করিবে।" 'আকদাস' গ্রন্থে বাহাউল্লা পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে আহ্বান করিয়া যাবতীয় প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধানের জন্য আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করিবার কথা বলিয়াছিলেন। ১৯০০ সালে হেগে আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয় এবং মহা যুদ্ধের পরে লীগ অব্ নেশানস্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যুগের ভাব-ধারার সহিত বাহাই ধর্ম্মের ঐক্য এইখানেই অনুভূত হয়।

হজরত বাহাউল্লা নূতন ধর্ম্ম উদ্ভাবন করেন নাই বা প্রচার করেন নাই, মানুষের অমৃতত্ব লাভের কোন নূতন পথ নির্দ্দেশ তিনি করেন নাই। যুগ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন দেশে এবং কালে মহাপুরুষ মানুষের অমৃতত্ব লা[illegible] যে চিরন্তন পথের সন্ধান দিয়াছেন তাহা যুগ-যুগা[illegible] সঞ্চিত কুসংস্কার, কল্পনা, ভুলভ্রান্তি, স্বার্থের সং[illegible]ষ প্রভৃতি আবর্জ্জনায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, চলার পথে প্রতিপদে আবর্জ্জনারাশিতে তাহার গতি প্রতিহত হইতেছে, তাহার পদস্খলন হইতেছে, আর মানুষ ভাবিতেছে সত্যিকার পথ বুঝি এ নয়। হজরত বাহাউল্লা 'সত্য-সুন্দর মঙ্গলে'র এই চিরন্তন পথের সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, মানুষ যাহাতে সহজে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত এই পথে চলিতে পারে সে সম্বন্ধে তাহাকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। এইখানেই বাহাই ধর্ম্মের বিশেষত্ব, নূতনত্ব যদি কিছু থাকে তবে তাহা এইখানেই। বস্তুতঃ বর্ত্তমান যুগের ভাবধারাই বাহাই ধর্ম্মের শিক্ষার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সঞ্চয়ন

মূক-বধিরের শিক্ষা

[১৩৪৮। পৌষ সংখ্যা 'বাংলার শিক্ষক' হইতে উদ্ধৃত]

মূক-বধিরদের যে কী কষ্ট ও কী গভীর দুঃখ ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহারা অতি ঘৃণিতভাবে পরের গলগ্রহ হইয়া জীবন যাপন করিতেছে।

সুখের বিষয় যে বৈজ্ঞানিকগণের অসীম কর্ম্ম-প্রচেষ্টার ফলে এই অসহায় মূক-বধিরদিগের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধুনা এই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বহু অসহায় মূক-বধির তাহাদের অভিশপ্ত জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিতে সক্ষম হইতেছে।

"বোবায় কথা কয়" একথা অনেকেই বিশ্বাস করেন না। কিন্তু অবিশ্বাস করিবার কোনই যুক্তিপূর্ণ হেতু নাই। মূকত্বের প্রধান এবং একমাত্র কারণ বধিরতা। শ্রবণ-শক্তির অভাবেই বধির মূক হয়। আমরা ভাষা লইয়া জন্মগ্রহণ করি না; ইহা জন্মিবার পর অনুকরণ দ্বারা আয়ত্ত করি। সুতরাং শৈশব হইতে যে ভাষা আমাদের অবিরত শ্রুতিগোচর হয় আমরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষার দ্বারাই আমাদের মনোগত ভাব, অভাব অভিযোগ ব্যক্ত করিতে অভ্যস্ত হই। এবং সেই ভাষাই মাতৃভাষারূপে গণ্য হয়। যে শিশু জন্মগত ভাবে অথবা জন্মের অব্যবহিত পরে কোন ব্যাধির জন্য বধির হয়, সে কথা শুনিতেও পায় না, শিখিতেও পারে না; বধিরত্বের ফলস্বরূপ মূকত্ব প্রাপ্ত হয়।

অনেকেরই বিশ্বাস যে মূক-বধিরদের বাক্‌যন্ত্র কোন অভাব বা বিকৃতির জন্য মূক হয়, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণই ভ্রান্ত ধারণা। ইহাদের বাক্‌যন্ত্র সাধারণের ন্যায়ই সুস্থ ও সবল।

বিজ্ঞানের সাহায্যে মূক-বধিরদিগকে কথা বলিতে ও অন্যের কথা বুঝিতে শিক্ষা দেওরা হয়। ইহাদের শ্রবণ-শক্তি নাই কিন্তু দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শশক্তি আমাদেরই মত বিদ্যমান। আমাদের শ্বাসযন্ত্রস্থ বায়ু কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া বাহির হইবার কালে তালু, জিহ্বা, কণ্ঠ, দন্ত, ওষ্ঠ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ব্যাহত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শব্দ উৎপন্ন করে। এই শব্দ উৎপন্ন হইবার কালে বক্ষে বা চিবুকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে একটি কম্পন অনুভূত হয়। সেই কম্পন স্পর্শ দ্বারা অনুভব করিয়া মূক-বধির নিজ বক্ষে বা চিবুকে ঐরূপ কম্পন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন শব্দের উচ্চারণ কালে মুখ, ঠোঁট ও জিহ্বার যে বিভিন্ন প্রকার রূপ হয় উহা দৃষ্টিশক্তির দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়। যেমন "পা" এই বর্ণ উচ্চারণ কালে আমাদের ওষ্ঠদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হয়। এবং বহির্গামী বায়ু দ্বারা ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া "পা" এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। আবার "কা" এই বর্ণ উচ্চারণ কালে জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ বক্র হইয়া উর্দ্ধদিকে উঠে এবং তালুর পশ্চাদভাগের সহিত সংযুক্ত হয়। বহির্গামী বায়ু জিহ্বা ও তালুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া "কা" বর্ণ উচ্চারিত করে। এইরূপে প্রত্যেকটি বর্ণের উচ্চারণ কালে আমাদের বাক্ যন্ত্রের যে প্রকার বিভিন্ন রূপ হয় উহা দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শের সাহায্যে মূক-বধিরদিগকে লক্ষ্য করিতে ও অনুকরণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। মূক-বধির উহা অনুকরণ করিয়া ক্রমশঃ কথা বলিতে শিক্ষা-লাভ করে।

আমরা শ্রবণশক্তি দ্বারা অন্যের কথা বুঝিয়া থাকি, বধিরগণ বক্তার ওষ্ঠ সঞ্চালন দেখিয়াই সমস্ত কথা বুঝিতে পারে। বক্তার কথা বলিবার সময় ওষ্ঠাধর ও মুখাবয়বের নানারূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। প্রায় প্রত্যেক বর্ণ উচ্চারণ করিতে মুখের আকার বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন 'পাতা' বলিতে বা 'টাকা বলিতে মুখের আকার

একরূপ হয় না। এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াই বধিরগণ অপরের কথা বুঝিতে সক্ষম হয়। ইহাকে "ওষ্ঠপাঠ" বলা হয়। শিক্ষার কৌশলে ক্রমে দৃষ্টি কুশলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। একজন শিক্ষিত বধির অনায়াসে সাধারণের বোধগম্য কথা কহিতে ও দৈনন্দিন জীবনের কথা বুঝিতে সমর্থ হয়।

মূক-বধিরের শিক্ষা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয় সাপেক্ষও বটে। সাধারণ ভাষার জ্ঞান দিতে প্রায় ১০ বৎসর কাল সময়ের প্রয়োজন হয়। ইহাদের ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ভবিষ্যৎ জীবনে ইহারা যাহাতে স্বাবলম্বী ও উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারে তজ্জন্য উপযুক্ত রকম শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হয়।

মূক-বধিরদিগের শিক্ষার জন্য বাঙ্গলায় প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মহানগরীতে। মুষ্টিমেয় নগণ্য কয়েকজন যুবক ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। হতভাগ্য মূক-বধিরদিগের নীরব মর্ম্মবেদনা ইহাদের হৃদয়ের অন্তস্থলে পৌছিয়াছিল। এই জনহিতকর মহদনুষ্ঠান তাহারই ফল। অধুনা ভারতের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষায়তন কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় ব্যতীত বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলায় আরও ১০টি মূক-বধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যালয়গুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

৩৫,০০০ হাজার মূক-বধিরের সংখ্যানুপাতে কোন বিদ্যালয়েই আশানুরূপ ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা পাইতেছে না। দেশের শিক্ষিত সহৃদয় ব্যক্তিগণ এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে এবং তাঁহাদের আন্তরিক সাহায্য ব্যতীত উন্নতির আশা করা যায় না। গভর্ণমেণ্ট, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিরও এ সম্বন্ধে বিশেষ কর্ত্তব্য আছে।

নিম্নে বিদ্যালয়গুলির নাম, ছাত্রসংখ্যা ও স্থানীয় মূক-বধিরের সংখ্যার তালিকা দেওয়া গেল—

স্থাপিত	বিদ্যালয়	ছাত্রসংখ্যা	বিদ্যালয়ে পড়িবার উপযুক্ত মূক-বধিরের সংখ্যা
১৮৯৩	কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়	২৩০	৫০০
১৯১১	বরিশাল ...	৩১	১৬৮৩
১৯১৬	ঢাকা ...	৩০	১১২৩
১৯২৩	চট্টগ্রাম ...	২২	১৪০০
১৯২৫	ময়মনসিংহ ...	১৫	৯৩০
১৯৩১	রাজসাহী ...	১৪	১০০০
১৯৩৪	মুর্শিদাবাদ ...	১২	৮২৪
১৯৩৪	খুলনা ...	৭	১০০০
১৯৩৬	বীরভূম ...	৮	৭২৯
১৯৩৯	বগুড়া ...	২০	৭৭৩
১৯৩৯	কুমিল্লা .	৮	১৫০০

(শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার)

বিভিন্ন দেশের পেট্রল উৎপাদন

[১৩৪৮। মাঘ সংখ্যা বণিক হইতে উদ্ধৃত]

পৃথিবীতে পেট্রলের আবিষ্কারের পর শতাধিক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ইহার পর ভূগহ্বরস্থিত এই তৈলকে নিঃশেষে আহরণ করিবার জন্য একাধারে যেমন নিত্যনূতন পন্থার উদ্ভাবন হইতেছে, অপর দিকে তৈল উৎপাদনের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কারের অনুপ্রেরণা মানুষের মনকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সময়কে তাহার মুঠার মধ্যে পুরিতে উদ্যত হইয়াছে। আধুনিক সংগ্রাম পরিচালনার প্রায় সকল স্তরে এবং অগণিত মোটর ও অসংখ্য কল-কারখানার জ আজ শুধু প্রয়োজন পেট্রলের। তাই নিবিড় বনানী ও দুর্গম পর্বতকে তুচ্ছ করিয়াও মানুষ আজ পেট্রলের খনি খুঁজিয়া বাহির করিতেছে।

ভূগহ্বর হইতে প্রকৃতিজাত যে তৈল পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক প্রথায় শোধনের পর তাহাই পেট্রল আখ্যা পায়। এই তৈল নিষ্কাশনের জন্য প্রথমতঃ কূপ খনন করা হয়। পরে এই সকল কূপে তৈল-নিষ্কাশনের যন্ত্র বসাইয়া গ্যাসের সাহায্যে চাপ সৃষ্টি করিয়া তৈল সংগ্রহ করা হয়। পেট্রলে ৮৪ ভাগ কার্বন এবং ১২ ভাগ হাইড্রোজেন থাকে। অপরিশুদ্ধ অবস্থায় পেট্রলের রং সাধারণতঃ হলদে, সবুজ, লাল, ধূসর অথবা কাল হয়। যে সকল অঞ্চলে অত্যধিক পরিমাণে পেট্রল মজুত থাকে, কূপ খনন করিবামাত্র ফোয়ারার ন্যায় তৈলের উৎস ঐ সকল স্থল হইতে নির্গত

হইতে দেখা যায়। তৈলখনি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে পারস্যের বিরাট প্রান্তরে ও পর্বতগাত্রে স্বচ্ছ তৈলের এইরূপ উৎস দেখা যাইত। প্রথমাবস্থা কাটিয়া যাইবার পর খনির তৈলের উৎস যখন মন্দীভূত হইয়া আসে, তখন পাম্পের সাহায্যে তৈল সংগ্রহ করা হয়। খনি হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, বিভিন্ন পন্থায় তাহাকে শোধন করা হয়। শোধনের এইরূপ একটি অবস্থায় যে তৈল পাওয়া যায়, তাহারই নাম কেরোসিন। আসাম ও ব্রহ্মের খনি হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহার বেশীর ভাগই কেরোসিনে রূপান্তরিত হয়। বিদেশের বাজারে এই তৈলের যথেষ্ট চাহিদা আছে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে আমেরিকায় পেট্রল উৎপাদন স্বরু হয়। ইহার পর যে দীর্ঘ অশীতি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মাত্র চারি বৎসর ব্যতিরেকে সকল সময়েই পেট্রল উৎপাদনে আমেরিকাই সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৮৯৮ হইতে ১৯০১ সাল পর্যন্ত চারি বৎসর রাশিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন পেট্রলের ৯০ ভাগ আমেরিকাতেই উৎপন্ন হয়। আমেরিকার বিভিন্ন খনিতে ৫ হাজারের অধিক কূপ হইতে পেট্রল সংগ্রহ করা হয়। কালিফোর্ণিয়া, কানসাস, ওকলাহামা এবং উত্তর টেক্সাসই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পেট্রল পাওয়া যায়।

উত্তর-আমেরিকার অন্যতম রাষ্ট্র মেক্সিকো পেট্রল উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে ৭ম স্থান অধিকার করিলেও তাহার উৎপন্ন তৈলের গুরুত্ব খুবই বেশী, কেননা বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন যে, অতিরিক্ত তৈল নিষ্কাশনের দরুণ এতদিন হয়ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের খনিসমূহের পেট্রল নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তখন পেট্রলের ব্যাপারে মেক্সিকোই হইবে আমেরিকার প্রধান ভরসাস্থল। উত্তর-আমেরিকার কানাডায় সামান্য পরিমাণে পেট্রল পাওয়া যায়। কানাডার অন্তর্গত নিউ ব্রান্সউইক, এলবার্টা ও বৃটিশ কলম্বিয়ায় পেট্রল খনির অস্তিত্ব রহিয়াছে। ১৮২৬ সালে কানাডার পেট্রল-খনি আবিষ্কৃত হইলেও উৎপাদনের পরিমাণ এ পর্যন্ত তেমনভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। দক্ষিণ-আমেরিকায় ভেনেজুয়েলা ও ত্রিনিদাদের পেট্রল উৎপাদন অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ভেনেজুয়েলার এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ত্রিনিদাদে পেট্রল নিষ্কাশন স্বরু হয়। উৎপাদনের দিক্ দিয়া ভেনেজুয়েলা বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ত্রিনিদাদ দ্বাদশ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইউরোপের মধ্যে পেট্রল উৎপাদনে রুশিয়াই সর্বাগ্রগণ্য। রুশিয়া শুধু ইউরোপে নহে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে পেট্রল উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, শুধু দ্বিতীয় স্থানই নহে, পেট্রল উৎপাদনে রুশিয়া পর পর চারি বৎসর আমেরিকাকে ছাড়াইয়া প্রথম স্থানও অধিকার করিয়াছিল। রুশিয়ার বাকু অঞ্চল যখন পারস্যের শাসনাধীন ছিল, তখন ১৮০৬ সালে এই অঞ্চলের বিখ্যাত খনিসমূহের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহার পর ক্রমে ক্রমে জর্জিয়া ও সমস্ত ককেসিয়া অঞ্চলে বহু বড় বড় খনি আবিষ্কৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে রুশিয়ার এই অঞ্চলটি তৈল খনিতে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। রুশিয়ার বিখ্যাত বাকু অঞ্চলের তৈল একটি দীর্ঘ পাইপ-লাইনযোগে কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী বাটুম বন্দরে যায়। এই বন্দর হইতে রেল-ও সমুদ্র-পথে বিভিন্ন স্থানে তৈল প্রেরিত হয়। ইউরোপে তৈল উৎপাদনে রুশিয়ার পরই রুমানিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। রুমানিয়ার কার্পেথিয়ান অঞ্চলের খনিসমূহে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে তৈল নিষ্কাশন চলিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে রুমানিয়ার তৈলখনিসমূহই সর্বাপেক্ষা পুরাতন। রুমানিয়ার পরে পোল্যাণ্ডের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের তৈলখনিসমূহ আবিষ্কৃত হইলেও যথোপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার অভাবে প্রচুর পরিমাণে তৈল এখনও এই অঞ্চলের ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে বলিয়াই বিশেষজ্ঞদের ধারণা। পোল্যাণ্ডের প্রধান তৈল উৎপাদন কেন্দ্রের নাম বোরিশ্লাভ। ইউরোপের অপরাপর অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র এষ্টোনিয়ায় প্রচুর মেটে তৈল উৎপন্ন হয়। এই তৈলের উৎপাদন বৎসরে প্রায় এক কোটী টনের কাছাকাছি। তাহা ছাড়া ইউরোপের অপরাপর অঞ্চলের মধ্যে আলাসেস লোরেন, হ্যানোভার, ব্যাভেরিয়া ও ইতালীতে সামান্য পরিমাণে

পেট্রল পাওয়া যায়। পশ্চিম গ্রীস, থেস ও সিসিলিতে পেট্রলের খনি আছে। গ্রেট বৃটেনের খুব সামান্য পরিমাণ পেট্রল উৎপন্ন হয়। চেষ্টারফিল্‌ডেই প্রথম পেট্রলের খনিতে কাজ আরম্ভ হয়। পারস্য ও মেসোপটেমিয়াতে প্রচুর পরিমাণ পেট্রল পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে যে পরিমাণ পেট্রল মজুত রহিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এই দুইটি স্থানের পেট্রল খনিসমূহ পৃথিবীর পেট্রল উৎপাদনের হয়ত অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিবে। বৃটিশ প্রতিষ্ঠান-সমূহ এই দুইটি অঞ্চলের পেট্রলের ব্যবসায় পরিচালনা করে। পারস্য বর্তমানে পেট্রল উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পারস্যের তৈলখনিতে কাজ সুরু হয়। প্রাচ্যে ওলন্দাজ পূর্বভারত-দ্বীপপুঞ্জ পেট্রল উৎপাদনের দিক দিয়া পৃথিবীর মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছে। পূর্বভারত দ্বীপপুঞ্জের বোর্ণিও, সুমাত্রা এবং যাভা এই তিনটি দ্বীপেই পেট্রল উৎপন্ন হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এই সকল দ্বীপে তৈল-খনির সন্ধান পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে এখনও প্রচুর পরিমাণে পেট্রল অনাবিষ্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে। দক্ষিণ-আমেরিকার আর্জেন্টিনা ও পেরুতে পেট্রল পাওয়া যায়।

নিউজিলাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত পাপুয়াতেও পেট্রল পাওয়া গিয়াছে। মিশরে লোহিত সমুদ্রের উপকূলে কয়েকটি প্রধান প্রধান পেট্রল খনি রহিয়াছে। সোমালি-ল্যাণ্ডে, পশ্চিম আফ্রিকায়, এঙ্গোলা এবং আল্‌জেরিয়ার কিছু কিছু পেট্রল পাওয়া গিয়াছে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রথম ব্রহ্মদেশে পেট্রল-খনি আবিষ্কৃত হয়। প্রথমে ছোট ছোট কূপ খনন করিয়া ইরাবতী জেলা হইতে প্রচুর তৈল সংগ্রহ করা হইত। এই অঞ্চলের খনিসমূহ প্রচুর তৈল সমন্বিত বলিয়া চিরদিনই প্রসিদ্ধ। এই খনি-অঞ্চলের নাম ইয়েনাঙ্গইয়াত। সিঙ্গু এবং ইয়েনাঙ্গইয়াত ইরাবতী নদীর তীরে। উত্তর ব্রহ্ম অঞ্চলই প্রাচীন কাল হইতে ব্রহ্মের প্রধান তৈল উৎপাদন-কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। এই অঞ্চল রেঙ্গুন হইতে ৩০০ মাইল উত্তরে এবং মান্দালয় হইতে ১৩০ মাইল দক্ষিণে। এই খনি-অঞ্চলের পরিধি প্রায় সহস্র একর। এই সকল খনি ব্যতীত ব্রহ্মের আরও বহু স্থানে পেট্রল বর্তমান রহিয়াছে। ইয়েনাঙ্গইয়াত ও সিঙ্গু হইতে প্রথমতঃ তৈল পাম্প করিয়া ৪৮ মাইল দীর্ঘ একটি পাইপ-লাইনের সাহায্যে ইয়েনাঙ্গইয়াঙ্গে পাঠান হয়। এই স্থান হইতে ২৭৫ মাইল দীর্ঘ একটি পাইপ-লাইনযোগে ঐ তৈল রেঙ্গুনের নিকটবর্তী সিরিয়ামে লইয়া আসা হয়। ষ্টীমারযোগে নদীপথেও কতক তৈল সিরিয়ামে প্রেরণ করা হয়। সিরিয়াম এবং বগিওকের শোধনাগারে উপযুক্ত শোধনের পর তৈল রপ্তানী হয়। ভারতের উৎপন্ন তৈলের ৭০ ভাগ ব্রহ্মের এই সকল খনি হইতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মের অপরিশুদ্ধ তৈল হইতে কেরোসিনই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভারতের বাজারে ব্রহ্মের উৎপন্ন সমুদয় কেরোসিন তৈল বিক্রয় হয়। মোমবাতির তৈলও প্রচুর পরিমাণে ব্রহ্মের খনি হইতে উৎপন্ন হয়। প্রধানতঃ জাপান, গ্রেট বৃটেন এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ইহার রপ্তানী হয়। মোমবাতির আকারে সিংহল, ভারতবর্ষ এবং মিশরেও ইহা রপ্তানী হয়।

বিভিন্ন দেশের পেট্রলের উৎপাদন

(টনের হিসাব)

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১৭৩,৪০৪,২৬৬
রুশিয়া	২৭,৮২৮,[illegible]২
ভেনেজুয়েলা	২৫,[illegible]১,৮৭০
ইরাণ	১০,১৬৭,৭৯৫
ওলন্দাজ পূঃ ভাঃ দ্বীপপুঞ্জ	৭,৫৭২,৩৫৩
রুমানিয়া	৭,১৪৭,০৩৭
মেক্সিকো	৬,৪০৯,৭৮৬
ইরাক	৪,০৬০,৬০৯
কলম্বিয়া	২,৭৮৪,১৪৭
আর্জেন্টিনা	২২৭,১৪৮
পেরু	২,৩৮১,৫৬৪
ত্রিনিদাদ	২,১২৬,৫১৮
ভারতবর্ষ	১০,৫৮,৭৪৭
বাহেরীণ	১০,৬৪,৫৩৫
ব্রিঃ বোর্ণিও	৮৯০,০০৯
পোল্যাণ্ড	৫২০,৯৩০

জাপান	৩৪১,২০৭
মিশর	১৫৭,৫৫৮
জার্মানী	৪৭০,৫০৭
ইকুয়েডর	২৯৬,৪৮৩
কানাডা	৪১০,৮৪০
ফ্রান্স	৬৯,০৩৮
ইতালী	———
অপরাপর দেশ	৪৫,৮১৫

ভারতবর্ষে আসাম, পাঞ্জাব ও বেলুচিস্থানে পেট্রল খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আসামে ডিগবয়, মাকুম এবং বদরপুর এই তিনটি স্থানে খনি রহিয়াছে। এই খনি-অঞ্চলের পরিধি প্রায় ১২ মাইল। ডিগবয় খনির কাজই ইহার মধ্যে বিশেষ সন্তোষজনক। ১৯৩৮ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, ডিগবয় খনি হইতে ৬৬০ লক্ষ গ্যালন তৈল নিষ্কাশন করা হইয়াছে। এই তৈলের বেশীর ভাগ হইতেই কেরোসিন উৎপন্ন হয়। প্রধানতঃ আসাম অঞ্চলেই ইহার কাট্‌তি। এই তৈলের সঙ্গে মোম তৈরীর তৈলও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বিদেশে ইহা রপ্তানী হইয়া থাকে।

পাঞ্জাবে আটক অঞ্চলের খনি গত ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হইলেও উৎপাদনের পরিমাণ এখনও তেমন ভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৩৮ সালের হিসাবে দেখা যায়, আটক খনির উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২১০ লক্ষ গ্যালন।

উত্তর-পূর্ব বেলুচিস্থানের খাটামে তৈলের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অঞ্চলে প্রচুর তৈল মজুত থাকিলেও নিষ্কাশিত তৈলের সহিত জল মিশ্রিত থাকায় সন্তোষজনক ভাবে কাজ চলিতেছে না। দক্ষিণ-ভারতে কালিকট বন্দরের নিকটে এলেপেনতে পেট্রলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

১৯৩৮ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, এই বৎসরে সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন পেট্রলের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৮ কোটি টন। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এই বৎসর পেট্রল উৎপাদনের পরিমাণ চার কোটি টনের উর্ধে বৃদ্ধি পায়, ইহার মধ্যে একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনই ৩ কোটি টন বৃদ্ধি পায় এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার চিরাচরিত প্রথম স্থান দখল করে। এই বৎসর যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনে তাহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭ কোটি টনের উর্ধে। যে সকল দেশের পেট্রল খনি বৃটিশ ব্যবসায়ীবৃন্দ কর্তৃক পরিচালিত হয়, তাহাদের উৎপাদনের মধ্যে ইরাণের উৎপাদন ৩ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটি ১ লক্ষ টনে পৌছিয়াছে। ইরাকের উৎপাদন প্রায় ৪ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়া ৪০ লক্ষ টনে পৌছিয়াছে এবং দক্ষিণ আমেরিকার ত্রিনিদাদের উৎপাদন ৪ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়া ২১ লক্ষ টনে পৌছিয়াছে। পারস্য উপসাগরে বাহেরিণ দ্বীপপুঞ্জের তৈলের উৎপাদনও গত কয়েক বৎসরে ৪ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়া ১০ লক্ষ টনে পৌছিয়াছে। দুইটি মার্কিণ প্রতিষ্ঠান এই দ্বীপের তৈল-খনির পরিচালনা করিতেছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পেট্রল উৎপাদনকারী। রপ্তানীর জন্য এবং দেশের আভ্যন্তরীণ কাট্‌তির জন্য ইহারা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতে তৈল সরবরাহের জন্য ৬০ হাজার মাইল দীর্ঘ পাইপ-লাইন তৈরী করা হইয়াছে। মেক্সিকোর তৈল-খনিসমূহ সমুদ্রোপকূলবর্তী হওয়ায় খনি হইতে সরাসরি তৈল সরবরাহ করা হয়। রাশিয়ার বাকু অঞ্চলের তৈল পাইপ-লাইন যোগে কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী বাটুম বন্দরে প্রেরিত হয়, তথা হইতে ট্যাঙ্ক সমন্বিত ষ্টীমারযোগে ভল্‌গা নদীপথে এই তৈল দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। ককেসাস অঞ্চলে গ্রজনী খনির তৈল পাইপ-লাইনযোগে পেট্রস্ক বন্দরে প্রেরিত হয়। ককেসাস অঞ্চলের অপর মেইকপ খনি একটি প্রসিদ্ধ রেলওয়ে জংশনের নিকটেই অবস্থিত। এই খনি হইতে কৃষ্ণসাগরের দূরত্ব মাত্র ৫০ মাইল। কাস্পিয়ান সাগর-তীরবর্তী এম্বা খনির তৈল ভল্‌গার পথে রুশিয়ার অভ্যন্তরে প্রেরিত হয়। বাকু হইতে শোধনের পর এই তৈল পাইপ-লাইন ও অপরাপর ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। তুর্কিস্থানের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ফেরখানা খনির তৈল রেলপথে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। *

* সংখ্যানুপাতিক হিসাবসমন্বিত পেট্রোলিয়াম ইয়ার বুক হইতে গৃহীত।

কেদার রাজা

(উপন্যাস)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রে শরতের ভাল ঘুম হোল না, অচেনা জায়গা ভাল ঘুম হবার কথা নয়, দেশের বাড়ী ছেড়ে এসে পর্য্যন্তই তার ঘুম তেমন হয় না। কিন্তু কাল রাত্রে কি জানি কেমন হোল, বাবার কথা মনে হয়েই হোক্ বা অন্য যে কারণেই হোক্—শরৎ প্রথম দিকে তো চোখের পাতা একটুও বোজাতে পারে নি।

প্রভাসের বৌদিদি তার পাশেই শুয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়লো। এত শব্দ এত আওয়াজের মধ্যে মানুষ পারে ঘুমুতে? মোটর গাড়ী যাচ্ছে, লোকজনের কথাবার্ত্তা চলেচে—ভাল রকম অন্ধকার হয় না, জানালা দিয়ে কোথা থেকে আলো এসে পড়েচে দেওয়ালের গায়ে—আর সারারাতই কি লোক চলাচল করবে আর গান-বাজনা চলবে? এখানে এতও গানবাজনা হয়। ডুগি-তবলার শব্দ, হার্ম্মোনিয়ামের আওয়াজ, মেয়ে-গলায় গান চলেচে আশপাশের সব বাড়ী থেকে। দমদমার বাগান-বাড়ীতে থাকতে সে বুঝতে পারে নি আসল কলকাতা শহর কি। এখন দেখা যাচ্ছে এখানকার তুলনায় দমদমার বাগান-বাড়ী তাদের গড়শিবপুরের জঙ্গলের সমান।

ভোরে উঠে সে গঙ্গাস্নান করে আসবে—এখান থেকে গঙ্গা কত দূর কে জানে? প্রভাস-দা'কে বললে মোটরে নিয়ে যাবে এখন। সকালে প্রভাসের বৌদিদির ডাকে তার ঘুম ভাঙলো। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েচে বিছানায়। অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়েচে নাকি তবে? ওর মুখে কেমন ধরণের ভয় ও উৎকণ্ঠার চিহ্ন প্রভাসের বৌদিদির চোখ এড়ালো না।

সে বললে—ভাবনা কি দিদি, দেরিতে উঠেচ তাই কি? তোমায় উঠে আপিস করতে হচ্চে না তো আর। মুখ ধুয়ে নাও, চা হয়ে গিয়েচে—

শরৎ লজ্জিত মুখে জানালে এত সকালে সে চা খায় না। তার গ খাওয়ায় কতকগুলো বাধা আছে—স্নান করতে হবে, কাপড় ছাড়তে হবে—সে সব হাঙ্গামায় এখন কোন দরকার নেই, থাক্ গে। গঙ্গা এখান থেকে কত দূর? এক বার গঙ্গায় নাইতে যাবার বড় ইচ্ছে তার। প্রভাস-দা কখন আসবে?

প্রভাসের বৌদি বললে—গঙ্গা নাইবে? চল না আমাদের—আচ্ছা, দেখি—বোসো। ওরা আসুক সব—

—কখন আসবে? আসতে বেশি দেরি করবে না তো প্রভাস-দা?

—কি জানি ভাই। তবে দেরি হওয়ার কথা নয় তো। এখুনি আসবে—

—গঙ্গা নেয়ে এসে আমি বাবার কাছে যাবো—আমায় রেখে আসুক—

—সে কি ভাই? এ-বেলাটা থাকবে না এখানে? থেকে খাওয়া-দাওয়া করে ওবেলা—

শরৎ চিন্তিত মুখে বললে—কাল রাতে গেলাম না, বাবা কত ভেবেচেন। আমার কি থাকবার যো আছে যে থাকবো?

প্রভাসের বৌদিদি বললে—ওবেলা চলো ভাই সিনেমা দেখে দুজনে—

—কি দেখে?

—সিনেমা—মানে বায়োস্কোপ—টকি—

—ও—

—দেখে চলো আমরা যশোর রোড দিয়ে মটোরে বেড়িয়ে আসবো। চাঁদের আলো আছে—

শরৎ হেসে বললে—মোটে একাদশী গেল বুধবারে, এরই মধ্যে চাঁদের আলো কোথায় পাবেন? আপনারা কলকাতার লোক, আপনাদের সে খবরে কোনো দরকার

নেই—এখানে সারারাতই গ্যাসের আলো—ইলেক্‌ট্রিক আলো—

ঈষৎ অপ্রতিভের সুরে প্রভাসের বৌদিদি বললে—তা বটে ভাই, যা বলেচ। ওসব খেয়াল থাকে না।

এমন সময় পাশে কমলাদের ঘর থেকে জড়িত স্বরে কে বলে উঠলো—আরে ও হেনাবিবি—এদিকে এসো না চাঁদ, আলোর সুইচটা যে খুঁজে পাচ্চি নে—ও হেনাবিবি—

প্রভাসের বৌদিদি হঠাৎ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বললে—আ মরণ, বেলা সাড়ে সাতটা বাজে—উনি আলোর সুইচ্ খুঁজে বেড়াচ্চেন এখন—

শরৎ বললে—কি হয়েচে, কে উনি?

—কে জানে কে? মাতালের মরণ যত—পাশের বাড়ীর এক বুড়ো। রোজ ভাই অমনি করে—

শরৎও হেসে ফেললে মাতাল বুড়োটার কথা ভেবে। বললে ডাকচে কাকে? ও যেন পাশের ঘর থেকে কথা বললে বলে মনে হোল—না?

—ওই পাশের বাড়ী, দোতলার জানালাটা খোলা রয়েচে দেখচো তো—ওই ঘর। দাঁড়াও আসচি—

শরৎ শুনলে বুড়ো মাতালটা হঠাৎ "এই যে হেনাবিবি বলিহারি যাই! বলি সার্সি জানালা বন্ধ করে"—

এই পর্য্যন্ত চেঁচিয়ে বলে উঠেই চুপ করে গেল। কে যেন তার মুখে থাবা দিয়ে চুপ করিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ পরে কমলাও ঘরে ঢুকলো। শরৎ হাসিমুখে বলে উঠলো—এসো ভাই গঙ্গাজল এসো—তোমাকেই খুঁজচি—গঙ্গা নাইতে চলো না কেন যাই সবাই মিলে?

কমলা সত্যই সুন্দরী মেয়ে। ঘুম ভেঙে সদ্য উঠে এসেচে, আলুথালু চুলের রাশ খোঁপার বাঁধন ভেঙে ঘাড়ে পিঠে এগিয়ে পড়েচে, বড় বড় চোখে অলস দৃষ্টি, মুখের ভাবেও জড়তা কাটে নি—বেশ ফর্সা নিটোল হাত দুটি কেমন চমৎকার ভঙ্গিতে ঘাড়ের পেছনে তুলে ধরে এলোচুল বাঁধবার চেষ্টা করতে লাগলো—কিংবা ওটা এলোচুল বাঁধবার ছলে একটা কায়দা মাত্র, চুল বাঁধবার চেয়ে ওই ভঙ্গিটা দেখাবার আগ্রহটাই ওখানে বেশি। শরতের হাসি পায়—ছেলেমানুষ কমলা!

শরৎ এসব বোঝে। সেও এক সময়ে সুন্দরী কিশোরী ছিল, ওই কমলার মত বয়েসে সে জানে, নিজেকে ভাল দেখানোর কত খুঁটিনাটি আগ্রহ অকারণে মেয়েদের মনে জাগে। তারও জাগতো। এসব শিখিয়ে দিতে হয় না, বলে দিতে হয় না মেয়েদের। আপনিই জাগে। শরতের কেমন স্নেহ হয় কমলার ওপর। স্নেহের সুরেই বলে—ভাই, চমৎকার দেখাচ্চে তোমায় গঙ্গাজল—

—সত্যি?

—সত্যি বলচি।

কমলার মুখে লজ্জার আভাস নেই, সে যে পথে পা দিয়েচে, সে পথের পথচারিণীরা লজ্জাবতী লতা নয়, বনচাঁড়ালের পাতা—টুসি দিলে নাচে। কমলা হেসে বললে—আপনার ভাল লাগে?

—খুব, ভাই। খুব—

—তবে তো আমার ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো—এদিকে আবার গঙ্গাজল পাতিয়েচি—

কমলার কথার নির্লজ্জ সুর শরতের কানে বাজলো। সে মনে মনে ভাবলে, মেয়েটি ভালো, কিন্তু অল্প বয়সে একটু বেশি ফাজিল হয়ে পড়েচে। আমি ওর চেয়ে কত বড়। মা না হোলেও কাকী খুড়ীর বয়সী—আমার সঙ্গে কেমন ধরণের কথা বলচে ছাখো—

কমলা বললে—আপনি চা খেয়েচেন?

শরৎ হেসে বললে—না ভাই, আমি বিধবা মানুষ, নাইনি ধুইনি—এখুনি চা খাবো কি করে? চা খাওয়ার কোনো তাড়াতাড়ি নেই আমার। এখন গঙ্গা নাইবার কি ব্যবস্থা হয় বলো তো?

—চলুন না হেঁটে গিয়ে নেয়ে আসি। এই তো আহিরিটোলা দিয়ে গেলে সামনেই গঙ্গা—

প্রভাসের বৌদিদি ওদের ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে পেছন থেকে গিরিন ডাকলে—ও হেনাবিবি—

হেনা দাঁড়িয়ে গিয়ে পেছন ফিরে বললে—কখন এলে? কি ব্যাপার? ওদিকে—

গিরিন চোখ টিপে বললে—আস্তে।

হেনা এবার গলার সুর নীচু করে বললে—কি হোল?

এখনো হয় নি কিছু। আমরা এখনো বুড়োর কাছে যাইনি। বেশি বেলা হোলে যাবো। এদিকের খবর কি?

হেনা রাগের সুরে বললে—তোমরা আমায় মজাবে দেখচি। এখনও সে কিছু খায় নি, এবাড়ী এসে পর্য্যন্ত দাঁতে কুটো কাটেনি। না খেয়ে ও কতক্ষণ থাকবে, ও আপদ যেখানে পারো বাপু তোমরা নিয়ে যাও। আমার টাকা আমায় চুকিয়ে দাও, মিটে গেল গোলমাল। না খে'য়ে মরবে নাকি শেষটা—তারপর এদিকে হরি সা যা কাণ্ড বাধিয়েছিল! হেনাবিবি বলে ডাকাডাকি। সারারাত কমলির ঘরে বসে মদ খেয়েছে—এই একটু আগে কি চেঁচামেচি। মেয়েটা যাই একটু সরল গোছের, কোনো-রকমে তাকে বুঝিয়ে দিলাম পাশের বাড়ীতে একটা মাতাল আছে তারই কাণ্ড বিশ্বাস করেচে কিনা কে জানে—

গিরিন হাসিমুখে বললে—ভয় কি তোমার হেনাবিবি, রাত যখন এখানে কাটিয়েচে, তখন ওর পরকাল ঝরঝরে হয়ে গিয়েচে। ওর সমাজ গিয়েচে, ধর্ম্ম গিয়েচে। ওর বাবার কাছে সে কথাই বলতে যাচ্ছি—

—কি বলবে?

—সে সব বুদ্ধি কি তোমাদের আছে? গিরিনের কাছ থেকে বুদ্ধি ধার করে চলতে হয় সব ব্যাটাকে।

—গালাগাল দিও না বলচি—

—গালাগাল তোমাকে তো দিই নি হেনাবিবি, চটো কেন? তারপর শোনো। সন্দে অবধি রেখে দাও। সন্দের আগে আবার আমরা আসবো।

—টাকা নিয়ে এসো যেন।

—অত অবিশ্বাস কিসের হেনাবিবি? নতুন খদ্দেরের কাছে তাগাদা কোরো, আমাদের কাছে নয়।

—আচ্ছা, কথায় দরকার নেই—যাও এখন। আমি দেখি গে কমলিটা ছেলেমানুষ—কি বলতে কি বলে বসে—ওকে সামলে নিয়ে চলতে হচ্ছে আবার—

হেনা ঘরে ঢুকে দেখলে শরৎ ও কমল চুল খুলে তেল মাখতে বসেচে। বললে—ও কি? নাইতে যাবে না কি ভাই?

কমল বললে—গঙ্গাজলকে নিয়ে নেয়ে আসি—

হেনা প্রশংসার দৃষ্টিতে শরতের সুদীর্ঘ কালো কেশ-পাশের দিকে চেয়ে বললে—কি সুন্দর চুল ভাই তোমার মাথায়? এমন চুল যদি আমাদের মাথায় থাকতো—

কমল বললে—আমিও তাই বলছিলাম গঙ্গাজলকে—

শরৎ সলজ্জ সুরে বললে—যান কি যে সব বলেন! গঙ্গাজলের মাথায় চুল কি কম সুন্দর? দেখুন দিকি তাকিয়ে? তা ছাড়া আমার লম্বা চুলের কি দরকার আছে ভাই? বাবা কিছু পাছে মনে করেন তাই—নইলে ও চুল আমি এতদিন বঁটি দিয়ে কেটে ফেলতাম। শুধু বাবার মুখের দিকে চেয়ে পারি নে। তাঁর চোখ দিয়ে যাতে জল পড়ে, তাতে আমার ধর্ম্ম নেই।

হেনা এ পথের পুরাতন পথিক, তার মন কোমল হৃদয় বৃত্তির ধার ধারে না অনেক দিন থেকে—যা কিছু ছিল তাও পাষাণ হয়ে গিয়েচে চর্চ্চার অভাবে, শরতের কথায় তার মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত হোল না—কিন্তু কমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে চাইল।

হেনা বললে—কমলা, এঁকে গঙ্গায় নিয়ে যাবি? কেন বাড়ীতে চান কর না? বেলা হয়ে যাবে।

শরতের দিকে চেয়ে বললে—সে তুমি যেও না ভাই। ও ছেলে মানুষ, পথ চেনে না—কোথায় যেতে কোথায় নিয়ে যাবে।

কমল বললে—বারে, আমি বুঝি আর—[illegible]র তো আমি—

হেনা কমলাকে চোখ টিপে বললে—থাম বাপু তুই। তুই ভারি জানিস্ রাস্তা ঘাট। তার পর দিদিকে নিয়ে যেতে একটা বিপদ হোক রাস্তায়! যে গুণ্ডা আর বদমাইসের ভিড়—

শরৎ বললে—সত্যি না কি ভাই, বলুন না?

—আমি কি আর মিথ্যে কথা বলচি—ও ছেলে মানুষ কি জানে?

এইবার কমল বললে—না—তা—হ্যাঁ আছে বটে।

—কি আছে ভাই গঙ্গাজল?

কমলকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়েই বললে—কি নেই কলকাতা সহরে বলতে পারেন? সব আছে। আজকাল আবার সোলজারগুলো ঘুরে বেড়ায় সর্ব্ব জায়গায়

—সে আবার কি?

সোলজার মানে গোরা সৈন্য। এরা যে অঞ্চলে আছে, তার ত্রিসীমানায় মেয়েমানুষের যাওয়া উচিত নয়। না, তুমি যেও না ভাই। আমি তোমায় যেতে দিতে পারিনে। তোমার ভাল মন্দর জন্যে আমি দায়ী যখন। প্রভাস-ঠাকুরপো আমার হাতে তোমায় যখন সঁপে দিয়ে গিয়েচে।

কমলা বললে—আমরা তেল মাখলাম যে।

—তেল মেখে বাড়ীর বাথরুমে ওঁকে নিয়ে চান্ কর। মিছেমিছি কেন ওঁকে বিপদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া?

আড়ালে নিয়ে গিয়ে কমলাকে হেনা খুব বকলে। প্রভাসের কাছ থেকে সেও টাকা নেবে যখন, তখন এতটুকু বুদ্ধি নিয়ে কাজ করলে কি চলে না? বাড়ীর মধ্যেই ওকে ধরে রাখা যাচ্ছে না, একবার বাইরের রাস্তায় পা দিলে আর সামলানো যাবে না ওকে। এত কম বুদ্ধি কেন কমলার। হরি সা লোকটাকে কাল রাত্রে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে কি কোম্পানীর রাজ্য অচল হোত? সামলে না নিলে সব কথা ফাঁস হয়ে যেতো যে আর একটু হোলে? ঘটে বুদ্ধি হবে কবে তার?···ইত্যাদি।

কমল গুরুজন কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা বালিকার ন্যায় চুপ করে রইল।

হেনা বললে—তুমি আর ও ঘরে যেও না। আমি করচি যা করবার—তুমি যাও। হরি সা যেন এখন আর না ঢোকে—

হেনা ঘরে ঢুকে শরৎকে বললে—গঙ্গায় যাওয়া হবে না ভাই। পথে আজকাল বড় গোলমাল, তুমি বাথরুমে নেয়ে নাও, আমি সব যোগাড় করে রেখে এলাম—

স্নান করে আসবার কিছু পরে হেনা শরৎকে বললে—তোমার খাওয়ার কি করবো ভাই? আমাদের রান্না চলবে না তো?

—আমার খাওয়ার জন্যে কি ভাই। দুটো আলো-চাল আনুন, ফুটিয়ে নেবো।

—মাছমাংস চলে না—না? গাঁ থেকে এসেচ, এখন চলুক না, কে আর দেখতে আসচে ভাই?

প্রভাসের বৌদিদির এ কথায় শরৎ বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে নয় বটে, কিন্তু হিন্দু তো—সে একজন ব্রাহ্মণের বিধবাকে একথা বলতে পারলে কি করে? অন্য জায়গায় এ ধরণের কথা বললে শরৎ নিজেকে অপমানিতা বিবেচনা করতো, তবে এরা কলকাতার লোক, এদের কথা স্বতন্ত্র।

শরৎ গম্ভীর মুখে বললে—না ও-সব চলে না। ও কথাই বলবেন না আর—

হেনা মনে মনে বললে—বাপরে, দেমাক ছাখো আবার! কথা বলেচি তো ওঁর গায়ে ফোস্কা পড়েচে। তোমার দেমাক আমি ভাঙবো, যদি দিন পাই—কত দেখলাম ও রকম, শেষ পর্য্যন্ত টিকলো না কোনোটা।

শরৎ বিকেল থেকে কেবল দমদমায় ফিরবার জন্যে তাগাদা করতে লাগলো। হেনা ক্রমাগত বুঝিয়ে রাখে, ওরা এখনো আসচে না, এলেই পাঠিয়ে দেবে। শরৎ তো জলে পড়ে নেই—এর জন্যে ব্যস্ত কি?

কমলার দেখা নেই অনেকক্ষণ থেকে। শরৎ বললে—গঙ্গাজল কই, তাকে দেখচি নে—

হেনা কমলাকে সরিয়ে দিয়েছিল, কাঁচা লোক, কখন কি বলে বসবে, করে বসবে—সব মাটি হবে। তা ছাড়া কমলার ঘরে এমন সব জিনিসপত্র আছে, যা দেখলে শরতের মনে সন্দেহ হতে পারে। হরি শা'র একটা বিছানা, আলমারিতে তার দাড়ি কামানোর আসবাব, বড় নল-লাগানো গড়গড়া ইত্যাদি। মদের বোতলগুলো না হয় পাড়াগাঁয়ের মেয়ে না বুঝতে পারলে—কিন্তু পুরুষের বাসের এ সব চিহ্নের জবাবদিহি দিয়ে মরতে হবে হেনাকে।

বিকেলের দিকে হেনা বললে—চলো ভাই টকি দেখে আসি—

—সে কোথায়?

—চৌরঙ্গীতে বলো, শ্যামবাজারে বলো—

—বাবার কাছে কখন যাবো? ওরা কখন আসবে?

—চলো, টকি দেখে দমদমায় তোমায় রেখে আসবো—

শরৎ তখুনি রাজি হয়ে গেল। টকি দেখবার লোভ যে তার না হয়েছিল তা নয়। বিশেষ করে টকি দেখেই

যখন বাবার কাছে যাওয়া হচ্চে তখন আর গোলমাল নেই এর ভেতর।

কিন্তু হেনার আসল উদ্দেশ্য কোনো রকমে ওকে ভুলিয়ে রাখা। টকি দেখবার জন্যে গাড়ী ডাকতে গিয়েচে বলে দেরি করিয়ে সে প্রায় সন্ধ্যা করে ফেললে। শরৎ ব্যস্ত হয়ে কেবলই তাগাদা দিতে লাগলো—কখন গাড়ী আসবে, কখন যাওয়া হবে। হেনাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো, এদের কারো দেখা নেই—পোড়ার মুখো গিরিনটা লম্বা লম্বা কথা বলে, তারও তো চুলের টিকি দেখা যাচ্চে না, গিয়েচে সেই সকাল বেলা। যা করবি করগে বাপু, টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে এ আপদ তোরা যেখানে পারিস নিয়ে যা, তার এত ঝঞ্ঝাটে দরকার কি? এদিকে একে আর বুঝিয়ে রাখা যায় না।

সন্ধ্যার পরে গিরিন এসে নীচের তলায় হেনাকে ডেকে পাঠালে।

হেনা তাড়াতাড়ি নেমে এসে বললে—কি ব্যাপার জিগ্যেস করি তোমাদের? আমার ঘাড়ে যে চাপিয়ে দিয়ে গেলে এখন আমি করি কি? ও যে থাকতে চাইছে না মোটে। কোথায় নেবে নিয়ে যাও না, আমি কতকাল ভুলিয়ে রাখবো? আমার থিয়েটার আছে কাল। কাল ওকে কার কাছে রাখবো? ওদিকে কদ্দূর করলে?

গিরিন তুড়ি দিয়ে গর্ব্বের সুরে বললে—সব ঠিক।

—কি হোল?

—বুড়োকে ভাগিয়েচি। সে বলবো এখন পরে। সে পুঁটুলি নিয়ে বুঝলে—হি-হি-হি—

—কি বলো না?

পুঁটুলি নিয়ে ভেগেচে হি-হি—ঝি চিঁড়ে আনতে গিয়েচে আর সেই ফাঁকে হি-হি—পুলিশের আয়সা ভয় দেখিয়ে দিইচি, বুড়োটা আর এ মুখ হবে না।

—বেশ, এখন নিয়ে যাও—

—দ্যাখো, ওকে একটু ভুলোও টুলোও। পাড়াগাঁয়ে গরীব ঘরে থাকতো, সুখ আমোদ আহ্লাদের মুখ দেখে নি। গয়না গাঁটি কাপড়চোপড়ের লোভ দেখাবে—

—ওরে বাপরে, বলেচি তো ও মেয়ে তেমন না। একটুখানি মাছমাংস খাওয়ার কথা বলেছিলাম তো অমনি ফোঁস করে উঠলো—আর কেবল হা বাবা যো বাবা—

—তবে আর তোমার কাছে দিয়েচি কেন হেনা বিবি? পাকা লোকের কাছে রেখেচি, আজ রাতটা রেখে দাও, রেখে যা পারো করো। আজ আর নিয়ে যাই কোথায়? এখনো কিছু ঠিক করি নি। প্রভাসের বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েচেন, প্রভাস বাড়ী থেকে বেরুতে পারচে না। অরুণ আজ নাইট ডিউটি করবে আপিসে। আমি একা—

—কেন তুমি একাই একশো বলে যে বড্ড গোমর করো। লম্বা লম্বা কথা বলবার সময় হেন করেগা, তেন করেগা—এখন কাজের সময়ে হেনাবিবি তুমি করো। আরও টাকা চাই তা বলে দিচ্চি—

—যাহোক, যা বললাম আজকার রাতটা তো রাখো—

—ও টকি দেখতে যাবে বলছিল, নিয়ে যাবো?

—দরকার নেই। বাড়ীর বার করবার হাঙ্গামা অনেক। ভুলিয়ে রাখো—

—কাল সকালে এসো বাপু। কাল আমার থিয়েটার, আমার দ্বারা কাল কোনো কাজ হবে না বলে দিচ্চি।

হেনা মুখ চুণ ক'রে শরতের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে—বড় মুস্কিল। প্রভাস-ঠাকুরপোর বাবার বড় অসুখ, এখন যান তখন যান। হঠাৎ অসুখ হয়ে পড়েচে। এই মাত্তর খবর দিয়ে পাঠিয়েচে।

শরৎ উদ্বেগের সুরে বললে—এমন অসুখ! তা বয়সও তো হয়েচে—বাবা বলেন, তাঁর চেয়ে দশ-বারো বছরের বড়।

—তা তো বুঝলুম। এদিকে এখন উপায়।

—আজ কি দমদমা যাওয়া হবে না?

—কি করে আর যাওয়া হচ্চে বলো ভাই। প্রভাস-ঠাকুরপোর গাড়ী পাওয়া যাচ্চে না তো—

—কেন ভাড়াটে গাড়ী?

—কে নিয়ে যাবে? তুমি আমি দুই মেয়েমানুষ। ভাড়াটে গাড়ীতে ভরসা করে যাওয়া চলবে না। কাল সকালেই যা হয় ব্যবস্থা হবে।

শরৎ অগত্যা রাজি হোল। না হয়ে উপায় যখন নেই।

সন্ধ্যার পরে শরৎকে সঙ্গে নিয়ে হেনা গিয়ে ছাদে উঠলো। চারদিকে আলোর কুরকুট্টি, নীচের রাস্তা দিয়ে সারবন্দী গাড়ী ঘোড়া, মোটর, কর্ম্মব্যস্ত জনস্রোত, ফিরিওয়ালারা কত কি হেঁকে যাচ্ছে, বেলফুলের মালাওয়ালা 'চাই বেলফুলের গোড়ে' বলে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাঁকচে, শরৎ মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখলে।

বললে—সত্যি, সহর বটে কলকাতা। জায়গার মত জায়গা একথা ঠিক। কি লোকজন, কি আলোর বাহার! আমাদের গাঁ এতক্ষণ অন্ধকার হয়ে ঝিঁঝিঁ ডাকচে জঙ্গলে।

হেনা অবসর বুঝে অমনি বললে—আমিও তো তাই বলি, এখানেই কেন থেকে যাও না? সব বন্দোবস্ত করে দিচ্চি। সুখে থাকবে, খাও দাও, আমোদ-আহ্লাদ করে বেড়াও—

শরৎ হেসে বললে—তা তো বুঝলাম। আমার ইচ্ছে করে না যে তা নয়। কিন্তু চলবে কি করে? বাবা গরীব মানুষ—

হেনা উৎসাহের সুরে বললে—সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে এখন। তুমি রাজি হয়ে যাও ভাই—

—কি বন্দোবস্ত হবে? বাবার চাকুরী করে দিতে পারা যায় যদি, তবে সব হয়। গড়শিবপুরের জঙ্গলে থেকে আমার প্রাণও হাঁপিয়ে উঠেচে—দুদিন এখানে থেকে বাঁচি—

—বেশ কথা তো। কলকাতার মত জায়গা আছে ভাই? এখানে নিত্য আমোদ, লোকজন—ইচ্ছে হোল আজ শিবপুরে কোম্পানীর বাগানে বেড়াতে গেলাম—ইচ্ছে হোল আজ জু'তে গেলাম—

—সে আবার কি?

মানে চিঁড়িয়াখানা। যখন যেখানে যেতে চাও গেলে, যা খাবার ইচ্ছে হয় খেলে, এই তোমার বয়েস। হেসে খেলে যদি এখন না বেড়ালে তবে কবে আর কি করবে? মানব-জীবনে এ সবই তো আসল। জঙ্গলে থাকলাম আর আলো চাল খেলাম—এজন্য কি আসা জগতে?

—কি করব বলুন। অল্প বয়সে কপাল পুড়েচে যখন, তখন কি আর উপায় আছে—ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ের? বাবাও টাকার মানুষ নন যে কলকাতায় বাসা করে রাখবেন।

—তুমি ইচ্ছে করলেই সব হয়। কলকাতায় থাকতে চাও, বাসা কেন—খুব ভাল ভাবে থাকতে পারবে এখন—ষ্টাইলে থাকবে এখন। রেডিও রাখবে এখন বাড়ীতে—

—সে কি?

—বেতার। ওই শোনো বাজচে—ওই যে দোকানের সামনে লোক জমেচে? গান গাইচে না? তারপর গ্রামোফোন মানে কলের গান—

—জানি।

—সে কলের গান রাখো—মোটর পর্য্যন্ত হয়ে যাবে। আজ এখানে বেড়াও, কাল ওখানে বেড়াও। ইচ্ছে হোল আজ কাশী বেড়াতে যাবে, কাল এলাহাবাদ কি দার্জ্জিলিং বেড়াতে যাবে—গেলে।

শরৎ হি হি করে হেসে উঠে বললে—আপনি যে রূপকথার গল্প আরম্ভ করে দিলেন দেখচি। আমি মুখে বললেই সব হবে—এ যেন সেই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের—যাক্ গে, সত্যি হোক না হোক—ভেবে তো নিলাম—বেশ লোক কিন্তু আপনি!

—আমি মোটেই গল্পকথা বলি নি ভাই। আপনি ইচ্ছে করলেই হয়—

—আমি কি আর ইচ্ছে করলে বাবার চাকরী করে দিতে পারি? অবিশ্যি আমিও বুঝতে পারি বাবার যদি থিয়েটারে চাকুরী হয় তবে সব হয়। বাবা যে কি চমৎকার বেহালা বাজান, সে আপনি শোনেন নি—কলকাতার থিয়েটারে সে রকম পেলে লুফে নেয়। যেমনি বাজান, তেমনি গাইতে পারেন।

হেনার হাসি পাচ্ছিল। পাড়াগেঁয়ে একটা বুড়ো এমন বেহালা বাজায় যে তাকে কলকাতার বড় থিয়েটারে লুফে নিয়ে এত টাকা মাইনে দেবে যে তাতে ওদের বাড়ী, গাড়ী, জুড়ি, ঢাক, ঢোল সব হয়ে যাবে। শোনো কথা। বাঙাল কি আর গাছে ফলে?

হেনা চুপ করে ভাবলে। আর বেশি বলা কি উচিত

হবে একদিনে? অনেকদূর সে এগিয়েচে—অনেক কথা বলে ফেলেচে। মাগী কি সত্যিই বোঝে না—না ঢং করচে? কিন্তু যদি সত্যি ও বুঝতে না পেরে থাকে তার কথার মর্ম্ম—তবে আর না বলাই ভালো। ভয় করে বাবা, এমনি ফোঁস্ করে উঠে একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলতে পারে। বাঙালনীকে বিশ্বাস নেই।

শরৎ বললে—কই বললেন না আমি ইচ্ছে করলে কি করতে পারি?

এ কথার জবাবে হেনা খপ করে বলে ফেললে—তুমি বুঝতে পারচো না ভাই সত্যিই আমি কি বলচি?

এই পর্য্যন্ত বলেই হেনার হঠাৎ বড় ভয় হোল। চোখ বুঁজে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার দরকার নেই—আপাততঃ সাহসও নেই তার। কথা সামলে নেবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে একই নিঃশ্বাসে সে কণ্ঠস্বরকে লঘু ও হাস্য তরল করে এনে বললে—বুঝলে এবার? একটু ঠাট্টা করচি তোমায়। তাই কি কখনো হয়? তুমি আমি বললে কি হবে বলো। এমনি বলছিলাম। চলো নীচে যাই—রাত্রে কি খাবে?

—কিছু না। আমি কিছু খাইনে রাত্রে।

—বেশ, একটু দুধ একটু মিষ্টি খেতে আপত্তি আছে?

—আমি কিছুই খাবো না, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

হেনা মনে মনে বললে—তুমি না খেয়ে মরো না, আমার কি? এমন একগুঁয়ে বালাই যদি আর কখনো দেখে থাকি। যা বলবে তাই। 'না' বললে আর 'হাঁ' করবার যো নেই।

এই সময় নীচের তলায় খুব একটা চেঁচামেচি শোনা গেল। কে জড়িত স্বরে চীৎকার করচে, কে গালাগালি করচে।

শরৎ ভীতমুখে বললে—ওকি ভাই? কে চেঁচাচ্চে? আমাদের বাড়ীতে না?

হেনা পাংশু মুখে বললে—না, ও আমাদের বাড়ী নয়।

হরিসা মদ খেয়ে কমলার ঘরে ঢুকে নিত্যকার মত উপদ্রব সুরু করেচে। সর্ব্বনাশ!

এই সময় নীচে মারধরের শব্দ শোনা গেল। এও নতুন নয়, হরি সা মদ খেয়ে এসে কমলাকে ঠেঙায় মাঝে মাঝে—পয়সার খাতিরে গায়ের কালশিরে ঢেকে আবার হাসতে হয় কমলাকে। কিন্তু—

শরৎ ব্যস্ত হয়ে বললে—না দেখুন, আমাদের বাড়ীতে নীচের ঘরেই। কমলার ঘরের দিকে মনে হচ্চে। যান, যান, আপনি শীগগির যান—দেখুন—চলুন যাই আমরা। কে হয়তো বদমাইস ঘরে ঢুকেচে—

চেঁচামেচি বাড়লো। আর রক্ষা হয় না। হরি শা গর্দ্দভের মত চেঁচানি জুড়েছে। হরি শা যে একদিন মাটি করে দেবে সব, হেনা তা জানতো। সেই লম্বা কথাওয়ালা গিরিন এই সময় আসুক না দেখা যাক।

কমলার গলার কান্না মেশানো আর্ত্ত সুর শোনা গেল—ও দিদি, তোমরা এসো, আজ আমায় মেরে ফেললে মুখপোড়া—আর পারি নে দিদি—উঃ আর রক্ষা হয় না।

তবুও এ্যাকট্রেস্ হেনা মরীয়া হয়ে শেষ চাল চাললে। মুখে দিব্যি শান্ত হাসি এনে বললে…ও আমাদের বাড়ী না, পাশের বাড়ীর সেই বুড়ো মাতালটা। ছাদ থেকে মনে হয় যেন আমাদের বাড়ী। রোজই শুনচি। যাবেন না নীচে—জানলা দিয়ে ওদের ঘরটা দেখা যায় কি না? আমাদের দেখলে আবার গালাগাল করবে। আমি তো এ সময় সিঁড়ি দিয়ে নামি নে—

ক্রমশঃ



বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা দিবস

গত ২৬শে জানুয়ারী ভারতের সর্ব্বত্র স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছে, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ভারতের নর-নারী জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। স্বাধীন জাতির স্বাধীনতা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীনতার স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের মধ্যে। তাহাদের এই আনন্দের মধ্যে ফুটিয়া উঠে স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সুদৃঢ় সঙ্কল্প। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা-দিবস পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-দিবস—স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সঙ্কল্প গ্রহণের শুভ মুহূর্ত্ত। শতাব্দীরও অধিক কাল ব্যাপী পরাধীন ভারতবাসীর কাছে স্বাধীনতা শুধু একটা আদর্শ নয়, স্বাধীনতা ভারতবাসীর জীবনে প্রধানতম বাস্তব সমস্যা। কিন্তু স্বাধীনতা অমনিই লাভ করা যায় না, জাতিকে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হয় নিজের পৌরুষ দ্বারা। স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ শুধু কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করার মধ্যেই পর্য্যবসিত নয়, এই সঙ্কল্প-বাক্যের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে স্বাধীনতার জন্য সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষা যদি সুদৃঢ় হয়, তাহা হইলে তাহা অপূর্ণ থাকে না, একদিন না একদিন তাহা অবশ্যই সার্থক হইয়া উঠে।

বিশ্বব্যাপী মহাসমর তাহার নির্ম্মম বাস্তবতা লইয়া ভারতের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পরাধীন ভারত এবার তাহার স্বাধীনতা অর্জ্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিল যুদ্ধের অনিশ্চিত পরিণতির সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে। আজ আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর সহিত প্রত্যেক দেশের ভাগ্য বিজড়িত। তথাপি ভারতবাসীকে নিজের চেষ্টা দ্বারাই স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে। ভারতের স্বাধীনতা আর কতদূর তাহা বলিবার উপায় নাই, কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্কল্প যে আমাদিগকে ক্রমশঃ স্বাধীনতার নিকটবর্ত্তী করিয়া দিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বাধীনতার সুদৃঢ় সঙ্কল্পই একদিন স্বাধীনতার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে।

—

লর্ড-সভায় ভারত-প্রসঙ্গ

ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অচল অবস্থা দূর হউক আর না হউক, উহা লইয়া আলোচনা কিন্তু বেশ জোরেই চলিতেছে। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পার্লামেণ্টের লর্ড সভায় শ্রমিকদলভুক্ত লর্ড ফেরিংডন ভারতীয় সমস্যাকে বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিরূপে ভারতীয় সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ভারতে বৃটিশ নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বৃটেন ভারতের জন্য যাহা করিয়াছে তাহার জন্য ভারত বৃটেনকে উপযুক্ত প্রতিদানও দিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রায় একশত কোটি পাউণ্ড খাটান হইতেছে, উহার সুদ বাদেও ভারত বৃটেনকে প্রতি বৎসর ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করিয়া থাকে। এই টাকা পরিমাণ যথেষ্ট, কিন্তু ভারতের নিকট বৃটেনের অনেকখানি বাধ্যবাধকতাও রহিয়াছে।"

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মতামত না লইয়া ভারতের পক্ষ হইতে যুদ্ধ ঘোষণাকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অনর্থপূর্ণ ঘটনা বলিয়া মনে করেন। কংগ্রেসের ঘোষণার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতবর্ষকে যখন স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই তখন ভারত কখনও অপরের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে পারে না। এই সঙ্গত কারণেই বড়লাটের প্রস্তাব যথেষ্ট নহে বলিয়া কংগ্রেস অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।" আটলাণ্টিক-সনদ সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিলের বিবৃতির সমালোচনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, এই বিবৃতির ফলে আটলাণ্টিক-সনদের উপযোগিতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে মালয়ের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "মালয় সম্পর্কে শোনা যায়, সেখানকার জনগণ যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আদৌ আগ্রহান্বিত নহে।" ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী উ-সর গ্রেফ্তারের নিন্দা করিয়া লর্ড ফেরিংডন বলিয়াছেন, "উ-সকে পঞ্চম বাহিনী বলিয়া উল্লেখ করিলে

আসল ব্যাপার এড়ান হয়। আসল ব্যাপার এই যে, আমরা এই সকল ব্যক্তির বন্ধুত্ব ও সমর্থন লাভ করিতে পারি নাই।"

পণ্ডিত জওরাহেরলাল নেহরু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিয়াছেন। লর্ড ফেরিংডন বলেন, পণ্ডিত নেহরুর দাবীর অর্দ্ধ পথে উহার সম্মুখীন হওয়া আবশ্যক। ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি যে প্রস্তাব করেন, তাহা তিন অংশে বিভক্ত। প্রথমতঃ ভারতকে স্বায়ত্ত শাসন দিবার ঘোষণা এখনই সুস্পষ্ট ভাষায় করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ শুধু ভারতীয় সদস্য লইয়া সাময়িক ভাবে বড়লাটের শাসন পরিষদ গঠন করিতে হইবে। এই শাসন পরিষদ ভারতের শাসন-তন্ত্র রচনার জন্য গণ-পরিষদ আহ্বান করিবেন। তৃতীয়তঃ যুদ্ধের পর তিন বৎসরের মধ্যেই গণ-পরিষদের রচিত শাসন-তন্ত্র অনুসারে নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। মুসলিম লীগের দাবী সম্পর্কে তিনি বলেন, "লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান নহে—তাহারা অধিক সংখ্যক মুসলমানের প্রতিনিধিত্বও দাবী করিতে পারে না।"

লর্ড উয়েজ উডের মতে ভারত সম্পর্কে তিনটি বিষয় প্রয়োজন, প্রথমতঃ জাপানীদের দ্বারা ভারত যেন অধিকৃত না হয়, দ্বিতীয়তঃ ভারতের সাহায্য লাভ, তৃতীয়তঃ ভারতকে মুক্ত এবং বন্ধু ভাবাপন্ন করা। যুদ্ধের মধ্যে শাসন-তান্ত্রিক পরিবর্ত্তন হইতে পারে না বলিয়া যে যুক্তি দেওয়া হয় লর্ড হেইলী তাহা খণ্ডন করিয়া বলেন, সিরিয়াকে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়ার ঘোষণা যুদ্ধের মধ্যেই করা হইয়াছে, ১৯১৭ সালে যুদ্ধের গুরুতর সঙ্কটের মধ্যেই ভারতের শাসন-তন্ত্র সম্পর্কে ঘোষণা করা হইয়াছিল।

লর্ড ক্যাটোর কাছে লর্ড ফেরিংডনের গণপরিষদের প্রস্তাব ভাল লাগে নাই। তিনি ভারতীয় সমস্যা সমাধানের এক সোজা উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার সোজা উপায়টা হইল, পণ্ডিত নেহরু, মিঃ জিন্না এবং স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুকে ভারতের শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করা। উপায়টা সহজ বটে, তবে উহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় নাই। স্যার তেজ-বাহাদুরের কাছে প্রস্তাবটা খুব ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু জিন্না তাঁহার পাকিস্তান কিছুতেই ছাড়িবেন না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও যে মিঃ জিন্নাকে পাকিস্থান দিয়া ফেলিবেন তাহা নয়, তবে ভারতকে কিছু না দিবার পক্ষে উহা একটা অছিলা মাত্র। ভারতীয় সম্ভ্রান্তবর্গের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য যেমন বৃটিশের সহযোগিতা আবশ্যক, তেমনি ভারতে বৃটিশ স্বার্থ কায়েম রাখিতে হইলে ভারতীয় সমাস্ত সম্ভ্রান্তদেরও সহযোগিতা প্রয়োজন। কিন্তু মিঃ জিন্না ও স্যার তেজ বাহাদুরের সহিত পণ্ডিত নেহরুর সহযোগিতার কল্পনায় বাহাদুরী আছে বটে।

—

ভারতীয় সমস্যায় সহকারী ভারত-সচিব

লর্ড সভায় লর্ড ফেরিংডনের বিতর্কের উত্তরে সহকারী ভারতসচিব ডিউক অব ডিভনশায়ার ভারতসচিব মিঃ আমেরীর কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তবে তাঁহার উক্তিতে ঝাঁঝ কিছু বেশী। ভারত সম্পর্কে বৃটিশ নীতির অনাবৃত সত্যকেই তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কাজেই ঝাঁঝ কিছু বেশী মনে হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে। তবে তিনি ভারত সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা এবং পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সত্যই অপূর্ব্ব।

সহকারী ভারত-সচিব স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন, কংগ্রেসের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে এবং মুসলিম লীগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। কংগ্রেসের ক্ষমতা হ্রাস হওয়ার কি কি প্রমাণ পাইয়াছেন তাহা তিনি বলেন নাই। তবে কংগ্রেসের ক্ষমতা হ্রাসের অলীক কল্পনা করিয়া অনেক বৃটিশ রাষ্ট্র-নীতিবিদ্ আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন বটে। আইন অমান্য আন্দোলনের পরে কংগ্রেস ধ্বংস হইয়া গিয়াছে বলিয়া কোন কোন বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস তো ধ্বংস হয়ই নাই, অধিকন্তু অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে, তাহা দেখা গেল ১৯৩৭ সালে নূতন ভারতশাসন আইন প্রবর্ত্তনের সময়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে কতখানি উদাসীন হইলে কংগ্রেসের শক্তি হ্রাসের কল্পনা করা যায়, সহকারী ভারতসচিবের উক্তি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। মুসলিম লীগের শক্তি

দ্ধির কোন প্রমাণও তিনি উল্লেখ করেন নাই। কোন দেশেই লীগ মন্ত্রিসভা নাই, লীগের শক্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে হা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে!

মিঃ আমেরী তবু ভারতের একত্বের কথা বলেন, কন্তু তাঁহার সহকারী ডিউক অব ডিভনশায়ার ভারতের তত্ত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার াছে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান ইউরোপের জার্মাণ ও গ্রীকের মতই সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি। অতঃপর মুসলিম লীগও বোধ হয় সহকারী ভারতসচিবের এই ভারতের তত্ত্ব সম্বন্ধীয় নূতন আবিষ্কারটি কাজে লাগাইতে ভুলিবে না। কিন্তু তাহাতে মিঃ জিন্নার ভাগ্যে পাকিস্তান মিলিবে সে ভরসা কিন্তু সহকারী ভারতসচিবের উক্তি ইতে একটুও পাওয়া যায় না। তাঁহার লীগ-প্রীতি ত বেশীই হউক মিঃ জিন্নাকে স্বাধীন পাকিস্তান দেওয়ার ল্পনা ডিউক অব ডিভনশায়ার নিজেও বোধ হয় করেন না।

পরাধীন ভারত পৃথিবীতে গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে, এই কল্পনা করিয়া ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু যুদ্ধের পর বিজয়ী বৃটেনের কাছে পরাধীন জাতিসমূহ কি পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারে সে সম্বন্ধে সহকারী ভারতসচিব কাহারও কোন সন্দেহ রাখেন নাই।

—

প্রথম কর্ত্তব্য কাহার?

ভারত-সচিব মিঃ আমেরী এবং সহকারী ভারত-সচিব ডিউক অব্ ডিভেনশায়ার মনে করেন, ভারতীয় সমস্যা সমাধানে তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে, আগষ্টের ঘোষণার পরে তাঁহাদের আর কিছু বলিবার বা করিবার নাই। কিন্তু শুধু ভারতীয় নেতৃবৃন্দই নহে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ও এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ রাশিয়ায় যাইয়া বৃটেনের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার খ্যাতিই শুধু বৃদ্ধি পায় নাই, তাঁহার বুদ্ধি ও কর্ম্ম-দক্ষতাও প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতামতও যথেষ্ট মূল্যবান। বিলাতের যে-সকল রাষ্ট্র-নীতিবিদ্ ভারতীয় সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ অন্যতম। বিলাতের ডেলীমেল পত্রিকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাতের এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণে দেখা যায়—তিনি বলিয়াছেন, "এই (ভারতীয়) সমস্যার সমাধান নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহার জন্য প্রাথমিক কর্ত্তব্য ভারতীয়দের নহে, প্রাথমিক কর্ত্তব্য বৃটেনের। বৃটেন যখন তাহার রাজ-নৈতিক নীতি স্থির করিবে, আমি মনে করি, তখনই ভারতীয়দিগকে সম্মত করা যাইতে পারিবে।"

তাঁহার এই উক্তি বিশেষ অর্থ পূর্ণ। বৃটেনকে তিনি যে-নীতি স্থির করিতে বলিয়াছেন তাহা বৃটেনের এ যাবৎ ঘোষিত নীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি বলিয়াছেন, "কিন্তু প্রথম স্তর হইবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি সম্বন্ধে মন স্থির করা,—এ যাবৎ যে নীতি ঘোষিত হইয়াছে তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নীতি।" ভারত সম্পর্কে বৃটেনের এ পর্য্যন্ত ঘোষিত নীতির পরিচয় কাহারও নিকট অজ্ঞাত নহে। বৃটিশ রাষ্ট্র-নীতিবিদ্‌গণ যখন অধীন জাতি সমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করেন, তখনও উহা সহৃদয় সাম্রাজ্যবাদেরই আর একটি রূপ ছাড়া আর কিছু হয় না। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ রাশিয়ায় যাইয়া বৃটেনের জন্য যাহা করিয়াছেন, অপরের দ্বারা তাহা সম্ভব হইত না। তাই বলিয়া ভারত সম্পর্কে তাঁহার [illegible] যে গৃহীত হইবে সে সম্বন্ধে কোন ভরসা আমরা [illegible] পারিতেছি না।

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের ভারতে আসিবার কথা শোনা গিয়াছিল। বৃটিশ নীতির পরিবর্ত্তন না হইলে তাঁহার ভারতে আসার যে কোন সার্থকতা নাই তাহা তিনি নিজেও বুঝিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিতে পারিব বুঝিতে পারিলে আমি সানন্দে ভারতে যাইতাম।" বস্তুতঃ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বহু ঘোষিত নীতি ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে বুঝাইবার জন্য তাঁহার আসিবার সার্থকতা কোথায়? স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ মিঃ আমেরীর পরিবর্ত্তে ভারত-সচিব হইবেন, এইরূপ কথাও শোনা গিয়াছিল। বৃটেনের নীতির যদি পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে মিঃ আমেরী যাহা বলিতেছেন সেই কথা-

গুলিই বলিবার জন্য তাঁহার ভারত-সচিব হইয়া লাভ কি? বৃটিশ মন্ত্রি-সভায় তাঁহাকে গ্রহণ করিবার কথা উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু ভারত-সচিবের পদে নয়। কিন্তু তিনি যেরূপ ক্ষমতা চাহিয়াছিলেন তাহা পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন নাই। আর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেও রক্ষণশীল দলের সদস্য ছাড়া আর কেহ ভারত-সচিব হইবেন এইরূপ আশা করিবারও কোন কারণ দেখা যায় না।

—

নয়া দুনিয়ার রূপ

যুদ্ধের গোড়া হইতেই মানুষ স্বপ্ন দেখিতেছে যুদ্ধের পরে পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা আর থাকিবে না, শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র পৃথিবীতে এক নূতন যুগ আনয়ন করিবে। মানুষের এই আশা শুধু আলেয়ার আলোকের মতই তাহাকে নিরাশ করিবে কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারে না, কিন্তু কোন পথে নয়া দুনিয়া সার্থক হইয়া উঠিতে পারে তাহার আলোচনা উপেক্ষার বিষয় নয়। এ সম্পর্কে কিংহল তাঁহার ১৫ই জানুয়ারী তারিখের নিউজ লেটারে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

এ পর্য্যন্ত নয়া দুনিয়ার তিনটি পরিকল্পনা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। একটি হিটলারের নব-বিধান। এই নয়া দুনিয়া গড়িবার জন্য সংগ্রামের রথচক্র আজ নির্ম্মম ভাবে সমস্ত দুনিয়াকে নিষ্পেষিত করিতেছে। হিটলার অস্ত্রের সাহায্যে যে নব-বিধান গড়িতে চাহিতেছেন তাহার পরিচয় নির্ম্মমভাবেই মানুষ পাইয়াছে। হিটলারের দৃষ্টিতে সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে—নাৎসী জার্ম্মানীকে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিবার জন্য। কিন্তু হিটলারের চূড়ান্ত জয় লাভের আশঙ্কা আছে কি? কিংহল নিউজ লেটার বলা হইয়াছে, হিটলার ইতিমধ্যেই তাহার প্রথম যুদ্ধে হারিয়াছেন। আরও দুইটি যুদ্ধে হারিয়া তাঁহার টিকিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই। যদি আগামী জুন পর্য্যন্ত আরও দুইটি যুদ্ধে তিনি জয় লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দুই ফ্রণ্টে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে,—তাঁহার দ্বিতীয় ফ্রণ্ট হইবে জার্ম্মানীতে অন্তর্বিপ্লব।

দ্বিতীয় নয়া দুনিয়া ইঙ্গ-মার্কিন পরিকল্পিত শান্তি পূর্ণ নূতন যুগ। আটলাণ্টিক-সনদ রূপে উহা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; কিন্তু উহার পরিচয় দেওয়া সহজ কথা নয়। এই নূতন যুগের পরিচয় দিতে যাইয়া কিংহল নিউজ লেটারে বলা হইয়াছে, "আটলাণ্টিক-সনদের অস্পষ্টতার মধ্যে উহা যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের বাস্তব ঘটনাবলীর সুতীব্র আলোকে পরীক্ষা করিলে উহার মধ্যে আদি ভিক্টোরিয়া যুগের আভাষ পাওয়া যায়।" বস্তুতঃ ইঙ্গ-মার্কিন নব-যুগ কতকগুলি সার্ব্বভৌম-রাষ্ট্র সমন্বিত ইউরোপ ছাড়া আর কিছু নয়। তবে ১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত তাহারা যেরূপ সার্ব্বভৌম ছিল, সমষ্টিভূত ভাবে তাহাদের নিরাপত্তা যেরূপ অনিশ্চিত ছিল সেরূপ হইবে না। জার্ম্মানীকে দাবাইয়া রাখিবার প্রয়োজনে এই রাষ্ট্রগুলিকে সংহত করা হইবে। ইহাই মিত্র শক্তিবর্গের শান্তিপূর্ণ নূতন দুনিয়া।

আর একটি নূতন জগতের পরিকল্পনা আছে ষ্ট্যালিনের। কিংহল নিউজ লেটারে উহাকে বামপন্থী সাম্যবাদী রাষ্ট্রের অধীনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংযুক্ত সমবায় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় ষ্ট্যালিনের নূতন জগতের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। হিটলারের মত মিঃ চার্চ্চিল ও প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্টও এই সমাজ ব্যবস্থাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। ধনতন্ত্র আজ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হইয়াছে। চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপিত হইলে উপনিবেশের লোভ ছাড়িতে হইবে। কিংহল তাঁহার উক্ত নিউজ লেটারে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গড়িবার জন্য রাশিয়াকে সাহায্য করিতে বলিয়াছেন। এই পরামর্শ গৃহীত না-ও হইতে পারে, কিন্তু লণ্ডন, ওয়াশিংটন এবং ন্যাৎসী অধিকৃত ইউরোপের ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতিগণ ১৯১৯—৩৯ এর যুগে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেও একথা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতায় এমন একটা কিছু ঘটিতেছে যাহা বিপ্লবের নামান্তর।

—

কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্ম্মসূচী

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ওয়ার্দ্ধা অধিবেশনে শুধু বারদৌলী প্রস্তাবই গৃহীত হয় নাই, ওয়ার্দ্ধা হইতে

দেশবাসীর নিকট কর্ত্তব্যের আহ্বানও আসিয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতবাসীকে স্বরাজ না-ও দেয়, তথাপি কংগ্রেস তাহার দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না, কংগ্রেস নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। কংগ্রেস নেতৃবর্গ যে এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, দেশের পক্ষে ইহা আশার কথা।

কংগ্রেসের গত বিশ বৎসরের কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে দেখা যায়, এতদিন কংগ্রেস হয় সত্যাগ্রহ করিয়াছে, না হয় সহযোগিতা করিয়াছে, গঠনমূলক কার্য্যে কোন দিনই আন্তরিকতার সহিত আত্মনিয়োগ করে নাই। মহাত্মা গান্ধীকেও একথা আজ স্বীকার করিতে হইয়াছে। মহাত্মাজী 'শান্তিপ্রতিষ্ঠান' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "সত্য ও অহিংসার পথে আমরা স্বরাজ লাভ করিতে চাহিলে অবিচলিত ভাবে এবং দৃঢ়তার সহিত গঠনমূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টা দ্বারা সমাজের নিম্ন হইতে উচ্চস্তর পর্য্যন্ত সেই স্বরাজের সৌধ নির্ম্মাণ করাই একমাত্র পন্থা।" মহাত্মাজীর এই উক্তির সঙ্গে আমরা শুধু আর একটি কথা যোগ করিতে চাই,—আমরা বলিতে চাই, এই গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি গঠন কার্য্যের উপযোগীও হওয়া আবশ্যক। তাঁহার তের দফা কর্ম্মসূচীই কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতির ভিত্তি। ইহার মধ্যে চরকা ও হরিজন অন্যতম। কিন্তু চরকা এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসসেবী-দিগকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে নাই, সূতাকাটায় তাঁহারা সাড়া দেন নাই। মহাত্মা 'শান্তি প্রতিষ্ঠান' শীর্ষক প্রবন্ধে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "কংগ্রেসসেবিগণ সাড়া না দেওয়ায় সূতা কাটা সম্পর্কিত বিধি পরিত্যক্ত হইয়াছে।" যাহা জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারে নাই তাহাকে গঠনমূলক কার্য্যসূচীতে স্থান দিলে, উহা এক প্রকার ছেলেখেলা হয়ে দাঁড়ায় নাকি?

গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতিকে সার্থক করিতে হইলে জন-গণের সহিত কংগ্রেসের সংযোগ সাধন করিতে হইবে, ভারতের প্রতি পল্লীতে কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করিতে হইবে। এই সকল পল্লী-কমিটির ভিতর দিয়াই কংগ্রেস প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠিবে। এইসকল পল্লী-কংগ্রেস কমিটির ভিত্তির উপরেই দেশে স্বরাজের সৌধ নির্ম্মাণ করা সম্ভব।

—

ভারতরক্ষা ও ভারতীয় সমস্যা

যুদ্ধ আজ ভারতের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, ভারত আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আজ আর উপেক্ষার বিষয় নয়। সুতরাং ভারতীয় সমস্যা অপেক্ষা বৃহত্তর সমস্যা আজ দাঁড়াইয়াছে ভারতরক্ষার ব্যবস্থা—ভারতের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা। গোরক্ষপুর ডি, এ, ভি হাই স্কুল গৃহে এক জনসভায় পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, কোন শক্তি ভারতকে আক্রমণ করিলে, কিম্বা উহাকে ক্রীতদাস করিতে চাহিলে কংগ্রেস নিজ পদ্ধতিতেই উহাতে বাধা দিবে। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সংগঠনকেই তিনি শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া মনে করেন।

শুধু আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই নয়, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্যও সংগঠন কার্য্য আবশ্যক। কিরূপে এই সংগঠন কার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভব তাম্বারামে ক্রিশ্চিয়ান কলেজের ছাত্রদের সভায় শ্রীযুত রাজগোপাল আচারী তাহা আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধ সামগ্রিক যুদ্ধ। এই যুদ্ধ জয়ের জন্য শুধু সামরিক কৌশল ও শক্তিই যথেষ্ট নয়। উহার পিছনে থাকা চাই দেশরক্ষা করিবার জন্য দেশবাসীর মধ্যে একটা প্রবল উদ্দীপনা, দেশপ্রেমের একটা প্রবল আবেগ, যুদ্ধের সঙ্ঘাতকে সহ্য করিবার মত দৃঢ় মনোবৃত্তি। এতদিন ভারতের শাসকবর্গ ভারত-বাসীকে তাহাদের আত্মরক্ষার অসামর্থ্যের কথাই শুধু শুনাইছেন, বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কা দেখাইয়া ভারতবাসীকে জব্দ রাখিয়াছেন। কিন্তু বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কা আজ আর অলীক কল্পনা নয়। এই সম্ভাবিত আক্রমণের সম্মুখে দেশকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত করা প্রয়োজন, মৃত্যুকে বরণ করিবার, অতিপ্রিয় সাতপুরুষের বাড়ীভিটা পোড়াইয়া ধ্বংস করিবার জন্য সুদৃঢ় মনোবৃত্তির প্রয়োজন। রাশিয়া ও চীনের জনসাধারণ এই বিপুল ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রতি ইঞ্চি ভূমির জন্য প্রতি গৃহে, প্রতি রাজপথে, প্রতি নগরে, প্রতি পল্লীতে শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে।

ইহার জন্য চাই নির্ম্মম দৃঢ়তা, অকুণ্ঠ আবেগ ও উদ্দীপনা। কিন্তু কিরূপে উহা সৃষ্টি করা সম্ভব? রাজাজী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "যিনিই আমাদিগকে শাসন করুন না কেন, তাহাতে কি আসে যায়, এই চিন্তা যদি প্রতিমুহূর্ত্তে মনে জাগে, তাহা হইলে কি জনসাধারণের পক্ষে এইরূপ ত্যাগ স্বীকার করা সম্ভব?"

আমরা শুনিতেছি, বৃটেনের এই জীবন-মরণ সমস্যার মধ্যে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য চাপ দেওয়া অসঙ্গত। শত্রু যখন দূরে ছিল তখন ভারতীয় সমস্যার সমাধান করা হয় নাই কেন, সে প্রশ্ন না হয় না-ই তুলিলাম, কিন্তু রাজাজী বলিয়াছেন, "ভারতের এই দাবী তো আজ নূতন করা হইতেছে না, আমরা সমগ্র জীবন ধরিয়াই এই দাবী করিয়া আসিতেছি।" ভারতের দাবীর কথা না হয় না-ই তুলিলাম, কিন্তু দেশ রক্ষার ব্যবস্থা তখনই সাফল্যের সহিত করা সম্ভব যখন দেশপ্রেম রক্ষা-ব্যবস্থার তুল্য হয়। ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য না হইলেও শত্রুর আক্রমণকে সাফল্যের সহিত বাধা দিবার জন্যও ভারতের অচল অবস্থা দূর করা প্রয়োজন। আজও যদি ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ সময় না পান, তবে কখন পাইবেন তাহাই আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না।

—

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী

জানুয়ারী মাসে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের অক্লান্ত কঠোর সাধনার ফল এই বিশ্ববিদ্যালয় ধর্ম্মসম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীরই গৌরবের বস্তু। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নাম হইলেও হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ছাত্রের জন্যই ইহার দ্বার উন্মুক্ত।

১৯০৫ সালে সর্ব্বপ্রথম মালব্যজী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গঠন করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৬ সালে এবং ১৯২১ সাল হইতে ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও উন্নত করিবার জন্য একাশী বৎসরের বৃদ্ধ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর উৎসাহের অন্ত নাই। পাঁচ কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়া আরও কুড়িটি কলেজ এবং পঞ্চাশটি ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এই জ্ঞান-নিকেতনের উন্নতি কামনা করিতেছি।

—

মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী

সম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশের "শ্রীমতী নাথিবাঈ দামোদর থ্যাকরসে ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে"র রজত-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ এস, রাধাকৃষ্ণাণ এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক কার্ভে পুণা সহর হইতে চারি মাইল দূরে বিধবা আশ্রম স্থাপন করেন। স্বর্গীয় স্যার বিঠলদাস, ডি, থ্যাকারসে শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে সুদের পনর লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করেন। এই দান হইতে পরবর্ত্তী কালে উক্ত মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয়। সম্প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক দুইটি কলেজ ও দুইটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত আরও ২১টি বিদ্যালয় ইহার সংযুক্ত আছে। আমরা এই মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি কামনা করিতেছি।

—

কর্পোরেশনের বাজেট

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা কর্পোরেশনের [illegible] অধিবেশনে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা কর্পোরেশনের আগামী বৎসরের (১৯৪২-৪৩ সন) যে বাজেট পেশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, আগামী বৎসরে কলিকাতা কর্পোরেশনের আয় হইবে ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা এবং ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। সুতরাং আগামী বৎসরে ঘাট্‌তির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩৫ হাজার টাকা। চল্‌তি বৎসর অপেক্ষা আগামী বৎসরে ঘাট্‌তির পরিমাণ অনেক কম দেখান হইয়াছে বটে এবং আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু অপব্যয় নিবারণ করিয়া এই সমতা আনয়ন করিবার চেষ্টা করা হয় নাই, ব্যয়সঙ্কোচের ধাক্কা লাগিয়াছে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির উপরে।

পল্লীস্বাস্থ্য সমিতিগুলির জন্য চলতি বৎসরের ন্যায় আগামী বৎসরেও কোন ব্যয় বরাদ্দ করা হয় নাই। অনাথ আশ্রম, এতিমখানা, হাসপাতাল প্রভৃতির জন্য ব্যয় হ্রাস করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকা করা হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার ব্যয় হ্রাস করা হইয়াছে। মজুরদের মাগ্‌গী ভাতা বাবদ মাত্র ১৫ হাজার টাকা বেশী ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে, কিন্তু কর্ম্মচারীদের মাহিনা বাবদ ৩ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা বেশী ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। অবশ্য বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করিতে হইয়াছে এবং ব্যয় বরাদ্দ চলতি বৎসরের তুলনায় ১০ লক্ষ টাকা কম করা হইয়াছে। কিন্তু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ব্যয় হ্রাস না করিয়া অন্যদিকে ব্যয় কমান উচিত ছিল।

—

যুদ্ধ ও শিক্ষা-সমস্যা

যুদ্ধের জরুরী অবস্থায় কলিকাতার শিক্ষাসমস্যা শিক্ষা-সঙ্কটে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার ১৬০টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৬০টি বিদ্যালয়ে বিমান আক্রমণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। এইগুলি অবিলম্বেই খোলা হইবে। অবশিষ্ট একশতটি স্কুলের দশটি স্কুলবাড়ী জরাজীর্ণ, উহাদিগকে নিরাপদ করিবার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কিন্তু ৯০টি স্কুলে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয় নাই কেন? এই সকল স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের উদাসীনতা সত্যই বিস্ময়কর। কতকগুলি বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা অশানুরূপই হইতেছিল। উপযুক্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা না করায় ছাত্রদের পড়াশুনায় ব্যাঘাত হইবে, শিক্ষকেরাও বেকার সমস্যার সম্মুখীন হইবেন।

গবর্ণমেণ্ট ছয়টি সম্মিলিত স্কুল খুলিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। এই ব্যবস্থার ফলে যে সকল শিক্ষক বেকার হইবেন তাঁহাদিগকে এ, আর, পিতে গ্রহণ করা হইবে। এ, আর, পিতে বহুলোক দরকার। এই ব্যবস্থায় বেকার শিক্ষকদের সুবিধা হইলেও ছয়টি সম্মিলিত স্কুল দ্বারা একশতটি স্কুলের অভাব পূরণ হইবে না। এই সকল স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণে বাধ্য করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। কোন স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের আর্থিক অসামর্থ্য থাকিলে সরকারী ব্যয়ে আশ্রয় স্থান নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। এই ব্যবস্থা যদি কোন রকমেই সম্ভব না হয়, তবে সম্মিলিত স্কুলের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা উচিত। ১৬০টি স্কুলের পরিবর্ত্তে অন্ততঃ একশতটি স্কুল হইলেও শিক্ষা-ব্যবস্থা যুদ্ধের জরুরী অবস্থার মধ্যে মোটের উপর সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

—

শ্বেতাঙ্গের উদ্ধত আচরণ

মিঃ ত্রিবেদী মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটরী। পুত্রকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য তিনি সস্ত্রীক নাগপুর ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তাঁহার পুত্রের আসন নির্দ্দিষ্ট করা ছিল, কিন্তু গাড়ী রিজার্ভ করা ছিল না। এই গাড়ীতে দুইজন শ্বেতাঙ্গ আরোহী ছিল, তাহাদের একজন আসিয়া দরজা রোধ করিয়া দাঁড়াইল। মিঃ ত্রিবেদীর পুত্রকে কিছুতেই গাড়ীতে উঠিতে দিবে না। অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াও কোন ফল হইল না। মিঃ ত্রিবেদীর পরিচয় জানিয়াও উক্ত শ্বেতাঙ্গের মত পরিবর্ত্তন হইল না। অন্য কামরায় ত্রিবেদীর পুত্রের জন্য স্থান করিয়া দিয়া দিতে হইল। তার পর পুলিশ যখন ঐ শ্বেতাঙ্গকে গ্রেফ্‌তার করিতে আসিল, তখন তাহার চৈতন্য হইল, কিন্তু তবুও তাহার রূঢ় ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাহিল না, ট্রেন ছাড়িতে বিলম্ব হওয়ার জন্য ত্রুটি স্বীকার করিল। পরে অবশ্য রূঢ় ব্যহারের জন্য ত্রুটি স্বীকার করিয়াছিল।

এই জাতীয় ঘটনা এই প্রথম নহে। সরকারী অতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয়কেও একজন সাধারণ শ্বেতাঙ্গ পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করে না। সাধারণ ভারতীয়ের তো কথাই নাই। মিঃ ত্রিবেদী এই শ্বেতাঙ্গকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা না করিয়া ছাড়িয়া দিলেন কেন? মিঃ ত্রিবেদী না হইয়া অন্য কেহ হইলে কি হইত তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

—

ভারতে মার্শাল চিয়াং কাইশেক

চীন-রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল চিয়াং কাইশেক সপত্নীক রাজ-অতিথিরূপে ভারতে আগমন করিয়াছেন। তিনি যে

ভারতে আসিতে পারেন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নাকি কিছুদিন যাবৎ এইরূপ আশা করিতেছিলেন। চীনের সহিত ভারতের সংস্কৃতিগত সম্পর্ক সহস্রাধিক বৎসরের পুরাতন। জাপান চীন আক্রমণ করিবার গোড়া হইতেই চীনের প্রতি ভারতের সহানুভূতি রহিয়াছে। জাপান কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের আশঙ্কা আজ অলীক কল্পনা নহে। আশঙ্কা শুধু ভারতেরই নয়, চীন-ব্রহ্ম রোড বন্ধ হওয়ারও আশঙ্কা। জাপ-আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ভারতের সহিত চীনের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই আজ মুখ্য প্রয়োজন। সুতরাং সামরিক এবং রাজনৈতিক উভয়বিধ উদ্দেশ্যের সহিতই তাঁহার ভারতে আগমনের সম্পর্ক রহিয়াছে।

ইতিমধ্যে মার্শাল চিয়াং কাইশেকের সহিত পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরুর একাধিকবার সাক্ষাৎ হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদও তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছেন। মার্শাল চিয়াং কাইশেক ভারতে আগমন করায় অনেকের মনেই ধারণা জন্মিয়াছে, তিনি ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সম্পর্কেও আলোচনা করিবেন। এইরূপ মনে হওয়া আশ্চর্য্য কিছু নয়। পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে তাঁহার চীন, ভারত এবং রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছেন, "মার্শাল চিয়াং কাইশেকের আগমনে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই এবং মার্শাল চিয়াং কাইশেক ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে ভারতীয়দিগকে পরামর্শ দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এইরূপ আশা করা অন্যায়।" পণ্ডিতজী যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ পরামর্শ দিবার সার্থকতা কোথায়? তিনি কি ভারতবাসীকে তাহাদের স্বাধীনতার দাবী পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতে পারিবেন? ব্রিটেন কি মার্শাল চিয়াং কাইশেকের পরামর্শ গ্রহণ করিবে? কিন্তু চীনের প্রতি ভারতের আন্তরিক সহানুভূতি ক্ষুণ্ণ হইবে না কোন দিনই। কি উপায়ে সহানুভূতি কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছেনা।

—

সিঙ্গাপুর

জাপ বাহিনী সিঙ্গাপুর দ্বীপে অবতরণ করায় সিঙ্গাপুরের সঙ্কটজনক অবস্থা ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় হইয়াছে। জাপানীদের সিঙ্গাপুর সহরে প্রবেশের দাবী অসমর্থিত হইলেও সিঙ্গাপুর রক্ষা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। সিঙ্গাপুরের পতনে জাপানকে পরাজিত করিবার সমস্যা অধিকতর জটিল আকার ধারণ করিবে, ভারত মহাসাগরে জাপানের প্রভাব সৃষ্ট হইবে, কলিকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতিতে জাপবিমানের আক্রমণ শুধু আশঙ্কার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে না, জাভা, সুমাত্রা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন-ব্রহ্মরোড্, ভারতবর্ষ সব দিকেই জাপানের অগ্রগতি অপ্রতিহত হইয়া উঠার সম্ভাবনা। ভারত মহাসাগর জাপানের প্রভাবাধীনে আসিলে মাডাগাস্কার দ্বীপও দ্বিতীয় ইন্দোচীনে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা অনেকে করেন। রয়টারের কূটনৈতিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বর্ত্তমানে এই আশঙ্কা নাই, তবে জাপানের ঐরূপ মতলবের কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

ব্রহ্মদেশে জাপানী সৈন্য এখনও সালুইন নদী পার হইতে পারে নাই, কিন্তু মার্ত্তাবান তাহাদের হস্তে পতিত হইয়াছে।

—

লিবিয়া ও রাশিয়া

লিবিয়ার রণক্ষেত্রের অবস্থা ভাল বোঝা যাইতেছে না। বৃটিশ বাহিনীকে দের্ণা ত্যাগ করিতে হইয়াছে। 'এনালিষ্ট' লিখিয়াছেন, লিবিয়ায় জার্ম্মাণ সৈন্যের অগ্রগতি থামিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। নিউজ ক্রণিকেল পত্রিকা লিখিতেছেন, আসন্ন বসন্তকালে হিটলার ভূমধ্য সাগরে বৃটিশ নৌশক্তি ধ্বংস করিবার আয়োজন করিতেছে। দক্ষিণ-ইটালী ও সিসিলিতে নাকি জার্ম্মাণ বিমান-শক্তিকে সংহত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

রাশিয়াতে সোভিয়েট বাহিনী অটুটভাবে আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে। খারখোভ ও স্মোলেনস্ক অঞ্চলে প্রবল লড়াই চলিতেছে। বসন্তকালে রাশিয়াকে প্রবল ভাবে আক্রমণ করিবার জন্য হিটলার আয়োজন করিতেছেন। এদিকে রাশিয়া যাহাতে জার্ম্মাণীকে আক্রমণ করিতে না পারে তজ্জন্য মেজিনো লাইনের মত তিনটি দুর্গশ্রেণী নির্ম্মাণ করা হইতেছে।

—

মাতৃভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী"

চতুর্থ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৪৮ | ৩য় সংখ্যা

মহেঞ্জোদড়ো

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, এম·এ, পি-এইচ-ডি. এফ-আর-এ-এস্-বি।

বিশ বৎসর পূর্বেও যদি কেহ বলিত যে পাঁচ হাজার বৎসর আগে আমাদের দেশের লোকেরা সুন্দর সুবিন্যস্ত নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত ছিল, তাহাদের নগরে প্রশস্ত রাজপথ ও সুরম্য অট্টালিকা বর্তমান যুগের ন্যায়ই সহরের শোভা বর্ধন করিত সহরের ঘরে ঘরে পাকা ইঁদারা ও স্নানাগার এবং রাস্তায় রাস্তায় পোড়া ইঁটের তৈয়ারী নর্দামার ব্যবস্থা ছিল, সহরের অধিবাসীরা গম ও যবের চাষ করিয়া এবং নানাবিধ জীবজন্তু পালন করিয়া জীবন যাপন করিত, তাহারা তুলা হইতে সূতা কাটিয়া কাপড় বুনিত, এক বিচিত্র লিখনপ্রণালী তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং কারু ও চারুশিল্পে তাহারা সমধিক উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল—তাহা হইলে তাহা আমরা পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু সম্প্রতি ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তে সিন্ধু ও তাহার সন্নিহিত প্রদেশগুলিতে কতকগুলি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের ফলে মানবসভ্যতার একটি বিরাট নূতন পরিচ্ছেদ সূচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের এই যে সর্বপ্রাচীন সভ্যতা যাহাকে 'সিন্ধু-সভ্যতা' (Indus Civilisation) আখ্যা দান করা হইয়াছে—তাহার পুনরুদ্ধার বর্তমান যুগের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার নিঃসংকোচে বলা যাইতে পারে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে সরকারী পুরাতত্ত্ব বিভাগের একজন বাঙ্গালী কর্মচারী সিন্ধুপ্রদেশে পর্যটন করিতে করিতে সিন্ধুনদের অদূরবর্তী একস্থানে একটি বিশালকায় প্রাচীন স্তম্ভ দেখিতে পান। এই কর্মচারীর নাম স্বর্গীয় রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। স্তূপটি পূর্ব হইতে অনেকের জানা ছিল, কিন্তু রাখালবাবু আপনার অসামান্য প্রতিভা-বলে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করিলেন যে, এই স্তূপটির নীচে একটি অতি প্রাচীন এবং প্রকাণ্ড সহর লুক্কায়িত আছে। রাখালবাবুর আবিষ্কারের ফলে সমস্ত পৃথিবীর পণ্ডিত-সমাজে একটা বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। প্রসিদ্ধ জার্মান পর্যটক Schliemann সাহেব এশিয়া মাইনর এবং গ্রীস দেশের মাটি খুঁড়িয়া যখন ট্রয় এবং মাইসিনি (Mycenae) নগরীদ্বয় আবিষ্কার করেন তখনও পণ্ডিত মণ্ডলে এই রকমই একটি সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সিন্ধু-দেশে আবিষ্কৃত এই সহরটি ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ভারত সরকার মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। সরকারী পুরাতত্ত্ব বিভাগের সর্বময় অধ্যক্ষ সার জন মার্শাল এবং সেই বিভাগের অন্যান্য কর্মচারিগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যে সকল অপূর্ব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইল তাহা মার্শাল সাহেব তাঁহার সম্পাদিত "Mohenjodaro and the Indus Civilisation" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিলেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা Mackay সাহেব লিখিত আর একটি গ্রন্থে ("Further Explorations at Mohenjodaro") বর্ণিত হইয়াছে।

এই সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক সহরটি যেখানে অবস্থিত

তাহার বর্তমান নাম মহেঞ্জোদড়ো—সিন্ধুভাষায় যাহার অর্থ "মরা মানুষের স্তূপ"। স্তূপটি সিন্ধুদেশের লারকানা জেলার অন্তর্গত এবং নর্থ-ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ের ডোকরি (Dokri) স্টেশন হইতে সাত মাইল দূরবর্তী। যে ভূখণ্ডে এই প্রাচীন সহরটি দাঁড়াইয়া আছে তাহার পূর্বদিকে সিন্ধুনদ এবং অপর দিকে নারা নামক একটি সরকারী খাল প্রবাহিত হইতেছে। সহরটি এত বড় ছিল যে এতকাল পরেও তাহার ধ্বংসাবশেষ সাতশত কুড়ি বিঘা জমী জুড়িয়া আছে।

ভূতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে প্রস্তর ও তাম্রযুগের সন্ধিক্ষণে মহেঞ্জোদড়োর এই প্রাচীন সহরটি বিদ্যমান ছিল; কারণ দেখা গিয়াছে যে, ঐ সহরের লোকেরা পাথর ও তামার কাজ জানিত; কিন্তু লোহার ব্যবহার তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। এই কালকে Chalcolithic Age অর্থাৎ মিশ্র তাম্র-প্রস্তর যুগ বলা হইয়া থাকে।

এখানে একটা কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখা দরকার। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ নানা স্থানে পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, 'সিন্ধু-সভ্যতা' কেবলমাত্র সিন্ধুপ্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পরন্তু তাহা পাঞ্জাব, পূর্ব বেলুচিস্থান এবং সিন্ধু নদের অপর পারে ডেরাজাট প্রদেশেও বিস্তৃত ছিল। পূর্বে গঙ্গা-যমুনা এবং দক্ষিণে নর্মদা-তাপ্তী উপত্যকাতেও এই সভ্যতার সূত্র পাওয়া গিয়াছে। কেবল যে ভারতবর্ষে এই সভ্যতার প্রসার ছিল তাহা নহে। ঐ যুগে এলাম (পশ্চিম পারস্য), সুমের (দক্ষিণ ব্যাবিলোনিয়া), মিশর, ক্রীট দ্বীপ প্রভৃতি দেশও সভ্যতার সংস্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একদিকে ভারতবর্ষ ও অপরদিকে পশ্চিম পারস্য এবং মিশর প্রভৃতি দেশের যে প্রাচীনতম সভ্যতা আজ আমাদের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—তাহাদের সকলেরই মূলতত্ত্বগুলি এক, কেবল স্থানভেদে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচীন সভ্যতা Afrasia অর্থাৎ সংযুক্ত আফ্রিকা ও এসিয়ার ব্যাপক সভ্যতার একাংশ মাত্র।

পণ্ডিতদিগের মতে মহেঞ্জোদড়ো সহরের বয়স খৃষ্টপূর্ব ৩২৫০ হইতে ২৭৫০ পর্যন্ত অর্থাৎ এখন হইতে ৪৫০০ হইতে ৫০০০ বৎসর পূর্বে সহরটি বর্তমান ছিল এবং তাহার আয়ুষ্কাল প্রায় পাঁচশত বৎসর। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ইহার তিনবার পতন এবং পুনরুত্থান হয়। এই কালগুলিকে সহরের আদি, মধ্য এবং অন্ত্যযুগ বলা হয়। সম্প্রতি সরকারী পুরাতত্ত্ব বিভাগের অন্যতম কর্মচারী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়* সিন্ধুদেশের নানা স্থান পর্যটন করিয়া প্রমাণ পাইয়াছেন যে মহেঞ্জোদড়ো সহরের আদিযুগ অপেক্ষাও প্রাচীন কয়েকটি স্থান ঐ প্রদেশে আছে। বলা বাহুল্য, যে-সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ আমরা মহেঞ্জোদড়োতে দেখিতে পাই তাহার সূত্রপাত ইহার বহু শতাব্দী পূর্বেই হইয়াছিল।

যে অজ্ঞাত জাতি এত বড় সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহাদের কৃষ্টি, রুচি এবং ব্যবহারিক জীবনের সমুন্নতির বিশেষ পরিচয়—তাহাদের সহর ও গৃহনির্মাণের পরিপাটী বন্দোবস্তের মধ্যে পাওয়া যায়। সহরের রাস্তাগুলি সোজাসুজি উত্তর হইতে দক্ষিণ এবং পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে গিয়াছে। রাজপথগুলি ১৩ ফুট হইতে ৩০ ফুট প্রস্থ। ছোট ছোট রাস্তাগুলি বড় রাস্তাগুলিকে লম্বালম্বি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সেগুলিও ৩॥ ফুট হইতে ৭ ফুট পর্যন্ত চওড়া। ঘরবাড়ি রাস্তার দুই পার্শ্বে সরল রেখায় বিন্যস্ত। দেখিয়া মনে হয় যেন পূর্বে অঙ্কিত নক্সা অনুসারে সহরটি নির্মিত হইয়াছিল। অর্থাৎ আমরা এখন যাহাকে town-planning বা নগরবিন্যাস বলি তাহা আমাদের দেশের লোকেরা পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেও জানিত। সেকালে এইরূপ সুসম্বদ্ধ ও সুবিন্যস্ত সহর পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। এই প্রকাণ্ড সহরের জলনিকাশের ব্যবস্থা আজও আমাদের বিস্ময় আকর্ষণ করে। ছোট বড় প্রত্যেক রাস্তাতেই দুই একটি করিয়া পাকা গাঁথুনির নর্দামা ছিল এবং সেগুলির উপর ইঁট কিম্বা পাথর ঢাকা থাকিত। প্রত্যেক বাড়িতে ময়লা জলনিকাশের জন্য রাস্তার দিকে দেওয়ালে দুই একটি করিয়া গর্ত থাকিত। গর্তগুলির মেঝে ঢালু করিয়া গাঁথা হইত। ঘরের ভিতর একতলাতে

* সিন্ধুদেশে দ্বিতীয়বার প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের সময় মজুমদার মহাশয় দস্যুর হস্তে নিহত হন।

নর্দামাগুলি horizontal অর্থাৎ সমান্তরাল ভাবে তৈয়ারী হইত। কিন্তু দোতলার জন্য বাহিরের পাঁচিল দিয়া মাটির নল ব্যবহৃত হইত। আবর্জনাপূর্ণ জল রাস্তার নর্দামা দিয়া একটি কুণ্ডে (pit) গিয়া পড়িত। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই একটি পাকা ইঁদারা ছিল। ইহা ছাড়া পথের স্থানে স্থানে সাধারণের জন্য পাকা ইঁদারার ব্যবস্থা ছিল।

এই সহরের বাড়ি নির্মাণের প্রথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভিত্তির জন্য কেবল কাঁচা ইঁট ব্যবহৃত হইত। মেঝের উপর হইতে সমস্ত দেওয়ালে কেবলমাত্র পাঁজায় পোড়া ইঁট ব্যবহার করা হইত। এই পোড়া ইঁটগুলির গঠন এবং নির্মাণকৌশল এত নিখুঁৎ যে একজন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক বলেন যে বর্তমান যুগেও যে কোনও মিস্ত্রী এইরূপ ইঁট গড়িতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিতে পারিবে। ইঁটগুলি সাধারণভাবে দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে এবং উচ্চতায় ১১"×৫৷৷"×২$\frac{1}{2}$" ইঞ্চি। গাঁথুনির জন্য কাদা কিম্বা gypsumএর ক্ষার মিশাইয়া একটি মশলা ব্যবহৃত হইত।

মহেঞ্জোদড়ো সহরের বহু বাড়ির মধ্যে একটি বাড়ির কথা উল্লেখ না করিলে আমাদের বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই বাড়িটিকে সাধারণত "The Great Bath" বা "বৃহৎ স্নানশালা" নামে অভিহিত করা হয়। বাড়িটি প্রকাণ্ড—উত্তর-দক্ষিণে ১৮০ ফুট লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১০৮ ফুট চওড়া। তাহার মধ্যে একটি বড় পুষ্করিণী। পুকুরটি ৩৯ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট চওড়া এবং ৮ ফুট গভীর ইহার উত্তর ও দক্ষিণ পাড় হইতে নামিবার জন্য সিঁড়ি আছে। এই পুকুরটি তৈয়ার করিতে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যাহাতে কোনওক্রমে জল গাঁথুনির মধ্যে প্রবেশ না করিতে পারে তাহার জন্য ইটগুলি gypsum নামক প্রস্তরচূর্ণের মশলা দিয়া বসান হইয়াছে এবং তাহাদের উপর—bitumen অর্থাৎ শিলাজতু জাতীয় দ্রবপদার্থের এক ইঞ্চি লেপ দেওয়া আছে। ইহার ফলে আজ পাঁচ হাজার বছর পরেও এই পুষ্করিণীটিকে নূতন তৈয়ারী বলিয়া মনে হয়।

মহেঞ্জোদড়োর এই অতি প্রাচীন সুসভ্য জাতির আর একটি কৃতিত্ব তাহাদের লিখনপ্রণালীর মধ্যে পাওয়া যায়। এই সকল লেখ সাধারণত তাহাদের শত শত শীলমোহরগুলিতে (seals and sealings) উৎকীর্ণ আছে। প্রত্যেক শীলমোহরের উপরের দিকে দুই বা একলাইন লিপি এবং তাহার নীচে বিশেষ বিশেষ মূর্তি মুদ্রিত আছে। এই লিপির এখনও পর্যন্ত কোনও সর্বজনগ্রাহ্য পাঠোদ্ধার হয় নাই।* আমরা এই লিপির কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ নির্দেশ করিতে পারি: এই লিখনপ্রণালী পরবর্তীকালের বর্ণমালার স্তরে পৌঁছিতে পারে নাই। ইহাকে সাধারণভাবে pictograph অর্থাৎ চিত্রলিপির একটি উন্নত সংস্করণ বলা যাইতে পারে। কারণ যখন ইহার জন্ম হয় তখন প্রত্যেক চিহ্ন একটি করিয়া চিত্র বা মনোভাব সূচিত করিত। মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার যুগে ঐ সকল চিহ্নে একটি করিয়া মাত্রা বা syllable সূচিত হইতে থাকে। মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত শীলমোহরগুলির উপর যেসব symbol অর্থাৎ চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা মোটামুটি ৩৯৬। এই চিহ্নগুলির একটি তালিকা মার্শাল সাহেবের পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের এই অতি প্রাচীন লিপির সহিত সেকালের ক্রীট দ্বীপ, মিশর, সুমের, এলাম প্রভৃতি সুসভ্য দেশে প্রচলিত লিপিমালার মোটামুটি একটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনটিই অপর লিপি হইতে উৎপন্ন নয়। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মী এবং পরবর্তী যুগের লিপিমালার মূলসূত্র মহেঞ্জোদড়ো-লিপিতে পাওয়া যায়। এই লিপি সাধারণত ডান দিক হইতে বাঁদিকে পড়িতে হইত, অবশ্য কখনও কখনও ইহার ব্যতিক্রম হইত।

মহেঞ্জোদড়োর এই অতি প্রাচীন জাতির ধর্মবিশ্বাস যে কি ছিল তাহা জানিবার একমাত্র উপাদান শীলমোহর ইত্যাদির উপর মুদ্রিত নানাবিধ মূর্তি। এই বহুবিধ মূর্তির মধ্যে কয়েকটি যে অন্তত দেবদেবীর তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। এইরূপ একটি স্ত্রী-মূর্তির কথা ধরা যাইতে পারে: মূর্তির পরণে একটি কটিবাস মাত্র, মস্তকে অপরূপ আবরণ এবং গলদেশে

* ভারতবর্ষের ডক্টর প্রাণনাথ এবং রেভারেণ্ড হেরাস এবং ইউরোপের কয়েকজন পণ্ডিত এসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

একটি collar অর্থাৎ বেষ্টনী। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, ইনিই সেকালের ভারতবাসীর আরাধ্যা প্রধানা জননী-স্বরূপা দেবী (Great Mother Goddess)। ইঁহার পূজা অতি প্রাচীনকালে সমগ্র পশ্চিম এশিয়া এবং মিশর ও গ্রীস দেশেও প্রচলিত ছিল। আর একটি দেবমূর্তি একটি শীলমোহরে মুদ্রিত আছে: দেবতার তিন মুখ, দুই বাহু, এবং দুইটি শৃঙ্গের দ্বারা তাঁহার মস্তকাবরণ বিভূষিত। দেবতা যোগীর ভঙ্গিতে সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার পদদ্বয় উরুর উপর এমনভাবে সন্নিবিষ্ট যে দুই গোড়ালি সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বাহুদ্বয় জানুর উপর লম্বমান ভাবে স্থাপিত। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ব্যাঘ্র ও একটি হস্তী এবং বাম পার্শ্বে একটি গণ্ডার ও একটি মহিষ মূর্তি অঙ্কিত আছে। সিংহাসনের নীচে দুইটি হরিণ ঊর্ধ্বমুখে অবস্থিত। এই অপূর্ব মূর্তির লক্ষণগুলি পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে ইনিই হিন্দু-দিগের দেবাদিদেব মহাদেবের prototype অর্থাৎ মূল আদর্শ। মহাদেবের মত ইনি মহাযোগী; পশুপতি ও মৃগলাঞ্ছন। ইঁহার তিন মুখ এবং শৃঙ্গদ্বয়ে মহাদেবের ত্রিনেত্র ও ত্রিশূলের পূর্বাভাষ সূচিত হইতেছে। এই আশ্চর্য আবিষ্কারের ফলে এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে, আমাদের দেশে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেও শিবপূজা প্রচলিত ছিল এবং আর্যসভ্যতাভিমানী জাতিরা তাহাদের পূর্ববর্তী সুসভ্য অনার্যজাতির নিকট ঐ পূজা গ্রহণ করিয়াছিল।

বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা ছাড়া মহেঞ্জোদড়োর অধিবাসীরা লিঙ্গ এবং যোনী পূজাও করিত তাহারও প্রমাণ আছে।

মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার দৈনিক ব্যবহারিক জীবনযাত্রা যে সমুন্নত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। এই সহরের ঘরবাড়ি হইতে যে সকল ভুক্তাবশিষ্ট জিনিষ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ইহাদের খাদ্যসম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইতে পারে। ইহারা যব ও গম হইতে খাদ্য প্রস্তুত করিত। গরু, ভেড়া, শূকর, মুর্গী, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস এবং নদীর টাটকা ও সমুদ্রের শুকনা মাছ ইহাদের প্রিয় খাদ্য ছিল। খর্জুর প্রভৃতি ফল ইহাদের রসনা পরিতৃপ্ত করিত। গরু, মহিষ, ভেড়া, হস্তী, শূকর, উট প্রভৃতি—পশুপালনের রীতি প্রচলন ছিল। মহেঞ্জোদড়োর অধিবাসীরা পশম ও তুলা হইতে সূতা কাটিত এবং তাহার দ্বারা কাপড় বুনিত। সহরের বাড়িগুলি হইতে অনেক সূতা কাটিবার যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে। এমন কি কয়েক টুকরা সূতাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর এই যে সর্বপ্রাচীন তুলা তাহা কার্পাস গাছ হইতে উৎপন্ন। ইহা হইতে আমাদের দেশে কার্পাস চাষের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার বহু শতাব্দী পর পর্যন্তও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তুলার চাষ অজ্ঞাত ছিল।

সোনা, রূপা, তামা, টিন সীসা প্রভৃতি খনিজ পদার্থেরও প্রচলন এই জাতির মধ্যে ছিল। সোনারূপা দিয়া বহু-বিধ বিচিত্র অলংকার তৈয়ারী হইত, রূপা হইতে ঘটিবাটি প্রভৃতিও প্রস্তুত হইত। তামার প্রচলনই সমধিক ছিল। তামার তৈয়ারী বর্শার অগ্রভাগ, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র, ছুরি, বাটালি প্রভৃতি যন্ত্রপাতি, বাসন এমন কি চুড়ি, কর্ণবলয় প্রভৃতি অলংকার এবং নানাবিধ মূর্তি বহু পরিমাণে মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া গিয়াছে। ধাতব পদার্থ ছাড়া নানা প্রকারের প্রস্তরনির্মিত অলংকার (গলার হার প্রভৃতি) পাওয়া যায়।

অলংকারপ্রিয়তা এই জাতির একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব ছিল। ধনীলোকেরা সোনারূপা, হাতীর দাঁত এবং পাথরের তৈয়ারী গহনা ব্যবহার করিত। দরিদ্রেরা তামা, শাঁখা, হার, পোড়ামাটি প্রভৃতির অলংকার লইয়া সন্তুষ্ট থাকিত। অলংকারের মধ্যে, গোট, হার, চুড়ি, বালা, আংটি, নথ, কানের দুল, hairpin প্রভৃতি প্রচলিত ছিল।

মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রগুলির বিশেষত্ব এই যে সেগুলি তামা দিয়া তৈয়ারী। সেগুলি গাঢ় লালজমির উপর কাল রঙের বিচিত্র নক্সাদ্বারা চিত্রিত। ইহাই হইল সিন্ধু-সভ্যতার বিশেষত্ব জ্ঞাপক Red and Black pottery। যে সকল মৃৎপাত্রের টুকরা পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি polychrome অর্থাৎ বহুবর্ণে চিত্রিত এবং কয়েকটি glazed অর্থাৎ সূক্ষ্ম কাঁচজাত স্তরের দ্বারা আচ্ছাদিত। শেষোক্ত পাত্রগুলি ঐ জাতীয় শিল্পের পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রাচীন নিদর্শন।

মহেঞ্জোদড়োর অধিবাসীদিগের নির্মিত জীবজন্তু প্রভৃতির মৃন্ময় মূর্তিতে ঐ জাতির সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য-বোধের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ কয়েকটি মূর্তি দেখিয়া সার্ জন্ মার্শাল সাহেবের মত পাশ্চাত্য শিল্পভক্তও স্বীকার করিয়াছেন যে, যে কোনও গ্রীক্ শিল্পী এই রকম মূর্তিগুলি গড়িতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করিতে পারিত।

কতকগুলি পাথরের ঘুঁটি সহরের মাটি খুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে। তাহাতে মনে হয় যে, মহেঞ্জোদড়োতে পাশা খেলার প্রবর্তন ছিল। তাহা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পাথরের তৈয়ারী marble হইতে ঐ জাতীয় খেলারও প্রচলন ছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ছেলেদের খেলানার মধ্যে মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্তি, বাঁশি, ঝুমঝুমি, টানাগাড়ি, চাকার উপর বসান পাখীর মূর্তি উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে কুঠার, বর্শা, ছোরা, তীরধনুক, গদা প্রভৃতির নমুনা মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া যায়। কিন্তু তরবারি, শিরস্ত্রাণ, বর্ম প্রভৃতি আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রের অস্তিত্বের বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

শবদাহের তিনটি বিভিন্ন প্রথার প্রচলন দেখা যায়। প্রথমটি সমস্ত দেহটি কবরস্থ করা, দ্বিতীয়টি দেহের অস্থিখণ্ড মাত্র কবর দেওয়া, এবং তৃতীয় সমস্ত দেহটি দাহ করিয়া ভস্মাবশিষ্ট হাড় কয়েকখানি মাটিতে পোঁতা হইত। যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, মহেঞ্জোদড়োতে আগত বিদেশীদিগের মধ্যেই কবর দেওয়ার প্রথা সীমাবদ্ধ ছিল। *

*বেতার বক্তৃতা (অল্-ইণ্ডিয়া রেডিয়োর সৌজন্যে)

হারানো দিন

শামস্নুদ্দীন

দিবসের কোলাহল আলো হাসি গান,
গোধূলি রঙের সনে লীন হ'য়ে যায়,
চিহ্ন তার রহে নাকো, মরণ সমান
আঁধার কবর মাঝে নীরবে ঘুমায়।

নীলিমার বুকে আসে নীহারিকা দল,
সহস্র নয়ন তুলি চাহে শেফালিকা,
সরসীর মাঝে আসে লাখো শতদল
বসিয়া বিজনে একা চাহে কাননীকা।

মনে হয় যেন সবে হারানো গীতিকা
আলোকের মাঝে মাথা ফেলেছে হারায়ে
কাঁদিয়া খুঁজিয়া ফিরে, প্রাণের লিপিকা
ভুবনে ছড়ায়ে দেয় বেদনা জানায়ে।

ভাবি আর খুঁজে মরি বিরাম বিহীন
হারানো গীতালি ধ্বনি সারা নিশিদিন।

মা

(উপন্যাস)

শ্রীসুপ্রভা দেবী

ছয়

উৎপল যে ছেলেটিকে পড়ায় তার বাবা একদিন তাকে ডেকে বললেন, "দেখুন ওর হাফ ইয়ারলি আসছে, আপনি এ কয়েকটা দিন রবিবার দুপুরবেলায় এসে একটু জোর দিয়ে অঙ্কটা দেখে দিন। ছুটীর দিন দুপুরবেলায় মোটেই বই নিয়ে বসে না, আপনি এলে তবু একটু চার হবে।"

উৎপল একটুও প্রতিবাদ করতে পারল না, এরকম জুলুম মাঝে মাঝে তার ওপর চলেই এসেছে। প্রতিবাদের ফল যে কি হবে তা নিশ্চিত জানা ছিল বলেই সাহস হোত না। রবিবারের দুপুরে সে অগত্যা হাজরি দিতে আসতো। এমনি এক রবিবারে ছাত্রকে অঙ্ক কষতে দিয়ে সে চুপ করে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে, এমন সময় এক চাকর এসে তাকে খবর দিলে একটি মেয়ে তাকে ডাকছে। সে অবাক্ হ'য়ে বলল, "তোমার ভুল হয় নি তো, আমাকে খুঁজছে?"

"না, ভুল কেন হবে বাবু, বললেন আপনার ছোট বোন।"

ছাত্রকে ছুটী দিয়ে উৎপল দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল, বাইরের ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকেই দেখে মলিনা এক লাল ছাতা হাতে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে। উৎপল বললে—"আমার শুনেই বোঝা উচিত ছিল। আমার ছোট বোন অত দুষ্টু নয়।"

মলিনা বললে, "দুষ্টুমি কোথায়, বল বিবেচনা। বোন না এসে আর কোন মেয়ে এসেছে শুনলে এতক্ষণে এদিক ওদিক থেকে উঁকিঝুঁকি সুরু হ'য়ে যেতো না? দেখলে তো কেমন ছুটী করিয়ে দিলাম?"

উৎপল বললে, "হ্যাঁ ছুটী বই কি, আমার ছাত্রের বাপকে তো চেন না—ঠিক খবর রাখবেন আমি কতক্ষণ রইলাম, আর একদিন এ সময়টুকু পুষিয়ে নিয়ে তবে ছাড়বেন। যাক্ তোমার ইচ্ছেটা কি এখন? বেড়ানো? তাই চল তবে।"

মলিনা বললে, "বল তো কোথায় যাওয়া যায়? আজ আর বটানিকাল গার্ডেন হবে না। অত সময় নেই, পাঁচটার মধ্যে ফিরতে হবে। চল আজ চিড়িয়াখানা দেখে আসা যাক্।"

এক তরফা কথা বলে নিজেই সব ঠিক করে উৎপলের সঙ্গে সে ট্রামে চড়ে বসলো।

হঠাৎ যেন দুপুরের সূর্য্যের তেজ ক'মে গিয়েছে, চারদিক মনে হচ্ছে সোনালী।

পাশাপাশি ব'সে আছে দু'জনে, ট্রামে লোকজন বেশী নেই। কেউ কথা বলছে না। উৎপল একটা সিগারেট ধরাতেই মলিনা জোরগলায় আপত্তি জানাল। উৎপল বলল, "যতই আপত্তি থাক্ তা শুনছিনে এখন। সারাটা দুপুর সকাল খাটিয়ে নেয়, আর সিগারেট খেতে গেলেই কোথা থেকে টের পেয়ে ছাত্রের বাপ এসে বলবেন "খোকার সামনে সিগারেট খেতে দেখলে ও যে বিগড়ে যাবে সেটুকুও কি আপনি বোঝেন না?" এতক্ষণ বসে বসে আমার দম বন্ধ হ'য়ে আসছিল।"

মলিনার কোলের ওপরে এক ডিটেকটিভ নভেল, তার ওপরের পাতাটা উল্টিয়ে দেখে উৎপল জিজ্ঞাসা করল, "তুমি হঠাৎ আজ বেড়াতে এলে, কেউ কিছু বললেন না?"

মলিনা বললে, "সে সব শুনে কি করবে? ছলনাময়ী নারী জাতি এইটুকু জেনে রেখে দাও?"

উৎপল হেসে বাইরের দিকে চাহিল। কী অদ্ভুত লাগে। দুপুরের আকাশ কী ঘন নীল, চলাচল-মন্থর রাজপথ। সব ভুল হ'য়ে যায়। তার ছাত্র ও ছাত্রের বাপ কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। রাজগঞ্জ যেন কোন দূর দেশের কোন অজ্ঞাতনামা জনপদ, অতসী ও সবিতা যেন স্বপ্নলোকের মানুষ। ঠিক এই মুহূর্ত্তে এই ক'লকাতা সহরে কত লক্ষ লোক তাদের কোটী কোটী ভাবনা-চিন্তা সুখদুঃখ সমস্যা নিয়ে জর্জ্জরিত, কিন্তু উৎপলের পৃথিবীর কেউ নয় তারা। একটি মাত্র লোক তার জগতের অধিবাসী, একটি মাত্র মেয়ে সে তার পাশে বসে রাস্তার লোকজন, দোকানপাটের দিকে চেয়ে আছে, তার পরণে শরতের আকাশের মত নীল রং-এর সাড়ী সোনালী রং-এর পাড় বসানো, তার কোলের ওপরে অযত্নে রাখা বই, তার আঙুলগুলো বই-এর ওপরে চুপ করে আছে, তার কপালে দু'একগাছা চুল বাতাসে অবাধ্য হ'য়ে উঠেছে। এই মেয়েকে সে চিনেছে আজ নয়, তার সঙ্গে মনে হয় বহুকালের চেনা। যেন কত বছর পেরিয়ে গিয়েছে তাদের প্রথম পরিচয়ের পর। অথচ, আজও মনে পড়ে উৎপলের হাসি পায় কি তুচ্ছ উপলক্ষে তাদের পরিচয়। এক নামজাদা প্রফেসর কয়েক দিনের জন্য শেলী পড়িয়েছিলেন। তখন মলিনা একদিন কলেজে আসে নি, অ্যাডোনিসের ওপর সেদিন নোট দেওয়া হয়েছিল। ক্লাশের মধ্যে ভাল ছেলে বলে উৎপলের নাম আছে। মলিনা কোন কিছুই না ভেবে তার কাছে নোটটা চেয়েছিল পরের দিন; এমনি করে তো আলাপের সূত্রপাত, এই তো গত বছরের কথা। তারপরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়াশুনো করতে করতে তাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে এবং দুজনেই এ বিষয় এক মত হয়েছে যে ইউনিভার্সিটীতে পড়ানো যখন এত খারাপ হয় তখন সেখানে বৃথা কালক্ষেপ না করে লাইব্রেরীতে বসে নিজেদের পড়া নিজেরাই তৈরী করবে। বই খাতা নিয়ে তারা আলোচনাও করে অনেক, কিন্তু আলোচনাটা পড়ার বই ছাড়িয়ে প্রায়ই রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, পুরুষ-মেয়ের অধিকার-ভেদ ইত্যাদিতে ছাড়িয়ে পড়ে, "উইচ্ অফ এ্যাটলাসের" তথ্য অনাবিষ্কৃতই থেকে যায়।

কিন্তু তার এত অন্তরঙ্গ এই মেয়েটি কি করে আবার এত সুদূরবর্ত্তিনী হ'য়ে যায় মাঝে মাঝে, উৎপল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। যে মলিনা নাগ ডাক্তার সুনীল নাগের বড় মেয়ে, সুন্দর সাজানো একবাড়ীতে নানা আরামে ডুবে থাকে, ঝক্‌ঝকে গাড়ী ছুটিয়ে কলেজে আসে, যার বাড়ীতে মাঝে, মাঝে সন্ধ্যাবেলায় সেও চা খেয়ে এসেছে, বাপ-মায়ের সেই 'মিলি' তার একেবারেই পরিচিতা নয়। তখন তার সঙ্গে সহজভাবে কথা কওয়া অসম্ভব, দ্বিতীয় কোন অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত থাকলে তো কথাই নেই (তাদের ভয়ে কতদিন বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে তবু সাহস করে ঢুকতে পারেনি), তখন কিছুতেই মনে করা যায় না এই মেয়েটিকে সে কোনদিন 'লীনা' বলে নিভৃতে ডেকেছে, আইসক্রীম কিনে দু'জনে কাড়াকাড়ি করে খেয়েছে, নিজের কবিজীবনের অতি সঙ্কুচিত ইতিহাস সাহস করে যার সামনে মেলে দিতে বাধেনি। তখন তো মনে হয় এর কাছে না বলতে পারার মত কোন কথা নেই, কোন সঙ্কোচ নেই, এই যেন একমাত্র আপনার।

শরতের আকাশে পাখা মেলে উড়ে-যাওয়া বর্ষণহীন মেঘের চন্দ্রাতপের নীচে নিভৃত অরণ্য-সরসীতে ক্ষণিক সূর্য্যালোকে ফুটে ওঠে যে পদ্মফুল সে কি জানে তার ভবিষ্যৎ?

চিড়িয়াখানায় গিয়ে উৎপল ভেবেছিল, কোন এক জায়গায় বসে গল্প করে বেশ কাটানো যাবে, কিন্তু মলিনা সে মেয়ে নয়, প্রত্যেকটি জীবজন্তু, পাখী তার বহুবারের দেখা হ'লেও তাদের সম্বন্ধে তার অদম্য কৌতূহল। তার সঙ্গে প্রত্যেক জায়গায় দাঁড়িয়ে ও প্রত্যেক জায়গায় বেড়িয়ে বেড়িয়ে উৎপল হাঁপিয়ে পড়ল। মলিনার ছিপ-ছিপে শরীরে এতটুকু ক্লান্তি নেই। অবশেষে উৎপল রাগ করে বললে, "আমার সঙ্গে বেড়াতে আসাটা মিছে কথা, আসলে বল চিড়িয়াখানা সম্বন্ধে তোমার একটা প্রবন্ধ লিখতে হবে।"

মলিনা হেসে বলল, "তাই বই কি, আমি তো আর তোমার মত লেখক নই যে প্রবন্ধ লেখার গরজে আলিপুর ছোটাছুটি ক'রে মরব? আমি এসেছি, আমার সব দেখতে ভাল লাগে। কেন তোমার লাগে না?"

চঞ্চল, প্রজাপতির মত অস্থির, কী অফুরন্ত প্রাণে উচ্ছল এই মেয়ে, এ আবার কি ক'রে ড্রইংরুমে বসে অ্যালবাম দেখিয়ে, খবরের কাগজের মূল্যবান খবর নিয়ে, পরিমিত আলোচনা করে ওজনমাফিক হাসি হেসে হেঁয়ালি ক'রে কথা কয়, উৎপল বুঝতে পারে না।

মলিনাকে জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দেয়, সবাই তো আর তোমার মত নয়? কত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসেন, তাঁদের খুসী করতে হবে না? নইলে শেষটায় আমার গতি হবে কি বল দেখি?

উৎপল জানে এখুনি আলোচনাটা একটা বিশেষ খাতে গিয়ে পড়বে, যখন তার বলবার কিছু থাকবে না, তাই সে বাধা দিতে চায়, কিন্তু মলিনা নির্মম। সে হাসিমুখে বলে যায় অনেক অনেক সাংসারিক কথা, ভবিষ্যতের ছবি এঁকে উৎপলকে দেখায়, উৎপল বিবর্ণ মুখে চুপ করে শোনে। কিন্তু ভবিষ্যতে উপন্যাস লিখে যশস্বী হবার দিবাস্বপ্ন যার সঙ্গে আলোচনা করা যায় তাকে রাজগঞ্জের কথা, সবিতার কথা, হাওড়া ষ্টেশনে অতসীর টিকিট বিক্রীর কথা গল্প করে বলা চলে না। উৎপল যে ভবিষ্যতের দিকে দুই চোখ বন্ধ করে থাকে, সে জানে, মলিনা তা লজ্জাকর দুর্বলতা বলে মনে করে, তাই নানা কথায় খুঁচিয়ে, খুঁটিয়ে তাকে আত্মসচেতন করে দেবার জন্যে সে এত উৎসুক।

উৎপল যখন বাসায় ফিরল সন্ধ্যা হ'তে তখন আর বেশী দেরী নেই। ঘরে ঢুকে দেখল তখনও কেউ আলো জ্বালায় নি, জানালার কাছে একটা মাদুর পেতে একটা হাতের ওপর মাথা রেখে সবিতা শুয়ে আছে। উৎপলের সাড়া পেয়ে সে উঠে বসল। "খোকা এলি? বাতিটা জ্বাল তো, সন্ধ্যে যে উৎরে যায় এতক্ষণ খেয়ালই হয় নি।"

পরনে আধময়লা কাপড়, গায়ে সেমিজ নেই, রুক্ষ চুলগুলি ঝুঁটি করে বাঁধা, সমস্ত মুখে ও শরীরে অপরিসীম ক্লান্তির আভাস। অনেক দিনের পর সে আজ মায়ের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল। এখানে আসার পর যে-নব-জাগ্রত আগ্রহ ও উৎসাহে স্ফীত হ'য়ে উঠেছিল সবিতা, সেই জোয়ারে এরি মধ্যে কি ভাঁটা পড়ে এসেছে?

সবিতা বলল, "একটু চা খাবি, করব খোকা?"

সে ব্যস্ত হ'য়ে উত্তর দিল, "না মা চা চাইনে; তুমি এখানে এসে বোস আমার কাছে, সন্ধ্যেবেলায় শুয়ে ছিলে, শরীর ভাল নেই মা?"

সবিতা হাসল, "না, শরীর তো বেশ আছে, গঙ্গার হাওয়ায় ম্যালেরিয়া কোথায় পালিয়েছে ঠিক নেই। খুকী বিকেলে বেরিয়ে গেল, আমিও ভাবলাম আলিস্যি লাগে, একটু গড়িয়ে নি। রাত আটটায় খুকীকে আনতে যাস্ খোকা, ও অবশ্যি বলেছে আর কে এক মেয়েরও এদিকে ফিরতে হয়, তার সঙ্গেই আসবে। তবু দু'জনেই মেয়ে, রাত বিরেত, আমার ভারী ভাবনা হয়।"

উৎপল ভাবে ঠিক মায়ের কথাগুলো মায়ের গলায় অন্য কে যেন বলে যাচ্ছে, কণ্ঠস্বরে আজ প্রাণ নেই যেন। প্রাণোচ্ছলতার অভাব তার মায়ের মধ্যে তো নেই। এত বয়সেও সে তরুণী, কত অল্পতে খুসী, কত সামান্য আঘাতে ম্রিয়মান।

উৎপলের যে স্পর্শকাতর কবি-মন অতি তুচ্ছ উপলক্ষে আপন মনে আকাশ-কুসুম রচনা করে, (সবিতা কোনদিন টের পাবে না, এমন কি তাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেও বুঝবে না) সেই স্বপ্নাতুর মন এই মাকে অবলম্বন করেই কত হাজার শিকড় চারদিকে মেলেছিল সে নিজেও সে বিষয় তেমন সচেতন ছিল না। তার মাকে চিরকাল সে একই রকম দেখে এসেছে অসহায়, নির্ভরশীল শত আঘাতেও যে প্রতিঘাত করতে পারে না কোনদিন। ছোটবেলায় তার বেশ মনে আছে যেখানে যা কিছু তার আশ্চর্য্য মনে হোত, যা দেখে মন খুসী হোত মাকে না ব'লে বা না দেখিয়ে তার মন স্বস্তি পেতো না। কারণ সে-সব জিনিস দেখে বা সে-সব বিষয় শুনে ঠিক তার মতই অবাক হোত খুসী হোত সবিতা। তাই এখনও সহজেই সে বুঝতে পারে, মা কি পেলে খুসী হবে, কি সে আশা করে। উৎপলের মনে আছে প্রথম যখন কলেজে পড়তে এসে সে তার নতুন বন্ধু প্রভাতের সঙ্গে তার বাড়ীতে বেড়াতে যায়। প্রভাতরা ক'লকাতায় বহুদিন থেকে থেকে প্রায় ক'লকাতার লোক হ'য়ে গিয়েছে। সচ্ছল অবস্থা, বাড়ী গাড়ী বাগান সব কিছুতেই ঐশ্বর্য্যের ছাপ। তারপরে সে দেখল প্রভাতের মাকে, দিদিকে, ছোট বোনকে। দিদি বা ছোট বোনকে দেখে তার এমন কিছু নতুন ঠেকে নি, তার বোন অতসী

তাদের চেয়ে এক সাজসজ্জা ছাড়া কোন অংশেই খাটো নয় ব'লে তার মনে হ'য়েছিল, কিন্তু প্রভাতের মা যখন সোনালী জড়িপাড় শান্তিপুরী শাড়ী পরে সাদা ধবধবে সিল্কের চাদর গায়ে জড়িয়ে, ঘাসের নরম চটি-পায় দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন, তাঁর রূপ, কথাবার্ত্তা সব কিছুতেই উৎপলের চোখ সেদিন ঝলসে গিয়েছিল। কী আদর-যত্নই তাকে করলেন, এমন করে ব'লে ব'লে অনুরোধ করে তাকে খাওয়ালেন, যে তার নিজের মায়ের সাধ্য ছিল না ওরকম করে বলবার। তারপর তিনি কত রকমের গল্প করলেন তাদের সঙ্গে। সব বিষয় তিনি ভাবেন, তাঁর নিজস্ব মতামত আছে, রীতিমত যুক্তিতর্কের সাহায্যে নিজের মতগুলি তিনি ব্যক্ত করেন।

সেদিন প্রভাতের মাকে তার মনে হ'য়েছিল রাজরাণী। রাস্তায় বেরিয়ে প্রভাতকে সে সেদিন বলেছিল, "কী ভালো লাগল ভাই তোমার মাকে, আশ্চর্য্য কিন্তু!"

প্রভাত হেসে জবাব দিল, "সবাই তাই বলে।"

সেদিনের পর থেকে তার নিজের মাকে যেন আরো দুর্ব্বল, পরাজিতা, নিরুপায় ব'লে তার মনে হোত, কোথা থেকে তার মনে জেগে উঠতো অজস্র করুণা, তার মাকে দেখে কেউ রাজরাণী ব'লে মনে করবে না, কেউ অবাক হ'য়ে যাবে না, এ কথা যতই মনে হোত, তার মনের মধ্যে মায়ের সকরুণ মুখ নিবিড় হ'য়ে ঘনিয়ে আসতো, আর সব তার সইবে, কিন্তু মায়ের মনে কষ্ট দেওয়া তার কখনই সইবে না।

মায়ের প্রতি তার এই অনুকম্পা-ভরা ভালবাসাকে একদা একটা বিশেষ অর্থে ও প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিল তার বন্ধু বীরেশ্বর। সেও এক কাহিনী।

(২)

সে যখন ম্যাট্রিক পাশ ক'রে বৃত্তি পেল তখন ক'লকাতার কলেজে পড়া সম্বন্ধে তার আর কোন সংশয় রইল না। একেবারে বিনা সম্বলে কিছু আর ক'লকাতায় আসা চলে না, চারদিকে এ কথা শুনে শুনে তার মনও তা মেনে নিয়েছিল তা যত অপ্রসন্ন ভাবেই হোক। কিন্তু মাসে মাসে ২০টি রৌপ্যমুদ্রা তা' বলে উড়িয়ে দেবার মত ব্যাপার নয়, ইচ্ছে করলে ২০৲ টাকায় কি না করা যায়? বিজয়ী বীরের মত মনোভাব নিয়ে সে ক'লকাতায় এসে পৌছুল।

তাদের গাঁয়ের সুন্দরীবাবু বহুদিন আগে ক'লকাতায় এসে হাইকোর্টে ওকালতী করে এক কালে বহু টাকা উপার্জ্জন করতেন। বড়লোক হ'য়েও তিনি দেশের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন করে ফেলেন নি। দেশের বহু আত্মীয় অনাত্মীয় লোক তাঁর বাসায় থেকে কেউ চাকুরী পেয়েছে, কেউ পড়াশুনা করেছে। ইদানীং তিনি অক্ষম হ'য়ে পড়েছিলেন বুড়ো হ'য়ে। ছেলেরাই কর্ত্তা, তারা অতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করতো না। তাই অনেক নিষ্কর্ম্মা লোককে পাত্তাড়ি গুটোতে হ'য়েছিল হাল আমলে। তবু সুন্দরীবাবুর বাড়ীতে দু'চার দিনের অতিথি হ'তে এখনও লোকে দ্বিধা করতো না। নির্ব্বান্ধব ক'লকাতায় প্রথম এসে উৎপলও একটি পরিচয়-পত্রের জোরে ওই বাড়ীতে আশ্রয় নিল, সেখানে কিছুদিন থেকে কলেজে ভর্ত্তি হ'য়ে খোঁজ-খবর ক'রে সে একটা সস্তা মেসে উঠে যায়। তারপর থেকে সেই মেসেই কয়েক বছর কাটল।

চিরদিনের বন্দী মন তখন সবে মাত্র ছাড়া পেয়েছে। তার ষোল বৎসর জীবনের যত অসম্ভব কল্পনা এতদিন শুধু আশপাশ থেকে মনকে দুলিয়েছে, নদীর তটে আছড়ে-পড়া ছোট ছোট ঢেউ যেমন নোঙর ফেলা নৌকাকে দোলায়।

সেদিন বিকেলবেলা উৎপল বললে, "আজ আর স্টোভ ধরিয়ে কাজ নেই, স্পিরিটও ফুরিয়েছে। গয়লা বউ এই সময়টায় রোজ উনান জ্বালে, ওখান থেকে জলটা গরম ক'রে আনি। শশাঙ্ক আজ তোমার টিফিনের পালা।" বলে সে কেটলী হাতে পাশের হিন্দুস্থানী বস্তিতে গয়লা বৌ-এর কাছে ছুটলো। ফিরে এসে দেখে শশাঙ্ক সকলের জন্য রীতিমত এক 'সারপ্রাইজ' সাজিয়ে বসে আছে। তাদের মেসের প্রায় সকলেই কলেজে পড়ে, দু'একজন ফেল্-করা ছেলে কাজের চেষ্টায় আছে, দু'জন মোটরের কারখানায় কাজ শেখে। তাদের একজন ছিল শশাঙ্ক, তার বাড়ীর অবস্থা অন্যদের চেয়ে কিছু সচ্ছল ছিল, মাঝে

মাঝে তাই সে বন্ধুদের ভালমন্দ খাওয়াবার একটু চেষ্টা করতো। আজও নিয়মিত মুড়ি ছোলা-ভাজার টিফিনের বদলে সে পাঁপর-ভাজা ও জিলিপির যোগাড় করে রেখেছে। উৎপল এসে ব্যাপার দেখে অত্যন্ত উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা অপ্রিয় চিন্তা মনের মধ্যে জেগে উঠলো—আসছে কাল তার টিফিনের পালায় আবার তো সেই মুড়ি যাকে তারা নাম দিয়েছে 'পি সি রায়ের প্রেসক্রিপসন্।' তারও খুব ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে সে এদিক সেদিক একটু খরচ করে, কিন্তু মেসের দু'বেলার খাওয়া খরচ এবং সিট্ ভাড়া দিয়ে অতি সামান্যই উদ্বৃত্ত হয়, তাতে রোজ বিকেলের জলখাবার জোটাই একটা বিলাসিতা। তারা আবার নিজেদের মধ্যে কতকগুলো কঠিন নিয়ম করেছে। গুরুতর বিপদে না পড়লে কেউ কারুর কাছ থেকে এক পয়সা ধার করতে পারবে না, মেসের প্রাপ্য মাসের প্রথম সপ্তাহে মেটাতে হবে, ধার করলে ১৫ দিনের মধ্যে শোধ দিতে হবে। কারুর সিনেমায় যাওয়া চলবে না, এমনি সব। মেসের ম্যানেজার ছিল নির্মল হাজরা, সে অন্যদের চেয়ে বয়সে বড়, দু-বার বি-এ ফেল ক'রে অনেক চেষ্টায় কর্পোরেসনে নামমাত্র মাইনের একটা কাজ জুটিয়েছে সম্প্রতি। সেই এসব নিয়ম ক'রে দিয়েছিল এবং উৎপলের পক্ষে তার আশ্রয়টা হয়েছিল বাঁচোয়া, নইলে তার যা সাংসারিক অভিজ্ঞতা তাতে ক'লকাতা সহরে তাকে নানা রকমেই বিপন্ন হ'তে হোত।

গরম জিলিপি আর পাঁপর-ভাজা সংযোগে চা যে অমন অমৃতের মত লাগে উৎপল আগে কি কখনো জানতো? উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কি একটা বলতে যাবে এমন সময়ে তার এক সহপাঠী বীরেশ্বর বাইরে থেকে হাঁক দিলে, "উৎপল বাবু আছেন?"

এই ছেলেটির সঙ্গে গত সপ্তাহে বটানী ক্লাশে তার প্রথম আলাপ। উৎপল I. A. পড়ে, ছেলেটি পড়ে সায়ন্স। পাশে বসে উৎপল মাইক্রোস্কোপটা কিছুতেই ঠিকমত খাটাতে পারছে না, তখন এ সাহায্য ক'রে ঠিক ক'রে দেয়, তখনই পরিচয়; তারপর এ কয়দিনে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে, দু জনেই কথাবার্ত্তা বলেছে। তবু উৎপল ভাবেনি সে অত শীগ্‌গিরই দেখা করতে আসবে।

বীরেশ্বর বলল, "চলুন না বেড়িয়ে আসি, বেশ বিকেলটা করেছে। কোন কাজ আছে আপনার?"

উৎপল একটু ইতস্ততঃ করলো, এ সময়টা সে অন্যদিন পাড়ার ফুটবল টিমের খেলা দেখে কাটায়। শেষটায় নতুন বন্ধুর খাতিরে আপত্তি না ক'রে তার সঙ্গী হোল।

অনেক গল্প হ'য়েছিল দু'জনের সেদিন। উৎপলকে বেশী জিজ্ঞাসা করার দরকার হোত না, সে তার লেখাপড়ার কথা, মায়ের কথা, অতসীর কথা, রাজগঞ্জের কথা, ভবিষ্যৎ আশা ও কল্পনার কথা একনিঃশ্বাসে সকলের কাছেই বলে ফেলতে সব সময়ে প্রস্তুত। বীরেশ্বর নিজের পারিবারিক কথা বিশেষ কিছু বলল না. তবে তাদের অবস্থা ভাল নয়, বাপ অসুস্থ, এমনি দু-একটা খবর শোনাল কথাপ্রসঙ্গে। সে নিজে খুব রাজনীতি চর্চ্চা করে, দেশের অবস্থা নিয়ে ভাবে, বড় বড় নেতাদের মতামত, যুক্তিতর্ক অনর্গল বলে যেতে পারে। সেদিন বিকেলের আলাপ-আলোচনার পরে উৎপলের মনে হোল, বীরেশ্বর তার চেয়ে অনেক বেশী পড়াশুনো করেছে, খবরও রাখে অনেক কিছুর। নতুন বন্ধুর প্রতি সম্ভ্রমের ভাব এল তার মনে।

কিছুকাল পরে একদিন কলেজে বীরেশ্বর তাকে এসে ধরল, সে একটা নাইট স্কুল খুলেছে তাদের পাড়ায়, ছাত্রদের জন্য বই শ্লেট কিনতে কিছু পয়সার প্রয়োজন, উৎপলকে চাঁদা দিতে হবে। উৎপলের জীবনে নিজস্ব আয় থেকে এই প্রথম চাঁদা দেওয়া। পকেটে সেদিন স্কলারশিপের টাকা ঝমঝম্ করছে। নিরুদ্বেগে একটা আস্ত টাকা দান ক'রে বসল। বীরেশ্বর খুসী হ'য়ে বলল, "এই তো চাই। তবে শুধু টাকা দিলেই হবে না ভাই, খাটতে হবে, মাঝে মাঝে এদের দু-একদিন মাষ্টারি না করে পার পাচ্ছ না।"

বীরেশ্বরকে বেশী কিছুই বলতে হয় না, উৎপলের মন রঙীন স্বপ্নের জাল বুনে ততক্ষণে বহু দূর এগিয়ে গিয়েছে। নাইট স্কুল, জিমন্যাসিয়াম, একদল শক্তিশালী উৎসাহী যুবক···জহরলাল···সুভাষ বোস···স্বাধীনতা। "চল্‌রে, চল্‌রে চল্, উর্দ্ধগগনে বাজে মাদল।"

বীরেশ্বরের নাইট স্কুল কিন্তু উৎপলকে প্রথম পরিচয়ে

অত্যন্ত নিরাশ করল। একতলার এক এঁদো ঘরে অতি ময়লা কাপড়-চোপড় পরা গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে পাড়ার মেথরদের, তারাই লেখাপড়া শিখতে এসেছে, আবার এদেরই যোগাড় করতে বীরেশ্বরকে তাদের বাপদের কম খোসামোদ করতে হয় নি। উৎপল ভেবে দেখল, রোজ রোজ বীরেশ্বরের কাছে অত উপদেশ পেয়েও তার মনটা সম্পূর্ণ 'ডেমোক্রিটিক' হয় নি এখনও। এদের লেখাপড়া শেখানোটা তার কাছে নিতান্তই পণ্ডশ্রম মনে হচ্ছে। সেদিন এ নিয়ে বীরেশ্বর তুমুল তর্ক করল। উৎপল তর্কে হেরে গেল সহজেই, কিন্তু তবু সায় দিতে পারল না। এই এঁদো ঘরে অন্ধকারে বসে অ, আ, ক, খ, শেখার চেয়ে বাইরে গিয়ে ছুটোছুটি ক'রে খেলা করলে আর তাদের বাপ-পিতামহের ব্যবসা শিখে তাই ক'রে গেলে এদের পক্ষে এমন কি ক্ষতি তা সে বুঝতে পারল না। বীরেশ্বর বোঝাল, এরা এদের কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় না, সমাজের কাছে এদের যথাপ্রাপ্য সম্মান পায় না, অথচ দাবী করার কথাও এদের মনে হয় না, নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে এরা এতই অজ্ঞ। সেই আত্মসম্মানবোধ ও কাজের উপযুক্ত মূল্য দাবী করতে শিখবে এরা, লেখাপড়া শিখতে পারলে।

বিকেলে সেদিন কলেজের পরেই বীরেশ্বরের সঙ্গে সে চলে এসেছিল, এতক্ষণে দু-জনের পেটেই কিছু পড়ে নি, খুব ক্ষিধে পেয়েছিল উৎপলের। সে মেসে ফেরবার জন্য ব্যস্ত হোল। বীরেশ্বর তার সঙ্গে কয়েক পা এসেই একটা বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, "আমি আর যাচ্ছিনে এখন।"

উৎপল উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল, "এইটে বুঝি তোমাদের বাড়ী?"

সে আশা করেছিল বীরেশ্বর তাকে হয় তো ভেতরে যেতে ডাকবে, কিন্তু তার কাছ থেকে আহ্বান না পেয়ে সে আর দাঁড়াল না। কয়েক পা গিয়েছে, হঠাৎ পেছন থেকে বীরেশ্বর ডেকে বলল, "উৎপল, এস আমাদের বাড়ীতে একটু বসে যাও। কিছু মনে কোর না ভাই, অনেক দিনই ভেবেছি তোমাকে আসতে বলব, কিন্তু সাহস হয় না। তুমি প্রভাতের বাড়ী মাঝে মাঝে যাও জানি, তারা কত আদর যত্ন করে, আমরা তো সেসব কিছুই পারবো না।"

উৎপল বাধা দিয়ে বলে উঠল, "বাঃ, প্রভাতের বাড়ী যাওয়া-আসা আছে বলে আমার নিজের অবস্থাও রাতারাতি বদলে গিয়েছে নাকি। আমার মেসের খাওয়া থাকা তো দেখেছ?"

খুসী হ'য়েই সে বীরেশ্বরের সঙ্গে তার বাড়ীতে প্রবেশ করলে। সে দিনটা আজও চোখ বুঁজলে এখুনি মনে করা যায়।

তার পর কত দিন কেটে গিয়েছে।

সবিতা কাছে এসে ডাকল, "খোকা, চোখ বুঁজে কি ঘুমুচ্ছিস নাকি, ওঠ্, এই তো সবে সন্ধ্যে উৎরেছে।

উৎপল উঠে ব'সে দেখল একখানা রেকাবীতে দু'খানা পরোটা, একটু আলুভাজা ও একপাশে একটু চিনি। সবিতা তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, "খেয়ে নে, কতক্ষণ পেটে কিছু পড়ে নি, মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। খুকীও এসে পড়বে, আলুভাজা দিয়ে পরোটা খেতে সে ভারী ভালোবাসে, তাই বিকেলে করে রেখেছিলাম। কেন, খাবি নে কেন? তোর কি শরীরটা আজ ভালো নেই?" উৎপলের কপালে হাত দিয়ে বলল, "যা ভেবেছি, গা যেন বেশ গরম বোধ হচ্ছে, খারাপ লাগছে খোকা?"

উৎপল দু-হাত দিয়ে মায়ের কোমর জড়িয়ে বলল, "না, তোমার হাতটাই গরম, আমার কিছু হয় নি। তুমি ব'স আমার কাছে। কলকাতা আসার পর থেকে আর তুমি আমার সঙ্গে বেশী কথাই বল না।"

ছেলের অভিমান-ক্ষুণ্ণ কণ্ঠস্বরে সবিতার মনে অপূর্ব্ব মমতা এল, সেই সঙ্গে সে খুসীও হোল একটু। অনেক দিন ছেলে তার অত কাছে আসে নি। কলকাতা আসার পর ছেলে-মেয়ে দু'জনেই যেন আরো দূরে চলে গিয়েছে, তারা সবিতারই ছেলেমেয়ে, তবুও তারা যে জগতে বাস করে সবিতা সেখানকার পথ জানে না। ঘুড়ি ওড়াবার সময় সুতোটা যেমন হাতে থাকে, ঘুড়ি উড়ে যায় নীল শূন্যে, সে যেমন তখন আর পৃথিবীর নয় আকাশের, সবিতার ছেলেমেয়েও তেমনি তার কোলের কাছে থেকেও অনেক দূরের মানুষ। মণিমালার সুখ-দুঃখ রুক্ষ মেজাজ

সে বুঝতে পারে, অতসীকে কেন কিছু বোঝা যায় না?

"কি চাস তুই খোকা, কি হয়েছে তোর বল্ তো?"

উৎপল শুনে হাসে, কিছুই বলে না। সবিতা তো জানে না, উৎপল নিজেই বুঝতে পারে না সে কি চায়, কি পেলে সে ঠিক খুসী হবে? প্রত্যেক মানুষই কি একেবারে একা নয়, সম্পূর্ণ অন্ধ নয়? নিজের ঘরের চাবি খুঁজে পায় নি যে লোক, সে নেবে অপরের হৃদয়-রহস্যের সন্ধান? উৎপল ভাবে, মলিনার কাছে আমি জীবন-সংগ্রামে পেছিয়ে-পড়া অক্ষম, দুর্ব্বল, ভীরু পলাতক সৈনিক। অতসীর মনের কথা জানিনে, জানিনে রমেশ-দা আমায় কি ভাবে। মা ভাবেন, আমি একদিন তাকে চাঁদ পেড়ে এনে দেবো, অসাধ্য সাধন করব কিছু, কিন্তু আমার মধ্যের আসল লোকটাকে এরা কেউ কি জানে? কেন জানে না? আমি নিজেই যে জানিনে। এই না জানার সমস্যা পূরণ হবে কোন্ উপায়ে?

ক্রমশঃ

পরেশনাথের পথে

(ভ্রমণ)

[শেষ অংশ]

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

পাহাড়ের পথ বাহিয়া যতই উপরে উঠিতেছি ততই নীচের বাড়ীঘর, গাছপালা, মানুষ সবই ক্রমে অধিকতর ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইতে লাগিল, কবি হেমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে পারা যায়, "ক্রমে ক্ষীণ, ক্রমে লীন মসীবিন্দুবৎ।"

আমি চলিয়াছি আগে আগে, পিছনে চারু-দা আসিতেছেন। খুব যে জোরে হাঁটিতেছি তাহা নয়। কিন্তু পিছন হইতে চারু-দা হাঁকিলেন, "আরও একটু আস্তে চলুন।"

ফিরিয়া দেখি তিনি রাস্তার পাশে শিলাখণ্ডে বসিয়া কমলা লেবু ছাড়াইতেছেন। তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া আমি বেশ একটু দমিয়া গেলাম। আধ মাইল না উঠিতেই কমলা লেবু—তবেই হইয়াছে। মনে মনে একটু রাগও হইল। কিন্তু উপায় কি? দশ-পনর মিনিট জিরাইয়া চারু-দা যাত্রা সুরু করিলেন, কিন্তু এবার সামান্য কিছু দূর উঠিয়াই আবার বসিয়া পড়িলেন। তার পর আবার কিছু দূর উঠিয়া আবার বসিলেন। এই ভাবে চলিতে চলিতে এক মাইল তো কোনও রকমে উঠি লেন, কিন্তু রাস্তার পাশে একটি হরিতকী গাছের গো পর্য্যন্ত আসিয়া তাহার ছায়াবহুল পাদদেশে সটান শুইয়া পড়িলেন এবং সাফ জবাব দিলেন, "আমার দ্বারা পাহাড়ে ওঠা সম্ভব হবে না, কিছু সুস্থ বোধ করলেই আমি নীচে নেমে যাবো, আপনি গাইড সঙ্গে করে উপরে যান।"

মন নিরুৎসাহে ভরিয়া উঠিল। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় এই জঙ্গলাকীর্ণ নির্জ্জন পার্ব্বত্য পথে সবেমাত্র অপরিচিত সাঁওতাল গাইড ভরসা করিয়া চারু-দাকে পিছনে ফেলিয়া আমার পর্ব্বতারোহণ সমীচীন কিনা চিন্তা করিয়া মন সংশয়াকুল হইয়া উঠিল, অথচ নিজের অদম্য কৌতূহল নিবৃত্ত করা সম্ভবপর হইতেছে না। কিছুক্ষণ দুই জনেই নির্ব্বাক্। হঠাৎ চারু-দা বেশ মেজাজের সঙ্গে (কোট-প্যাণ্ট পরা ছিল বলিয়া বোধ হয় জলদগম্ভীর আওয়াজে তিনি গাইডকে আদেশ দিতে পারিয়াছিলেন) হুকুম করিলেন "আমি

ধর্ম্মশালায় ফিরে যাচ্ছি। বাবুকে সন্ধ্যার আগেই ফিরিয়ে নিয়ে আসিস।"

চারু-দা তো হুকুম করিয়াই খালাস, কিন্তু আমার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল। তেমনই কি ছাই পথে একজনও যাত্রী আছে যে তাহার সঙ্গ লইব। যত লোক কি কলিকাতা সহরে? পথ চলিতে গেলে গায়ের ছাল থাকে না। একেই বলে অদৃষ্ট। ভাস্বরক সিংহের আহার্য্য হিসাবে নিজ পালার দিনে শশক যেমন ধীরে ধীরে চিন্তাকুল মনে যাত্রা করিয়াছিল আমারও মনের অবস্থা তদ্রূপ হইয়াছিল ঐ জঙ্গল দেখিয়া। সিংহ ও শশকের উপাখ্যান পুঁথির পাতায় নিবদ্ধ, কিন্তু আমার ভাগ্যে হয়ত সেই নিবিড় অরণ্য-পথে ভাস্বরকের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী না হউক অন্ততঃ তাহার মাসতুতো ভাই ব্যাঘ্রাচার্য্যের সাক্ষাৎ যে বাস্তবতায় পরিণত হইতে পারে সে বিষয় একরূপ নিঃসন্দেহ হইয়া চিন্তাকুল হৃদয়ে গাইডের পিছনে পিছনে ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলাম। পর্ব্বতগাত্রের বিচিত্র শোভাময় বনভূমির (যাহা বাংলাদেশে দুর্লভ) মধ্য দিয়া চলিয়াছি, অথচ সে সৌন্দর্য্য কিছুতেই অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, যেন পাষাণময় বক্ষ-কবাটে ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। এইরূপে পথ চলা বড়ই কষ্টকর। প্রায় দুই মাইল চড়াইয়ের পর বনমধ্যে বিচরণশীল সাঁওতাল রাখাল বালকদিগের সুমধুর বংশীধ্বনি ও তাহাদের গো-মহিষাদির গলার অপূর্ব্ব ঘণ্টাধ্বনি আমার বিক্ষিপ্ত মনকে প্রকৃতির মন্দিরের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট করিল যেমন করিয়া সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টাধ্বনি মন্দিরের দেববিগ্রহের প্রতি ভক্তজনের মন আকৃষ্ট করে।

পাহাড়ের পাদদেশ হইতে চূড়ায় উঠিবার কোনও সোজা রাস্তা থাকিলে তাহা এক মাইলের বেশী হইত না, কিন্তু সেরূপ রাস্তা তৈয়ারী সম্ভব হয় নাই বলিয়া অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমির উপর দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ছয় মাইল দীর্ঘ রাস্তা করিতে হইয়াছে। তিন মাইল অতিক্রম করিবার পর অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়াতে কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করিবার প্রবল ইচ্ছা হইতে লাগিল। প্রথমে যে উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া পাহাড়ে উঠিতে সুরু করিয়াছিলাম ক্রমেই তাহা মন্দীভূত হইতে দেখিয়া গাইড একখান লাঠি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিল ও তাহাতে ভর দিয়া উঠিতে বলিল। তাহার পরামর্শ অনুযায়ী এক্ষণে কষ্ট কম হইতে লাগিল। বৃদ্ধ লোকদিগের সমতল ভূমিতেই যষ্টি আবশ্যক হয় দেখিতে পাই—কিন্তু পাহাড়ে উঠিতে যুবকদিগের ক্ষেত্রেও যে তাহা অন্ধের নড়ী এখন বেশ তাহা বুঝিলাম। আরও কিছু রাস্তা চলিবার পর একটি ঝরণার পাশে পথিকদিগের কষ্ট অপনোদন করিবার জন্য কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যে বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন সেখানে বিশ্রাম করিবার জন্য গাইড অনুরোধ করিল। সেই অরণ্য মধ্যে যেরূপ সুবন্দোবস্ত আছে—আবশ্যক বোধ করিলে এক-আধ দিন বেশ আরামে থাকাও যায়, এমন কি একজন লোক পর্য্যন্ত সেবাব্রতীরূপে সর্ব্বদাই মোতায়েন আছে। আমি এখানে না বসিয়া নীচে নামিয়া একটি বড় পাথরের উপর বসিয়া ঝরণার জলে কিছুক্ষণ পা ডুবাইয়া রহিলাম। যেন কোন যাদুকরের মন্ত্রবলে আমার সমস্ত পথশ্রম দূরীভূত হইল। মিসেস রায় গিরিডি হইতে টিন ভর্ত্তি করিয়া যে খাবার দিয়াছিল তাহা নিজে খাইলাম ও গাইডকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া অঞ্জলি ভরিয়া ঝরণার সুশীতল জল আকণ্ঠ পান করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। এবার মনে করিলাম পথে আর কোথাও বিশ্রাম না করিয়া বাকী তিন মাইল পথ এক রোখে উঠিয়া যাইব। আমার এ অভিপ্রায় গাইডকে জানাইলে সে বলিল, "বাবু শর্টকাট করে গা?"

পাছে বাঙ্গালী বাবু লোকের অক্ষমতা প্রকাশ পায় সে জন্য কোনও রূপ দ্বিধা বা ইতস্ততঃ না করিয়াই জবাব দিলাম—"আলবৎ করেগা!"

এবার রাস্তা ছাড়িয়া সে জঙ্গলে প্রবেশ করিল। তাহার অনুসরণ করিতে আমাকে কখনও বড় বড় পাথর ডিঙ্গাইতে হইতেছে, কখনও বা লম্বমান লতা ধরিয়া দোল খাইয়া আর একটা পাথরের ওদিকে নামিতে হইতেছে, কখনও বা কাঁটাঝোপের ভিতর দিয়া গুড়ি মারিয়া কিছু দূর চলিতেছি, আবার রাস্তায় উঠিতেছি। যতই এইরূপ 'শর্টকাট' করিতে লাগিলাম ততই রাস্তা অধিকতর বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমাগত চড়াই উঠিয়া আমার যেন নাভিশ্বাসের মত হইতে লাগিল। পরশ-পাথরের সংস্পর্শে আসিলে লৌহ সুবর্ণ হয়—আর

অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আমার পদযুগল প্রস্তরের সংস্পর্শে আসাতে পাষাণময় হইয়া গেল। চরণযুগল এত ভারী বোধ হইতে লাগিল যে টানিয়াও তুলিতে পারিতেছি না। চীনদেশের অপরাধীদিগের একখানি ছবিতে দেখিয়াছিলাম শিকল দিয়া তাহার পায়ের সঙ্গে পাথর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাই অহিংসার সিদ্ধপীঠে আমার ন্যায় জীবহিংসাকারী প্রবেশ করিতেছে বলিয়া পার্শ্বনাথ আমার পায় অদৃশ্য কোন ভার বাঁধিয়া দিয়া শোধন করিয়া লইতেছেন নাকি? রাস্তার দূরত্ব যতই সংক্ষেপ হইতে লাগিল আমি ততই অধিক ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলাম। শর্টকাট ছাড়িয়া ভাল রাস্তায় পড়িয়া তখনও প্রস্তরফলকে দুই মাইল লেখা দেখিয়া হতাশ হইয়া গাইডকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হাঁ রে আর কতদুর? জিজ্ঞাসা করিলেই যেন রাস্তার দূরত্ব কমিয়া যাইবে।

গাইড বলিল, "বাবু উ বাত মৎ পুছিয়ে, আউর থোড়া দূর হ্যায়, উপরমে দেখিয়ে ওহি মন্দিল দেখা যাতা হ্যায়।

"মন্দিল তো দেখা যাতা হায়," কিন্তু আমার যে আর পা চলে না। উপরে চাহিয়া মনে হইল আর ২০।২৫ মিনিট বড় জোর আধ ঘণ্টা উঠিতে পারিলেই চূড়ায় পৌঁছাইয়া যাইব। আর শর্টকাট করিলে অতও লাগিবে না—। বনের মধ্য দিয়া শর্টকাট করা ও তাহার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করার জ্বালায় কোনও ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াইয়া দুই দণ্ড সেই বিরাট পার্ব্বত্য বনভূমির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া পথশ্রান্তি দূর করিব তাহারও কোন সুযোগ নাই। কিন্তু উপায় কি? পথ চলিতে চলিতে কেবলই মনে হইতে লাগিল, পোড়া রাস্তার কি শেষ নাই? হঠাৎ উপরে বনমধ্যে মনুষ্য-কণ্ঠস্বরে চমকাইয়া উঠিলাম। সে দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। গাইডকে জিজ্ঞাসা করিলাম "হাঁ রে মানুষের শব্দ কোথা হইতে আসে?"

"বাবুজী কৈ লোক তীরথ সে লোওটতা হ্যায় উনলোক কা আওয়াজ দেতা"।

আহা রে যদি ধর্ম্মশালায় বিলম্ব না করিয়া তখনই রওনা হইতাম তাহা হইলে ফিরিবার সময় অন্ততঃ ইহাদের সঙ্গ লইতে পারিতাম, কিন্তু এখন এ আপশোষ করা বৃথা। সুতরাং সাঁওতাল গাইড অনুসরণ করা ছাড়া উপস্থিত গত্যন্তর নাই। চড়াইয়ের পাঁচ মাইলের মাথায় গবর্ণমেণ্ট নির্ম্মিত রেষ্ট-হাউসে পৌঁছাইয়া তাহার বারান্দায় সটান শুইয়া পড়িলাম। আমাকে তদবস্থ দেখিয়া গাইড কিছু ঘাবড়াইয়া গেল। ছুটিয়া আমার কাছে আসিয়া বোতল হইতে জল লইয়া আমার মুখে চোখে দিল, পা দুখানি কোলে তুলিয়া লইয়া টানিয়া দিতে লাগিল। এইরূপ হাত পা টেপাটিপি করিয়া গাইড আমাকে কিছু চাঙ্গা করিয়াও তুলিল। অজানা বনপথে চারু-দা যখন এই সাঁওতাল সঙ্গীসহ রওনা করিয়া দিয়াছিলেন তখন আমি ইহাকে কতই না সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলাম সে কথা এখন মনে হইতেই অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম। আর মাত্র এক মাইল রাস্তা বাকী, তাহাও শর্টকাট করিলে অন্ততঃ সিকি মাইল দূরত্ব কমিয়া যাইবে। সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া এই 'তাল গাছের আড়াই হাত' উঠিতে কোমর বাঁধিলাম। উপর হইতে যাঁহাদের কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল তাঁহারা সশরীরে আমাদের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম একটি মাড়োয়ারী ভদ্রলোক সপরিবারে তীর্থ দর্শন করিয়া ফিরিতেছেন। এই মাড়োয়ারী ও তাঁহার স্ত্রীর পক্ষে না হয় এই ছয় মাইল চড়াই উঠিয়া ছয় মাইল উৎরাই আসা সম্ভব, কিন্তু তাহাদের কিশোরী বালিকা বা ৭।৮ বৎসরের বালক পুত্রের পক্ষে [illegible] কি রূপে সম্ভব হইয়াছে তাহা আমাদের মত বাঙ্গালীর কল্পনার বহির্ভূত—আমার মত যোয়ান লোকই যখন নাটাইয়া পড়িয়াছে। আমাকে ক্লান্ত দেখিয়া তাঁহারা সহানুভূতি সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বনপথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

মনে মনে ঐ মাড়োয়ারী পরিবারের কষ্ট সহিষ্ণুতার কথা স্মরণ করিয়া নিজ কাতরতায় লজ্জিত হইলাম এবং পরমুহূর্ত্তে মনে জোর করিয়া গাইডকে পিছনে ফেলিয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া উঠিতে আরম্ভ করিলাম এবং ঐ বাকী পথটুকু এক নিঃশ্বাসে উঠিয়া মন্দিরের পাদদেশে পৌঁছিলাম। তখন বেলা সাড়ে তিনটা। এখান হইতে একশত সিঁড়ি বহিয়া তবে মন্দিরে পৌঁছিতে হইবে। এক একবার মনে হইতে লাগিল একটু জিরাইয়া যাই,

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সেই মাড়োয়ারী বালক-বালিকাদিগের কষ্টসহিষ্ণুতার কথা মনে করিতেই সোপানপ্রান্তে অপেক্ষা না করিয়া এক দুই তিন করিয়া গুনিতে গুনিতে শেষ ধাপ অতিক্রম করিয়া পার্শ্বনাথের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। সেই সুউচ্চ চূড়ায় পৌছাইয়া পার্শ্বনাথের কৃপায় কি প্রকৃতির কোমল স্পর্শে জানি না আমার সকল কষ্ট দূর হইল—দীর্ঘ পথশ্রম এখন আমার সার্থক।

মন্দিরটি প্রায় একশত হাত পরিমিত সমতল প্রস্তর-মণ্ডিত চত্বরের মধ্যস্থলে অবস্থিত, আর চত্বরপ্রান্ত প্রস্তরের রেলিং দিয়া ঘেরা। মন্দিরাভ্যন্তরে শ্বেত প্রস্তরময় পার্শ্বনাথের ধ্যানী মূর্ত্তি ভক্তগণ রত্নময় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

চতুর্দ্দিকে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! একবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিলাম, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া গেল। পুনরায় ঘুরিলাম, কিন্তু অতৃপ্ত বাসনা মেটে কৈ? আবার তৃতীয়বার ঘুরিলাম। ধানবাদ হইতে একদল মাইনিং ক্লাসের ছাত্র ছুটির দিন আমোদ করিতে পরেশনাথ আসিয়াছে। আমাকে ক্রমাগত ঐ রূপ ঘুরিতে দেখিয়া দেবদর্শনান্তর মন্দির পরিক্রমণ করিতেছি অনুমান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কোন্ দিক হইতে উঠিয়াছি এবং কখন নামিব। যদিও তাঁহারা মধ্যপথে আমাকে ছাড়িয়া ইস্রির পথে নামিয়া যাইবেন, তথাপি তাঁহাদিগকে আমার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া আর একবার চত্বরের চারিধারে ঘুরিলাম। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী যেন মুহূর্ত্তে বদলাইয়া গেল। বনপথে উঠিবার সময় সীমাবদ্ধ গণ্ডী পার হইতে হইতে পথিপার্শ্বের হরিতকী, আমলকী, মহুয়া, পলাশ, কেঁদ প্রভৃতি যে সকল বনস্পতি জাতীয় বৃক্ষ, ক্ষুদ্র বৃহৎ অজানা লতাগুল্ম যাহার শ্রেণী ও জাতিভেদ করিতে পারিয়াছিলাম—এখন তাহার সকল ভেদ ঘুচিয়া গিয়া এক বিশাল বনভূমিতে পরিণত হইয়াছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চতুর্দ্দিকই শ্যামলতায় পরিপূর্ণ। পর্ব্বতগাত্রের বনভূমি কে যেন সযত্নে স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তীর্থঙ্করদিগের শ্বেতবর্ণ সমাধিমন্দির নিবিড় বনমধ্য হইতে অতি প্রাচীনকালের সাধনকৃচ্ছ্রতা দর্শকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। নবীন সঙ্গীদিগের তাড়ায় অস্তাচল-গামী সূর্য্য সুদূর দিকবলয় পর্য্যন্ত যে সোনালী রং-এর পোঁচ টানিয়া বনভূমীর নূতন রূপ ধরাইবে তাহা দেখা ভাগ্যে আর হইল না। আহা, চারু-দা যদি আসিতে পারিতেন তাহা হইলে দু'জনে ভাব বিনিময় করিয়া সূর্য্যাস্ত দৃশ্য ত উপভোগ করিতামই, এবং রাত্রে সেখানে থাকিয়া প্রভাতে সূর্য্যোদয়ে প্রকৃতির নবকলেবর দেখিয়া তবে ফিরিতাম। ইস্রির পথের সংযোগস্থলে আমার নবীন সঙ্গীদল নমস্কার জানাইয়া কলরব করিতে করিতে বনপথে অদৃশ্য হইলেন। তাঁহাদের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। আমি যে তিমিরে ছিলাম আবার সেই তিমিরে, ভরসা সবে ধন গাইড। তবে মধ্য পথে তাহার সেবা পাইয়া পূর্ব্বের ভীতিপূর্ণ বিরুদ্ধ ধারণা অন্তর্হিত হওয়ায় এখন সে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য মনে হইল। চড়াইয়ের সময় কেবলই হাঁফাইয়া উঠিতেছিলাম আর পা ধরিয়া আসিতেছিল, আর উৎরাইয়ের সময় এক নূতন বিপত্তি দেখা দিল। নিম্নগামী গতির দরুণ সারাদেহ ঝাঁকানিতে পায়ের আঙুল, মাংসপেশী আলোড়িত হইয়া আর একরূপ আস্বস্তিকর কষ্ট হইতে লাগিল। অন্ধকারের ভয়ে নীচে নামিবার তাড়াসত্ত্বেও জিরাইয়া লইবার জন্য মাঝে দাঁড়াইয়া দেখিলাম কোথাও বন্য কলার বন, কোথাও বন্য শেফালী, কোথাও কাঁটাবাঁশ বন। হঠাৎ এগুলি দেখিলে মনে হয়, কেহ বোধ হয় সযত্নে চাষ করিয়া এইরূপ পৃথক পৃথক বাগান করিয়া রাখিয়াছে। অপরাপর বৃক্ষ-লতার কোথাও এরূপ একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, এখানে চাষ করা বাগানের মধ্যে দেখিলাম পর্ব্বতগাত্রে স্তরে স্তরে সাজান একটি পরিত্যক্ত চা-বাগান।

ক্রমে দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন। নিস্তব্ধ বনভূমি নূতন সাজে সজ্জিত হইল। নানা জাতীয় পাখীর ঝাঁক যেন পরমেশ্বরের জয়গানে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া চারু-দা ধর্ম্মশালা হইতে আসিয়া কিছু দূরে আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমরা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম চলুন আগে বাসায়

পৌঁছিয়া চা খাইয়া একটু চাঙ্গা হই, প্রাণ যে এদিকে কণ্ঠাগত।

চারু-দা বলিলেন, "তার আর ভাবনা কি, আমি গৃহস্থালীর পাকা বন্দোবস্ত করেছি—চা তো চা যায় রাত্রে খিচুড়ি, আলুভাজা ধোঁধলের তরকারী, রাবড়ী ও ভেলীগুড় পর্য্যন্ত। রান্না করবার একটি পাকা লোকও যোগাড় হয়ে গেল, তার কাছে চা, চিনি, দুধ কিনে দিয়ে জল গরম করতে বলে এসেছি। বাসায় পৌঁছিতে যা দেরী সঙ্গে সঙ্গে Hot Tea।"

ধর্ম্মশালায় পৌঁছাইয়া চারু-দা হাঁকিলেন—"পণ্ডিতজী জলদী চা।"

"চা বান্‌তা হ্যায় হুজুর," জবাব আসিল।

পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট গেল, ক্রমে আধ ঘণ্টার কাছাকাছি তবু চায়ের দেখা নাই। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য নিজেই রান্নাঘরে গিয়া দেখি চারু-দার পণ্ডিতজী এক ডেক জল উনানে চাপাইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুঁ পাড়িতেছে। আমি বলিলাম, "আরে অত জল কি হবে, ও যে সমস্ত রাত্র জাল দিলেও গরম হবে না। ওটা নামিয়ে রেখে ঐ জল কেটে নিয়ে লোটায় করে গরম কর।"

পণ্ডিতজী বলিল,—"নেই বাবুজী, আবি থোড়া দেরিসে হো যায়েগা, উস্‌মে চা, চিনি, আউর দুধভি ছোড় দিয়া। হুকুম হৈ ত হাণ্ডিকা মু মে আপন ধোতি লাগায়কে আপকা লিয়ে লোটাভর উতার দেগা।"

অবস্থা দেখিয়া আমার পিত্ত জ্বলিয়া গেল। থাক বাবা আর উতার দিয়ে কাজ নেই। বড় এক হাঁড়ী জলে ত দু পয়সার চা, চিনি আর ছটাকখানেক দুধ দিয়া ত ঘণ্টাখানেক জাল দিচ্ছ, তার উপর তোমার ঐ প্রপিতা-মহের আমলের ধুতি দিয়ে ছাঁকা চা খাইয়ে আর কাজ নেই। আমার চা খাওয়ার প্রবৃত্তি মুহূর্ত্তে উবিয়া গেল। ফিরিয়া আসিতেই চারু-দা বলিলেন, "আমার চা কই?"

"বড় ক্লান্ত হয়েছি চারু-দা, আপনি খেয়ে আসুন আর আমার জন্য আর এক গ্লাস আনবেন, খেয়ে যেন কেমন তৃপ্তি হোলো না।"

চারু-দা রান্নাঘরের দিকে যাইতেই আমি উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। চারু-দার কর্কশ চীৎকার কানে আসিল, "ব্যাটা তুই যখন কিছু জানিস না তখন মুড়ুলী কত্তে গেলি কেন? উনি বলেন কিনা কল্‌কাত্তাওয়ালা বাবুদের বহুত দফে খিলায়া—আমার পিণ্ডি খিলায়া হারামজাদা"

চারু-দাকে তাহার গলায় গামছা দিয়া টানিতে টানিতে আসিতে দেখিয়া হাসিও পাইল, দুঃখও হইল। ছুটিয়া গিয়া ছাড়াইয়া দিয়া তাহার চুক্তি করা মজুরীর পরিবর্ত্তে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া জোরে একটি ধাক্কা দিলাম। পণ্ডিতজী সেই গতিবেগের সহিত নিজ গতিবেগ যোগান দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া নিমিষে আদৃশ্য হইল। আমি হাসিতে লাগিলাম আর চারু-দা গজরাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় চা, চিনি, দুধ আনিয়া তৃপ্তি সহকারে দুই গ্লাস করিয়া চা খাওয়া গেল (এক গ্লাস ক্ষতিপূরণ স্বরূপ) এবং চারু-দার ব্যবস্থমাত খিচুড়ী চাপান হইল। গাইড আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল, বোধ হয় তাহারও দুটি প্রসাদ পাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু চারু-দাকে মারমুখো দেখিয়া বলিতে ভরসা পাইতেছিল না। তাহার মনোভাব বুঝিয়া আমি তাহাকে অভয় দিলাম। তখন সে নিশ্চিন্তে শুইয়া পড়িল এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নাক ডাকাইতে সুরু করিল।

সকালে উঠিয়া ধর্ম্মশালার জিনিসপত্র বুঝাইয়া দিয়া পূর্ব্ব দিনের গাইডকে কুলীরূপে লইয়া মোটর-বাস ধরিবার জন্য গিরিডি হাজারীবাগ রাস্তার সংযোগস্থলে আসিয়া পৌঁছান গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিষ্ক্রিয় ভাবে মোটরের প্রতীক্ষায় হাজারীবাগের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মোটর ধ্যান ও মোটর জ্ঞান হইয়া উঠিল, কিন্তু মোটরের দেখা নাই। এদিকে বেলাও প্রায় ১১টা বাজিল। জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তার ধারে না আছে কোনও আশ্রয়, না আছে কোনও খাবারের দোকান যে এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া খাই। শুধু সিনারীতে তো পেট ভরে না। রাস্তার নয়নজুলি বহিয়া দুইটি লেংটিপরা সাঁওতাল বালক মহিষের পিঠে উপুড় হইয়া শুইয়া আমাদের দিকে পিট পিট করিয়া চাহিয়া চলিয়া গেল। নিকটে কোথাও খাবার দোকান অথবা মুড়ী চিঁড়া বা ঐ জাতীয় কোন খাবার পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কোনও কথা বলিল না, একটু কুটিল হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল—ভাবটা "গরজ থাকে খুঁজে নেও।"

আসিবার সময় পরেশনাথ-হাজারীবাগ রাস্তার সংযোগ-স্থলের অনতিদূরে একটি ছোট বাজার ও থানা দেখিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু ফিরিবার সময় এত বিপদ ঘটিবে বুঝিতে পারিলে তাহার দূরত্ব অনুমান করিয়া রাখিতাম। এখন মনে হইতে লাগিল অনুমান এক দেড় মাইল হইবে। কিন্তু মোট বহিবার লোক কৈ? হঠাৎ চারু-দা স্বাবলম্বনের মহিমা কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন, এবং বড় মোটটি পিঠে ফেলিয়া রওনা হইলেন, অগত্যা আমাকেও অন্যটি লইয়া তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইল। পরিশ্রান্ত হইয়া ছোট্ট বাজারটিতে পৌঁছাইয়া ধপাস করিয়া একটি খাবারের দোকানের সামনের মাচায় বসিয়া পড়িলাম। যেমন ক্ষুধা পাইয়াছে তেমনই তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু খাবারের দোকানের দিকে চাহিতেই যেন অগ্নি-মান্দ্য হইল। ধূলিধূসরিত ডালায় যোয়ারের লাড্ডু, গোময়লিপ্ত চাঙ্গারিতে ছোলা, যব ও মকাইয়ের ছাতু বেশ চাপিয়া চাপিয়া চূড়া করিয়া সাজান এবং তাহার গায় কাচা লঙ্কা বেঁধান। একটি ছেঁড়া চটে খানিকটা ভেলিগুড়। কিন্তু ঐ দ্রব্যের উপর মিষ্ট রসলুব্ধ মক্ষিকাকুল উড়িয়া না বেড়াইলে তাহা লাল জমাট মাটী ছাড়া অন্য কিছু বলিয়া অনুমান করা আর আছে উপাদেয় ও সৌখীন খাবাত অবিশ্বাসের হাসি পিতলের উঁচু কাঁধাওয়ালা থালায়. মি তাহার আভাস অবিক্রীত খানকতক বাসী জিল জিলাপী তো কখনও দেখি আপনি শোনেন নি এখনো? বড় বড় কাঁচমাছি এমন ঘন্যি।"

জিলাপী দৃষ্টির অন্তরালেন, "টাকা!"

বিধাতা আজ অদৃষ্টে কি -এক-আধটা নয়, অনেক।"

এমন সময় সম্মুখের দিয়া সঙ্কেতে সে টাকার পরিমাণ সামরিক-কায়দায় বুটের করিয়া শব্দ করিয়া অ্যাটেন্ হইয়া গেলাম, বলে কি লোকটা? জানাইয়া বলিল দা পারি না। মনে মনে কেমন যেন সেলাম জানাইয়াছেন—আমার সম্প্রতি প্রাপ্ত কয়েক শত বলিলাম, দারোগা-সাক্ষাৎকর বলিয়া মনে হইল। কেন যেন ভুল কর নাই তো ছা হইল না গ্রামে ফিরিবার জন্য কনেষ্টবলকে জমাদারে করিলাম, তবুও তিনি তুষ্ট না হইয়া জানাইলেন যে আমাদেরই ডেকেছেন। আমি বলিলাম, "চারু-দা এই অপরিচিত স্থানে যখন বাঘে ছুঁয়েছে তখন আঠার ঘা নিশ্চয়ই ভাগ্যে আছে, সুতরাং প্রস্তুত হয়ে চলুন।" মনে মনে চিন্তা করিলাম এই সন্ত্রাসবাদের যুগে এরূপস্থানে বাঙ্গালীর স্বাবলম্বী হইয়া এই বিপদ ঘটিল, এখন পুলিসের ঠ্যালা সাম্‌লাইতে দেখিতেছি বহু কাঠখড় পোড়াইতে হইবে। থানায় পৌঁছাইতেই দারোগা সাহেব পরিষ্কার বাংলায় আমাদের নমস্কার জানাইয়া হাঁকিলেন "এই পাহারা জলদি দোঠো কুরসী লাও ঔর ভূরি ভূরি বাবুলোককো চীজ উঠায়কে লাও" দু-টাকা বেতন বাড়াইয়া 'জী হুজুর' বলিয়া সে করিয়াছে, কিন্তু তাহার কোন আমরা বসিয়া নাড়া দিতে পারে নাই। চাপ দিয়া বেশী বাঙ্গালী আদায় করিবে এমন কাঁচা লোক আমি নই। তাহা হইলে পৈত্রিক ভূ-সম্পত্তি আজ কোন্ শূন্যে মিলাইয়া যাইত। তবু সে টাকা পাইয়াছে। বুঝি না, টাকা দিয়া সে কি করিবে,—উড়াইয়া দিবে হয়তো। তাহাদের তিন বাপ-বেটার উপার্জ্জন আজ নূতন করিয়া আমার কাছে বেশ মোটা বলিয়াই মনে হইল।—বড়ছেলে পরাণ কামারের কাজ করে, মাসে দশ টাকা কি আর রোজগার না হয়! ছোটটিও এটা-ওটা ফাইফরমাস খাটে, পাঁচ-সাত টাকা সেই কি আর ঘরে না আনিয়া ছাড়ে। খাটিয়া খাইতে পারে উহারা। উহাদের ঘরে টাকা কেন যে যাচিয়া আসে তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া কেমন যেন বিব্রত হইয়া উঠিতেছিলাম। টাকার অকারণ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়া টাকার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া উঠিলাম। দুত্তোর বিচার! অথচ আমি বাড়ীর অপর অর্দ্ধেক অংশটুকু পাকা করিবার জন্য কত ফন্দীই না আঁটিতেছি! ইন্‌সিওরেন্স পলিসি বাঁধা দিয়া ধার করা, কি কোন একটা ব্যবসায়, এমনি কত রকম কৌশলের কল্পনা মাথা বিগড়াইয়া দিতেছে—অথচ কোনটাই কাজ হাসিল করিবার ইঙ্গিতটুকু পর্য্যন্ত দিতেছে না। তাহার কারণও যে বুঝি না তা নয়। কথাটা হইতেছে আমি লোকটি অতি সাবধানী। অন্যে হয়ত বলিবে কৃপণ। তাহারা হয়তো হাসিবে। তাহারা তো সেইটাই বড়

'এইবার চলুন বাসায় যাওয়া যাক্, অনেক বেলা হয়েছে,' বলিয়া দারোগাবাবু উঠিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কোয়ার্টারে আসিয়া পৌছাইলাম। বাসায় কোনও স্ত্রীলোক বা ছেলে মেয়ে না দেখিয়া মনে হইল বোধ হয় তিনি একাই থাকেন। তিনিই বলিলেন "নোংরা বাসা দেখে আপনারা হয় তো কি মনে করছেন, কিন্তু ঐ মহারাজই আমার একমাত্র ভরসা।" বলিয়া ঠাকুরকে দেখাইলেন। "মেয়েছেলের বালাই আমার নেই, সেসব হাঙ্গাম বছর দুই আগে ঘুচে গিয়েছে।"

ধর্ম্মশালা।আমাদের তেল মাথাইয়া দিয়া ইঁদারা হইতে
জলদী চা।" ...পির সহিত স্নান করা গেল।

"চা বান্‌তা হ্যায় হুজুর," জবাব আঁ...বর্ত্তে খবরের কাগজ

পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট গেল, ক্রমে

কাছাকাছি তবু চায়ের দেখা নাই। ব্যাপার কি দে...
জন্য নিজেই রান্নাঘরে গিয়া দেখি চারু-দার পণ্ডিতজ...
এক ডেক জল উনানে চাপাইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুঁ পাড়িতেছে। আমি বলিলাম, "আরে অত জল কি হবে, ও যে সমস্ত রাত্র জ্বাল দিলেও গরম হবে না। ওটা নামিয়ে রেখে ঐ জল কেটে নিয়ে লোটায় করে গরম কর।"

পণ্ডিতজী বলিল,—"নেই বাবুজী, আবি থোড়া দেরিসে হো যায়েগা, উস্‌মে চা, চিনি, আউর দুধভি ছোড় দিয়া। হুকুম হৈ ত হাণ্ডিকা মু মে আপন ধোতি লাগায়কে আপকা লিয়ে লোটাভর উতার দেগা।"

অবস্থা দেখিয়া আমার পিত্ত জ্বলিয়া গেল। থাক বাবা আর উতার দিয়ে কাজ নেই। বড় এক হাঁড়ী জলে ত দু পয়সার চা, চিনি আর ছটাকখানেক দুধ দিয়া ত ঘণ্টাখানেক জ্বাল দিচ্ছ, তার উপর তোমার ঐ প্রপিতা-মহের আমলের ধুতি দিয়ে ছাঁকা চা খাইয়ে আর কাজ নেই। আমার চা খাওয়ার প্রবৃত্তি মুহূর্ত্তে উবিয়া গেল। ফিরিয়া আসিতেই চারু-দা বলিলেন, "আমার চা কই?"

"বড় ক্লান্ত হয়েছি চারু-দা, আপনি খেয়ে আসুন আর আমার জন্য আর এক গ্লাস আনবেন, খেয়ে যেন কেমন তৃপ্তি হোলো না।"

চারু-দা রান্নাঘরের দিকে যাইতেই আমি উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। চারু-দার কর্কশ চীৎকার কানে আসিল, "ব্যাটা

পাতিয়া ঠাঁই করিয়া পিতলের কাঁধা-উঁচু থালায় ভাত, একদলা মহিষের দুধের মাখম, আলুভাজা, অড়হর ডাল ঢ্যাঁড়সের তরকারী ও এক বাটী দুধ দিয়া গেল।

পরিপাটী আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। বিকালে মোটর আসিলে দারোগাবাবু নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই আমাদের বিদায় দিলেন। মোটরে উঠিয়া তাঁহাকে নমস্কার ও ধন্যবাদ জানাইয়া বিদায় হইলাম। পিছনে চাহিয়া দেখি তিনি মোটরের দিকে চাহিয়া নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। মুখ বাড়াইয়া রুমাল উড়াইলাম তিনিও দুই হাত উঁচু করিলেন। মোটর মোড় ফিরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

ন
দিলাম
মিনিটের ম...
সকালে উঠি.
পূর্ব্ব দিনের গাইডকে
জন্য গিরিডি হাজারী... ছিল। বর্ষাকালে এই ...টা
পৌছান গেল। ঘণ্টার পরই অপেক্ষা করিয়া থাকে।
প্রতীক্ষায় হাজারীবাগের দি... ফসল বিক্রী ইত্যাদি মিলিয়া
ও মোটর জ্ঞান হইয়া উঠিল, আদায় হয়। আদায় প্রায়
এদিকে বেলাও প্রায় ১১টা বাত্তিই ভালই ছিল। সেদিন
ধারে না আছে কোনও আশ্রয়, নাআর অযথা বেশী দেরী
দোকান যে এক পয়সার মুড়ি কিনি টাকাটা ভালয় ভালয়
তো পেট ভরে না। রাস্তার ...রিলেই হয়। সিন্দুকে
লেংটিপরা সাঁওতাল বালক ম...রণ ফসলটা জন্মিয়াছিল
শুইয়া আমাদের দিকে পিট পিট...কা থাকিবে। তাছাড়া
গেল। নিকটে কোথাও খাবার দে...দায়ের কাজে নিজেকে
বা ঐ জাতীয় কোন খাবার পাও...র আর সে ধার দিয়া
করায় তাহারা কোনও কথা বলিল নানান্ দফায় চাঁদার
হাসিয়া চলিয়া গেল—ভাবটা "গর আর নালিশ করিবার

ভয় দেখাইয়া আমার জমির পাওনা ফসল কড়ায়গণ্ডায় উশুল করিয়াছি। নিজের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কড়া মেজাজের লোকের সন্ধান পাইয়া পুলকিত যে হইয়াছি এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং এ বিষয়ে ক্রমোন্নতি লাভ করিলে ঐ স্রোত হইতে আয়টা বিলক্ষণ বাড়িয়া যাইবে তাহা বুঝিতে পারিয়া আনন্দিত হইয়া উঠিতেছি। যাহোক দেরী আর একটা দিনও নয়,—আবার কোন্ চাঁদার ফর্দ্দ আসিয়া জুটিবে কে জানে!

আহার সমাধা করিয়াছি প্রায়, হঠাৎ বাহিরে লোকের কথাবার্ত্তা শুনিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। হায়রে আবার কোন ফ্যাঁকড়া আসিয়া জুটিল কে জানে! যাহোক আঁচাইবার জলপূর্ণ ঝারি লইয়া সেই দিকেই গেলাম, দেখি দুর্গাপুরের অন্ততঃ দশবার জন লোক, চোখে মুখে তাহাদের মূর্ত্তিমান কৌতূহল। সকলের চেয়ে উৎসাহী লোকটি আগাইয়া আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ মশায় শুনছেন?"

হতভম্বের মতো জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কী?"

লোকটি বলিল, "মশায়, গুরুতর,—তাই জানতেই তো আসা। আপনাদের গাঁয়ে রতন সরকার বলে একজন লোক আছে না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ আছে—তার হয়েছে কি?"

কিছুই জানি না দেখিয়া লোকটি অবিশ্বাসের হাসি হাসিল—তাহার চোখে মুখে আমি তাহার আভাস পাইলাম।

"সে বলিল, "সে কি মশায় আপনি শোনেন নি এখনো? টাকা পেয়েছে মশায়—টাকা।"

অবাক হইয়া বলিলাম, "টাকা!"

"হ্যাঁ মশায় টাকা—এক-আধটা নয়, অনেক।"

বলিয়াই হাত দিয়া সঙ্কেতে সে টাকার পরিমাণ দেখাইল।

কেমন যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম, বলে কি লোকটা? তবু অবিশ্বাস করিতে পারি না। মনে মনে কেমন যেন আহত হইয়া উঠিলাম—আমার সম্প্রতি প্রাপ্ত কয়েক শত টাকা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইল। কেন যেন আর দেরী করিতে ইচ্ছা হইল না গ্রামে ফিরিবার জন্ম মন ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

বাড়ী যাইবার পথেও নানান্ চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাত অনুভব করিতে লাগিলাম। টাকার কথাটাই বড় হইয়া মনের সবটুকুই দখল করিয়া বসিল। রতন সরকারকে চিনি,—খুব ভাল করিয়াই চিনি। দুই বেলা অন্ন জোটে না, সে কথা আমার চেয়ে বেশী কেহ জানে বলিয়া বিশ্বাস করি না। কারণ রতন আমাদের বাড়ীতে অনেক দিন ধরিয়া কাজ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, আর সেও অতি সামান্য বেতনেই। তাহার মত লোককে বেশী বেতন দিয়া কে রাখিবে? দশ টাকা বেতন বড় কম নয়। আর যখন উহার অর্দ্ধেক টাকায় তাহার মত ভূরি ভূরি লোক পাওয়া যায়। অনেক বার দু-টাকা বেতন বাড়াইয়া দিবার জন্য কাকুতি সে করিয়াছে, কিন্তু তাহার কোন যুক্তি আমাকে নাড়া দিতে পারে নাই। চাপ দিয়া বেশী বেতন আদায় করিবে এমন কাঁচা লোক আমি নই। তাহা হইলে পৈত্রিক ভূ-সম্পত্তি আজ কোন্ শূন্যে মিলাইয়া যাইত। তবু সে টাকা পাইয়াছে। বুঝি না, টাকা দিয়া সে কি করিবে,—উড়াইয়া দিবে হয়তো। তাহাদের তিন বাপ-বেটার উপার্জ্জন আজ নূতন করিয়া আমার কাছে বেশ মোটা বলিয়াই মনে হইল।—বড়ছেলে পরাণ কামারের কাজ করে, মাসে দশ টাকা কি আর রোজগার না হয়! ছোটটিও এটা-ওটা ফাইফরমাস খাটে, পাঁচ-সাত টাকা সেই কি আর ঘরে না আনিয়া ছাড়ে। খাটিয়া খাইতে পারে উহারা। উহাদের ঘরে টাকা কেন যে যাচিয়া আসে তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া কেমন যেন বিব্রত হইয়া উঠিতেছিলাম। টাকার অকারণ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়া টাকার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া উঠিলাম। দুত্তোর বিচার! অথচ আমি বাড়ীর অপর অর্দ্ধেক অংশটুকু পাকা করিবার জন্য কত ফন্দীই না আঁটিতেছি! ইন্‌সিওরেন্স পলিসি বাঁধা দিয়া ধার করা, কি কোন একটা ব্যবসায়, এমনি কত রকম কৌশলের কল্পনা মাথা বিগড়াইয়া দিতেছে—অথচ কোনটাই কাজ হাসিল করিবার ইঙ্গিতটুকু পর্য্যন্ত দিতেছে না। তাহার কারণও যে বুঝি না তা নয়। কথাটা হইতেছে আমি লোকটি অতি সাবধানী। অন্যে হয়ত বলিবে কৃপণ। তাহারা হয়তো হাসিবে। তাহারা তো সেইটাই বড়

করিয়া দেখিবে। এইটুকু বুঝিবে না যে টাকা জমানো আমার পেশা। চুরি করিয়া তো জমাই নাই, তাহাতে অন্যের কি বলিবার থাকিতে পারে? তাহাদের যাহা ইচ্ছা ভাবুক। কিন্তু সম্প্রতি রতন সরকারের টাকা প্রাপ্তির কথা আমার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল। উহার কুঁড়ে ঘরে টাকা রাখিবে কোথায়? কয়দিন রাখিবে! হা পোড়াকপাল, লক্ষ্মী দেবীর কি সে বুদ্ধিটুকুও যোগাইল না?

গ্রামে পৌছিতে না পৌছিতেই দু-চার জন লোকের সাক্ষাৎ পাইলাম। রতন সরকারের টাকা-প্রাপ্তির কথা জিজ্ঞাসা করার সাহস হইল না। কিন্তু সাহস না হইলেও ঘটনা আমার কর্ণগোচর হইল এবং রতন সরকার ও তাহার ছেলেদের টাকা লইয়া যাইতে স্বচক্ষে যাহারা দেখিয়াছে এমন লোকের সাক্ষাৎ পাইতেও বিলম্ব হইল না। মেহের কলু আমাকে রাস্তায় দাঁড় করাইয়া সেই কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা না করিয়া ছাড়িল না।—গোঁসাই-বাড়ীর নদীর ঘাটে সকালবেলা রতন আর তার ছেলেদের বড় বড় তিন ঘড়া টাকা লইয়া যাইতে মেহের নিজের চোখে দেখিয়াছে। মেহের যত ডাকে উহারা নাকি তত তাড়াতাড়ি বাড়ীর পথ ধরে। তিন তিনটা জোয়ান লোক সেই ভারী টাকার ঘড়া বহন করিতে কতটা কাবু হইয়াছিল মেহের নানান্ ভঙ্গিতে তাহার বর্ণনা করিল।

গোঁসাইবাড়ী নদীতে ভাঙিতেছে। গোঁসাইরা আমাদের গাঁয়ের বনেদী বড়লোক বলিয়া খ্যাত। আজ বিশ বৎসর সে বাড়ীতে গোঁসাইদের কেহ থাকে নাই। সেই বংশের কোন্ এক ব্যক্তি নাকি আজও বাঁচিয়া আছে এবং পশ্চিমের কোন্ এক সহরে নাকি রাজার হালেই আছে। এ-বাড়ী আজ পরিত্যক্ত—পোড়ো, কিন্তু টাকার কাহিনী ওই পোড়ো বাড়ীর প্রতি ইট-কাঠের সহিত জড়িত এবং আমাদের অঞ্চলে রূপকথার সামিল হইয়া রহিয়াছে। অনেকে অনেক বার কোদালি শাবল লইয়া সেই যক্ষপুরীর গুপ্তধন আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সফল কেহ-ই হয় নাই। নদীর ভাঙন দেখিয়া কিছু পাইবার আশা অনেকেই করিয়াছিল। ওইখানকার ভাঙনের কাছে লোকের আনাগোনা একটু বেশীই হইত সে আমি নিজেও দেখিয়াছি।

টাকাটা যে রতনই পাইবে এমন ইঙ্গিতও পূর্ব্বেই শুনিয়াছি, কারণ রতনের বাড়ীটা গোঁসাইবাড়ীর সবচেয়ে কাছে। কাঁহাতক আর গাঁয়ের লোক সদাসর্ব্বদা ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিবে! অবশেষে টাকাটা রতনের ঘরেই উঠিল, যদিও লোকের চোখকে ফাঁকি সে দিতে পারে নাই। যা হোক সোজাকথায় গুপ্তধন রতনকেই কৃপা করিয়াছে। তবে কৃপা করিয়াছে বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করে না। কারণ গোঁসাইগোষ্ঠীর পরিণতি তো তাহারা চোখের উপরে দেখিয়াছে। তবু কেন ঐ টাকার জন্য লোলুপ হইয়া ওঠে তাহাও বুঝিতে পারে না।

আমি বাড়ী পৌছিতে না পৌছিতেই সে খবর যে কেমন করিয়া গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল তাহা কিছুতেই বোধগম্য হইল না। কিন্তু গ্রামের অনেক লোক জমায়েত হইয়া আমায় হাতমুখ ধুইবার অবসর পর্য্যন্ত দিল না। কাহারও কাহারও কথার মর্ম্মে বুঝিলাম, রতন সরকার টাকা পাইয়াছে এবং টাকাটা আমার বাড়ীর সিন্দুকের মাঝেই তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে। শুনিয়া রাগে গা জ্বলিয়া গেল। কড়া কথা শুনাইতে ছাড়িলাম না।

রতনকে ডাকাইলাম। টাকার কথা তুলিতেই সে হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার বেহায়াপনা দেখিয়া রাগে গা জ্বলিয়া গেল। কিন্তু কিছু বলিতেও সাহ[illegible] পাইলাম না। আজ টাকার লোক সে! একটা [illegible] পাইবার আশা বৃথা। তবে সময়ে অসময়ে তাহার কাছে হাত পাতিতে হইবে না এমন কথা কে হলফ করিয়া বলিতে পারে! কিন্তু রতন দেখি টাকার কথা একেবারে ঝাড়িয়া অস্বীকার করিল। হায় হায়, এত অল্প সময়েই লোকটা এমন ডাঁহা মিথ্যাবাদী বনিয়া গেল! জানি, আহত সে কিছুতেই হইবে না। তবু বলিলাম, "টাকা যখন পেয়েছ তখন গরীবদের কাজ করা কি আর ধাতে সইবে!"

রতন হলফ করিয়া বলিল, "না বাবু, টাকা আমি সত্যি পাইনি, এই দিব্যি করে বলছি।"

তাহার জলজ্যান্ত মিথ্যা কথায় রাগে অধীর হইয়া গেলাম, বলিলাম, "দেখ টাকাওয়ালা লোক দিয়ে আমার চলবে না। আজ থেকে তোমার জবাব হয়ে গেল।"

জানি ইহাতে ক্ষতি তাহার কিছুই হইবে না! তবু

যা হোক কিছু উপার্জ্জন তো হইতেছিল, সেই লোভটাই বা আজ সে ছাড়ে কেমন করিয়া, তাই অনেক কাকুতিই সে করিল, বলিল, "লোকের কথায় এই গরীবকে প্রাণে মারবেন বাবু।"

তাহার ঢং দেখিয়া নিজেরি কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। ন্যাকামি বরদাস্ত করিতে না পারিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেলাম।

লোকটার উপর রাগ করিলাম বটে, কিন্তু কৌতূহল কমিল না একটুও। কয়েক রাত্রি পর পর রতনের বাড়ীতে চোরে সিঁদ কাটিল, কিন্তু শুনিয়া অবাক হইলাম যে এজাহারে কোন জিনিষ খোয়া গিয়াছে বলিয়া রতন উল্লেখ করিল না। তবে টাকা সে রাখিল কোথায়?

কিছুদিন পর রতনের সঙ্গে দেখা। দেখি চেহারা অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম টাকার চিন্তা। আর কুশলপ্রশ্ন পর্য্যন্ত করিবার প্রবৃত্তি হইল না।

ইহার কয়েকদিন পর রতনের বড়ছেলে পরাণের মৃত্যুসংবাদে শুম্ভিত হইয়া গেলাম। শুনিলাম নিউমোনিয়া হইয়াছিল। মনটা কেমন যেন ভারী হইয়া উঠিল। কবে রোগ হইল তাহাও জানিতে পারিলাম না। গ্রামের লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, ঐসব পাওয়া টাকার অনিবার্য্য ফল। গুপ্তধন পাইলে নাকি বংশ থাকে না। নিজেও ছোটবেলায় অমন কথা যে না শুনিয়াছি তা নয়। পরাণের পেশীবহুল হাতদুখানি আমার চোখের উপর ভাসিতে লাগিল। রতন তাহাকে বিবাহ করাইতে পারে না, কন্যাপণ সংগ্রহ করিবার অদম্য চেষ্টায় আমার কাছে কত বারই তো হাত পাতিয়াছে সে। আমি দিতে সাহস করি নাই। কেনই বা সাহস করিব। ধার শোধ করিবে কোথা হইতে?

খঞ্জনপুরে কোথায় একটি মেয়ে আছে, দুই-দুইশ টাকা চায়—। অত টাকা রতন পাইবে কোথায়! অথচ বড়ছেলে, বয়সও হইয়াছে—এখন বিবাহ না করাইলে আর কবে করাইবে। বিবাহ অবশ্য তার কিছু দিন পরই হইয়াছিল, টাকার ভাবনা তখন তো আর ছিল না। গ্রামে ইহা লইয়া জল্পনা-কল্পনাও খুব হইয়াছিল। আমাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিল রতন—তাহার স্পর্দ্ধাটাই সেদিন বড় করিয়া দেখিয়াছিলাম। একদিন ঐ কাজে আমার কাছে ধার চাহিয়া বিমুখ হইয়াছিল সেই কথাটাই যেন সে বড় করিয়া শুনাইতে আসিয়াছিল। তবু পরাণের মৃত্যু আমাকে ব্যথিত করিল এবং খুব বেশী করিয়াই ব্যথিত করিল। রতনের নিজের বিবাহের পণের টাকা আমার স্বর্গগত পিতৃদেব যাদব চক্রবর্ত্তী দিয়াছিলেন, সেকথা রতন আজ পর্য্যন্তও ঘটা করিয়া প্রচার করিয়া আসিয়াছে, এবং সেই রতনের প্রথম ছেলে পরাণের অন্নপ্রাশন দিবার জন্য আমার পিতৃদেব কোমর বাঁধিয়াছিলেন এবং সেজন্য ব্যয়বাহুল্য করার সিদ্ধান্ত হইতে কেহ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। সে তিনি করুন, আমার পূজনীয় পিতৃদেবের নানা খেয়াল থাকিয়া থাকিতে পারে, তাই বলিয়া সেগুলো যে আমার মাথায়ও ভর করিবে সে আশা করা অন্যায়। তবু মনের মধ্যে কেমন যেন খচ্‌খচ্ করিতে লাগিল। হাঁটিতে হাঁটিতে যোগেশ ডাক্তারের ডিসপেনসারীতে গেলাম। যোগেশ ডাক্তার অনেক আক্ষেপ করিল,—রতনের টাকা হইয়াছে, অথচ বিনা চিকিৎসায় ছেলেটা মারা গেল—তাহাকে একবার ডাকিল না পর্য্যন্ত! —ভয়ানক রাগ হইল। শেষকালে লোকটা এমন কঞ্জুস হইয়া দাঁড়াইল! ইহার চেয়ে গরীব ছিল সেই ভাল ছিল।

তার পর মাসখানেক কাটিয়াছে কিনা সন্দেহ। কি কাজে বাহিরে গিয়াছিলাম। বাড়ী ঢুকিতে যাইব, দেখি রতন আমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কোথায় গেছলে?"

রতন সংক্ষেপে জবাব দেয়, "বৌদির কাছে।"

'বৌদি' অর্থাৎ আমার স্ত্রী। বাড়ীতে ঢুকিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম,—রতনের বেতনের কয়েকটা টাকা পাওনা ছিল, তাই নিয়ে গেল, ছোট ছেলেটার খুব অসুখ কিনা! তাহার লজ্জার লেশমাত্র নাই দেখিয়া অবাক্ হইলাম। এত টাকা পেলি আর এই সামান্য কয়টা টাকার জন্য তোর ছেলের চিকিৎসা ঠেকিয়া ছিল! মনে মনে কেন যেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম।

কয়েক দিন পর রতন আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল—তাহার নাকি খুব অসুখ। যাইবার ইচ্ছা ছিল না আদৌ।

আমি যাইয়াই বা কি করিব। তাহার টাকা আছে,—সে ইচ্ছা করিলেই কতশত লোক তাহার কাজ করিবার জন্য লোলুপ হইয়া উঠিবে। কিন্তু আমার স্ত্রী কিছুতেই ছাড়িল না, মেয়েদের ঐ এক স্বভাব!—হাজার হোক পুরানো চাকর! আরে বাবা সে কি আর নিজেকে চাকর বলিয়া ভাবে? আমিই বরং তাহার চাকরের পর্য্যায়ে নামিয়া গিয়াছি।···যা হোক যাইতেই হইল।

বাড়ী খাঁ খাঁ করিতেছে। রতনের ছোট ছেলে হারান রোগজীর্ণ শরীরে পান্তা-ভাত কাঁচালঙ্কা দিয়া গিলিতেছে। দেখিয়া গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। এক ধমক দিয়া তাহার হাত হইতে ভাতের বাটিটা কাড়িয়া লইয়া বলিলাম, "জ্বরে ও-দিকে বাঁচে না—কোঁৎ কোঁৎ ক'রে কেমন পান্তা ভাত গিলছে!"

হারান কথাটি কহিল না, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। কেমন যেন মায়া হইল, বলিলাম, "একটু বসে থাক, খাবার আমি আনিয়ে দেব এখন।"

হারানের চোখ দুটি উজ্জল হইয়া উঠিল।

রতন আমার গলার শব্দ পাইয়াই বোধ করি উঠিয়া বসিয়াছিল এবং আমার কাছে আসিবার নিরর্থক চেষ্টা করিতেছিল। তাহার উঠিয়া আসিবার সাধ্য নাই। আমি বলিলাম, "থাক থাক আর উঠতে হবে না।"

রতনের পাশে বসিয়া তাহার বৌ পান্তাভাতে লবণ মিশাইতেছে। উহা যে রতনের পথ্য তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। রাগে গা জ্বলিতে লাগিল, বলিলাম, "এই জ্বরের ওপর পান্তাভাত খেয়ে মরবার এত সখ কেন?"

রতন কাৎরাইয়া কাৎরাইয়া জবাব দিল, "কি করি দাদা, একটা পয়সা নাই ঘরে—না ওষুধ না পত্তর।"

একটু ঝাঁঝের সাথেই বলিলাম, "কেন, টাকাগুলো কোন্ চুলোয় গেল?"

রতন এবার রাগিয়া উঠিল—বলিল, "আপনি দেখি চকোত্তি-জ্যাঠার কুপুত্তর। বার বার বলি—না-না—তবু পেত্যয় হয় না। যান না আপনি এখান থ্যা—।"

কথা কয়টি বলিয়া সে হাঁপাইয়া উঠিল—চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।···বাড়ীময় মাছি ভন ভন করিতেছে···ঘরবাড়ীর সব কিছু দৈন্য আমার কাছে ধরা পড়িল। আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। ডাক্তারের কাছে যাইয়া রতনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলাম।

যোগেশ ডাক্তার মুচকি হাসিল—ভাবখানা এই যে টাকাটা তাহলে আমার সিন্দুকেই, অথচ তাহারা হাতড়াইয়া মরিতেছে!

পরদিন গ্রামময় কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। টাকাটা আমার ঘরে এ কথা জানিতে প্রথমেই যাহাদের বাকী ছিল না তাহারা বিরুদ্ধবাদীদের উপর একহাত লইতে কসুর করিতেছে না।

কি বলছেন, চুরি ডাকাতি? না সে চেষ্টা এখনও হয় নাই।

আমার আবার একটা দোনালা বন্দুক আছে কি না!

হ্যাঁ, রতন কিন্তু আমার বাড়ীর কাজে আবার বহাল হইয়াছে।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ

বিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদ সমগ্র বিশ্বজগতের দৈহিক অভিব্যক্তির পরিচয় আমাদিগকে দিয়াছে, কিন্তু মানুষের মনের লীলার মধ্যেও যে অভিব্যক্তির ধারা অনুস্যূত রহিয়াছে—শুধু জীবনযাত্রার প্রয়োজন ছাড়াও যে মানব-মনের নানা অভিব্যক্তি হইয়াছে, প্রাকৃত বিজ্ঞান তাহার কোন পরিচয় আমাদিগকে দেয় নাই। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এক মানুষের সহিত অন্য আর এক মানুষের কোন পার্থক্য আমরা খুঁজিয়া পাই না, কিন্তু মানব-মনের কত বিচিত্র অভিব্যক্তিই না আমরা প্রত্যক্ষ করি। মানব-মনের মধ্যে এই যে অভিব্যক্তির ধারা প্রবাহিত রহিয়াছে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে তাহার উজ্জ্বল প্রকাশ আমরা কখনও কখনও লক্ষ্য করিয়া থাকি। অভিব্যক্তির পথে এই যে বিশেষ মানুষ, এই যে স্বতন্ত্র মানুষ তাঁহারাই গুহাহিত সত্যকে আমাদের নিকট প্রকাশ করেন—তাঁহারা সত্যদ্রষ্টা। তাঁহারা শুধু "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" সত্যকে প্রত্যক্ষই করেন নাই "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলিয়া সকলকে ডাকিয়া শুধু সেই তত্ত্ব শ্রবণই করান নাই, সেই অমৃত লাভের পথের সন্ধানও তাঁহারা মানুষকে দিয়াছেন।

সাধারণ মানুষের মধ্যে সত্যের এই মহান্ প্রকাশ ব্যাহত হয়, কিন্তু প্রকাশ বন্ধ হয় না, এমন এক-এক জন মানুষ এই পৃথিবীতে আসেন যাঁহাদের মধ্যে অভিব্যক্তির এক বিশেষ প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সংখ্যায় ইঁহারা কোটীতে গোটি মিলেন কিনা সন্দেহ। শুধু এক-একটা বিশেষ যুগে, বিশেষ দেশে সত্যদ্রষ্টার প্রকাশ হয়, যুগের এবং দেশের প্রয়োজন তাঁহাদের আবির্ভাবের অপেক্ষা করিয়া থাকে। এমনি একটা যুগ আমাদের দেশে আসিয়াছিল বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে।

অষ্টাদশ শতাব্দী ভারত-ইতিহাসে এক অন্ধকারময় যুগের সূচনা করিয়াছিল। এই শতাব্দীর মধ্য ভাগে পলাশীর আম্রকাননে ভাগ্যলক্ষ্মী বৃটিশ জাতির কপালে বিজয় তিলক পরাইয়া দিলেন। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারত তথা বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনে, অর্থনৈতিক নৈতিক জীবনে, ধর্ম্মজীবনে, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় দেখা দিল চরম বিশৃঙ্খলা। ভারতীয় সমাজ-জীবনের এই বিশৃঙ্খলতার মধ্যে হইল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাত। এই শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে দেখা দিল প্রাচীর সঙ্গে প্রতিচীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত। আমরা শ্রেয় এবং প্রেয়, অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের মধ্যে পার্থক্য ভুলিয়া গেলাম, নূতন এবং পুরাতনের দ্বন্দ্ব হইতে নূতনতর সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা সে যুগের তরুণদের দৃষ্টি এড়াইয়া গেল। ইহা "ইয়ং বেঙ্গলে"র যুগ নামে আজও আমাদের অসামর্থ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই যুগ এক দিকে যেমন আমাদের অধঃপতনের যুগ আর এক দিকে তেমনি নবজাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণ। অভিব্যক্তির ধারা কখনও সরলরেখার গতিতে চলে না, উত্থান-পতনের বন্ধুর পথে অভিব্যক্তির ধারা প্রবাহিত হয়। বস্তুতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মধ্যেই সৃষ্টি হইল নূতন জীবনের। এই ভারতীয় নবজীবনের যাঁহারা স্রষ্টা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের স্থান তাঁহাদের সকলের শীর্ষদেশে।

রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে মানুষ যখন আত্মকর্তৃত্ব হারায় তখন যাহা কিছু মানব-জীবনের পক্ষে কল্যাণকর তাহাই সহস্র অকল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়—মানুষের অবদমিত হীনতাবোধ শ্রেষ্ঠত্ব বোধরূপে অত্যাচারের রথচক্র সমাজের উপর দিয়া চালিত করে, মনুষ্যত্বের করে চরম অপমান। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সদাচার সে যুগে অত্যাচারের রূপ গ্রহণ

করিয়াছিল। মানুষকে স্পর্শ করিলে মানুষ পবিত্র হইত গঙ্গাজলে স্নান করিয়া, লক্ষ লক্ষ লোককে অনাহারে রাখিয়া মানুষ গর্ব্ব করিত তাহার অজস্র সম্পদ সঞ্চয়ের, লক্ষ লক্ষ লোককে মূর্খ রাখিয়া গর্ব্ব করিত তাহার পাণ্ডিত্যের শ্রেষ্ঠতার। মনুষ্যত্বের এই অপমান সমাজ-দেহকে করিয়া তুলিয়াছিল দুর্ব্বল, মিথ্যাকে সত্যের গৌরবাসনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, লোভকে প্রদান করিয়াছিল দানের গৌরব। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন আচণ্ডালে হরিনাম বিতরণ করিয়া মানুষকে মনুষ্যত্বের অপমানের মহাপাপ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি যুগের উপযোগী করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন সেবাব্রতের অতুলনীয় মাহাত্ম্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জীবনের গূঢ় রহস্য আলোচনা করিবার সামর্থ্য আমার নাই, সে ব্যর্থ চেষ্টাও আমি করিব না। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের আলোচনা যোগ্য সাধকের জন্য রাখিয়া আমি শুধু তাঁহার জনসেবার আদর্শের কথাই আলোচনা করিব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে, পরমার্থকে, নিঃশ্রেয়সকে সমগ্র জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। অন্যান্য মহাপুরুষদের সঙ্গে এইখানেই তাঁহার অতুলনীয় পার্থক্য। আবার মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকেও আধ্যাত্মিক জীবন হইতে পৃথক তিনি করেন নাই। সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা কার্লমার্কস-এর মতবাদের সহিত তাঁহার জনসেবার আদর্শের পার্থক্য এইখানেই। কার্লমার্কস ধর্ম্মকে বাদ দিয়া শুধু অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরই সাম্যবাদী সমাজকে গড়িয়া তুলিবার কথা বলিয়াছেন, ধর্ম্মকে তিনি তুলনা করিয়াছেন আফিং-এর সঙ্গে, ধর্ম্মকে তিনি বলিয়াছেন অগণিত জনগণকে চিরদিন শোষণ করিবার একমাত্র সহজ উপায়। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে আধ্যাত্মিকতার রসে অভিষিক্ত করিয়া শ্রেয়ের সহিত প্রেয়ের, অভ্যুদয়ের সহিত নিঃশ্রেয়সের অপূর্ব্ব মিলন সাধন করিয়াছেন। তাঁহার এই আদর্শকে রূপ দিয়াছেন তাঁহারই প্রিয় শিষ্য শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীকৃষ্ণের গীতার উপদেশ যেমন সার্থক হইয়াছে অর্জ্জুনের মধ্যে, যিশুখ্রীষ্টের ভাবধারাকে যেমন রূপায়িত করিয়াছিলেন সেন্ট পল, রুশোর বিপ্লবী মতবাদকে রবস্পেয়ার যেমন রূপ দিয়াছেন ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে, কার্লমার্কসকে যেমন অভিব্যক্ত করিয়াছেন লেনিন, তেমনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন-সেবার আদর্শের মূর্ত্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জীবে শিব দর্শন করিয়া মানুষকে গরীয়ান ও মহীয়ান করিয়াছেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পদ্ধতি অনুসারে সাধন- করিয়া ধর্ম্মে ধর্ম্মে দ্বেষ দূর করিয়া সমস্ত ধর্ম্মের মূলগত ঐক্য প্রকাশ করিয়াছেন, মানব-জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া জীবনকে পূর্ণতা দান করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে অলৌকিক কিছু আমরা দেখি না, অথচ সবই যেন অলৌকিক। ধর্ম্মের অতি গূঢ় তত্ত্ব সহজ ভাষায় গল্পচ্ছলে অভিব্যক্ত করা একমাত্র তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে। একদিক হইতে দেখিতে গেলে কোন নূতন ধর্ম্ম তিনি উদ্ভাবন বা প্রচার করেন নাই, যুগ যুগ ধরিয়া ধর্ম্মজগতে যে আচার ও কুসংস্কারের আবর্জ্জনা-রাশি সঞ্চিত হইয়াছিল তিনি তাহা মুক্ত করিয়া ধর্ম্মকে তাহার যথার্থ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহা যদি অলৌকিক না হয়, তবে অলৌকিক বলিতে আর কি বুঝায় আমি জানি না। ইহা যদি নূতন ধর্ম্ম না হয়, তবে নূতন ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায় তাহা আমি বুঝি না। এইখানে [illegible] রামকৃষ্ণ-জীবনের নূতনত্ব। কিন্তু আমার কাছে [illegible]র জনসেবার যে মহান আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে অপূর্ব্ব ত্যাগে, কর্ম্মে, সেবায়, অনুপ্রেরণায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে, মানুষের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-জীবনে উহা অপেক্ষা মহত্তর আদর্শ আর কিছুই হইতে পারে না।

আজ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের জন্মতিথি স্মরণে উৎসবের দিন। এই উৎসব শুধু তাঁহার মাহাত্ম্য স্মরণেই সার্থক হইবে না। শুধু তাঁহার জয়গান করিলেই সার্থক হইবে না। পত্রপুষ্পে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেই সার্থক হইবে না। উহাকে সার্থক করিবার একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ তাঁহার সেবাব্রতের আদর্শকে নিজ নিজ জীবনে সার্থক করিয়া তোলা। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যসাহিত্যিক জর্জ্জ বার্ণাড শ বলিয়াছেন—

"In a stupid nation the great genius becomes a god, everybody worships him, but

…body does his will." শুধু আজ বলিয়া নয়, যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ মহাপুরুষদিগকে শুধু পূজাই করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাঁহাদের উপদেশ কেহ এ পর্য্যন্ত প্রতিপালন করে নাই, শুধু পূজা করিয়াই বাহির দ্বার হইতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়াছে। মানুষের এই আত্ম-প্রতারণাকে লক্ষ্য করিয়াই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

"স্মরণীয় তারা বরণীয় তারা তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দ্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে॥"

আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র স্মৃতিকে আমরা স্মরণ করিতেছি, তাঁহার পবিত্র আত্মাও এই উৎসবের দিনে আমাদের প্রতি উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। আমরা যেন তাঁহাকে "ব্যর্থনমস্কারে" ফিরাইয়া না দেই*

* [ইটাচুনা হুগলী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মবার্ষিকী উৎসবে পঠিত]

অভিমান

শ্রীনিভা দেবী

হে কবিন্দ্র, স্বর্গরাজ সসম্মানে—
তোমারে করেছে আজি
দেব-সভাকবি
অতর্কিতে ভুলায়ে মোদের,
তবু তুমি আমাদেরই কবি।
দোলায়ে শ্রীকণ্ঠে তব
পারিজাত মালা
দেবগণ গাহে আবাহন,
উর্ব্বশীর কনক নূপুরে বেজে ওঠে
আনন্দ-নিক্কণ।
আজি গীতরসে ভরা মন্দাকিনী তীরে
শোভে তব উজ্জ্বল আসন,
অক্ষয় লেখনি হস্তে সমাধি মগন।
আমাদেরি সেই তুমি
ত্যজিয়া মাটির মায়া—
—ত্যজি মাতৃভূমি।
জান তুমি ওগো কবি স্বর্গের বারতা
সুগোপন সেই সত্য কথা,
কঠিন প্রস্তরে গাঁথা স্বর্গের অন্তর
যায় যদি কেহ তারে ছাড়ি
দেব-আঁখি হ'তে এক ফোঁটা অশ্রুজল
নাহি পড়ে ঝরে।
তরুশিরে জীর্ণ পাতা সম—
ঝরে গেলে ঝরে তার রূপ অনুপম,
আর এই মাতৃভূমি—
যাহারে ছেড়েছ আজি তুমি,
তার কথা তোমারে কহিব
হেন স্পর্দ্ধা নাহিক আমার
নিমিলিত করি দুটি আঁখি
তারে তুমি করেছ আঁধার॥

জাগরণী

শ্রীপ্রীতিকুমার বসু

জাগো বিশ্ব-রচয়িতা জাগো…
লীলায়িত বহ্নি পুলকিত তন্বী
নৃত্যের তালে গাহে আগমনী
পঙ্কিল ধরণীতে তোমার স্মরণীতে
রক্তেরি কলরোল থামাও ওগো।
জাগো বিশ্ব-রচয়িতা জাগো…॥
আজি প্রাণে প্রাণে নাহি সদ্ভাব
আজি মনে মনে জাগিছে বিবাদ
তোমারি সৃজনীতে ভেঙে গড় মরণেতে
শান্তির মাঝে রচ নূতন স্বরগ।
জাগো বিশ্ব-রচয়িতা জাগো॥

গৌতম বুদ্ধ ও তৎসংসৃষ্ট যুগের প্রকৃত কাল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উদয়ন বা উদয়-আশ্বই যে প্রথম অশোক বা বৌদ্ধদের কথিত নন্দরাজ এবং জৈনদের কথিত প্রথম নন্দ তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বোঝা যাইবে :—মৎস্য পুরাণ অনুসারে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর (৫০১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ) আট বৎসর পূর্ব্বে রাজা অজাতশত্রু সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁহার রাজত্বকাল ২৭ বৎসর। তাঁহার পুত্র হর্ষক বা দর্শক খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৫৮ অব্দ পর্য্যন্ত ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। হর্ষক বা দর্শকের পর তাঁহার ভগ্নীপতি উদয়ন পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ডক্টর ভাণ্ডারকর দর্শক এবং নাগ (বোধ হয় শৈশুনাগ) দশককে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। সিংহলের পুরাবৃত্তে তাঁহাকে রাজা বিম্বিসারের বংশের শেষ রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। হিউয়েন সাঙ্-এর সি-উ-কি গ্রন্থ হইতে নিম্ন উদ্ধৃতাংশ সিংহলী কিম্বদন্তীকেই সমর্থন করিতেছে :—"...পুরাতন সঙ্ঘরামের এত শত লী দক্ষিণ-পশ্চিমে তি-লো-শি-কিয় সঙ্ঘরাম অবস্থিত। রাজা বিম্বিসারের শেষ বংশধর এই সঙ্ঘরাম নির্ম্মাণ করেন।" 'বোধ হয় দর্শকের নাম অনুসারেই দ্বিতীয় সঙ্ঘরামের নামকরণ করা হইয়াছিল। দর্শকই এখানে বিম্বিসারের শেষ বংশধর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।[১] বৌদ্ধ, জৈন, পৌরাণিক[২] এবং অন্যান্য ইতিবৃত্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, রাজা উদয়ন অর্থাৎ হিউয়েন সাঙ্-এর রাজা ও-শো-কিয় রাজগীর হইতে পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। আমরা আরও জানি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৫৮ অব্দই আলবেরুণি কর্ত্তৃক উল্লিখিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীহর্ষ অব্দের কাল। বোধ হয় হর্ষকই পাটলীপুত্র নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই। হর্ষকের কোন পুত্রসন্তান ছিল না বলিয়া তাঁহার রাজ্য উদয়ন প্রাপ্ত হন এবং শ্যালক হর্ষকের স্মৃতি রক্ষার জন্য পাটলীপুত্রকে রাজধানী বলিয়া ঘোষণা করিবার তারিখ হইতে শ্রীহর্ষ অব্দের প্রবর্ত্তন করেন। 'দীপ বংশে' উল্লিখিত হইয়াছে যে, "দ্বিতীয় বৌদ্ধ সভা যখন আহূত হয় তখন শৈশুনাগের পুত্র অশোক রাজা ছিলেন। ইনি পাটলীপুত্রে রাজত্ব করিতেন।" "অন্যত্র শৈশুনাগ নন্দরাজাদের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।[৩] আমরা জানি, উদয়ন অজাতশত্রুর জামাতা, পুত্র নয়। বৌদ্ধ জাতকে সীতাকে দশরথের পুত্রবধূর পরিবর্ত্তে কন্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়া অনুরূপ ভুল করা হইয়াছে। তারানাথ নন্দরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় [illegible]ীয় বৌদ্ধ সভার অধিবেশন হওয়ার কথা উল্লেখ ক[illegible]ছেন। একটি বৌদ্ধ ইতিবৃত্তে বলা হইয়াছে যে, গৌতম বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের ৮৮ বৎসর পরে অর্থাৎ ৫৪৬—৮৮=৪৫৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে নন্দরাজা সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। "অন্যান্য প্রমাণ উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে একথা আমরা উল্লেখ না করিয়া পারি না যে, গল্পের নায়কগণ যদি কাল্পনিক না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সভার অধিবেশন যে সময়ে হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ঐ সময়ে (গৌতম বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ১০০ বৎসর পরে) উহার অধিবেশন হওয়া অসম্ভব। পরিনির্ব্বাণের এক শত বৎসর পরে 'সর্ব্বকামিনে'র বয়স কমপক্ষে ১৪০ বৎসর না হইয়া পারে না,...সুতরাং অন্যান্য থেরগণের বয়সও ঐরূপ হইয়াছিল। যে ইতিবৃত্ত এইরূপ অসম্ভব ব্যাপার

১। H. C. Roychowdhury, *Pol. Hist. of Ancient India*, 2nd. Ed., P. 130.

Vide also Pargiter, Dynasties of the Kali Age, p. 22.

২। স বৈ পূরবরম্ রাজা পৃথিব্যাম্ কুসুমাহ্বয়ম্।

৩। Kern, Manual of Buddhism, p. 105.

বর্ণনা করে উহা হইতে ঐ ইতিবৃত্তের অসারতা প্রতিপাদিত হয়।"[৪] মহাবংশে দ্বিতীয় সভার অধিবেশনের সময়ে যিনি রাজা ছিলেন তাহার নাম 'কাল-অশোক' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, রাজা কাল-অশোকের রাজত্বের একাদশ বৎসরের শেষভাগ বৌদ্ধ নির্ব্বাণের শততম বৎসর অর্থাৎ ৫৪৬—৯৯=৪৪৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। এই ৪৪৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ উদয়নের পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণের বৎসর খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৫৮ অব্দের ১১ বৎসর পরবর্ত্তী। হিউয়েনসাঙও বলিয়াছেন, তথাগতের নির্ব্বাণ লাভের একশত বৎসর পরে ও-সু-কীয় নামক একজন রাজা ছিলেন। তিনি রাজগীর হইতে পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং নগরের চারিদিকে বহিঃপ্রাকার নির্ম্মাণ করান। সুতরাং উল্লিখিত বিবরণ হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি, উদয়-আশ এবং প্রথম অশোক বা নন্দ এক এবং অভিন্ন রাজা।

বৌদ্ধ কিম্বদন্তী অনুসারে শিশুনাগ নন্দরাজাদিগের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী। এই কিম্বদন্তী হইতে বোঝা যায়, বৌদ্ধগণ উদয়নকেই প্রথম নন্দ রাজা বলিয়াছেন। নন্দীবর্দ্ধন তাঁহারই পরবর্ত্তী রাজা। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বৌদ্ধ ইতিবৃত্ত অনুসারে গৌতম বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের ৮৮ বৎসর পরে অর্থাৎ ৪৫৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে নন্দ রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই ৫৫৮ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ উদয়নের নূতন রাজধানী পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণের তারিখ এবং উহা তাঁহার বৎসদেশের রাজা হিসাবে চারি বৎসর রাজত্ব করিবার পর অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং উদয় বা প্রথম নন্দ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৬২ অব্দে বৎসদেশের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহাই যে সত্য তাহা মিঃ জয়শোয়াল কলিঙ্গের জৈন রাজা খারবেলের উদয়গিরি বা হাথিগুম্ফা লিপির যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়। এই লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের ১৬৪ বৎসর পর এবং নন্দরাজার ৩০০ বৎসর পর খারবেল বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং খারবেল ৩২৬—১৬৪=১৬২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। উক্ত ১৬২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ নন্দরাজার তিনশত বৎসর পরবর্ত্তী বিধায় নন্দরাজা ৩০০+১৬২=৪৬২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সিংহাসেন আরোহণ করেন। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, হর্ষ অব্দ এবং নন্দ অব্দ একই অব্দ। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ৬ষ্ঠ চালুক্য বিক্রমের আদেশে এই অব্দ গণনা রহিত হয়।[৫] ডক্টর আর, সি, মজুমদারও আলবরুণি কর্ত্তৃক উল্লিখিত পূর্ব্ববর্ত্তী হর্ষ অব্দ খারবেলের হাথিগুম্ফা লিপিতে উল্লিখিত নন্দ কালকেই বুঝাইত বলিয়া মনে করেন।[৬]

কলিকাতাস্থ ভারতীয় মিউজিয়মে পাটনা হইতে আনীত যে সকল বড় বড় প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে, মিঃ জয়শোয়াল তাহাদের একটিকে পাটলীপুত্র নির্ম্মাণকারী উদয়ের প্রস্তর-মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত প্রস্তরমূর্ত্তিতে যে সংখ্যা উৎকীর্ণ আছে ডক্টর আর, সি, মজুমদারের পাঠোদ্ধার অনুসারে উহা ৪০ এবং ৪ অর্থাৎ ৪৪। যদি গৌতম বুদ্ধের তারিখের সাহায্যে এই সংখ্যাটিকে হিসাব করা যায়, তাহা হইলে আমরা পাই ৫০১—৪৩=৪৫৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। উদয়ের পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণের ইহাই সুবিখ্যাত অব্দ। সুতরাং মিঃ জয়-শোয়ালের নির্দ্ধারণ সত্য বলিয়া মনে হয়।

পারখাম প্রস্তর মূর্ত্তিতে উৎকীর্ণ লিপি হইতে মিঃ জয়শোয়াল রাজা অজাতশত্রুর নাম এবং ৪, ২০, ১০ এবং ৮ সংখ্যা পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। এই সংখ্যাগুলি অজাতশত্রুর রাজত্ব কাল বুঝাইতেছে মনে করিয়া তিনি এই সংখ্যাগুলিকে ৪+২০+১০=৩৪ বৎসর এবং ৮ মাস বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। অজাতশত্রুর প্রকৃত রাজত্বকাল ৪+২০=২৪ বৎসর, ১০ মাস এবং ৮ দিন অর্থাৎ প্রায় ২৫ বৎসর, ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। যদি ৩৪ বৎসরই বুঝাইবার ইচ্ছা

৪। Keru, Manual of Buddhism, p. 105

৫। *Vide* Fleet and Leumanu on Chaulukya Vikrama Esa—*Indian Antiquary*, Vol. VIII & XII.

৬। Vide J. B. O. R. S. 1923, p- 418. 'A passage in Alberuni's India—A Nanda Era ?"

থাকিত, তাহা হইলে সংখ্যা ৪ এবং ৩০ লেখা থাকিত অথবা ৪, ১০, ২০ এই অনুক্রমেও লিখিত হইতে পারিত। আমরা জানি, মৎস্য পুরাণে অজাতশত্রুর রাজত্বকাল ২৭ বৎসর বলিয়া উল্লিখিত হইলেও অন্যান্য সকল পুরাণেই তাঁহার রাজত্বকাল ২৫ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

সমস্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতই ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, সিংহলের ইতিবৃত্তে ৬০ বৎসরেরও অধিক ব্যতিক্রম আছে। এখন দেখা যাইবে যে, সিংহলী ইতিবৃত্তের সহিত ব্যতিক্রমটা ৪৫ বৎসরের, অর্থাৎ নির্ব্বাণ এবং পরিনির্ব্বাণের মধ্যবর্ত্তী কালের। পরিনির্ব্বাণের কাল ৫০১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের পরিবর্ত্তে খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮৩ অব্দ অর্থাৎ ১৮ বৎসর পরে ধরিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ব্যতিক্রমের পরিমাণ ৬০ বৎসরের অধিক, অর্থাৎ ৪৫ + ১৮ = ৬৩ বৎসর স্থির করিয়াছেন। কার্ণ তাঁহার Manual of Buddhism গ্রন্থে (P. 108 ff) লিখিয়াছেন :

"The preference to the Sinhalese account is, from a critical stand-point, the less intelligible, because ever since Turnour advocated the claims of the Sinhalese Chronnlogy, it has been admitted on all hands that it contains an error of more than 60 years. That error has been palliated by the guess that such an error has sprung up after the period of Asoka. But a system which contains such a blunder or wilful misstatement at a later period is *a fortiori* suspicions for more ancient times"

(অনুবাদ) "সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিলে সিংহলী ইতিবৃত্তকে সবিশেষ গ্রহণ যোগ্য বলিয়া মনে করিবার কারণ বোঝা যায় না। কারণ, টার্ণার কর্ত্তৃক সিংহলী ইতিবৃত্তের দাবী গৃহীত হওয়ার পর হইতে ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, এই ইতিবৃত্তে ৬০ বৎসরের অধিক ব্যতিক্রম দেখা যায়। অশোকের পরে এই ব্যতিক্রম সৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ অনুমান করিয়া উহাকে কতকটা লঘু করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যে ইতিবৃত্তে পরবর্ত্তী কালে এইরূপ একটা ভয়ানক ভুল বা স্বেচ্ছাকৃত ভ্রান্ত উক্তি সন্নিবেশিত হইতে পারে, অধিকতর প্রাচীন কাল সম্বন্ধে তাহা অধিকতর সন্দেহযুক্ত।" কার্ণের সন্দেহ যে ঠিক তাহা নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে বোঝা যাইবে।

[illegible] অজাতশত্রু এবং নন্দী-বর্দ্ধনের সিংহাসন আরোহণের মধ্যবর্ত্তী কালের পরিমাণ ১২৭ বৎসর। এই সকল ইতিবৃত্তে নন্দীবর্দ্ধনকে কাল-অশোকের উত্তরাধিকারী বলা হইয়াছে।) এই কাল-পরিমাণের মধ্যে ৪৫ বৎসরের একটা ভুল আছে। এই ৪৫ বৎসর নির্ব্বাণ এবং পরিনির্ব্বাণের মধ্যবর্ত্তী কাল। সুতরাং সঠিক কালপরিমাণ হইবে ৮২ বৎসর। পুরাণ অনুসারে অজাত শত্রু এবং নন্দীবর্দ্ধনের সিংহাসন আরোহণের মধ্যবর্ত্তী কালের পরিমাণও ঠিক ৮২ বৎসর (অজাত শত্রু ২৫ বৎসর, হর্ষক ২৪ বৎসর এবং উদয়াশ্ব ৩৩ বৎসর)। এখন, অজাতশত্রু গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর (৫০১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ) ৮ বৎসর পূর্ব্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০৯ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই ৫০৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে ৮২ বৎসর বাদ দিলে আমরা পাই ৪২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। বায়ু পুরাণ অনুসারে ইহাই নন্দীবর্দ্ধনের সিংহাসনে আরোহণের বৎসর। মৎস্যপুরাণ অনুসারে নন্দীবর্দ্ধনের সিংহাসনে আরোহণের বৎসর আমরা পাই খৃষ্টপূর্ব্ব ৪২৬ অব্দ। তফাৎটা এক বৎসরের। তারপর, নন্দীবর্দ্ধন হইতে শেষ নন্দরাজা পর্য্যন্ত নন্দরাজাদিগের রাজত্বকাল একশত বৎসর অর্থাৎ ৪২৭ − ১০০ = ৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত। পরবর্ত্তী বৎসর অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ তাহার *Early History of India* (৪র্থ সংস্করণ) নামক গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণের বৎসর খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৫ অব্দ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

মহাবীরের মৃত্যু গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুরও দশ বৎসর পর হইয়াছে স্থির করিয়া জার্লকার্পেণ্টার এবং আরও অনেকে বৌদ্ধ এবং জৈন কিম্বদন্তীকে একেবারেই অবিশ্বাস করিয়াছেন। 'মজ্‌ঝিম নিকায়ে'র (সামগাম সুত্ত) একটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ অংশে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গৌতম বুদ্ধ যখন শাক্যদেশের সামগামে অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন শুনিতে পান 'পাবা'তে নিগ্‌গন্থ নাতপুত্রের (অর্থাৎ মহাবীরের) মৃত্যু হইয়াছে, দীগ্‌ঘ নিকায়েও অনুরূপ কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মহাবীরের মৃত্যুর পরেই তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয় এবং গৌতম

বুদ্ধকেও তাঁহার শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাঁহার (গৌতম বুদ্ধ) তিরোভাবের পরেও অনুরূপ অবস্থা সংঘটিত হইবে কিনা, ইত্যাদি। তা ছাড়া গৌতম বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের বিংশতি বৎসরে তাঁহার আশ্রমের পরিচালন ব্যাপারে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। তাঁহার নির্ব্বাণ লাভের (৫৪৬ খৃঃ পূঃ অঃ) উনবিংশতি বৎসরে অর্থাৎ উল্লিখিত পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়ার অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে (৫২৮ খৃঃ পূঃঅঃ) মহাবীরের মৃত্যু হইতে যে শিক্ষা লাভ হইয়াছিল, বোধ হয় তাহারই ফলে উল্লিখিত পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

গৌতম বুদ্ধ যে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৬ অব্দে নির্ব্বাণ লাভ করেন তাহা বরাহমিহির কর্ত্তৃক বৃহৎ সংহিতায় উদ্ধৃত বৃদ্ধ গর্গের একটি উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, শক কালের ২৫৫৬ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির পৃথিবীর রাজা ছিলেন। 'ষড়দ্বিক পঞ্চদ্বিযুতঃ শককালঃ' এই বাক্যাংশটির অর্থ কাশ্মীরের ভট্টোৎপল (৯৬৬ খৃঃঅঃ) এবং কল্হন (১১৪৮ খৃঃঅঃ) উভয়েই শক কালের (৭৮ খৃঃঅঃ) ২৫২৬ বৎসর (অর্থাৎ ষট্ = ছয়, দ্বিক = দুই, পঞ্চ = পাঁচ এবং দ্বি = দুই) পূর্ব্বে এই অর্থ করিয়াছেন। কল্হন এইরূপে সিদ্ধান্ত করেন যে, মহাভারতের যুদ্ধ ২৫২৬—৭৭ = ২৪৪৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে অর্থাৎ কলিযুগ আরম্ভ হইবার ৩১০২—২৪৪৯ = ৬৫৩ বৎসর পরে সংঘটিত হইয়াছিল এবং তাঁহার রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে সগর্ব্বে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। বৃদ্ধগর্গের উক্তির প্রকৃত অর্থ হইবে ষঠ্ (ছয়) দ্বিকপঞ্চ (দুই পাঁচ = ৫৫) এবং দ্বি (দুই), অর্থাৎ শককালের ২৫৫৬ বৎসর পূর্ব্বে। শককাল যে শাক্যকাল অর্থাৎ শাক্যমুনি বা বুদ্ধ অব্দ ছাড়া আর কিছুই নয় তাহা আমি (এই প্রবন্ধের লেখক) অনেক দিন পূর্ব্বে 'হিন্দু নক্ষত্র' 'The Hindu Nakshatras' published in the *Journal of the Department of Science*, Calcutta University, Vol. V1, 1924, P. 44) শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। নিম্ন উদ্ধৃতাংশ দ্বারাও আমার এই অভিমত সমর্থিত হয়:

"And the ultimate basis of them is to be found in my opinion in the point that in early times, alongside of the words Saka, Saka, as a tribal name, there were in use the forms Saka, Saka—Sakka, Sakka, corruptions of Sakya, a Buddhist."

(অনুবাদ) পূর্ব্বকালে কৌমের নাম (tribal names) শক, শাক শব্দগুলির সঙ্গে সঙ্গে শাক্য (অর্থাৎ বৌদ্ধ) শব্দের অপভ্রংশরূপে শক, শাক = শক্ক, শাক্ক, শব্দেরও প্রচলন ছিল এবং আমার মতে উহাতেই ঐগুলির মূলভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

গর্গ তাঁহার গার্গী সংহিতায় অশোকের চতুর্থ পুরুষ শালিশুকের বিষয় (২০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) বলিয়া এবং পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে পরবর্ত্তী যবন আক্রমণের (ডিমিট্রিয়স কর্ত্তৃক) কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[৮]

মিঃ জয়শোয়ালের 'Historical Data in the Garga Samhita and the Brahmana Empire'[৯] হইতে আমরা জানিতে পারি, ৫৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে গর্গ সংহিতা রচিত হইয়াছিল। কার্ণ (kern) অনেকদিন পূর্ব্বে গর্গসংহিতার রচনা কাল সম্বন্ধে ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। সুতরাং খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব্বে বৃদ্ধ গর্গের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং বরাহ মিহির শক কাল সম্বন্ধে বৃদ্ধ গর্গের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা ৭৮ খৃষ্টাব্দের শকাব্দকে বুঝাইতে পারে না। ডাঃ ফিনট (Dr Finot) তাঁহার একটি প্রবন্ধে[১০] দেখাইয়াছেন যে, খৃষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশ প্রত্যাগত থাইগন খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৪ অব্দ কালীন যে বৌদ্ধ অব্দের বিবরণ ইন্দো-চীনে লইয়া গিয়াছিল তাহা বুদ্ধ শক কাল নামে পরিচিত ছিল। গৌতম বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৬ অব্দ। ইহার সহিত ২৫৫৬ বৎসর যদি যোগ দেওয়া যায় তাহা হইলে আমরা পাই ৫৪৬ + ২৫৫৬ অর্থাৎ ৩১০২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। উহাই কলিযুগ আরম্ভের বা মহাভারতের যুদ্ধের সুবিখ্যাত কাল।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হইবে)

৭। Dr. Fleet, The Date of Kanishka, J. R. A. S., 1913, p. 994.

৮। *Vide* discussion on this in V. Smith's E. H. I., 4th ed. pp. 228-29.

৯। J. B. O. R. S., Vol. *XIV*, 1928, pp. 397-421.

১০। B. E. F. E. O. Vol. *XVII. 1917.*

ভৌতিক

(গল্প)

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনো এক এষ্টেটের সার্কেল অফিসার হিসাবে মহাল ইন্‌স্পেক্ট করিতে ও একটি মামলার স্থানীয় তদন্ত করিতেই আমার এই বেতগাঁয়ে আসা। বেতগাঁয়েই কাছারী। শোনা যায়, পূর্ব্বে বেতগাঁ একটি বড় তহশীল-কেন্দ্র ছিল, এখন আর তাহার সে গৌরব নাই, কিন্তু কাছারীটা সেই স্থানেই রহিয়া গিয়াছে। বার মাস এখানে একজন নায়েব, একজন মুহুরী, দুইজন পাইক ও একজন দ্বারবান থাকে। এরা আমার আসিবার খবর আগে হইতে পাইয়া ষ্টেশনে আমাকে আনিতে উপস্থিত ছিল। যখন কাছারী পৌঁছিলাম তখন বেলা একটা। তারপর স্নানাহারাদি করিয়া কাগজপত্র দেখিতে বেলা ২টা বাজিয়া গেল। কাছারী-ঘরের দাওয়া হইতে দেখিলাম গাছের মাথায় রৌদ্র উঠিয়াছে। দেখিয়া খাতাপত্র মুড়িয়া নায়েব হরেন্দ্রকে বলিলাম—কোথায় একটু বেড়িয়ে আসা যায় বল দিকি ?

হরেন্দ্র বলিল—নদীর ধারেই চলুন।

তাহাকে সঙ্গে করিয়া নদীর ধারে বেড়াইতে আসিলাম। একটি ছিন্নমূল প্রকাণ্ড গাছ শায়িত অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহাতেই দুইজনে আসন গ্রহণ করিলাম।

বেলাশেষের ঝির্ ঝিরে হাওয়ায় নাতিপ্রশস্ত নদীবক্ষ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। সম্প্রতি গ্রামের যে বাজারটি উঠিয়া গিয়াছে তাহা আবার বসানো যায় কিনা তাহারই পরামর্শ করিতেছিলাম নায়েবের সঙ্গে।

হরেন নিজের মত ব্যক্ত করিয়া বলিল—এ গাঁয়ে বাজার আর চল্‌বে না। কারণ ক্রেতা কই ? বর্ত্তমানে গ্রামটি তো প্রায় পরিত্যক্ত। এত দিন পাশের গাঁয়ে একটিও বাজার ছিল না, তাই পাশাপাশি যত গাঁয়ের লোক বেতগাঁয়ে আস্‌তো বাজার কর্‌তে। এখন পাশাপাশি দুটো গাঁয়ে দুটো বড় বড় বাজার বসেছে। এখন আর নিজের গাঁয়ের বাজার ছেড়ে কে আর আসবে এখানে বাজার কর্‌তে ? গাঁয়ে যখন লোক ছিল তখন পাশাপাশি দুটো বড় বড় বাজার রৈ রৈ করে চলেছে তাও শুনেছি, এখন মোটে একটা বাজার তাও চলে না। ব্যাপারীরা আসতে চায় না বিক্রী নেই বলে।

এমনি করিয়া কথায় কথায় আসিয়া পড়িল পূর্ব্বে কিরূপ সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল এই বেতগাঁ। হরেন যাহা জানিত মোটামুটি তাহাই বলিতে লাগিল। এমন সময়ে পিছন হইতে একটি অশীতিপর বৃদ্ধের অভিবাদন আমাদের দুইজনের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। আমরা ফিরিয়া চাহিলাম। হরেন বলিল—এই যে আবদুল, কি খবর ? এখানে কি করতে ?

—আপনাদের কাছেই হুজুর, শুনলাম সহর থেকে বড় বাবু এসেছেন তাই দেখা করতে গিছলাম কাছারীতে, সেখানে দরোয়ান বলল, আপনারা এখানে নদীর ধারে বেড়াচ্ছেন। তাই শুনে এখানে এলাম।

আবদুলকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া হরেন বলিল—এই হচ্ছে আবদুল মিঞা—গাঁয়ের সব চেয়ে বুড়ো লোক। এখানকার যত পুরোনো খবর এর কাছ ছাড়া এখন আর কারো কাছে পাবেন না। আমাদেরও সব কিছু খবরই শোনা এর কাছ থেকে। বেড়ে গল্প বলে…

খুব খুশী হইয়া আবদুল বলিল—এই বেতগাঁর কথাই না হচ্ছিল হুজুরদের ?

হরেন হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ আবদুল তোমার কাছ থেকে যা সব শুনেছি এই গ্রাম সম্বন্ধে তাই বড়বাবুকে বলছিলাম। তুমি এসে পড়েছো ভালই হয়েছে, তোমার মুখ থেকেই ইনি এবার সব শুন্‌বেন।

বলিলাম—বেশ, বেশ, আমার অনেক কিছুই জানবার আছে তোমার কাছে ; সম্প্রতি বাজারটার মামলার জন্য স্থানীয় পুরোনো লোকের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করতেই এসেছি।

আবদুল অমনি আরম্ভ করিয়া দিল—বেতগাঁর কিরূপ গৌরবের দিনই সে দেখিয়াছে, দুর্ভাগ্যক্রমে এখন আবার কিরূপ দৈন্যের দিন দেখিবার জন্য আজও সে বাঁচিয়া আছে। গ্রামে আজ আর কে আছে, দু'চার ঘর যারা পুরোনো বাসিন্দা তারা ছাড়া আর সকলেই তো গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছে। সে আজ বহু বৎসরের কথা—বোধ হয় ৭০।৮০ বৎসর হইবে, বিখ্যাত দুইটি মহামারী হয়, তাহাতেই গ্রামের অর্দ্ধেকেরও অধিক লোক মারা যায়। তার পর হইতেই এমন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। সে চৌধুরী-বংশও নাই, সে বেতগাঁও নাই। দেওয়ান ছলিমুদ্দি চৌধুরী নবাবের দেওয়ান ছিলেন, এই বেতগাঁর জমিদার-বংশের তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরই হাতের গড়া গ্রাম এই বেতগাঁ। তিনিই প্রথম বন হাসিল করাইয়া বসতি বসান। এখানে শুধু বেত আর বিছুটীর বন ছিল, তাই তিনি নাম দেন বেতগাঁ। এই বংশের শেষ বংশধর ছিলেন জমিরুদ্দি খাঁ চৌধুরী। তাঁর সময়েই ছিল বেতগাঁর নামডাক সব চেয়ে বেশি। অন্য লোকে বেতগাঁর উল্লেখ করিলে তাহাদের তাহা সম্ভ্রমের সহিত করিতে হইত। জমিরুদ্দি খাঁকে আমরা সকলে রাজা বাবু বলিতাম। বড় ভাল লোক ছিলেন তিনি। প্রজাদের ঠিক ছেলের মতই দেখিতেন। তাঁহার শাসনে দিন দিন বেতগাঁর সমৃদ্ধি বাড়িয়াই যাইতেছিল। আশ-পাশের প্রায় পঞ্চাশখানা গ্রামের এটাই ছিল প্রাণ। দুটো হাট, তিনটে বাজার গমগম করিত লোকে। যত বা ক্রেতা তত বা ব্যাপারী। সহর হইতে ডাক্তার বদ্যি হাকিম আনিয়া গ্রামে বসাইয়াছিলেন। মক্তব মাদ্রাসা পাঠশালা টোল গোটা ১৫।২০ গ্রামের মধ্যেই। এক কথায় তাঁহার আমলে প্রজাদের কিছুই নালিশ করিবার ছিল না, তাহারা সুখেই ছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি করিয়া ফেনাইয়া অনর্থক উপক্রমণিকা দীর্ঘ করিতেছিল দেখিয়া হরেন্দ্র বলিল—বেলা আর বেশিক্ষণ নেই আবদুল তোমার সেই শয়তানের গল্পটা ধর এবার।

হরেনের তাগাদা খাইয়া আবদুল আর বৃথা কালক্ষেপ না করিয়াই এবার মূল গল্পটা ধরিল, বলিল—এই যে বলি বাবু। সে আজ প্রায় আশী বছর আগেকার কথা আপনাদের বলছি—এক ফকির এসেছিল গ্রামে—সে ফকির, না ফকিরবেশী শয়তান! কি অদ্ভুত কি ভয়ঙ্কর তার চেহারা—একমুখ ধূলি-ধূসর জট-পড়া দাড়ি ও চুল, শতছিন্ন তালি-দেওয়া একটা লাল আলখাল্লা পরা, কাঁধে এক ঝুলি, সঙ্গে কতকগুলো ঘেয়ো কুকুর, গলায় একগাছা হাড়ের মালা, নড়লে-চড়লেই সেগুলো কি বিশ্রী খট্ খট্ শব্দ করে বাজতো। প্রথমে অনেকে তাকে মনে করেছিল পাগল বলে, কিন্তু তার সঙ্গে খানিক কথাবার্ত্তা কইলে সে ভ্রম আর কারো থাকতো না।

সে বড় একটা কোনো কথার জবাব দিত না কাউকেই। কেবল এই তিনটি কথার জবাব যে যতবারই জিজ্ঞেস করতো সে একই উত্তর দিত।

তুমি কে?—প্রশ্ন করলে সে উত্তর দিত—মৌত।

কোত্থেকে আসছো?—প্রশ্ন করলে জবাব দিত—জাহান্নমসে।

কেন এসেছো?—প্রশ্ন করলে বল্‌তো—ই দুনিয়া কি বরবাদ হো গ্যয়া।

কাঁধে সেই ঝুলি আর সঙ্গে এক পাল কুকুর এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো, গাঁয়ের লোক তাকে ঘিরে জমায়েত হলে তাদের কত রকম ভেল্কি দেখাতো! ঝুলি থেকে গাঁজানো মদ বের করতো, তাই একটা মড়ার মাথার খুলিতে ঢেলে এক এক চুমুক খেতো আর খুব শব্দ করে অট্টহাসি হাসতো আর বের করতো একটা হাঁড়ি যার ঢাকা খুল্লে সকলে আশ্চর্য্য হ'ত দেখে যে হাঁড়িতে পচা দুর্গন্ধ খানিকটা মাংস মুড়ির মত পোকায় ভরা। তার গন্ধে ও ঘৃণায় লোকে পিছিয়ে যেত। তা দেখে তার বড় আমোদ হতো, হাসতো আর হাঁড়ি থেকে মুঠো মুঠো পোকা সমেত খানিকটা করে মাংস মুখে পুরে দিয়ে কোটরগত চক্ষু দু'টি বুঁজিয়ে হৃষ্টমনে চিবোত আর মাঝে মাঝে মদের পাত্রটায় এক একবার চুমুক দিত। তার খাবার ধরণ দেখে, ভয়ে, ঘৃণায়, দুর্গন্ধে কেউ তার কাছে ঘেঁষতো না। সকলেই পালাতো ভূত দেখলে যেমন পালায়।

এমনি ভাবে সেদিন দুই গ্রামের মধ্যে ঘুরেফিরে বেড়ালো, তারপর রাজাবাবুর কাছে সকল প্রজা সমবেত হয়ে দরবার করল। তার কানে যেতে তিনি সেই দিনই

বরকন্দাজ দিয়ে সেই বুড়োটাকে গ্রামের বাইরে বের করে দিয়ে আসতে হুকুম দিলেন। সেই দিনই তাকে গ্রামের চতুঃসীমার বাইরে বের করে দেওয়া হ'ল। কিন্তু পরদিন সকালে বিস্ময়-বিভীষিকার মাঝে আবিষ্কার করা হ'ল সে মূর্ত্তিমান মড়ক নিজে নিজেরই বমি বাহে মেখে মসজিদের চত্বরে মরে পড়ে রয়েছে। আর তার ঘেয়ো কুকুরগুলো সেই সব চাটছে আর ছড়াচ্ছে চারি ধারে।

তারপর আর কি মড়ক লাগল গাঁয়ে, গাঁ উজাড় হ'য়ে গেল ওলাউঠোয়। আর বাকী লোক সব ছেড়ে ছুড়ে শুধু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল বহু দূর গ্রামে। প্রতি বাড়ীতেই হাহাকার শব্দ উঠছে, কে কার মুখে জল দেয়। বদ্যি, হাকিম এরা সব যে যার প্রাণ নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। এক পান ওযুধ পাবার জো নেই। সেবা করার লোক নেই, তাই তিন গাঁ থেকে ভাড়া করে লোক আনার চেষ্টা হয়েছিল। বাবু বলে দিয়েছিলেন, লোক পিছু আশ্‌রফি মিলবে। কিন্তু আশ্‌রফির লোভে আসবে কে? প্রাণের চেয়ে তো আর আশ্‌রফি নয়, কি বলুন বাবু? আগেই তো বলেছি যে আমরা রাম-রাজত্বিতে ছিলাম। এমনি ভাল আমাদের জমিদার যে আমরা বললাম—আপনি এখুনি এগ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যান বাবু, আপনি কি জন্য পড়ে থাকবেন? গ্রাম ছেড়ে গেলে যারা খেতে পাবে না, তারা পর্য্যন্ত পালাচ্ছে আর আপনার কিসের অভাব? আপনার গোলাম নফর বেওৎ তারা পর্য্যন্ত জান বাঁচাচ্ছে পালিয়ে আর আপনার জানের দাম তো তাদের চেয়ে অনেক বেশি।

তার উত্তরে বাবু বললেন—আমি পালালে কি আর মুমূর্ষুদের মুখে জল দেবার একটি লোকও পাওয়া যাবে ভাবছো? আমি আছি তাই আমার যারা নুন খায় তারা অনেকে এখনো পড়ে আছে। আমি গেলে এতগুলো রোগী এদের কি হবে? শুশ্রূষা হ'লে চিকিৎসা হ'লে এতগুলো রুগীর ভেতর গোটা কতকও তো সারতে পারে? তবে আমি জোর করে কাকেও রাখতে চাই না। সে কেনা গোলামই হোক না কেন? যে যেতে চায় যাক্, শুধু আমার যাবার জো নেই।

অনেক বার শোনা গল্প বলিয়াই বোধ হয় হরেন উশ্‌খুশ্‌ করিতেছিল, বলিল—আর বসতে ভাল লাগছে না, চলুন উঠবেন নাকি?

বলিলাম—তাই হোক, চল ওঠা যাক। বেতগাঁর সাবেক জমিদার বাড়ীটা আব্‌দুলের সঙ্গে দেখে আসা যাক্। কি বল আবদুল?

—সে আমি আর কি বলব বাবু আপনার মর্জ্জি। বেশ তো চলুন না নিয়ে যাই। আবদুল সানন্দে নিমন্ত্রণ করিল।

হরেন বাধা দিয়া বলিল—কোথায় যাবেন শুদ্ধ বিছুটির জঙ্গল।

তাহা সত্ত্বেও বলিলাম—তা হোক একবার দেখেই আসা যাক্, চল আবদুল।

গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে জায়গাটা নেহাত মন্দ লাগিল না। ইতস্ততঃ জঙ্গলে ঢাকা ভগ্নস্তূপ ছাড়া যদিও এখন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না, তথাপি সব কিছু লইয়া ইহা এককালে যে বেশ বড় ব্যাপারই ছিল তাহা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। থাকিবার মধ্যে শৈবালদামে ভর্ত্তি হইয়া দীঘিটি আজও আছে। ঘাট চারিটির মধ্যে দুটি আজও অটুট আছে। সুদীর্ঘ কাল সংস্কারাভাবে চতুর্দ্দিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। জঙ্গল ভাঙ্গিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। এক সময় যাহা সখের বাগান ছিল আজ তাহা অরণ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাগানের পিছনে একটি ভাঙা মস্‌জিদ্—তাহার চত্বরে উঠিলে অদূরে আমাদের কাছারীটি দেখা যায়। তাহারই সংলগ্ন গোরস্থান। তাহাতে অনুমান ৪০।৫০টি কবর আছে। চৌধুরী-বংশের যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে প্রথামত তাহাদের সকলকেই এখানে গোর দেওয়া রীতি ছিল।

মসজিদের চত্বরে তাহার সহিত খানিক বসিলাম। বড় অদ্ভুত লাগিল স্থানটা। নির্জ্জনতার কপিশ চক্ষুর মূক ভ্রূকুটী আমাদের কথা হরণ করিয়া লইল। এইরূপ জায়গায় বসিয়া ভাবিতে খুব ভাল লাগে। ভাবিবার জন্য এইরূপ একটি নির্জ্জন স্থান বড় ভালবাসিতাম বলিয়াই যত দিন সেখানে ছিলাম ঐ দীঘির ঘাটে বা মসজিদের চত্বরে বৈকালে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। সন্ধ্যাসমাগমে ঝিঁঝিঁ

পাকারা সেই মহান স্তব্ধতা ভঙ্গ করিত। তবে সে একটানা অবিরাম শব্দ নির্জ্জনতা অপেক্ষাও একঘেয়ে ও ঔদাস্যকর এবং সমভাবদ্যোতক। অন্ধকার হওয়ার আগেই উঠিয়া পড়িতাম।

আমি রোজ এখানে আসিয়া বসিয়া থাকি দেখিয়া হরেন আমাকে একদিন বলিল—আপনি নবাগত ও শহরের লোক তা নইলে এখানকার কেউ ওখানে যেতে সাহস করে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—তাই নাকি? কেন?

—আর দু'চার দিন থাকলেই বুঝতে পারবেন।

হরেন আমার কাছে হেঁয়ালি হইল।

বলিলাম—বটে! এমন কথা? দেখাই যাক।

বলিয়া প্রত্যহই নিয়ম মত সেখানে গিয়া বসিয়া থাকিতাম, শুধু ইহাই দেখাইতে যে আমরা সহুরে লোক, আমাদের কাছে গেঁয়ো ভূত প্রেত বা অপদেবতা ঘেঁষিতে পারে না।

দিন পাঁচ-ছয় বেশ এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন রাত্রে এমনই এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে প্রমাণিত হইল যে, গ্রামের ভূত সর্ব্বশক্তিমান্ সহরবাসীকেও গ্রামের মধ্যে পাইলে তাহার প্রতিও যে বিশেষ সম্ভ্রম করিয়া চলে তাহা নহে।

সে দিন রাত্রে কাছারীতে খুব এক চোট ভোজ হইয়াছিল, পাশের গাঁ হইতে এক প্রজা একটি পাঁঠা দিয়া গিয়াছিল বলিয়া। সবে খাওয়া-দাওয়া করিয়া শুইয়াছি, ঘুম আসিতেছে না, গুরুভোজনজনিত কষ্ট হইতেছে। একে ভাদ্রের গুমোট, তাহাতে মশার জ্বালায় চোখের দু'টি পাতা এক করিতে পারিতেছি না। বাহির হইতে ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ ও দূরাগত শেয়ালের ডাক কানে আসিতেছে। এত মশার উপদ্রব সত্বেও কি করিয়া যে পাইক, দারোয়ান, হরেন এরা সকলে ঘুমাইতে পারিল ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি।

মাঝে আমারও একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল—ঘামে অবগাঢ় তন্দ্রা—সেটুকু আবার তৎক্ষণাৎ ভাঙিয়া যাওয়ায় শান্ত ঘুম ত্যাগ করিয়া ঘাম মরাইতে বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। শরতের মেঘলেশহীন আকাশ। কৃষ্ণপক্ষের আকাশ জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে তারায়। দাওয়ায় চেয়ার আনিয়া বসিলাম। অদূরে চৌধুরীদের বাগানের পিছনের অংশ অন্ধকারের রহস্যে কুটিল হইয়া উঠিয়াছিল। তথাকার চূড়াহীন ভাঙা মসজিদটি কতকগুলি ভঙ্গিল রেখায় কালো দিগন্তের পশ্চাদপটে রূপায়িত হইয়াছিল। মনে পড়িল আবদুলের সঙ্গে দেখিয়া আসিয়াছি—ওখানকার সেই বিষণ্ণ গোরস্থান, যেন শিহরিয়া উঠিলাম। অন্ধকারে মনে হইল, স্থানটা যেন থম্ থম্ করিতেছে অশরীরী আত্মাদের নিঃশব্দ সঞ্চারে। ঐ সব কথাই ভাবিতেছিলাম, হঠাৎ কানের উপর কাহার অঞ্চল যেন স্পর্শ বুলাইয়া গেল। বড় চমকাইয়া উঠিলাম, গা-টা ছম্-ছম্ করিয়া উঠিল। পিছন ফিরিয়া দেখি কিছুই নয়, পিছনে একটা কাপড় শুকাইতেছিল, তাহারই একটা কোণ হাওয়ায় উড়িয়া আসিয়া আমার গাল স্পর্শ করিয়া গেছে!

আশ্বস্ত হইলাম বটে, তবু কেমন যেন একটা অসাড় ভীতি আমার বুকের তলায় জাগিয়া রহিল! ঘরে গিয়া আবার শুইয়া পড়িব ভাবিতেছি, এমন সময়ে কানে আসিল তীব্র একটা আর্ত্তনাদ। মনে হইল আর্ত্তনাদটা যেন ঐ গোরস্থান হইতে আসিল। হাতের কাছে যাহা পাইলাম তাহা লইয়াই উঠনে নামিয়া পড়িলাম।

কিন্তু তখনই আবার চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, একটা কালপেঁচা আকাশের এদিক হইতে ওদিকে কর্কশ আওয়াজ করিয়া উড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই আর্ত্তনাদ ও মেয়েলি কণ্ঠের বিলাপ—আমার সোনা মাণিক গো!

ঐরূপ গহন নিরালা স্থানে মাঝরাতে স্ত্রীকণ্ঠ শুনিয়া বড় আশ্চর্য্য হইলাম। কৌতূহলচালিত হইয়া সেইদিকে আরও অগ্রসর হইলাম, কিন্তু কেহ কোথাও নাই, সবই নিস্তব্ধ নথির। জঙ্গলের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি, প্রায় বাগানের সমীপবর্ত্তী হইয়াছি এমন সময়ে সেই শব্দ নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইল। শাসনপরুষ কণ্ঠে যথাসাধ্য চীৎকার করিলাম—কে?

নৈশ প্রান্তর আমার প্রশ্ন প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল—কে?

সহসা এক ছায়া দেখিলাম—আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত…

সুতরাং মেয়েমানুষ বলিয়াই নিশ্চিত ধারণা করিলাম। ক্রমে সেই ছায়া বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। আবার সেই আর্ত্তস্বর! কিন্তু এবার মনে হইল স্বরটা যেন অপেক্ষাকৃত দূর হইতে আসিতেছে। আর অগ্রসর হইলাম না, ভাবিলাম ফিরিয়া যাই। কিন্তু মনে পড়িল বাল্যের সংস্কার—ভূত-প্রেত দেখিলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে নাই, পিছন ফিরিলেই তাহারা আক্রমণ করিবার সুবিধা পায়। সেই জন্য পিছন ফিরিয়া দৌড় দিলাম না, ধীরে ধীরে পিছু হটিতে লাগিলাম। এমনি করিয়া গিয়া শেষে কাছারীর উঠানে গিয়া পৌছিলাম। বনের মধ্যে তখনো যেন কিসের আলো থাকিয়া থাকিয়া দেখা যাইতেছিল! জনমানবহীন বনের মধ্যে রাত্রিবেলা আলো—আলেয়া নাকি?

সে যাহা হউক তারপর সেই দূরশ্রব আর্ত্তনাদ আরও কয়েকবার শ্রুত হওয়ার পর আবার পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। ইহার পর শয্যা গ্রহণ করিলাম। এই বিভীষিকার কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি নাম মনে নাই।

সেদিন ঘুম ভাঙ্গিতে কিছু বেলা হইয়া গিয়াছিল, চোখ চাহিয়া আর হরেনকে দেখিতে পাই নাই, সে আদায়ের কাজেই পাইক সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়াছে। পণ করিয়া ছিলাম যে ব্যাপারটির রহস্য ভেদ করিতেই হইবে। উঠিয়া সর্ব্বাগ্রেই নিজে গিয়া চৌধুরীদের বাগানের সেই অংশটুকু ভাল করিয়া আবার দেখিয়া আসিলাম। সকালে সেখানে যাইতে গতরাত্রির বিভীষিকার কণামাত্রও অনুভব করিলাম না। শুধু কয়েকটি ছোট ছোট সদ্যখাত গর্ত্ত দেখিয়া আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহা লইয়া এত ভাবি নাই, তারপর তাহা আবার ভুলিয়াও গিয়াছিলাম। তারপর ফিরিয়া আসিয়া দরোয়ানকে দিয়া আবদুলকে ডাকাইয়া আনিলাম। গতরাত্রির সমস্ত ঘটনা তাহাকে বলিলাম। সমস্ত কিছু শুনিয়া সে মন্তব্য করিল যে, ইহা নিত্যই ঘটিয়া থাকে, নূতন কিছুই নয় এবং ইহাতে ভয়ের কিছুই নাই। তবে ইহার অনেক ইতিহাস আছে।

বলিলাম—ব্যাপারটা খুলে বলো তো আবদুল মিঞা!

আবদুল নিজের দীর্ঘ শ্মশ্রুর মধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে করিতে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ব্যাপারটা বড় দুঃখের বাবুজী। তখনকার লোক আমি এখন একাই জিন্দা আছি, আর কেউ আপনাকে এসব কথা বলতেও পারবে না। তারা জান্‌বেও না, জান্‌তে চাইবেও না, শুনবেও না, হেসে বুড়ো মানুষের সব কথাই উড়িয়ে দেবে—বল্‌বে আজ্‌গুবি। এখনকার ছেলেগুলোকে বলতে গেলে তারা বলে আমি নাকি গল্প বানাই।

বলিলাম—না না আবদুল—তুমিই গ্রামের একমাত্র পুরোনো লোক, তুমি বল্‌বে না তো কে আর বলতে পারবে? তোমার কথা আমরা কি রকম বিশ্বাস করি। ব্যাপারটা খুলে বলো, না জানা পর্য্যন্ত আমি স্থির থাকতে পাচ্ছি না।

এর পরেই বৃদ্ধ এই গল্পটি আরম্ভ করিল:

সে আজ অনেক দিনের কথা বলছি, আপনাদের তো তখন জন্ম হয়ই নি, আপনাদের বাপেরাও তখন জন্মান নি। আমরাই তখন সবে জোয়ান—এই আপনাদের বয়সী।

এই সময়ে তাহাকে একবার বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তোমার বয়স কত হ'ল আবদুল?

বৃদ্ধ খানিকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়া বলিল—বয়সের কি আর হিসেব রেখেছি তবে একশ' পার হয়ে গেছে বাবু।

বড় আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম বৃদ্ধের কথায়, বৃদ্ধকে দেখিলে বড় জোর ৭০।৭৫ বৎসর মনে হইতে পারে। যাই হোক, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা মনে ঠাঁই দিতে ইচ্ছা করিল না, বলিলাম—আচ্ছা, তারপর বল?

বৃদ্ধ বলিতে লাগিল—রাজাবাবু তখন সবে পুত্রশোক পেয়েছেন—একমাত্র পুত্র। একে রাজাবাবুর তখন আর ছেলে হওয়ার বয়েস নেই, তার ওপর আবার রাণী-মা চল্লিশ পার হয়ে যেতে বসেছেন। সকলেই বলল—বেতগাঁর এত বড় বংশ রইল না।

কিন্তু তারপরই কানাঘুষায় শোনা গেল রাণী-মা অন্তঃসত্ত্বা। তাঁকে খুব সাবধানে রাখা হ'ল, সেবা-যত্ন করার জন্য আরও কতকগুলো বাঁদী বাহাল হ'ল। জমিদার-বাড়ীর বাঁধা হাকিম যে ছিল সে দিনের মধ্যে

সাতবার যেতে আসতে লাগল রাণীমাকে দেখবার জন্যে। রাজাবাবু রোজ সকালে গরীব-দুঃখীকে ডেকে খয়রাৎ করতেন। ঢোল শহরতে রাষ্ট্র করে দেওয়া হ'ল যে, জমিদার বাবুর এবার যদি ছেলে হয় তো সকল প্রজারই এ বৎসরের পুরো খাজনা মাফ হয়ে যাবে। আর যদি মেয়ে হয় তো অর্দ্ধেক খাজনা মাফ হবে। প্রজারা সকলেই কামনা করতে লাগল তাদের বাবুর এবার যেন খোকা হয়। তাহলে তারা এক বছরের খাজনা রেহাই পাবে।

তারপর সময় যখন পূর্ণ হয়ে এল সহর থেকে ভাল ভাল দাই এসে দেখে যেতে লাগল। একদিন তারা বলে গেল যে, সময় হয়েছে দেরী নেই, আজ রাত্তিরের মধ্যেই ব্যথা উঠবে। এবং এও বলে গেল যে পেটে নাকি ছেলে নড়ছে না, লক্ষণ ভাল নয়।

শুনে রাজাবাবু তো একেবারে বসে পড়লেন। পুরস্কার ঘোষণা করে দিলেন—যদি দাই জ্যান্ত ছেলে প্রসব করাতে পারে তাহলে এখুনি পঞ্চাশ আশ্‌রফি বকশিশ করবেন।

তার পর এক বেলা বেদনা সহ্য করার পর রাণী মূর্চ্ছা গেলেন। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু অনেক করে দাই সেই রাত্রের ভিতরই মরা ছেলে প্রসব করাল, রাণীর তখনো মূর্চ্ছা ভাঙে নি।

একটা গরীব দাইয়ের কাছে পঞ্চাশ আশ্‌রফির লোভ তো আর কম নয়!

পাশেই জোলাপাড়ার দীনু মোল্লার গতকাল ভারী সুন্দর একটি ছেলে হয়েছে—দীনুর বৌ পরীকে দেখতে গিয়ে সে দেখে এসেছে। ছেলেকে বুকে করে পরী কত দুঃখ করেছিল, কেঁদে ছিল যে এমন সুন্দর ছেলে এ গরীবকে খোদা কেন দিলেন, বাঁচাব কি করে কি খাইয়ে? সত্যই দীনুর নিজের খাওয়ার সংস্থান নেই, তা খাওয়াবে কি করে? দাইয়ের মনে সেই কথাই ক্রমাগত তোলপাড় করতে লাগল।

তাই রাণীর কাজে কিছুক্ষণের জন্য অন্য কাকেও নিয়োগ করে সে নিজে দৌড়ল পরীর কাছে এবং রাতারাতি দীনু মোল্লার ছেলেটিকে রাণীর পাশে শুইয়ে দিয়ে রাজাবাবুকে গিয়ে বলল—রাণীমার একটি ফুটফুটে ছেলে হয়েছে। তবে অবিলম্বেই ছেলের জন্য একজন স্তন্যদায়িনী ধাত্রী চাই, একজন ধাত্রীরও জোগাড় হ'য়েছে। বলে সে পরীকে দেখিয়ে দিল।

পরীই বাহাল হ'ল ছেলের কাজে। পরীকে আড়ালে ডেকে আমিনা দাই বলল—তোর ছেলে তোরই কাছে রইল, শুধু জমিদার-বাড়ীতে মানুষ হবে, মন্দ কি?

আমিনার কথায় পরীও তার ঘাড় হেলিয়ে জানাল, এতে আর তার দুঃখ নেই

রাণীমার জ্ঞান হ'লে আমিনা তাকে ছেলে নিয়ে গিয়ে দেখালো, ছেলে দেখে তিনি সকল কষ্ট ভুলে গেলেন। তারপর আমিনা পরীকে নিয়ে গিয়ে দেখাল বলল—রাণীমা, এই হ'ল তোমার ছেলের ঝি, এ ছেলেকে মাই দেবে।

রাণী-মা আর কি বলবেন, শুধু অবাক হয়ে ঝি-এর রূপ দেখতে লাগলেন! পরী তো সত্যই পরী!

তারপর যত দিন যেতে লাগল পরীও ভুলে যেতে লাগল যে সে ছেলেকে বিক্রী করে ফেলেছে এবং সে এখন নিজেরই গর্ভজাত শিশুর সামান্য একটা বেতনভোগিনী ধাত্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। আর রাণীও জানতে পারলেন না যে শিশুটি তাঁর গর্ভজাত নয়।

পরী প্রাণ দিয়ে ছেলেমানুষ করতে লাগল দেখে সকলে বলল—পরের ছেলে এমন করে মানুষ করতে কেউ কখন দেখেনি, সাবাস মেয়ে পরী।

রাণী-মার কানে কথাগুলো যখন উঠলো তখন তিনি বললেন—মায়ের চেয়ে দরদী তাকে বলে ডাইনী।

এম্নি করে যতদিন যায় কোথা হতে যেন রাণীমার মনে পরীর প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ গোপনে গোপনে জমা হতে থাকে! ছেলে যদি কোনো সময় বায়না ধরে কাঁদে তো পরীর কোলে যতক্ষণ না যাবে চুপ করবে না। যদি কোনো সময়ে ছেলে পরীকে না দেখতে পায় তো একেবারে বাড়ী মাথায় করবে চেঁচিয়ে, আর কারও কোল যাবে না, রাণী-মার কোলে তো নয়ই। লোকে বল্‌তো—ছেলে মায়ের চেয়ে ঝিয়ের বেশি ন্যাওটা।

শুনে রাণী-মার ভেতরটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতো

হিংসায়। এমনি করে দিন কেটে যায়, শুক্লপক্ষের চাঁদের মত পরীর কোলে ছেলেও বেড়ে উঠতে থাকে।

সেবারে চারিদিকে বড্ড জ্বর হচ্ছিল, সেই হিড়িকে পরীও জ্বরে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে বিকার। ছেলে তখন বছর দুয়েকের। ডাক্তার পরীকে দেখতে এসে বলে গেল—দাইয়ের কাছ থেকে ছেলেকে তফাৎ কর। রোগীর ত্রিসীমানায় যেন ছেলেকে আসতে দেওয়া হয় না, কারণ রোগটা ছোঁয়াচে।

ছেলেকে আর কোথায় সরিয়ে রাখা হবে? কাজেই ঝিকেই সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল বাইরের বাড়ীতে। অবশ্য লোক রাখা হ'ল সেবার জন্যে।

বিকারের ঘোরে পরী থেকে থেকে ঠেলে উঠতে যেত, বলতো—খোকাকে মাই দেবার সময় হয়েছে। উঠতে যারা না দিত, তাদের সময় সময় অনুনয় বিনয় মিনতি বা কখনো কখনো গালাগালি করতো, বলতো—চামারগুলো তার খোকাকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলবে, খোকার গলা শুকিয়ে গেছে। থেকে থেকে খোকার নাম ধরে চীৎকার করে উঠতো।

ঠিক এক ভাবেই দিন পনেরো কাটলো, রোগ কমল না, ডাক্তার বদ্যি সকলেই বলে গেল—অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আজ রাত্তিরটা কাটার আশা খুবই কম।

ঠিক সেই দিনই রাত্তিরে পরীর কাছে যে থাকতো সে ঘুমিয়ে পড়েছিল মাঝরাত নাগাদ আর সেই ফাঁকে উঠে বিকারের ঘোরে তার সুপ্ত শুশ্রূষাকারিণীকে খোকা মনে করে তার মুখে স্তন গুঁজে দিতে গিছল। শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোকটি তাতে প্রাণভয়ে চেঁচিয়ে উঠে তাকে মেরেছিল এক ঠেলা। পরী সেই যে ঠিকরে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় আর তার জ্ঞান হয়নি। তারপর সকাল হতেই পরী মারা যায়।

এর পরে আর ছ'মাসও পেরোয় নি ছেলেটাও মারা গেল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছিল?

আবদুল বলল—হবে আর কি? শুধু চিল-চেঁচাতো. খত না দেত না শুকিয়ে যেতে লাগল।

একটু থামিয়া পরে আবার বলিল—গোরস্থানের সব শেষ যে ছোট কবরটা আমবাগানের দিকে ঐটে হচ্ছে খোকার কবর। রাত্রিবেলা গোরস্থান বা তার আশে-পাশে সেই থেকে একটা ছায়াকে ঘুরতে ফিরতে দেখা যায়—সাদা কাপড়ে মোড়া একটা মেয়েমানুষের ছায়ার মত। পরী রোজ আসে কিনা আলো নিয়ে তার ঘুমন্ত ছেলেকে খুঁজতে। কবর থেকে তুলে মাই দেয়, 'সোনা-মাণিক' বলে আদর করে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। আবার সকাল হ'বার আগেই ছেলেকে কবরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে মাটি চাপা দিয়ে চলে যায়!

—তুমি কখনো দেখেছো আবদুল, না এই রকম শুনেছো বলেই বলছো?—জিজ্ঞাসা করিলাম।

ইহাতে একটু আহত স্বরে আবদুল বলিল—আমি আর দেখিনি? স্বচক্ষে দেখেছি চৌধুরী-বাড়ীর বাগান থেকে যে ঐ আঁকাবাঁকা পথ গিয়েছে গাঁয়ের বাইরে তরঙ্গিণী নদীর তীর পর্য্যন্ত যেখানে শুধু শর আর বিছুটির বন। সেই বনের মধ্যে পরীকে মাটি দেওয়া হয়েছিল। কত দিন আমি দেখেছি সেইখান থেকে পরীকে উঠে আসতে ঐ পথ দিয়ে। ও পথ দিয়ে কেউ কখনো হাঁটে না, তবু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পথটা আজও ঘাসের মধ্যে মিলিয়ে যায় নি। রোজ সকালে লক্ষ্য করলেই দেখবেন মানুষের পায়ের দাগ।

ঠিক এমনি সময় কাছারী-বাড়ীর বাহির হই[illegible] ডাক আসিল—আবদুল এখানে আছো, ও আবদুল!

আবদুল আমার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমায় কে ডাক্‌ছে না হুজুর?

বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ দরোয়ান আসিয়া জানাইল যে গ্রামান্তর হইতে একজন আবদুলকে ডাকিতে আসিয়াছে, বলিতেছে যে সে আবদুলের বাড়ী গিয়াছিল, সেখান হইতে বলিয়া দিয়াছে যে আবদুল এই কাছারীতেই আছে। তাই সে এখানে আসিয়াছে। আবদুলকে এখনি যাইতে হইবে একটি হিন্দুর মেয়েকে ভূতে পাইয়াছে।

শুনিবামাত্র আবদুল উঠিয়া দাঁড়াইল ও একটা আত্ম-প্রসাদের হাসি হাসিয়া লইয়া বলিল—দরকারের সময় আবদুলকে যে মনে পড়ে এই ঢের! আবার দরকার

ফুরোলেই আবদুল বুড়ো গাঁজাখোর, মিথ্যাবাদী, যত আজগুবি গল্প বানায় কত কি? বলিয়া আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আবদুল চলিয়া গেলে পর আমি পরীর কথা ভাবিতেছি এমন সময়ে পোষ্টাল পিওন আসিয়া দ্বারে হাঁক দিল—চিঠি।

পরক্ষণেই দরোয়ান একখানি চিঠি আমার হাতে দিয়া গেল।

চিঠি খুলিলাম, 'মণ্টুর মা' চিঠি লিখিয়াছে। এখানে বলা বাহুল্য, মণ্টু আমার একমাত্র শিশুপুত্র। পড়িতে লাগিলাম—

"শ্রীচরণেষু,

পত্র পাঠ তুমি চলিয়া আসিবে। এখানে মণ্টুর কি যে হইয়াছে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দিনান্তে পেটে একটুও দুধ তলাইতেছে না। খাইলে তখনই তুলিয়া ফেলিতেছে। ক্ষেমি-পিসী বলিতেছেন যে কোনো মন্দ লোকের চোখ লাগিয়াই এরূপ হইতেছে। মাই মুখে করিতেছে না, শুধু চিল-চেঁচাইতেছে। কিছুতেই ঠাণ্ডা করিতে পারিতেছি না, তাহাকে লইয়া বড় চিন্তার কারণ হইয়াছে। তুমি না আসিলে কোনো ব্যবস্থাই হইতেছে না। ফিরিবার পথে অন্ততঃ একদিনের জন্যও আসিও। আমার প্রণাম ও ভালবাসা জানিও। ইতি,

তোমার চারু"

চিঠি পড়িয়া মন আরও খারাপ হইয়া গিয়াছিল। কেন জানি না সবদিকেই অলক্ষণ মনে হইতেছিল। স্থির করিতেছিলাম যে, আজই এস্থান হইতে বাড়ী রওনা হইব। বেলা দুইটায় একমাত্র গাড়ী। মাত্র এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গুছাইয়া লইতে হইবে ভাবিয়া গাত্রোত্থান করিতেছি এমন সময়ে হরেন আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

তার পর দু'এক কথা হইবার পর হরেন আমায় জিজ্ঞাসা করিল—আবদুল এখানে এসেছিল নাকি? আমি কাছারী ফিরছি, পথে দেখা হ'ল। ও যাচ্ছে।

—হ্যাঁ এসেছিল, আমিই ডেকে আনিয়েছিলাম।

কেন ডাকাইয়া আনাইয়াছিলাম তাহাও বলিলাম, গত রাত্রির সব ব্যাপার বলিলাম, রাত্রের ঘটনাটি শুনিয়া আবদুল তাহার কি ভাষ্য দিল তাহাও বলিলাম। শুনিয়া হরেন নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত আমার সকল কথা শুনিয়া হরেন বলিল—ব্যাপার কিছুই ভৌতিক নয়, এ নিত্যই ঘটে। পাশের গাঁয়ে এক পাগলী থাকে—এক কৈবর্ত্তের মেয়ে। তাকে দিনের বেলায় যে দেখেছে সে বিশ্বাস করে না তার মাথা খারাপ, খালি রাত্তির হলেই সে পাগল হয়। তার ধারণা চৌধুরীদের বাগানে অনেক ধন-দৌলত সোনা-মাণিক পোঁতা আছে—তার সন্ধান সে ছাড়া আর কেউ জানে না। তাই সে প্রতি রাতেই এক পো রাস্তা হেঁটে এসে আলো ধরে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে খোঁজে ...বছরের পর বছর সে এমনি করে খুঁজে যায়—কি পায় তা সে-ই জানে! কিছু পায় না নিশ্চয়ই—তাই সোনা-মাণিকের শোকে কাঁদে আর খোঁজে, এমনি করে রাতের পর রাত! আবার দিন হলেই অন্য মানুষ যেন, চেনাই যায় না।

বলিলাম—তবে কি আবদুল আমার কাছে এত সব আজগুবি গল্প করে গেল?

হরেন বলিল—ওর কথা বাদ দিন। আমাদেরও কাছে অমন কত রকম বলে, সব বিশ্বাস করতে গেলে কি চলে বাবু? রকম রকম সময় রকম রকম লোকের কাছে রকম রকম গল্প করেই ও দিন কাটায়। ভেবে পাই না লোকটা কি? গাঁজাখোর না পাগল?

বুঝিলাম আবদুলের কথা বিশ্বাস করিয়া বোকামি করিয়াছি। হাসি দিয়া বোকামি ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম—লোকটা গাঁজাখোর? আমারও তাই মনে হয়েছিল কিন্তু।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিজের বিশ্বাসপ্রবণতার জন্য বিশেষ লজ্জিতই হইয়াছিলাম।

বিরূপার জিজ্ঞাসা

শ্রীমলয়

সম্মানীয়াসু

বিরূপা, তোমার চিঠিখানা পেয়েছি। যুগাধিক কাল পরে তোমার চিঠিখানা যে পেলাম, এ পাওয়াতে সত্যিই আনন্দ আছে। সংসারের বাধা-বিপত্তিতে মনে যে ঘন আঁধার জমে আসে তোমার সংবাদ বহন করে চিঠিখানা সেথায় আলোর সন্ধানই নিয়ে এসেছে। সংসারের বাকী সবগুলি বাঁধন কেটে ফেলে কেন্দ্রীভূত দৃষ্টিটাকে চিরপরিচিত পরিধি থেকে তুমি যে বহির্মুখী ক'রে দিতে পেরেছ— এ যে কত বড় সাধনার ফল তা সহজে অনুমান করা কষ্টকর। সংসারের প্রধান আলোক-বর্ত্তিকা যখন তোমার চোখের সামনে চিরতরে নিবে গেল, দেবতার নির্ম্মম বিধানকে অনায়াসে মেনে নিয়ে তুমি সে বিপদ থেকেই অনুপ্রেরণা গ্রহণ কোরলে তোমার নূতন জীবনের—এ তোমায় নারীত্বের আদর্শ থেকে মাতৃত্বের গৌরবাসনেই বসিয়ে দিলে। সেবাধর্ম্মের উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি যে জীবন বরণ ক'রে নিয়েছ ওদিকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি পড়ে কিনা জানি না, কিন্তু পরার্থে উৎসর্গীকৃত তোমার এ জীবন থেকেই আমি পাচ্ছি অন্তরে অপরিমিত উৎসাহ ও প্রেরণা।

তোমার খবরাদি দেওয়ার পরে তুমি চিঠির একস্থানে আমায় একটি প্রশ্ন করেছো। প্রশ্নটিকে সাধারণ ভাবে বিচার করলে মনে হয়, এটা শ্লেষপূর্ণ একটা জিজ্ঞাসা মাত্র। কিন্তু কোন্ ব্যক্তিবিশেষের এ জিজ্ঞাসা—এভাবে এর বিচার করলে তা যে একটা গভীর ও দূরপ্রসারী প্রশ্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। তোমার প্রশ্ন অতি শক্ত, অথচ প্রশ্নটি মাত্র তিনটি কথার সমষ্টি—গৃহীর বৈরাগ্য কেন? জানি, এ জাতীয় প্রশ্ন করবার দাবী তোমার আছে, কিন্তু এরূপ প্রশ্ন কদাচ কেহ আমায় করেনি। মাত্র এ তিনটি কথাই ভূত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যতকে সজোরে টেনে আনছে! তাই বলছি, তিনটি কথার প্রশ্নটিকে তিনটি, ছয়টি বা নয়টি কথায় জবাব দেওয়া যাবে না। আমার জবাব একটু দীর্ঘ হবে।

শুনেছি, যখন আমার সাত বৎসর বয়েস তখন পশ্চিম-দেশ থেকে ব্যাধিগ্রস্ত এক ব্রাহ্মণ এসেছিলেন আমাদের বাড়ীতে। নিয়মিত একমাস ধরে প্রতিদিন ভোরে আমার পাদোদক একবার ক'রে পান করলেই নাকি তাঁর রোগ যাবে সেরে—এ ছিল তাঁর প্রতি স্বপ্নাদেশ। পূর্ব্বজন্মে আমিই নাকি এ ব্রাহ্মণের ছিলুম অগ্রজ আর ছিলুম সংসার-বিরাগী ব্রহ্মচারী। এ জন্মান্তর-রহস্য সত্য কিনা জানিনা, কিন্তু এ জাতীয় একটা সংস্কার নিয়েই যেন হয়েছিল আমার জন্ম আর বহির্দৃষ্টি নিয়েই সুরু হয়েছিল আমার জীবন। তাইত অসচ্ছল সংসারের ছেলে হয়েও ছোটবেলা থেকে অন্য সংসারের অন্নকষ্ট বা অভাব-অভিযোগের কথা শুনলেই ছুটে যাই তাদের দুঃখকষ্টের লাঘবচেষ্টায়! নিজেদের সংসারের ভিতরে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ না থেকে সকল সময়েই দৃষ্টি পড়ে বাইরের দিকে। এ জন্য নিজ ভাইবোনগুলির প্রতি যে আমার স্নেহ-মমতার অভাব ছিল এরূপ আশঙ্কা করবারও কোন কারণ নেই। আমার ছয়টি বোনেরই জন্ম হয়েছিল শনিবারে আর চার ভাইয়ের ভিতর কেবল আমার হয়েছিল জন্ম শনিবারে। এ জন্য আমার হৃদয়ের কোমলতা লক্ষ্য করে মা তামাসা করে বলতেন যে, যদিও তাঁর কন্যা সংখ্যায় ছয়টি, প্রকৃতপক্ষে দশটি সন্তানের মধ্যে সাতটিই তাঁর ছিল কন্যা অর্থাৎ আমাকে আমার মায়াপ্রবণ হৃদয়ের জন্য মমতা-প্রবণ তাঁর মেয়েদের সাথেই গণনা করতেন। বোন্‌দেরও প্রত্যেকের বিশ্বাস যে, ভাইদের ভিতর আমারই ওদের প্রতি সব চাইতে আকর্ষণ বেশী।

যখন আমি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য হচ্ছিলাম প্রস্তুত তখন থেকেই গোপনে সুরু হয় আমার বিয়ের চেষ্টা। তুমি শুনেছ কি না জানি না যে, আমার সাথেই প্রথম হয়েছিল তোমার বিয়ের প্রস্তাব। এ প্রস্তাবে মায়েরই

হয়েছিল অমত। মা আমার মোটেই মুগ্ধ হন নি তোমার রূপে, না হয়েছিলেন আকৃষ্ট তোমার গুণপনার কথা শুনে। জানি না কোন্ মাপকাঠি দিয়ে নিরূপিত হয়েছিল তোমার মূল্য, আর পরকালে হারিয়ে গিয়েছিল কিনা সেই কাঠিখানা! তুমি হয়ত কৌতূহল পোষণ করতে পার আমার ব্যক্তিগত মতামত কি ছিল তাই জান্‌বার জন্যে। সে প্রশ্ন এখানে উঠছে না, কেননা এ কথা শুনেছিলাম আমি তিন বৎসর পরে, যখন তোমার বৈধব্যের সংবাদ শুনতে পাই। সবেমাত্র বিবাহিত তখন আমি। কার মুখে শুনে ও তোমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে আমার স্ত্রীই তখন প্রথম আমায় বলেছিলেন তোমার সাথে আমার বিয়ের প্রস্তাবের কথা, আর এ বিয়ে হলে তুমি নাকি শাঁখা-সিঁদুর বজায় রেখে অনায়াসেই চলতে পারতে ইত্যাদি। যাক্, আমার বিবাহের দ্বিতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল সেই বৎসর যখন আমি আই-এস্‌সি পরীক্ষা দিই। এক বোন্ বেশ চালাকি ক'রে আমায় দেখিয়েছিল সেই কনেটিকে। সাদাসিদে গোবেচারা মেয়েটি, চেহারা তাঁর ছিল না মন্দ, কিন্তু রূপগুণের ব্যাখ্যানও শুনেছিলাম তার ঢের বেশী। শুনেছি সামান্য দাবীদাওয়ার ব্যাপারেই নাকি ফিরেছিল সে বিয়ে। জোর শিবপূজো কোরে যে লাইন-ক্লিয়ার পেল, সেও এলো এক বৎসরের নানা বাধার ভিতর দিয়ে। তিন-তিনবার কোরতে হয়েছিল বিয়ের দিন পরিবর্ত্তন। বোম্বের চাকুরীতে যোগদানের সময় মাকে প্রণাম ক'রে বিদায় নেবার কালে অনুরোধ ক'রে গিয়েছিলাম আমার বিয়ের চেষ্টায় বিরতি দিতে আর কথা দিয়ে গিয়েছিলাম যথাসময়ে আমি নিজেই তুলবো আমার বিয়ের প্রস্তাব। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল, বাবার চাপে পড়ে মা রাখতে পারেন নি আমার সে অনুরোধ। তৃতীয় বারের জন্য বিয়ের তারিখ পরিবর্ত্তন ক'রে বাবা খুলে জানালেন এক বৎসরের পূর্ব্বেকার পাকা কথা দেওয়ার কথা। এত দীর্ঘ দিন পরে এ বিয়ে ফেরান যে নেহাৎ অভদ্রতা আর সম্ভাবনার বাইরে তা তিনি নিরপরাধ কন্যাপক্ষের দোহাই দিয়েই জানালেন। বাগ্‌দত্তা কন্যার যে অন্যত্র বিয়ে হ'তে নেই, তার শাস্ত্রসম্মত কারণও তিনি যুক্তি দিয়ে জানালেন। বিবাহে অমত জেনে আমার মতের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি তুলে তিনি আমার প্রতি অনেক অত্যুক্তি ও কটূক্তি করেছিলেন। আর এ-মত ব্যক্ত করাটাই যেন পুত্রোচিত কর্ত্তব্যের ত্রুটি—বিশেষতঃ উপার্জ্জনক্ষম হয়ে স্বাধীন মত ব্যক্ত করাটাই যে পিতার প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার অভিব্যক্তি এটা দীর্ঘ চিঠিতে তিনি নানা ভাবে অনুযোগের সুরে অভিযোগ করেছিলেন। পুত্রের বিবাহ দেওয়া যে মা-বাপের শেষ কর্ত্তব্য এবং তা শেষ ক'রে যেতে না পারলে যে তাঁদের স্বর্গের দ্বার মুক্ত থাকবে না এরূপ যুক্তিও নানা ভাবে প্রকাশ ক'রে অবশেষে অনুযোগ ও অভিযোগ মিশ্রিত অভিশাপ ক'রেই চিঠি শেষ করেছিলেন। বাবার চিঠিতে রামায়ণের উদাহরণ উল্লেখ দেখে পিতৃদায় থেকে মুক্ত হবার জন্য অবিমৃষ্যকারীর ন্যায় বিরক্তির সহিত এ বিবাহে রাজি হয়েছিলাম। বিয়ের আসনে বসে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করবার সময় আমার বার বার হৃদয় ও কণ্ঠ কেঁপেছিল। বেদমন্ত্রের এক-একটি অঙ্গীকার-বাক্য উচ্চারণ করবার সময় বিবেক আমার বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল। অন্তরে বিবেক ও হৃদয়বৃত্তিগুলির দ্বন্দ্বে পরিশেষে বিবেকের উপর হৃদয়বৃত্তিগুলিই অধিকার বিস্তার করেছিল। অতঃপর ত্যাগ ও সংযমের আদর্শে জীবনটাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে সংসার-জীবন সফল করবার চেষ্টায় ব্যর্থতার আঘাতই কুড়ায়ে চলেছি!

এ যে কর্ত্তব্যের নামে মা-বাপ প্রভৃতি অভিভাবকদের দৌরাত্ম্য—স্নেহপ্রতিম পুত্র, ভাই প্রভৃতির মনের খবর না জেনে বা তাদের প্রকৃতির ধারা না বুঝে তাদের উপর বিবাহের গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়—এতে ক'রে যাঁদের বিবাহ-জীবনে অমত নেই, অসময়ের বিবাহে তাঁদের ক্ষতি হয় সাময়িক আর হয়ত ভবিষ্যতে তাঁদের জীবন সুখেরই হয়। কিন্তু যাঁরা বিবাহ-জীবন বরণে অপারগ বা যাঁদের বিবাহ-জীবন গ্রহণে আপত্তি তাঁদের এ অবাঞ্ছিত বিবাহেই জীবনকে পঙ্গু ক'রে দেয় এবং কোন কোন জীবনকে একেবারেই ব্যর্থ ক'রে দেয়। যাঁদের যোঝ্‌বার ক্ষমতা অপরিমেয় বা যাঁদের মনোবল অনমনীয়, তাঁদের জীবন হয়ত বা কিছুকাল পরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু যাঁদের ক্ষমতা পরিমিত বা মনোবল সতেজ নয়, তাঁদের জীবনই দুর্ব্বিষহ হয়ে দাঁড়ায়। অভিভাবকদের

এ অবিমৃষ্যকারিতার দোষে আমাদের যুবকদের জীবনেই যে অশান্তি এনে দেয় তা নয়, এ সব নিষ্ফল বিবাহ-বন্ধনে যে নিরপরাধ যুবতীদের বেঁধে দেওয়া হয় এদের জীবন ততোধিক অভিশপ্ত হয়ে যায়। এ ব্যর্থ বিবাহ-বন্ধনের জেরই এদের জীবনভোর টেনে চলতে হয়। আমাদের সমাজ এদের উপর অভিভাবকত্বের দাবী রাখে ঢের, কিন্তু এদের সুখ-শান্তির দিকে দৃষ্টি রাখা বা এদের জীবন-সমস্যার সমাধান-চেষ্টার কিছুই ধার ধারে না। এদের প্রতি সহানুভূতির সুরে কেহ কেহ বা বড় জোর দু-একটা সান্ত্বনা-বাক্য ব'লেই কর্ত্তব্য শেষ করে। অবস্থা ভেদে এদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা বা আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য উৎসাহ দান এখনো সমাজ কর্ত্তব্য হিসাবে গ্রহণ করে নি, কিন্তু উঁচুদরের নৈতিক জীবনযাপনে যদি কেহ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, তখন শাস্ত্রের নজির দেখিয়ে সবাই বিমাতার ন্যায় শাসনই ক'রে থাকে—পদস্খলনের কারণ অনুসন্ধান বা সংশোধনের ব্যবস্থা নিয়ে কেউ কদাচ মাথা ঘামায় না। ওদিকে যে যুবকগুলি অভিভাবকদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না ক'রে পিতৃভক্ত বা ভ্রাতৃভক্ত সেজে নির্ব্বিবাদে অবাঞ্ছিত বিবাহ-জীবন গ্রহণ করে আর ত্যাগ বা সংযমের নামে গোপনে করে স্বেচ্ছাচার, পরজীবনে এরাই হয় সমাজের কলঙ্ক। আত্মীয়তা ও বন্ধুতার অভিনয় ক'রে এরাই আবার সমাজে টেনে আনে ব্যভিচার। যে ত্যাগ ও সংযম শিক্ষার অভাবে সমাজের এ দুর্দ্দশা এবং প্রায় ঘরে ঘরেই অশান্তির বহ্নি ধূমায়িত হচ্ছে—এশিক্ষার ব্যবস্থা না আছে আমাদের গৃহে, না আছে এ যুগের স্কুল-কলেজে; বরং বিপরীত আদর্শের পাঠই হয়েছে যেন আজকালকের রেওয়াজ। তাই স্কুল-কলেজের শিক্ষার চাইতে যুবক-যুবতীরা বেশী আকৃষ্ট হয় ছায়াচিত্রের ছবির দিকে।

ত্যাগ ও সংযমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে শিথিল বিবাহ-বন্ধনের কথা স্মরণ রেখে পতি-পত্নী যদি পরস্পর সহানুভূতিশীল হ'য়ে নিজেদের জীবন ধারা নিয়ন্ত্রিত করেন তাহ'লে তাঁদের জীবন-সমস্যার একটা কিনারা হ'তে পারে। যেখানে পত্নীর প্রতি পতির নেই দরদ, অথচ পত্নীর পতিভক্তি প্রবল, সেখানে প্রাণপাত পতিসেবা ক'রে তাঁর হৃদয় জয় করবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করাই পত্নীর কর্ত্তব্য। আবার যেখানে পতির প্রতি পত্নীর নেই অনুরাগ অথচ পত্নীর প্রতি পতির দরদ প্রচুর, সেখানে কাজে, কথায় ও ব্যবহারে পত্নীর মন জয় করবার জন্য যত্নবান হওয়া পতির কর্ত্তব্য। এক্ষেত্রে আদর্শ দাম্পত্য প্রেমের দাবী করা পতি-পত্নীর উভয়েরই অনুচিত। কিন্তু ত্যাগ ও সহানুভূতির আদর্শে অনুপ্রাণিত জীবন হয়ত পরস্পরের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে এবং দীর্ঘ সহনশীলতাই ক্রমে এই অসুখী পতি-পত্নীকে আদর্শ দাম্পত্য জীবনের স্তরে উন্নীত করতে পারে। কিন্তু হৃদয়-সেনা পরিবেষ্টিত আমার যে মনোদুর্গ এ অজেয়ই র'য়ে গেল। হৃদয়সেনার পরাজয় ঘটেছে হয়ত অনেক বার, কিন্তু এদুর্গে যে বর্ব্বরটা বাস করে কদাচ না পারল করতে সে আত্মসমর্পণ, না পেল সে সন্ধিস্থাপনের সুযোগ।

জয়-পরাজয়, আত্মসমর্পণ, সন্ধিস্থাপন বা শান্তিস্থাপন ইত্যাদিই কি সংসারের সমস্যা বা উদ্দেশ্য নয়?

তুমি আমার অন্তরের স্নেহ-প্রীতি গ্রহণ কর। কর্ম্ম-প্রেরণাময় তোমার মহৎ জীবনের উদ্দেশ্যে আমার সদিচ্ছা ও শুভেচ্ছা রইল। ইতি—

শুভার্থী

তোমার অমূল্যদা'

পরশমণির সন্ধানে

শ্রীশরদিন্দু চৌধুরী

কবি আর বিজ্ঞানী দুই বন্ধু। কবি ভাবুক, কল্পনার হাল্কা পাখায় চড়ে ভাবরাজ্যের দিগন্তহীন অসীমতার মধ্যে বিচরণ ক'রে তিনি নিয়ে আসেন আমাদের জন্যে এক অনির্ব্বচনীয় রসঘন কাব্য। তা আমাদের কাছে এ জগতের জিনিষ বলে মনে হয় না। আমরা কোনদিন কবির কল্পিত রাজ্যে প্রবেশ করবার অধিকার পাব না। অনেক সময় সাধারণ মানুষ কবির কল্পিত বস্তুকে অলীক ও অসম্ভব কল্পনা মনে করে, উহা যে মানুষের জীবনে কোনদিন সত্য হতে পারে তা ভাবতেও পারে না। কবি কল্পনায় পুষ্পকরথে চড়ে তাঁর নায়ক-নায়িকাকে মুক্ত বিহঙ্গের মত সীমাহীন আকাশের অনন্ত নীলিমায় বিচরণ করতে দিলেন। কিছুদিন আগেও আমরা এ যে কখনও সত্য হ'তে পারে তা ভাবি নি। কবির অসাধারণ চিত্রাঙ্কনের ক্ষমতা ও কল্পনাশক্তিকে প্রশংসা করেই আমরা ক্ষান্ত হয়েছি। কবি তাঁর কল্পনায় গাছপালার মধ্যেও পেলেন প্রাণের সজীবতা দেখতে, তাঁরা যেন সব মূক প্রাণী। বৃক্ষলতার অনভিব্যক্ত দুঃখে কবি তাই দুঃখ অনুভব করেন, তাদের প্রতি আপন মনেই সমবেদনা প্রকাশ করেন, আলোচনা করেন—নিজের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা। মানুষ কবিকে ভাবে নিছক পাগল। কিন্তু তাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। কবি নিজেই স্পর্শমণির স্বপ্ন দেখে নিজেই হন আত্মহারা এর মধ্যে। আমরা সত্যতা কিছুই দেখতে পাইনে। কবি কল্পনা করেন, পৃথিবী সমস্ত জীবের জননী। তিনি তার সন্তানগণকে সর্ব্বদাই বুকে রাখেন। কোথাও যেতে দেন না। আমরা ভাবি একি সত্যি? না কবিকল্পনা মাত্র?

এর উত্তর দিলেন আর এক শ্রেণীর লোক—তাঁরা কবির বন্ধু। তিনি সত্যই সন্ধান পেলেন ফল মাটিতে পড়ে কেন? একি মাতার আকর্ষণী শক্তি? আপেল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণেই পৃথিবী ছেড়ে কোথাও যায় না। যিনি এ কথা আমাদের শোনালেন তিনিই হ'চ্ছেন কবি-সখা বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানী পুষ্পক রথের কথা শুনে তাকে সত্যি পাবার জন্তে উঠে পড়ে লাগলেন, বন্ধু কবির কল্পনা যে অলীক কল্পনা নয়, মানুষের বাস্তব জীবনে তাকে সত্যে পরিণত করা যে সম্ভব তাই তিনি প্রমাণ করলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন পাখীরই মত একটি জিনিষ—বিমানপোত। বিজ্ঞানী প্রমাণ করলেন গাছপালারও মানুষের মত জীবন আছে। তারা আঘাত পেলে মানুষের মতই যন্ত্রণা অনুভব করে। সত্যিকারের স্পর্শমণি আবিষ্কারের জন্যও বিজ্ঞানী চেষ্টা কম করেন নি। অবশেষে তিনি সফলও হলেন। কেমন ক'রে বিজ্ঞানী এদিকে অগ্রসর হ'লেন এই প্রবন্ধে তারই সামান্য পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হ'ল।

কবি-কল্পনাকে যে ভাবে বিজ্ঞানী তাঁর জ্ঞান-সাধনায় সার্থক ক'রে তোলেন তা থেকে বিজ্ঞানীকে আমরা বলতে পারি প্র্যাকৃটিক্যাল কবি। কবি তাঁর কল্পনায় যে প্রব্লেম সৃষ্টি করলেন, বিজ্ঞানী করলেন তারই সমাধান তাঁর অক্লান্ত বিজ্ঞান-সাধনার ভিতর দিয়ে। কবি যা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন বিজ্ঞানী তাকে দিলেন বাস্তবতার সত্য রূপ। তাই কবি আর বিজ্ঞানী দুই বন্ধু।

খুবই আশ্চর্য্যের কথা বিজ্ঞানীরাও আজ এক জিনিষকে অন্য আর এক জিনিষে রূপান্তরিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন এবং অনেকটা সফলকামও হয়েছেন। বিজ্ঞানী কবির স্পর্শমণির কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করেছেন। তা যাদুকরের মন্ত্রপূত যষ্টি দিয়ে নয়, তা হিপনোটিজম দিয়ে নয়—তা সফল হ'য়েছে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দিয়ে। যে-বিজ্ঞান-জননীর প্রসাদে মানুষ আজ সত্যিকার পুষ্পক রথ পেয়েছে, যে বিজ্ঞান-জননী মানবসন্তানকে শিক্ষা দিয়েছেন গাছপালারও সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে, যার কৃপায় মানুষ আজ ইন্দ্রের

বজ্র কেড়ে নিয়ে নিজের কাজে লাগিয়েছে, সেই বিজ্ঞান-জননীর কৃপায়ই আজ মানুষ সমর্থ হয়েছে এক জিনিষকে অন্য জিনিষে রূপান্তরিত করতে। অ্যালকেমিষ্ট্রিই রসায়ন বিদ্যার প্রথম সোপান। আরবেই প্রথম এই অ্যালকেমিষ্ট্রির জন্ম হয়েছে। যে আরব বিজ্ঞানীর কাছে আমরা এর জন্য চিরঋণী তাঁর নাম আবু-মুসা জেবার আলসফি। জেবার নামেই তিনি ইউরোপে সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রাচীনকালে আমাদের দেশেও বিজ্ঞানের এই শাখার বেশ চর্চ্চা ছিল। আরব হ'তে স্পেনে, স্পেন থেকে এই শাস্ত্র ইউরোপে বিস্তার লাভ করে ১১০০ খৃঃ অব্দে। জার্ম্মানীর আলবেরটাস ম্যাগনাস্ (Albertus Magnus ১১৯৩-১২৮০), ইংল্যাণ্ডের রোজার বেকন (Roger Bacon), স্পেনের রেমণ্ড লালি (Raymond Lully ১২৩৫-১৩১২ খৃঃ অব্দ) এবং ফ্রান্সের ভিলানোভার আরনল্ড (১২৪০-১৩১৯) এঁরাই হচ্ছেন অ্যালকেমিষ্ট্রির প্রথম ছাত্র। কিন্তু পরবর্ত্তী ছাত্রগণ এই শাস্ত্রে আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। তাঁরা মনে করলেন, এক জিনিষকে অন্য জিনিষে রূপান্তরিত করা নেহাৎ গাঁজাখুরি কল্পনা বা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না। প্রাচীন বিজ্ঞানীদের মতে অ্যালকেমিষ্ট্রির তিনটি উপাদান হচ্ছে—লবণ, গন্ধক ও পারদ। একথা বলেছিলেন বেসিল ভ্যালেনটাইন (Basil Valentine)। জেবার মনে করতেন সোনা ও রূপোর মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে গন্ধক (sulphur) এবং পারদ (mercury) বিদ্যমান। সোনায় এই মিশ্রণের অনুপাতে রং হয় লাল আর রূপোয় উহা সাদা। অন্যান্য ধাতুতেও অশুদ্ধ গন্ধক কিয়ৎ পরিমাণে আছে, ইহাও তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে এই নিম্নস্তরের ধাতুগুলিকেও সোনা রূপোয় রূপান্তরিত করা সম্ভব হতে পারে। তাঁর ধারণা ছিল, নিম্নস্তরের ধাতুগুলিতে যে পারদ ও গন্ধক বিদ্যমান তাদের বিশোধিতা সাধন করে এবং তাদের অনুপাত সোনায় বা রূপোয় যেমন আছে ঠিক সেইরূপ করতে পারলে যে-কোন ধাতুকে সোনা বা রূপোয় রূপায়িত করা যেতে পারে। প্রাচীন বিজ্ঞানীগণ মনে করতেন পরশ পাথর (philosopher's stone) নামক এক রকম গুঁড়ো দিয়ে এই রূপান্তর ক্রিয়া সম্পন্ন করা যেতে পারে। তাঁরা খনি থেকে প্রাপ্ত গন্ধক মিশ্রিত দস্তা (sulphide Ore of zinc) বাতাসে বর্ত্তমানে পুড়িয়ে দস্তা পেলেন। গন্ধকের গন্ধ পাওয় গেল। তার পর সেই দস্তা খণ্ডটিকে আবার কিউপেল নামক এক প্রকার থালার মত মুচিতে করে পুড়িয়ে একটি রৌপ্যখণ্ড (button of silver) পেলেন। আবার গন্ধক মিশ্রিত অসংস্কৃত লৌহ (iron pyrites) দস্তার সঙ্গে মিশিয়ে পুড়িয়ে এবং আবার কিউপেলে পুড়িয়ে তা'হতে দস্তা তাড়িয়ে একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণখণ্ড পাওয়া গেল। এই দুটি ক্ষেত্রে সফলকাম হয়ে প্রাচীন কিমিয়া-বিদ্যাবিদ্‌গণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, নিম্নস্তরের ধাতুগুলাকেও সোনা রূপোতে অনায়াসে পরিণত করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁরা তখন জানতে পারেন নি যে, ঐ ধাতুতে অর্থাৎ দস্তাতে আগেই কিছু রূপো এবং ঐ লৌহতে কিছু পরিমাণে সোনা মিশ্রিত ছিল। যখন এই সত্য ধরা পড়লো তখন থেকে অনেক দিন পর্য্যন্ত অ্যালকেমিষ্ট্রি বা কিমিয়া বিদ্যাকে নেহাৎ ভণ্ডামি মনে করে উহার আলোচনা বন্ধ থাকে। এ বিষয়ে আবার আলোচনা আরম্ভ হ'ল রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থগুলি (radioactive element) আবিষ্কৃত হওয়ার পর যখন পদার্থের আধুনিক আণবিক গঠনপ্রণালী (modern electronic structure of matter) সম্বন্ধে মানুষের ধারণা সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং বর্ত্তমান রূপান্তর ক্রিয়া সম্বন্ধে কোন কিছু বলবার পূর্ব্বে আমরা পদার্থের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে বর্ত্তমান বিজ্ঞানীদের মতামত এবং রেডিও-অ্যাকটিভ পদার্থগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

পদার্থকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—মৌলিক (element) ও যৌগিক (compound)। মৌলিক পদার্থগুলি যত বিশ্লেষণ করা থাক না কেন ও থেকে আর দ্বিতীয় কোন পদার্থ পাওয়া যাবে না। যৌগিক পদার্থগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি মৌলিক পদার্থ পাব। যৌগিক পদার্থ কতকগুলি মৌলিকের সংমিশ্রণে গঠিত। কোন মৌলিক পদার্থকে ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত করলে সেই ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয় পরমাণু বা অ্যাটম

(atom)। এই অ্যাটম বা পরমাণুর সাহায্যেই রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। পরমাণুর সংজ্ঞা এই রকম ভাবে দেওয়া যেতে পারে—

"An atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction."

সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী জন ডালটন (John Dalton) এই পরমাণু সম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করেন। তা "Dalton's Atomic Theory" নামে পরিচিত। তাতে তিনি বলেন, পরমাণু মাত্রেই পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ এবং অবিভাজ্য। নির্দিষ্ট মৌলিক পদার্থের (element) পরমাণুগুলোর ওজন ধর্ম প্রভৃতি পরস্পর সমান এবং একই রকমের।

যতই দিন যেতে লাগল বিজ্ঞানের উন্নতি ততই হ'তে লাগল এবং মানুষের পদার্থ সম্বন্ধে ধারণারও পরিবর্তন হ'তে লাগল। এখন বিজ্ঞানীগণ ডালটনের থিওরিগুলি ভ্রান্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন পরমাণুই পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ নয়। ওর হ'তেও ক্ষুদ্র অংশ পদার্থে বিদ্যমান। এই ক্ষুদ্রতম অংশ কি?

যদি বলা যায় পদার্থ মাত্রই কতগুলি বৈদ্যুতিক শক্তির (electric charge) সমষ্টি, তা বড়ই আশ্চর্য ঠেকবে নয় কি? আমরাও কতকগুলি বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা গঠিত। আমরা যা খাই, যা ধরি, যা দেখি সবই কতগুলি বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রিয়া। আধুনিক বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ ক'রেছেন পদার্থের পরমাণুগুলো কতকগুলি বৈদ্যুতিক শক্তির সমষ্টি। প্রত্যেক পরমাণুকে যেন এক একটি ক্ষুদ্র সৌর জগৎ (miniature solar system)। বিষয়টা এইরূপ,— প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রে (nucleus), কয়েকটি ধন তড়িৎ-কণা বা প্রোটন (Proton) এবং কয়েকটি ঋণ তড়িৎকণা বা ইলেকট্রন (electron) থাকে। ঋণ তড়িৎশক্তি সম্পন্ন ইলেকট্রনগুলি প্রোটনের ধন বৈদ্যুতিক শক্তিকে নষ্ট (neutralise) ক'রতে চেষ্টা করে। যেটুকু ধনশক্তি বাকি থাকে তা নষ্ট (neutralise) করবার জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইলেকট্রন কেন্দ্রের বাইরে একটি কক্ষে (orbit) থেকে কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়—ঠিক যেন সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলো ঘুরছে।

এই বাইরের পক্ষে গতিশীল ইলেকট্রনগুলোর সংখ্যার উপর নির্ভর করে পদার্থের সকল ধর্ম। ইলেকট্রন ও প্রোটন ছাড়া পদার্থে নিউট্রন (neutron) নামে আর এক রকম বৈদ্যুতিক শক্তিহীন (neutral) কণা বিদ্যমান আছে। আধুনিক বিজ্ঞান তার সূক্ষ্মতম পরীক্ষায় প্রোটন ও ইলেকট্রণের ওজন নির্ণয় করেছে। প্রোটনের ওজন হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ওজনের সমান। আর ইলেকট্রনের ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের $\frac{১}{১৮৫০}$ অংশ। এখন যদি হাইড্রোজেনের ওজন বিবেচনা করি তবে ওদের ওজনের ক্ষুদ্রতা আমরা বুঝতে পারব। হাইড্রোজনের একটি পরমাণুর ওজন খুব সূক্ষ্ম পরীক্ষায় নির্ণিত হয়েছে $১\cdot৬৬ \times ১০^{-২৪}$ গ্রাম। এর অর্থ এক পরমাণ হাইড্রোজেনের ওজন — ১.৬৬কে ১০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০০০০০০ দিয়া ভাগ ক'রলে যে রাশি পাওয়া যায় তত গ্রাম। প্রোটনের ওজনও তাই। এখন ইলেকট্রনের ওজন এরও $\frac{১}{১৮৫০}$ অংশ। সুতরাং অতি তুচ্ছ (negligible)।

কাজেই পরমাণুর ওজন প্রোটনগুলোর ওজনেরই সমষ্টি, ইলেকট্রোনের ওজনকে আর ধরা হয় না। আবার কেন্দ্রে যে মোট ধনবৈদ্যুতিক শক্তি থাকে (net positive charge at the nucleus) তাকে পরমাণবিক সংখ্যা বা atomic number বলা হয়। আমরা জানি, কেন্দ্রের মোট ধন-শক্তির (net positive charge) সংখ্যা কেন্দ্রবহিস্থ কক্ষস্থিত মোট ইলেকট্রনগুলির সংখ্যার সমান, কারণ তারা পরস্পর পরস্পরকে neutralise করে। অতএব কেন্দ্রের বাইরের কক্ষে স্থিত ইলেকট্রনগুলির যে সংখ্যা তাকেই পরমাণবিক সংখ্যা (atomic number) বলা হয়। বিভিন্ন পদার্থে এই পরমাণবিক সংখ্যা (atomic number) বিভিন্ন। যেমন: হাইড্রোজেনে তার সংখ্যা ১, হিলিয়ামে ২, লিথিয়ামে ৩ ইত্যাদি। এই পরমাণবিক সংখ্যার উপরই পদার্থের সকল ধর্ম নির্ভর করে। যদি আমরা হিলিয়াম পরমাণু হ'তে একটা ইলেকট্রন কমিয়ে দিই তাহ'লে আমরা হাইড্রোজেন পরমাণু পাব। এইরূপে

এক পদার্থের পরমাণুকে অন্য পদার্থের পরমাণুতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হতে পারে।

রূপান্তর-ক্রিয়ার কথা মানুষের মাথায় প্রথম আসে যখন রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থগুলির আবিষ্কার হ'ল ও তাদের আশ্চর্য্য ধর্ম্মাবলী মানুষের অজানা রইল না। এই রেডিও-অ্যাকৃটিভ পদার্থগুলি এক আশ্চর্য্য বস্তু। সর্ব্বদাই এরা নিজ থেকেই এত জ্যোতি বিকিরণ করছে, যেন তার শেষ নেই। এদের তাপও চতুর্দ্দিকের জিনিষ-গুলি হ'তে একটু বেশী। কোথা হ'তে এরা এরূপ শক্তি পায় তা এখনও জানা যায় নি। আরও আশ্চর্য্য হ'তে হয় যখন আমরা দেখি—এই রকম রেডিও-অ্যাকৃটিভ পদার্থের নিকটস্থ পদার্থগুলিও ওদের গুনার্জ্জন করে এবং তা স্থায়ী হয় যতক্ষণ ঐ রেডিও-অ্যাকটিভ পদার্থ উহার নিকটে থাকে। এই পদার্থগুলির আর একটি ধর্ম্ম হচ্ছে, এরা ফটোগ্রাফিক প্লেটকে নষ্ট ক'রে দেয়। রেডিও-অ্যাকৃটিভ পদার্থগুলো যে রশ্মি বিকিরণ করে পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে ঐ রশ্মি বৈদ্যুতিক শক্তি বহন করে। তাদেরকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে যথা—আল্‌ফারশ্মি বেটা-রশ্মি এবং গামা-রশ্মি আল্‌ফা রশ্মি ধনতড়িৎ শক্তি বহন করে। বেটা রশ্মি নেগেটিভ চার্জ্জ অর্থাৎ ঋণতড়িৎ শক্তি বহন করে। গামা রশ্মি নিউট্রাল, কোন তড়িৎশক্তি বহন করে না। ওরা রঞ্জন রশ্মির (x-ray) অনুরূপ। একটি আল্‌ফা কণা অবিকল একটি হিলিয়াম পরমাণুর অনুরূপ। এরা দুটি ধন তড়িৎশক্তি বহন করে। একটি বিটা কণা (B-particle) অবিকল একটি ইলেকট্রনের সমান।

রেডিও-অ্যাকটিভ পদার্থগুলি সর্ব্বদাই আল্‌ফা ও বিটা কণা (বিকিরণ ক'রে নতুন নতুন পদার্থের সৃষ্টি করছে। এ প্রক্রিয়া আপনা হ'তে অবিরাম চলেছে। কবে থেকে এই সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হ'য়েছে, কবে শেষ হবে কেউ জানে না। কি ক'রে এর উৎপত্তি হ'ল তাও কেউ নির্ণয় করতে পারে নি। কেউ এই প্রক্রিয়ায় বাধাও দিতে পারে না।

রেডিও-অ্যাকটিভ পদার্থগুলোর এমন রূপান্তরের আশ্চর্য্য গুণ দেখে বিজ্ঞানীগণ চেষ্টা করতে লাগলেন কোন কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক প্রণালী দিয়ে সাধারণ পরমাণু-গুলোকে রূপান্তরিত করা সম্ভব কি না। তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন কি ক'রে পরমাণুর বাইরের কক্ষের ইলেকট্রনের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি করা যেতে পারে।

যে প্রক্রিয়া রেডিও-এলিমেণ্টসের ক্ষেত্রে আপনা হ'তেই চলেছে তাই আমাদের কৃত্রিম ভাবে চালাতে হ'বে। রেডিও-অ্যাকটিভ পদার্থ হ'তে বিচ্ছুরিত আল্‌ফাকণা-গুলোর বেশ ওজন আছে। ওর পরমাণবিক ভর (atomic mass) হচ্ছে ৪। যদিও এদের গতি ইলেকট্রনের গতির ন্যায় অত দ্রুত নয়, তবুও এরা বেশ শক্তি (energy) বহন করে। আইনষ্টাইন বলেছেন, একটি গতিশীল বৈদ্যুতিক শক্তি-বাহক কণার ওজন ওর গতির উপর নির্ভর করে। এবং যখন ওর গতি আলোর গতির সমান হবে, তখন ওর ওজনও অসীম হবে। সুতরাং আল্‌ফা কণার গতিউৎপাদক শক্তি (kinetic) যত বেশী হবে ওর গতিও তত দ্রুত হবে।

রাদারফোর্ড (Rutherford) ১৯১৯ সালে রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থ হ'তে বিচ্ছুরিত আলফা কণা দিয়ে নাইট্রোজেন পরমাণুতে আঘাত (bombard) ক'রে দেখলেন যে খুব অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি সম্পন্ন (charged) হাইড্রোজেন পরমাণুর সৃষ্টি হ'য়েছে। কিন্তু ঐ সৃষ্টি হাইড্রোজেনের পরিমাণ এত অল্প যে উহা সূক্ষ্মতম ভাবে পরীক্ষা না করলে তার উপস্থিতি নির্ণয় করা কঠিন হবে। এইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে—বোরণ (Boron), ফ্লোরিণ (Fluorin), সোডিয়াম (Sodium), এলুমিনিয়াম (Aluminium), ফস্‌ফরাস (Phosphorous), নিয়ন (Neon), ম্যাগনেসিয়াম (Magnegium), বালু (Silicon), গন্ধক (Sulphur), আরগন (Argon) ও পটাসিয়াম (Potasium) প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের (elements) পরমাণুকে আঘাত (bombard) করা হ'ল। দেখা গেল, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎশক্তিসম্পন্ন (charged) হাইড্রোজেন পরমাণু পাওয়া যাচ্ছে।

রূপান্তরের (transmutation) জন্য উচ্চ গতিসম্পন্ন আলফা কণার (alfa partiles) প্রয়োজন। সেইজন্য তারপর চেষ্টা হ'ল, কি উপায়ে এই আলফা কণার গতি বৃদ্ধি করা যায়। প্রোটনের সাহায্যেও আঘাত করা যায় এবং রূপান্তর ক্রিয়া চালান যায়। ১৯০২ খৃঃ অব্দে উয়িন (Wien) বললেন "পজিটিভ রে এ্যানালাইসিস টিউবে" উৎপন্ন প্রোটনগুলোকে খুব উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ ক'রে আরও গতিশীল করা যেতে পারে। পরে কক্‌ক্রফ্‌ট (Cockcroft) ও ওয়ালটন (Walton) ১২৫,০০০ ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন একটি বায়ুশূন্য পাত্রের মধ্য দিয়ে প্রোটনগুলোকে চালনা ক'রে, তাদের গতি এত দ্রুত করলেন যে তা ইউরেনিয়াম হ'তে বিচ্ছুরিত আলফা কণার গতির সমান হ'ল। এ রকম গতিশীল প্রোটন দিয়ে লিথিয়ামের রূপান্তর করা হ'ল এবং তা হ'তে পাওয়া গেল হিলিয়াম পরমাণু। বিটা-কণা দিয়ে আঘাত ক'রেও রূপান্তর করা সম্ভব। নিউট্রন (neutron) দ্বারা এ সম্ভব হ'য়েছে। সুতরাং তিন রকম পদার্থ দিয়ে আঘাত ক'রে রূপান্তর ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যথা,—(১) আলফা কণা (২) বিটা কণা (৩) নিউট্রন।

এই প্রক্রিয়াগুলো দ্বারা রূপান্তর ক্রিয়া সম্ভব হ'লেও এরা এখনও এত উন্নত হয় নি যে সব জিনিষকেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এদের সাহায্যে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। আমরা জানি সোনার পরমাণবিক সংখ্যা (atomic number) ৭৯ এবং পারদের ৮০। অতএব যদি কোন মতে আমরা পারদ হ'তে একটি ইলেকট্রন কমাতে পারি তাহ'লেই আমরা সোনা পেতে পারি। কিন্তু এখনও পারদকে সোনা করা যায় নি, তবে চেষ্টা চলেছে। সম্প্রতি জার্মানীর একজন বিজ্ঞানী দাবী ক'রে ছিলেন যে তিনি সোনা হ'তে পারদ পেয়েছেন বৈদ্যুতিক সংঘাত (electronic bombardment) দ্বারা। কিন্তু অন্য একজন বিজ্ঞানী বলেন বোধ হয় পূর্ব্বে ঐ পাত্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণে পারদ ছিল। যা হোক, এই পদার্থের রূপান্তর ক্রিয়া যে সম্ভব—পারদকে সোনা করা যায় এ কথা যে নেহাৎ পাগলের প্রলাপ নয়, এ আমরা আজ স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি।

সম্প্রতি সাইক্লোট্রোন নামে একটা যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বোধ হয় একে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ আশ্চর্য্য বলা যেতে পারে। এই যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক সংঘাত দ্বারা যে কোন পদার্থের রূপান্তর করা যেতে পারে। যদিও রূপান্তর ক্রিয়ার নিয়মাবলী এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। যদিও বিজ্ঞান এখনও স্পর্শমণির মত কোন জিনিষ আবিষ্কার করতে পারে নি, তবুও আশা আছে। কে জানে অদূর ভবিষ্যতে আমরা পকেটের তামার পয়সাটিকে রূপোর মুদ্রায় পরিণত করতে পারব কি না। আজ আর বিজ্ঞানের কাছে কিছুই অসম্ভব বলে মনে হয় না।



কেদার রাজা

(উপন্যাস)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওদিকে কমলার চীৎকার তখনও শোনা যাচ্চে।

শরৎ বললে—ও তো পষ্ট গঙ্গাজলের গলা—আপনি কি বলচেন?

তার পর সে নিজে এগিয়ে গিয়ে কমলার ঘরে ঢুকলো। গিয়ে যা দেখলে তাতে সে অবাক হয়ে গেল। কমলা মেজেতে পড়ে কাঁদচে, একটা কালো মোটামত লোক তক্তপোষের ওপর বসে, তার হাতে একখানা পাখা। পাখার বাঁটের দিকটা উঁচিয়ে বোধ হয় কিছুক্ষণ আগে সে কমলাকে মেরেচে, কারণ পাখাখানা উল্টো করে ধরা রয়েচে লোকটার হাতে।

শরৎকে দেখে কমলা দিশাহারা ভাবে বললে—আমায় মারচে গঙ্গাজল—আমায় বাঁচাও—

শরৎ কমলার হাত ধরে বললে—তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে—

মোটামত লোকটা গর্জ্জন করে বলে উঠলো—ও কোথায় যাবে?

পরক্ষণেই সে শরতের দিকে ভাল করে চেয়ে বললে, স্বর নরম করে ইতরের মত রসিকতার সুরে বললে—তুমি কে চাঁদ?

শরৎ সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে কমলার হাত ধরে তাকে ঘরের বাইরে আনতে গেল।

বুড়ো লোকটা বললে—ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্চ চাঁদ? ওকে আমার দরকার আছে—তুমিও এখানে বসো না একটু—কোন্ ঘরে থাকো?

পরে কমলার দিকে চাহিয়া কড়া সুরে বলিল—এই, যাবি নে। বোস বলচি।

শরৎ বললে—আপনি একে মারচেন কেন?

—আমার ইচ্ছে—তুমি কে হে আমার কাজের কৈফিৎ নিতে এসো? আমার নাম হরি শা। বৌবাজারে আমার দোকানে ছাপ্পান্ন হাজার টাকার জল বিক্রী হয় মাসে—শুধু জল, বুঝলে চাঁদ। বোতলভরা জল—

শরৎ ততক্ষণ কমলার হাত ধরে ঘরের বাইরে এনেচে। কমলার পিঠের কাপড় তুলে দেখলে, পিঠের অনেক জায়গায় লম্বা লম্বা মারের দাগ। হেনা কখন এসে নিঃশব্দে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েচে। শরৎ তার দিকে চেয়ে বললে—দেখুন, ওই কে একজন লোক কি রকম মার মেরেচে—কে ভাই উনি তোমার?

কমলা চুপ করে রইল—তখনও সে নিঃশব্দে কাঁদচে।

এ কথার উত্তর দিলে স্বয়ং হরি শা। কমলার পিছনে পিছনেই সে ঘরের বাইরে এসে বললে—আমি কে ওর? শুধু ওকে জিজ্ঞেস করো ওর পেচনে কত টাকা খরচ করেচি আমি। হাড়কাটা গলির দোকানখানাই উড়িয়ে দিয়েচি ওর পেচনে—আমার—আচ্ছা আমি বসচি গিয়ে ঘরের মধ্যে। ও পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘরে আসুক—

শরৎ এতক্ষণও খুব খারাপ কোনো সন্দেহ করেনি। কমলার কোনো গুরুজন হবে এতক্ষণ ভেবেছিল—যদিও লোকটার কথাবার্ত্তার ধরণে সে রাগ করেছিল খুব। কিন্তু এবার তার বুকের মধ্যেটা যেন হঠাৎ ধক্ করে উঠলো, এ কোন্ সমাজে সে এসে পড়েচে যেখানে দাদামশায়ের বয়সী বৃদ্ধ নাৎনীর বয়সী মেয়ের সম্বন্ধে এ ধরণের কথাবার্ত্তা বলে? সে কোথায় এসে পড়েচে! বুড়ো লোকটার সঙ্গে কমলার সম্পর্কে কি?

প্রভাসের বৌদিদিই বা তাকে এত মিথ্যে কথা বলতে গেল কেন?

সে হেনার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চেয়ে বললে—আপনি জেনেশুনে আমায় কি সব কথা বলছিলেন এতক্ষণ? আমায় আপনারা কোথায় এনেচেন? এ সব কি কাণ্ড!

হেনা ঠোঁট উল্টে বললে—নেও নেও গো রাইমণি।

অমন সতীপনা অনেককে করতে দেখেচি—প্রথম প্রথম যারা আসে, সবাই সতী থাকে—কত দেখলুম, কত হোল আমাদের এ চক্ষের সামনে—

শরৎ রাগের সুরে বললে—তার মানে? কি বলচেন আপনি?

—যা বলচি তা বলচি, ভেবে দ্যাখো। আর ঢং দেখাতে হবে না তোমাকে। বেরিয়ে এসেচ তো প্রভাসের আর গিরিনের সঙ্গে—কোথায় এসে পড়েচ বুঝতে পারচ না? তোমার এ কূল ও কূল ছকূল গিয়েচে। এখন যেখানে এসে উঠেচ সেখানেই থাকো—সুখে থাকবে। তোমার বাবা এখানে নেই—চলে গিয়েচে কাল। তুমি এখানে ওদের সঙ্গে পালিয়ে এসে উঠেচ শুনে—

শরতের মুখ থেকে হঠাৎ সব রক্ত চলে গিয়ে সমস্ত মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে হাঁ ক'রে হেনার মুখের দিকে চেয়ে রইল। মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হোল না, শুধু তার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগলো।

ওর অবস্থা দেখে হেনার ভয় হোল।

বাঙালনীর ঢং দ্যাখো আবার! ফিট টিট হবে নাকি রে বাবা! আঃ কি ঝঞ্ঝাটেই তাকে ফেলে গেল ওই কথার ঝুড়ি গিরিনটা। এসে সামলাক এখন তাল।

সে কাছে এসে বললে—তাই ভাই তুমি তো আর জলে নেই? ভয় কিসের? আমি তো বলছিলাম তোমার সব হবে। থাকো না এখানে আমাদের এই বাড়ীতে। তোমায় মাথায় করে রেখে দেবে এখন ওরা। মটোর বলো, কালই মটোর হবে। রেডিও হবে, কলের গান হবে—যা আমি বলেচি। আপাদমস্তক জড়োয়া দিয়ে মুড়ে দেবে—ভয় কিসের তোমার? চাকর-চাকরাণীর মাথায় পা দিয়ে বেড়াও। মুখের কথা খসাও, কাল থেকে সব সব ঠিক করে দেবো—কি হবে সেই ধাবধাড়া গোবিন্দপুরের জঙ্গলে—

শরৎ এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল।

বললে—এমন লোক আপনারা—তা আমি ভাবি নি। মাথার ওপর ভগবান আছেন, আমি জানতাম না। সরল বিশ্বাস করেছিলাম প্রভাস দাদার ওপর। ভাইয়ের মত দেখতাম। আপনাদের ভেবেছিলাম ভদ্রঘরের মেয়ে। আমার বোকামির শাস্তি যথেষ্ট হয়েচে—

কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

হেনার মন যে পথকে আশ্রয় করে পোক্ত হয়েচে, সেই পথেই ওর সংকীর্ণ দৃষ্টি ও মনুষ্যত্বকে শৃঙ্খলিত করে রেখেচে। পাপের পথে যে মন ঝানু হয়ে পড়ে, পুণ্যের আলো প্রবেশ করবার বাতায়ন-পথ তার নিজের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে রুদ্ধ হয়ে যায়।

হেনার মন গলবার নয়।

সে বললে—কেন কান্নাকাটি করচো ভাই? প্রথম প্রথম অবিশ্যি একটু কষ্ট হয়—কিন্তু জগতে এসে সুখের মুখ যদি না দেখলে তবে করলে কি? এখানে দিব্যি সুখে থাকো—পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাও—সব সয়ে যাবে।

শরৎ বললে—আপনি দয়া করে আর কিছু বলবেন না। আমি গরীব লোকের মেয়ে, আমি বাসন মেজে ভাত রেঁধে কাঠ চ্যালা করে সংসার করে এসেচি এতকাল, এক দিনের জন্যও ভাবি নি যে কষ্টে আছি। আপনাদের সুখ নিয়ে থাকুন আপনারা—

এই সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে দুপ্‌ দুপ্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল গিরিন।

তাকে দেখে হেনা যেন অকূলে কূল পেয়ে গেল। তার দিকে ফিরে বললে—এই যে! বাপরে বাপ! এত ঝক্কি পোয়াবার জন্যে আমি রাজি হই নি তা বলে দিচ্ছি। ওই নাও, সব খুলে বলেচি—যা বোঝো করো।

গিরিন বললে—কি, ও বলে কি?

—জিগ্যেস করো, তোমার সামনেই তো বিরাজ করচে সশরীরে—

গিরিন শরতের দিকে ফিরে বললে—কি? বলচ কি তুমি? তোমার বাবা তোমার কথা সব শুনে পালিয়েচে। এখানে থাকো, পরম সুখে থাকবে—

শরৎ বললে—আপনি আমায় কোনো কথা বলবেন না। আমায় ছেড়ে দিন দয়া ক'রে—আমি গাঁয়ে চলে যাবো বাবার কাছে—

গিরিন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললে—সে গুড়ে বালি।

এতক্ষণ গাঁয়ে রটে গিয়েচে সব। কোথায় দু-দিন দুরাত কাটিয়েচ গাঁয়ের সবাই জেনে গিয়েচে। আর ঘরে জায়গা নেই তোমার—এখন যা বলচি তাতে রাজি হও চাঁদ—

শরৎ হঠাৎ তীব্র, পুরুষ কণ্ঠে বলে উঠলো—খবরদার, আমাকে যা তা বলবার কোনো এক্তার নেই আপনার জানবেন—সাবধানে কথা বলুন—

গিরিন কৃত্রিম ভয়ের ভাণ করে হেনার পেছনে লুকোবার অভিনয় করলে। বললে—ও বাবা, শূলে দেবার না ফাঁসিতে লটকাবার হুকুম হয়ে গেল বুঝি। তাল সামলাও হেনাবিবি—

শরৎ বললে—সে দিন নেই, আজ আমার বাবা গরীব, আমরা গরীব—নইলে আপনাদের মত ছোটলোককে শূলে ফাঁসে দেওয়া খুব বেশি কথা ছিল না গড়শিবপুরে—যাক্, আমায় যেতে দিন, আমি চলে যাবো—

গিরিন বললে—কোথায় যাবে চাঁদ? সে পথ বন্ধ—আমি তো—

শরৎ বলে উঠলো—আবার ওই ইতরের মত কথা। আমি কোনো কথা শুনবার আগে আপনি আমার সামনে থেকে চলে যান—ভদ্রলোক বলে ভুল করে ঠকেচি—

শরতের কথাবার্ত্তার ভঙ্গির মধ্যে ও কণ্ঠস্বরে এমন কি একটা জিনিস ছিল যাতে গিরিন কুণ্ডু যেন সাময়িক ভাবে ভয় খেয়ে চুপ করলে।

হেনা ওকে আড়ালে চুপিচুপি বললে—কেন ও বাঙালনীকে রাগাচ্ছ। রাগিয়ে কাজ পাবে না ওর কাছে।

—বাপরে! কেবলই যে ফোঁস্ ফোঁস করে? আজ ওকে এখানে রাখো—

—আমি পারবো না, আমার থিয়েটার আজ—

—তুমি নিয়ে যাও কমলাকে। হরি শাকে আমি নিয়ে ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে যাচ্ছি। থাকুক এখানে চাবি দেওয়া আটকানো—

হেনা ফিরে গিয়ে বললে—তোমার কথা শোন। বাড়ী যাবে কোথায়? সেখানে সব রটে গিয়েচে—গাঁয়ে যাবে কোন্ মুখে? এখানে সুখে থাকবে।

—সে ভাবনা আপনি ভাববেন না। আমার যে দিকে দু-চক্ষু চায় চলে যাবো। মা-গঙ্গা তো আছেন, শেষ পর্য্যন্ত। এমন কি করেচি আমি যাতে মা আমায় কোলে স্থান দেবেন না?

শরতের গলা আবার কান্নার বেগে আটকে গেল। বললে—লোককে বিশ্বাস করে আজ আমার এই দশা—কি করে জানবো যে মানুষের পেটে এত থাকে!

হেনা বললে—আচ্ছা, তাই হবে। না হয় মোটরে করে তোমাকে ইষ্টিশানে রেখে আসুক—দেখে আসি নীচে—

সে চলে গেল। কমলাকে গিরিন কি বলতে নিয়ে গেল পাশে। শরৎ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেনার ওপরে উঠে আসবার অপেক্ষা করলে। তারপর তার দেরি হচ্চে দেখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দেখলে বাইরের দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে ওরা ঘরে তালা দিয়েচে।

শরৎ আবার ওপরে উঠে এল। একবার মনে করলে তালা দেয়নি, ওরা গাড়ীর সন্ধানে গিয়েচে। আনতে দেরি হচ্চে হয় তো।

শরৎ এসে চুপ করে ওপরে অনেকক্ষণ বসে রইল।

বাড়ী নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। জলতেষ্টা পেয়েচে বড়, জল আছেও কিন্তু এবাড়ীতে সে জলস্পর্শ করবে না, জলতেষ্টায় মরে গেলেও না। প্রভাসদা'র বাবার কি সত্যিই অসুখ? হয় তো সব মিথ্যে কথা ওদের। ওদের কথাতে বিশ্বাস করেই আজ তার এই দশা। প্রভাসও লোক ভাল নয় নিশ্চয়ই।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। কেউ আসে না। শরৎ জানালা দিয়ে পাশের বাড়ীতে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে। কোনো লোক দেখা গেল না। দু'ঘণ্টা তিন ঘণ্টা কেটে গেল শরৎ বসে বসে হাপুস্ নয়নে কাঁদতে লাগলো। সম্পূর্ণ অসহায়, কেউ তাকে জানে না, কেউ চেনে না। কি সে এখন করে?

শেষ পর্য্যন্ত সে ভাবলে—এও ভালো, দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালও ভালো। ওরা না আসুক, সে এখানে না খেয়ে মরবে। মরতে তার ভয় নেই। একবার আশা

ক্লস বাবার সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বলে—কিন্তু বাবার দর্শনলাভ অদৃষ্টে বোধ হয় নেই।

বিকেল হয়ে আসচে। পাশের বাড়ীর গায়ে লম্বা ছায়া পড়েচে। শরৎ বসে বসে একটা উপায় ঠিক করলে। সে যেই দেখবে পাশের বাড়ীর জানালায় লোক, তাকে সে নিজের অবস্থার কথা জানাবে। তার কথা শুনে দয়া হবে না কি ওদের? বাড়ীর চাবিটা খুলিয়ে দেবে না তারা?

হঠাৎ সে দেখলে পাশের বাড়ীর জানালায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে।

সে চেঁচিয়ে বললে—শুনুন, এই যে এদিকে—

মেয়েটি ওর দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—আমায় বলচো—কি ভাই?

—আমায় এ বাড়ীতে আটকে রেখেচে। আমি পাড়াগাঁ থেকে এসেচি—আমায় দোরটা খুলে দিন— দয়া করুন আমার ওপর।

—এ তো হেনাদিদির বাড়ী। হেনা নেই?

—হেনা কে জানি নে। তবে কেউ এখন এবাড়ীতে নেই। আমায় তালা দিয়ে বন্ধ করে রেখে চলে গিয়েচে—

—তোমার বাড়ী কোথায়?

—অনেক দূরে। গড়শিবপুর বলে একটা গাঁ—যশোর জেলা—

—এখানে কার সঙ্গে এসেচ?

প্রভাস আর অরুণ বলে দুজন লোক—আমাদের গাঁয়ের—

মেয়েটি মুচকি হেসে বললে—তারপর ঝগড়া হয়েচে বুঝি? থাকো ভাই থাকো। এসেচ যখন, তখন যাবে কোথায়?

শরৎ ব্যগ্রস্বরে বললে—না না—আপনি বুঝতে পারচেন না। ওরা আমায় ঠকিয়ে এনেচে, আমি ভদ্র-লোকের মেয়ে। আমায় দোর খুলে দিন কাউকে বলে দয়া করে—আমায় বাঁচান—আমার সব কথা শুনুন—

মেয়েটি ঠোঁট উল্টে বললে—সবাই বলে ঠকিয়ে এনেচে। তবে এসেছিলে কেন? ওসব আমি কিছু করতে পারবো না—কে হ্যাঙ্গামা পোয়াতে যাবে বাপু তোমার জন্যে? যারা এনেচে, তাদের কাছে বোঝাপড়া করো গে—

কথা শেষ করে মেয়েটি জানালা থেকে সরে গেল। শরৎ জানতো না যে এপাড়ায় আশপাশের বাড়ীতে যে-সব স্ত্রীলোক বাস করে, তারা কেউ ভদ্রঘরের নয়, মনে, চরিত্রে পেশায় তারা হেনারই সগোত্র। এদের কাছ থেকে সাহায্য ভিক্ষা নিষ্ফল।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। বিকেল বেশ ঘনিয়ে এসেচে। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে শরৎ তাড়াতাড়ি ছুটে বাইরের বারান্দায় এসে দেখতে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসচে একা কমলা। ওর পেছনে কেউ নেই। ওকে দেখে কমলা হাসিমুখে বললে—কি ভাই গঙ্গাজল?

তারপর তাড়াতাড়ি দুতিনটী সিঁড়ি একলাফে ডিঙিয়ে এসে শরতের গলা জড়িয়ে ধরে বললে—গঙ্গাজল—কি কষ্ট ওরা তোমাকে দিলে? কোনো ভয় নেই ভাই, আমি যখন এসে গিয়েচি। তুমি পালাও—আমি লুকিয়ে দেখতে এসেছিলাম তোমার কি দশা হচ্ছে—হয় তো এতক্ষণে একটা উপায় হয়েচে ভেবেছিলাম। তুমি চলে যাও—আমার কাছে এ বাড়ীর একটা চাবি থাকে, তাই রক্ষে।

এতক্ষণ শরৎ কথা বলবার অবকাশ পায় নি, এত তাড়াতাড়ি সব ব্যাপারটা ঘটলো।

সে এইবার বললে—ভগবান আছেন গঙ্গাজল, তাই তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন ভাই—আমার তো আর কেউ ছিল না—

কমলা বললে—তুমি ভাই তাড়াতাড়ি নেমে চলো। জিনিষপত্র কিছু এনেছিলে—সুটকেশ কি পুঁটুলি?—নেই?...এসো নেমে। গিরিনরা এসে পড়তে পারে। আমায় দেখলে গোলমাল করবে। হেনা-দি থিয়েটারে গিয়েছে—সে আজ এখুনি আসবে না।

শরৎ ওর সঙ্গে ফুটপাথে এসে দাঁড়ালো।

কমলা বললে—ভাই, তুমি এখন কোথায় যাবে?

—যেদিকে দুই চোখ যায়—ভগবান আমার হাত ধরে যে পথে নিয়ে যাবেন। আমাদের গড়ের ভাঙা দেউলে সন্দে পিদিম দিয়েছি জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত—তিনি পথ দেখিয়ে

দেবেন আমায়। পথ না হয়, মা-গঙ্গা আর কোল থেকে ঠেলে ফেলবেন না।

কমলার চোখ জলে ভরে উঠলো। সে বললে—আমরা নরকের কীট, ভাই, তোমার মত মেয়ের পায়ের ধূলো পড়ে আমাদের পাপের বাসা পবিত্র হয়ে গেল। একটু সাবধানে থেকো, তোমার রূপ যে কি তুমি নিজে জানো না, আমাদের মাথা ঘুরে যায়। পুরুষের দোষ কি দেবো? তার পর সে আঁচল খুলে পাঁচটা টাকা নিয়ে শরতের হাতে দিয়ে বললে—এই টাকাকটা সঙ্গে রাখো দিদি। দরকার হবে, ছোট বোনের কাছ থেকে নিতে লজ্জা নেই। সুসময় আসে, অনেক রকমে শোধ দিতে পারবে।

শরৎ বললে—তুমিও কেন চল না আমার সঙ্গে? এই কষ্ট সহ্য করে মার খেয়ে কেন এখানে পড়ে থাকো? চলো দুই বোনে পথে বেরুই ভগবানের নাম ক'রে। তিনি নিরুপায়ের উপায়, একটা কিছু করে দেবেনই তিনি—

কমলা বিষণ্ণ মুখে বললে—না দিদি। আমার তা হবার নয়। আমার মা এখানে—মার বয়েস হয়েছে—তাকে ফেলে যেতে পারবো না। তাছাড়া আরও অনেক কাল এই পথের পথিক এক পুরুষে নয়, অনেক পুরুষে। আমাদের উদ্ধার নেই—আমি যাবো বললেই যাওয়া হবে না। বাঁচি মরি এখানে থাকতে হবে। গোবরের গাদাতে জন্মেছি, গোবরের গাদাতেই মরতে হবে।

শরৎ কমলার চিবুক ধরে আদর করে বললে—না ভাই, গোবরের গাদায় তুমি পদ্মফুল—

কমলা অশ্রুসজল চোখে মাথা নীচু করে বললে—একটু পায়ের ধূলো দাও দিদি। ছোট বোন বলে মনে রেখো যেখানে থাকো—আমার আর দেরি করবার যো নেই—

কমলা বিদায় নিয়ে দ্রুতপদে চলে গেল।

কমলা চলে গেলে শরৎ বড় একা মনে করলে নিজেকে। এতক্ষণ তবুও একটা অবলম্বন ছিল, তাও গেল। এখন থেকে সে সম্পূর্ণ একা, নিঃসহায়। কখনো এমন অবস্থায় পড়েনি জীবনে। কোথায় সে এখন যায়? বেলা পড়ে এসেছে—এই বিশাল অপরিচিত সহর সামনে। সুনির্দ্দিষ্ট পথে চিন্তাধারাকে চালিত করবার শিক্ষা ওর নেই—যারা এ বিষয়ে আনাড়ি, তাদের চিন্তা যেমন খাপ-ছাড়া ধরণের, ওর বেলাতে তার ব্যতিক্রম হোল। শরৎ ভাবলে—কালীঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হই—যা কিছু পাপ, যদি ঘটে থাকে কিছু, গঙ্গায় ডুব দিয়ে কেটে যাবে এখন—

একটা ঘোড়ার গাড়ী যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। গাড়োয়ান এ পাড়াতেই থাকে—এ পাড়ার স্ত্রীলোকদের সে চেনে—সওয়ারি খুঁজবার চেষ্টায় বললে—গাড়ী চাই?

শরৎ যেন অকূলে কূল পেলে। গাড়ী ডেকে নিজে সে চড়তে পারতো না—কি করে গাড়ী ডাকতে হয়, কি বলতে হয়, এ সবে সে অনভ্যস্ত। সে বললে—আমায় কালীঘাট নিয়ে যাবে?

—কেন যাবো না বিবিজান? চলো—

—কত ভাড়া দিতে হবে?

—তিন টাকা দিও। তোমাদের এ পাড়ার ভাড়া তো বাঁধাই আছে। ওই খেঁদি বিবি যায়, বড় পারুলবিবি সেদিন গেল—তিন টাকা দিলে। আমি যাস্তি লেবো না।

শরৎ দরদস্তুর করতে জানে না। দু'টাকার জায়গায় তিন টাকা ভাড়ায় সওয়ারি পেয়ে গাড়োয়ান মনের আনন্দে গাড়ী ছুটিয়ে দিলে। গড়ের মাঠ দিয়ে যখন গাড়ী চলেছে, তখন শরতের মনে হোল একটা বিশাল জনস্রোতের মধ্যে সেও একজন। প্রকাণ্ড মাঠটার মধ্যে দিয়ে কত রাস্তা, কত গাড়ী ঘোড়া, ট্রাম গাড়ী, মোটর গাড়ী, লোকজন ছুটেচে, চলেছে—দূরে গঙ্গাবক্ষে বড় বড় জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। সকলের ওপর উপুড় হওয়া নীল আকাশের কতটা দেখা যাচ্ছে, মুচুকুন্দ চাঁপাগাছের সারির নীচে সাহেবদের ছেলে-মেয়েদের ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট ঠ্যালা গাড়ীতে—জীবনটা ছোট নয়, সংকীর্ণ নয়—এত বড় জগতে যদি সবাই বেঁচে থাকে নিজে নিজের পথে—সেও থাকবে। ভগবান তাকে পথ দেখিয়ে দেবেন।

গাড়ীতে বসেই গতির বেগে মন যখন পুলকিত, তখন অনেক কথা এমন অল্প সময়ের জন্যে আসে, শরীরের

জড়তার সুদীর্ঘ অবসরে নিষ্প্রভ ও অলস মন যা কখনো কল্পনা করতে পারে না।

এই অল্প সময়টুকুর মধ্যেই শরৎ অনেক কথা ভেবে ঠিক করলে। সে আর গড়শিবপুরে ফিরবে না।

বাবা সেখানে গিয়ে আছেন, হয় তো তিনি গিয়ে বলেছেন মেয়ে তাঁর মারা গিয়েছে। সে গেলেই গ্রামে কলঙ্ক রটবে। সে কলঙ্কের হাত থেকে বাবাকে সে রক্ষা করবে।

কোথায় সে যাবে? তা সে জানে না আজ, যদি কখনো কারো অনিষ্ট চিন্তা না করে থাকে জীবনে, কখনো অন্যায় না করে থাকে—তবে সে সবের জোর নেই জীবনে?

কালীঘাটে পৌঁছে সে গঙ্গায় ডুব দিলে, তার পর আর কোথাও যাওয়া নিরাপদ নয় ভেবে সে কালী-মন্দিরের সামনে চুপ করে বসে রইল।

সন্ধ্যার আরতি আরম্ভ হোল। কত মেয়ে সাজগোজ করে আরতি দেখতে এল। তার মধ্যে ও চুপ করে বসে বসে সকলের দিকে চেয়ে দেখলে। কত বৃদ্ধা এসে দোরের কাছে ওর পাশে বসলো। রাত্রি বেশি হোল। ও ভাবলে কোথায় যাবে এখন। কোনো জায়গা নেই যাবার। এত বড় বিশাল সহরে অসহায়, তরুণী নারীর পক্ষে নিরাপদ স্থান কোথায় এই দেবমন্দির ছাড়া। সুতরাং সে বসেই রইল। বসে বসে মনে পড়লো বাবার কথা। গড়শিবপুরের জঙ্গল-ঘেরা বাড়ীতে বাবাকে একা হয়তো এতক্ষণ হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হচ্ছে। আনাড়ি মানুষ, কোন দিন জীবনে কুটোটা ভেঙে দুখানা করার অভ্যেস নেই, বেহালা বাজিয়ে আর গান গেয়েই নিশ্চিন্ত দিনগুলো কাটিয়ে এসেচেন বাবা—শরৎ তাঁর গায়ে আঁচটুকুও লাগতে দেয় নি। আজ সে থেকেও নেই, বাবার কি কষ্টই হচ্ছে! তার কথা মনে ভেবে বাবার কি শান্তি আছে?

শরতের চোখে জল এল। বাবার কথা মনে পড়লে মন হু-হু করে। সে কিছুতেই চুপ করতে পারে না, ইচ্ছে হয় সে এখুনি ছুটে চলে যায় সেই গড়শিবপুরের ভাঙা বাড়ীতে, বড় কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িখানা বাবাকে পেতে দেয় রান্নাঘরের কোণে—একটা চটা ওঠা কলাই-করা পেয়ালায় বাবাকে চা করে দিয়ে ছোট্ট খুকীর মত বাবার মুখের দিকে চেয়ে বসে বসে গল্প শোনে।

মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে একজন সন্ন্যাসিনী ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে—ওর নজর পড়লো। তার চারিপাশ ঘিরে অনেক মেয়েছেলে জড় হয়ে কেউ হাত দেখাচ্ছে, কেউ ওষুধ নিচ্ছে, কেউ শুধু বা কথা শুনচে। শরৎ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এই দেবমন্দিরের পবিত্রতা অনুভব করতে চাইছিল—যে ঘরে সে আজ দুদিন কাটিয়ে এসেচে তার সমস্ত গ্লানি, অপবিত্রতা, পাপ এই দেবায়তনের ধূপধুনার সৌরভে, শঙ্খঘণ্টার ধ্বনিতে, সমবেত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণের নিবিড় আগ্রহে যেন ধুয়ে যায়, মুছে যায়, শুভ্র হয়ে ওঠে, নির্ম্মল হয়ে ওঠে কালীঘাটের মন্দিরের সেবকদের লোভ যেখানে উগ্র, পূজার্থীদের অর্থ শোষণ করবার হীন আকাঙ্ক্ষা সব ছাপিয়ে যেখানে প্রবল হয়ে উঠেচে—পূজার মধ্যে ব্যবসা এসে ঢুকেচে, বৈষয়িকতা এসে ঢুকেচে—সে সব দিক পল্লী-বাসিনী শরতের জানা নেই। তার মুগ্ধ মনের ভক্তি ওর চোখে যে অঞ্জন মাখিয়েচে, তার সাহায্যে প্রাচীন ভারতের সংস্কারপূত বাহান্ন পীঠের এক মহাপীঠস্থান জাগ্রত হয়ে উঠেচে ওর মনে, বুদ্ধদেবের সেই অমর বাণী 'মনই জগতকে সৃষ্টি করে'—শরতের মনে মহারুদ্রের চক্রছিন্ন দক্ষকন্যা সতীর দেহাংশ সতী নারীর তেজ ও পাতিব্রত্যের প্রতীক স্বরূপ এখানকার মাটিতে আশ্রয় নিয়েচে। এই মাটি তার মনে তেজ ও বল দিক। সন্ন্যাসিনীর সামনে বসে সে সারারাত কাটিয়ে দিলে। কিছু কিছু কথাও হোল সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে। সামান্য কিছু ফলমূল কিনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলে।

সন্ন্যাসিনী বললে বাড়ী কোথায় তোমার?

—গড়শিবপুরে।

—এখানে কোথায় থাকো?

—কোথায় না মা। মন্দিরেই আছি এখন। আশ্রয় নেই কোথাও।

—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি বড় ঘরের মেয়ে। কে আছে তোমার? কি করে এখানে এলে মা?

একটা কথা জিগ্যেস করি কিছু মনে কোরো না—কারো সঙ্গে—মানে কেউ ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল?

কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গেই শরতের সরল, তেজোদৃপ্ত মুখের সুকুমার রেখার দিকে, তার ডাগর কালো, নিষ্পাপ চোখ দুটির দিকে চেয়ে সন্ন্যাসিনী এ প্রশ্ন করার জন্যে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়লো।

শরৎ মুখ নীচু করে বললে—না, মা। ও সব নয়। তবে সব তো বোঝেন, মেয়েমানুষের অনেক শত্রু—বিশেষ করে মা, যে সকলকে বিশ্বাস করে তার শত্রু এখন দেখচি চারিদিকেই। ভুলিয়েই এনেছিল বটে মা—তবে আমি ভুলে আসি নি। বুঝলে মা?

—তোমার বয়েস কত মা?

—সাতাশ বছর।

—কিন্তু তোমার রূপ এই বয়েসে যা আছে, তা কুড়ি বছরের যুবতীরও থাকে না। তোমার বড় বিপদ এই কলকাতা সহরে। আমার এখানে থাকো—কোথাও গেলে তোমার বিপদ ঘটতে দেরি হবে না মা।

শরতের চোখ ছাপিয়ে জল পড়লো। এই তো মা দক্ষরাণী সতী তাকে আশ্রয় দিয়েচেন। ঠাকুর-দেবতার মাহাত্ম্য কলিকালে তবে নাকি নেই? বাবা তো নাস্তিক, সন্ধ্যে-আহ্নিকটা পর্য্যন্ত করবেন না। সে কত বকুনির পরে জোর করে আসন পেতে বাবাকে আহ্নিকে বসাতো। বাবার কথা মনে পড়তে শরতের চোখের জল আর থামে না। বাবা কি আর সন্ধে আহ্নিক করচেন? উত্তর-দেউলে এই সন্ধ্যার বাদুড়নখের জঙ্গল ঠেলে কে সন্দে-পিদিম দিচ্ছে আজকাল? কেউ না।

বহু দূর থেকে সে দেখতে পায়, ভগ্ন দেবীমূর্ত্তির পায়ের চিহ্ন বনে-জঙ্গলে নির্দ্দেশহীন কালো নিশীথ রাত্রে এমনি অমনি পড়ে ভয়ে শিউরে উঠে কুটীরের ঘরে অর্গলবদ্ধ করবার জন্যে সে আর সেখানে নেই। রাজলক্ষ্মী? সে কি আছি—সে আর সেখানে আসে না। কেনই বা আসবে?

শরৎ সেখানে রইল সেদিনটা। সন্ধ্যার পরে অনেকগুলি মেয়ে আসে—রোজ শাস্ত্রকথা হয়। শরৎ বড় ভালবাসে শাস্ত্রকথা শুনতে, একদিন নকুলেশ্বরের মন্দিরে কথকতা হোল। আরও কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে সেখানে শরৎ গেল। কথকতার পর প্রসাদ বিতরণের পালা। সকলের সঙ্গে শরৎও শালপাতা পেতে বাতাসা, শসা, ছোলা ভিজে, ফলমূল নিয়ে এল। সন্ন্যাসিনী ব্রাহ্মণের মেয়ে—তিনি স্বপাক ভিন্ন খান না, নিজে রান্না করেন, শরৎকে শাল পাতে ভাত বেড়ে দেন। সারাদিন খাওয়া হয় না—সন্ধ্যার পর রান্না চড়ে।

তিন-চার দিন পরে একটি বড়লোকের গৃহিণী এলেন সন্ন্যাসিনীর কাছে। স্নানের ঘাটে যেতে শরৎকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন দুপুরে। বোধ হয় সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে তাঁর কিছু কথা হয়ে থাকবে শরতের সম্বন্ধে। বললেন—তোমাকে দেখে আমার বড় ভাল লেগেচে। তোমার নাম কি?

—শরৎসুন্দরী।

—কত দিন সন্ন্যাসিনীর কাছে আছ?

—বেশি দিন না।

—আমাদের সঙ্গে যাবে?

—কোথায় মা?

—আমরা বেরিয়েচি কাশী, গয়া করবো বলে। মুখে বলতে নেই—এখন হবে কি না তা জানি নে ইচ্ছে তো আছে। আমার বড় মেয়ের বিয়ে হয়েচে লক্ষ্ণৌ। সেখানে গিয়ে একবার মেয়ের সঙ্গে দেখা করবো। আমি যাচ্ছি আর আমার দুই মেয়ে, ছোট ছেলে আর কর্ত্তা। একটা লোক আমাদের দরকার। বয়েস হয়েচে—একা ভরসা করি নে সব ঝক্কি নিতে বিদেশে। তুমি চলো না কেন আমার সঙ্গে? মাইনে-টাইনে সব ঠিক করে দেবো এখন—কোনো অসুবিধে হবে না। গৌরি মা বলেছিলেন তোমার কথা। কথা কি জানো, যে সে মেয়ে নিতে ভরসা হয় না। স্বভাব চরিত্তির কার কি রকম না জেনে বাপু নেওয়া তো যায় না? গৌরি মা যখন তোমার সম্বন্ধে বললেন—তখন আমার নিতে কোন আপত্তি নেই।

ক্রমশঃ

সঞ্চয়ন

নবচীনের শক্তিমন্ত্র

[১৩৪৮। ৮ই ফাল্গুন তারিখের 'বাতায়ন' হইতে উদ্ধৃত]

জাপানকে একা চীন আজ চার বৎসরেরও অধিককাল সাফল্যের সঙ্গে যে প্রতিরোধ ক'রে আসছে, তার পেছনে কি শক্তি থাকতে পারে সমগ্র পৃথিবী বিস্ময়ে তাই ভেবে বের করার চেষ্টা ক'রছে নিশ্চয়ই।

এ রহস্যের উত্তর দিয়েছেন সেদিন ম্যাদাম চীয়াং কাই-শেক নিজেই। দিল্লীতে তাঁকে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের হ'য়ে যে অভিনন্দন জানানো হয় তার উত্তরে তিনি বলেন, "নব চীনের শক্তির মূল মন্ত্র হ'চ্ছে, 'একের স্বার্থ সবাইকে নিয়ে, সবাইয়ের স্বার্থ একের জন্যে।' এই কথারই আর একটু ব্যাখ্যা পাওয়া যায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রদত্ত এক বিবৃতি থেকে। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি বলেন, 'চীন এখন নিজের অস্ত্রসম্ভার প্রস্তুতে সক্ষম। এই ক্ষমতার পেছনে রয়েছে চীনের শিল্প-সমবায়। এই সমস্ত সমবায় কেবল যুদ্ধ-সামগ্রীর জন্য গড়ে ওঠেনি, এর দ্বারা চীনের গণতান্ত্রিক ভিত্তি সুদৃঢ় হ'য়েছে।' একটা উদাহরণ দিয়ে পণ্ডিতজী বলেন, তিনি যখন চুংকিংয়ে ছিলেন তখন ভারতবর্ষ থেকে পুরানো ব্যবহৃত মোটর টায়ার পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রে দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হয়। খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারলেন যে অতিপ্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি ঠেলাগাড়ীতে সাত শত মাইল রাস্তা অতিক্রম করানোর জন্যেই এই টায়ারের দরকার। শুনতে, এই প্রকার বাহনকে দ্রুতগামী বা বিশেষ কার্য্যকরী বলে মনে হবে না, কিন্তু এদের ব্যবস্থা হ'চ্ছে রাস্তার ওপরের গ্রামস্থিত লোকেরা প্রত্যেক জায়গায় এই গাড়ীগুলি দশ মাইল রাস্তা ঠেলে দেবে এবং আবার তার গ্রামে ফিরে আসবে। চীনের বিশাল জনশক্তির সহায়তায় উপায়টি সহজ, স্বাধীন এবং বিস্ময়জনকরূপে কার্য্যকরী হয়ে উঠেছে।

চীনে যে বিরাট সমবায় নীতি গড়ে উঠেছে ওপরের উদাহরণটি তার নামমাত্র পরিচয় দেয়। বস্তুতঃ সমবায় এবং পরস্পর সহযোগিতা যে কি বিপুল শক্তি দান করতে পারে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ পাওয়া যায় বর্ত্তমান অনধিকৃত চীন থেকে। চীনের বর্ত্তমান শিল্প-সংগঠনটি বিস্ময়কর এবং উৎসাহব্যঞ্জক। আজ চীনের সর্ব্বত্রই একটা নতুন ধ্বনি অনুরণিত হ'তে শোনা যাচ্ছে: 'গাঙ্ হো' অর্থাৎ একত্রে কাজ করো। উত্তর-পশ্চিমে ফুকিয়েন থেকে দক্ষিণ পূর্ব্বে কোয়াংটাং পর্য্যন্ত প্রত্যেক পর্ব্বতে, গুহায়, গ্রামে জঙ্গলে, শত্রুর অবিরাম গোলাগুলির ধমককে ছাপিয়ে চীনের শিল্প-সমবায়ের বাণী প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে: 'গাঙ্ হো!' এই বাণীই চীনকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে তার সামনে নূতন আশার আলোকপাত ক'রেছে; এই বাণীই চীনকে মুক্তির পথে পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—ইতিহাসে এতবড় পুনরভ্যুত্থান দেখা যায়নি।

চীনের সমবায়-পদ্ধতি একরূপ অসাধ্যসাধন ক'রে তুলছে বলা যায়। ঘুমন্ত বিশাল জাতিকে অনুপ্রাণিত ক'রে কর্ম্মচঞ্চলই করে তোলেনি শুধু, সমবায়-পদ্ধতি যে কি এনে দিতে পারে জগতে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণও তুলে ধরেছে।

জাপান আক্রমণ ক'রেই প্রথম থেকে চীনের শিল্প-কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করতে থাকে এবং চীনের আধুনিক শিল্পশক্তির শতকরা নব্বই ভাগ করায়ত্ত ক'রতে সমর্থ হয়। ছ' কোটি দক্ষ শ্রমিক তখন কাজ হারিয়ে এবং ঘরছাড়া হ'য়ে পালিয়ে গ্রামাভ্যন্তরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এদের দলে সাংহাইয়ের কারখানা পরিদর্শক রেউয়ি এ্যালেও ছিলেন; নিউজীল্যাণ্ডের অধিবাসী হ'লেও দীর্ঘ ষোল বৎসর চীনেতে বাস ক'রে, বহু প্লাবন ও দুর্ভিক্ষে ত্রাণ সমিতির পুরোভাগে কাজ ক'রে তিনি চীনাদের বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। রেউয়ি এ্যালি এই সঙ্কটকালেও এগিয়ে এলেন। চীনের শিল্পকে নতুন পদ্ধতিতে গড়ে তোলার জন্যে তাঁর উদ্যোগে তথাকার চৈনিক ও ইউ-রোপীয় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ সভা গঠিত হ'ল। তাঁদের সবাইয়ের মনে এই কথাটাই এল যে, গরিলাযুদ্ধ যদি সাফল্য লাভ করতে পারে, তাহ'লে 'গরিলা শিল্পই' বা নিষ্ফল হবে

না কেন!—সেনাদলের মত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও তেমনি গতিশীল, তেমনি অতর্কিত হবে। আজ এখানে, কিন্তু শত্রু এসে পড়তে না পড়তেই তা নিমেষে অপর জায়গায় স্থানান্তরিত হতে পারবে। এ কাজের জন্যে দরকার এই সমস্ত বেকার শ্রমিকদের এবং যে সমস্ত স্থানে তারা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ ক'রছে তথাকার প্রাকৃতিক সম্পদের। এই সূত্রে একটি জাতীয় সমবায়-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'ল যার শিল্প পরিচালক নিযুক্ত হ'লেন রেউয়ি এ্যালে এবং এদের আর্থিক সাহায্য ক'রতে এগিয়ে এলেন ম্যাদাম চীয়াং কাই-শেক এবং অর্থসচিব ডাঃ এইচ কাঙ্গ। তারপর দেশবাসীর কাছে আবেদন জানানো হ'ল এই ভাবে:

"যুদ্ধ অঞ্চলে যে সমস্ত শ্রমিক ঘুরে বেড়াচ্ছো, যারা বেকার এবং পঙ্গু সৈনিকদল—আমাদের সঙ্গে যোগ দাও। যাদের শক্তি আছে কিন্তু মূলধন নেই; যাদের দক্ষতা আছে কিন্তু কাজ দেবার কেউ নেই, আমাদের সঙ্গে তারা যোগ দাও! এস, সবাই মিলে মাটি থেকে সম্পদ আহরণ করি—তার সোনা, তার লোহা, কয়লা। এস, সবাই মিলে যুদ্ধ বিজয়ে এবং আমাদের নব জীবনের জন্য সে সব কাজে লাগাই।"

ঠিক তিন বছর পূর্ব্বে এই আবেদনে প্রথমে সাড়া দেয় হোনান থেকে দেড় শ' মাইল রেললাইন ধ'রে পদব্রজে আগত নয় জন ক্ষুধিত এবং আশাহীন কামার। কাজের যন্ত্রগুলি ছাড়া তাদের সম্বল কিছুই ছিল না, অথচ একটা কামারশালা যে খুলবে সে সরঞ্জামও একা কারুর ছিল না। সমবায় সমিতির একজন সংগঠনকারীই প্রথমে তাদের শিখিয়ে দিলে কি ক'রে সবাইয়ের যন্ত্রপাতি এক ক'রে সমবায় পদ্ধতিতে একটা কামারশালা খোলা যায়। এইটাই হ'ল প্রথম সমবায়ী শিল্প-প্রতিষ্ঠান।

কিয়াংশু উপকূল থেকে এক মুদ্রাকর তার সাত জন সহকারী ও তাদের স্ত্রীপুত্র সমেত উপস্থিত হ'ল। তারাও শত শত মাইল হেঁটে একটা গ্রামে বিশ্রাম করবার সময় 'চৈনিক শিল্প সমবায়'-এর প্রতীকটি দেখে আকৃষ্ট হয়। এইটে হ'ল দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান—এরা নতুন মুদ্রাকর তৈরী ক'রতে এবং আন্দোলনকে বিস্তৃত করতে সাহায্য করতে লাগলো। তার পর আস্তে আস্তে সর্ব্বত্রই ছোট ছোট তাঁত, সুতোকল প্রভৃতি বসতে আরম্ভ হ'ল। সংগঠনকারীরা ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রের মতই সমস্ত সাজিয়ে গড়তে লাগলো।

এই গতিশীল শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পুরোবর্ত্তী দল জাপানী অধিকৃত অঞ্চলসমূহেও চলা-ফেরা ক'রে বেড়াচ্ছে। অধিকৃত প্রদেশ হোপেতে নারীরা মিলে একটা সমবায় মেরামত কারখানা খুলেছে। অন্যান্য দল ভূগর্ভে আত্মগোপন ক'রে ছোট ছোট হাত-যন্ত্রে মোজা বুনছে কেউ, কেউবা জাপানী কামানের ছায়ায় ছায়ায় থেকে জুতো, পুরু কোট তৈরী করছে। জাপানী সৈন্য খুব কাছাকাছি এসে পড়লে মেয়েরা যন্ত্রগুলিকে ব্যাগে পুরে ছায়ার মত মিলিয়ে যায়, আবার এক জায়গায় গিয়ে যন্ত্র বের করে কাজ ক'রতে থাকে।

এই পুরোবর্ত্তী দলের পশ্চাতে থাকে বয়ন-সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি, যারা কম্বল এবং সেনাদলের পোষাকের জন্য কাপড় বুনে যায়; আরো আছে—যারা বাতি, সাবান, জুতো ইত্যাদি নির্ম্মাণ করে। কোথাও বোমা পড়লে বাতাসে ধোঁয়া মিলিয়ে যাবার আগেই শ্রমিকরা আগুনের মধ্যে দিয়েই তাদের যন্ত্রপাতি মালপত্র ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে পুনর্নির্ম্মাণে তৎপর হ'য়ে ওঠে। আক্রান্ত অঞ্চলসমূহের আরো পিছনে হচ্ছে সঞ্চয় কেন্দ্র যেখানে খনিজ দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয়, বেসামরিক ও সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত ছোট ছোট শিল্পে নিয়োজিত যাবতীয় যন্ত্রপাতি নির্ম্মিত হয়।

সমবায় সঞ্চয় কেন্দ্রগুলি কি ভাবে কাজ ক'রছে তার তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীনের কীয়াংশি প্রদেশে। প্রদেশের দক্ষিণে tungsten, wolfram, লোহা প্রভৃতি খনিজপদার্থ ভর্ত্তি পাহাড়শ্রেণী বিরাজমান; উত্তরে বিস্তৃত শস্যভূমি। কীয়াংশিতে কোনকালে ছোটবড় কোন রকম শিল্প ছিল না। আজ সেখানকার অবস্থা অন্য রকম। প্রধান চলাচল পথ ক্যান নদীর ধারে ধারে সমবায় শিল্পসামগ্রী বাজারে নিয়ে যাবার জন্য চন্দন ও কর্পূর কাঠের নৌকো তৈরী হচ্ছে। নদীতীরের একটা গোলাবাড়ীতে অবস্থিত কারখানায় অন্যান্য কাজের জন্য যন্ত্রপাতি তৈরী হচ্ছে। এ সমস্তই আবার সহজে

স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা আছে। ঘাটে দিবারাত্রি নৌকো বাঁধা থাকে, শত্রুর আগমন সম্ভাবনা দেখলেই সমস্ত যন্ত্রপাতি বেঁধে নৌকো ক'রে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসানো হয়।

উত্তর-পশ্চিম চীনের পর্ব্বত মধ্যস্থিত ঢালুভূমিতে সার সার বহু গুহা পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি গুহা হ'চ্ছে এক একটি সমবায়-প্রতিষ্ঠান। কোনটায় বস্ত্র তৈরী হ'চ্ছে, কোনটায় চলেছে তাঁত, কোনটায় বা জুতো তৈরী হ'চ্ছে। প্রত্যেক গুহার ওপরে আছে একটা ক'রে লাল ত্রিকোণ-বিশিষ্ট গাঙ্গ-হো'র প্রতীক—যুদ্ধবিধ্বস্ত চীনের শিল্প-সম্প্রদায়ের প্রতীক; তারা যেমন দৃঢ় তেমনি বোমা থেকে সুরক্ষিত। সমবায় পদ্ধতিতে যানবাহনেরও ব্যবস্থা আছে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে নদী ঘিরে ঘিরে রাস্তা গিয়েছে; রাস্তায় সারবন্দী থাকে দেড় শ' অশ্বতরের গাড়ী। গাড়ীগুলোর বেশীরভাগই ভাঙ্গাচোরা আমেরিকান মটর, যেগুলোর চাকা আর কাঠামো ছাড়া কিছুই নেই, কিন্তু তার ওপরেই কাঠের ঘেরা তৈরী ক'রে কাজ চালানো হ'চ্ছে, আর তাদের কলের জায়গা নিয়েছে অশ্বতর। আরো উত্তরে রাস্তা যেখানে মাত্র পদচিহ্নে পরিণত তার ওপর দিয়ে সারবন্দী চলে গাধা আর উট—সৈন্যদের কম্বল এবং জামা তৈরীর উপযুক্ত পশম বহন করে তারা চীনের তাঁতশালাগুলিতে বিতরণ করার জন্য।

সমবায়-প্রতিষ্ঠানগুলিতে শৃঙ্খলার সঙ্গে খুব দ্রুত কাজ এগিয়ে যায়। একবার মাদাম চীয়াং কাই-শেক সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে দশ হাজার তুলোর কোট এবং দশ হাজার ভিতরাবরণ চাওয়ায় পনের দিনের মধ্যে তিনি তা পেয়েছিলেন। পনের হাজার তোয়ালে এবং পনের হাজার জোড়া মোজা সরবরাহ ক'রতে এদের লেগেছিল মাত্র পাঁচ দিন। সমবায় প্রতিষ্ঠান উদ্ভবের পূর্ব্বে যা কিছু কম্বল হয় সাংহাইয়ে তৈরী হত না হয়ত বিদেশ থেকে আমদানী হ'ত। সমবায় তাঁতশালাগুলিতে দেশজ পশমে এবং দেশজ রং ব্যবহার ক'রে লক্ষ লক্ষ কম্বল বোনা হ'চ্ছে।

সমবায় কার্য্যাবলীর পিছনে আছে একটা দক্ষ প্রতিষ্ঠান। শিল্পকুশলী এবং সংগঠনকারী বিচারে চীন পাঁচটা প্রদেশে বিভক্ত। ক্ষুদ্রতম সমবায়ে কর্ম্মীরাও যাতে ঠিকমত হিসাব রাখতে পারে তজ্জন্য তাদের হিসাব শেখাতে স্কুল খোলা হ'য়েছে। নতুন সভ্যদের শিক্ষা দেবার জন্যও কেন্দ্র স্থাপিত হ'য়েছে।

শিল্পবিশারদরা কখন কোথায় কি দরকার পড়ে না পড়ে, কোথায় কি ভাবে কাজ করাতে হবে তা দেখে যায়। হয়ত দেখা গেল মালের অভাবে চিনির দাম অসম্ভব বেড়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা তখনই চাষাদের দিয়ে আখ উৎপাদন এবং কারখানাগুলিতে চিনি তৈরীর ব্যবস্থা করে দেয়। কোথাও হয়ত ক্যাষ্টর গাছ খুব বেশী হয়েছে; শিল্পকুশলীরা তখনই এগিয়ে আসে—তা থেকে তেল নিষ্কাষণের ব্যবস্থা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা সাবান-শিল্পও গড়ে তোলে।

এই সমস্ত সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে খুব বেশী টাকারও দরকার হয় না; টাকার হিসেবে সভ্য পিছু টাকা পনের ক'রে হ'লেই হয়। একটা ছোট দলকে যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ আরম্ভ করিয়ে দেবার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। এই পদ্ধতির সারবত্তা দেখে চীনের মহাজনরা এবং সরকারী তহবিল অর্থ সাহায্যে অগ্রসর হয়েছে। পৃথিবীর নানাস্থানের সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকেও অর্থ সাহায্য আসে। সমবায়ীদের জানানো হয় যে, বাইরে থেকে যে মূলধন আসে তা ধার মাত্র এবং মাল তৈরী আরম্ভ হলেই তা শোধ করতে হবে।

এখন অনধিকৃত চীনেতে একটা কোন জিনিষ কিনলেই তার গায়ে সমবায়ের প্রতীক লাল ত্রিকোণটি মারা দেখা যায়, আর সেই সঙ্গে এই বাণী: "শত্রুকে প্রতিরোধ করো এবং এক নতুন চীন গড়ে তোল।" জাগ্রত চীনের এই ভরসা। এই সমবায়ীদের হাতে কেবল বর্ত্তমান গড়ে উঠছে নয়, যুদ্ধের পর আবার স্বপ্রতিষ্ঠা ফিরিয়ে আনার বিরাট কাজও তাদের সামনে রয়েছে। আজ তারা শিখেছে যে, যুগ যুগ ধরে তাদের যেসব প্রাকৃতিক ধন-সম্পদ চীনের দারিদ্র্য ও দুঃখকে ব্যঙ্গ করে এসেছে সে-গুলিকে কাজে লাগাতে। এই সম্ভাবনাই লিন য়ুটাঙ ও অন্যান্য চীনা নেতাদের আকৃষ্ট করেছে। এই গরিলা শিল্প সমবায়গুলির মধ্য দিয়ে যুদ্ধের পর চীনের উন্নতিশীল শিল্প-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন।

পুস্তক-পরিচয়

সম্বন্ধ-নির্ণয়—(চতুর্থ সংস্করণ) ১ম, ২য় ও ৩য় পরিশিষ্ট—প্রথম খণ্ড—৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি। ৯৩।৪ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্যদ্বারা প্রকাশিত। মুল্য—১ম পরিশিষ্ট পাঁচ সিকা ; ২য় পরিশিষ্ট এক টাকা বার আনা; ৩য় পরিশিষ্ট এক টাকা আট আনা।

এই গ্রন্থ ৬৭ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে ইহার চারিটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি যে বাংলার শিক্ষিত সাধারণের কাছে আদৃত হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। প্রথম পরিশিষ্টে শাণ্ডিল্য, ২য় পরিশিষ্টে ভরদ্বাজ এবং ৩য় পরিশিষ্টে কাশ্যপ গোত্রীয় বংশ-বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাঁহাদের বংশ-বিবরণ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে শুধু তাঁহাদের কাছেই যে এই পুস্তক মূল্যবান তাহা নহে, বাংলার সামাজিক ইতিবৃত্তসম্পর্কে যাঁহারা আলোচনা করিবেন তাঁহারাও এই পুস্তকে গবেষণার অনেক উপকরণ পাইবেন।

যোগে দীক্ষা—(যোগ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের পত্র) শ্রীঅনিলবরণ রায় সঙ্কলিত। ২৫এ বকুল বাগান রো, ভবানীপুরস্থিত দি কালচার পাবলিশার্সে'র পক্ষ হইতে শ্রীতারাপদ পাত্রকর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য মাত্র এক টাকা।

প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় রাজনৈতিক অপরাধে কারারুদ্ধ হন। কারাবাসকালে তাঁহার জীবনে একটি আমূল পরিবর্ত্তন আসে। তাহার ফলে তাঁহার জীবনে ভগবৎ-জীবন লাভের তৃষ্ণা জাগরিত হয়। সেই সময়ে তিনি যুগস্রষ্টা ঋষি শ্রীঅরবিন্দের নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া কয়েকটি পত্র লিখেন। শ্রীঅরবিন্দও তাঁহার পরিজন মারফৎ তাহার প্রত্যুত্তর দেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়দ্বয় শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করেন। সেই পত্রগুলি একত্র করিয়া যোগে দীক্ষা নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দের যোগ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সাধককে কি কি বিষয়ে প্রস্তুত হইতে হইবে তাহা এই পুস্তকে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। যোগের প্রথম অবস্থায় সাধকের মনে যে সমস্ত সহায়ক ও বিপরীত ভাব আসিতে পারে, তাহাদের কি উপায়ে ও কি ভাবে গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে হইবে, সেই বিষয়েও নানা উপদেশ উক্ত পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের যোগ-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও প্রচলিত অন্যান্য যোগমার্গের সহিত তাহার পার্থক্যও এই পত্রাবলীতে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, মন কি অবস্থায় উপনীত হইলে শ্রীঅরবিন্দের যোগ গ্রহণ করা উচিত ও সম্ভব, সেবিষয়েও পাঠকবর্গ এই সংগ্রহে নানা উপদেশ দেখিতে পাইবেন। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনেচ্ছু পাঠকসম্প্রদায় এই পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। যাঁহারা সাধারণ ভাবে শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধন-পদ্ধতির সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহেন তাঁহারাও ইহার মধ্যে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য দেখিতে পাইবেন।

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় খ্যাতনামা সাহিত্যিক, নূতন করিয়া তাঁহার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যাবলম্বনে রচিত তাঁহার শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার সংস্করণখানি বাংলা ধর্ম্মজিজ্ঞাসু পাঠক-সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে। তাঁহার ভাষা সরল ও হৃদয়গ্রাহী, বক্তব্য স্পষ্ট এবং অনুভূতি সুগভীর। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্যও সুপ্রচুর। তাই এই সকল সদ্‌গুণ একত্র সন্নিবিষ্ট হওয়াতে পুস্তকখানি সত্যই অনবদ্য হইয়াছে।

আমরা আশা করি ধর্ম্মজিজ্ঞাসু পাঠকবর্গ বইটিকে প্রীতির চক্ষে দেখিবেন।

ছাপা, কাগজ উত্তম। এইরূপ সুমুদ্রিত পুস্তক বাংলা সাহিত্যে প্রায়ই দেখা যায় না।

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

ব্যথা

শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

বিগত নিশীথে ঘুম থেকে উঠি' জাগি'
চকিতে অন্তর মম কার ব্যথা লাগি'
উঠিল কাঁদিয়া। হেরিলাম শূন্য-পানে
কে যেন চাহিয়া আছে করুণ নয়ানে
মোর আঁখি-পানে। বক্ষ হ'তে নগরীর
কি ব্যথা উঠিছে নিত্য শঙ্কায় অধীর
মনে হ'ল—আজি তারা সারি সারি
কোন্ দূর অজানায় দেবে বুঝি পাড়ি।

গেরুয়া বসনে সাজি কোন্ উদাসিনী
চলিয়াছে দূরে—এক বিষাদ-কাহিনী!
মনে হ'লে তারি লাগি বাহিরিল কবে
কত ব্যথা! একে একে চলে যায় সবে,
আমি শুধু পড়ে রই লয়ে আকুলতা,
বেড়ে চলে নিশীথের গাঢ় নীরবতা!
কত কান্না কত হাসি, কাঁপে দশ দিশি—
বেদনায় দহে হৃদি কেন অহর্নিশি ?

বিবিধ প্রসঙ্গ

মিঃ চার্চ্চিলের ঘোষণা

ভারত সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিলের বহু প্রতীক্ষিত ঘোষণায় আসল কথাটাই প্রকাশ করা হয় নাই—সমর পরিষদ সম্মিলিত ভাবে ভারতের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অপ্রকাশ রাখা হইয়াছে। ইহার কারণ সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন, "আমাদের আশঙ্কা হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে প্রকাশ্য ভাবে এইরূপ কোন ঘোষণা করা হইলে তদ্দ্বারা উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হইবার আশঙ্কা থাকিবে। সর্ব্ব প্রথম আমাদিগকে এই কথা উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আমাদের এই প্রচেষ্টা ন্যায়সঙ্গত এবং কার্য্যকরী ভাবে সমর্থিত হইবে…।"

তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাকে তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত এবং চূড়ান্ত সমাধান বলিয়াই বিবেচনা করেন। কিন্তু মিঃ চার্চ্চিলের উক্তি হইতে এ কথা মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, সমর পরিষদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ভারতে ন্যায়-সঙ্গত এবং কার্য্যকরী ভাবে সমর্থিত হওয়ার সম্পর্কে তিনিও একেবারে নিঃসন্দেহ নহেন। এই জন্যই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি না তাহা বুঝিবার জন্য কমন্স সভার লীডার স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ভারতে আসিতেছেন।

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ইতিপূর্ব্বেও ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে একবার ভারতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সহিত বর্ত্তমান আসার একটা গুরুতর পার্থক্য আছে। তিনি এখন আসিতেছেন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে ভারত সম্পর্কে বৃটিশ মন্ত্রি-সভার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত বহন করিয়া। ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিদের সহিত আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁহাদের মত তিনি যাচাই করিবেন। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতবাসী সাদর সম্বর্দ্ধনাই করিবে। কোন পূর্ব্বকল্পিত ধারণা তাঁহার উদ্দেশ্যের সাফল্যের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহার কার্য্যের সাফল্য নির্ভর করিবে তিনি যে সিদ্ধান্ত বহন করিয়া আনিতেছেন তাহারই উপরে। ভারতের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অনেকে তাঁহার বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি হইতে স্বতন্ত্র একটা নিজস্ব মতবাদও তাঁহার আছে, শুধু ইহার-ই উপরে তাঁহার 'মিশনে'র সাফল্য নির্ভর করিবে না।

ইতিপূর্ব্বে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য এরূপ পন্থা গ্রহণ করেন নাই, এ কথা খুবই সত্য। কিন্তু পথ নূতন এবং খুব ভাল হইলেও ঈপ্সিত স্থানে আমাদিগকে পৌছাইতে পারে না যদি উহা আসলে ঈপ্সিত স্থানে যাইবার পথ না হয়। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস রাশিয়ায় রাজনৈতিক দৌত্যকার্য্যে যাইয়া অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহার এই সাফল্যই ইংলণ্ডে তাঁহার প্রতিষ্ঠাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বৃটিশ-মন্ত্রিসভায় তিনি যে স্থান লাভ করিয়াছেন তাঁহার মূলেও যে এই রাশিয়ার সাফল্য, তাহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল করা হইবে না। বৃটিশ শ্রমিক দলে স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের স্থান নাই, পার্লামেণ্টে তাঁহার দল বা অনুবর্ত্তী নাই। বৃটিশ মন্ত্রিসভার নীতি এখনও রক্ষণশীল দল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। রক্ষণশীল দলেরও তিনি সদস্য নহেন। ভারতের সমস্যা রাশিয়ার সমস্যা অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং ভারতবর্ষকে দিবার মত সত্যই যদি কিছু তিনি লইয়া আসেন এবং ভারতীয় নেতাদের সহিত আলোচনা চালাইবার যদি পূর্ণ ক্ষমতা তাঁহার থাকে তবেই তাঁহার মিশন সার্থক হইবার সম্ভাবনা।

মিঃ চার্চ্চিলের বিবৃতিতে ভারত সম্পর্কে সমর পরিষদের সিদ্ধান্ত অপ্রকাশিত থাকিলেও তাহার স্বরূপের কোন আভাসই কি পাওয়া যায় না? তিনি যে বড়লাটের ১৯৪০ সালের আগষ্টের ঘোষণার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত সন্ধি সূত্রে বৃটেনের বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ভারতের সহিত বৃটেনের বহুদিনের

সংপ্রব হইতে উদ্ভূত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা বলিয়াছেন, সেগুলি কি শুধু ঐতিহাসিক আলোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়? ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া মিঃ চার্চ্চিলের বিবৃতিতে ঐগুলির কি আর কোন মূল্য নাই? আছে কি না ভবিষ্যতে তাহা আমরা অবশ্যই দেখিতে পাইব। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ যখন ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করিবেন, তখন তাহা অপ্রকাশ থাকিবে না।

সুদূর প্রাচ্যে জাপ আক্রমণের পট ভূমিকার উপরেই মিঃ চার্চ্চিলের বিবৃতি রচিত হইয়াছে। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ভারতে আসিতেছেন। কিন্তু যুদ্ধ জয়ই যুদ্ধ জয়ের একমাত্র শেষ কথা নয়। ভারতবাসী তাহা মনে করে না, বৃটেনেরও তাহা মনে করা উচিত নয়। সমগ্র পৃথিবী এক বিপুল পরিবর্ত্তনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নূতন বাণী ধ্বনিত হইতেছে। যুদ্ধ জয়ের পর গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শুধু ফ্যাসিষ্ট সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করিলে চলিবে না, সর্ব্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাইতে হইবে। এই বাণী লইয়াই স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে আসিতে হইবে। যদি এই বাণী লইয়াই তিনি আসেন, তাহা হইলে ভারতীয় মিশনে তাঁহার সাফল্য রাশিয়ার সাফল্য অপেক্ষাও অধিকতর গৌরবান্বিত হইবে।

—

ভারত-গবর্ণমেণ্টের তৃতীয় যুদ্ধ বাজেট

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভারত-গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইসম্যান ভারত-গবর্ণমেণ্টের ১৯৪২-৪৩ সালের যে বাজেট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, শান্তির সময় সামরিক ব্যয় সহ ভারত-গবর্ণমেণ্টের মোট ব্যয় যাহা হয়, আগামী বৎসরে শুধু দেশরক্ষার ব্যয়ই তাহা অপেক্ষা অধিক। আগামী বৎসরে (১৯৪২-৪৩) ভারতগবর্ণমেণ্টের মোট আয় ১৪০ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ১৮৭ কোটি টাকা হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই মোট ব্যয় ১৮৭ কোটি টাকার মধ্যে দেশরক্ষার খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে ১৩৩ কোটি টাকা। আগামী বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ ৪৭ কোটি ৭ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

দেশরক্ষার বিপুল ব্যয় ছাড়া আগামী বৎসরের বাজেটের আর একটি বিশেষত্ব ব্যাপক কর বৃদ্ধি। ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেটে আমদানী তুলার উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৪০-৪১ সালে চিনির উপর উৎপাদন শুল্ক এবং আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে। উহার অব্যবহিত পরেই যুদ্ধজনিত অতিরিক্ত লাভের উপর শতকরা ৫০৲ হারে কর ধার্য্য করা হয়। ইহার পর অতিরিক্ত বাজেট পেশ করিয়া আয়কর ও সুপার ট্যাক্স টাকায় চারি আনা হিসাবে বর্দ্ধিত করা হয়। চলতি বৎসরে (১৯৪১-৪২) পাঁচ দফা কর বৃদ্ধি ও নূতন কর ধার্য্য করা হয়। অতিরিক্ত লাভকর শতকরা ৬৬⅔ টাকা, আয়কর শতকরা ২৫৲ টাকা হইতে ৩৩⅓ টাকা, দিয়াশলাইয়ের উৎপাদন শুল্ক দ্বিগুণ, কৃত্রিম রেশমের আমদানী শুল্ক পাউণ্ড প্রতি তিন আনা স্থলে পাঁচ আনা এবং নিউমেটিক টায়ার এবং টিউবের উপর নূতন উৎপাদন শুল্ক শতকরা ১০৲ টাকা হারে ধার্য্য করা হয়। আগামী বৎসরে পেট্রোলের উপর ট্যাক্স শতকরা ২৫৲ টাকা বৃদ্ধি, বার্ষিক হাজার টাকা হইতে দুই হাজার টাকা আয়ের উপর ৭৫০৲ টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট আয়ের উপর আয়কর ধার্য্য, আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের উপর সারচার্জ্জ শতকরা ৩৩⅓ হইতে শতকরা ৫০৲ টাকা ধার্য্য করার প্রস্তাব করা হইয়াছে তুলা, লবণ ও পেট্রোলের উপর শতকরা ২০৲ টাকা চার্জ্জ ধার্জ্জ করা হইবে। ডাক ও টেলিগ্রামের মাশুল বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু কর বৃদ্ধির আয় হইতে ঘাটতির সাকুল্য টাকা সঙ্কুলান হইবে না, ৩৫ কোটি টাকা ঋণ করিতে হইবে। ঋণই যখন করিতে হইবে, তখন এই দুঃসময়ে ট্যাক্স বৃদ্ধি না করিয়া, ৪৭ কোটি ৭ লক্ষ টাকার সবটাই ঋণ করিয়া ঘাটতি পূরণ করা কর্ত্তব্য ছিল।

১৯৪০-৪১ সালে সামরিক ব্যয় ৫৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হয়, কিন্তু সংশোধিত হিসাবে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। কিন্তু প্রকৃত হিসাবে দেশরক্ষার ব্যয় আরও ২০৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়। ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে দেশরক্ষার সর্ব্বসাকুল্য ব্যয় ৮৪ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া বরাদ্দ

করা হয়। সংশোধিত হিসাবে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১০২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ভারতের যুদ্ধপ্রচেষ্টা খাতে ব্যয় বাড়িয়াছে ১৭ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি বাবদ বাড়িয়াছে ৬৯ লক্ষ টাকা। ১৯৪০-৪১ সনের প্রথম যুদ্ধ বাজেট পেশ করিবার সময় স্যার জেরেমি রেইসম্যান জানাইয়াছিলেন যে, যুদ্ধের ব্যয় সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যে মীমাংসা হইয়াছে তদনুসারে ভারতবর্ষ পণ্যমূল্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সাধারণ শান্তিকালীন সামরিক ব্যয়, ভারতের নিজ যুদ্ধপ্রচেষ্টার ব্যয় এবং ভারতের বাহিরে দেশরক্ষা বাহিনীর ব্যয়মধ্যে এক কোটি টাকা ব্যয় বহন করিবে এবং অবশিষ্ট দেশরক্ষার ব্যয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন। তদনুসারে ১৯৪১-৪২ সালে দেশরক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৩ শত কোটি টাকা মধ্যে ২ শত কোটি টাকা ব্যয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন। আগামী বৎসর সামরিক ব্যয় বাবদ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৪ শত কোটি টাকারও অধিক পাইবেন বলিয়া অর্থসচিব আশা করিয়াছেন। ভারতরক্ষার ব্যয় সাম্রাজ্য রক্ষা ব্যয়েরই অন্তর্গত। সুতরাং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে আরও অধিক সাহায্য পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

আগামী বৎসরের বাজেটে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু এসম্বন্ধে সরকার কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা প্রদান করেন নাই। সুতরাং ইহার উদ্দেশ্য 'ইন্‌ফ্লেশন' রোধ করা এবং ডিফেন্স বণ্ড ক্রয়ের জন্য অনুপ্রেরণা যোগান ছাড়া আর কি হইতে পারে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। মোটের উপর যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরের বাজেটে যেরূপ কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই কঠিন হইয়া পড়িবে :

—

বাংলা সরকারের বাজেট

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বাংলার অর্থ-সচিব ডাঃ শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলা গবর্ণমেণ্টের ১৯৪২-৪৩ সালের যে বাজেট বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিয়াছেন তাহাতে অসামরিক জনরক্ষার ব্যয় খাতে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। অবশ্য বাংলার অসামরিক জনরক্ষার মোট ব্যয় চারি কোটি টাকারও বেশী। তবে বাংলা গবর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে উল্লিখিত ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে, অবশিষ্ট ব্যয় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন। প্রধানতঃ এই অসামরিক জনরক্ষার ব্যয়ের জন্যই আগামী বৎসরের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৫ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। ১৯৪২-৪৩ সালে বাংলা গবর্ণমেণ্টের মোট আয় ১৫ কোটি ৬৯ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা এবং মোট ব্যয় ১৬ কোটি ৭৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা হইবে বলিয়া বাজেটে বরাদ্দ করা হইয়াছে।

১৯৪০-৪১ সালে বাংলা গবর্ণমেণ্টের মোট আয় হইয়াছিল ১৩ কোটি ৫৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং মোট ব্যয় হইয়াছিল ১৪ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। ৯০ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ঘাটতি হইয়াছিল। চল্‌তি বৎসরের (১৯৪১-৪২) বাজেটে ১৪ কোটি ৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। সংশোধিত হিসাবে দেখা যায়, আয়ের পরিমাণ উহা অপেক্ষা ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বেশী হইবে অর্থাৎ মোট আয় ১৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। চল্‌তি বৎসরের বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল ১৫ কোটি ৩৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। কিন্তু সংশোধিত হিসাবে ব্যয়ের পরিমাণও ৯৪ লক্ষ টাকা বেশী হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। বাজেটের হিসাব অনুযায়ী আগামী বৎসরে চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাব অপেক্ষা ৪১ লক্ষ টাকা বেশী আয় এবং ৪৪ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইবে।

জনরক্ষার জন্য যে চারি কোটি টাকারও অধিক ব্যয় করা হইবে তাহার মধ্যে ২ কোটি টাকা শুধু এ-আর-পির কর্ম্মচারীদের বেতন বাবদই বরাদ্দ করা হইয়াছে, কিন্তু আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের জন্য যে ৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহাকে আমরা পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করিতে পারি না। বিমান আক্রমণে নিরাশ্রয় লোকদের সাহায্য বাবত বরাদ্দ করা হইয়াছে মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা। প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অত্যন্ত নগণ্য, অথচ জনরক্ষার

ব্যবস্থায় ইহা একটি অন্যতম প্রধান দফা হওয়া উচিত। বিমান আক্রমণে আহতদের হাসপাতালের ব্যবস্থার জন্য ৩১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহাও পর্য্যাপ্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অসামরিক জনরক্ষার জন্য মোট যে ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা না করিয়া উপায় ছিল না, কিন্তু এই ব্যয় বরাদ্দ যে ভাবে বিভিন্ন দফায় বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে সরকারী বাজেটের গতানুগতিক ধারারই শুধু পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত জনরক্ষা অপেক্ষা উদ্যোগ-আয়োজনেই বেশী ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

জাতিগঠন ও জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা বরাবরই অবহেলিত হইয়া আসিতেছে। ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আগামী বৎসরে অবশ্য জাতি রক্ষার ব্যবস্থার জন্যই খরচের চাপ বেশী পড়িয়াছে। তথাপি শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির কোনও একটির জন্যও কি কোন পরিকল্পনা গঠন করা সম্ভব ছিল না? এই সকল দফায় প্রতি বৎসরই কিছু কিছু বেশী ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়া থাকে, এবারও হইয়াছে। কিন্তু সুচিন্তিত ও সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে এই ব্যয় সার্থক হইতে পারিতেছে না। আগামী বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য ৫ লক্ষ টাকা, তপশীলভুক্ত জাতির মধ্যে শিক্ষার উন্নতিবাবদ ১০৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা লইয়াছে। জনস্বাস্থ্য যাতে পল্লীতে জল সরবরাহ বাবদ ১০ লক্ষ, বিনা ব্যয়ে কুইনাইন বিতরণের জন্য ৬ লক্ষ, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের পরিকল্পনার জন্য ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

আগামী বৎসরের বাজেটের একমাত্র বিশেষত্ব এই যে, সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্দ স্থাপনের জন্য একলক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং নূতন কোন ট্যাক্স ধার্য্য করা হয় নাই। বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের গুরুত্ব অন্য কোন বিষয় অপেক্ষা একটুকুও কম নহে। যদি এই অর্থ সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয় করা হয়, তবেই উহা সার্থক হইবে। কোন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য হয় নাই বটে, কিন্তু ট্যাক্সের বোঝা লাঘবও হয় নাই। সব দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ডাঃ মুখার্জ্জীর বাজেটকে গতানুগতিক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তবে জনরক্ষার জন্য যে বিপুল ব্যয় করা সম্ভব হইয়াছে তাহা দেখিয়া প্রত্যেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে, ইচ্ছা থাকিলে জাতি গঠনমূলক কার্য্যের জন্যও অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে।

—

সরকারী রেলের আয়-ব্যয়

যুদ্ধের জন্য জনসাধারণের এমন কি গবর্ণমেণ্টের অবস্থা পর্য্যন্ত অসচ্ছল হইয়া উঠিলেও সরকারী রেলের অবস্থা কিন্তু বেশ সচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতীয় রেলের ইতিহাসে এমন সচ্ছল অবস্থা অতীতে কোন দিনই হয় নাই। চলতি বৎসরের (১৯৪১-৪২) বাজেটে ১১·৮৩ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল, কিন্তু সংশোধিত হিসাবে দেখা যায় উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে ২৬·২০ কোটি টাকা। আগামী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ভারতের সরকারী রেলওয়ে-সমূহের আয় ১২৮ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১০০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। সুতরাং বৎসরের শেষে উদ্বৃত্ত হইবে ২৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা।

১৯৪০-৪১ সালে সরকারী রেলের উদ্বৃত্ত হইয়াছে ১৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। এই উদ্বৃত্ত টাকা ভারত গবর্ণমেণ্টের তহবিলে দেওয়া হইয়াছে ১৩·২ কোটি টাকা এবং ১৯৪১-৪২ সালের উদ্বৃত্ত হইতে দেওয়া হইয়াছে ১৯·১২ কো[illegible] টাকা। আগামী বৎসরে ২০·১৩ কোটি টাকা দেওয়া হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে।

রেলের এই সচ্ছল অবস্থা দেখিয়াও আমরা আনন্দ অনুভব করিতে পারিতেছি না। রেলের ব্যয় সঙ্কোচের জন্য এই উদ্বৃত্ত হয় নাই, পরিচালনের গুণেও হয় নাই। রেলের সচ্ছল অবস্থার মূলে রহিয়াছে প্রথমতঃ যুদ্ধের জন্য মাল চলাচলের পরিমাণ বৃদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ যাত্রী এবং মালের ভাড়া বৃদ্ধি। আমাদের আনন্দিত হইতে না পারার আর একটি কারণ, রেলের আয় এবং উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও যাত্রী ও মালের ভাড়া কমে নাই। বরং ই-আই এবং এন্-ডব্লু রেলের যাত্রীর ভাড়া বাড়িয়াছে। পার্শেল ও লগেজের ভাড়াও টাকা প্রতি দুই আনা বাড়িয়াছে। খাদ্য শস্য এক ওয়াগনের কম হইলে ভাড়া টাকা প্রতি দুই আনা বেশী লাগিবে। এই সকল বিষয়

বিবেচনা করিলে রেলের সচ্ছল অবস্থা দেখিয়াও আমাদের আশ্বস্ত হইবার কোন কারণ নাই। যাত্রীর সংখ্যা কমাইবার জন্য রেলের ভাড়া বৃদ্ধির যুক্তিটা আমাদের কাছে খুবই অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশে সখের ভ্রমণ করে বড়লোকেরা। সংখ্যায় তাঁহারা খুবই কম। যে-সকল যাত্রীর নিকট হইতে রেলের প্রচুর আয় হয়, তাহারা নিতান্ত দায় ঠেকিয়াই রেলে চড়ে। কাজেই রেলের অবস্থা যখন সচ্ছল তখন ভাড়া না কমিবার কোন কারণই থাকিতে পারে না।

রেলওয়ে সচিব স্যার এণ্ড্রুজো সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়া কেবল দুইটি রেলে যাত্রীর ভাড়া বৃদ্ধি করিয়াছেন। ঐ দুইটি রেলে যাত্রীর ভাড়া অপেক্ষাকৃত কম। এই যুক্তিতে বরং অন্যান্য রেলওয়েতে যাত্রীর ভাড়া কম হওয়া উচিত ছিল। ভবিষ্যতে রেলের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইলে ভাড়া বাড়িবার আশঙ্কাও তিনি দেখাইয়াছেন। ব্যাপার মন্দ নয়। রেলের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইলেও ভাড়া বাড়িবে, আবার খারাপ হইলেও ভাড়া বাড়িবে। রক্ষা পাইবার উপায় কোন দিকেই আমাদের নাই।

—

জনরক্ষার ব্যবস্থা

যুদ্ধ যতই ভারতের নিকটবর্ত্তী হইতেছে অসামরিক জনরক্ষার গুরুত্ব ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। জল, স্থল এবং আকাশ তিন দিক হইতেই ভারত আক্রান্ত হইতে পারে। বিমান আক্রমণের আশঙ্কার জন্যই জনরক্ষার গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এবং কলিকাতায় বিমান আক্রমণের আশঙ্কা একটুকুও কম নয়। সুতরাং কলিকাতায় থাকা যাহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক নাই তাহাদের অন্যত্র যাওয়া সম্পর্কে দুই মত থাকিতে পারে না। বাংলা গবর্ণমেণ্টও অনাবশ্যক জনগণকে কলিকাতা ত্যাগের পরামর্শ দিয়াছেন। অ-সামরিক জনরক্ষার অর্থ জনগণের ধন ও প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থা যে শুধু আক্রমণসাধ্য এলাকার জন্যই করা প্রয়োজন, তাহা নহে; মফঃস্বলেও জনরক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে।

কলিকাতা হইতে বাধ্যতামূলক ভাবে লোক অপসারণের কোন পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্টের নাই বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যদি বাধ্যতামূলক ভাবে লোক সরাইবার ব্যবস্থা করিতেই হয়, তাহা হইলে অনাবশ্যক জনগণ সময় থাকিতে স্থানান্তর গমন না করিলে জনগণের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না। রেঙ্গুনের দৃষ্টান্ত হইতে এসম্বন্ধে আমাদের শিখিবার আছে।

২০শে কি ২১শে ফেব্রুয়ারী রেঙ্গুন হইতে অসামরিক জনগণকে চলিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হয়। হাজার হাজার ভারতবাসী হাঁটিয়া রেঙ্গুন হইতে ভারতে আসিয়াছে এবং আসিতেছে। পথে তাহাদের জন্য খাদ্য, পানীয় জল এবং বিশ্রামস্থানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ভারত হইতে একলক্ষ লোককে টীকা দিবার উপযোগী ঔষধাদিসহ দুই দল চিকিৎসক দুইটি স্থলপথে প্রেরণ করা হইয়াছে। সুতরাং পথে যে কলেরা প্রভৃতি রোগেরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। কিন্তু পথে কাহারও মৃত্যু হইয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। কলিকাতা হইতে যদিই বাধ্যতামূলক ভাবে লোক অপসারণ করিতেই হয়, তাহা হইলে রেঙ্গুনের অব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থাও পূর্ব্ব হইতেই অবলম্বন করা প্রয়োজন। কলিকাতা হইতে অনাবশ্যক লোক চলিয়া গেলেও বহুলোক কলিকাতায় থাকিবে এবং তাহাদের সংখ্যা মফঃস্বলের যে কোন সহরের জনসংখ্যা হইতে বহুগুণ বেশী হইবে। তাহাদের জন্য খাদ্য, পানীয়, চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, বিমান আক্রমণ হইলে আহতদের চিকিৎসা, অগ্নিনির্ব্বাপন প্রভৃতি ব্যবস্থার ন্যায় মফঃস্বলের জনগণের ধনপ্রাণ রক্ষাও অসামরিক জনরক্ষার ব্যবস্থার অন্তর্গত।

বহু লোক কলিকাতা হইতে চলিয়া যাওয়ায় মফঃস্বলের সহরে ও গ্রামে লোকসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে এবং বাড়িতেছে। মফঃস্বলে গ্রীষ্মকালে জলের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়া থাকে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আরও বেশী অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা। জলাভাবের পরিণামে কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা খুবই বেশী। খাদ্যাভাবের আশঙ্কা জলাভাব হইতে কম

নয়। খাদ্যাভাব ঘটিলে লুঠতরাজ চুরি-ডাকাতি আরম্ভ হওয়ার আশঙ্কা। রেঙ্গুন সহর বন্দুক-কামানে সুসজ্জিত সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হেফাজতে থাকা সত্ত্বেও লুঠতরাজ হইয়াছে বলিয়া শোনা যায়। খাদ্যাভাব ঘটিলে ম্যালেরিয়ায় জরাজীর্ণ চৌকিদার মাত্র সম্বল গ্রামে অধিবাসীদের ধনপ্রাণ রক্ষা করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। সুতরাং অসামরিক জনরক্ষার ব্যবস্থা খুব ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। কলিকাতায়, মফঃস্বলের সহরগুলিতে এবং পল্লী অঞ্চলে ত্যাগী, সাহসী এবং কর্ম্মী যুবকদিগকে লইয়া জনরক্ষা কমিটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন। সরকারের সহযোগিতায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় বেসরকারী কমিটি গঠন করাই বোধ হয় নিরাপত্তা রক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। কংগ্রেস, কৃষক সভা প্রভৃতি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই বিষয়ে সত্বর অবহিত হইবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি। সরকারকেও অনুরোধ করিতেছি, এই সকল বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের জনরক্ষামূলক কাজে তাঁহারা যেন সর্ব্বপ্রকারে সহযোগিতা করেন।

—

আহার্য্য সমস্যা

কয়লার প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও মালগাড়ীর অভাবে কয়লা-সমস্যা দেখা দিয়াছে, কিন্তু আমাদের সম্মুখে যে খাদ্যসমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা খাদ্যের অভাবে। মালগাড়ীর অভাবে এই সমস্যা আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের শতকরা ৪৫ জন লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ২০ জন লোক আধপেটা খাইয়া থাকে, ইহা আমাদের সনাতন সমস্যা। ইহার উপর লোকসংখ্যা পাঁচ কোটি বেশী হইয়াছে সে কথাও না হয় নাই ধরিলাম। ভারতের লোকসংখ্যা ১৫ ভাগ বাড়িয়াছে, কিন্তু একর প্রতি ধানের উৎপাদন এগার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচ সের কমিয়া গিয়াছে। চাউল ও গমের জন্য আমাদিগকে ব্রহ্মদেশ ও অষ্ট্রেলিয়ার উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হয়। যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর মালগাড়ীর অভাবে সরবরাহের অসুবিধা তো আছেই।

গ্রেট বৃটেন খাদ্যের জন্য প্রধানতঃ বিদেশের উপর নির্ভরশীল হইলেও বৃটেনের আহার্য্যসচিবের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী কমন্স সভায় জানাইয়াছেন, বৃটেনের প্রয়োজনীয় খাদ্যসম্ভার যাহা মজুত আছে তাহা সন্তোষজনক। তিনি বলিয়াছেন, "যত রকম অসুবিধাই আমাদের হউক না কেন, জাতিকে আমরা প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য যোগাইব। কি স্বাস্থ্য, কি নৈতিক দৃঢ়তা কিছুই আমাদের নষ্ট হইবে না।" এই উক্তির মধ্যে যে দৃঢ় আশ্বাসের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদের দেশে ঐরূপ নিশ্চিন্ত ভাব অনুভব করিবার মত কিছুই পাইতেছি না। গত ৪ঠা মার্চ্চ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্যার রামস্বামী মুদালিয়র বলিয়াছেন, "ভারত গবর্ণমেণ্ট খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সন্তোষজনকভাবে সরবরাহ করা বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চল লইয়া কমিটি গঠনের বিষয়েও চিন্তা করিতেছেন।" তাঁহার এই উক্তি সন্তোষজনক বলিয়া মনে করা যায় কি? আটার অভাব তো ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে। চাউলও দুর্ম্মূল্য।

—

সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন ও যবদ্বীপ

সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনের পতন হইয়াছে। সমগ্র মালয় উপদ্বীপ জাপানের অধিকারে। ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতী দ্বীপপুঞ্জ প্রায় সম্পূর্ণরূপে জাপান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ফিলিপাইনে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র জাপানকে বাধা দিতেছে বটে, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার মেণ্ডেটারী রাষ্ট্র নিউগিনি দ্বীপে জাপসৈন্য অবতরণ করিয়াছে। ইহাই সুদূর প্রাচীর যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতি।

প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া বৃটেন সিঙ্গাপুরে নৌঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মানুষের যতদূর সাধ্য, সিঙ্গাপুরকে দুর্ভেদ্য করা হইয়াছিল। সেই সিঙ্গাপুরের পতন ডানকার্ক ও ক্রীটের স্মৃতিকেও ম্লান করিয়া দিয়াছে। ডানকার্ক এবং ক্রীট অপেক্ষা ইহার গুরুত্বও সুদূরপ্রসারী। তেমনি সুদূরপ্রসারী রেঙ্গুনের পতন। সুদূর প্রাচ্যে জাপানের আক্রমণ আকস্মিক ও প্রতারণাপূর্ণ হইলেও উহা দীর্ঘ দিনের পরিকল্পনা ও সুসংবদ্ধ আলোচনার ফল। সিঙ্গাপুর পতনের পর মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন, জাপানের সামরিক

কর্ত্তারা গত বিশ বৎসর ধরিয়া যে স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছে বর্ত্তমানে সেই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতেছে। বস্তুতঃ এ পর্য্যন্ত জাপান যেরূপ দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে জাপানের পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনুমান করিতে পারা যায়। শুধু প্রতারণাপূর্ণ হঠাৎ আক্রমণে এত দ্রুত অগ্রসর হওয়ার আশা বোধ হয় জাপান করে নাই। ছয় শত মাইল দীর্ঘ মালয় উপদ্বীপ দুই মাসের মধ্যে জাপান অধিকার করিয়াছে। সিঙ্গাপুর আক্রমণ আরম্ভ হয় ১লা ফেব্রুয়ারী এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখেই জাপ-সৈন্য সিঙ্গাপুর দ্বীপে অবতরণ করিতে সমর্থ হয় এবং সাত দিনের মধ্যেই ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সিঙ্গাপুরের বৃটিশ-বাহিনী জাপানের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

সিঙ্গাপুরের পর যাভা দ্বীপ দখলের জন্য আক্রমণ আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে ও উত্তর-পূর্ব্বে সুমাত্রা ও সিঙ্গাপুর হইতে উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে বোর্ণিও ও সেলিবিস হইতে এই অভিযান আরম্ভ হয়। যাভার নূতন রাজধানী বাণ্ডোয়াঙের পতনের পর ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের গবর্ণর-জেনারেল ভনমুক উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারিগণ সহ অষ্ট্রেলিয়ায় চলিয়া গিয়াছেন। যাভা আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেশে রেঙ্গুনের দিকে জাপ আক্রমণ চলিতে থাকে। ৭ই মার্চ্চ বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ রেঙ্গুন হইতে সৈন্য অপসরণ করিবার এবং কলকারখানা ইত্যাদি ধ্বংস করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর ৯ই মার্চ্চ এই কার্য্য সমাপ্ত হয়। অবশেষে রেঙ্গুনেরও পতন হইল।

—

জাপানের পরবর্ত্তী লক্ষ্য

রেঙ্গুনের পতনের পর প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে, জাপান অতঃপর কি করিবে? জাপান অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণ করিবে, না ভারত আক্রমণ করিবে, না একসঙ্গে দুই দিকেই আক্রমণ চালাইবে? সম্মিলিত কমাণ্ডের সর্ব্বাধিনায়ক জেনারেল ওয়াভেল পুনরায় ভারতের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ায় ভারতের সামরিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অনেকে মনে করেন, জাপান অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণ না করিয়া 'জার্ম্মণী'র সহিত একযোগে সাঁড়াশী অভিযানের আকারে ভারত আক্রমণ করিতে পারে। অনেকে আবার মনে করেন, মিত্রশক্তিকে অষ্ট্রেলিয়া হইতে পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণের সুযোগ দিয়া জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে না। কেহ কেহ মনে করেন, আসন্ন বসন্তকালে জার্ম্মাণী এবং জাপান একসঙ্গে রাশিয়া আক্রমণ করিবে, সুতরাং আপাততঃ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অভিযান জাপান এইখানেই শেষ করিবে।

জাপান কি করিবে, নিশ্চিত ভাবে কেহই কিছু বলিতে পারে না। তবে একথা ঠিক যে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের ফলাফলের উপরেই শুধু ভারত আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাই নয়, প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। নিউগিনি হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত জাপান তাহার সামরিক প্রচেষ্টাকে বিস্তৃত করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্র আরও অধিক বিস্তৃত হইলে তাল সামলান জাপানের পক্ষে কঠিন হইতে পারে। কিন্তু জাপানকে পরাজিত করিতে যত সময় নষ্ট হইবে তাহার প্রতিটি মুহূর্ত্ত মূল্যবান মনে করা কর্ত্তব্য।

—

বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা

বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সনের রিপোর্টে দেখা যায়, উক্ত বৎসরে বাংলা দেশে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৪০৯টি এবং মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২১৮১টি। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষার মোট বিদ্যালয় ছিল ৩৫৯০টি। উক্ত বৎসরে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ১৬৪ জন। স্কুলসংখ্যা ও ছাত্র-সংখ্যার দিক হইতে দেখিলে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিই হইয়াছে বলিতে হয়।

১৯৩১-৩২ সালে সমগ্র বাংলা দেশে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১১২টি এবং মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯৬৪টি ছিল। ১৯৩১-৩২ সালের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ২০৭টি এবং মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২১৩টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে মেয়েদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৬টি, আলোচ্য বৎসরে উহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮৭টিতে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার দিক দিয়া

দেখা যায় ১৯৩১-৩২ সালে বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৪২ হাজার ১৬৯ জন। আট বৎসরে ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৯ শত ৯৫ জন ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু ইহাকে আশানুরূপ বলা চলে না। ইহার প্রধানতম কারণ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারের প্রচেষ্টা অতি সামান্যই। দ্বিতীয়তঃ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয়ভারের বৃহত্তর অংশ ছাত্রছাত্রীদিগকেই বহন করিতে হয়। তাহাদের অংশের ব্যয়ভারটা ক্রমেই বাড়িতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সনে গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপালিটি ও জিলাবোর্ড মিলিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার মোট ব্যয়ের মাত্র শতকরা ১৫·৮ ভাগ মাত্র বহন করিয়াছেন। ১৯২৭ সালে হার্টগ কমিটির হিসাবে দেখা যায় গবর্ণমেণ্ট হইতে দেওয়া হয় শতকরা ১৬·২ ভাগ। বাংলা দেশের শতকরা ৫০টি স্কুল কোন সরকারী সাহায্য পায় না। এই ব্যবস্থা মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে।

কয়লার সমস্যা

রান্নার কয়লা এবং কলকারখানা ইত্যাদি চালাইবার জন্য কাঁচা কয়লা—দুইয়ের-ই সমস্যা দেখা দিয়াছে, কয়লার অভাবে নয়, কয়লা সরবরাহের জন্য মালগাড়ীর অভাবে। রান্নার কয়লার দাম একবার খুব চড়িয়া গিয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট দাম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও আবার দাম বাড়িয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট আবার কোক কয়লার খুচরা ১৷৹ মণ বাঁধিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সরকারের এই আদেশ সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইতেছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সরকারের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

১৩ই ফাল্গুন বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা জানাইয়াছিলেন, বিভিন্ন পাম্পিং ষ্টেশনে বিশেষতঃ পলতার পাম্পিং ষ্টেশনে মজুত কয়লার অবস্থা উদ্বেগজনক। পলতার পাম্পিং ষ্টেশনে দৈনিক ১০০ টন কয়লার প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য দুই হাজার টন কয়লা মজুত রাখা হইত। কর্পোরেশনের কর্ম্মকর্ত্তা জানান যে, মজুত কয়লার পরিমাণ ৭০০ টনের মত দাঁড়াইয়াছিল।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাংলার বাণিজ্য-সচিব খান বাহাদুর আবদুল করিম বলিয়াছেন, "ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান খনিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কয়লা উত্তোলন করা হইতেছে, কিন্তু মালগাড়ী সংগ্রহে অসংযত প্রতিযোগিতার জন্য উচ্চ ভাড়ায় যিনি মালগাড়ী সংগ্রহ করিতে পারেন তিনিই কেবল কয়লা সংগ্রহে সমর্থ হন।" গাড়ীর অভাব হইয়াছে সামরিক প্রয়োজনে। পূর্ব্বে প্রায় তিন হাজার মালগাড়ী কয়লা বহনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সামরিক প্রয়োজনে মালগাড়ী দেওয়ায় মাত্র নয় শত গাড়ী ব্যবহৃত হইতেছে। এ বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারের কোন হাত নাই। ভারত গবর্ণমেণ্টকে কয়লা সরবরাহ সম্পর্কে অবহিত হইবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি।

মাতৃভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী"

চতুর্থ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪৯ | ১০ম সংখ্যা

গুপ্ত-সম্রাট্‌দের বংশাবলী ও কাল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সৌরাষ্ট্রপতি শিলাদিত্যের নির্দ্দেশে ধনেশ্বর সূরী ৪৭৭ বিক্রমাব্দে বলভী নগরীতে শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য রচনা করেন। এই সৌরাষ্ট্রপতি শিলাদিত্যকে মহাবীরের ৪৭০ বৎসর পরবর্ত্তী অর্থাৎ (৫২৮—৪৭০) খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮ অব্দের বিক্রমাদিত্যের ৪৭৭ বৎসর পরবর্ত্তী লোক বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। সুতরাং উল্লিখিত বলভী-রাজ শিলাদিত্য (৪৭৭—৫৮) ৪১৯ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। এখন, প্রথম শিলাদিত্যের প্রথম অনুশাসনের তারিখ ২৮৬ সম্বৎ এবং তাঁহার পিতা দ্বিতীয় ধরসেনের শেষ অনুশাসনের তারিখ ২৭০ সম্বৎ। যদি স্বীকার করা যায় যে, প্রথম শিলাদিত্য ২৭১ সম্বতে অর্থাৎ ডাঃ ফ্লীটের মতানুযায়ী ৫৯০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে ১৭০ বৎসর পূর্ব্বে একজন শিলাদিত্যকে বলভীতে রাজত্ব করিতে আমরা দেখিতে পাই। শুধু এই একটি মাত্র প্রমাণ হইতেই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে, ডাঃ ফ্লীটের যুগ নির্দ্ধারণে অন্ততঃ প্রায় ১৭০ বৎসরের ভুল আছে। বস্তুতঃ শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্যের শিলাদিত্য সপ্তম শিলাদিত্যের পুত্র অষ্টম শিলাদিত্য ব্যতীত আর কেহ নহেন। সপ্তম শিলাদিত্যের অনুশাসনের তারিখ আমরা পাইয়াছি ৪৪৭ সম্বৎ।

গুপ্ত-বিক্রমাদিত্য অব্দ যে বিক্রমাব্দের সহিত অভিন্ন তাহা দ্বিতীয় ধরসেনের কাথিয়াবাড় অনুশাসন হইতেও প্রমাণিত হইবে। এই অনুশাসনের তারিখ ২৫৭ সম্বৎ, বৈশাখ মাস, কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশী তিথি (অমাবস্যা,) উপলক্ষ সূর্য্যগ্রহণ। ডাঃ ফ্লীটের যুগ-নির্দ্ধারণ অনুযায়ী ২৫৭ সম্বৎ = ৫৭৬ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু এই বৎসরে অর্থাৎ ৫৭৬ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে কিম্বা পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের বৈশাখ মাসে কোন সূর্য্য গ্রহণ হয় নাই। ২৫৭ সম্বৎকে বিক্রমাব্দ ধরিলে উহা ১৯৯ খৃষ্টাব্দ হয়। এই বৈশাখ মাসে অর্থাৎ ১৩ই এপ্রিল তারিখে একটি আংশিক সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ২৫৭ অতীত সম্বৎ, তাহা হইলে তারিখ দাঁড়ায় ২০০ খৃষ্টাব্দ। এই বৎসর ১লা এপ্রিল তারিখে পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষে উহা আংশিক গ্রাস রূপে দেখা গিয়াছে। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মিঃ ডি, বি দিস্কলকর এম-এ (D. B. Diskalkar M-A) মূল অনুশাসন পাইয়াছিলেন। তিনি তারিখটিকে বরাবরই (তিন চার বার) '২৫৭' পড়িয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এই অনুশাসনের সঙ্কলন করিয়াছেন (E.I. Vol. XXI pp. 179—81) এবং তারিখটিকে ২৫৭ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ডাঃ ফ্লীটের নির্দ্ধারিত গৌপ্তাব্দের যুগের সহিত গণিত জ্যোতিষের ঘটনাবলীর মিল রাখিবার জন্যই বোধ হয় Epigraphia Indica-র তৎকালীন সম্পাদক রাও বাহাদুর কে, এন, দীক্ষিত উক্ত তারিখটিকে পরিবর্ত্তন করিয়া '২৫৪' সম্বৎ করিয়াছেন। মূল অনুশাসনটি হারাইয়া যাওয়ায় মিঃ দিস্কলকর (Mr. Diskalkar) উহার যে প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছিলেন তাহা দৃষ্টেই রাও বাহাদুর দীক্ষিত উক্ত তারিখটির পাঠ ২৫৪ সম্বৎ স্থির করিয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই লেখক কর্ত্তৃক বহু

পত্রালাপের পর উক্ত প্রতিলিপির যে কপি Epigraphia Indica-য়* অবশেষে ছাপা হইয়াছে তাহা দৃষ্টে কি ডাঃ ডি, আর, ভাণ্ডারকর, কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ডি, সি সরকার কেহই শেষ সংখ্যাটিকে '৭' অথবা '৪' বলিয়া পড়িতে পারেন নাই। সুতরাং রাও বাহাদুরের পাঠ প্রমাণিকতাশূন্য এবং ডাঃ দিসৃকলকরের মত পণ্ডিত ব্যক্তি উহার পাঠ ২৫৭ বলিয়া যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহাই ঠিক বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। কারণ, মূল অনুশাসনটি তিনি নিজে দেখিয়াছিলেন। এই তারিখটি যে বিক্রমাব্দ তাহা উক্ত রাজার ২৬৯ সম্বতের আর একটি অনুশাসন হইতেও প্রমাণিত হইবে। এই অনুশাসনে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ধরসেনের পিতা গুহসেন (অনুমান ২৪০ সম্বতে) আচার্য্য ভদন্ত স্থিরমতির জন্য একটি বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এই ২৪০ সম্বৎ ডাঃ ফ্লীটের যুগ-নির্দ্ধারণ অনুযায়ী ৫৬০ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু আচার্য্য স্থিরমতির মহাযানবাদের উপক্রমণিকা ('Introduction to Mahayanism) ৪০০ খৃষ্টাব্দে চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এই বিষয়টি, গোকক-ফলকের প্রমাণ এবং অন্যান্য আরও প্রমাণ হইতে ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, ডাঃ ফ্লীটের নির্দ্ধারিত গৌপ্তাব্দের আরম্ভ কালানুযায়ী বৎসরে জ্যোতিষিক ঘটনাবলীর মিল করিতে যাওয়া বৃথা চেষ্টা।

এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে যাহা বিবৃত হইল তাহা এবং আরও অসংখ্য ভারতীয়, চীনা এবং তিব্বতীয় সাহিত্য, এবং মুদ্রা-প্রমাণ হইতে ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয় যে, গুপ্ত বিক্রমাদিত্য প্রবর্ত্তিত অব্দই খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮ অব্দে প্রবর্ত্তিত সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাব্দ এবং গুপ্ত-সম্রাট্‌দের রাজত্বকাল ডাঃ ফ্লীটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে আরম্ভ হয় নাই, আরম্ভ হইয়াছে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে।

বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝাইবার জন্য (ক) এবং (খ) পরিশিষ্টে বংশাবলী এবং সম-সাময়িক ব্যক্তিদের একটি তালিকা এখানে প্রদত্ত হইল।

পরিশিষ্ট (ক)

পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্ত-বিক্রমাদিত্য সম্রাট্‌গণ

গুপ্ত
|
ঘটোৎকচ
|
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (২৬ সম্বৎ = ৩২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত)
|
সমুদ্রগুপ্ত (২৬ — ৫৮ সম্বৎ = ৩২ — ০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ)
|
- রামগুপ্ত (সং ৫৯ = ১ খৃঃ অঃ)
- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (সং ৬০ — ৯৩ = ২ — ৩৫ খৃঃ অঃ)
  - প্রথম কুমারগুপ্ত (সং ৯৩ — ১৩৬ = ৩৫ — ৭৮ খৃঃ অঃ, সিংহাসন ত্যাগ ১৩৬ সম্বৎ, মৃত্যু ১৫৫ সং = ৯৭ খৃঃ অঃ। (মালবগণ অব্দ ৪৯৩ এবং ৫২৯ — ৯৩ এবং ১২৯ বিক্রম সম্বৎ)
    - স্কন্দগুপ্ত (১৩৬ — ১৫৫ সং — ৭৮ — ৯৭ খৃঃ অঃ)
    - বুধগুপ্ত (১৫৬ — অনুমান ১৮০ সং = ৯৮ — ১২২ খৃঃ অব্দ)
      |
      নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য (অনুমান ১৮৫ — ২১৫ সং = ১২৭ — ১৫৭ খৃঃ অঃ)
      |
      দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত (অনুমান ২১৫ — ২৩০ সং = ১৫৭ — ১৭২ খৃঃ অঃ)
      |
      বিষ্ণুগুপ্ত (অনুমান ২৩০ — ২৪০ সং = ১৭২ — ১৮২ খৃঃ অঃ)
    - ঘটোৎকচগুপ্ত (অনুমান ১৮০ — ১৮৪ সম্বৎ = ১২২ - ১২৬ খৃঃ অঃ)
  - গোবিন্দগুপ্ত (মালবগণ অব্দ ৫২৪ = ১২৪ গুপ্তবিক্রম সম্বৎ = ৬৬ খৃষ্টাব্দ)

পরিশিষ্ট (খ)

সমসাময়িক ব্যক্তিগণের তালিকা

গুপ্ত সম্রাট্‌গণ	কুশান এবং অন্যান্য নৃপতি	বৌদ্ধ আচার্য্যগণ প্রভৃতি	অন্ধ্র-নৃপতিগণ
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ২৬ সম্বৎ পর্য্যন্ত	কনিষ্ক (১—২৩ সম্বৎ) বসিষ্ক (২৪—২৮ সম্বৎ)	কালিদাস (অনুমান ৭০ সম্বৎ পর্য্যন্ত) অশ্বঘোষ (অনুমান ৭০ সম্বৎ পর্য্যন্ত) নাগার্জ্জুন (অনুমান ১০৮ সম্বৎ পর্য্যন্ত)	হাল মন্তলক
সমুদ্রগুপ্ত (২৬—৫৮ সং)	হুবিষ্ক (২৮—৬০ সং)		গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী (৪৬ সম্বৎ)
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৬০—৯৩ সম্বৎ)	দ্বিতীয় কনিষ্ক বা কণিক (৪১—৭৩ সং) বাসুদেব (৭৪—৯৮ সং)	আর্য্যদেব (অনুমান ৬৫—১২০ সং)	
কুমারগুপ্ত (রাজত্বকাল = ৯৩—১৩৬ সং ; সিংহাসন-ত্যাগ = ১৩৬ সং ; মৃত্যু = ১৫৫ সং		বুদ্ধমিত্র (অনুমান ১১৯—১৫৯ সং)	যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণী (অনুমান ১০৯—১৩৮ সং)
স্কন্দগুপ্ত (১৩৬—১৫৪ সং)		স্থূর (১৫৪ সং পর্য্যন্ত) শান্তিদেব (১৮৮ সম্বতের পূর্ব্বে)	
বুধগুপ্ত (১৫৬—১৮০ সং)	তোরমান (শকাব্দ ৫২ = ১৩০ খৃঃ অঃ = ১৮৮ বিক্রম সম্বৎ = ৫৮৮ মালবগণ অব্দ)	বসুবন্ধু (অনুমান ১৫০—২০০সম্বৎ)	
ঘটোৎকচগুপ্ত (অনুমান ১৮০—১৮৪ সং)			
নরসিংহগুপ্ত (অনুমান ১৮৫—২১৫ সং)	মিহিরকুল (১৮৯—২১০ সং) যশোধর্ম্মা (মালবগণ অব্দ ৫৮৯ = ১৮৯ বিক্রম সং)	স্থিরমতি (অনুমান ২০০—২৪০ সম্বৎ)	
দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত (অনুমান ২১৫—২৩০ সং)			
বিষ্ণুগুপ্ত (অনুমান ২৩০—২৪০ সং)			

সম্পাদকীয় মন্তব্য

দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর যাবৎ এই প্রবন্ধের লেখক অধ্যাপক শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গৌপ্তাব্দের আরম্ভ কাল সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন এবং প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন। ১৯৪০ সালে লাহোরে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের সভাপতি ডক্টর এস্, কে আয়াঙ্গার ধীরেন্দ্রবাবুর নিকট এক পত্র লিখেন। তাঁহার উক্ত পত্রের উপদেশ অনুযায়ী ধীরেন্দ্রবাবু "on the Genealogy and Chronology of the Early Imperial Guptas" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেন। উক্ত প্রবন্ধ ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের বিগত হায়দারাবাদ (দাক্ষিণাত্য) অধিবেশনে পঠিত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি তাহারই বঙ্গানুবাদ। ধীরেন্দ্র বাবু তাঁহার নিকট লিখিত ডক্টর এস, কে আয়াঙ্গারের পত্রখানি মাতৃভূমি সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়াছেন। নিম্নে ঐ পত্র প্রকাশিত হইল। ডক্টর আয়াঙ্গার গৌপ্তাব্দের আরম্ভকাল সম্বন্ধে উক্ত পত্রের একস্থানে বলিয়াছেন, It iS a qustion of exploring opinion." গৌপ্তাব্দের আরম্ভকাল সম্বন্ধে ধীরেন্দ্রবাবুর গবেষণার প্রতি আমরা বাংলার ঐতিহাসিকবৃন্দের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্ত-সম্রাট্‌দের কাল নির্দ্ধারণ সম্পর্কে ডাঃ ফ্লীটের মতবাদই এখন পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাস রচনায় অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। মৌর্য্যবংশের পতনের পর শুঙ্গ এবং কান্ব বংশের রাজত্বকাল। কিন্তু তাহার পর হইতে ডাঃ ফ্লীটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় কাল ৩২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত ইতিহাসে প্রায় পৌনে চারিশত বৎসরের একটা ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ধীরেন্দ্র বাবু ডাঃ ফ্লীটের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত প্রমাণিত করিয়া গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় কাল ৩৭৭ বৎসর আগাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে ভারত ইতিহাসের উল্লিখিত ফাঁকটি যেমন পূর্ণ হইয়াছে, তেমনি গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর পরাক্রান্ত বলভী রাজগণের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট স্থান ও কাল নির্দ্দেশ করিবারও একটা সুযোগ পাওয়া যাইতেছে। ডাঃ ফ্লীটের সিদ্ধান্তকে মানিয়া লইলে গুপ্ত-সম্রাজ্যের পতনের পর হর্ষবর্দ্ধনের বাংলার রাজাদের জন্য স্থান, কাল নির্দ্দেশ করিয়া সৌরাষ্ট্রাধিপতি বলভীরাজাদের জন্য দশ বৎসরের বেশী সময় পাওয়া যায় না। অথচ ভারত ইতিহাসের আড়াই শত বৎসর কাল যে বলভী রাজারা সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন তাহা সকল ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। সুতরাং গুপ্তবংশের পতনের পর বলভী রাজাদের জন্য যদি স্থান ও কাল নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় কাল ৪৭৭ বৎসর আগাইয়া দিলেও গুপ্তবংশের পতন হইতে হর্ষবর্দ্ধনের অভ্যুদয় কালের ভারত ইতিহাসে কোন ফাঁক থাকে না, যদিও এই সময়ের সুসংবদ্ধ ইতিহাস নূতন করিয়া রচনা করিবার প্রয়োজন হয়।

আমাদের বিশ্বাস, ডাঃ ফ্লীটের মতবাদ যে ভ্রান্ত তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ধীরেন্দ্রবাবু নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উহাই এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। গুপ্তসাম্রাট্‌দিগকে শুধু কালচ্যুত না করিয়া তাঁহাদিগকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গঠন-মূলক কাজও তিনি করিতেছিলেন এবং গুপ্তসাম্রাজ্যের অভ্যুদয় কাল খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে লইয়া গেলে বর্ত্তমানে সত্য বলিয়া গৃহীত ঐতিহাসিক ঘটনা সংস্থানের যে-সকল নড়চড় হইবে তাহার ব্যাখ্যাও তিনি যথাসম্ভব বিভিন্ন প্রবন্ধে করিতেছেন।

ডাঃ ফ্লীটের মত খণ্ডন করিয়া ধীরেন্দ্র বাবু ভারত-ইতিহাসের জন্য একটি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। গুপ্তাব্দ বিক্রম সম্বতের সহিত অভিন্ন হইলে ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের যুগ সম্বন্ধেও আর কোন সন্দেহ থাকে না। এখানে স্বনামধন্য অধ্যক্ষ এস্ রায়ের "Age of Kalidasa" শীর্ষক সন্দর্ভের কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তিনি external এবং internal উভয় বিধ প্রমাণ দ্বারা কালিদাসকে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ধীরেন্দ্র বাবুও ঐ প্রবন্ধটি নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবেন।

গুপ্তাব্দ এবং বিক্রমাদিত্যের একত্ব এবং কনিষ্ক ও প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িকত্বের প্রমাণ ধীরেন্দ্রবাবু বিবিধ প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য ইহা-ই প্রচলিত মত। ধীরেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্ত

অনুযায়ী প্রথম **চন্দ্রগুপ্তই** সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য এবং তিনিই দিগ্বিজয়ের পর ৫৭-৫৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে প্রচলিত বিক্রমাব্দের প্রচলন করেন। সমুদ্রগুপ্তের বিপুল দিগ্বিজয়ের পর দ্বিতীয় **চন্দ্রগুপ্তের** দিগ্বিজয় করিবার প্রয়োজন ছিল না, ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। কনিষ্কের সাম্রাজ্য এবং গুপ্ত-সাম্রাজ্য যে পাশাপাশি ছিল তাহাও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধে এই সকল সিদ্ধান্তের প্রমাণ তিনি আলোচনা করিতেছেন। সুতরাং কনিষ্কের সাম্রাজ্য বরণাসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকা ধীরেন্দ্রবাবুর মতে প্রমাণিত হয় না।

শকাব্দ ১৩৬ সম্বৎ অর্থাৎ ৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রচলিত হইয়াছে। স্কন্দগুপ্ত পিতাকর্ত্তৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৩৬ সম্বতে হূনদিগকে পরাজিত করিয়া গুপ্ত-সাম্রাজ্যকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করেন। এই ব্যাপারে তিনি যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণীর সাহায্য পাইয়াছিলেন। ৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রচলিত শকাব্দের আর এক নাম শালিবাহন শকাব্দ। শকাব্দের প্রচলন সম্বন্ধে ইহাই ধীরেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্ত।

পূর্ব্ববর্ত্তী-গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় কাল খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধীরেন্দ্র বাবু ভারত ইতিহাসের একটা মস্ত অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এখনও অনেক পরিশ্রম তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে। এখানে এসম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত মাত্রই দেওয়া সম্ভব হইল। তাঁহার সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিকগণ কবে গ্রহণ করিবেন সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। ঐতিহাসিকগণের মানসিক complexও তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণে কম বাধা সৃষ্টি করিবে না। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিকগণেরও এই মানসিক complex দূর হইবে, ইহাই আমরা আশা করিতেছি। কিন্তু মৌর্য্য বংশের পতনের পর হইতে হর্ষবর্দ্ধনের অভ্যুদয় পর্যান্ত কালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রমাণ, ব্যাখ্যা এবং বিচার সমগ্রভাবে পুস্তাকাকারে প্রকাশ করা প্রয়োজন। তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রতি ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আকর্ষণের পক্ষেও এইরূপ গ্রন্থ অপরিহার্য্য। একদিন তাঁহার সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিকগণ গ্রহণ না করিয়া পারিবেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। আমরা তাঁহার গবেষণার সাফল্য কামনা করিতেছি।

সম্পাদক, মাতৃভূমি

(লেখকের নিকট লিখিত ডাঃ আয়েঙ্গারের পত্র)

(True Copy)

Madras. S.
15-8-41.

Dear Sir,

I have your long letter, dated the 10th instant. I quite see your position in respect of the matter of the Gupta era being identical with the Vikrama Samvat. It is because I felt that the line of evidence upon which you have been working seems definitely to indicate this identity that I thought we might as well reconsider the whole position, if need be, by a special symposium for the discussion of the matter, so that there might be some kind of a considered opinion upon the question. That is why I said you might put the case as fully as ever you can from the side of the astronomical detail on which you have done the most work. I know the papers that you wrote, and have read them from time to time. But that is not enough for the purpose. I mean it might do for my purpose. It is a question of exploring opinion. It is the more important and perhaps even urgent, now that we are on a scheme of Indian History to be brought out under the authority of the Indian History Congress. It would be just as well that the whole question should be considered fully and discussed to the extent possible, with a view to a possible unanimity of opinion. It may not be a bad idea if you should work up the material for a dicussion and present it to the coming session of the Indian History Congress, and perhaps we may arrange for a discussion of the subject in the Congres. I want you to consider the possibility of this. If you are agreeable, possibly we might get the local Committee in Hyderabad to take it up and get about a special discussion on the occasion of either the Oriental Conference or the Indian History Congress or a joint meeting of the two. You may make the paper as short as the subject would permit and make it clear-cut, so that the issues may be clear and the discussion on points quite definite. I take it you understand my point of view, and it would be a very good thing done if you can have it done. Kindly let me know what you propose doing. I shall then be in a position to correspond with the authorities of the Congress as well as the Conference in Hyderabad in respect of the matter. Kindly let me have your reply as early as you conveniently can.

Thanking you in anticipation.

Yours Sincerely,
(Sd.) S. Krishnasvami Aiyangar.

[Epigraphia Indica, Vol. XXIV, between p. 256-57.]

ভ্রমসংশোধন—আশ্বিন সংখ্যা মাতৃভূমির ৫১৮ পৃষ্ঠার প্রথম কলামের ২৪ লাইনের প্রথম শব্দ 'যে' শব্দটি উঠিয়া যাইবে এবং 'বর্ণমালা' শব্দের পর একটি , (কমা) বসিয়া তৎপর যাহা শব্দটি বসিবে।

থাক্ পড়ে থাক্

শ্রীনিভা দেবী

জগত আজি রয়েছে কান পাতি,
দিগন্ত ঐ অশরীরীর কণ্ঠে
ওঠে মাতি।
মাতাল হাওয়া দিল দোলা
থাক্ পড়ে থাক পুষ্প তোলা
বসন্ত থাক শুষ্ক ধুলায় লুটি
যাক্ ঝরে যাক্ কুসুমকলি
বৃন্ত পরে ফুটি'।
সবুজ পাতা দোদুল দোল
ঝরা পাতায় পূর্ণ হোল
বৈশাখেরি রুদ্র দোলায় দুলি
সুরের বিফল প্রয়াস শাখীর
চঞ্চু দুয়ার খুলি'
শ্রাবণ কাঁদে অন্ধ আঁখি
ব্যথায় ছোঁয়ার আর কি বাকী,
শরত-শোভার গোপন
অন্তরালে
সবহারাদের দহন জ্বালা
হাসির শিখায় জ্বলে।
হিমের অঙ্গ ব্যথার ভারে
পড়্‌লো ঢাকা লাজ তুষারে
থাক্ ঢাকা থাক্ তীব্র হসন্তিকা
অপেক্ষিয়া উন্মোচিতে
যুগের যবনিকা।

ইস্‌ক্রা ও প্রাভ্‌দা

শ্রীস্মরজিৎ দাশগুপ্ত এম-এ, বি-এল

লেনিন লিখিয়াছেন, "সংবাদপত্রের কর্ত্তব্যভার মাত্র প্রচারকার্য্য চালান বা আন্দোলন সৃষ্টি করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সংবাদপত্রকে দেশের গণশক্তিও সংগঠিত করিতে হইবে।" পৃথিবীর অন্যতম সর্ব্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র হিসাবে রাশিয়ার 'ইস্‌ক্রা' ও 'প্রাভ্‌দা'র সার্থকতা বস্তুতঃপক্ষে লেনিনের এই আদর্শকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

১৮৯৮ সাল। রাশিয়ার মার্ক্সবাদীরা তখনও পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে নাই। সেণ্ট পিটার্সবার্গ, মস্কো, কিয়েভ, ও একাটারিনোস্লাভের শ্রমিক-সঙ্ঘগুলি যদিও ইহুদী সমাজতান্ত্রিক দল বাণ্ডের সহিত একযোগে মিন্‌স্কে নিখিল রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকদলের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তথাপি কার্য্যতঃ তাহাতে কোনই ফল হয় নাই। বিভিন্ন মার্ক্সবাদী সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানগুলি পূর্ব্বের মতই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়া গেল। দলের নিজস্ব কোন নিয়ম-পদ্ধতি রচিত হইল না, কোন প্রধান কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হইল না, বা কোন সর্ব্বব্যাপক ও সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যসূচীও গৃহীত হইল না। প্রতিক্রিয়াশীল নারদনিক দল (ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির সংঘাতে বিধ্বস্ত ক্ষুদে জমিদার-শ্রেণীভুক্ত সন্ত্রাসবাদী প্রতিষ্ঠান) তখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। উপরন্তু রুটির লড়াইওয়ালা ইকনমিষ্ট, আইন-অনুগ লিগ্যাল মার্ক্সিষ্ট প্রভৃতি সুবিধাবাদীরা ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল এবং নিজেদের সুবিধামাফিক মার্ক্সবাদকে বিকৃত করিয়া লইতেছিল।

লেনিন এসময়ে সাইবেরিয়ার সশেন্‌স্কোয়ে গ্রামে নির্ব্বাসিত। সুবিধাবাদিগণ কর্ত্তৃক মার্ক্সবাদের অপব্যাখ্যার সংবাদ জানিতে পারিয়া সাইবেরিয়াতেই তিনি ১৮৯৯ সালে নির্ব্বাসিত মার্ক্সবাদীদের লইয়া এক সম্মেলন করেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই এক মার্ক্সবাদী সংবাদপত্র প্রকাশের সংকল্প তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। অনতিকাল পরে ১৯০০ সালের প্রথম ভাগে মুক্তিলাভ করিয়া লেনিন এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ তখন রাশিয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, আসিবার পথে লেনিন তখন উফা, পস্কোভ, মস্কো ও সেণ্টপিটার্সবার্গের মার্ক্সবাদী কর্ম্মীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা লইয়া তাঁহাদের সহিত আলোচনা করেন। এক প্রবন্ধে এই সময়ে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমাদের মতে আমাদের কর্ম্মতৎপরতার মূল ভিত্তি, আমাদের সংগঠন প্রচেষ্টার প্রাথমিক সোপান, এবং সর্ব্বশেষে আমাদের সংগঠনকে সম্প্রসারিত, কার্য্যকরী ও ক্রমবিকাশিত করিবার প্রথম সূত্র, নিখিল রাশিয়া ব্যাপী এক রাজনৈতিক সংবাদপত্রের প্রকাশের মধ্য দিয়াই সূচিত হইবে।...বর্ত্তমানে যখন জনসাধারণের এক অত্যন্ত বৃহৎ অংশের মধ্যে রাজনীতি বিশেষ করিয়া সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে কৌতূহল দেখা দিয়াছে, তখন সমাজতান্ত্রিকদের মূল প্রধান কর্ত্তব্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এইরূপ এক সংবাদপত্র প্রকাশ করা ছাড়া আর কোন রূপেই আমরা দেশব্যাপী প্রচার ও আন্দোলন-কার্য্য নিয়মিতভাবে চালাইতে পারিব না।" এই সংবাদপত্রই দলের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র রচনা করিবে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি আরও বলেন, "আমাদের দেশব্যাপী এক অখণ্ড দল সংগঠন করিতে হইবে। দলের কার্য্যকলাপ বহুমুখী হইবে এবং তাহার সদস্য সংখ্যাও এরূপ হইবে যে, তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন কাজ সুনির্দ্দিষ্ট ও বিস্তারিত ভাবে যেন ভাগ ভাগ করিয়া দেওয়া যায়। যে কোন বিপদ বা যে কোন অবস্থাই আসুক না কেন দলকে তাহার কর্ত্তব্য ভার অবিচলিতভাবে সম্পাদন করিতে হইবে। অত্যন্ত শক্তিশালী শত্রু যদি সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া আঘাত করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে

ইত্যাদি হইতে প্রাভ্‌দা মেনশেভিকদের অপসারিত করিতে সক্ষম হয়। এই প্রচেষ্টার ফলে ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মের সময়ে দেখা যায় যে, রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন শ্রমিকদের মধ্যে পাঁচ ভাগের চারি ভাগই বলশেভিক দলভুক্ত হইয়াছে এবং বলশেভিক মতবাদ গ্রহণ করিয়াছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রেই রহিয়াছে এবং তখনও তাহা ছিল। কিন্তু প্রাভ্‌দার বিশেষত্ব ছিল এই যে প্রাভ্‌দা নিজস্ব সংবাদদাতার মারফৎ জনসাধারণের সহিত সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিত। তাহার অসংখ্য সংবাদদাতাদের প্রত্যেকেই ছিল হয় খাঁটি শ্রমিক নয়ত খাঁটি কৃষক। ফলে এই সকল সংবাদ-দাতারা প্রত্যহ নিজ নিজ এলেকা হইতে যে সকল সংবাদ সরবরাহ করিত তাহাতে জনসাধারণের অন্তরের কথাই প্রতিফলিত হইত। দেশ সত্য-সত্যই কি চায় সে তাহা সহজেই অনুধাবন করিতে পারিত। জনসাধারণের সহিত সংযোগ রক্ষাকল্পে প্রাভ্‌দা আরও এক বিশেষ নীতি অনুসরণ করিত। প্রত্যহ বহু সংখ্যক শ্রমিক ও কৃষক প্রাভ্‌দার সম্পাদকীয় কক্ষে আসিয়া সমবেত হইত। প্রাভ্‌দার সম্পাদকমণ্ডলী ও সহযোগী সম্পাদকগণ তাহাদের সহিত বিভিন্ন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। কিন্তু এই আলাপ-আলোচনা ও সংবাদ আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া প্রাভ্‌দা আরও একটি বিশেষ কাজ সম্পন্ন করিয়া লইত। ইহা গঠনমূলক কাজ। দলের মিল্‌-কারখানার ইউনিয়ান, কৃষক-প্রতিষ্ঠান, সেণ্ট পিটার্সবার্গ কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে প্রাভ্‌দা সংযোগরক্ষার কাজও চালাইয়া যাইত। প্রাভ্‌দার সম্পাদকীয় কক্ষ হইতেই নিজস্ব সংবাদ-দাতাদের মারফৎ সেণ্ট পিটার্সবার্গ কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশ বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত।

১৯১৪ সালের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমবর্দ্ধমান বলশেভিক শক্তিতে ভীত হইয়া জার শেষ বারের জন্য প্রাভ্‌দার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। গৃহ-যুদ্ধের সময়ে কেরেনস্কি গবর্ণমেণ্ট এবং মেনশেভিকরাও একবার ক্ষিপ্ত হইয়া প্রাভ্‌দার অপিস ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল এবং নির্ম্মমভাবে প্রাভ্‌দার প্রকাশ বন্ধ করিয়াছিল। তাহারা প্রাভ্‌দা বুলেটিন বিক্রেতাদের ধরিয়া ধরিয়া হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু 'ইস্‌ক্রা' যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল এবং প্রাভ্‌দা যাহা সংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল কোন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই সে অগ্নির গতি নিরুদ্ধ করিতে পারে নাই। বস্তুতপক্ষে ইস্‌ক্রা ও প্রাভ্‌দার পক্ষচ্ছায়ায় থাকিয়া সমগ্র রাশিয়াতে একদল নূতন মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল—১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে তাহারাই বলশেভিক বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। ষ্টালিন বলিয়াছেন, "১৯১২ সালে প্রাভ্‌দা যে ভিত্তিফলক স্থাপন করিতেছিল তাহাই ১৯১৭ সালে বলশেভিকদের বিজয়ে রূপান্তরিত হইয়াছিল।"

বিপ্লবের অগ্নিদাহনে যখন খাঁটি সোনা বাহির হইয়া আসিল তখন স্ফুলিঙ্গের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। তখন সত্য আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। নবীন রাশিয়াকে গড়িয়া তুলিবার ভারও তাই প্রাভ্‌দার উপরেই ন্যস্ত হইল। বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই—বর্ত্তমানে প্রাভ্‌দার (মাত্র সংবাদপত্র বিভাগ) দৈনিক প্রচার সংখ্যা ২০ লক্ষেরও অনেক বেশী।



কবচ

(গল্প)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

বিপুল উকীল বড়ভাইয়ের গুরুদেব হরনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের হাত হইতে সার্টিফিকেটখানা লইয়া তাহার পায়ে দুই হাতের থাবা মেলিয়া প্রণাম করিয়া হাসিয়া তাহার অন্দরমহল দেখাইয়া দিলেন। শাস্ত্রী আসিয়াছেন বিত্তশালী বিপুলকে দীক্ষা দিয়া কিছু পৌনঃপুনিক ত্যাগ-ব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য।

শাস্ত্রী অন্দরমহলে ঢুকিয়াই উকিলের সহধর্ম্মিণীকে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন—এই লক্ষ্মীর আবাসও শূন্য-পুরীর মত খাঁ-খাঁ করছে, সমস্ত সুখশান্তি নষ্ট হয়ে গেল; আজ যদি বিপুলের একটি সন্তানও থাকত তবু এই মা যশোদার জীবনটা সার্থক হ'ত। বিপুলের দাদা যদি একথা আমাকে আগে বলত তবে কবে এই দোষ কাটিয়ে দিতাম—

শাস্ত্রীর মা যশোদা অর্থাৎ বিপুলের স্ত্রী চিত্রা হয়ত একটু ব্যথা মিশ্রিত দৃষ্টিতেই তাকাইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন, তাই হরনাথ তাঁহার বন্ধ্যাদোষ-নিবারক মাদুলীর বৈজ্ঞানিক প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই প্রশংসা চিত্রার মনে সন্তান-ক্রোড়রতা জননীর একখানি মনোরম ছবি আঁকিয়া দিল। যে বেদনাটা অহরহ এই সংসারে খোঁচার মত রহিয়াছে, যাহাকে ভুলিয়া থাকিবার জন্য শত রকমের চেষ্টা, তাহা যেন ভুলিয়াও ভোলা যায় না। চিত্রার চোখে একটি বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলিয়া যায় যেন। শাস্ত্রীর গলায় সোণার তারে গাঁথা ছোট চিক্কণ্ রুদ্রাক্ষের মালা আছে এবং তাহা হাতে ঘোরে, পরণে লাল সিল্কের গৈরিক, মুখে মা মা শব্দ। শাস্ত্রী মহাশয় জাঁকিয়া বসিয়াছেন। এমন সময় উত্তরের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন চিন্তানন্দ স্বামী! কোঁকড়ান চুল, ভাল করিয়া আঁচড়ান রেশমের মত দাড়ি, গায়ে নির্ম্মল গৈরিক উত্তরীয়, পরনে গৈরিকবাস, কাছা নেই। স্বামীজী হাসিয়া নমস্কার করিলেন শাস্ত্রী-মহাশয়কে।

শাস্ত্রী ও স্বামীজীর দুই জোড়া চোখ তাহাদের পরস্পরের দিকে প্রধাবিত হইল, মনে হইল, ঝগড়া বাধিবে, কিন্তু কিছুপর তাহাদের অন্তর্দৃষ্টি যথাস্থানে গিয়া প্রবেশ করিল, যেন চোখ দুই জোড়া পরস্পরকে শুঁকিয়া কি মনে করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিল, কিছুপর শাস্ত্রী কহিলেন--এই মাদুলীর কথা বলছিলাম। বিপুল এতদিনও নিঃসন্তান আছে এ যদি আমি ঘূণাক্ষরেও জানতাম তবে—

স্বামীজী কি চিন্তা করিয়া তাহার মাঝখানেই বলিলেন, আপনি ভগবান মানেন—

হরনাথ স্বামীজীর এবম্বিধ প্রশ্নে স্তম্ভিত হইয়া যান। সংসারে কোন মানুষ এত সহজে ঝগড়া করিতে পারে ইহা তাঁহার জানা ছিল না, তিনি তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—ভগবান মানি না মানে, আমরা অনন্তশক্তি শিবজয়াকে মানি, আপনাদের মত অমন ছড়ান ভগবানকে মানি না—

স্বামীজী তাঁহার দাড়িটা একটু টানিয়া আর একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া মুখে ভ্রূকুটী করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—হুঁ তা বুঝেছি—আপনাদের ভগবান যে কেমন মিছরীর দানার মত জমাট বেঁধে উঠেছে তা আর আমার জানতে বাকী নাই—

কি জেনেছেন—শাস্ত্রী রুক্ষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তেজনার প্রাবল্যে তাঁহার পশ্চাৎদিকটা চৌকী হইতে একটু নড়িয়া বসিল।

—জানিনি, নিশ্চয় জেনেছি, অনেক কিছু জেনেছি—আপনার ব্যবহারে জেনেছি মশায়, চব্বিশ বছর এ অধমকে

হিমালয়ে কাটাতে হয়েছে—অনেক কিছু দেখেছি। স্বামীজী দাড়ি আঁচড়াইতে লাগিলেন।

হরনাথ একবার মালাটা হাতে লইয়া 'মা, মা' বলিয়া হাই তুলিয়া হাতের টুসকী মারিয়া বলিলেন—আপনি বিয়ে করেছেন—

—এজ্ঞে, আমি ত্যাগী—

—ছাই ত্যাগী, বিয়ে করলে বুঝতেন স্ত্রী ত্যাগ করা কত কঠিন। মশাই একটার পর একটা তিনটে বে করেছিলাম, আবার একমুহূর্ত্তে তিনটে বউকেই ছেড়ে চলে এসেছি এই মালাটা সম্বল করে, আজ বিশ বছর কেটে গেল—হুঁ হুঁ মশাই হিমালয়ের চেয়েও পাষাণ বনে' গেছি—একটু দম লইয়া শাস্ত্রী পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—উঁঃ ত্যাগী, আরে যার কিছু নাই সে ত্যাগ করবে কিগো—ছেলেমানুষ একেবারে ছেলেমানুষ—

ইঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া ছেলেমানুষ নন্দকিশোর পড়িবার ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া 'নারদ' 'নারদ' বলিয়া হাতে তালি দিতে লাগিল।

শাস্ত্রী মহাশয় নন্দকিশোরের এই ব্যবহারে তান্ত্রিকের মত চক্ষু দুইটিকে হিংস্র করিয়া তুলিলেন। দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁটটি চাপিয়া তীব্র রোষে বলিলেন—আচ্ছা ফচ্‌কে ত—

কিন্তু স্বামীজী নন্দকে দুই হাতে তুলিয়া তাহার মুখে দাড়ি বুলাইয়া তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। নন্দ হাসিতেছিল।

নন্দকিশোরের খুব শৈশবে তাহার মা মারা গিয়াছে, কেমন করিয়া এ সংসারে আসিল, সে জানিনা। তাহার পিতা দূরদেশে চাকরী করেন, আবার বিবাহ করিয়াছেন —নন্দর খোঁজ বড় একটা করেন না, সময়ও পান না। এই চিত্রাই তাহার মা হইয়া দাঁড়ায়াছে—সে কোন অভাব বোধ করে না। চিত্রারও মাতৃত্বক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়াছে যেন এই নন্দকে পাইয়াই।

দুপুরবেলা নন্দ কি কাজে ঘরে আসিয়া দেখিল গুরুদেবের পা টিপিতেছে তাহার মা তাঁহারই পায়ের তলায় বসিয়া। মুহূর্ত্তে নন্দের সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল, কি জানি কেন, নন্দ এই শাস্ত্রীকে যেন কিছুতেই দেখিতে পারেনা। তাহার কবচ তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে যেন। মায়ের এই অধঃপতন নন্দ সহ্য করিতে পারে না, সে রাগিয়া মাকে টানিয়া শাস্ত্রীর পায়ের কাছ হইতে সরাইয়া বলিল—আচ্ছা মা, তুমি যারতার পায়ে অমন হাত দাও কেন?

চিত্রা সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—ছিঃ বাবা, গুরু।

—হুঁ গুরু শুয়ে শুয়ে তামাক টানবেন আবার তাঁর পা টিপে দেবার জন্যে লোকের দরকার। জান মা, লোকটা তিন বে করেছে—একটাকেও খেতে দ্যায় না—আমি সব শুনেছি

যে লোক একাধিকবার বিবাহ করে তাহার উপর নন্দর রাগ আছে—বোধহয় তাহার মনে এই জাতীয় লোকের প্রতি গুরুতর অভিযোগ জমা হইয়াছে, বোধহয় এই প্রসঙ্গে তাহার পিতার ব্যবহারটির কথাও মনে পড়ে। শাস্ত্রী তামাক টানিতেছিলেন, এইবার উঠিয়া নন্দকে তীব্র এক চপটাঘাত করিলেন। নন্দ সে আঘাত সামলাইতে না পারিয়া মেঝেয় পড়িয়া গেল। শাস্ত্রী পুনরায় তাম্রকূটে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি রাশভারী লোক—কথার চেয়ে কাজ করেন বেশী। চিত্রার মনটি বিতৃষ্ণায় ভরিয়া যায়। সে ধীরে ধীরে নন্দকে মেঝে হইতে উঠাইয়া সস্নেহে পাশের ঘরে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

শাস্ত্রী কহিলেন—শোন, বৌমা—

চিত্রা দাঁড়াইল।

শাস্ত্রী মুখে একটু হাসি টানিয়া বলিলেন—তোমার ব্যবহারে আমার অপমান হচ্ছে বুঝতে পারছ, এখন না হয় আমি 'আমি' আছি কিন্তু দুদিন পরেই তোমাদের ত' গুরুদেব হচ্ছি, তখনও কি এইসব ডেঁপো ছোঁড়াদের তুমি আস্কারা দেবে—কেথোকার কে, কার ছেলে, এত লেপ্টার-ও তুমি বইতে পার বৌমা, সংসারে এতখানি জড়িয়ে পড়োনা, সংসারে থেকেই বৈরাগ্য আনতে হবে— মানে কাঁঠাল খাবে কিন্তু কাঁঠালের আঠা যেন না জড়ায়— হেঁ হেঁ হেঁ—

চিত্রা দেওয়ালে টাঙানো মহাদেবের ছবিখানার দিকে একবার তাকাইয়া নন্দকে বুকে টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

শাস্ত্রী মহাশয় একটু গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিতে যাইবেন

এমন সময় স্বামীজীর দাড়ি উঁকি মারিল ঠিক শাস্ত্রী মহাশয়ের ঘরের দরজাতেই। স্বামীজী একটু ইতস্ততঃ করিয়া চৌকাঠে হোঁচট খাইয়া ভিতরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন—আপনার কথাই ঠিক শাস্ত্রীমশাই, সংসার না করলে সংসার চেনা যায় না। অর্থাৎ এই নন্দ ছোঁড়াটা ভয়ানক ডেঁপো তার মায়ের আবার 'মা'র চেয়ে মাসী'র আধিক্যটা বেশী—এগুলো যে এমন অসহ্য তা আগে আমি বুঝতেই পারি নি—বাস্তবিক আমি অসাংসারিক অপদার্থ—

শুদ্ধ-শূন্য মুখে রোষ-কষায়িত চোখে শাস্ত্রী হাঁকিলেন—আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন?

—এজ্ঞে না, ছিঃ ছিঃ ধার্ম্মিককে নিয়ে ঠাট্টা করব এমন দুর্ম্মতি হবে আমার—ছিঃ ছিঃ—

স্বামীজী আরও বার দুই-তিন ছিঃ ছিঃ করিয়া বলিলেন—আমার কথাটা হচ্ছে কি জানেন—

শাস্ত্রী নল মুখে পুরিলেন, ভঙ্গীটাতে বোঝা গেল যেন অব্যক্ত ভাষায় বলিলেন—বলুন—আপনি বক্তৃতা দিতে পারেন—খুব ভাল বক্তৃতা—

গড়গড়ায় জোরে এক টান দিয়া বলিলেন—আমাকে আপনার মত বাক্যবাগীশ ঠাওরালেন নাকি—

—ন্-না—না তা নয়, আমার চেয়েও ভাল, মানে বিপুলবাবুকে দীক্ষা দেওয়া নিয়ে কথা বলছিলাম, লোকটা উকীল কি না, ওকে চার দিক থেকে সরলতা দিয়ে জড়িয়ে ফেলা দরকার। উকীল ঘোর প্যাঁচ যতই বুঝুক, সরলতার মার টের পায় না।

এইবার আপ্যায়িত সুরে শাস্ত্রী কহিলেন—অনুগ্রহ করে আপনি একটু চলুন আপনার সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে—

ইহাদের পরামর্শের প্রধান ফল দেখা গেল শাস্ত্রী কারণে অকারণে নন্দকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নন্দকে কাগজের নৌকা তৈয়ার করিয়া দেন শাস্ত্রী, তাহার সহিত ধাঁধা কষিতে থাকেন, সুতলীর প্যাঁচে তারের যন্ত্র গড়িয়া তোলেন। শাস্ত্রীকে দেখিয়া নন্দও অবাক হইয়া গিয়াছে। সেও আর শাস্ত্রীর নিকট সহজে আসিতে চায় না, তাহার সহিত ডেঁপোমীও করে না। অথচ শাস্ত্রীর প্রয়োজন নন্দকে দিয়াই, কারণ হয় ত স্বামীজীর সুপরামর্শ। হয় ত তাঁহারা বুঝিয়া গিয়াছেন চিত্রা নন্দকে ভালবাসে, তাই নন্দকে ভালবাসিয়া চিত্রাকে হাতে রাখা, ফলে বিপুলকে দীক্ষার জালে জড়াইয়া ফেলিবার কৌশল। হয় ত জালে জড়াইবার চারদিকের একদিক। তবুও শাস্ত্রীর ভুল হইয়া যায়। কোন সময় নন্দের ব্যবহারে হয়ত শাস্ত্রীর চোখ জ্বলিয়া উঠিল, অমনি স্বামীজী ডান চোখ টিপিয়া বসেন—আর মন্ত্রমুগ্ধের মত নন্দকে শাস্ত্রী কোলে তুলিয়া লন—তাঁহার চোখ দুইটি স্বামীজীকে তখন জিজ্ঞাসা করে—ঠিক হচ্ছে ত স্বামীজী। উত্তর প্রসঙ্গে দাড়িটি বাতাসে তুলিয়া ধরেন অর্থাৎ যেন বলেন, চমৎকার।

কিন্তু নন্দের দুষ্টামিটা বাহির হইতে ভিতরে আসিয়া পড়িল—শাস্ত্রীর নিকট হইতে চিত্রার মাদুলীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ কয়েকদিন হইতে সে কেবলই বায়না ধরিয়াছে, মাদুলী হাত হইতে খুলিতে হইবে। চিত্রা নন্দের কথায় একদিনও কান দেয় নাই। কিন্তু আজ চিত্রার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল প্রায়।

নন্দ বলিতেছিল—গুরু বলেছে ভাইটি হবে—ভাই হবে না ছাই হবে—

চিত্রা তাহার ভবিষ্যৎ সন্তানের অকল্যাণ ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—তোমার আবদার বড় বেড়ে গেছে নন্দ, চুপ করে বসে থাও নচেৎ—

—বেশ, চুপ করলাম। আমি খাবও না, আমি থাকব না, একদিক বলে চলে যাব। গাড়ীতে উঠে বসা আর ব্যস্ কোথায় যাব কেউ জানে না, ভালই হবে, ইস্কুল নেই, তুমি নাই, তোমার গুরু-না-হাতী সে নেই আমি একা—

নন্দ যেন আনন্দ করিতে থাকে।

—বেশ তাই যাও—চিত্রা গম্ভীর মুখে বলে।—

—উঁ যাব—যাব না, আমি রোদে ঘুরে ঠাণ্ডায় বেড়িয়ে অসুখ বানিয়ে বসব, পড়াশুনা না ক'রে বছর বছর ফেল করব—ঘুমিয়ে থাকলে তোমার কবচ চুরি করে নেব—

উত্তরের ঘর হইতে শাস্ত্রীর আর স্বামীজীর নাসিকাধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে, শাস্ত্রীয় আলোচনা করিতে

করিতে তাঁহারা বোধহয় এই দুপুরেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। সে ভীষণ আওয়াজ দিনের বেলাতেও এই পাকঘর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যেন দুইজন নাসিকাধ্বনি করিয়া ঝগড়া করিতেছেন। নন্দ কান পাতিয়া তাহা শুনিয়া হাসিয়া বলে—বল ত মা কুম্ভকর্ণ না—বাঘ—

চিত্রা তখন উনুনের পাশে বসিয়া গভীর চিন্তা করিতেছিল। নন্দের কথা তাহার কানে গেল না বোধ হয়। নন্দ ইহাতে অপ্রতিভ হইয়া পড়ে। মা কি তবে তাহার সহিত কথা কহিবে না! নন্দ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—আমি জানি, আমি সব জানি। ও বাড়ীর মাসিমা আমাকে বলেছে—বলেছে ভাইটি হ'লে নাকি সকলে আমাকে তাড়িয়ে দেবে—আমাকে খেতে দেবে না—

নন্দের চোখ দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। চিত্রা নন্দের শেষের কথাও হয় ত শুনিয়াছিল, তাহার চোখের জলও হয় ত নজরে পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত চেতনা যেন মনের কোন্ এক স্থানে যাইয়া আটক পড়িয়া গিয়াছে। নন্দ একবারও কোন সাড়া না পাইয়া তাহার সামনে রাখা খাবারের থালার দিকে বার দুই নজর ফেলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল; কোন কিছুই স্পর্শ করিল না।

এতক্ষণে নন্দের এই সব ছবি চিত্রার মনে সত্য হইয়া উঠিল, কিন্তু মনের চিন্তার আবেগেই সে হাত হইতে কবচ খুলিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠে—বাবা নন্দ—বাবা এই নে কবচ—আমি পরব না—তুই আয়—তুই ফিরে আয়—

কিন্তু সেকথা একমাত্র চিত্রা ছাড়া আর কেহই শুনিতে পাইল না। চিত্রা যখন বুঝিল সে একাই একথা বলিয়াছে তখন তাহার এক ভাবাবেগের লজ্জা আসিয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিল।

নন্দ কি একটা করিতে পারিয়া যেন খুশীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। তাহার মনে হয় এখন মার কাছে গল্পটা করা উচিত। কি করিয়াছে সেই জানে, কিন্তু সে নিজের মনেই হাসিয়া নাচিয়া আবার পাকঘরে আসিয়া বলে—আমি খেলাম না আর মানুষে বেঁচেছে, আমাকে একবার কেউই ডাকলেও না—

কিন্তু কথাটাতে দুঃখ ছিল না, ছিল কৌতুক। অথচ চিত্রার দিক হইতে সে কোন সাড়াই পাইল না। তাহার মজার কথাটা বলা হইল না—সে দেখিল মা কাঁদিতেছে, সামনে তাহার মাদুলী পড়িয়া। নন্দ কি মনে করিয়া মাদুলীটা লইয়া মায়ের হাতে বাঁধিয়া দিল—তার পর লক্ষ্মী ছেলের মত খাইয়া উঠিয়া যাইবার সময়ও দেখে মা তেমনই কাঁদিতেছে।

—বারে আমি সব ভাতকটাই ত খেয়েছি, পাতে এক মুঠিও ত রাখি নি—নন্দ ঠোঁট বাঁকাইয়া বলে।

চিত্রা আগাগোড়া সমস্তই দেখিয়াছিল এবং সেই জন্যই বোধ হয় সে চোখের জল রাখিতে পারে নাই।

নন্দ ব্যাপারটা আর একটু বুঝিতে চেষ্টা করিয়াও কিছুই বুঝিতে পারে না।

—বেশ, আমি কাউকে কিছুই বলি নি, তবু সকলে কেবল কাঁদবে আর আমাকে দুষবে—বলিয়া নন্দ বাম হাতে নিজের চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া যায়। চিত্রা এবার তাহাকে ফিরাইল না, ডাকিল না। নন্দের চেয়ে নন্দের অন্তরটা আর ভাগ্যের কথাই তাহার মনে পড়ে বেশী। সেই দিনকার কথা তাহার মনে পড়ে যে দিন বড়দিদি তাহারই কোলে নন্দকে রাখিয়া চক্ষু মুদিলেন। এই ডেঁপো ও দুরন্ত ছেলেটিকে সকলেই মন্দ বলে, তবুও সকলে কেন যেন তাহাকে এই মন্দ ছেলেটিরই মা বলিয়াই জানে। ইহার অর্থ সে খুঁজিয়া পায় না—কিন্তু ইহাতে যেন একটা গৌরব আছে, আর সম্বন্ধটাও যেন পুরোন হইয়া গিয়াছে—ইহাকে বদলান যায় না। যে নন্দের দুষ্টামির অবধি নাই, যেন মনে হয় ছেলেটার মান-অপমান বোধ নাই, কিছু বোঝে না, জানে না, কিন্তু তাহার কাছে নন্দের আবদারের অবধি দেখা যায় না। নন্দের প্রত্যেকটি মাতৃ-সম্বোধনের ভিতর মাতৃত্ব জাগানিয়া মন্ত্র রহিয়াছে যেন। এই অবুঝ ছেলেও বেশ তীক্ষ্ণ নজর ফেলিয়া বসিয়া আছে, তাহার মায়ের স্নেহ কোন্ দিক দিয়া চুরি যাইতে বসিয়াছে। কিন্তু এত দুষ্ট! এমনই কত কিই ভাবিতেছিল সে, হয় ত আরও অনেক ভাবিয়া যাইত যদি না শাস্ত্রী মহাশয়ের আবির্ভাব হইত।

শাস্ত্রী শ্মশ্রু-গুম্ফ-শূন্য মুখে কোথা হইতে দাড়ি লাগাইয়া আসিয়া উপস্থিত! তিনি চিত্রাকে সে দাড়ি দেখাইয়া বলিলেন—ব্যাপারটা বৌমা—

বৌমা বোঝেন নাই, কিন্তু হাসিয়া ফাটিয়া পড়িতেছিলেন, অবশ্য বাহিরে তাহার প্রকাশ ছিল না, কারণ শাস্ত্রীর চক্ষু রক্তজবা।

—এ তোমার নন্দকিশোরের কাণ্ড! ঘুমিয়েছিলাম, তা স্বামীজীর দাড়ি কেটে আমার মুখে লাগিয়েছে এত বড় আস্পর্দ্ধা—

চিত্রা উঠিয়া দাঁড়ায়। সত্যই এমন স্পর্দ্ধা ত ভাল নয়।

স্বামীজী গম্ভীর ভাবে শাস্ত্রীর পাশে দাঁড়াইয়া চোখটি একটু কুঞ্চিত করিলেন অর্থাৎ ইঙ্গিত দিলেন—সব ভেস্তে দিয়ো না—শাস্ত্রী নিষ্পলক চোখে স্বামীজীর দিকে তাকাইয়া থাকিলেন যেন বলিলেন—এ অপমানও সইব—। এইবার স্বামীজী একসঙ্গে দুই চোখ টিপিয়া অর্দ্ধকর্ত্তিত দাড়িতে নখ বুলাইয়া প্রকাশ করিলেন যেন—নিশ্চয়, এই ত ধৈর্য্য—। শাস্ত্রী তাহার বাম পার্শ্বের নীচের ঠোঁট একটু কানের দিকে টানিয়া দেখাইলেন—করুন যা হয়—বিরক্ত সহকারে যাইবার সময় ছোট করিয়া বলিলেন—বেশ ত আপনার সইলেই হ'ল—দাড়িকাটা ত আর আমার যায় নি, আমার না হয় আর একজনের ছেঁড়া দাড়ি মুখে লেগেছে—

স্বামীজী কৌতুক দৃষ্টিতে শাস্ত্রীর ক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্র পদক্ষেপের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে একটু হাসি খেলিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা বিপুল কোর্ট হইতে আসিলে চিত্রা তাহাকে এই ব্যাপারটা সর্ব্বপ্রথম বলিল। বিপুল পোষাক খুলিতে খুলিতে ঘটনাটা শুনিয়া হুঁ-হাঁ করিয়া টেবিলের ধারে স্থির হইয়া বসিয়া চিত্রাকে সামনে চেয়ার দেখাইয়া বলিল—বস।

চিত্রা বিনা বাক্যব্যয়ে বসিল, কারণ নন্দের ব্যবহার সত্যই সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে একটা গুরু আলোচনা হওয়া সত্যই দরকার। বিপুলশ্রী বিশেষ যত্ন সহকারে চারিদিক চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—দেখ নন্দের এ ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ভাল নয়, রীতিমত ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ, একজনের বিশ্বাসে বাধা জন্মান এবং ভেবে দেখ এটাও এক রকম অঙ্গে অস্ত্র চালান যদি দাড়িটা অঙ্গের অংশ মনে করা যায়—

—কি বলতে চাও বল না—সামান্য একটা ছেলেকে শাসন করতে তুমি কোর্ট ডেকে বসলে যে—

বিপুল বিস্মিত হইয়া বলিল—সামান্য, সামান্য কি রকম, যথেষ্ট বুদ্ধি না থাকলে একজন সন্তর্পণে ঘুম না ভাঙিয়ে কারও দাড়ি কাটতে সাহস পায়।

—তা কি বলবে বল—

—হ্যাঁ, সেইটেই হচ্ছে কাজের কথা, ছেলেকে অমন সামান্য-টামান্য বলে আমার সহানুভূতি টেন না—তা বলে দিচ্ছি—

বিপুল একটু দম লইয়া বলিল—তা এখন শাসন করা দরকার—কি বল?

—নিশ্চয়ই ত—

—কি শাস্তি দিতে চাও—

—আমি কি বলব তুমিই ঠিক করে নাও।

—আমি? আমি ঠিক করব! জান আমি তাকে কিছু বলিনে কি জন্যে? পুরুষলোকের, শাসন বড় বেশী কড়া হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা মেয়েছেলে, আর এ সব বাড়ীর ভেতরকার অপরাধ তা বাইরে আনা উচিত নয়

নন্দ আমার কথা মোটেই শোনে না যে—চিত্রা বলে।

—আহা, শোনাতে হবে, তোমার হুকুমের পেছনে বার দুই-তিন আমার নাম চালিয়ে দিয়ো, যেমন বলবে, আসুক আগে সে বাড়ী, তার পর দেখা যাবে মজা, কিংবা তিনি বলে গেছেন আজ রাত্রে তোমাকে ভাত দেওয়া হবে না, মানে এই রকম করে বাঘের ভয় দেখাতে হবে বুঝেছ কি না—

চিত্রা এবার বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়—খুব বুঝেছি তোমাকে আর বোঝাতে হবে না।

সেই সময় নন্দ স্বামীজীর হাত ধরিয়া বাহির হইতে বেড়াইয়া ঘরে ঢুকিল, নন্দ ঢুকিতে ঢুকিতেই বলিল—দেখেছ মা, স্বামীজীর দাড়ি যে কেটেছিলুম

তা আর টের পাওয়া যাচ্ছে না, কেমন বে-মালুম মিলিয়ে দিয়েছে সেলুন, আর এক ব্যাপার শুনেছ মা, সেলুনে মুখে স্নো মাখিয়ে দেয়ত—তা স্বামীজীর মুখে দাড়ি, কোথায় আর মাখাবে, তবু স্বামীজী ছাড়বেন না, বলেন পয়সা দিচ্ছে ঠিক ঠিক, তুমি কিছু মাখাবে না কেন, যেটা সুবিধা হয় সেইটা মাখাও, শেষে বেচারী একটু পমেট মেখে ছিল—হিঃ হিঃ।

সকলেই এক সঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

বিপুলশ্রী এইবার সংযত হইয়া তাঁহার বক্তব্য আরম্ভ করিলেন। চিত্রা দাঁড়াইয়াই থাকিল, স্বামীজী একখানা চেয়ার টানিয়া নিলেন। শাস্ত্রীও পাশের ঘর হইতে এই আসরে যোগদান করিবার জন্য তাঁহার পাশের চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। নন্দ কোথায় যাইতেছিল, বিপুল তাহাকে হুকুম করিলেন—দুষ্টু ছেলে কোথাকার, ওখানে দাঁড়িয়ে থাক—অনেক কথা আছে—গুরুতর অভিযোগ পালাচ্ছ কোথায়। জান আমি কোর্ট থেকে এসে সব শুনেছি, তোমার ডেঁপোমী দিন দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে সে খেয়াল রাখ, কিন্তু না আগে বিচার হোক। বিপুল উত্তেজিত ভাবটাকে কিছু-টা দমন করিয়া স্বামীজীকে বলিলেন—আপনার অভিযোগটা বলুন—

—আমার অভিযোগ—স্বামীজী বিস্মিত হইয়া নিজের দিকে আঙুল দেখাইলেন।

—হুঁ আপনার দাড়ি কাটা যাওয়া সম্বন্ধে, কি ক্ষতিটা আপনার হয়েছে সেইটে বলুন। মানে ব্যাপার হচ্ছে কি জানেন, আপনারা সাধু পুরুষ আপনাদের আমি তেমন যত্ন-আত্তি করতে পাচ্ছিনে, অথচ আপনারা যত্ন করে যা রাখবেন তা আমার বাড়ীর লোকে নষ্ট করে ফেলবে এ আমি ঘটতে দেবোনা, এসব কি! আপনারা মানী লোক, আর এই সব ছেলেপিলে আপনাদের অঙ্গস্পর্শ করবে—এ কি রকম কথা?

বিপুল বিরক্ত সহকারে ভ্রূ কুঁচকাইল। স্বামীজী তিড়িং করিয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—দেখুন দাড়ি রাখা আমার ঠিক ধর্ম্মের অঙ্গ নয়, তবে রাখি কারণ এতে মুখের থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হলে দাড়ির মত নিরাপদ স্থল এমন আর নাই। কিন্তু ক্রমশঃ এই ভাব গোপন করার অভ্যাস যখন আমার বেড়ে গেল তখন এই নন্দই আমাকে বাঁচিয়েছে—

স্বামীজী কথার শেষে নন্দকে টানিয়া বুকের কাছে আনিলেন—

—একি তোমার জ্বর হয়েছে নন্দ!—স্বামীজী বিস্মিত হইয়া কহিলেন।

চিত্রা চমকিত হইয়া নন্দকে কাছে আনিয়া বুকে পিঠে হাত রাখিয়া চিন্তিত মুখে বলিল—ও মা, সে কিরে তোর যে গা পুড়ে যাচ্ছে—

নন্দ 'হুঁ' বলিয়া টলিতে টলিতে শোবার ঘরে চলিয়া গেল।

শাস্ত্রী কহিলেন—ছেলেমানুষ ও কে যেমন আস্পর্দ্ধা দেবে না, তেমনি ওকে অতিরিক্ত শাসন করতেও যেওনা—সংসারে ভালপনাটাই হচ্ছে মনের ভূষণ, বুঝেছ বিপুল, হোক্‌না নন্দ পরের ছেলে, হোক না কেন সে পথে কুড়োনো—তবুও ভবিষ্যৎ মানুষ ওর ভেতর রয়েছে, ওকে ভালবাসাও আমাদের কর্ত্তব্য শাস্ত্রের আদেশ স্পষ্ট করে বলেছে।

বিপুল বিস্মিত হইয়া বলিলেন—তাই নাকি?

কথাটার পিছনে বিদ্রূপ ছিল কিনা বোঝা গেল না, তবে শাস্ত্রী চোখ বুঁজিয়া বলিলেন—হুঁ

স্বামীজী শাস্ত্রীকে ডান চোখ টিপিয়া বোঝাইলেন—নিখুঁৎ—

শাস্ত্রীও মুচকি হাসি দিয়া প্রচ্ছন্ন উত্তরটা জানাইলেন—হবেইত, আমি তিনটে সংসার করেছি।

কয়েকদিন পর। চিত্রা শুদ্ধ শুচিভাবে সন্ধ্যাবেলা নন্দের ঘরে ধূপধুনা দিয়া বাহির হইয়া আসিল। দরজার একপাশ হইতে ডাকিলেন স্বামীজী—মা, একটু শুনে যাবেন ত!

চিত্রা কাছে আসিলে স্বামিজী তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন।

স্বামিজী চিত্রাকে বসিতে বলিয়া নিজেও একটি

[হ]রিতকী বাহির করিয়া মুখে পুরিয়া স্বামিজী কহিলেন—[ন]ন্দ ঘুমিয়েছে ?

—হ্যাঁ—

—ওর বিছানাতে নিমপাতা দিয়েছেন—

—হ্যাঁ—

—বেশ ভাল হয়ে উঠবে। তবে খুব ভুগ্‌ল এই যা, [এ]খন আর কোন ভয় নেই, আসল বসন্ত যা তা ওর হয় [না]।

স্বামিজী আবার চুপ করিলেন। একটি নীরবতা, করুণাঘন অপ্রাকৃত কোন ব্যাপার যেন তাঁহাদের চেষ্টা [স]ত্ত্বেও চাপিয়া আসিয়া বসিতেছে।

—আপনাকে ডেকেছি, কারণ আছে কাল রাত্রে নন্দ আমাকে একটা গল্প শোনাচ্ছিল ওর নিজেরই লেখা।

স্বামিজী গলায় একটু খাকারি দিয়া বলিলেন—বলেছে, আমি যদি মরে যাই তবে 'মাছধরা' কাগজে গল্পটা পাঠিয়ে দেবেন—ওরা ছাপাবে, আমার লেখা ভালই—তবে ওরা একটু হিংসুটে'। নন্দ মনে করেছে সে বাঁচবে না। স্বামিজী একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—কিন্তু আমি বলছি ও বাঁচবে নিশ্চয়ই বাঁচবে—সে যাক্ ওর গল্পটা শুনুন—

স্বামিজী নন্দের গল্পটি পড়িতে আরম্ভ করিলেন, ধীরে ধীরে পড়িলেন। চিত্রা স্বামীজীর অন্তর-রহস্যটা বুঝিতে না পারিয়া বসিয়াই রহিল। অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। লণ্ঠনের আলো সমস্ত অন্ধকারটা কাটাইতে পারে নাই, বরং বাহিরের চেহারা আরও কালো হইয়া উঠিয়াছে। দুই-একটা জোনাকী উড়িতেছে। ঝিঁ-ঝিঁ পোকার একটানা শব্দ চিত্রার কানে আসিয়া বিঁধিতে লাগিল। স্বামিজী পড়িতেছেন—

তার মা বাবা কেউই ছিল না, কবে তাঁরা মারা গেছেন তা তার মনেই পড়ে না। লেখাপড়া করে না, বড় দুষ্ট, বকুনী খায়, কানমলা খায়, আরও অনেক কিছু খায়—

স্বামিজী পড়িতে পড়িতে হাসিয়া বলিলেন, একেবারে ছেলেমানুষ। চিত্রাও হাসিল।

কিন্তু সে কিছুই ভ্রুক্ষেপ করে না, ভূতও নয়, স্বপ্নও নয়। কানাই পোদ্দারের বাগানের ভেতর দিয়ে সে রাত্রি বারোটার সময়েও পথ কেটে চলে।

চিত্রা বলিল—বাব্বা, কানাই পোদ্দারের নামও বসিয়েছে—

স্বামিজী হাসিয়া আবার পড়িতে লাগিলেন—

সেদিন ছিল অমাবস্যা, মঙ্গলের কিছুতেই ঘুম আসে না। সে বিছানা থেকে উঠে বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসল। ভিতরে পিসেমশাই ঘুমিয়ে পড়েছেন, কত রাত্রি হয়েছে জানা যায় না। পথে একটি লোকও নেই। কিন্তু মঙ্গল ভয় পায় না। ঐ কালো বাগান থেকে এমন সময় কে যেন ছায়ার মত উঠে এল। মঙ্গল উঠে দাঁড়ায়, কিন্তু হাওয়ার মত সে লোকটা এসে ঠাণ্ডা হাতে তাকে চেপে ধরে—

চিত্রা বলিয়া উঠিল—ভূতের গল্প পেলে ওর আর কথা নেই--

স্বামিজী পড়িয়া চলিলেন—সে লোকটা ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললে, সেদিন পথ দিয়ে যাবার সময় আমার মায়ের হাতটা ভেঙে দিয়েছিস্ মাড়িয়ে। মঙ্গল বলে, তুমি কে ? তোমার মাকে আমি মাড়াতে যাবো কেন ? লোকটি বললে, আমি ! আমি ঐ তেঁতুল গাছে থাকি, সেদিন নীচে এসে তেঁতুল কুড়োতে কুড়োতে আমার মা গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল সেই সময় তুই তাকে মাড়িয়ে গেলি, আমার মা তখন ঘুমিয়েছিল, নতুবা দেখতে পেতিস্ মজা, তোর ঘাড় ভেঙে দিতো—

মঙ্গল বলে—বারে ! তার হাত ভেঙে গেলো আর তার ঘুম ভাঙলো না ?

—হেঃ আমরা টের পাই না কি না, আমাদের ব্যথা নেই কিছুতেই, আমাদের যন্ত্রণা হয় না, কিন্তু একটু আঘাতেই আমরা ভেঙে পড়ি—

চিত্রা কোন কিছুরই মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিল, স্বামিজী, এ গল্প শুনে আমি কি করব—

চিত্রা মনে করিয়াছিল ইহাও স্বামিজীর এক পাগলামী।

স্বামিজী কিয়ৎকাল নীরব থাকিলেন। অন্ধকার আরও জমাট হইয়া আসিয়াছে। সেই ঝিঁ-ঝিঁ পোকার এখন তন্দ্রা আনিতেছে যেন।

স্বামিজী যেন কান পাতিয়া কি শুনিলেন। ঐ ঘরে নন্দ বোধ হয় জাগিয়া যন্ত্রণায় উঃ করিয়া উঠিল।*

—আমি যাই, বোধ হয় নন্দ উঠেছে—চিত্রা বলিল।

স্বামিজী ইহার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি শুধু বলিলেন—গল্পটা আমি আপনাকেই শোনাচ্ছি। পাগলামী বলে ভাববেন না। নন্দর লেখা নন্দর মাকে শোনাচ্ছি।

স্বামিজী আবার পড়িতে আরম্ভ করিলেন—মঙ্গল বোঝে সে ভূতের সামনে পড়েছে। মঙ্গল ভূতকে ভয় করে না, কিন্তু ভূত কথা বললে বড় ভয় করে। সে উঠতে যাবে এমন সময় ভূত শাসিয়ে গেল—এর প্রতিশোধ আমি নেবো, তোর মাকেও আমি কেড়ে নেবো—কালকে তোর মায়ের হাতের দিকে তাকালেই টের পাবি—

মঙ্গল হেসে উঠে, তার মা ত কবেই মারা গেছে। হঠাৎ উঠে সে চোখ মোছে ফেলে ভাবলে স্বপ্ন—বিশ্রী স্বপ্ন।

ও ঘর হইতে নন্দ আবার যন্ত্রণায় কাতর শব্দ করিয়া উঠিল। চিত্রা বলিল—আমি যাই—

স্বামিজী পড়িতেছেন কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া—

পর দিন অনেক বেলাতে তার ঘুম ভাঙে—উঠে সে দেখে তার পিসীমার হাতে এক আচার্য্য মাদুলী বেঁধে দিচ্ছে। পিসীমার ছেলেপিলে নেই বলে এই কবচ।

চিত্রার চোখ দুইটি একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বোধ হয় কি চিন্তা করিল।

স্বামিজী পড়িয়া যাইতে লাগিলেন—এক মুহূর্ত্তে মঙ্গল যেন শুব্ধ হয়ে যায়। কালকের ভূতের আক্রমণ কোন্ দিক দিয়ে আসছে সে বোঝে। মঙ্গল জানে সে মাতৃহারা, তবু সে পিসীমাকে দেখে বুঝেছিল—অন্তর থাকলে এ সংসারে মায়ের অভাব হয় না। আজ ছ-সাত বছর এই পিসীমা তার মায়ের স্থান দখল ক'রে বসেছিল। পিসীমা তার মা-ই বটে, কিন্তু সে বোধহয় সন্তান হতে পারে নি,—মঙ্গল বোধ হয় এই মাকে তৃপ্তি দিতে পারে নি—তাই বুঝি কবচ ধারণ তাঁকে করতেই হবে। আজ এই প্রথম মঙ্গল বোঝে তার মা নেই, যার মা নেই—তার কেউ নেই। মা মরে গেছে, মা মরে গেছে অনেক দিন আগে মরে গেছে মা—

চিত্রা কাঁপিতে কাঁপিতে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া [illegible] ঐ কান্নার ভিতর দিয়া যেন ভাঙিয়া গুঁড়া হইয়া ঐ চোখের জলে শরীরের অণু-পরমাণু মিশিয়া যাইতেছে। একটি লতা যেন ঝড়ের বেগ সহ্য করিতে পারিতেছে না। এই কান্নার উৎস কোথায় স্বামিজী বুঝিতে চেষ্টা করিলেন।

গল্পের শেষটুকু আর পড়া হইল না—স্বামিজী ধীরে ধীরে চিত্রাকে ডাকিলেন—মা—

চিত্রার যেন লজ্জা সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়াছে, সে বলিল—আমি ত কবচ চাই নি বাবা! আমি ত চাই নি। নন্দ এমন গল্প লেখে কেন, আপনি আমাকে এমন গল্প শোনান কেন?

চিত্রা ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করিল, তার পর বাম হাত হইতে কবচটি টানিয়া ছিঁড়িয়া স্বামিজীর পায়ের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল—আমি আর পরব না, আর পরব না কবচ—আমার কোন অভাব নেই—

চিত্রা আর দাঁড়াইতে পারিল না, ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল।

স্বামিজী একা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বাহিরের দমকা বাতাসে আলোটা হঠাৎ নিভিয়া গেল। অন্ধকার, গভীর অন্ধকার, সেই অন্ধকার ঘরের বাতাস যেন স্বামিজীর কানে কানে কথা কহিয়া যায়, স্বামিজী ভাবিলেন, তাঁহার বৈরাগ্যের পূর্ব্বেকার কথা। নন্দর জীবনের সঙ্গে স্বামিজীর নিজেরও কিছুটা মিল আছে তবে...

স্বামিজীর সেই দিনকার কথা মনে পড়ে, যেদিন সংসারের একমাত্র আত্মীয় তাহার সহধর্ম্মিণীকে চিতায় উঠাইয়া দিয়া আসিলেন, শূন্যঘর, ফিরিয়া আসিয়া দেখেন ঘর একেবারে শূন্য, তার পর কি করিয়া সেই প্রথম সামনের ঐ বিরাট পাষাণস্তূপ হিমালয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। বহুদিনকার কথা—অনেক দিন—কিন্তু যত দিন-কার কথাই হউক, আজিও মন তেমনই অবলম্বনহীন হইয়া পড়িয়া আছে। সংসারে মা, স্ত্রী, সহোদরা—এরা সব যেন অন্তরে অন্তরে একশ্রেণীর—ইহারা পুরুষের আকর্ষণ নয়, অবলম্বন, আশ্রয়স্থল, একটা নিভৃত স্থান যেখানে দুই দণ্ড নিজেকে উপলব্ধি করা যায়। সন্ন্যাস ধর্ম্মে মেয়েদের

[ত]াহায় এড়াইয়া চলিবার বিধি আছে, কিন্তু মানুষের [প]রিপূর্ণ বিকাশকে পরিত্যাগ করিয়া মানুষের কোন [সা]ধনাই সফল হয় না—ইহাই যেন স্বামিজীর একাধিকবার [ম]নে হইতে লাগিল।

অন্ধকারে স্বামিজী নিজের ঝুলিটি খুঁজিয়া কাঁধে [ঝু]লিয়া উঠানে আসিয়া ডাকিলেন—মা—

মা বাহির হইয়া আসিল, চিত্রা যেনআর চিত্রা নহে, [সে] এখন মা—

—চললুম মা, বড্ড ছোট হয়ে পড়ছি আপনাদের কাছে [থে]কে, আপনারা আমাকে ছাড়িয়ে যাবেন এ আমি সইতে [প]াচ্ছিনে, তবে খুব খুসী হয়েছি। নন্দ আপনার ভাল [হ]য়ে উঠবে, কোন ভয় নেই। একটু থামিয়া স্বামিজী [আ]বার বলিলেন—নন্দর গল্পে একটা সত্য কথা আছে যে, [খু]ঁজতে জানলে সংসারে মায়ের অভাব হয় না—কিন্তু তা [য]ে এত সত্য আপনাকে না দেখলে বুঝতাম না—

ইহার পর স্বামিজী এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন, অতি দ্রুত তিনি চিত্রার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিলেন—চিত্রা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শরীরের সমস্ত রক্তস্রোতে ঝাকানি [খ]াইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিয়া উঠিল—এ কি করলেন, এ কি করলেন স্বামিজী—না না এ কি—

—মাকে প্রণাম করলাম মা, আপনি সঙ্কোচ কর্ব্বেন না। কারণ আজ পর্য্যন্তও আমি পুণ্যার্জ্জন করতে পারি নি। আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে আমার প্রণামকে মর্য্যাদাভ্রষ্ট করবেন না, মা—আমার এ দুর্ব্বলতা সংসারের আর কেউ জানবে না, আমার সম্পদ আমাতেই থেকে গেল। আমার কোন সম্প্রদায় নেই, আমি দল ছাড়া—

চিত্রা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু স্বামিজীর কথায় বাধা পড়িল—জানেন মা, আমি আপনাদের ঠিক ঐ সাধু-সম্প্রদায়ের নই, সংসার আমাকে টেনে নীচে ফেলে দিয়েছে, সংসারে আমার প্রলোভন আছে, কিন্তু আমি লক্ষ্মীছাড়া দুর্ভাগা বৃন্তচ্যুত, তাই সংসারের মানুষ দেখলে কেন যেন শ্রদ্ধা করি বেশী, বড় তৃষ্ণার্ত্ত আমি মা—

তবু চিত্রা ছিঃ ছিঃ আমার কি হবে—বলিয়া অস্থিরতার সঙ্গে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল।

স্বামিজী বলিলেন—সন্ন্যাসীরা সংসারের অভাবটা মিটিয়ে পূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়—আমার কি জানেন, সংসারে যা আছে তা-ও আমার নেই, আমি বড় অভাবগ্রস্ত—কিন্তু যাক সে কাঁদুনী—

এমন সময় আহ্নিক সারিয়া শাস্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বামিজীর কাঁধে ঝোলা দেখিয়া বলিলেন—সে কি, আপনি চলছেন নাকি ?

—যেখানে মানুষের মন উন্নতই আছে সেখানে আমার কাজ নেই ত শাস্ত্রীমশাই—

শাস্ত্রী নির্ব্বাক হইলেন, বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন না কথাটা। স্বামিজী এবার হাসিয়া বলিলেন—আমি অভাবের দলে, প্রাপ্তিতে আমি নেই! অর্থাৎ নন্দর মা আছে, আপনার শিষ্যও জুটল—কিন্তু আমি কোথায়—কি বলেন ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক কি না? কাজেই মান বাঁচান ভাল—

শাস্ত্রী এবারও বুঝিতে না পারিয়া ডান চোখটি একবার কুঞ্চিত করিয়া বোঝাইতে চেষ্টা করিলেন—আর একটা খেলা নাকি খেলোয়াড়—

স্বামিজী তাহার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া ছেঁড়া কবচটা তাঁহার হাতে দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

চিত্রা এতক্ষণ যেন তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, এইবার হঠাৎ সম্বিৎ পাইয়া 'স্বামিজী' 'স্বামিজী' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

স্বামিজী তখন বাহির হইয়া গিয়াছেন।

চিত্রা এলায়িত চুলে দ্রুতপদে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বাহিরের ফটক পর্য্যন্ত আসিল, কিন্তু কোথায় স্বামিজী!

শাস্ত্রী পিছনে পিছনেই ছিলেন, বলিলেন—পাগল মানুষ, কোথায় গেল আর কি খুঁজে পাবে বৌমা—

চিত্রার দুই চক্ষুতে তখন অশ্রু জমা হইয়া উঠিয়াছে।

শাস্ত্রী সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া আপন মনেই বলিলেন —লোকটা তর্ক ছেড়ে অভিনয় করেই আমাকে হারিয়ে গেল—

নন্দ তাহার ঘর হইতে যন্ত্রণায় ডাকিয়া উঠিল—মা—

ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার, বি-এল

সেকালের পণ্ডিত মহাশয়রা 'কূপমণ্ডূক' কথাটির সৃষ্টি করিয়াছিলেন হতভাগ্য কূপবাসী নগণ্য মণ্ডূককে উপহাস করিবার জন্য। অতিক্ষুদ্র ভেক অতি সংকীর্ণ কূপে বাস করিয়া তাহাকেই ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া মনে করে। কূপের বাহিরে যে বিশাল জগত পড়িয়া রহিয়াছে সেই ধারণা মণ্ডূকের নাই। তাই সে তাহার কূপের বিশালতার কথা চিন্তা করিয়া গর্বে বিভোর। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্‌গণ ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতা সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে সেকালের বিজ্ঞ পণ্ডিত-মহাশয়দিগকে কূপমণ্ডূক বলিলে অন্যায় হইবে না।

প্রাচীন কালে পৃথিবীর বিশালতা সম্বন্ধেই কাহারও সম্যক ধারণা ছিল না। এসিয়াবাসীরা এসিয়াকে এবং ইয়ুরোপবাসীরা ইয়ুরোপকেই সমগ্র পৃথিবী বলিয়া মনে করিত। আকাশের জ্যোতিষ্কসমূহের গতিবিধি পর্যালোচনা করিয়া প্রাচীন জোতির্বিদগণ স্থির করিয়াছিলেন, পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত। উহার চারিদিকে চন্দ্রসূর্যাদি জ্যোতিষ্করাজি নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। কোপার্নিকাস পৃথিবীকে সেই গৌরবের স্থান হইতে সরাইয়া সূর্যকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আজও সূর্য সৌরজগতের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সৌর জগতের বাহিরে এই জ্যোতির্ময় বিভাকরের স্থানও অতি নগণ্য।

সেকালের জ্যোতিষীরা সৌরজগতকেই ব্রহ্মাণ্ড মনে করিতেন। সৌরজগতের সীমান্ত প্রদেশে নক্ষত্র সকল অবস্থিত। আকাশটি একটা খোলের ন্যায় সৌরজগতকে বেষ্টন করিয়া আছে। সেই খোলের গায় আলোক বিন্দুর ন্যায় ক্ষীণ-জ্যোতি নক্ষত্র সকল শোভা পাইতেছে। নক্ষত্রখচিত আকাশের খোলটি অবিশ্রান্ত পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ

ইহার বাহিরে আর কিছুই নাই। নক্ষত্র সকলের আয়তন ও দূরত্ব সম্বন্ধে সেকালের পণ্ডিতগণ অতিশয় ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেন। নক্ষত্র সকলের অচিন্তনীয় দূরত্বের কথা তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

১৬০৯ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত পণ্ডিত গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করিয়া সর্ব প্রথম উহার সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতে জ্যোতিষশাস্ত্রে যুগান্তরের সূচনা হইল। গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণটি ছিল অতি ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণের সাহায্যেই তিনি চন্দ্রের গিরিগহ্বর, সূর্যের কলঙ্ক, বৃহস্পতির চারিটি চন্দ্র ও শনির বিচিত্র বলয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু নক্ষত্রগুলির দিকে তাকাইয়া তিনি দেখিলেন দূরবীক্ষণ উহাদের কোন তথ্যই দিতে সমর্থ নয়। এমন কি নক্ষত্র সকলের ক্ষীণ আলোকের উজ্জ্বলতা সহস্রাংশের একাংশও বৃদ্ধি করিতে পারে না। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন নক্ষত্র সকল অতিশয় দূরবর্ত্তী।

ছায়াপথ সমগ্র আকাশকে উত্তরে দক্ষিণে বৃত্তাকারে মেখলার ন্যায় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ছায়াপথটি শুভ্র মেঘের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার জ্যোতি অতি ক্ষীণ। এই জন্য অন্ধকার রাত্রি ব্যতীত ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্যোৎস্না রাত্রে ইহা অদৃশ্য থাকে। গ্যালিলিও প্রথমে অনুমান করেন যে, দৃশ্যমান ছায়াপথটি দূরবর্তী নক্ষত্রের ক্ষীণ প্রভা মাত্র।

গ্যালিলিওর পর সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ স্যার উইলিয়ম হর্শেলের আবির্ভাব হয়। তিনি একটি সুবৃহৎ দূরবীক্ষণ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরাট দূরবীক্ষণের সাহায্যে তিনি ছায়াপথের অত্যাশ্চর্য রহস্য উদ্ঘাটন করেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ছায়াপথে স্তরে স্তরে কোটি কোটি নক্ষত্র বিরাজিত। এক একটি নক্ষত্র একটি বিরাট

র্য! একটি সূর্যের পর আর একটি, তার পর আর একটি, ইরূপ এক-এক স্থানে পাঁচশত সূর্য-স্তর অবস্থিত। আকাশ পরিবেষ্টিত সমগ্র ছায়াপথটি অগণিত সূর্য দ্বারা গঠিত। এই সকল সূর্য পরস্পর হইতে কোটি কোটি মাইল ব্যবধানে অবস্থিত।

হর্শেল কিম্বা তাঁহার পরবর্ত্তী জ্যোতির্বিদগণ আকাশের কোটি কোটি নক্ষত্রের মধ্যে কোন একটিরও দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। হর্শেলের পরে অনেক উৎকৃষ্টতর দূরবীক্ষণ নির্মি'ত হইল; কিন্তু উহাদের সাহায্যেও নিকটতম নক্ষত্রেরও বিম্ব (disc) প্রত্যক্ষ করিতে পারা গেল না। তখন পণ্ডিতেরা নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন নক্ষত্রসকল এতদূরে অবস্থিত যে, উহাদিগের দূরত্ব নির্দ্ধারণ করা অসাধ্য। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জার্মা'ণ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত বেসেল (Bassel) অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া লম্বন (Parallex) সাহায্যে সর্বপ্রথম সিগনি নক্ষত্র মণ্ডলের ৬১নং তারকাটির (61 Cygni) দূরত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হন। ইহার কিছুদিন পর স্কটলণ্ড নিবাসী জ্যোতিষী হেণ্ডারসন্ (Handerson) আলফা সেণ্টরাই (alpha centaury) নামক নক্ষত্রটির দূরত্ব নির্ণয় করেন। এই দুইজন পণ্ডিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটা অতি দুরূহ কার্য সম্পাদন করিয়া তৎকালে যশস্বী হইয়াছিলেন। ইহার পর জ্যোতিষীরা আরও কতকগুলি নক্ষত্রের দূরত্ব নিরূপণ করিয়াছেন।

পৃথিবীর কোন স্থানের দূরত্ব নিরূপণ করিতে সাধারণতঃ মাইল ক্রোশ ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু নক্ষত্রের দূরত্ব প্রকাশ করিতে এই সকল মাপ ব্যবহৃত হয় না। কারণ দূরত্বজ্ঞাপক সংখ্যাগুলি এত বড় হইয়া পড়ে যে তাহা অঙ্কে প্রকাশ যেমন দুঃসাধ্য, পাঠ করাও তেমনি ক্লেশকর হয়। সেই জন্য নক্ষত্র জগতের দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিতে জ্যোতির্বিদগণ দীর্ঘতর মাপকাঠি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আলোক এক বৎসরে যতদূর যায় সেই দূরত্ব জ্যোতির্বিদগণের 'গজ' বা মাপকাঠি। ইহার নাম দিয়াছেন তাঁহারা এক 'আলোক বর্ষ'। আলোক এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল গমন করে। এই হিসাবে আলোক এক-বৎসরে প্রায় ৬০০০,০০০,০০০,০০০ ছয় লক্ষ কোটি মাইল যাইতে পারে। জ্যোতির্বিদগণের মাপকাঠি হইল এই 'আলোক বর্ষ'। সূর্য পৃথিবী হইতে প্রায় নয়কোটি উনত্রিশ লক্ষ মাইল দূরবর্তী। সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে মাত্র ৮ মিনিট লাগে। আল্‌ফা সেণ্টরাই আমাদের নিকটতম নক্ষত্র। এই নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে ৪½ বৎসর লাগে। সুতরাং ইহা ৪½ আলোক বর্ষ দূরবর্ত্তী। ৪½ আলোক বর্ষের দূরত্বের পরিমাণ হয় ২৭০০০,০০০,০০০,০০০ সাতাশ লক্ষ কোটি মাইল। যে 'এরোপ্লেন' ঘণ্টায় ৩০০ মাইল যাইতে পারে তাহাতে আরোহণ করিয়া আমরা যদি নিকটতম নক্ষত্র আল্‌ফা সেণ্টরাইতে যাত্রা করি তবে তথায় পৌঁছিতে আমাদের অনূ্যন ১০২৭৩৯৭২ বৎসর লাগিবে! এই ত গেল নিকটতম নক্ষত্রটির কথা। আকাশে যে কোটি কোটি নক্ষত্র ক্ষীণ আলোক-বিন্দুর ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয় ইহারা অচিন্তনীয় দূরে অবস্থিত।

কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর লুব্ধক (Sirius) নক্ষত্রটি পৃথিবী হইতে ৮½ আলোক বর্ষ দূরবর্তী; অর্থাৎ উহার দূরত্ব প্রায় একান্ন লক্ষ কোটি মাইল। এই নক্ষত্রটি আমাদের সূর্য হইতে প্রায় ২৬ গুণ উজ্জ্বলতর। আর আয়তনেও ইহা সূর্য হইতে বহুগুণ বড়। লুব্ধক হইতেও বৃহত্তর নক্ষত্র আকাশে অনেক আছে। কিন্তু দূরত্ব হেতু উহাদিগকে অতি ক্ষীণ আলোক-বিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ব্রহ্মহৃদয় (Capella) নামক নক্ষত্রটি হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে ৫২ বৎসর লাগে। কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীতে একটি লোহিত বর্ণের নক্ষত্র আছে উহার নাম আর্দ্রা (Betelgeux)। এই নক্ষত্রটি পৃথিবী হইতে প্রায় ৩০০ শত আলোক বর্ষ দূরবর্তী। অর্থাৎ ইহার দূরত্ব প্রায় ১৮০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল। এই নক্ষত্রটির আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে প্রায় তিনশত বৎসর লাগে। তিনশত বৎসর পূর্বে এই নক্ষত্র হইতে যে আলোক বিকীর্ণ হইয়াছিল তাহাই আমরা এখন

দেখিতে পাইতেছি। এই নক্ষত্রটি এখন ধ্বংস হইয়া গেলেও তিনশত বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীর অধিবাসীরা তাহা বুঝিতে পারিবে না। উহার আলোক এইরূপই দেখিতে পাইবে।

আর্দ্রা নক্ষত্রটির আয়তন এত বিশাল যে এই বিষয়ে চিন্তা করিলে ভয়ে বিস্ময়ে শরীর শিহরিয়া উঠে। সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ জেম্‌স্ জীন্‌স্ (Sir James Jeans) লিখিয়াছেন—ইহার উদর শূন্য করিয়া উহার ভিতরে আমাদের সূর্যের ন্যায় বৃহৎ দশ সহস্র সূর্য সন্নিবিষ্ট করিলেও আরও অনেক স্থান শূন্য পড়িয়া থাকিবে। আর্দ্রা হইতে বৃহত্তর নক্ষত্র আকাশে অনেক আছে।

একটি একটি করিয়া নক্ষত্রের দূরত্বের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা এখন কতকগুলি দূরবর্তী জ্যোতিষ্কের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতার অতি ক্ষীণ আভাস দিতে প্রয়াস করিব। ফরাসী জ্যোতির্বিদ মেসিয়ার নির্মিত নক্ষত্র-তালিকায় (Messiers catalogue) হার্কিউলিস নক্ষত্র মণ্ডলীতে ১৩নং একটি গোলাকার নক্ষত্র-পুঞ্জ (Globular Star Cluster M 13) আছে। ইহা উত্তর আকাশে অতি রমণীয় নক্ষত্রপুঞ্জ। এই নক্ষত্র পুঞ্জের আলোক পৃথিবীতে পৌছিতে প্রায় ৩৩০০০ তেত্রিশ হাজার বৎসর লাগে। আমাদের সূর্যের বিকীর্ণ আলোক অপেক্ষা এই জ্যোতিষ্কপুঞ্জ ২৫০০০০০ পঁচিশ লক্ষগুণ অধিক আলোক প্রদান করিতেছে। তথাপি উহার অচিন্তনীয় দূরত্বহেতু খালি চক্ষে উহার ক্ষীণ প্রভা মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আকাশের দক্ষিণ মেরুর সন্নিকটে টিউকানা (Tucana) নক্ষত্র মণ্ডলীতে একটি সুবিস্তৃত মেঘবৎ শুভ্র আভা দৃষ্টি-গোচর হয়। উহা সুদূরবর্তী বহুসংখ্যক নক্ষত্ররাজির ক্ষীণ আলোক রাশি। এই স্থানে একটি গোলাকার নক্ষত্রপুঞ্জ আছে। ইহার নাম ক্ষুদ্রতর ম্যাগেলেনিক মেঘ (Lesser magellanic cloud)। এই নক্ষত্রপুঞ্জটির আয়তন অতিশয় বিশাল। ইহা এত বৃহৎ যে, আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল গতিতে ছুটিয়াও ৬০০০ হাজার বৎসরের কমে উহার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌছিতে পারে না। এই নক্ষত্রপুঞ্জটি এতদূরবর্তী যে পৃথিবীতে ইহার আলোক আসিতে ৯৫০০০ বৎসর লাগে। এই নক্ষত্রপুঞ্জে আমাদের সূর্যের ন্যায় বৃহৎ পাঁচ লক্ষ নক্ষত্র আছে। ইহাদের কতকগুলি পূর্বোক্ত লুব্ধক নক্ষত্র হইতেও অধিকতর উজ্জ্বল। এইরূপ বহুসংখ্যক সুবৃহৎ নক্ষত্রপুঞ্জ আকাশে বিরাজিত রহিয়াছে।

আমরা এখন পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নিকটতম প্রদেশের কথা বলিলাম। আমরা পূর্বে ছায়াপথের কথা বলিয়াছি। এই ছায়াপথ কোটি কোটি সূর্যে গঠিত এবং ইহা মেখলার ন্যায় আকাশকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই ছায়াপথ পরিবেষ্টিত আকাশ ব্রহ্মাণ্ডের অতি ক্ষুদ্র অংশ। ইহাকে একটি নক্ষত্র-জগৎ (Galactic system) কহে। আমাদের সূর্য এই নক্ষত্র জগতের অধিবাসী। কোটি কোটি নক্ষত্রের মত সূর্যও একটি নক্ষত্র। সূর্য প্রতি-সেকেণ্ডে ২০০ মাইল গতিতে নিজ কক্ষে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিয়া সেই নক্ষত্র-জগতের কেন্দ্রের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য-কক্ষ এত বৃহৎ যে এই প্রচণ্ড গতিতে ছুটিয়াও ২৫০০০০০০০ পঁচিশ কোটি বৎসরের কমে সূর্য কেন্দ্রের চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে পারে না। ছায়াপথে এইরূপ কোটি কোটি সূর্য পরস্পর হইতে কোটি কোটি মাইল দূরে থাকিয়া নিজ নিজ কক্ষে কেন্দ্রের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। স্যার জেম্‌সজীন্‌স্ লিখিয়াছেন, ছায়াপথে অন্যূন দশ সহস্র কোটি সূর্য ও মহাসূর্য অবস্থিত। ছায়াপথ পরিবেষ্টিত যে নক্ষত্র-জগতের আমরা অধিবাসী তাহারই বিশালতার ধারণা করা অসাধ্য। এইরূপ বহু লক্ষ নক্ষত্র-জগৎ (Galactic systems) মহাকাশে বর্তমান আছে। সেই সকল জগৎ সমষ্টি লইয়া বিশ্বরাজের বিশাল সাম্রাজ্য। ইহাকেই আমরা বলি ব্রহ্মাণ্ড। সেই ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতার ধারণা করা অসাধ্য।

কল্পনাতীত বৃহৎ বস্তুর সহিত অতি ক্ষুদ্রবস্তুর তুলনা করিলে বলিতে হয় আমাদের নক্ষত্র-জগৎ বহু আলোক-মালা সুশোভিত একটি নগরী। নগরের বাহিরে যেমন দীপমালা শূন্য অন্ধকার স্থান তেমনি নক্ষত্র-জগতের

বহির্ভাগে তিমিরাচ্ছন্ন সীমাহীন মহাকাশ। সেই গভীর অন্ধকারাবৃত মহাকাশে যদি আমরা প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল গতিতে সম্মুখে অবিরাম অগ্রসর হই, প্রায় দশলক্ষ বৎসর পর আবার আর একটি কল্পনাতীত বিচিত্র এক মহাদেশের (Galactic system) অস্পষ্ট ক্ষীণ প্রভা আমরা প্রত্যক্ষ করিব। সেই রাজ্য আমাদের ছায়াপথ পরিবেষ্টিত নক্ষত্র রাজ্যের অনুরূপ সুবিশাল। উহার ব্যাস এক লক্ষ আলোক বর্ষের ন্যূন হইবে না। পূর্বোক্ত প্রচণ্ড গতিতে আরও দশ লক্ষ বৎসর অবিশ্রান্ত অগ্রসর হইলে আবার আর একটি ঘনবিন্যস্ত তারকা শোভিত নক্ষত্র-রাজ্য আমাদের নয়নগোচর হইবে। আমরা মহাকাশে যতই অগ্রসর হইব ততই একটির পর একটি নূতন নক্ষত্র-জগৎ দেখিতে পাইব। এই সকল জগতেও আমাদের সূর্যের ন্যায় দীপ্তিশীল কোটি কোটি নক্ষত্র বিরাজিত।

We now know that the wheel-shaped system of stars bounded by the milky way is not the only system of stars in the space. Far beyond the milky way are other system of star-cities, each with its own system of lights the stars and their courses—Sir James Jeans.

সেই সুদূর মহাকাশ হইতে পুনরায় যদি উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ সাহায্যে আমরা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে বামে, দক্ষিণে, উর্দ্ধে, অধঃভাগে বহুসংখ্যক ঘূর্ণায়মান বাষ্পময় পদার্থ দেখিতে পাইব। ইহাদিগকে বলে কুণ্ডলিত নীহারিকা (Spiral Nebula)। এই নীহারিকা আয়তনে অতিশয় বিশাল। ইহাদের প্রত্যেকটির দেহে কোটি কোটি সূর্যের উপাদান রহিয়াছে। কোন নীহারিকায় উপাদান জমাট বাঁধিয়া নক্ষত্রে পরিণত হইয়াছে। কোন নীহারিকার উপাদান জমাট বাঁধিতেছে।

আমেরিকার উল্‌সন্ মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ডাক্তার হাব্‌ল্‌স্ (Dr. E. P. Hubbles.) পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, মহাকাশে নীহারিকার সংখ্যা ত্রিশলক্ষেরও অধিক হইবে। এই সকল নীহারিকা অচিন্তনীয় দূরে অবস্থিত। জ্যোতির্বিদগণ পরিক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, রোহিণী নক্ষত্রমণ্ডলীর (Andromeda) নীহারিকাটি পৃথিবী হইতে অন্যূন ৬০০০০০ ছয় লক্ষ আলোকবর্ষ দূরবর্ত্তী। ইহার ব্যাস প্রায় ২০,০০০ বিশ হাজার আলোক বর্ষ। এইরূপ সুবিশাল লক্ষ-লক্ষ নীহারিকা মহাকাশে আরও দূরতর প্রদেশে বিরাজিত রহিয়াছে।

মহাসমুদ্রের নীলাম্বুগর্ভে যেমন দ্বীপমালা শোভা পায়, তেমনি সীমাহীন নীলাকাশের বক্ষে আমাদের ছায়াপথ পরিবেষ্টিত নক্ষত্র-জগতের ন্যায় লক্ষ-লক্ষ নক্ষত্র-রাজ্য (Island universe) পরস্পর হইতে ১০ লক্ষ আলোক বর্ষ ব্যবধান অবস্থিত আছে। এক একটি নক্ষত্র জগতের ব্যাস প্রায় একলক্ষ আলোক বর্ষ হইবে।

We have explored a region by telescope 400,000,000 light year in diameter in which will be found millions of Galaxies separated by distance of 1,000,000 light year. These Galaxies may be 100,000 light year in diameter. —Through the Telescope by Edward Arthur Firth.

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা এমন এক সুবিশাল মহাজগতের আবিষ্কার করিয়াছি যাহার ব্যাস ৪০ কোটি আলোকবর্ষ হইবে। ইহাতে আমাদের ছায়াপথ পরিবেষ্টিত নক্ষত্র-জগতের মত লক্ষ-লক্ষ জগত বিরাজমান। এই সকল নক্ষত্র-জগত পরস্পর হইতে ১০ লক্ষ আলোক বর্ষ ব্যবধান এক-একটি নক্ষত্র-জগতের ব্যাস দশ লক্ষ আলোক বর্ষ হইবে।

বাস্তবিক ব্রহ্মাণ্ড কত বিশাল তাহা অনুমান করা অসাধ্য, কল্পনা করাও অসম্ভব। যতই উৎকৃষ্টতর যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে, জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে ততই অভিনব জগৎ সকল আবিষ্কৃত হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের সীমা দূরতর প্রদেশে সরিয়া যাইতেছে। আমরা ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতা বুঝাইবার জন্য উপরে দূরত্বজ্ঞাপক যে সকল সংখ্যা ও দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা পাঠ করিলে ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতার অব্যক্ত ও অস্পষ্ট আভাস মাত্র পাঠকের মনে থাকিয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়।

মা

(উপন্যাস)

শ্রীসুপ্রভা দেবী

তেরো

সকালে এসেছে। সন্ধ্যেবেলায় বীণাকে সবিতা বলল, "এত দিন তুমি কোথায় লুকিয়েছিলে মা? কলকাতা সহরে থেকেও তোমায় আমি খুঁজে পাই নি, পেলে ত আমার এত দিন এত একা একা লাগতো না। মাঝে মাঝে তোমাকে দেখতে আসতাম।"

বীণা বলল, "হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করলাম কিনা? আপনার নিজের মেয়ে রয়েছে কাছে, আর সে কি মেয়ে, যেমন রূপে তেমন গুণে, উৎপলদার কাছে কত শুনেছি। তাকে ছেড়ে আমার পানে চেয়ে দেখতেন কিনা?

সবিতা হেসে বলল—"দুষ্টু মেয়ে কথায় কথায় বুঝি সবার সাথে ঝগড়া করিস তুই?"

বলতে বলতেই হাসি মিলিয়ে গেল। অকারণেই নিঃশ্বাস দীর্ঘ হ'য়ে পড়ে। ক'লকাতায় সে যে ভরা মন নিয়ে এসেছিল তার অনেকখানিই ঝরে গিয়েছে। তিনজনে এসেছিল, একসঙ্গে সুখের ঘর তারা রচনা করেছিল, কিন্তু ক্রমশঃই তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছে। অতসী, উৎপল দুজনেই আপন মনে থাকে, নিজেদের কাজকর্ম্ম চিন্তা ভাবনা নিয়ে সময় কাটায়, সবিতাকে কোন অংশ দেয় না। এত দিন তবু মণিমালা ছিল, সে ডেকে পাঠাত, নিজের সুখ-দুঃখের কাহিনী শোনাত। সে তো চিরকালের মতই চলে গেল। তার স্বামী একমাস পরেই বিয়ে করেছে, অন্যত্র বাসা ভাড়া ক'রে তারা উঠে গিয়েছে। তেতলার তরু মেয়েটিও বিয়ের পরে আর বাপের বাড়ী আসে নি। তার বাপ হৃদয়বাবু মেয়ের বিয়ে দিয়ে কিছু টাকা পেয়েছিলেন, সেই টাকার বাঁটোয়ারা নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে কিছু দিন তাঁর নিত্য ঝগড়া কচকচি চলত, এখন আপোষ হয়েছে। মণিমালার ঘরে এখনও নতুন ভাড়াটে আসে নি। প্রায়ই সবিতার তার কথা মনে পড়ে, তরুর বিয়ের কথা মনে পড়ে। আর তার জীবনে তারা কেউ ফিরে আসবে না। পালিত-গিন্নীরা তাঁদের মস্ত সংসার নিয়ে এখনও আছেন। রোজ অতসী তাদের ওখানে কাগজ পড়তে যায়। তাদের দু-একটি ছেলের সঙ্গে উৎপলেরও বেশ আলাপ আছে। দুপুর বেলা সবিতা একবার ক'রে সেখানে গিয়ে বসে, কিন্তু সে একটা অভ্যাসের মত। আগেকার আগ্রহ আর তার নেই।

এ রকম তার আর কোন দিন হয় নি। সৌখীন কাজ কোন দিনই জানে না। চিরকাল সে অবসর সময়ে রান্নাঘর সংক্রান্ত মোটা কাজ নিয়েই কাটিয়েছে। পাড়া-পড়শীর সঙ্গে গল্প করতে করতে সুপুরী কুচিয়েছে, কি আমের দিনে আমসী দিয়েছে; মাসকাবারের জি[illegible] গুছিয়েছে কি, মসলাপাতি ধুয়ে রেখেছে, লেপ-তোষক কাপড়-চোপড় রোদে দিয়েছে, ঝেড়ে মুছে ঝাঁট দিয়ে ঘর-দোর ঝকঝকে ক'রে তুলেছে। এখন মনে হয়, সেই রাজগঞ্জের চার ভিটের চারখানি ঘর, মাঝখানে প্রশস্ত উঠোন পশ্চিম দিকে পুকুর, সেই পুকুরঘাটে তার জীবনের কত সকাল কত দুপুর যে কাটল। সেই রাজ-গঞ্জের বাড়ী, পুকুর, চারদিকের প্রতিবেশীরা, খুকীর ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা মাঝে মাঝে আসতেন, সে রেকাবে করে পান সেজে দিত, পান খেতে খেতে কত কি গল্প করতেন তাঁরা, অত বিদ্যেবুদ্ধি তাঁদের কিন্তু অহঙ্কার ছিল না। সে সবই ছিল সবিতার আপন। সেই তার নিজের সংসার ছিল, ক'লকাতায় কেউ কারো নয়, সবাই যে যার একলা।

কিন্তু বীণা মেয়েটিকে পেয়ে আজ মনটা একটু হাল্কা

হয়েছে তার। আজ সারাদিন বীণার মা প্রায় অচৈতন্য হ'য়ে আছেন, রাত কাটবে বলে আশা নেই। সবিতাকে কেউ রোগীর কাছে বেশীক্ষণ থাকতে দেয় নি। সেও এ নিয়ে জোর করে নি। কারণ রোগীর সেবা সুনিপুণ ভাবে করতে সেও খুব অভ্যস্ত নয়। তার নিজের মেয়ে এ বিষয় তার চেয়ে অনেক পাকা। সে সারাদিন বীণার কাছে কাছে রইল। তার নিজের আজ একাদশী খাওয়ার হাঙ্গামা নেই। রান্নাঘর ঝিকে দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে সে রাঁধতে বোসল, বীণার বারণ মানলো না। বীণার মুখ ম্লান হয়ে গিয়েছে, বারে বারে চোখে জল এসে পড়ছে, আজ যে তার বড় দুর্দ্দিন এ কথা কেউ না বলে দিলেও সে বুঝতে পেরেছে।

একটু একটু করে রাত বাড়তে লাগলো। বীরেশ্বর ফিরে এল, উৎপল এল, সারাদিনের উপবাসে ক্লান্ত দেহে সবিতা বীণার উপরোধে একটু দুধ খেয়ে বারান্দায় এসে মাদুর পেতে বোসল, বলল—"বীণা, যখনই দরকার পড়বে আমাকে ডেকো, আমি তো কিছুই করতে পারি নে, তবু যতটুকু কাজে লাগি।"

বীণা একটা বালিশ এনে দিয়ে বলল, আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন।

ঘুম ভাঙলো, তখন বেশ রাত হয়েছে। ঘরের ভেতর একটা ব্যস্ততার ভাব। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে যে ঘরে বীণার মা শুয়ে আছেন সে ঘরে উঁকি মেরে সবিতা দেখল, ডাক্তার বসে ইনজেকসন দিচ্ছেন, ঘরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, পায়ের কাছে বীণা প্রতিমার মত স্তব্ধ হ'য়ে বসে। বীণার বাবা জোরে জোরে নাম জপ করছেন। আর তার ঘরে ঢুকতে সাহস হোল না। দরজার আড়ালে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল তার, মনে হোল একদিন তার শয্যা ঘিরেও এমনি সব অনুষ্ঠান হবে।

ইনজেকসনের সাময়িক একটু সুফল দেখা গেল। বীণার মা হঠাৎ চোখ খুলে চাইলেন। চারদিকে কেমন এক অবাক্ দৃষ্টিতে তাকালেন, যেন কিছুই চিনতে পারছেন না। বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করলো—'মা কেমন আছ?' তার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না, বললেন, বীণা কোথায়?

বীণা কাছে এসে দাঁড়াল। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে কি যেন বললেন, সবাই নীচু হয়ে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলে।

আধঘণ্টা পরে বীণাকে দুহাতে বুকের কাছে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিল সবিতা। কোন কথা বলে নয়, কেবল তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে যতটুকু দুঃখ তার লাঘব করা যায়। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের পাণ্ডুর জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে। সবিতার মনে হোল, বীণার মা এখনও চ'লে যাননি, কাছাকাছি কোথাও তিনি আছেন। বীণাকে সে যে কোলে টেনে নিয়েছে এ দেখে তিনি যেন তৃপ্তি পেয়েছেন। অধিকতর আশ্বাসে সে বীণাকে আরো কাছে নিয়ে আসে। মাতৃহীনের মা হবে তবেই তো মা হওয়া তার সার্থক।

কিন্তু বীণার মায়ের মৃত্যু দিয়েই অশান্তি ও গোলযোগ মিটে গেল না। তাঁর মৃত্যুর পরে দু'দিন এ বাড়ীতে থেকে বীণাকে একটু সুস্থ দেখে ফিরে যাবে সবিতার এই ইচ্ছে ছিল। নিজের ঘরটিতে ফিরে যেতে মনে মনে তাড়াও ছিল তার। অতসী সকাল বেলায় এসেছিল। বীনা তখন শোকার্ত্ত, তার সঙ্গে বিশেষ আলাপ তার হয় নি। যাবার সময় চুপি চুপি সবিতাকে বলে গিয়েছে—'মা, তুমি শীগ্‌গির চ'লে এসো, বীণাকেও নিয়ে চল না কেন। তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারিনে, কখনও তো থাকিনি।' তার একথা শুনে অবধি সবিতার মনে আর স্বস্তি নেই। খুকীকে ছেড়ে সেই বা কবে থেকেছে? কিন্তু বীণাকে ফেলে যাওয়াও যেমন কঠিন, নিয়ে গেলেও তেমনি মুস্কিল, কেননা বীণার বাবা মেয়ের সেবাযত্নের ওপরে নির্ভরশীল। দিনটা একভাবে কেটে গেল। সন্ধ্যে হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বীণার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তাদের বাড়ীতে ঘরের সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং যে ঘরটায় তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে সে ঘরে বারে বারে আসা-যাওয়া না করে কাজ চলে না। সংসারের অর্দ্ধেক জিনিষ সে ঘরে। সন্ধ্যেবেলায় সবিতা সে ঘরে একটি প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছে। বীণাকে দু'একবার কি কাজে সে ঘরে যেতে হোল। তারপর সে এসে সবিতার কাছে বসে পড়ে দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলো—'আমার ভয় ক'রছে মাসীমা।'

'কেন মা, কি ?'

'মা যেন রয়েছেন, কেবলই তাঁকে যেন দেখতে পাচ্ছি। মাসীমা, আমি এমন একলা হ'য়ে গেলাম তাই বোধ হয় মা আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারছেন না ?'

সবিতা তাড়াতাড়ি তাকে কোলে টেনে নিয়ে বলল, 'কি পাগল ওসব কথা কি ভাবতে আছে ? কোন ভয় নেই, তিনি স্বর্গে গিয়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছেন।'

পরের দিন আবার সন্ধ্যে থেকেই বীণার ভয় সুরু হোল। সে যেন বদলে গিয়েছে। বাইরের দুঃসাহসী মেয়েটির আড়ালে শঙ্কিত দুর্ব্বল মেয়েটি লুকিয়ে ছিল—আঘাত পেয়ে সেই বাইরে এসেছে। সবিতা ব্যাপার দেখে বীণার জন্য শঙ্কিত হোল। পরের দিন সকালে থেকে জ্বরের ঘোরে বীণা আর চোখ চাইতে পারে না। ডাক্তার এসে বললেন, —'শক্ লেগেছে মনে, খুব সাবধানে রাখতে হবে, নইলে রোগ ব্রেণে চড়াও করা অসম্ভব নয়।' তিনি বললেন হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিতে কিন্তু সবিতা সে কথা মানতে চাইল না। সে বলল, 'ওর মায়ের কোল থেকে আমি ওকে কোলে নিয়েছি, ওর অসুখের সময় আমার কাছে রাখতে না পারলে আমি স্বস্তি পাব না। আমাদের বাড়ীতে ওকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা তোমরা ক'রে দাও। খোকার ঘরে খুকী থাকবে। আমাদের ঘরে বীণাকে নিয়ে আমি থাকবো—তার আগ্রহে সকলেই শেষে এই ব্যবস্থা মেনে নিলেন। বীণাকে নিয়ে সবিতা তার বাড়ীতে এল। বীণা তখন জ্বরে আচ্ছন্ন। পনেরো দিন ধরে সবিতা ও অতসীর অক্লান্ত সেবায় বীণার জ্বর ছেড়ে গেল, কঠিন ব্যধির হাত থেকে তাকে তারা যেন ছিনিয়ে আনল।

পরবর্ত্তী জীবনে বীণার এই অসুখের কথা অতসী ও উৎপল তাদের জীবনের সর্ব্ব প্রধান ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম বলে মনে করতো। এই অসুখ অলক্ষ্যে তাদের জীবনের ভবিতব্য নির্দ্ধারণ ক'রে দিয়েছিল যদিও তখন তারা বা কেউই তা ভাবতে পারে নি। এই অসুখের মাধ্য সবিতা বীণার একেবারে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। জীবনে ছেলে বা মেয়ের কোন অসুখের পরীক্ষায় তাকে পড়তে হয়নি। মণিমালা ও তরু যদি তার মন করুণায় অভিষিক্ত ক'রে না দিয়ে যেত, বীণার মা যদি নিশীথরাত্রে অমন ক'রে না চ'লে যেতেন, যদি আকাশে পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় অলক্ষ্য মৃত্যুর পদসঞ্চার সে শুনতে না পেত, বীণাকে যদি মনে মনে সে মেয়ে বলে গ্রহণ না করতো, তবে হয়তো তাকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্যে, তার যন্ত্রণা লাঘব করবারও জন্য অমন ব্যাকুলতা তার হোত না। কিন্তু তার মনে হয়েছিল ভগবান বীণাকে তার জীবনে জুটিয়ে দিয়েছেন, বীণা আশ্রয় নিয়েছে তার কোলে! যেমন ক'রে হোক্ আশ্রয় তাকে দেওয়া চাই। বীণা অতসী বা উৎপলের মত শক্ত নয়, সাহসী নয়। সবিতাকে না হলেও তাদের চলে। কিন্তু সবিতা ছাড়া বীণার আর এখন উপায় নেই। রমেশকে সে রোগীর ঘর ছেড়ে বেরুতে দিত না। তার মনে হোত, রমেশ যখন ডাক্তার, সে বসে থাকলে বীণা কিছুতেই ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারবে না। উৎপল, রমেশ, বীরেশ্বর, অতসী এরাই সেবা করতো রাতদিন পালা ক'রে, সবিতা কেবল ঘরে বসে সমস্ত হৃদয় একাগ্র ক'রে কামনা করতো, ভাল হয়ে উঠুক, মেয়েটা বেঁচে উঠুক। সকলের সামনেই সে বলতো, বীণা বেঁচে উঠলে তাকে আমি ছেলের বৌ কোরব। আমার ঘরে যখন এসেছে, তাকে আর আমি অন্য কোথাও যেতে দেবোনা। একথা শুনে অতসী মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উৎপলের দিকে চাইতে, কিন্তু উৎপলের মুখে কোন ভাবান্তর দেখা যেতো না। সকলেই ভাবতো এ [illegible] সাময়িক উত্তেজনায় সবিতা এ সব কথা বলছে।

এই অসুখের উপলক্ষে বীরেশ্বরের সঙ্গে অতসীর খুব ভাল ক'রে পরিচয় হোল এবং ক্রমশঃ তাদের আলাপ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল দুজনেরই মতের ঐক্যে। আর একটা কারণ ছিল, বীরেশ্বর হিমানী ও তার স্বামীর বিশেষ পরিচিত। সে তাদের দুজনের অনেক গল্প অতসীকে শোনাত।

একদিন রাত্রে বীরেশ্বর চলে যাবার পরে উৎপল নিভৃতে অতসীকে জিজ্ঞেস করলো, 'খুকী, বীরেশ্বর তোকে রাত দিন অত কি বক্তৃতা শোনায় রে ?'

অতসী চুপ ক'রে রইল। উদ্বিগ্ন হ'য়ে আবার উৎপল বলল, 'দেখ্ অতসী, বীরেশ্বরকে আমি খুব জানি। এক কালে আমি ওর দলে ছিলাম, খুব তর্ক হোত আমাদের।

ও বলতো আমাকে, আমার কেবলই ভাবের বিলাসিতা, কোন কাজ করবার মুরদ নেই, সে কথা যে মিথ্যে তাও নয়। যে কোন কারণেই হোক ওর কাছ থেকে আমি সরে এসেছিলাম। এখন আবার ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হোক আমি চাই নে, কারণ ওর স্বভাবই হচ্ছে জবরদস্তি ক'রে দলে টানা। আমাকে না পেরে এখন বুঝি তোর পেছনে লেগেছে?

অতসী বলল, 'আর একদিন এ কথার উত্তর দেবো দাদা, আজ থাক্।'

এর পরের দিন বিকেল বেলা বীণার বিছানার পাশে বসে রমেশ জ্বরের চার্ট পরীক্ষা করছিল। অতসী কি কাজে ঘরে এল, কাজ সেরে চলে যাবে এমন সময় অতি মৃদু কণ্ঠে রমেশ বলল, 'অতসী আজ সকালে কোথায় গিয়েছিলে?'

চমকে উঠল অতসী। তার পর বলল, 'একজনের সঙ্গে দেখা করতে রমেশ-দা --'

'দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'বীরেশ্বরের সব খবর জানো অতসী?'

'জানি, রমেশ-দা।'

সবিতা ঘরে ঢুকল এমন সময়। রমেশকে কথা বলতে দেখে ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞেস করলো—'কি হয়েছে রমেশ?'

রমেশ হেসে বলল, 'কিছু নয় মা, অতসীকে বলছি—তার লেডী ডাক্তার হওয়ার যে ঝোঁক চেপেছিল তার কি হোল? এ বছর সিট অনেক খালি আছে।'

সবিতা বলল, 'ওসব বাদ দাও তোমরা। মেয়েমানুষের কি মানায় ও সব রোগ ঘাটা আর কাটা-চেরা করা? ওসব তোমাদের জন্যে।'

সে রাত্রে রমেশ বাসায় ফেরবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসতেই তার মনে হোল সিঁড়ির কাছে কে দাঁড়িয়ে আছে। পাশ কাটিয়ে নেমে যাবে এমন সময় অতসীর গলা শুনে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। অতসী বলল, 'রমেশ-দা, আজ দিনের বেলায় যা জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন তা ভালো ক'রে জবাব দেওয়া হয় নি, তাই দাঁড়িয়ে আছি।

রমেশ বলল, 'এখন কি উপযুক্ত সময় নাকি?'

অতসী বলল, 'সবাই ব্যস্ত রয়েছে, আমাদের কথায় কেউ কান দেবে না। শুনুন রমেশ-দা, আমি মন ঠিক ক'রে ফেলেছি। আজ সকালে আমি বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে যাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম, তিনি আমাকে নির্দ্দেশ দিয়েছেন আর আমার মনে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই।'

'কী নির্দ্দেশ দিলেন তিনি?'

'তিনি বললেন, আগ্রহ ক'রে যেই আসুক এ পথে, তাকে নিবৃত্ত করবার অধিকার কারুর নেই। তবে তিনিও বলেন, ভেবে দেখতে, নিজেকে তৈরী ক'রে নিতে।' সামান্য একটু সঙ্কোচের ভাব এল, তখুনি তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অতসী বলল, 'তিনি বলেন, মেয়েদের যে পথে চরম সার্থকতা বিয়ে এবং ঘরকরণা এবং মাতৃত্ব তার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার কোন যুক্তি নেই। মেয়েদের এ পথে আসার তিনি পক্ষপাতী নন।'

'তুমি কি বললে?'

'আমি বললাম, আমি অনেকদিন ধরে ভেবেছি। আমি মনে মনে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছি, আর ফেরবার উপায় নেই। এখন আমার যে মন তা নিয়ে ঘরকরণা চলে না।' তখন তিনি বললেন 'তবে তৈরী থেকো, কখন যে ডাক পড়বে ঠিক নেই, তবে পড়বেই।'

আমাকে এসব আর শুনিও না অতসী।" রমেশের গলার স্বর কেঁপে উঠ্‌ল। একমুহূর্ত্তের জন্য সে যেন নিজেকে ভুলে গেল। 'অতসী, তোমার মায়ের কথা ভাবছনা?'

"মা আমাকে নিয়ে এখনও সুখী নন রমেশ-দা। আমি তো কোন দিনই তাঁর খুব কাছে যেতে পারি নি। এই যে আপনাকে এ সব বলছি, মাকে কি পারতাম শোনাতে? আমি দাদা আর মা তিনজনে ঠিক মিলতে পারলাম না কোন দিন। তিনজনেই আমরা আলাদা ধরণের।"

রমেশ বলল, "অত কথাই ভেবে দেখেছ, আর এটুকু বুঝতে পারছ না যে, তুমি কাছে থাকলে সুখী হলেই তাঁর সুখ। কঠিন কথা বুঝতে একটু আটকায় না, কিন্তু উৎপল,

তুমি তোমরা দুজনেই সহজ কথাগুলি ঠিকমত বোঝনা কেন? আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাই তোমরা নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে চারদিকে যে দেয়াল তুলে দিয়েছ তাইতেই তোমাদের মা বার বার আঘাত পেয়ে ফিরে যান। ওই যে বীণা ওকেও তোমাদের চেয়ে বেশী বুঝতে পারবেন তিনি।"

তার তিরস্কারে অপ্রতিভ না হয়ে হেসে অতসী বলল—"কি করব রমেশ-দা, নিজেকে তো বদলে ফেলতে পারি নে? তা হলে যে আগাগোড়াই পাল্টে দিতে হয়, তাতেই কি মা সুখী হবেন।"

পরের দিন বীরেশ্বরকে অতসী একান্তে জিজ্ঞেস করলো, 'বলুন তো আপনি তো এতকাল ধরে এই পথে আছেন, সত্যিকার কি কি কাজ করেছেন?'

বীরেশ্বর বলল, 'আমাদের যিনি মাস্টার মশাই তিনি এ পর্য্যন্ত আমাকে কেবল পরীক্ষাই করছেন। এখন পর্য্যন্ত তাই দূতীগিরির চেয়ে বেশী এগুতে পারি নি। আমাকে তিনি বলেন 'এজেন্ট', পাণ্ডা বা গাইডরা যেমন যাত্রীদের টেনে এনে নিজেদের খাতায় নাম লেখায় আমার নাকি এখনও তার বেশী যোগ্যতা হয়নি। নইলে আমার দলের কত লোক এতদিনে মরে ভূত হয়ে গেল, অথবা সশরীরে স্বর্গে গেল, আমি এখনও কেবল এর তার সঙ্গে তর্ক করে বেড়াচ্ছি?'

'আপনার ওপরে এ জুলুম কেন মাষ্টার মশায়ের?'

বীরেশ্বর হেসে বলল, 'দেখলেন না লোকটা কেমন ভিজে ধরণের? কেবল বলেন গীতা পড়, নিরিমিষ খাও, আমাকে বলেন আমি নাকি বড্ড বেশী তর্ক করি।'

'দলের সবাই তাঁকে খুব মানে, না?'

'মানে না আবার? তবে নিরিমিষ খাওয়ার নিয়ম লুকিয়ে কেউ ভাঙেনি এমন বলা যায় না; তিনিও তো জানেন। এই একটা গুণ, এসব কিছুতেই তিনি mind করেন না। এক সপ্তাহ পরে আপনাকে আর একবার নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে।'

হঠাৎ উৎপল ঘরে ঢুকে পড়ল। বীরেশ্বর, অতসী দুইজনেই তাকে দেখে একটু চকিত হ'য়ে উঠল। উৎপল বীরেশ্বরের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'অতসীকে কি বোঝাচ্ছ বীরেশ্বর?' বীরেশ্বর বলল, 'ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন?'

'বীরেশ্বর কি বলছিল অতসী?'

মাথা নীচু ক'রে একটুক্ষণ চিন্তা করল অতসী তারপর বলল, 'তোমার সঙ্গে বীরেশ্বর বাবুর মতের মিল হয়নি, আমার সঙ্গে হয়েছে দাদা, আমি এখন ওঁর পথের পথিক। তোমাকে একথাটা জানাব বলে নিজেই ঠিক করেছিলাম।'

'অতসী, এ কিছুতেই হ'তে পারে না।'

দেখতে দেখতে তিনজনের তর্ক তুমুল হয়ে উঠ্‌ল। গলার স্বর তাদের অজ্ঞাতে উচ্চগ্রামে চড়ল। পাশের ঘর থেকে রমেশ এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'চুপ করো চুপ করো উৎপল, পাশের ঘরে রোগী খেয়াল নেই?' তার কথায় সচকিত হ'য়ে গলার স্বর তারা নামাল বটে. কিন্তু তর্ক শীগ্‌গির থামল না। তর্ক বীরেশ্বর ও উৎপলের মধ্যে, অতসী দু'একটি কথা বলে মাঝে মাঝে বীরেশ্বরকে সমর্থন করছিল। সন্ধ্যে হোল যখন তখন বাধ্য হ'য়ে তারা চুপ করলো, কিন্তু তাদের উত্তেজনা সেদিন সহজে শান্ত হোল না। যাবার সময় বীরেশ্বর বুঝে গেল যে; সে যে আর এ বাড়ীতে আসে উৎপলের তা ইচ্ছে নয়।

ক্রমশঃ

অন্ধকারের আফ্রিকা

(ভ্রমণ)

ভূ-পর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

মধ্য আফ্রিকার দাস-ব্যবসায়ের কেন্দ্রভূমি আজও ন অন্ধকারে আবৃত। দেশ-বিদেশের লোক এখনও াম্রাজ্যবাদী ধনী পরিচালিত চলৎ-চিত্র দেখে আফ্রিকার নিগ্রোদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়। সাম্রাজ্যবাদী ঘরে বাইরে মান। নিজের দেশের লোককে যেমন করে অন্ধকারের াঝে রেখে সর্ব্বস্ব হরণ করতে বদ্ধপরিকর, অপর দেশের লাককেও তেমনি করে শোষণ এবং শাসন করতে ্ত-নিশ্চয়। সেজন্যই আমরা আফ্রিকা সম্বন্ধে কিছুই ানতে পারছি না।

আমাদের দেশের অনেক লোক আফ্রিকার নিবিড় নেও আজ বাস করছে। তারা ইচ্ছা করলেই বই লখে দেশ-বিদেশের লোককে আফ্রিকার স্বরূপ জানাতে ারে। আমাদের দেশের শিক্ষিত এবং ধনীর ছেলেরা চ্ছা করিলেই আফ্রিকার আনাচে-কানাচে বেড়িয়ে এসে াদের অনুভব বজ্রকণ্ঠে চীৎকার করে সকলের কানে পৌঁছাতে পারে। আমাদের দেশের দার্শনিক এবং র্ম্ম-যাজকের দল ইচ্ছা করলেই মানবতার খাতিরে াফ্রিকার তথাকথিত অসভ্য-বর্ব্বরদের কথা লিপিবদ্ধ রতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়ে সকলেই উদাসীন। াফ্রিকার লোক যেন মানুষ নয়, ইহাই বোধ হয় তাদের ারণা। আমি কিন্তু অন্য মত পোষণ করি। আমার ারণা জাতীয়তাবাদ পুঁজিবাদ এদের মুখ বন্ধ করেছে।

আরবদের ধারণা ভূপর্যটক মাত্রেই বিশ্বপ্রেমিক। ামাকেও অনেকে বিশ্বপ্রেমিক বলেই আখ্যা দিয়েছিল। ামি বিশ্বপ্রেমিক বলে দাবী করি না। আমি দাবী করি, াামি একজন মানুষ। মানুষ হয়ে যদি স্বার্থের বশীভূত য়ে মনুষ্যত্ব রাখতে না পারা যায় তবে মানব-জন্মই বৃথা। সই ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই আমি অন্ধকারে আফ্রিকার মাঝে সহস্র সূর্য্যের কিরণ নিক্ষেপ করতে চেষ্টা করব। পারি না পারি তা অন্য কথা।

বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকার মম্বাসা, এবং নাইরবী এ-দুটি বিশিষ্ট স্থান ভ্রমণ করে আফ্রিকার প্রকৃত জঙ্গলে প্রবেশ করতে সুযোগ পেলাম। আমি আফ্রিকার ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করার জন্য উৎসুক হয়ে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করতে ছিলাম। সাহায্য অপ্রত্যাশিত ভাবেই আসল। একজন শিখ আমাকে আমার ঈপ্সিত সুযোগ এবং সুবিধা করে দিলেন। আমি চললাম তার সঙ্গে অন্ধকারের আফ্রিকায়।

নাইরবী হ'তে, কীজাবী, নরক, মারা হয়ে লাংগরেন পর্য্যন্ত একটি সরকারী রাস্তা গিয়েছে, তারপরই রাস্তার শেষ, আমরাও স্বাধীন। এর পর হতেই পার্বত্য জাতির বসবাস। আজ পর্য্যন্ত কেউ পার্বত্য জাতির কাছ হতে কোনরূপ টেক্স আদায় অথবা আইন ও শৃংখলার প্রচলন করতে সক্ষম হননি। বনের জানোয়ার যেমন স্বাধীন. এই অঞ্চলে যারা বসবাস করে তারাও স্বাধীন। সভ্য দেশের লোক স্বাধীনতার জন্য চীৎকার করে. এখানে সেই বালাই নেই, সকলেই স্বাধীন। বনে জংগলের স্বাধীনতার স্বরূপ কি তা সকলে জানে না। লংগরিয়েন ছাড়বার পূর্বে আমরা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য এবং অনেকগুলি বুলেট যোগাড় করেছিলাম। শিখ ড্রাইভার, পাঞ্জাবী হিন্দু এবং তিনজন নিগ্রো, সকলেই আপন মতলব মত কাজ করবার ফন্দি আটছিল, শুধু আমি নিশ্চিন্ত মনে অন্ধকারের আফ্রিকার কথাই ভাবছিলাম। গ্রাম পরিত্যাগ করে আমরা নিবিড় বনে প্রবেশ করিনি। আমি নিবিড় বন দেখব তাই ভাবছিলাম, কিন্তু গভীর অথবা নিবিড় বন আমার সামনে আসছিল না। যতদূর দেখতে

পাচ্ছিলাম শুধু পর্বতমালা। পর্বতমালায় উচ্চবৃক্ষ একটিও নেই। নদী নালা যথায় গড়ে উঠছে তথায়ই শুধু কয়েকটি ঝোপ। ঝোপের ভেতর দিয়ে হয় প্রস্রবণ নতুবা কল্লোলিনী বয়ে যাচ্ছে। অনেক কল্লোলিনীর জল পরিষ্কার, অনেকের আবার দুর্গন্ধময় ঘোলা জল কল কল করে বয়ে যাবার সময় দুর্গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

এরূপ দুর্গন্ধযুক্ত একটি কল্লোলিণীর কাছ দিয়ে যাবার সময় সাথীদের জিজ্ঞাসা করে যখন অবগত হলাম, এখানে হাতী এসে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে তখন সাথীদের মটরলরী থামাতে বলায়, তারা বললে এরূপ স্থানে কোন মতেই যাওয়া উচিত নয়। এসব স্থানে নানারূপ হিংস্র জীব ত থাকেই, উপরন্তু একরূপ বোলতা থাকে যারা সাধারণত পচা হাতির মাংসেই ডিম্ব প্রসব করে। পচা হাতির কাছে গেলেই তারা তাজা মাংসের মাঝেও হুল ফুটিয়ে দিয়ে ডিম প্রবেশ করিয়ে দেয়। সে ডিম ডাক্তারগণ বের করতে পারেন সত্যকথা; কিন্তু সকল সময় অপারেশন কৃতকার্য্য হয় না। শিখ ভদ্রলোক পরিশ্রান্ত থাকায় তিনি মটর থামাতে রাজি হলেন। আমি বিনা অস্ত্রে ঝোপের দিকে রওনা হলাম।

দূর থেকে ঝোপ কাছে বলেই মনে হয়, কিন্তু পায়ে হেঁটে যেতে বেশ কষ্ট হয় এবং ঝোপগুলি অনেক দূরেই বুঝতে পারাযায়। ক্রমাগত এক ঘণ্টা চলে যখন ঝোপের কাছে গেলাম, তখন বুঝলাম এটা ঝোপ নয়, এটা একটা বিরাট বন। এই বনে প্রবেশ করলে দিকভ্রম হবে নিশ্চয়ই এবং বের হয়ে আশা সম্ভব হবে কি না তাও বিবেচ্য বিষয়। দূর থেকেই তথাকথিত ঝোপ দর্শন করে ফিরে আসতে হ'ল। যার ভেতরে প্রবেশ করতে সাহস ও হ'ল না, তার সম্বন্ধে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নাই। আমি লরীতে ফিরে এলাম। নাকে যে দুর্গন্ধ লেগেছিল সেই দুর্গন্ধ ছাড়াতে আমাকে অনেক সময় নষ্ট এবং কষ্টও করতে হয়েছিল। পাঞ্জাবী হিন্দু বললেন, বাবু সাহেব এ টেংগানিয়াকার অথবা কেনিয়ার উলুবন নয়, গণ্ডায় গণ্ডায় সিংহ, হাজারে হাজারে হরিণ, খরগোস, বনগরু, জেব্রা উঠপাখী এসব দেখতে পাবেন? এটা হলো আসল আফ্রিকা, যেখানে এখনও ইউরোপীয় সভ্যতা কেন আরবরা আসতে ভয় পায়।

এখানে শিখ ভদ্রলোকের পরিচয় আমি দেব। তার নাম আমি জানি না। তবে তাকে পাঞ্জাবী ভদ্রলোক পিতমসিং বলেই ডাকতেন। পিতমসিং যে শিখ ভদ্রলোকের আসল নাম নয় তা আকারে ইংগিতে বুঝতে পেরেছিলাম। তাঁর মোটরের লাইসেন্স ছিল না। তাঁর মোটর চালাবারও লাইসেন্স ছিল না। তিনি প্রায়ই un-administered স্থানে বসবাস করেন। যখন তাঁর পেট্রল এবং মবিল তেলের দরকার হয় তখন তাঁর এজেন্টগণ তাঁকে সাহায্য করেন। তিনি ডাকাত নন; অথবা কারো কোন অনিষ্ট করেন না। তাঁর বন্দুকের লাইসেন্স ছিল না। তাঁর সংগে তিনটি নিগ্রোই ভবঘুরে অথবা জেল-পলাতক বলেই বুঝতে পেরেছিলাম। পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে একজন দালাল বলেই মনে হ'ত। কিন্তু যখনই তিনি হিন্দু সভ্যতার কথা বলতেন তখন তাকে পণ্ডিত বই আর কিছু ভাবতে আমার মন অক্ষম হ'ত। তার ইংরাজী ভাষায় প্রচুর অধিকার, পারসী ভাষা যেন তার মাতৃভাষা, সোহেলী তিনি বেশ বলতে পারতেন। আরবী তিনি আরবদের মতই বলতে পারেন। পণ্ডিত, লোভী এবং নরঘাতী এই তিন রকমের লোকের সংগে আমার ভাগ্য ভাসিয়ে দিয়েছিলাম পনর দিনের জন্য। পনরটি দিন যদিও আমাকে কমই বিশ্রাম করতে হয়েছিল, তবুও আজ আমার মনে আছে এই পনর দিনে আমি যে অ[illegible]তা অর্জনের সুবিধা পেয়েছিলাম সেরূপ সুবিধা জীবনে পাব কি না সন্দেহ।

দিনের বেলায় চলার পথে আমরা খুব কমই বিশ্রাম নিয়েছিলাম। সন্ধ্যার পূর্বে একটি সমতল ভূমিতে মোটর-লরী থামিয়ে, থাকবার এবং খাবারের বন্দোবস্ত করার জন্য আমরা সকলে মিলে কাজে লেগে পড়লাম। খাবারের জন্য আমাদের চিন্তা করতে হয় নি। এক খুচ্ছের ঘিয়ে ভাজা মোটা মোটা চপাতি যাকে নিগ্রোরা বলে "মাকাটি" আমাদের সংগে ছিল। কতকগুলি সব্জী আমরা এনেছিলাম তাই ভেজে নিয়ে সকলে মিলে খেয়ে নিয়ে চা তৈরী করে প্রত্যেকে এক এক মগ চা খেলাম। তার পর বিশ্রাম।

আমাদের সংগে তাবু ছিল না। লরীর উপর প্রকাণ্ড

একখানা ঘরের মতই ছিল। তাতে তিনজন করে ঘুমাতে লাগলাম এবং তিনজন করে লরীকে পাহারা দিতে লাগলাম। আমি ভেবেছিলাম, হয় ত কোন জানোয়ার আক্রমণ করবে, কিন্তু তা নয়, এখানে নাকি ডাকাত আছে। ডাকাতরা প্রায়ই নিগ্রো এবং আরবে মিশানো এক জাতীয় লোক। তারা মোম্বাসা, নাইরবী, কাম্পালা এবং অন্যান্য সহরে থাকে, এবং সুযোগ এবং সুবিধা পেলেই বিনা লাইসেন্সে হাতীর দাঁত, সোণার "ওর", মূল্যবান কাঠ, ছোট ছোট মুক্তা এ সব নিগ্রোদের কাছ থেকে কিনে গোপনে সহরে বিক্রয় ক'রে মোটা টাকা রোজগার করে। এরূপ একদল চোর অন্য দল চোরকে পেলে মিতালী করার বদলে শত্রুতা করে এবং সেই শত্রুতার ফলে হতাহতও হয়। আমি বুঝতে পারলাম কি রকম লোকের সংগে এড্‌ভেনচার করতে এসেছি। ক্রমশঃ

ব্যঙ্গরচনায় জনাথন্ সুইপ্ট

শ্রীহেরম্বনাথ রায়

"By far the greatest man of that time, I think, was Jonathan Swift. . . He saw himself in a world of confusion and falsehood, no eyes were clearer to see it than his."

টমাস কার্লাইলের (Thomas Carlyle) এই মন্তব্যে সুইপ্টের প্রকৃত পরিচয় অনেকখানি পরিস্ফুট হইয়াছে।

'ক্লাসিকেল' যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক জনাথন্ সুইপ্ট ডাবলিন সহরে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে ৩০শে মার্চ্চ জন্ম গ্রহণ করেন। সুইপ্ট আয়ারলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিলেও তাহার পিতামাতা উভয়েই ছিলেন ইংরাজ। সুইপ্ট জীবনের অধিকাংশ সময় আয়ারলণ্ডেই অতিবাহিত করিয়াছেন। অতি শৈশবকালেই পিতার মৃত্যু হওয়ায় সুইপ্ট ও তাঁহার মা একেবারে অসহায় হইয়া পড়েন। তাহার পিতা মাত্র ২০ পাউণ্ড আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। জীবনধারণের জন্যে তাঁহাদিগকে খুল্লতাতের (Godwin) আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই ভাবে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হওয়ায় সুইপ্টের তরুণ প্রাণে বাস্তবতার রূঢ় আঘাত কঠিন হইয়াই লাগিয়াছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও তিনি ছেলেবেলার এই অসহায় অবস্থার অভিজ্ঞতার কথা ভুলিতে পারেন নাই। ছেলেবেলার এই অসহায় অবস্থা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আট বৎসর তিনি 'কিল্‌কেনী' (Kil kenny) স্কুলে পড়াশুনা করেন। কন্‌গ্রেভ্ (William Congreve) সেখানে তাহার সমপাঠী ছিলেন। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ডাবলিনে তিনি ট্রিনিটি (Trinity) কলেজে যোগদান করেন। কলেজে মেধাবী ছাত্র বলিয়া সুইপ্ট মোটেই সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি 'বিশেষ অনুগ্রহে' বি-এ ডিগ্রী লাভ করেন। বি-এ পাশ করিয়া তিনি তাঁহার মার নিকট ফিরিয়া যান। তাঁহার মা তখন একান্ত নিঃস্ব অবস্থায় ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন। ইংলণ্ডে আসিয়া সুইপ্ট তাঁহার মার দূর সম্পর্কের আত্মীয় স্যার উইলিয়ম টেম্পেলের সঙ্গে (Sir Wiliam Temple) পরিচিত হন। এই পরিচয়ের সূত্রেই ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্যার উইলিয়মের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজটি পাইয়াছিলেন। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড হইতে এম-এ পাশ করেন এবং স্যার উইলিয়মের চাকরী ছাড়িয়া দিয়া আয়ারলণ্ডে চলিয়া যান। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় তিনি স্যার উইলিয়মের চাকরীতে যোগদান করেন এবং ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়মের মৃত্যু পর্য্যন্ত স্যার উইলিয়মের বাসভবন মুর পার্কে (Moor Park) অবস্থান করেন। মুর পার্কেই তাঁহার এস্থার জনসনের (Esther Johnson) সঙ্গে পরিচয় হয়। এই এস্থারই হইতেছেন ষ্টেলা (Stella)। স্যার উইলিয়মের বাসভবন সুইপ্টের সাহিত্যিক জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—এই বাসভবন হইতেই তিনি প্রথম সাহিত্যিক আসরে অবতীর্ণ হন। তাঁহার "Battle of the Books" এবং বিখ্যাত "Tale of a Tub" ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। স্যার

উইলিয়মের মৃত্যুর পর তিনি লর্ড বার্কলের (Lord Berkeley) সেক্রেটারী হিসাবে ডাবলিনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম রাজনৈতিক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। অল্পকালের মধ্যেই তৎকালীন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ্‌দের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। সুইপ্ট রাজনৈতিক বাদানুবাদের মধ্যে এই সুযোগে যোগদান করিয়া বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। হুইগ দলের পক্ষ হইয়াই প্রথমে তিনি তাঁহার শক্তিশালী লেখনী চালনা করেন। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে হুইগ দলের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া তীব্রভাবে হুইগ মন্ত্রীসভাকে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া যান। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে সুইপ্ট ডাবলিন St. Patrick's-এর Dean হইলেন। পরবর্ত্তী বৎসরে তিনি পোপ, গে, আরবুথনট এবং অন্যান্যের সঙ্গে Scriblerus club প্রতিষ্ঠা করেন। রাণী আনের মৃত্যুর পর টোরী দলের পতন হইলে সুইপ্ট 'আয়ারলণ্ডে' চলিয়া যান। পরবর্ত্তী দশ বৎসর সুইপ্ট সাহিত্য চর্চ্চা হইতে বিরত থাকেন এবং কতকগুলি পুস্তিকা রচনা করিয়া দৃঢ়ভাবে আইরিশ পক্ষ সমর্থন করেন। "Drapier's Letters" এই সমস্ত পুস্তিকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচারিত। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'Gulliver's Travels' (গালিভারের ভ্রমণ কাহিনী) প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে একমাত্র গালিভারের ভ্রমণকাহিনী লিখিয়াই তিনি অর্থ পাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। Gulliver's Travels-এর পরে তিনি গদ্য ও পদ্যে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিলেও গালিভারের ভ্রমণ কাহিনীতে তিনি যে নিপুণ শিল্পী-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাঁহার পরবর্ত্তী রচনাবলীতে সেই প্রতিভার অভাব পরিলক্ষিত হয়। জীবনের সায়াহ্নে সুইপ্টের শারীরিক ও মানসিক জড়তা আসে। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি একেবারে উন্মাদ হইয়া যান। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

থ্যাকারে বিয়োগান্ত নাটকের ভগ্নোৎসাহ ব্যক্তির সঙ্গে সুইপ্টের তুলনা করিয়াছেন। তিনি অনন্য সাধারণ বহুমুখী প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার রচনা শুধু মানুষের খর্ব্বতা, স্বল্পতা লইয়াই রচিত হইয়াছে। মানব-জীবনের কোন উজ্জ্বল মুহূর্ত্তের চিত্র তিনি অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। মানুষকে তিনি ঘৃণা করিতেন এবং তিনি উহা দ্বিধাহীন ভাবে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন,

"I heartily hate and detest that animal called man, although I heartily love John, Peter, Thomas, and so forth."

তাঁহার মতে মানুষ স্বভাবতঃই পাপাসক্ত ও ঘৃণ্য এবং নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যেই শুধু মানুষ ধর্ম্ম ও মহানুভবতার ভাণ করিয়া থাকে। তাঁহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে একটা বিরাট সাম্রাজ্য পতনের কথা স্বতঃই আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। বন্ধু অথবা সঙ্গী হিসাবে সুইপ্ট মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিলেন না। সর্ব্বদা তিনি নিজের স্বার্থের কথাই চিন্তা করিতেন—তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও কার্য্যদক্ষতা শুধু তিনি ব্যক্তিগত উন্নতির জন্যেই নিয়োজিত করিতেন। ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি-দিগের সঙ্গে তিনি সদয় ও ভদ্র ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সামান্য কারণেই তিনি তাঁহার অপেক্ষা নিম্নপদস্থ ব্যক্তিদিগকে ভীতি প্রদর্শন এমন কি শাস্তি দিতেও ইতস্ততঃ করিতেন না। দস্যু যেমন অনবহিত পথিকের সম্পত্তি সুযোগ পাইলেই লুণ্ঠন করে, তিনি সেইরূপ মানুষের সামান্য দোষ-ত্রুটির সুযোগ গ্রহণ করি[illegible] নির্দ্দয় ভাবে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে নানা [illegible]র অবতারণা করিয়া মানুষের সুখ, দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে একেবারে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, সম্মানের জন্যে হস্ত প্রসারিত করিয়া-ছিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া সমস্ত মানব-সমাজকেই ইহার জন্যে দায়ী করিয়াছেন। তাই, তিনি শিশু, স্ত্রীলোক, বিবাহ—প্রকৃত পক্ষে মানুষ যাহা কিছুকেই সম্মান ও পুরস্কৃত করিয়া থাকে, তাহার সমস্তকেই তিনি নির্দ্দয় ভাবে ব্যঙ্গ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, এবং এই বিষয়ে তিনি সাফল্যও অর্জ্জন করিয়াছেন অসাধারণ। তাঁহার সহিত যাহার অতি সামান্য পরিচয়ও ছিল, তাঁহাকেও আপন মন্দ ভাগ্যের জন্যে দায়ী করিতে এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়কে তিনি

ঘৃণা করিতেন এবং তাহাদের অনুগ্রহ তাঁহার একেবারে অসহ্য ছিল। স্যার উইলিয়ম তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্মান করিলেও তাঁহার মন বোধ হয় এই কারণেই তাঁহার প্রতি বিমুখ ছিল। ধনী-সম্প্রদায়ের সম্মান, অনুগ্রহকে তিনি সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন না—তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করিবার জন্যই ধনীরা দরিদ্রদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখায়। তাঁহার ধনী-সম্প্রদায় সম্বন্ধে এই ধারণা কোন দিন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কোন দিন কোনরূপ উচ্চ নৈতিক আদর্শ তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তিনি অতি মাত্রায় ভাগ্যান্বেষী ছিলেন—কোন সম্মানই তাঁহার নিকট যথেষ্ট ছিল না। আবার কোন অপমানই কোন বিষয় হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিত না। সর্ব্বদা তিনি একটা অবিশ্বাস—সন্দেহের ভাব পোষণ করিতেন—মানুষ, ভগবান, বন্ধুত্ব, ধর্ম্ম, ভালবাসা—সমস্তকেই তিনি সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ধর্ম্ম-যাজক হিসাবে বাহ্যতঃ তিনি ধর্ম্মের খোলস সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবেরা জানিতেন যে, তিনি ধর্ম্ম-যাজকের কঠোর জীবন পছন্দ করিতেন না। পক্ষান্তরে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও মদ্যের প্রতি তাঁহার একান্ত লোভ ছিল। লোকের নিকট তিনি নিজেকে একজন আদর্শ খৃষ্টান্ বলিয়া প্রচার করিলেও সুযোগ পাইলেই তিনি খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতেন। তাঁহার বাহ্যিক আচার-ব্যবহার দেখিয়া লোকের ধারণা হইত যে, তিনি ভগবানে বিশ্বাস করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকদের সঙ্গেই তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন ও তাহাদিগকে নানা উপায়ে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার খেয়াল মত মাঝে মাঝে তিনি দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিতেন বটে, কিন্তু এই দান হৃদয়ের উচ্চভাব হইতে উদ্ভূত ছিল না। ডান হাতে দান করিয়া বাম হাতেই তিনি অপমান করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। তাঁহার দয়া, সহানুভূতি, দাম্ভিকতা-পূর্ণ ছিল—ইহার মধ্যে শালীনতা ও শিষ্টাচারের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইত। থ্যাকারের মতে ষ্টেলার প্রতি তাঁহার ভালবাসাতেই শুধু তাঁহার হৃদয়াবেগের, কোমল-প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভালবাসা নিঃস্বার্থ ছিল—সাংসারিক পঙ্কিলতার মধ্যে উহাকে টানিয়া আনা যায় না। উহা যেন তাঁহার জীবনে ঘন-কৃষ্ণ-মেঘমালার পার্শ্বে ক্ষীণ রবি-রশ্মি। এই স্বর্গীয় ভালবাসা তাঁহাকে ক্ষণিকের জন্যেও উন্নত ও উদারতর আদর্শে অনুপ্রাণিত করিত। কিন্তু কপটতা বোধ হয় তাঁহার চরিত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল, তাই ষ্টেলার নিঃস্বার্থ ভালবাসারও তিনি প্রতিদান দিতে পারেন নাই। ষ্টেলারকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিলেও তাঁহার কার্য্যাবলী ষ্টেলার মনে আঘাত করিয়াছে। তিনি ভালবাসিতে পারিতেন এবং ভালবাসার মর্য্যাদা দিতেও চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু তাঁহার স্বভাবসুলভ মনোবৃত্তি কোন কোমল ভাবের সঙ্গে দীর্ঘকাল অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধা দিত।

সুইফ্ট 'ব্যঙ্গ-চিত্রকারী' ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ধর্ম্মযাজক, স্বদেশ-সেবক ও প্রেমিক হিসাবেও সাহিত্য-সৃষ্টি করিয়া তিনি বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু 'ব্যঙ্গ-রচনাকারী' হিসাবে (Satirst) তিনি যে অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, ইংরেজী সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। শ্রেষ্ঠ 'ব্যঙ্গরচনাকারী'র রচনায় যে সমস্ত উপাদান অত্যাবশ্যক, সুইফ্টের রচনায় তাহাদের কোনটারই অভাব নাই। ভাল, মন্দ, সমস্ত বিষয়েরই তিনি দোষ প্রদর্শন করিয়া শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার সময়কার সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা, মানুষের রুচি ও ভাবধারা, তাঁহার যৌবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা, আর্থিক উন্নতির মোহ. তাঁহার ব্যঙ্গ-রচনায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অত্যুগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য তাঁহার সমস্ত উচ্চাশাকে নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছে। তিনি ক্ষমতা, অর্থ ও সম্মানের জন্যে বিশেষ লালায়িত ছিলেন, কিন্তু আশানুরূপ কোনটাই তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল যে, মানবসমাজ তাঁহার প্রতিভার যথাযোগ্য সম্মান তাঁহাকে দেয় নাই, সেই জন্যেই মানুষের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান—তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া তিনি মানুষের দোষ-ত্রুটি কৌশলপূর্ণ ভাষার আবরণে নানা ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন—সমাজের কোন শ্রেণীর

লোককেই তিনি ক্ষমা করেন নাই। শিশুর প্রতিও তাঁহার কোন কোমল-ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না—নির্ম্মমভাবে শিশুকেও কশাঘাত করিয়াছেন। সমাজ, ধর্ম্ম, ভগবান, বিবাহ, বালক, বালিকা—সমস্তই তাঁহার আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। তাঁহার Drapier's Letters প্রধানতঃ দেশপ্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও, ইহাতে ভয়ঙ্কর রসিকতা ও তীব্র শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য প্রশংসনীয় ভাষার আবরণে করা হইয়াছে। Tale of a Tub-এ উন্মাদ সুলভ আনন্দে আত্মহারা হইয়া সমস্ত ধর্ম্মই যে মিথ্যা, কঠোর ভাবে তিনি তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা হীন চিন্তাধারা চিত্তাকর্ষক করিয়া সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। Modest Proposal-এ তিনি নারকীয় নৃশংসতাপূর্ণ ভাবের রূপ দিয়াছেন। এইখানে সুইফ্টকে নির্দ্দয় দানব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি দার্শনিকের মত গুরুগম্ভীর ভাবে শিশুমাংস খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু গালিভারের ভ্রমণকাহিনী তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'ব্যঙ্গ-রচনা।' এই বিখ্যাত বইখানিতে অদ্ভুত অদ্ভুত পরিকল্পনা আছে—ইহা শিশু পাঠকের মনে হাস্য-রসের সৃষ্টি করে। পূর্ণ গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া, কোন কিছু দ্বারাই প্রভাবান্বিত না হইয়া আপন মনে তিনি অসম্ভব অসম্ভব ঘটনাবলী অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহাতে প্রথমে ছয়ইঞ্চি মানুষের অবতারণা করা হইয়াছে (Lillput) এবং পরে আবার ষাট ফিট মানুষের চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে (Brobdingnag)। গালিভারের ভ্রমণ-কাহিনীতে সুইফ্ট আশ্চর্য্য আনুপাতিক জ্ঞানের (sense of proportion) পরিচয় দিয়াছেন। সুইফ্টের অসাধারণ বর্ণনশক্তির প্রভাবে গালিভারের ভ্রমণ-কাহিনী সত্য ঘটনা বলিয়া পাঠকের মনে হয়—পাঠকের মনে উহার অসম্ভব পরিকল্পনা, অবাস্তবতা কোন সন্দেহের সৃষ্টি করে না। একজন বিজ্ঞ বিশপের সম্বন্ধে এইরূপ একটি কৌতুকপ্রদ গল্প প্রচলিত আছে যে, তিনি নাকি গালিভারের ভ্রমণকাহিনী পড়িয়া বলিয়াছিলেন যে, এই পুস্তকে কতকগুলি কাহিনী আছে যাহার সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ একমত নহেন। বিজ্ঞ বিশপ গালিভারের ভ্রমণ-কাহিনীর ঘটনাবলীকে সত্য বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন—সুইফ্টের চাতুর্য্য দ্বারা তিনি প্রতারিত হইয়াছিলেন। Leslie Stephen-এর মতে শিশুদের জন্যে এমন চমকপ্রদ পুস্তক খুব অল্পই লিখিত হইয়াছে, তবে ব্যঙ্গ-রচনা হিসাবেও ইংরেজী-সাহিত্যে ইহার সমান পর্য্যায়ে স্থান পাইতে পারে এমন পুস্তক নাই। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, সকলেই উহা পাঠ করিয়া সমান আনন্দ পাইতে পারে। উহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, পাঠকের চিত্তে উহা বিশেষ ভাবে সাড়া, আশা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

" Whether we read it as children do for the story or as historians do for the political allusions or as men of the world do for the satire and philosophy, we have to acknowledge that it is one of the unique and wonderful books of the world's literature "—Gosse's Eighteenth Century Literature.

গালিভারের ভ্রমণ-কাহিনীর পাঠক এই মন্তব্য পূর্ণ ভাবেই সমর্থন করিবেন সন্দেহ নাই। গালিভারের ভ্রমণ কাহিনীতে তিনি যেন সমস্ত মানব-সমাজকেই নাকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। সুইফ্ট সৃষ্টি ছাড়া যে কোন বিষয়ের অবতারণা করিতে এতটুকু দ্বিধা করিতেন না। যুক্তিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাঁহার যে কোন বিষয়ের আলোচনা যত অদ্ভুত, অসম্ভবই হউক না কেন, তাহা একান্ত ভাবেই তর্ক-শাস্ত্রানুমোদিত ছিল,—এতটুকু খুঁত তাঁহার যুক্তিতে পরিলক্ষিত হয় না। সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাঁহার লেখায় প্রকৃত সত্যের স[illegible] পাওয়া সম্ভব নয়—প্রকৃত পক্ষে তাঁহার রচনায় সত্যের বিপরীত বিষয়বস্তুরই সুষ্ঠু আলোচনা করা হইয়াছে। উৎকট ভ্রমপ্রমাদাদির চিত্র তিনি যেরূপ সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাঁহার সমস্ত রচনায় বাস্তবতার কোন হৃদয়গ্রাহী চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না—বাস্তবতাকে তিনি নির্ম্মম ভাবে আঘাত করিয়াছেন। গালিভারের ভ্রমণকাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয় হইলেও ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হইয়া সমগ্র পুস্তকখানি পাঠ করিলে ইহা সুখপাঠ্য পুস্তকের পর্য্যায়ে স্থান পায় না। তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে উহা অত্যন্ত বীভৎস—সমস্ত মানব-সমাজের বিরুদ্ধে ইহাতে ক্রোধদীপ্ত ভাব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তাঁহাকে ঘোর মানবদ্বেষী বলিয়া পাঠকের ধারণা জন্মে।

ডাঃ জনসন (Dr. Johnson) সুইপ্টের শিল্পী-প্রতিভার উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই।

"When once you have thought of big men and little men, it is easy to do the rest."

ডাঃ জনসনের এই মন্তব্য অনেকটা বে-আড়া বলিয়াই আমাদের মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যঙ্গরচনাকারী হিসাবে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। মানুষের খর্ব্বতা, অহঙ্কার, অক্ষমতা 'তথাকথিত মহত্ত্ব', নীচ উদ্দেশ্য ও হীনতা অবলম্বন করিয়া সাফল্য অর্জ্জনের চিত্রই শুধু তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার ব্যঙ্গরচনার এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যেই Addison ও Charles Lamb-এর সঙ্গে তাঁহার কোন সাদৃশ্য নাই। এডিসন, চালর্স ল্যাম্ব উদার মনোভাব লইয়া ব্যঙ্গচিত্র রচনা করিয়াছেন—তাঁহারা মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দরদ ও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করিয়াছেন। ব্যঙ্গ-রচনাকারীদের মধ্যে সুইপ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও মানুষ এডিসন ও চালর্স ল্যাম্বের মত তাহাকে সর্ব্বতোভাবে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, এইখানেই তাঁহার অক্ষমতা—এডিসন ও চালর্স ল্যাম্বের সাফল্য।

চীন-রহস্যের অন্তরালে

শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায়

চীন-রহস্যের অন্তরালের কথা বলিতে গেলে চীনে অন্যান্য জাতির স্বার্থের কথাও প্রসঙ্গত বলিতে হয়। চীন বহু প্রাচীন কাল হইতেই পাশ্চাত্য শক্তি সমূহের লুণ্ঠন-ক্ষেত্র-রূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। রোমক সভ্যতার আদিযুগে রোমসম্রাট মার্কাস এরিনিয়াস চীনে সর্ব্বপ্রথম দূত প্রেরণ করেন এবং রোমক সভ্যতার মধ্যযুগে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ দলে দলে চীনের 'অসভ্য-দিগকে' ত্রাণ করিবার জন্য প্রেরিত হন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কোডিগামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া জলপথে পূর্ব্বমহাদেশে আসিবার পথ আবিষ্কার করিবার পর ১৫৩৭খৃঃ পর্ত্তুগীজরা ক্যাণ্টনের নিকটবর্ত্তী মেকাও নামক স্থান চীন সরকারের নিকট হইতে পত্তন গ্রহণ করে। সেই সময় চীনারা বৈদেশীক-দিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিত ও তাহাদিগকে অসভ্য বলিয়া অভিহিত করিত। সম্রাট কি রাজপুরুষদের নিকট যাইতে হইলে তাহাদিগকে মাটিতে শুইয়া নয় বার ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া অভিবাদন করিতে হইত। কিন্তু এইভাবে হীনতা স্বীকার করিয়াও ডচ্ ও ইংরাজ বণিকেরা চীনে ব্যবসা চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তৎপর ১৮৪০ সালে চীন আফিম আমদানী বন্ধ করায় ইংরাজগণ চীনদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যুদ্ধ-পণ হিসাবে বহু অর্থ এবং ক্যাণ্টন, হংকং, আময়, ফুচু, নিংছু ও সাংহাই অধিকার করিয়া চীনে বিপুল শক্তি লাভ করিল। এই যুদ্ধ ইতিহাসে Opium war বা, আফিম যুদ্ধ নামে খ্যাত। কালক্রমে রাশিয়া, জাপান, জার্ম্মানী ও আমেরিকাও আসিয়া চীনে প্রাধান্য স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে চীন বিভিন্ন জাতীর একটি অর্দ্ধ উপনিবেশে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। শুধু সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগরীগুলিই নহে, চীনের ভিতরকার অনেক সহর ও বিদেশীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং ১৯০০ সালে বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে একটা চুক্তির ফলে ঐসকল স্থানে ঐ সকল শক্তি সৈন্য, নৌ এবং বিমান বাহিনী নিয়া বিরাজ করিতেছিল। চীনের নদী সমূহেও চীনের অধিকার ছিল না—যে কোন প্রকার বিদেশী জাহাজ চীনের ইয়াংসী ও অন্যান্য নদী দিয়া বিনা বাধায় ১৫০০ মাইল পর্য্যন্ত যাইতে পারিত। বিদেশী শক্তিবর্গ চীনকে কি পরিমাণ গ্রাস করিয়াছিল তাহা এই সকল হইতে কতকটা উপলব্ধি হইবে। তাহা ছাড়া এই সকল শক্তি নিজেদের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এবং চীন গভর্ণমেণ্টকে ঋণ দান হিসাবে সেখানে বহু অর্থ-ও নিয়োজিত রাখিয়াছিল। এই সকল উপায়ে জাপান উত্তরচীনে, বৃটিশ

ও ফ্রান্স দক্ষিণ-চীনে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র চীনের কেন্দ্রীয় সরকারে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া নিজেদের সুবিধা মত চীনের গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। ফলতঃ রাশিয়া, বৃটিশ, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি শক্তি এই চীনকে অক্টোপাশের মত জড়াইয়া রাখিয়াছিল। এই সকল শক্তির বিশেষ করিয়া জাপানের চক্রান্তে চীনে কোন সংহতি শক্তি গড়িয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ১৯২৬ সালে কুয়োমিনটাং বা জাতীয়দলের অধিনায়ক চিয়াং কাইশেখের চেষ্টায় নান্‌কিনে চীনের সম্মিলিত গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইতে পারিল না, এবং অল্পকাল মধ্যেই তিন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল।

কিন্তু জাপানের আক্রমণের ফলে এই সকল শক্তির স্বার্থ বিপন্ন হইলেও তাহারা প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রতিবিধান করিতে পারিল না। কারণ, জাপান চীনের সহিত কোন যুদ্ধ ঘোষণা না করায়, এই ব্যাপার শুধু চীন ও জাপানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল। আন্তর্জ্জাতিক আইনকে ফাঁকি দিয়া যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া যুদ্ধ করার ইহাই সুবিধা। তথাপি রাশিয়ার ন্যায় এই সকল শক্তিও চীনকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে ও করিতেছে। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে 'আসাহি সিম্বুন' নামক জাপানী কাগজে চীনকে কোন রাষ্ট্র গত বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়া সাহায্য করিয়াছে তাহা উল্লিখিত হইয়াছিল। সেই কাগজের মতে এইরূপ দ্রব্য চীনকে ইটালী দিয়াছিল ১৮০০ টন, গ্রেটবৃটেন ৮০০ টন, জার্ম্মানী ৬২০ টন, আমেরিকা ৪৫০ টন, ডেনমার্ক ৪০০ টন, হলেণ্ড ২০০ টন এবং নরওয়ে ১০০ টন। এই সকল শক্তি অবশ্য নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য এবং এই জরুরী অবস্থা এই সকল দ্রব্য মূল্যের অত্যাধিক লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই এই সাহায্য করিয়াছে।

বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার ভূমিকার কথা বুঝিতে হইলে রুশ-জাপান বিরোধের কথা স্মরণ রাখা উচিত। মাঞ্চুরিয়া জাপানের হাতে চলিয়া যাওয়ায় রাশিয়ার ক্ষতিও বড় কম হয় নাই। এরূপ প্রকাশ যে মাঞ্চুরিয়াতে রাশিয়া এবং জাপানের সম্পত্তি প্রায় সমতুল্য ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ জাপানের হাতে চলিয়া যাওয়ায় তাহার সে সম্পত্তি মাঞ্চুরিয়া নষ্ট হইয়াছে। বৃটিশের স্বার্থও সেখানে বড় নগণ্য ছিল না। কারণ হুলুটাও Hulutao নামক স্থানে একটি বন্দর নির্ম্মাণ করিয়া উত্তর প্রদেশের রেলপথের সহিত ইহার যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ডাইরেনের (Dairen) গুরুত্ব নষ্ট করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সমৃদ্ধি করায়ত্ত করিবার একটা পরিকল্পনা বৃটেনের ছিল, কিন্তু মাঞ্চুকুয়োর সমস্ত রেলপথ জাপানের হাতে চলিয়া যাওয়ায় সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়। পিপিং মুকডেন রেলপথ বৃটেনের হাতে ছিল, তাহাও জাপানের মাঞ্চুরিয়া বিজয়ের ফলে হাতছাড়া হইয়া গেল। কাজেই চীনে আবার সেইরূপ কোন ক্ষতি না হয় সেই জন্যই এই সকল শক্তি চীনকে সাহায্য করিতে অগ্রণী হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালের শেষের দিকে রাশিয়ার সঙ্গে চীনের গোপন সন্ধির কথাও অল্পবিস্তর শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। তবে ইহাকে অনেকে untimely jest বলিয়াই অভিহিত করিয়াছিলেন। কেন না, তখন রাশিয়ায় আভ্যন্তরীণ গোলযোগ খুব বেশী চলিতেছিল এবং আমুর নদীর মোহনায় জাপানের নৌ-সৈন্য কর্ত্তৃক রাশিয়ার দুইটি দ্বীপ আক্রান্ত ও রুশ সৈন্য হতাহত হওয়া ব্যাপার রাশিয়া যেভাবে নীরবে সহ্য করিয়াছিল তাহাতে রাশিয়া বর্ত্তমান চীন-জাপান সংগ্রামে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন অংশগ্রহণ করিবে, ইহা অনেকে ধারণা করিতে পারিতে ছিলেন না। কিন্তু ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে সেই বৎসর ১৩ই ডিসেম্বর হইতে ২৪০ জন বিমান চালক দ্বারা সুসজ্জিত ১২০টি সোভিয়েট বিমানপোত চীনকে সাহায্য করিতেছিল। এই সময় আরও প্রকাশিত হইয়াছিল যে সোভিয়েট হইতে সৈন্য পাঠাইবার সুবিধার জন্য প্রায় তিন হাজার মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তাও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছিল। এই রাস্তায় সোভিয়েটের সাত লক্ষ কুলী ও সহস্রাধিক ইঞ্জিনিয়ার কাজ অতিক্রম করা সম্ভব হইবে।

১৯৩৭ সালের শেষের দিকে এবং ১৯৩৮ সালের প্রথম

াগে ইউরোপের শক্তিগুলি যখন নিজেদের সামরিক শক্তি দ্ধির কুণ্ঠাহীন প্রয়াসের সঙ্গে শান্তির বুলি কপচাইতেছিল, খন জাপানও সেই সুরে সুর মিলাইয়া নিজেদের ্বলতার পরিচয় দিতেছিল। ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর াপানের জাতীয় ঋণ (National Debt) দাঁড়াইয়াছিল ১,৮৯৩,০০০,০০০ ইয়েন। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ইহা ,৪৯৮,০০০,০০০ ইয়েন বেশী এবং পরীক্ষা করিয়া দখা গিয়াছিল যে ইহার পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরে তাহার এই ঋণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল; অপর দিকে জাপানের য উৎপন্নদ্রব্য চীনে রপ্তানী হইত তাহাও গুদামে াচিতেছিল। কাজেই জাপানের পক্ষে আর্থিক অস্বচ্ছলতা ্বে স্বাভাবিক ব্যাপার।

চীনে জাপানের ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে ১৯৩৮ ালের রিপোর্টে দেখা যায় যে ১৯৩৭ সালে চীনের মোট আমদানী হইয়াছে (সাংহাইয়ের ডলারের হিসাবে) ৯৫৩,০০০,০০০ ডলার। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসর ইহার মোট ারিমাণ ছিল ৯৪২,০০০,০০০ এবং ৯১৯,০০০,০০০ ডলার। ঐ বৎসর চীনের মোট রপ্তানি দাঁড়াইয়াছিল ৮৩৮,০০০'০০০ ডলার; ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ সালে ইহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৭৬,০০০,০০০ এবং ৭০৬,০০০,০০০ ডলার। কাজেই আপাততঃ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ১৯৩৭ সালে চীনের আমদানী ও রপ্তানী দুইই বাড়িয়াছিল। কিন্তু শেষের দিকের অর্থাৎ যুদ্ধের পাঁচ মাসের হিসাব সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী হইতে জুলাইয়ের আমদানী রপ্তানীর মোট পরিমাণ ১,৩০২,০০০,০০০ ডলার। পূর্ব্ব বৎসর এই সময়কার অঙ্ক ছিল ৯৭০,০০০,০০০ ডলার; কিন্তু আগষ্ট হইতে ডিসেম্বরের অঙ্ক দাড়াইয়াছিল ৪৯০,০০০,০০০ ডলার অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের এই সময়কার অঙ্ক হইতে ৩৩১,০০০,০০০ ডলার কম। কাজেই যুদ্ধের এই পাঁচ মাসের অঙ্কের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের এই সময়কার অঙ্কের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই সময় ইহার পরিমাণ তুলনায় প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছিল। অবশ্য চীনে সকল দেশের বণিজ্যই যুদ্ধের জন্য হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ছিল; কিন্তু জাপানের বাণিজ্যই কমিয়াছিল সকলের চেয়ে বেশী। যুদ্ধের এই ৫ মাসে চীনে জাপানী দ্রব্যের আমদানী শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ কমিয়া মোট দাঁড়াইয়াছিল ১৩,৭৩৬,০০০ ডলার এবং জাপানে চীনের রপ্তানী তিন-চতুর্থাংশ কমিয়া মোট দাঁড়াইয়াছিল ১২,৭৬০,০০০ ডলার মাত্র। যুদ্ধের পূর্ব্বের পাঁচ মাসে জাপানের যেখানে ব্যবসায়ের মোট আয় (Trade Balance) ছিল ৬০,২৩০,০০০ ডলার যুদ্ধের পাচ মাসে ইহা ৯৮৬,০০০ ডলারে নামিয়া আসিয়াছিল।

চীনের লোকবল জাপানের তুলনায় অত্যন্ত বেশী। জাপানের সমগ্র সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা অবশ্য ১৯৩৫ সালের হিসাব মত ছিল ৯৭,৬৯৭,৫৫৫ আর শুধু জাপানের লোকসংখ্যা ১৯৩৭ সালের হিসাবমত ছিল ৭১,২৫২,৮০০; চীনের লোকসংখ্যা ৪১৮,৪৭৯,০০০। কাজেই সমগ্র জাপানের তুলনায় চীনের লোকসংখ্যা চারগুণেরও অধিক। সেই জন্য চীন শেষ পর্য্যন্ত তাহার এই লোকবলের সাহায্যেই জয়লাভ করিতে সক্ষম হইবে। যন্ত্রযুদ্ধে গরিলা যুদ্ধ করিয়া যন্ত্রের ক্ষতি যদি তাহারা ক্রমশঃ অপুরণীয় করিয়া তুলিতে পারে তাহা হইলে কালে এমন সময় আসিবে যখন লোকবলের প্রাধান্য আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

জাপানের কবলিত চীনের আয়তন ইংলণ্ড ও যুদ্ধ-পূর্ব্ব জার্ম্মানীর সম্মিলিত আয়তন অপেক্ষা বড় এবং এই স্থানে খনিজ পদার্থ ও শস্যসম্ভার এত বেশী যে এই স্থানের এবং ইহার পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহে প্রভুত্ব পাইলে জাপান যে একটি অদমনীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হইবে তাহা ১৯৩৭ সালের শেষের দিকেই ইউরোপীয় শক্তিগুলি বুঝিতে পারিয়াছিল। আমেরিকাও এই আশঙ্কাতেই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য সেই সময় ব্রুসেলস্ নগরীতে নয়টি শক্তির একটি বৈঠকও আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু জাপান এই বৈঠকে যোগদান না করায় সহজ ভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় নাই বলিয়াই মিঃ এণ্টনী ইডেন অভিমত করিয়াছিলেন। তৎপর ১৯৩৮ সালের ১৯শে জুন বিলাতের সান্‌ডে এক্সপ্রেস কাগজে বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধ সম্বন্ধে মিঃ লয়েড জর্জ্জ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য তিনি বলিয়াছিলেন,—"যদি জাপান জয়ী হয় তাহা হইলে সে কার্য্যতঃ না হইলেও মূলতঃ

(Potentially if not actually) পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সামরিক সাম্রাজ্যে পরিণত হইবে। তাহার জনবল বিশ্বের জনবলের এক-চতুর্থাংশ হইবে। জাপান চীন জয় করিলে যেরূপ দুর্দ্ধর্ষ সাম্রাজ্য হইবে, নেপোলিয়ন সমগ্র ইউরোপ দখল করিতে পারিলেও বোধ হয় তত দুর্দ্ধর্ষ হইতে পারিতেন না।" ইতিমধ্যে যে জাপান চীনের অধিকাংশ গ্রাস করিয়া বসিয়াছে, তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। মডার্ণ এন্‌সাই-ক্লোপিডিয়াতে জাপান সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধের পর হইতেই চীনের উপর অনেকবার আক্রমণ চালান হইয়াছে এবং ১৯৩৬ সাল হইতেই চীনকে ক্রমে কাবু করিয়া আনা হইতেছিল। ১৯৩৭ সালে আবার চীন ও জাপানে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে হংকো ও ক্যান্টনের পতনের পর ১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকেই চীনের সমস্ত প্রসিদ্ধ নগরী জাপানের হাতে চলিয়া যায় এবং জাপান পিকিং নগরীতে সাময়িক ভাবে একটি গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করে।

চীনে জাপানের তাঁবেদার গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র চীনটা কিন্তু জাপানের কবলিত হয় নাই। স্বাধীন চীনের এলাকায় চিয়াং কাই-শেকের সেনাদল গরিলা যুদ্ধে জাপানকে খুব বিব্রত করিতেছে। প্রতিদিন যেসকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় কোনদিন বা জাপানীরা চীনের বিপুল ক্ষতি সাধিত করিতেছে, আবার কোন দিন বা চীনারা প্রবল পাল্টা আক্রমণ করিয়া জাপানীদিগকে পশ্চাতে হটাইয়া দিতেছে এবং বিরাট রকম ক্ষতিও করিয়া দিতে সক্ষম হইতেছে। জাপানীরা চীনাদের তুলনায় আধুনিক যন্ত্রপাতিতে অধিকতর ক্ষমতা-সম্পন্ন, তাহার সামুরাই দল পুরুষানুক্রমে বর্ব্বরোচিত হত্যাকাণ্ডই করিয়া আসিয়াছে, কাজেই ভাল যোদ্ধা হইবারই কথা। সুতরাং চীনের সৈন্যগণ জাপানীদের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে গত পাঁচ বৎসরেরও অধিক কাল যুদ্ধ করিয়া কম সাহস ও নৈপুণ্যের পরিচয় দেয় নাই—তাহাদের মানসিক বল ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেম বিশেষ উপলব্ধি করিবার বিষয়। তাহারা আধুনিক যন্ত্রপাতিতে জাপানের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও এই দীর্ঘকাল অনেক বিষয়ই শিক্ষা করিয়া নিয়াছে, কাজেই পূর্ব্বে জাপান যে-চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে—চীন আর এখন সেই চীন নাই। চীনের বর্ত্তমানে আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

তাহা ছাড়া চীন বাহিরের সাহায্য যথেষ্টই পাইয়াছে, এবং এই সকল সাহায্যে চীন ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া জাপানের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইবার সুযোগ পাইয়াছে। বিশ্বপরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া জাপান এই সময় চীনে একটা বড় রকমের পরিকল্পনা করিতেছিল তাহা তাহার ফরাসী ইন্দোচীনের ব্যাপারেই আভাস পাওয়া গিয়াছিল এবং পরবর্ত্তীকালে বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণায় ব্যক্ত হইয়াছিল। এবং শেষোক্ত ব্যাপার চীনের যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পাইলেও, অল্পকাল মধ্যেই অপর বিপর্য্যয়ের সূচনা দেখা দিয়াছিল। মিত্রশক্তিবর্গের—বিশেষতঃ বৃটিশ বাহিনীর ক্রমশ পশ্চাদপসরণের ফলে যখন ব্রহ্মদেশ বিপন্ন হইয়া উঠিল তখন ব্রহ্মপথে মাল চলাচলের সুবিধা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে চীন ব্রহ্মদেশের রণাঙ্গনেও জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে এবং এখনও মিত্রশক্তির অনুকূলে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প নিয়াই তাহার রণনীতি পরিচালিত করিতেছে। প্রকাশিত এক রিপোর্টে প্রকাশ গত ৫ বৎসরে চীনের প্রায় ৬০ লক্ষ সৈন্য হতাহত হইয়াছে—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও চীন বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। চীনের অসংখ্য নরনারী জাপানের বর্ব্বর অভিযান রোধ করিবার সঙ্কল্প নিয়া যুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর। চীন এখন আর শুধু নিজের শক্তিতেই যুদ্ধ করিতেছে না—সে এখন মিত্রশক্তি-পুঞ্জের অন্যতম শক্তি।

বাউল

(গান)

অধ্যাপক শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, এম-এ

চলা তোর সহজ হবে হবেই হবে।
পথে তুই আপন ভুলে
চলার টানে
চলবি যবে ॥

যেথা তোর কাঁটার ঘায়ে বেদন জাগে,
সেথা তোর ফুটবে মুকুল অনুরাগে ;
যেথা তুই পড়িস্ নুয়ে ব্যথার ভারে
সেথা তোর আপন জনে
সকল বোঝা
ব'বেই ব'বে ॥

চলা তুই করলি সুরু যাহার লাগি,
সে যে তোর আসার আশায়
নিমেষ-হত
আছে জাগি ॥

যত তুই মরিস্ ঘুরে মনের ভুলে
ফিরিস্ খুঁজে মরুমায়ার সাগর-কূলে,
তত সে আড়াল হ'তে হাতছানি দেয় ;
সে যে তোর মনের মানুষ,
তারে তুই [বন্ধুকে তোর]
চিনবি কবে ?

কেদার রাজা

(উপন্যাস)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিন দশ পনেরো কেটে গেল।

এদিনগুলো কেদার ও গোপেশ্বরের কাটলো খুব ভালই। ছিবাস মুদির দোকানে প্রায়ই সন্ধ্যার পরে ছেঁড়ামাদুর আর চট পেতে আসর জমে, কেদার এসেচেন শুনে তাঁর পুরোনো কৃষ্ণযাত্রা দলের দোহার, জুড়ি, একানে গায়কেরা কেউ জাল রেখে, কেউ লাঙল ফেলে ছুটে আসে।

—রাজা মশাই? ভাল ছেলেন তো? এট্টু পায়ের ধুলো দ্যান—

—বাবাঠাকুর, এ্যাদ্দিন ছেলেন কনে? মোদের দল যে একেবারে কানা পড়ে গেল আপনার জন্যি?

গেঁয়োহাটি কাপালী পাড়ার মধু কাপালী, নেত্য কাপালী এসে পীড়াপীড়ি—গেঁয়োহাটীতে একবার না গেলে চলবে না। সবাই রাজা মশাইকে একবার দেখতে চায়। এদের ওপর কেদারের যথেষ্ট আধিপত্য, অন্য সময় যে কেদার নিতান্ত নিরীহ—এদের দলের দলপতি হিসেবে তিনি রীতিমত কড়া ও উগ্র মেজাজের শাসক।

মধুকে ডেকে বলেন—তোর যে সেই ভাইপো দোয়ার দিতো সে কোথায়?

—আজ্ঞে সে পাট কাটচে মাঠে—

কেদার মুখ খিঁচিয়ে বলেন— পাট তো কাটচে বুঝতে পারচি, চাষার ছেলে পাট কাটবে না তো কি বড় গাইয়ে হবে? কাল একবার ছিবাসের এখানে পাঠিয়ে দিও তো? বুঝলে?

—যে আজ্ঞে রাজামশাই—

—আর শশীকে খবর দিও, দু'বছরের খাজনা বাকী। খাজনা দিতে হবে না? নিষ্কর জমি ভোগ করতে লাগলো যে একেবারে—

নেত্য কাপালী এগিয়ে এসে বললে—বাবাঠাকুর, আপনি যদি বাড়ী থাকতেন, তবে সবই হোত। তারা খাজনা নিনে এসে এসে ফিরে গিয়েল—

কেদার ধমক দিয়ে বললেন—তুই চুপ কর—তোকে ফোঁপল দালালি করতে বলেচে কে?

কেদারের নামে বহু লোক জড় হয় ছিবাসের দোকানে —কেদারের বেহালার সঙ্গে মিশেচে ওস্তাদ গোপেশ্বরের তবলা! পাড়াগাঁয়ে নিঃসঙ্গ দিনে রাত্রে সময় কাটাবার এতটুকু সূত্রও যারা নিতান্ত আগ্রহে আঁকড়ে ধরে—তাদের কাছে এধরণের গুণী-সম্মেলনের মূল্য অনেক বেশী। দু-তিনখানা গ্রাম থেকে লোকে লণ্ঠন হাতে লাঠি হাতে জুতো বগলে করে এসে জোটে। সেই পুরোনো দিনের মত অনেক রাত্রে দু'জনেই অপরাধীর মত বাড়ী ফেরেন।

শরৎ বলে—এলে? ভাত জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েচে—

গোপেশ্বর আমতা আমতা করে বলেন—আমি গিয়ে বললাম মা রাজামশায়কে—যে শরৎ বসে থাকবে হাঁড়ি নিয়ে—তা হয়েচে কি, উনি সত্যিকার গুণী লোক, ছড়ে ঘা পড়লে আর স্থির থাকতে পারেন না। জ্ঞান থাকে না মা—

কেদার গোপেশ্বরের পেছনে দাঁড়িয়ে মনে মনে কৈফিয়ৎ তৈরি করেন।

শরৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে—আপনি জানেন না জ্যাঠামশায়, বাবার চিরকাল একরকম গেল আর যাবেও —আজ বলে না, কোন কালে ওঁর জ্ঞান ছিল ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন না?

গোপেশ্বর মিটমাটের সুরে বলেন—না না কাল থেকে রাজামশাই আর দেরি করা হবে না। শরতের বড্ড কষ্ট হয়, কাল থেকে আমি সকাল সকাল নিয়ে আসবো মা, রাত করতে দেবো না—

এই দুই বৃদ্ধের ওপর শাসন দণ্ড পরিচালনা করে শরৎ মনে মনে খুব আমোদ পায় এবং এঁদের সংকোচজড়িত কৈফিয়তের সুরে যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করে—কিন্তু কোনো তর্জ্জন-গর্জ্জনেই বিশেষ ফল হয় না, প্রতি রাত্রেই া তাই—সেই রাত একটা। নির্জ্জন গড়বাড়ীর জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ পোকার গম্ভীর আওয়াজের সঙ্গে মিশে শরতের শাসন-বাক্য বৃথাই প্রতি রাত্রে নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

শরৎ বলে—আজ কিছু নেই বাবা, কি দিয়ে ভাত দবো তোমাদের পাতে? হাট না, বাজার না, একটা তরকারি নেই ঘরে, আমি মেয়ে মানুষ যাবো তরকারি যাগাড় করতে? ওল তুলে ছিলাম কালো পায়রার পাড় থকে এক গলা জঙ্গলের মধ্যে—তাই ভাতে আর ভাত াও—এত রাত্তিরে কি করবো আমি?

কেদার সঙ্কুচিত ভাবে বলেন—ওতেই হবে—ওতেই বে—

—তুমি না হয় বললে ওতেই হবে। জ্যেঠামশায় াড়ীতে রয়েচেন, ওঁর পাতে শুধু ওল ভাতে দিয়ে কি রে—

গোপেশ্বর তাড়াতাড়ি বলেন—যথেষ্ট মা, যথেষ্ট। তুমি াও দিকি? ভেসে যাবে—কাঁচালঙ্কা দিয়ে ওল ভাতে মখে এক পাথর ভাত খাওয়া যায় মা—

—তবে খান। আমার আপত্তি কি?

—কাল গেঁয়োহাটির হাট থেকে আমি ঝিঙে পটল ানবো দুটো—মনে করে দিও তো?

শরতের কি আমোদই লাগে! কতদিন পরে াবার পুরাতন জীবনের পুনরাবৃত্তি চলচে—আবার যে াতি নিশীথে গড়বাড়ীর জঙ্গলের মধ্যে তাদের ভাঙা াড়ীতে সে একা শুয়ে থাকবে; বাবা এসে অপ্রতিভ কণ্ঠে লবেন—ও মা শরৎ দোর খুলে দাও মা, এ সব কখনো ব বলে তার বিশ্বাস ছিল?

সেই সব পুরোনো দিন আবার ঠিক সেই ভাবেই ফিরে সেচে······

—জ্যাঠামশায়ের জন্যে একটু দুধ রেখেচি—ভাতক'টা লবেন না জ্যাঠামশায়—

গোপেশ্বর ব্যস্ত ভ্যাব বললেন—কেন আমি কেন—রাজা মশায়ের দুধ কই?

—বাবার হবে না। দু-হাতা দুধ মোটে—

—না না সে কি হয় মা? রাজা মশায়ের দুধ ও থেকেই—

কেদার ধীর ভাবে বললেন—আমার দুধের দরকার নেই। আমারা রাজা-রাজড়া লোক, খাই তো আড়াইসের মেরে একসের করে খাবো। ও দু-এক হাতা দুধে আমাদের—

কথা শেষ না করেই হা হা করে প্রাণখোলা উচ্চ হাসির রবে কেদার রান্নাঘর ফাটিয়ে তুললেন।

এই রকম রাত্রে একদিন গোপেশ্বর ভয় পেলেন কালো পায়রা দীঘির পাড়ের জঙ্গলে। বেশী রাত্রে তিনি কি জন্যে দীঘির পাড়ের দিকে গিয়েছিলেন—সে দিন আকাশে একটু মেঘ ছিল, ঘুম ভেঙে তিনি রাত কত তা ঠিক আন্দাজ করতে পারলেন না। দীঘির জঙ্গলের দিকে একাই গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কোথায় যেন পদক্ষেপের শব্দ তাঁর কানে গেল—গুরুগম্ভীর পদক্ষেপের শব্দ। উৎকর্ণ হয়ে কিছুক্ষণ শুনে গোপেশ্বরের মনে হোল তাঁরই কাছাকাছি গভীর বনঝোপের মধ্যে কে যেন সাবধানের সঙ্গে ধীরে ধীরে পা ফেলে চলেচে—তাঁর দিকেই ক্রমশঃ এগিয়ে আসচে নাকি? চোর-টোর হবে কি তাহোলে? না কোনো ছাড়া গরু বা ষাঁড়—

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হোল এ পায়ের শব্দ মানুষের নয়—গরু বা ষাঁড়েরও নয়। পদশব্দের সঙ্গে কোনো কঠিন জিনিসের যোগ আছে—খুব ভারি ও কঠিন কোনো জিনিস।

এক-একবার শব্দটা থেমে যায়···হয় তো এক মিনিট··· তার পরেই আবার···

হঠাৎ গোপেশ্বরের মনে হোল শব্দটা যেন তাঁকেই লক্ষ্য ক'রে হোক বা নাই হোক—মোটের ওপর খুব কাছে এসে গিয়েচে। তিনি আর কালবিলম্ব না করে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে নিজের ঘরে ঢুকতেই পাশের বিছানা থেকে কেদার জেগে উঠে বললেন—কি, কি—অমন করচ কেন দাদা?

—ইয়ে, একবার বাইরে গিয়েছিলাম—কিসের শব্দ—তাই ছুটে চলে এলাম—কেমন যেন গা ছম্ ছম্—

—শব্দ? ও শেয়াল-টেয়াল হবে—

—না দাদা মানুষের পায়ের শব্দ মত, ভারি পায়ের শব্দ—যেন ইট পড়ার মত—

কেদার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—হুঁ। আজ কি তিথি?

—তা কি জানি, তিথি-টিথির কোনো খোঁজ রাখি নে তো—

—হুঁ। নাও শুয়ে পড় দাদা—একটা কথা বলি। অমন একা রাত্তির বেলা যেখানে-সেখানে যেও না—দরকার হয় আমায় ডাক দিও—

রাজলক্ষ্মী দুপুরবেলা হাসি মুখে একখানা চিঠি হাতে ক'রে এসে বললে—ও শরৎদি, তোমার নামে কে চিঠি দিয়েচে দ্যাখো—

শরৎ সবিস্ময়ে বললে—আমার নামে! কে আনলে?

—দাদার সঙ্গে পিওনের দেখা হয়েছিল বাজারে—তাই দিয়েচে—

—দেখি দে—

—কোথাকার ভাবের মানুষ চিঠি দিয়েচে দ্যাখো খুলে—

বলে রাজলক্ষ্মী দুষ্টমির হাসি হাসলে।

শরৎ ভ্রুকুটি করে বললে—মারবো খ্যাংরা মুখে যদি ও রকম বলবি—তোর ভাবের মানুষেরা তোকে চিঠি দিক গিয়ে—জন্ম-জন্ম দিক গিয়ে—

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে—তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক শরৎদি, তাই বলো—তাই যেন হয়।

—ওমা, অবাক করলি যে রে রাজি? সত্যি তাই তোর ইচ্ছে নাকি?

—যদি বলি তাই?

—ওমা আমার কি হবে!

—অমন বোলো না শরৎদি। তুমি এক ধরণের মানুষ তোমার কথা বাদ দিই—কিন্তু মেয়েমানুষ তো, ভেবে দ্যাখো। আমার বয়স কত হয়েচে হিসেব রাখো?

শরৎ সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বললে—কেউ আটকে রাখতে পারবে না যেদিন ফুল ফুটবে, বুঝলি রাজি? কাকাবাবুর হাতে পয়সা থাকলে কি আর এতদিন—ফুল যে দিন ফুটবে—

—ফুল ফুটবে ছাতিমতলার শ্মশান সই হোলে—নাও তুমিও যেমন! খোলো চিঠিখানা—দেখি—

শরৎ চিঠি খুলে প'ড়ে বললে—কাশী থেকে রেণুকা চিঠি দিয়েচে—বাঃ—

—সে কে শরৎদি?

—সে একটা অন্ধ মেয়ে। বিয়ে হয়েচে অবিশ্যি। গরীব গেরস্ত। এ চিঠি তার বরের হাতে লেখা, সে তো আর লিখতে—

—কাশীতে থাকে? কি করে ওর বর?

—চাকুরী করে কোথায় যেন—

—দেখতে কেমন?

—কে দেখতে কেমন? মেয়েটা না তার বর?

—দুই-ই—

—রেণুকা দেখতে মন্দ নয়, বর তার চেয়েও ভাল—ছোকরা বয়েস—লোক ভালই ওরা। দ্যাখ না চিঠি পড়ে।

—অন্ধ মেয়েরও বিয়ে আটকে থাকে না, যদি কপাল ভাল হয়—

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ। তোর আর বকামি করতে হবে না—পড় চিঠি—

রেণুকা অনেক দুঃখ করে চিঠি লিখেচে। শরৎ চলে গিয়ে পর্য্যন্ত সে একা পড়েচে, আর কে তার ওপর দয়া করবে, কে তার হাত ধরে বেড়াতে নিয়ে যাবে? ওঁর মোটে সময় হয় না। তার মন আকুল হয়েচে শরৎকে দেখবার জন্যে, রাজকন্যা কবে এসে কাশীতে 'কেদার ছত্র' খুলচে? এলে যে রেণুকা বাঁচে—ইত্যাদি।

চিঠি পড়ে শরৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। অসহায়া অভাগী রেণুকা! ছোট বোনটির মত কত যত্নে শরৎ তাকে নিয়ে বেড়াতো—কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট, জলে ভাসমান নৌকা ও বজরার ভিড়, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে সান্ধ্য আরতির ঘণ্টা ও নানা বাদ্যধ্বনি।...রেণুকার করুণ মুখখানি। এখানে

সে সব স্বপ্নের মত মনে হয়। খোকা—খোকনমণি! রেণুকা খোকনের কথা কিছু লেখে নি কেন? কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হোল রেণুকাকে কে বক্সীদের বাড়ী নিয়ে যাবে হাত ধরে অত দূরে? তাই লিখতে পারে নি।

রাজলক্ষ্মী কৌতুহলের সঙ্গে নানা প্রশ্ন করতে লাগলো কাশী ও সেখানকার মানুষ-জন সম্বন্ধে, বহির্জগৎ সম্বন্ধে। শরৎ বিরাট অন্নসত্রগুলোর গল্প করলে, রাজরাজেশ্বরী, আমবেড়ে, কুচবিহারের কালীবাড়ী।

হেসে বললে—জানিস্ এক বুড়ী তৈলঙ্গিদের ছত্তরকে বলতো তুণ্ডুমুণ্ডুদের ছত্তর?

—তৈলঙ্গি কারা?

—সে আমিও জানি নে—তবে তাদের দেখেছি বটে।

রাজলক্ষ্মী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। বাইরের জগৎ মস্ত একটা স্বপ্ন। জীবনে কিছুই দেখা হোল না—একেবারে বৃথা গেল জীবনটা। শরৎদি'র ওপর হিংসে না হয়ে পারে?

ক্রমশঃ

অলীকের যুগ নাহিকো আর

শ্রীসমরেন্দ্র দত্তরায়

অলীকের যুগ নাহিকো আর
মানুষ বুঝেছে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম সার-অসার।
মানুষ বুঝেছে সত্য কি ধন,
কোথায় মৃত্যু, কোথায় জীবন,
মানুষ বুঝেছে মানুষেরে দিয়া কি চাহে করিতে প্রাণের প্রাণ,
জেনেছে মানুষ মহামানবেরা দিয়েছে ভুবনে কি সন্ধান।
স্বপনের যুগ নাই রে নাই,
অসীম জ্ঞানের একটু কণায় জীবন ভরিয়া তৃপ্তি পাই।
রূপকথা মন করে না হরণ
যতটুকু করে চন্দ্র, তপন,—
গ্রহ, নীহারিকা, আকাশের কথা, ধরণীর কথা নিশুতি রাতে
সত্য জানিয়া করিতে সফল মানবজন্ম ভুবনটাতে।
অলীকের যুগ নাহিকো আর
মানুষ করেছে করিবেও আরো নিয়ত নূতন আবিষ্কার।
মানুষ ভ্রমিবে গ্রহ তারকায়
আজিও রয়েছে যা' কল্পনায়,
মানুষ বাঁচাবে একদা ধরারে হইতে যে মহাপ্রলয়ে ধ্বংস
মৃত্যুর পথে যাবে না যাবে না সত্য-পূজারী মানব-বংশ।

সঞ্চয়ন

কোম্পানীর কাগজের ভবিষ্যৎ

[১৩৪৯। ভাদ্র সংখ্যা 'শিল্প ও সম্পদে' প্রকাশিত প্রবন্ধের সার মর্ম]

সরকারী ঋণ-পত্রসমূহের নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইলে প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে, সরকারী ঋণপত্রগুলি কি? "সরকারী ঋণপত্র" এ কথাটি অস্পষ্টার্থসূচক, এবং অনুরূপ অস্পষ্টার্থবোধক হইতেছে ইহার সমর্থবোধক কথাটিও, যথা "কাম্পানীর কাগজ।" এগুলি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই হেতুই এগুলিকে কোম্পানীর কাগজ বলা হয়, এবং এগুলি সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক গৃহীত বা সরকার বাহাদুরের নামে বিলীকৃত হয় বলিয়াই এগুলিকে "সরকারী ঋণপত্র" এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আসলে কিন্তু এগুলি জাতীয় ঋণ, এবং জাতির আর্থিক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী এগুলি বিলীকৃত হয়, এবং সেই হেতু সুদ প্রদানের নিমিত্ত জাতীয় তহবিলের উপর ইহাদের দাবী প্রথম। সেজন্য যতদিন জাতি জীবিত থাকিবে, ততদিন এগুলির অস্তিত্বও অটুট অক্ষুণ্ণ থাকিবে,—কেবল মাত্র মুখের কথায় বা রাষ্ট্রীয় শক্তির পরিবর্ত্তনে এগুলিকে পরিহার বা প্রত্যাখ্যান করা চলিবে না। অতীতকালে জগতের দুই একটী গভর্ণমেণ্ট তাহাদের জাতীয় ঋণ সাময়িকভাবে বা চিরকালের জন্য অস্বীকার করিয়াছেন—কিন্তু তাহাতে গভর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয় নাই। বর্ত্তমান যুগে অবশ্য একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া ব্যতীত অপর কোন স্থানে এরূপ জাতীয় ঋণ পরিহারের কথা শোনা যায় নাই। সরকারী ঋণপত্রগুলিকে কেন যে আমরা নিরাপদ মনে করিতেছি, তাহার পশ্চাতে অবশ্য অনেক যুক্তি আছে, কিন্তু সে আলোচনায় আমাদের মনে হয় সারা জগতের সমস্ত দেশের ঋণপত্রসমূহের ঐতিহাসিক পটভূমিকাতেই হওয়া উচিত।

যদি কোন দেশ কোন বিদেশী রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা অধিকৃত হয়, তাহা হইলে ঐ দেশীয় ঋণপত্রগুলির সম্মান রক্ষা বা তাহাদের সর্ত্তপালন, সেই বিদেশী রাষ্ট্রীয় শক্তির মুখের কথা বা সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। মাত্র কয়েক দিনের কথা, আমরা দেখিয়াছি কিভাবে ত্রাসগ্রস্ত হইয়া ভারতের প্রধান ব্যাঙ্ক সমূহের অন্যতম এক প্রতিষ্ঠান ভারতেই কোন এক প্রধান সহরের পৌর-প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্ত্তৃক গৃহীত ঋণগুলি সম্বন্ধে বুদ্ধিহীনের মত এক আদেশ জারী করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ তৎপরতার সহিত কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে তাহাদের চক্ষুর্দান করিয়াছেন।

কল্পনাপ্রসূত কোন যুক্তি দ্বারা কোন দেশের জাতীয় ঋণ পরিহার করা যায় না। সেই জন্যই ভারতীয় জাতীয় মহাপ্রতিষ্ঠান কিছুকাল পূর্ব্বে যখন এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা এদেশে জাতীয় রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে বা এক কথায় দেশ স্বাধীন হইলে, ভারতের সমগ্র জাতীয় ঋণ পরিহারের কথা কল্পনা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবলমাত্র ইহার :- তৃতীয়াংশই বাতিল করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপভাবে সমগ্র ঋণের ভগ্নাংশবিশেষ বাতিল করাও আন্তর্জাতিক আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিবে।

এ যাবৎকাল কোন বিদেশী শক্তি কোন দেশ অধিকার করিয়া সে দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত ঋণসমূহ পরিহার করেন নাই। বরং জাতীয় সরকারই দুই-এক ক্ষেত্রে নিজ দেশের জাতীয় ঋণ পরিহার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু আন্তর্জাতিক বিধানে ইহা অসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় তাঁহারা পরিশেষে সেগুলির সর্ত্তাবলী পালন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইতেছে বিগত শতাব্দীতে বিলীকৃত মিশর-তুর্ক ঋণপত্রসমূহ। এগুলি মিশর দেশের রাজস্বের উপর দায় রাখিয়া অটোমান সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল।

লুসান্ সন্ধির (Treaty of Lausanne) ১৮ সংখ্যক সর্ত্ত অনুযায়ী তুর্কী সরকারকে মিশর দেশের রাজস্বের উপর দায়যুক্ত ঋণসমূহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করা হইয়াছিল। এইরূপ ঋণ মাত্র তিনটি ছিল যথা—(১) ১৮৫৫ সালের শতকরা ৪৲ টাকা সুদ হারের ঋণ ; (২) ১৮৯১ সালের শতকরা ৪৲ টাকা হারের ঋণ ও (৩) ১৮৯৪ সালের শতকরা ৩॥০ টাকা সুদ হারের বদলীকৃত ঋণ এগুলি মিশর দেশের সাধারণ ঋণের অন্তর্গত বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৪ সালের মিশর সরকার এই ঋণগুলি সম্পর্কে নিজেদের দায় অস্বীকার করেন, এবং উক্ত বর্ষের জুলাই মাস হইতে এগুলির সুদ প্রদান বন্ধ করিয়া দেন। এই সম্পর্কে কায়রোর (Cairo) আপীল সম্পর্কিত মিশ্র আদালতে (Mixed Court of Appeal) যে বিচার তাহাতে এই রায় প্রদত্ত হয় যে, ১৮৯১ ও ১৮৯৪ সালের ঋণদ্বয়ের দায় গ্রহণ করিতে মিশর সরকার বাধ্য। তাহার ফলে মিশর সরকার সেই সময় (১৯২৪ সাল হইতে বকেয়া সুদ সমেত) হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহার সমস্ত সুদ যথাযথভাবে প্রদান করিয়া যাইতেছেন এবং ঋণপত্রের যে যে অংশসমূহ প্রত্যার্পণের জন্য মেয়াদী হইতেছে তাহার মূল টাকাও ফেরৎ দিতেছেন। উপরোক্ত দৃষ্টান্তটি মিশরের জাতীয় ঋণের ইতিহাস হইতে ইচ্ছা করিয়াই লওয়া হইয়াছে. তাহার কারণ ভারতীয় ঋণসমূহের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য অনুরূপ। এই উভয় দেশেরই ঋণসমূহ প্রতিষ্ঠিত বিদেশী সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। এখন কথা হইতেছে এই যে, বিদেশী সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত মিশরের এই সমুদয় ঋণের জন্য পরবর্ত্তীকালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সরকারের দায় কিসের? তাহার একমাত্র কারণ এই যে, এই সমস্ত ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল মিশর দেশের রাজস্বের উপর দায় চাপাইয়া। যত দিন রাজতহবিলে রাজস্ব প্রবাহিত হইতে থাকিবে, ততদিন মিশরের রাজসরকারকে সে দায় নিজেদের স্কন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি এই সম্পর্কে আরো উজ্জ্বলতর আলোক নিক্ষেপ করিবে।

• বিচারের সময় ইহা দেখা গেল যে, ১৮৫৫ সালের ঐ ঋণটি মিশরের রাজস্বের পরিবর্ত্তে স্মার্ণা (Smyrna) ও সাইপ্রাস্ (Cyprus) নামক সহরদ্বয়ের করের উপর দায় চাপাইয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল। মিশর সরকার তো মুক্ত হইয়া যাইলেন, কিন্তু ঋণপত্র ক্রেতাদের (bond holders) অবস্থা কি হইল? তাঁহারা অবশ্য পথে বসিলেন না। কেন না, যতদিন স্মার্ণা ও সাইপ্রাস্ সহরের তহবিলের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন কেহ না কেহ সেই তহবিল হইতে উহার সুদ প্রদান করিতে ও উহার দায় লইতে বাধ্য থাকিবেন। কার্য্যক্ষেত্রে হইয়াছে ও ঠিক তাহাই। উক্ত নীতি অনুযায়ী এই ঋণটি এখন বৃটিশ সরকারের ঋণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, এবং সাইপ্রাস সহরের কর হইতে ইহার ঋণপ্রদানের দায়িত্ব যুক্ত ও বিযুক্তভাবে বৃটিশ ও ফরাসী সরকার নিজেদের স্কন্ধে লইয়াছেন। ইহার জন্য একটি সংরক্ষিত ভাণ্ডারও সৃষ্ট হইয়াছে, এবং উহাতে যথেষ্ট টাকা জমা পড়িলে যথাযথ বিজ্ঞপ্তির পর উক্ত ঋণটি প্রত্যর্পণ করা হইবে, এইরূপ অঙ্গীকারও করা হইয়াছে।

সরকারী ঋণসমূহের উপর কোন না কোন রকমের দায় চাপান থাকে বসিয়াই ইয়োরোপের প্রাগ যুদ্ধকালীন রাজ্যসমূহের ঋণগুলির দায়িত্ব পরবর্ত্তীকালীন সরকারগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে অষ্ট্রো-হুঙ্গেরীয় রাজ্য বিযুক্ত হইবার পর উহার ঋণসমূহের দায়িত্ব অষ্ট্রিয়া ও হুঙ্গেরী ব্যতীত ফিউম (Fiume,) ইটালী, যুগোশ্লাভিয়া, পোলাণ্ড ও রুমানিয়াকেও গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সাম্প্রতিক সময়েরও দুইটি ঘটনা এসম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে চাইনীজ ইম্পিরিয়াল রেলওয়ে শতকরা ৫৲ টাকা সুদ হারে একটি ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার মূল টাকা প্রত্যর্পণ ও সুদ প্রদান সম্বন্ধে চীনা সরকার গ্যারাণ্টি দিয়াছিলেন, এবং সমগ্র রেলপথের আয়ের উপর ইহা দায়যুক্ত করা ছিল। ১৯৩২ সালের জুন মাসের পর হইতে এই রেলপথের অংশ বিশেষ মাংচুকো সরকারের অধীনস্থ হইয়াছে, এবং সেই অংশের আয়-লাভ হইতে চীনা সরকার বঞ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মাংচুকো কর্ত্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে ঐ রেলপথের আয়ের অংশ বিশেষ উক্ত ঋণের সুদ প্রদানের নিমিত্ত বিলাতে প্রেরণ করিয়া আসিয়াছেন। এই সম্পর্কে পুনরায় অষ্ট্রিয়ার দৃষ্টান্তই দেওয়া যাইতে পারে। ১৯৩৮ সালে জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক অষ্ট্রিয়া অধিকৃত হয়, কিন্তু সেই সময়

হইতে নাৎসী সরকার অষ্ট্রিয়ার সরকারী ঋণসমূহের সুদ যথাযথভাবে প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী সরকার কর্ত্তৃক ঋণসমূহই পরবর্ত্তীকালীন সরকার কর্ত্তৃক পরিগ্রহণ সম্বন্ধে যে আন্তর্জ্জাতিক বাধ্যতা-মূলক বিধান রহিয়াছে, তাহা আমরা উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহ হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি। একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া ব্যতীত জগতের অন্য কোন দেশে সরকারী ঋণ পরিহারঘটিত ব্যাপার বড় একটা ঘটে নাই। বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়াই ১৯১৭ সালে তাঁহার সমস্ত সরকারী ঋণ পরিহার করিয়াছিল। এইরূপ পরিহারের দ্বারা সোভিয়েট রাশিয়া যে আন্তর্জ্জাতিক বিধানানুযায়ী এক গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল, তাহা সেই সময়ে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার কর্ত্তৃক যুক্তভাবে প্রদত্ত নিম্নলিখিত বিবৃতি হইতে পরিষ্কার বোঝা যাইবে :—

"রুশ সাম্রাজ্যের সরকার, যেসময়ে এই দায়িত্বসমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহারাই যে রুশ দেশে একমাত্র প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন, এবং সেই দেশের উপরই যে এই দায়ভার সুনিশ্চিতরূপ ন্যস্ত করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রুশ দেশ যে কোন কর্ত্তৃপক্ষেরই ক্ষমতাধীন হউক না কেন, আন্তর্জ্জাতিক বিধানের ভিত্তি ক্ষুণ্ণ না করিয়া, তাঁহারা সেই অঙ্গীকার প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। অন্যথা জগতের রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের কোন নিরাপত্তা থাকে না, এবং এই দায়িত্ব সন্দেহজনক হইলে দীর্ঘ মেয়াদী কোন দায়ভারও গ্রহণ করা চলে না। ইহাতে রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক, কথা অর্থনৈতিক, মর্য্যাদাহানি ঘটিবেই। প্রতিনিধিমূলক যে শাসন-তন্ত্রের সাহায্যে কর্জ্জগ্রাহী সরকার কর্জ্জ প্রার্থনা করেন, তাহার স্থায়িত্বের উপরই যদি ইহার নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে, তাহা হইলে কোন দেশের সরকারের পক্ষেই স্বাভাবিক সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ করা সম্ভবপর হয় না। সরকারের কার্য্য-কলাপের জন্য জাতিই দায়ী এবং রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিবর্ত্তন ঘটিলেও পূর্ব্ববর্ত্তী সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত দায়ভার সম্পূর্ণ অটুট থাকিবে—এই নীতি অপেক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত আর কোনও নীতি নাই। রুশ দেশের দায়ভার স্থায়ীই থাকিবে ; এবং নূতন যে কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপুঞ্জ তৎপরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন তাঁহারাও সে দায়ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।" এবং যে হেতু ব্রিটিশ সরকার আন্তর্জ্জাতিক বিধানে এইরূপ পরিহার অসিদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত এই ঋণগুলিকে মানিয়া চলিতেছেন, এবং সেই কারণেই লণ্ডন ষ্টক এক্সচেঞ্জে আজ পর্য্যন্ত এইগুলির কাজ চলিতেছে ও যখন তখন সেগুলির হস্তান্তর ঘটিয়া থাকে। বিবেকের দিক হইতে সোভিয়েট সরকারও মনে মনে ইহা জানেন যে, এইরূপ পরিহার আইনে অসিদ্ধ এবং সেই কারণেই তাঁহারা ১৯২৯ সালে এগুলি সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, এবং তাহারই ফলে ১৯৩২ সালে ইণ্ডো সোভিয়েট ঋণ ও দায় সমিতি গঠিত হইয়াছিল।

উপরোক্ত ঘটনাসমূহ হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সরকারী ঋণসমূহের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অযথা ভয় পাইবার কিছু কারণ নাই সেগুলির নিরাপত্তা সর্ব্বকালেই অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

(শ্রীঅতুলকুমার সুর, এম-এ)



অমীমাংসিত

(গল্প)

শ্রীক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনে চলার ছন্দ যাহার থামিয়া আসিয়াছে, অনাগত ভবিষ্যতে আশার আলোক যাহার নিভিয়াছে, তাহার চলিবার প্রেরণা কোথায়? ভাবীকালের দুস্তর প্রান্তরে চলিবার পদচারণা যাহার বাজিবে না, অদূরের ইঙ্গিত সে বুঝিবে কেমন করিয়া? কয়েকদিন ধরিয়া আমার জীবন যেন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে, কিছুতে মন বসে না— সমস্ত তিক্ত, বিস্বাদ বলিয়া ঠেকে। অতীত জীবনের কৈশোর-দীপ্ত মুহূর্ত্তে কবে কোন্ কাজ করিয়াছিলাম, গাছের পাতায় প্রাণের স্ফূর্ত্ত উল্লাস পাইয়াছিলাম, আজ তাহা থাকিয়া থাকিয়া নিষুপ্ত নির্জ্জীব জীবনের উপর এক এক ঝলক আলো ফেলিয়া যায়। সেই আলোর ঝলকে অতীত ও বর্ত্তমানের আকাশ পাতাল ব্যবধান দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাই—কি ছিলাম, কি হইয়াছি! জীবনের উপর যৌবনের প্রভাব এখনও আছে, প্রৌঢ়ত্বের এতটুকু ছোঁয়াচ লাগে নাই; তবুও যেন মন এমন বুড়া হইয়া গিয়াছে যে ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আগে আগে কাজে ডুবিয়া থাকিতাম, এটা ছাড়িয়া ওটাতে হাত দিতাম। অবসর মিলিত কম। এখন কাজ নাই তাই অবসর বেশী। এই প্রচুর অবসরে বিলাসী দেহটা নিঃসাড় আয়াসে মরিয়া থাকিলেও সতেজ সক্রিয় মস্তিষ্কের রন্ধ্রে, রন্ধ্রে চিন্তার ঢেউ খেলিয়া যায়—বিগত জীবনের টুকরা টুকরা স্মৃতিকে লইয়া মনের কোণে কাহিনী গড়িয়া ওঠে।

খাওয়ার ভাবনা নাই, মেসের ঠাকুরের কল্যাণে নিয়মিত ভাতের থালা হাতের কাছে পাই। চাকুরী করিবার দরকার হয় না, কারণ না করিলেও স্বচ্ছন্দে আমার পৈতৃক সম্পত্তির প্রসাদে চলিয়া যাইবে। তাই মেসের নিঃসঙ্গ জীবনে আরাম কেদারায় সমস্ত দেহ বিলম্বিত করিয়া ক্যাপ্‌স্টান সিগার ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়ার ভিতর একটা অলস মাধুর্য্য ভোগ করিবার প্রচুর সময়। আগে ভাল লাগিত, এখন বসিয়া বসিয়া সিগার টানাতে বিতৃষ্ণা ধরিয়া গিয়াছে, মুখ তিতো হইয়া গিয়াছে। আগে মেসের এই কোণটাতে এমনি বসিয়া দূরে ছাতের উপর ও-বাড়ীর ছেলেমেয়েদের খেলা দেখিতাম, ঘুড়ি উড়িয়া আসিলে তাহাদের দিতাম। আজকাল ওদের দিকে চাহিতেও বিরক্তি হয়, কিছু যেন ভাল লাগে না। আবোল-তাবোল সাতরাজ্যের অবান্তর কথা লইয়া মনের সঙ্গে আজকাল বোঝাপড়া করি। এতদিন পর্য্যন্ত শৈশবের কথা নিয়া, মায়ের স্মৃতি নিয়া, বিবাহিত বোনের সাংসারিক জীবন লইয়া ভাবিয়াছি, তবু যা হোক্ সময় কাটিত। গত কয়েকদিন দেখিতেছি মনটা যেন ক্রমেই পাগলা হইয়া যাইতেছে, সে যেন কিছুতে শান্ত হইতে চাহে না। ঠিক বুঝিতে পারিতেছি, সে বিদ্রোহী হইয়াছে। মন বিদ্রোহী হইয়াছে এইটুকুই জানিতাম, কিন্তু একি? সে বলিতে চায় কি? আমি আর আমার মন যেন দুইটি বিভিন্ন বস্তুতে রূপান্তরিত হইয়াছি। তাই-ত মনের ক্ষণিক খেয়াল ও তার বিদ্রোহের আস্ফালনে আমি যেন অপরিচিত আর একজনের মত তাহার গোপন তথ্য জানিতে ব্যগ্র হইয়া থাকি। আজও গোধুলি রাঙা বৈকালে রেলিঙের পাশে আরাম কেদারায় এমনি এমনিই কি যেন ভাবিতেছিলাম—ভাল লাগিতেছিল না কিছুই। দূরে ছেলেমেয়েদের উচ্ছ্বাস ও হর্ষধ্বনি আমার কানে যেন প্রেতপুরীর অস্পষ্ট বিশ্রী আওয়াজের মত বোধ হইতেছিল। হঠাৎ আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম মনের একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া। আমার দেহকে আশ্রয় করিয়া আমারই মনোবৃত্তির উপাদানে গঠিত হইয়া যে মন এতদিন তিলে তিলে বাড়িয়া উঠিয়াছে, সে বিদ্রোহের আস্ফালনের মধ্যে অস্পষ্ট সুরে বলে কি?

যুক্তি-তর্ক জানি না, শুধু বুঝিতেছি আমার মন

বিদ্রোহী হইয়া আজ তার শেষ কর্ত্তব্য করিতে বলিতেছে। মনে হইল, আত্মহত্যা মন্দ কি। জীবনে যার সুখ নাই, বাঁচিবার নেশা যার কাটিয়া গিয়াছে, অনন্ত ভবিষ্যতের স্বপ্ন যার চোখে মায়ালোকের পরশ-ছোঁয়া দেয় নি, তার জীবনের ত কোন সার্থকতা নাই। এতক্ষণে বুঝিলাম, মন ঠিক কথা বলিয়াছে। কিন্তু মস্তিষ্কের কোন্ ছিদ্রপথে আর এক চিন্তা আসিয়া সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে। প্রশ্ন আসিতেছে, মরিব কেন? বাঃ—মরিব কেন! ভাল লাগে না বলিয়াই মরিব! কিন্তু ভাল লাগে না কেন?… তাইত, একথা ত ভাবিয়া দেখি নাই। এটা সত্য, আমার কিছু ভাল লাগে না—কিন্তু কেন? আমার রূপ আছে, অর্থ আছে, যৌবন আছে। বিবাহ করি নাই, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই করিতে পারি। বন্ধন আমার আজ কোনদিকে নাই—বাপ-মা বহুদিন মারা গিয়াছে, ত্রিসংসারে আত্মীয়ের মধ্যে শুধু ছোট বোন মায়া—তারও আজ বছর চারেক বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই চার বছরে সে আমায় কতবার তাদের মহুয়া গ্রামে যাইতে লিখিয়াছে। ভাল লাগে না বলিয়াই চার বছরের ভিতর তার সঙ্গে একদিনও দেখা করি নি। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যুক্তি-তর্কের পথ ধরিয়াও বুঝিতে পারিলাম না, ভাল আমার লাগে না কেন।

মন তার নূতন দাবী তুলিয়াছে। ঘরের কোণে টিকিতে পারিলাম না, অস্থির হইয়া বাহিরে আসিলাম। পাগল মনের সঙ্গে যুঝিতে যুঝিতে বহুদূরে আসিয়া পড়িলাম। রাত্রি কত হইবে কে জানে? ট্রাম-বাস ঘড় ঘড় করিয়া ছুটিতেছে। ফুটপাতের দু'পাশ দিয়া কাতারে কাতারে লোক চলিয়াছে। মনে হইল, পৃথিবী চঞ্চল। সজীব পৃথিবীর জীবনের নাড়ী দপ্ দপ্ করিয়া নড়িতেছে। অগণিত নরনারী কিসের যেন মোহে ব্যস্ত হইয়া চলিয়াছে. থামিবার লক্ষণ নাই। কিছুকাল আগে বর্ষা হইয়া গিয়াছে লক্ষ্য ছিল না, দেখিলাম ভিজিয়া গিয়াছি। ওঃ, মাথাটাতে জল বসিয়া গিয়াছে। সর্দ্দি না হয় আবার! তাড়াতাড়ি মেসের দিকে ছুটিতে পা বাড়াইলাম। কিন্তু তখনি আত্মহত্যার কথা মনে পড়িয়া এত দুঃখেও হাসি আসিল। জীবনকে যে নিজের হাতে শেষ করতে চায়. তাহার আবার জীবনের উপর কিসের মোহ? নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হইলাম। ফিরিয়া আবার বিপরীত মুখে ছুটিলাম। পীচের রাস্তার ধূলা-বালি জলে ভিজিয়া বিশ্রী একটা পচা ভাপ্‌সা গন্ধ ছাড়িতেছে। দূরে ডাষ্টবিনের স্তূপীকৃত জঞ্জাল জলে গলিয়া বীভৎস আবহাওয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। চলিতে চলিতে কোথাও বা ফাটল রাস্তার বদ্ধ জল জুতার চাপে পিচ্ করিয়া কাপড়ের পিছনটা নোঙ্‌রা করিয়া দেয়। লোকের ঠেলা, গায়ের ঘষাঘষি, বিষাক্ত গন্ধের ভিতরে চলিয়াছি। আজ আমার কিছুতে যায় আসে না, মরিব যখন ঠিক করিয়াছি তখন সুশ্রী বিশ্রীর বিচারে আমার দরকার কিসের! মরার সঙ্কল্প করিয়া মন যেন বহু উদার হইয়া গিয়াছে। কর্পোরেশনের ধাঙড় বা গাছতলার সাধু আমার কাছে আজ সমান বলিয়া বোধ হইতেছে।

শিয়ালদহের মোড় দিয়া শ্যামবাজার পর্য্যন্ত ট্রাম রাস্তার নির্ম্মাণ কার্য্য চলিয়াছে। ফুটপাথের পাশে পাশে কর্পোরেশনের কুলী ও মিস্ত্রী তাঁবু গাড়িয়া রাত্রির বাসস্থান ঠিক করিয়া লইয়াছে। হিন্দুস্থানী একটা কুলী তাঁবুর মুখে বসিয়া লোহারকড়ায়ে মোটা পুরী বানাইতেছে। ইহাতে তরকারী বড় জোর একটু অড়হরের ডাল মাখিয়া তাহার রাত্রির আহার হইয়া যাইবে। আবার সকালের খর-রৌদ্রে শিক ও সাবল ঘাড়ে লইয়া তাহারা পাথর ভাঙ্গিবে, রাস্তা খুঁড়িবে, লাইন বসাইবে। কি সুন্দর ইহাদের এই সরল শ্রমলব্ধ-জীবনের বিনিময়ে একটুকরা মোটা পুরী। নূতন-বসানো লাইনের দুই পাশ দিয়া লাল বাতি সারি সারি জ্বলিতেছে। মাঝে মাঝে পুলিশ দাঁড়াইয়া অসতর্ক পথিক ও গাড়িকে ঠিক পথে চলিবার ঈঙ্গিত করিতেছে। বৃষ্টির জলে ধোঁয়াটে কালো গাছের পাতাগুলি পরিষ্কার হইয়াছে। রাস্তার গ্যাসের আলোক গাছের পাতা, নীচের কাঁকর ও নিকটের ভাঙ্গা পীচের চাপ্‌ড়ার উপর পড়িয়া একটা মোহাবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। এই স্তিমিত আলোকের অস্বচ্ছ আভায় গ্যাসপোষ্টের উপর ছাপ-মারা ছেঁড়াখোঁড়া বিজ্ঞাপনগুলি যেন কোন্ এক সুদূর জগতের আশার বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে। দূরে দেওয়ালের গায়ে চশমাধারী মহিলারমী একটী [illegible]

াঝে মাঝে হুস্ করিয়া ৩নং বাস যাত্রী বোঝাই করিয়া টিয়া চলিয়াছে। অস্পষ্ট নীলাভ ধোঁয়াটে আলোকে ণিকের জন্য বুঝি বা কোন যাত্রীর সঙ্গে দৃষ্টির বিনিময় য়, সে কিছুকাল চাহিয়া থাকে, আমিও তাহাকে লক্ষ্য রি। কিন্তু আবার কোথা দিয়া সে হঠাৎ চাহিতে াহিতে চলিয়া যায়।

বৃষ্টি ছেক দিয়াছে। রাস্তার ধারের অস্থায়ী দোকান- রেরা তাহাদের সামান্য পশরা আবার বিছাইতেছে। াড়ীবারান্দার কোণে একটি কঙ্কালসার বিহারী লাল লশায় কাঠকয়লার আগুন ধরাইয়া তাহার উপর াছনের চাঙাড়ী হইতে সদ্য-আনীত ভুট্টা চাপাইতেছে। ই ভিজা বাতাসে আগুনে-সেঁকা ভুট্টা হইতে কেমন যেন কটা লোভনীয় গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। বিহারে এই ধের মকাই তাহার বিহারী দেশওয়ালারাই খাইতে জানে লো। একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। ছোট বোন য়ার এই বস্তুটির উপর একটা অস্বাভাবিক আগ্রহ। বা যখন ভাগলপুরে কাজ করিতেন, তখন আমরা র সাতেক তার সঙ্গে ছিলাম। মায়া ভাগলপুরেই হয়, ং শেষপর্য্যন্ত বাবার চাকুরী ছাড়িয়া না আসা পর্য্যন্ত মরা সবাই সেখানে ছিলাম। মায়া সেখানে কুলীদের ছ হইতে এই মকাই পোড়া খাওয়া শিখিয়াছিল, বলা ল্য, আমি ওসব কোন দিন পছন্দ করি না। বোনের জীবনে আর বোধ হয় দেখা হবে না, তাই বার আগে তাহার নাম করিয়া একটা ভুট্টা কিনিয়া নিচ্ছাসত্ত্বেও খাইলাম। খাইতে মন্দ লাগে না ত!

হাঁটিতে হাঁটিতে মানিকতলার মোড়ে পৌছিলাম। খালের সেতু, আরও দূরে আর একটা সেতুর উপর রেললাইন চলিয়া গিয়াছে। এখান হইতে অস্পষ্ট লো বর্ষার মেঘকৃষ্ণ আকাশের গায়ে সারি সারি অসংখ্য দেখা যাইতেছে। কলিকাতা নগরীর এই একটা ন্ত। তাই এখানে সহর ও প্রকৃতির সঙ্গে ঘেষাঘেষি য়াছে। রেললাইন ধরিয়া একটা পরিচিত পথে মন য়া চলিল। একবার মাত্র গিয়াছিলাম মহুয়া গ্রামে, নের সাথে ভাইকে প্রথমে শ্বশুর বাড়ীর পথ পর্য্যন্ত হাইয়া দিবার সেই সুযোগে। সেই এক বৈশাখী শুভ দিনে আমরা সকলে নূতন পথে চলিয়াছিলাম। রেলপথের দু'পাশে সাদা সাদা ঘাসফুল ফুটিয়াছিল, গাড়ী চলার সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত বাতাসে ফুলের ছোট ছোট কুঁড়ি জানালার ভিতর হইতে উড়িয়া আসিয়া মাথায় কাপড়ে জমা হইতেছিল। দূরে দূরে আমগাছের মাথায় প্রথম মুকুল ফুটিয়া একটা মিঠে গন্ধ বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। মনে কি স্ফূর্ত্তি! মায়া এক সময়ে আমার কানের কাছে মুখ রাখিয়া কহিল, দাদা আম পাক্‌বে তাই খেয়ে তবে তুমি বাড়ী ফিরবে। আমি তাহার মনের কথা বুঝিয়াও অন্য ভাবে কহিলাম, কেন তোমার শ্বশুরবাড়ীর আঁব না খেলে বুঝি আমি আর কোথাও খেতে পাব না। সে কাঁদিয়া ফেলিল, আমি বুঝি তাই বলেছি?

সান্ত্বনা দিয়া তাহাকে এবার বলিলাম, না রে মায়া তা নয়। আচ্ছা, তোর সঙ্গে আমি অনেক দিন থেকে আসব, তবে ত তুই খুশী হোস্?

মায়া হাসিয়াছিল। কিন্তু আমি দিন পনর থাকিয়া মায়ার শত অনুনয় ছাড়াইয়াও চলিয়া আসিয়াছিলাম। তারপর বছর চারেকের ভিতর আর মহুয়া গ্রামে যাই নাই।

হঠাৎ রাস্তার দিকে চাহিতে দেখিলাম, লোকজন চলা কমিয়া আসিয়াছে, অনেকক্ষণ পরে পরে এক একটা বাস আসিতেছে। তাইত, রাত্রি বেশী হইল যে। চারিদিকে কেমন একটা শুষ্ক গুঞ্জন চলিতেছে—দূরে কোথায় ঘণ্টা বাজিতেছে। এতক্ষণে মনে হইল, আমাকে ত মরিতে হইবে। না—না, আর বাঁচিব না। যতকাল বাঁচিব কেবল স্মৃতির টুক্‌রা লইয়া মন খেলিয়া বেড়াইবে, আর সেই বিগত বিস্মৃত স্বপ্নে-ঘেরা শৈশবের ঘটনার সঙ্গে আজিকার বিশুষ্ক জীবনের তুলনা টানিয়া শুধুই কেবল ব্যথা পাওয়া।

চলিতে চলিতে একটা কথা নূতন করিয়া মনে পড়িল। আচ্ছা, আমি ত সব করিতে পারি। এখন আমি মেসেও ফিরতে পারি, অথবা না ফিরিয়া সমস্ত রাত্রি পথে পথে চলিতেও পারি। আমি ইচ্ছা করিলে দাঁড়াইতে পারি, ইচ্ছা করিলে বসিতে পারি। আমার ইচ্ছা হইলে চুরি করিয়া এখনি কয়েদ-বাস করিতে পারি, অথবা সন্ন্যাসী

হইয়া নিরুদ্দিষ্ট হইতেও পারি। আমি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারি? মরা-বাঁচা ত আমার ইচ্ছার উপর। তবে যে আজ মরিবার জন্য এমন ব্যাকুল হইয়াছি, তাহা ত আমিই ইচ্ছা করিয়া বদলাইতে পারি। তবে আমি কি মরিব? ইহাই আমার ইচ্ছা? বটেই ত। কিন্তু পরক্ষণে মনে হইল, আমার মরণে কি আমি শুধু দায়ী, না নিয়তিরও হাত আছে? বুঝিতে পারিলাম না, সব ঘোলাটে হইয়া যাইতেছে…

ঠিক করিলাম, আমি মরিব। মরিব বলিয়া যখন মেস হইতে বাহির হইয়াছি, তখন ফিরিব কোন্ মুখে? কিন্তু মনে মনে মরিবার জন্য যে পণ করিয়াছি তাহা কি নিয়তির চক্রান্তে? তা যদি হয়, তবে আমি মরিব না। আমি দেখিতে চাই, নিয়তি অপেক্ষা আমি অনেক বড়। না, মরিব না—কিছুতেই না। আবার প্রভাত জাগিবে, গাছের ডালে পাখী গাহিয়া উঠিবে, আকাশের গায়ে হাল্কা মেঘের ঝিলিমিলি খেলা চলিবে। জীবনে কে বাঁচিতে চায় না? মাটির গর্ত্ত হইতে পিপীলিকা পাখা মেলিয়া উপরে উড়ে, গাছের পত্র-কোরকে জীবনের জোয়ার ফাটিয়া পড়িতেছে, মায়ের জঠরের অন্ধকার হইতে এই পৃথিবীর আলো-বাতাসের জন্য সন্তান দাপাইতেছে। কে চায় না বাঁচিতে? আমিও বাঁচিব।

রাত্রি বেশী হইয়া আসিতেছে। মেসের পথে দ্রুত পায়ে চলিলাম। কে জানে ঠাকুর এত রাত্রিতেও ভাত রাখিয়াছে কিনা। মরণের বাতিক চলিয়া গিয়াছে, বাঁচিবার জন্য আবার আসিয়াছে তাগিদ। বাস্তবতার রূঢ় আঘাতে আবার হয়ত জর্জ্জরিত হইতে হইবে, মেসের রেলিঙের ধারে আরাম কেদারায় শুইয়া শুইয়া জীবনকে উপভোগ করিব কিনা কে জানে? তবু ত বাঁচিতে পারিয়াছি। কি একটা বিভীষিকা—কি একটা দায়িত্ব এতক্ষণ আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল, তাহা হইতে ত মুক্তি পাইয়াছি।

কিন্তু কে বলিবে মুক্তি কোথায়? বাঁচার ভিতরই কি এত সার্থকতা?

পুস্তক-পরিচয়

নীলাঙ্গুরীয়—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীটস্থ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্সের পক্ষ হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৩৪২+১০ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা।

শরৎচন্দ্রের পর আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে কয়জন কথাসাহিত্যিক সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার অপূর্ব সুন্দর ছোট গল্পগুলি বাঙালী পাঠক-সমাজের মনোহরণ করিয়াছে বলিলে কিছুই বলা হয় না, আংশিক সত্য মাত্র প্রকাশ করা হয়। তিনি তাহাদিগকে মুগ্ধ, বিস্মিত এবং চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার 'রাণুর প্রথম ভাগ'-শীর্ষক গল্পটি যখন প্রথম 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়, তখন পাঠক-সমাজে যে বিপুল চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছিল তাহার সঙ্গে একমাত্র শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' প্রকাশের সময়কার কথাই তুলিত হইতে পারে। সমস্ত বাংলা দেশ মুগ্ধ হইয়া এই নবীন আগন্তুককে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল।

তাহার পর হইতে তিনি বহু ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন, এবং এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাঁহার সে পূর্বখ্যাতি একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং দিন দিন উজ্জ্বলতর হইয়াছে। তাঁহার 'শ্যামলরাণী', 'পীতু', 'বর্ষায়', 'বরযাত্রী', 'দ্রব্যগুণ' প্রভৃতি গল্পগুলি বিশ্ব-সাহিত্যের যে কোনো ভাষার অলঙ্কার স্বরূপে গণ্য হইতে পারে।

বিভূতিভূষণের ছোট গল্পগুলির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ তাহার মধ্যকার অনাবিল কৌতুকরস। তাহা যেমনি স্বতঃস্ফূর্ত,

ত্মনি মধুর—কাহাকেও আঘাত করে না। পাঠ শেষ রিয়া উঠিলে মন নির্মল আনন্দরসে পূর্ণ হইয়া যায়। াহার আর একটি বিশিষ্ট গুণ তাঁহার শিশুমনস্তত্ত্ব-শ্লেষণে অন্তর্নিহিত। তাঁহার ন্যায় এমন অপূর্ব শিশু-রিত্র চিত্রণ অন্য কোনো সাহিত্যিকের রচনার মধ্যে দেখা য় না। 'পীতু', 'বাদল', 'স্বয়ংবরা' প্রভৃতি গল্পগুলি তার ক্ষ্য দিবে। তাঁহার কিশোর চরিত্র চিত্রণ ক্ষমতাও অনন্য-ধারণ। বোধ হয়, একমাত্র শরৎচন্দ্র ব্যতীত এ বিষয়ে াহার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কিন্তু তাঁহার াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে হাসি ও অশ্রুর অপূর্ব মিশ্রণে। এই গুণেই তিনি বাঙালী পাঠকবর্গের হৃদয় করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার এই শ্রেণীর গল্পগুলি ড়িতে পড়িতে কখন কখন অশ্রুসিক্ত চোখে হাসিয়া লিতে হয়, আবার কখন বা হাসিতে হাসিতে হঠাৎ াখে জল ভরিয়া আসে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে াতে একটুও রসভঙ্গ হয় না। ময়ূরকণ্ঠী কাপড়ের লাল নীল সূতার মতো হাসি ও অশ্রুর টানাপোড়েনে বোনা ই গল্পগুলি। প্রত্যেকেই নিজের নিজের নির্দিষ্ট স্থানে প্রবিষ্ট, কেহ কাহারও মধ্যে একটুও অনধিকারপ্রবেশ রে না, অথচ সমস্ত মিলিয়া একই সঙ্গে পাশাপাশি কিয়া এক অপরূপ নূতন রসে টলমল করে। এই ণীর রসের পরিবেশন বাংলা সাহিত্যে আর কোনো হিত্যিকের রচনার মধ্যে দেখা যায় না। ইহার হতাই তাহার একমাত্র কারণ। এই শ্রেণীর রস পরি-শন করিতে হইলে অতি সূক্ষ্ম রসানুভূতি থাকা য়োজন। অন্যথা একটু অসাবধান হইলেই sublime liculousএ পরিণত হইবে। এ বিষয়ে তিনি অদ্ভুত- সাফল্য লাভ করিয়াছেন। এই দিক দিয়া দেখিতে লে শক্তিমত্তায় তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে স্থান দিতে হয়। এই শ্রেণীর গুলির মধ্যে 'রাণুর প্রথম ভাগ', 'শ্যামলরাণী', রদীয়া' প্রভৃতি গল্পগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ ও উল্লেখ-াগী।

তাঁহার রচনারীতির (style) প্রসাদগুণও অনন্য-ারণ। অতি সহজ সাবলীল ঘরোয়া ভাষায় লেখা তাহার মধ্য হইতে ছোট ছোট 'হিউমারে'র খোঁচগুলি রসে পরিপূর্ণ হইয়া ঝলমল করে। তাঁহার প্রকাশভঙ্গিও অপূর্ব মনোহর, কোথাও একটুও নীরস লাগে না। ভাষার সংযমও তাঁহার অসাধারণ। ঠিক যেটুকু লেখা উচিত তিনি সেইটুকুই লেখেন, কোথাও একবর্ণও বেশি লেখেন না। শরৎচন্দ্র একবার আমাদের বলিয়াছিলেন, "লেখার চেয়ে না লেখাই বেশি শক্ত।" অর্থাৎ ঠিক স্থানে থামিতে জানাই লেখকের সব চেয়ে বড় গুণ। বিভূতিভূষণের সে গুণ আছে। আধুনিক সাহিত্যে এই গুণের সবিশেষ অভাব লক্ষিত হয় বলিয়াই এত কথা বলিতে হইল।

এতদিন আমরা বিভূতিভূষণকে ছোট গল্পের লেখক হিসাবেই জানিতাম। বর্ত্তমানে তিনি বঙ্গবাণীর মন্দির দ্বারে তাঁহার উপন্যাসের অর্ঘ্য সাজাইয়া আনিয়াছেন। তাঁহার নবপ্রকাশিত উপন্যাসখানির নাম 'নীলাঙ্গুরীয়' ইহার বিষয়বস্তু, মধ্যবিত্তঘরের এক ছাত্রের ব্যর্থপ্রেমের কাহিনী—ঠিক করুণ কাহিনী নহে কিন্তু: ঐটুকুই বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য।

গ্রন্থের নায়ক শৈলেন নামক এম-এ ক্লাসের একটি ছাত্র। এই নামে বিভূতিভূষণ বহু ছোট গল্প লিখিয়াছেন। যে সমস্ত গল্প বিভূতিভূষণ উত্তমপুরুষে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন প্রায় সেই সমস্ত গল্পেরই নায়ক শৈলেন। ইহাতে অনেকে 'শৈলেন' বিভূতিভূষণেরই একটি ছদ্মনাম বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় একথা ঠিক নহে। কেন, সে প্রসঙ্গ এখানে অনাবশ্যক।

শৈলেন ধনী ব্যারিষ্টার মিঃ রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা তরুর গৃহশিক্ষক। কয়েক দিনের মধ্যেই শৈলেন মিঃ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা মীরাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। মীরার দিক হইতেও প্রতিদান আসিল—কিন্তু নিছক ভালবাসার নহে, শৈলেনের সাংসারিক অবস্থা মীরার অপেক্ষা নিম্ন-স্তরের বলিয়া মীরার ভালবাসার মধ্যে একটু ঘৃণার খাদ মিশিয়া রহিল। এই ঘৃণা-মিশানো ভালবাসাই গ্রন্থকারের প্রতিপাদ্য বিষয়। বস্তুতঃ ভালবাসার এই নূতন এবং বিতর্কিত রূপটি চিত্রিত করিবার জন্যই এই উপন্যাসের সৃষ্টি। সে কথা গ্রন্থকার ভূমিকাতেই লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু, বিশেষ একটি উদ্দেশ্য লইয়া লেখা

হইলেও, উপন্যাসটি পড়িতে পড়িতে সে কথা মোটেই মনে থাকে না—উপন্যাসের নিজস্ব মাধুর্যে মন ভাসিয়া যায়। এক একবার মনে সন্দেহ হয়, গ্রন্থাকার উদ্দেশ্যটি পরে জুড়িয়া দিয়াছেন—মূল উপন্যাসটি উক্ত উদ্দেশ্য লইয়া রচিত নয়—কারণ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া রচিত উপন্যাস এত স্বাভাবিক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। তবে আজকাল অনেকেই উপন্যাসের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য সর্বদা খুঁজিয়া থাকেন, না পাইলে হতাশ হন, তাই হয়তো গ্রন্থাকার পরে একটা উদ্দেশ্যে জুড়িয়া দিয়া তাঁহাদের একটু খুশী করিতে চাহিয়াছেন। অবশ্য আমাদের এ বিশ্বাস ঠিক নাও হইতে পারে।

গ্রন্থমধ্যে যে কয়েকটি চরিত্র আমাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে মীরার মা, অপর্ণা দেবী একজন। এই অসাধারণ তীক্ষ্ণধী রমণী বাল্যকালে উগ্র পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু যৌবনারম্ভেই তাঁহার মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়-পরিজন এমন কি স্বামী পর্যন্ত হতাশ হইলেও তিনি মত পরিবর্তন করেন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় আত্মবিস্মৃত, জ্যেষ্ঠাকন্যা মীরাও তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত নহে—তাই তিনি মনোমধ্যে গভীর ক্ষোভ পোষণ করিতেন। কিন্তু তাহার জন্য কাহারও কাছে তাঁহার নালিশ ছিল না। তিনি যথার্থ আদর্শ হিন্দু-গৃহিণী। স্নেহে, জ্ঞানে, সহৃদয়তায়, সহজ ভদ্রতায় তাঁহার তুলনা নাই। মিঃ রায়ের চরিত্রাঙ্কনেও লেখক সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

মীরার দাদার বাগ্‌দত্তা সরমা দেবীও একটি অপূর্ব চরিত্র। অল্প কয়েকটি কথায়, তুলির সামান্য কয়েকটি টানে, গ্রন্থাকার এই চরিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু এত জীবন্ত এত সু-অঙ্কিত চরিত্র বাংলা-সাহিত্যে দুর্লভ। এই চরিত্রটি এত চিত্তাকর্ষক যে, মনে হয়, সময়ে সময়ে যেন এ মীরাকেও ম্লান করিয়া দিয়াছে। এটি বিভূতি-ভূষণের একটি অপূর্ব সৃষ্টি।

শৈলেনের বন্ধু অনিল, তার স্ত্রী অম্বুরী, ও বাল্য-সহচরী সৌদামিনী প্রভৃতির চরিত্রগুলি যেমন মনোহর তেমনি জীবন্ত। তরু, সানু প্রভৃতি শিশুচরিত্রগুলিও অপরূপ। এমন কি বাড়ির দাসীচাকরগুলি পর্য্যন্ত অদ্ভুত রূপে জীবন্ত। পড়িলে মনে হয় যেন তাহাদের কোথায় দেখিয়াছি। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মিঃ রায়ের মালী ইমানুল বোরান। জাতিতে ওরাঁও, শ্বেতাঙ্গ পাদ্রীসাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্রীর রূপে মজিয়া ক্রীশ্চান হইয়াছে। হাসির চরিত্র, কিন্তু লেখক ইহাকে হাসির খোরাক হিসাবে আঁকেন নাই। গ্রন্থকার হৃদয়ের দরদ দিয়া এই চরিত্রটি আঁকিয়াছেন। এই চরিত্রটির পরিণতিতে লেখক অদ্ভুত রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন। যে ভাবে এই চরিত্রটির পরিসমাপ্তি ঘটিল, তাহা উপন্যাসের বিষয়বস্তু হইলে রসভঙ্গ হইত, তাই লেখক সুকৌশলে তাহা এড়াইয়া গিয়া গল্পের আকারে তাহা বর্ণিত করিয়াছেন। এইটি বিভূতিভূষণের একটি অসাধারণ রসবোধের পরিচয়-ক্ষেত্র।

সমগ্র উপন্যাসটির গঠন-পরিপাট্যও অতিশয় সুন্দর, ইংরাজিতে যাহাকে বলে neat; আজকালকার অনেক ভালো উপন্যাসও এই গুণের অভাবে অত্যন্ত এলোমেলো ও অনাবশ্যক বস্তুর সমাবেশে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। নীলাঙ্গুরীয়ের আর একটি বিশেষ গুণ এই যে ইহার মধ্যে লেখকের সবল ও সুস্থ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইবে, আধুনিক বহু উপন্যাসই morbid পর্যায়ভুক্ত।

শরৎচন্দ্রের পরে যে কয়খানি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস বাংলা ভাষায় লেখা হইয়াছে নীলাঙ্গুরীয় তন্মধ্যে অন্যতম মণীন্দ্রলালের 'রমলা,' বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী,' দিলীপকুমারের 'দোলা,' তারাশংকরের 'রাইকমল,' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর সঙ্গে বিভূতিভূষণের নীলাঙ্গুরীও যে এক আসনে স্থান লাভ করিবে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। আমরা বাঙালী পাঠক-সম্প্রদায়কে বইখানি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

লাইনো ছাপা; কাগজ, বাঁধাই ভাল; বর্তমান দুর্মূল্যতার দিনে সেই অনুপাতে দামও বেশী হয় নাই বলিতে হইবে।

বিবিধপ্রসঙ্গ

বর্ত্তমান অশান্তি ও স্যার মাক্সওয়েল

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেফ্‌তারের পরে ভারতব্যাপী যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে ভারত-গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার রেজিনল্ড ম্যাক্সওয়েল উহাকে 'বিদ্রোহ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং উহার সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়াছেন কংগ্রেসের ঘাড়ে। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "অমঙ্গলকর উদ্দেশ্য লইয়া পূর্ব্ব হইতেই ইহার উদ্যোগ-আয়োজন করা হইয়াছিল।" কি কি প্রমাণ হইতে এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইলেন স্যার রেজিনল্ড ম্যাক্সওয়েল সে-সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই।

অশান্তি আরম্ভ হইবার পর লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস হইতে প্রচারিত ইস্তাহারে বলা হয় (রয়টারের ১২ই আগষ্ট তারিখের সংবাদ), "ভারতবর্ষ হইতে সম্প্রতি প্রাপ্ত সরকারী সংবাদে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে, এ পর্য্যন্ত যে-সকল বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা সীমাবদ্ধ এবং বিচ্ছিন্ন ভাবেই করা হইয়াছে।" ভারত হইতে প্রেরিত সরকারী সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াই ইণ্ডিয়া অফিস হইতে উল্লিখিত ইস্তাহার প্রচার করা হইয়াছিল। সুতরাং ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রথমে উহাকে পূর্ব্ব-কল্পিত বলিয়া যে মনে করেন নাই, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। পরে কি কারণে এই অশান্তিকে পূর্ব্বকল্পিত বলিয়া স্বরাষ্ট্র সচিবের ধারণা হইল তাহা কিছুই বুঝা গেল না। এই 'বিদ্রোহ' স্যার রেজিনল্ড ম্যাক্সওয়েলের মতে যদি পূর্ব্বকল্পিতই হয়, তাহা হইলেও আর একটা প্রশ্ন থাকিয়াই যায়, ভারতব্যাপী এই 'বিদ্রোহে'র পরিকল্পনা গঠন করিতে কত দিন লাগিতে পারে? ওয়ার্কিং কমিটির ওয়ার্দ্ধা অধিবেশন এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনের মধ্যবর্ত্তী তিন সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে এইরূপ একটা ব্যাপক পরিকল্পনা গঠন করা সম্ভব কি? ওয়ার্দ্ধা অধিবেশনের পর হইতেই কংগ্রেস যদি এই বিদ্রোহে'র জন্য যোগাড়-যন্ত্র করিতেছিল, তাহা হইলে এতদিন কর্ত্তৃপক্ষ কি করিতেছিলেন? বোম্বাইয়ের অধিবেশন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা কি স্যার রেজিনল্ড ম্যাক্সওয়েল কথিত পূর্ব্বপরিকল্পনার সিদ্ধান্তের দৃষ্টিতে অন্যায়, অসঙ্গত এবং অবিমৃষ্যকারী বিলম্ব বলিয়াই মনে হইবে না?

অশান্তির যে-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপারের পরিকল্পনার ভিত্তি স্বরূপ জনগণের অর্থনৈতিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য না করিয়া পরিকল্পনা গঠন সম্ভব হইতে পারে নাই। বড়লাটের শাসন পরিষদের 'দেশপ্রেমিক ও বিজ্ঞ' সদস্যগণ এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের নেতৃত্বেই যদি জনগণ পরিচালিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে জনগণের আর্থিক ও মানসিক অবস্থা তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকিবার কথা নয়। জনগণের নেতা হিসাবে উহার প্রতিকারের জন্য তাঁহারা কিছু করা প্রয়োজন মনে করেন নাই কেন?

একথা অবশ্যই সত্য যে, মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেফ্‌তারের অব্যবহিত পরেই এই অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাঁহাদের গ্রেফ্‌তারই এই অশান্তির কারণ। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেফ্‌তারেই বা এত ব্যাপক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় কেন? অন্য কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের গ্রেফ্‌তারে এত ব্যাপক বিক্ষোভ সৃষ্টি হইত কি? এই সকল প্রশ্ন আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় কংগ্রেসকে এই অশান্তির জন্য দায়ী করা যায় কি না? এই প্রসঙ্গে 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রিকার মামলায় দিল্লীর এডিশনেল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, ইসার যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা এখানে আমরা উল্লেখ করিতে পারি। তিনি তাঁহার রায়ে পাবলিক প্রসিকিউটার কর্ত্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন, "পাব্‌লিক প্রসিকিউটার যে-সকল কাগজ-পত্রের কপি দাখিল করিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, ৯ই আগষ্ট তারিখে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং মিঃ গান্ধী যে-আন্দোলন আরম্ভ করিবেন তাহা সমর্থন করেন। আন্দোলনের সময় এবং

খুঁটিনাটি নির্দ্ধারণের ভার মিঃ গান্ধীর উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু বড়লাটের নিকট চিঠি লিখিবার পূর্ব্বেই তিনি এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতা গ্রেফ্‌তার হন। সুতরাং আন্দোলনের জন্য মিঃ গান্ধী কি কর্ম্মপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছেন তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারে না। এই গণ-আন্দোলনটা কি তাহা না জানিয়া এই বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং হিংসামূলক কার্য্যকে মিঃ গান্ধীর কল্পিত গণ-আন্দোলনের অংশ বলা যাইতে পারে না।" বিচার-আসনে বসিলে প্রমাণের যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিতে হয়, স্বরাষ্ট্র-সচিব কি তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন?

ভারতের বর্ত্তমান অশান্তিকে স্যার রেজিনল্ড ম্যাক্সওয়েল 'বিদ্রোহ' বলিয়াছেন। সুতরাং সাধারণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা অপেক্ষা উহা ভিন্ন শ্রেণীর। এই অশান্তিকে বিদ্রোহ বলিয়া অভিহিত করায় ইহা কি বুঝা যায় না যে, বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন? বর্ত্তমান অশান্তি সম্বন্ধে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু রাষ্ট্রীয় পরিষদে বলিয়াছেন, "দেশের বর্ত্তমান অশান্তি গবর্ণমেণ্টের প্রতি দেশের মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। এই অশান্ত আন্দোলনের মধ্যে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে দেশবাসীর মনোভাব প্রতিফলিত।" রায় বাহাদুর শ্রীনারায়ণ মেহ্‌তা এই অশান্তি সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় পরিষদে বলিয়াছেন, "এই আন্দোলন ছাত্রদের আন্দোলন নহে। ইহা কংগ্রেসের আন্দোলনও নহে! অথবা ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত ঘটাইবার জন্য পঞ্চম বাহিনীর প্রচেষ্টাও ইহা নয়। যে-জাতির সম্মুখে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রস্তাব তোমরা দোদুল্যমান অবস্থায় রাখিয়াছ ইহা সেই জাতির ক্ষুব্ধ বিক্ষেপ।" এই সকল উক্তি ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসানই দাবী করিতেছে। কিন্তু স্যার রেজিনল্ড ম্যাক্সওয়েল ভারতে অশান্তি ও তৎসম্বন্ধে কংগ্রেসের দায়িত্ব লইয়া দীর্ঘ আলোচনা করিলেও ভারতের রাজনৈতিক মীমাংসা সম্বন্ধে কোন কথাই তাঁহার বক্তৃতায় নাই।

—

শাসন-পরিষদের ভারতীয় সদস্যগণ

শাসন-পরিষদের 'দেশপ্রেমিক ও বিজ্ঞ' সদস্যদের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্যার সুলতান আহমদ, ডাঃ আম্বেদকর এবং মিঃ আনে এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদে স্যার যোগেন্দ্র সিং, স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফ্‌তার এবং বর্ত্তমান অশান্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেফ্‌তার করা সম্পর্কে স্যার সুলতান আহমদ তিনি এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনুশোচনা করিবার কারণ কখনও দেখিতে পান নাই। অনুশোচনা তিনি না করিতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেফ্‌তারের সিদ্ধান্ত ছাড়া কি আর কিছু করিবার তাঁহাদের ছিল না। কংগ্রেস যে স্বাধীনতার দাবী করিয়াছে, তাহা পূরণ করিবার ক্ষমতা শাসন পরিষদের সদস্যদের নাই, তাহা সকলেই জানে, কিন্তু ভারতের জাতীয় দাবী গ্রহণ করিবার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করিবার ক্ষমতা কি তাঁহাদের ছিল না? রাষ্ট্রীয় পরিষদে স্যার শ্রীবাস্তব বলিয়াছেন, বড়লাট তাঁহাদের পরামর্শ কোন সময়ই অগ্রাহ্য করেন নাই। তাই যদি হয়, তবে কংগ্রেসের দাবী পূরণের জন্য বড়লাটকে তাঁহারা পরামর্শ দিলেন না কেন?

এক কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেফ্‌তারের সিদ্ধান্ত ছাড়া, আর কোন্ বিষয়ে শাসন পরিষদের সদস্যগণ যে একমত তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। স্যার সুলতান আহমদ বলিয়াছেন, ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণ করিলেই ভারতের আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ লাভ হইবে। ভারতের সকল রাজনৈতিক দলই তো উহাকে বর্জ্জন করিয়াছে, স্যার সুলতান এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণই উহাকে গ্রহণ করিয়া কার্য্যে পরিণত করুন না কেন? ক্রিপস-প্রস্তাবকে উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়াও স্যার সুলতান আহমদ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদিগকে একটা গঠনমূলক ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ডাঃ আম্বেদকর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদকে ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ডাঃ আম্বেদকরের উক্তিই যদি ঠিক হয়—কেন্দ্রীয় পরিষদ যদি প্রতিনিধিমূলক না-ই হয়, তবে স্যার সুলতান আহমদের অনুরোধ নিরর্থক। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যরাই যদি জনগণের প্রতিনিধি না হয়, তাহা হইলে কি শাসন পরিষদের সদস্যগণই আপনাদিগকে জনপ্রতিনিধি বলিয়া মনে করেন।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে স্যার যোগেন্দ্র সিং কংগ্রেস এবং লীগের কথা ভুলিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গের এবং জনগণের প্রতিনিধি মিলিয়া অচল অবস্থা দূর করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু স্যার শ্রীবাস্তব বলিয়াছেন, "কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে বোঝাপড়া না হইলে আমরা একবারে উপায়ন্তরহীন।"

উপরে আমরা এক বিষয় সম্পর্কে শাসন পরিষদের চারিজন সদস্যের পরস্পর বিপরীত মতের উল্লেখ করিলাম। এখানে কাহার মত ভারত গবর্ণমেণ্টের অভিমত তাহা বুঝিবার কোন উপায় আছে কি? কেন্দ্রীয় পরিষদে ডাঃ ব্যানার্জ্জি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত প্রতিনিধি কে? স্যার সুলতান আহমদ যিনি এই পরিষদকে পরিকল্পনা স্থির করিতে বলিয়াছেন, অথবা ডাঃ আম্বেদকর যিনি পরিষদকে ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন?" তাঁহার এই প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। মিঃ যমুনাদাস মেহতা শাসন পরিষদের ভারতীয় সদস্যদিগকে 'অনৈক্যের মিউজিয়ম' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

—

সঞ্চিত ষ্টার্লিং দ্বারা কি করা হইবে

লণ্ডনে বর্ত্তমানে প্রতিমাসে প্রায় পঁচিশ কোটি টাকা মূল্যের ষ্টার্লিং ভারতের হিসাবে জমা হইতেছে। যুদ্ধের প্রথম তিন বৎসরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ষ্টার্লিং সঞ্চয় ২৭৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১১৪ কোটি টাকা হইতে ৩৮৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এই সঞ্চয় যদি প্রতি মাসে উল্লিখিত হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে আগামী বৎসরে ভারতের ষ্টার্লিং সঞ্চয় ৫৩০ কোটি টাকার কাছাকাছি দাঁড়াইবে। সুতরাং এই বিপুল সঞ্চয় কি ভাবে ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়ে নিয়োগ করা যাইতে পারে, তাহা বিশেষ-ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইস-ম্যান সম্প্রতি বিলাত ঘুরিয়া আসিয়াছেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদ্য সমাপ্ত অধিবেশনে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়া-ছিল, লণ্ডনে তিনি ভারতে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ করিয়া রেলওয়ে এবং অন্যান্য শিল্পে যে বৃটিশ মূলধন নিয়োজিত আছে ভারতের পক্ষে তাহা অর্জ্জন করিবার জন্য সঞ্চিত ষ্টার্লিং-এর কতক অংশ ব্যয় করার প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে স্যার জেরেমি রেইসম্যান জানাইয়াছেন, এই শ্রেণীর প্রশ্ন সম্বন্ধে কেবল সাধারণ ভাবে আলোচনা হইয়াছে। কি আলোচনা হইয়াছে, তাহা তিনি কিছুই বলেন নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে বিলাতের টাইমস এবং মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের সিটি করেস্‌পণ্ডেণ্ট এবং ফাইনানশিয়াল টাইমস ভারতের ষ্টার্লিং সঞ্চয়ের নিয়োগ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই সকল আলো-নার মধ্যে ষ্টার্লিং সঞ্চয়ের নিয়োগ সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাবের কোন আভাস পাওয়া গেলে আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে কি?

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় ভারত গবর্ণমেণ্টের ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৬৯.১০ কোটি টাকা। উহা কমিয়া ১৯৪১-৪২ সালের শেষে ১৮০.০০ কোটি টাকায় দাঁড়াই-য়াছে। অর্থাৎ ২৯০ কোটি টাকার ষ্টার্লিং ঋণ ইতিমধ্যে পরিশোধ করা হইয়াছে। আগামী বৎসরের মধ্যে অবশিষ্ট ষ্টার্লিং ঋণও শোধ হইয়া যাইবে। রেলওয়ের ষ্টার্লিং এন্যুইটি ৩০০৫৪২৫০ পাউণ্ড পরিশোধ করার জন্য সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে একসঙ্গে ৩০০৫৪২৫০ পাউণ্ড দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ এবং রেলওয়ের ষ্টার্লিং এন্যুইটি বাবদ তিন কোটি পাউণ্ড দেওয়ার পরেও ভারতের তহবিলে আরও প্রচুর ষ্টার্লিং সঞ্চিত থাকিবে। এই সঞ্চিত ষ্টার্লিং দ্বারা ভারতের শিল্প বাণিজ্যে বৃটিশের নিয়োজিত মূলধন ভারতের পক্ষে অর্জ্জন করিবার জন্য আমাদের দেশে দাবী করা হইয়াছে। ফাইনান্‌শিয়াল টাইমস যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার মধ্যে বৃটেনের তরফ হইতে ভারতের এই দাবীর উত্তর পাওয়া যায়। উক্ত পত্রিকা বলিয়াছেন, "অন্যান্য শ্রেণীর দায়, বিশেষ করিয়া যে-গুলি এখনও পরিশোধযোগ্য হয় নাই তাহা পরিশোধ করা বৃটিশ অংশীদারগণের পছন্দ হইবে না এবং তাঁহারা আশা করেন যে, ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার গতি এরূপ হইবে না

যাহাতে এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে।" উক্ত পত্রিকা যে-উপদেশ দিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই যে, এই ষ্টার্লিং সঞ্চয় দ্বারা যুদ্ধের পর ভারত বৃটিশের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিতে পারিবে, কারণ বৃটিশ পণ্যের পরিবর্ত্তে রপ্তানি করিবার মত পণ্য ভারতে উৎপন্ন হইবে না। ইহার অর্থ কি ইহাই নয় যে, যুদ্ধের পর ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য আর থাকিবে না, সুতরাং ভারতের অনুকূলে যে বাণিজ্যিক উদ্বর্ত্ত হইয়া থাকে তাহাও বিলুপ্ত হইবে এবং ভারতে সঞ্চিত ষ্টার্লিং নিয়োজিত করা হইবে বৃটেন হইতে ভারতে রপ্তানিকৃত পণ্য ক্রয় করিবার জন্য ?

বৃটেন ভারতে যে অর্থ নিয়োগ করিয়াছে তাহা মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) ষ্টার্লিং ঋণ, (২) ভারতের রেলওয়ে এবং (৩) অন্যান্য শিল্প-বাণিজ্য, চা-বাগান, পাটের কল, কয়লার খনি ইত্যাদি। ভারতের ষ্টার্লিং ঋণ সম্বন্ধে কংগ্রেসের দাবীর কথা সকলেই জানেন। এই ঋণের কতটা অংশ ভারতের রাজস্বের উপর দায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য কংগ্রেস অপক্ষপাত বিচারের দাবী করিয়াছেন। কংগ্রেসের এই দাবীর মূলে এই সত্যই নিহিত রহিয়াছে যে, ষ্টার্লিং ঋণের সবটুকু ভারতের আর্থিক প্রয়োজনে করা হয় নাই—এই ঋণের কতক অংশ করা হইয়াছিল সাম্রাজ্য গঠনের জন্য। সঞ্চিত ষ্টার্লিং দ্বারা ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ করায় এই প্রশ্নটাই এখন অবান্তর হইয়া পড়িয়াছে। বাকী রহিয়াছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর দায়। টাইমস পত্রিকায় সিটি-করেস্‌পণ্ডেন্টের মতে, এই দুইটি দায়কে সমপর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না। ভারতের শিল্প-বাণিজ্যে নিয়োজিত মূলধন খালাস করিবার প্রশ্ন তুলিবার পূর্ব্বে ষ্টার্লিং ঋণের সমপর্য্যায়ভুক্ত রেলওয়েগুলি ক্রয় করা উচিত, ইহা টাইমসের সিটিকরেস্‌পণ্ডেন্টের অভিমত। ভারতে বৃটিশ মূলধন দ্বারা গঠিত শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি সঞ্চিত ষ্টার্লিং দ্বারা ক্রয় করা তিনি সমর্থন করেন না। তিনি বলিয়াছেন, "এইগুলি ক্রয় করিবার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্টকে সম্ভবতঃ বে-সরকারী ক্রেতা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।" সঞ্চিত ষ্টার্লিং দ্বারা ঐগুলি ক্রয় করা সম্পর্কে তাঁহার আপত্তির কারণ আমেরিকার অভিজ্ঞতা। তিনি লিখিয়াছেন, "আমেরিকায় বৃটিশ স্বত্বাধিকারীর শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি বিক্রয়ের ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে উক্ত ব্যবস্থার অনুসরণে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ না থাকিবার কথা।' কিরূপ অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহা আমরা জানি না, কিন্তু ভারত যে উপযুক্ত মূল্য পাইবার পক্ষে কোন বাধাই হইবে না তাহা নিঃসন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, ভারতে টাকার বাজারের অবস্থা বর্ত্তমানে যেরূপ ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি করেন, তাহা হইলে ভারতে বৃটিশ মূলধনে গঠিত শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ক্রয় করিবার লোক ভারতে যথেষ্ট পাওয়া যাইবে।

মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের সিটিকরেস্‌পণ্ডেণ্ট গত মহাযুদ্ধের পর কানাডা কর্ত্তৃক ১০০ কোটি ডলার মূল্যের ষ্টার্লিং-এর দাবী বৃটেনের অনুকূলে পরিত্যাগ করার কথা তুলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, "বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মোটা-রকমের লাভ করিলেও ভারত গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এইরূপ কোন প্রস্তাব করা হয় নাই।" যে হারে ভারতের ষ্টার্লিং ঋণ শোধ করা হইয়াছে তাহা ভারতের পক্ষে লাভজনক তো হয়ই নাই, বরং যে ভাবে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে ভারতের অনেক ক্ষতিই হইয়াছে। গত যুদ্ধের সময়ও ভারতের তহবিলে ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইয়াছিল, তবে তাহার পরিমাণ এবারের মত বেশী ছিল না এই যা তফাৎ। কিন্তু গত যু[illegible] ষ্টার্লিং সঞ্চয়কে ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ করার জন্য ব্যয় করা হয় নাই। যুদ্ধের পর বাট্টাহার ২ শিলিং হইতে ২ শিলিং সাড়ে দশ পেন্স পর্য্যন্ত বজায় রাখিতেই ভারতের সমস্ত ষ্টার্লিং সঞ্চয় কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে।

ভারতের শিল্প-বাণিজ্যে কি পরিমাণ বৃটিশ মূলধন নিয়োজিত আছে তাহা নিশ্চিত রূপে জানা যায় না। অনেকে মনে করেন উহার পরিমাণ চারি শত কোটি টাকার কম হইবে না। ভারতের সঞ্চিত ষ্টার্লিং দ্বারা ভারতের জাতীয় সম্পত্তি রূপে ঐগুলি ক্রয় করা যে কেন সঙ্গত নয়, বৃটিশ সংবাদপত্রের মন্তব্যের পরেও তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ভারতের সঞ্চিত ষ্টার্লিং ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যই ব্যয়িত হওয়া উচিত।

—

ইউ-কে-সি-সি

ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন সংক্ষেপে -কে-সি-সি সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্রে এবং বিশিষ্ট ্যসায়িগণ কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে। এই সকল লোচনার উত্তরে ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি প্রেস নোট কাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই তিষ্ঠানটি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। রতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে রতে এবং অন্যত্র ইউ-কে-সি-সির ক্রমবর্দ্ধমান একচেটিয়া র্য্যকলাপে এদেশে যে ব্যাপক আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে ংপ্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এবং াসম্ভব সত্বর এই আশঙ্কা দূর করিতে ব্যবস্থা অবলম্বনের ন্য অনুরোধ করিয়া মিঃ পি, এন সপ্রু ভারতীয় রাষ্ট্রীয় রিষদে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবটি ামান্য সংশোধন করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য ৈভাগের সেক্রেটারী স্যার আলান লয়েড গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই প্রস্তাবের আলোচনায় যে-সকল বষয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার গুরুত্ব মাটেই উপেক্ষার বিষয় নহে।

মিঃ সপ্রু এই প্রতিষ্ঠানটিকে 'নয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' লিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পণ্ডিত হৃদয়নাথ ঞ্জরু অভিযোগ করিয়াছেন, ইউ-কে-সি-সির কার্য্যকলাপের পছনে মধ্য প্রাচ্যে এবং অন্যান্য দেশে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের াণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য রহিয়াছে। এদেশের কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সুবিধা সুযোগ দিয়া থাকেন। রকারী বিভাগ হইতে নিয়ন্ত্রিত দরে এই প্রতিষ্ঠান পণ্য ক্রয় করেন এবং খুব বেশী দামে বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করিয়া থাকেন। মাল প্রেরণের জন্য জাহাজ পাইবারও সুবিধা উহাকে দেওয়া হইয়া থাকে। মিঃ হাসান ইমাম বলিয়াছেন, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই প্রতিষ্ঠানকে যে-ভাবে সাহায্য করিয়া থাকে তাহা প্রায় অর্থ সাহায্যের তুল্য। এইরূপ অভিযোগও উপস্থাপিত করা হইয়াছে যে, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা গত ত্রিশ বৎসরের পরিশ্রমে যে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা এই প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে ধ্বংসের পথে বসিয়াছে।

এই প্রস্তাবের আলোচনায় ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী স্যার আলান যাহা বলিয়াছেন তাহা নূতন কথা কিছু নয়। সরকারী প্রেস নোটে পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি সর্ব্বপ্রথম গঠিত হয় বল্কানে বৃটেনের বাণিজ্য পরিচালনের জন্য। সরকারী প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, পরে রাশিয়ার জন্য সর্ব্ব-প্রকার পণ্য ক্রয় করিয়া চালান দিবার একচেটিয়া ক্ষমতা এই প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হইয়াছে এবং কতকগুলি পণ্য সম্পর্কে পারস্যের সহিত বাণিজ্য করিবারও সুবিধা উহাকে দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ ইউ-কে-সি-সির সমর্থনে কেন্দ্রীয় এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদে যে-সকল যুক্তি ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে তাহা দ্বারা উহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি খণ্ডিত হয় না। মধ্য প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য চালাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই যে-সকল ব্যবস্থা আছে তাহা দ্বারাই কাজ চলিত কি না, কেন্দ্রীয় পরিষদে মিঃ যমুনা দাস মেহতার এই প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্য-সচিব জানাইয়াছেন, না, তাহা চলিত না। যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে, চলিত না, তাহা হইলে ভারতেই কেন ইউ-কে-সি-সির মত একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইল না? কেন্দ্রীয় পরিষদে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে বাণিজ্য-সচিবের দিক হইতে ইহার কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। এইরূপ নীরবতা দ্বারা ইউ-কে-সি-সি সম্পর্কে আশঙ্কা বাড়ে, না কমে তাহা কি বাণিজ্য-সচিব বুঝিতে পারেন না?

রাষ্ট্রীয় পরিষদে স্যার আলান যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর বাণিজ্যের মধ্যে একটা পার্থক্য টানিয়া ইউ-কে-সি-সিকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এখানেও সেই প্রশ্নই আসিয়া উপস্থিত হয়, যুদ্ধকালীন বাণিজ্যের জন্য যদি একটি পৃথক প্রতিষ্ঠানেরই প্রয়োজন হয়, তবে ভারতে কি ঐরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন করা যাইত না? একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া তাহারই হাতে এই বাণিজ্যের ভার অর্পণ করিলে লাভটা তো ভারতের থাকিয়া যাইতই অধিকন্তু রপ্তানি-বাণিজ্যে ভারতবাসী কোণঠাসা হইয়া থাকিবার আশঙ্কা থাকিত না।

—

তদন্ত-কমিটী গঠনে আপত্তি

দেশের বিভিন্ন স্থানে অশান্তি দমনের জন্য পুলিশ এবং

সৈন্যবাহিনী প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছে এবং লোকের উপর নিষ্প্রয়োজনে জুলুম করা হইয়াছে বলিয়া যে-অভিযোগ শুনা যাইতেছে তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি তদন্ত-কমিটী গঠন করিতে শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। প্রস্তাবের আলোচনা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই পরিষদের অধিবেশন এবারের মত শেষ হইয়াছে।

শ্রীযুত নিয়োগী এবং মিঃ এন, এম যোশী এই অভি-যোগের সমর্থনে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করেন। তাঁহাদের ন্যায় দায়িত্বশীল ব্যক্তি যে-সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে উহাদের গুরুত্ব উপেক্ষার যোগ্য বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু তদন্ত-কমিটী গঠন সম্পর্কে আইন সচিব স্যার সুলতান আহমদ শ্রীযুত নিয়োগীর সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তিনি যে অভিযোগগুলি মিথ্যা বলিয়া তদন্ত কমিটি গঠনে আপত্তি করিয়াছেন তাহা নহে। কোন ক্ষেত্রেই বিন্দু-মাত্রও অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ হয় নাই বা নিরপরাধ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই তাহা তিনি অস্বীকার করিতে পারে, নাই। তিনি বলিয়াছেন, "কোথাও অতিরিক্ত বল-প্রয়োগ হয় নাই বা নির্দ্দোষ লোককে সাজা পাইতে হয় নাই, গবর্ণমেণ্ট এমন কথা বলিতে চান না।" প্রতিকারের জন্য আইন সচিব অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ সংক্রান্ত সত্য ঘটনা সেনা-বিভাগ এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। তদন্ত-কমিটী গঠনে তাঁহার আপত্তির কারণ এই যে, তদন্তের আদেশ দিলে পুলিশ ও সৈন্য বাহিনীর মানসিক দৃঢ়তার উপর সর্ব্বনাশকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

আইন সচিবের এই যুক্তির সারবত্তা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অশান্তি দমনে আইনতঃ পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর যে ক্ষমতা আছে তদন্ত-কমিটী গঠন দ্বারা তো অস্বীকৃত হইতেছে না! সুতরাং তাহাদের মানসিক দৃঢ়তার উপর সর্ব্বনাশকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবার কোনই কারণ দেখা যাইতেছে না। মধ্যপ্রদেশে এবং যুক্ত-[illegible] সৈন্যবাহিনী অতিরিক্ত বল প্রয়োগ সংক্রান্ত অভি-যোগের তদন্ত হইবে না বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন, আইনসচিবের পরামর্শের উত্তরে তাহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত ঘোষণা সত্ত্বেও অতিরিক্ত বল প্রয়োগ সম্বন্ধে তদন্ত করা হইবে, এমন কোন আশ্বাস আইন সচিব দেন নাই। বরং করাচীতে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে সরকারী তদন্তের ফলে ঐ স্থানে পুলিশের নৈতিক দৃঢ়তায় প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সরকারী তদন্ত সম্বন্ধেই বা ভরসা কোথায়? কিন্তু অতিরিক্ত বল প্রয়োগের ফল যে অকল্যাণকরই হইয়া থাকে, কর্ত্তৃপক্ষের দূরদৃষ্টিতে কি তাহা ধরা পড়ে না?

—

বিমান হইতে গুলিবর্ষণ

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে যে, জনতার উপর পাঁচ স্থানে বিমান হইতে মেসিনগানের গুলিবর্ষণ করা হইয়াছিল। এই পাঁচটি জায়গার তিনটি বিহারে, একটি উড়িষ্যায় এবং একটি বাংলায়। বাংলার এই স্থানটি কৃষ্ণনগর হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণে রাণাঘাটের নিকটে। এই স্থানটি কলিকাতা হইতে এমন কিছু দূর নয়। অথচ এই ঘটনাটির কথা কেহ জানিতে পারিল না, ইহা সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয়। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব বলিয়াছেন যে, এই ঘটনাটি বাংলা সরকারের নির্দ্দেশ, ইঙ্গিত, সম্মতি বা জ্ঞানে হওয়া দূরে থাকুক, মাত্র ৩০শে সেপ্টেম্বর এ সম্বন্ধে তাহারা জানিতে পারিয়াছেন।

রাণাঘাটের নিকট বিমান হইতে গুলিবর্ষণ সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী হক্ সাহেব জানাইয়াছেন যে, সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ঐখানে একটি পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছিল। তাহারা ভ্রমক্রমে রেল লাইনে কর্ম্মনিরত কুলীদিগকে ধ্বংসাত্মক কার্য্যে রত লোক মনে করিয়া কয়েকটি গুলি বর্ষণ করে। হক সাহেব আরও জানাইয়াছেন যে, গুলিতে কেহ হতাহত হয় নাই। বাংলার ঘটনাটি সম্পর্কে শেষ পর্য্যন্ত যা হউক আমরা কিছু সংবাদ জানিতে পারিলাম।

ন্তু অন্য চারিটি ঘটনার হতাহত সম্পর্কে কোন কিছুই নিবার সুযোগ দেশবাসীর হয় নাই।

—

ভারতবর্ষ রক্ষার ব্যয়

গত ২১শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত বর্ণমেণ্টের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইসম্যানের লণ্ডন-শন সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। যুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী জিজ্ঞাসা করেন, "অর্থসচিব হার মিশনের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ এবং তাহার ফলাফল র্ণনা করিয়া কোন বিবৃতি দিবেন কি?" কিন্তু অর্থসচিব ঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে ঐ বিষয়ে কোন বিবৃতি তে তিনি অসমর্থ। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ, ল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট এখনও কোন দ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে কেন্দ্রীয় বস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে সদস্যগণ হা জানিবার সুযোগ পাইবেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের দ্ধান্ত গৃহীত হইবার পূর্ব্বে পরিষদ এসম্পর্কে কোন ালোচনা হইতে না পারায় সরকারী সিদ্ধান্ত গঠনে জন-াধারণের মতামত কার্য্যকরী ভাবে সহায় হইবার সুযোগ াইল না।

ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইসম্যান বং অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা স্যার থিওডোর গ্রেগরী কজন্য বিলাতে গিয়াছিলেন সরকারী ভাবে তাহা কিছু ানান হয় নাই। তবে শোনা গিয়াছিল যে, সামরিক ায়-সংক্রান্ত কোন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করাই াহাদের বিলাত গমনের উদ্দেশ্য ছিল। ভারত রক্ষার ায় সম্পর্কে ভারতীয় সংযুক্ত বণিক এবং শিল্পী-সমিতি ারত গবর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহা খানে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের সামরিক ব্যয় সম্পর্কে বৃটেন এবং ভারতের ধ্যে অর্থনৈতিক মীমাংসার মূল সূত্র ১৮৫৮ সালের ারতের সু-শাসন সংক্রান্ত আইনে (Act for the Better Government of India) সুস্পষ্ট ভাবেই নির্দ্দেশ করা ইয়াছে। উক্ত আইনের ৫৫ ধারায় বলা হইয়াছে, ভারতের বহিঃ-সীমান্তের বাহিরে কোন সামরিক কার্য্য-কলাপের ব্যয় সঙ্কুলান করিবার জন্য পার্লামেণ্টের উভয় সভার সম্মতি ব্যতীত ভারতের রাজস্ব নিয়োজিত করা হইবে না।" ইহার পর ১৮৯৫-১৯০০ সালে উইলবি কমিশন, ১৯৩৩ সালে গ্যারেন ট্রাইবুনেল এবং ১৯৩৯ সালে চ্যাটফিল্ড কমিটী এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ১৮২৪ সাল হইতে ভারতে অবস্থিত বৃটিশ সৈন্যবাহিনী সংগঠন, অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিতকরণ এবং বিভিন্ন স্থানে প্রেরণের ব্যয় ভারতবর্ষ বহন করিয়া আসিতেছে। গত মহাযুদ্ধের সময়ও ভারত এই ব্যয় বহন করিয়াছে যদিও ঐ সময় নূতন সৈন্য-সরবরাহ বন্ধ ছিল। ১৯২০ সাল হইতে ভারতের এই ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতে অবস্থিত সৈন্যবাহিনী সাম্রাজ্যের প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই নিয়োজিত করা হয় বলিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেরও যে উহার ব্যায়ের কতক অংশ বহন করা উচিত ভারত গবর্ণমেণ্টও তাহা দাবী করিয়া আসিতেছেন। ১৮৭২ সালে ভারত সচিব বলিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশেই ভারতে অবস্থিত সৈন্যবাহিনীকে নিয়োজিত করা হইয়া থাকে এবং এই বিষয়ের বিবেচনা বৃটিশ-বাণিজ্যের স্বার্থ, বৃটিশ বণিকদিগের অভিযোগ এবং বৃটিশ রাজ-মকুটে সম্মান-সংক্রান্ত বিষয়ের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ১৮৯০ সালের ২৫শে মার্চ্চ তারিখের পত্রে ভারত গবর্ণমেণ্ট লিখিয়াছিলেন, "ভারতের সৈন্য বৃদ্ধির জন্য, অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য এবং ভারতে সুরক্ষিত করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করা হইয়াছে। এই ব্যয় ভারতকে গৃহশত্রুর হাত হইতে সুরক্ষিত করিবার জন্য নয়, পার্শ্ববর্ত্তী দেশের যোদ্ধৃজাতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নয়, প্রাচ্যে বৃটিশ প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য উহা করা হইয়াছে।" ১৮৫৬-৫৭ সাল হইতে ভারতের ব্যয়ে রক্ষিত বৃটিশ এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের বাহিরে কম পক্ষে চৌদ্দটি অভিযানে নিয়োজিত করিয়াছেন। ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা।

চ্যাটফিল্ড কমিটী যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে ভারতের সামরিক ব্যয় সম্পর্কে নূতন একটা সমস্যা দেখা দিয়াছে। কমিটী পরোক্ষভাবে হইলেও স্বীকার

করিয়াছেন যে, ভারতে অবস্থিত সৈন্যবাহিনী জরুরী অবস্থায়, সাম্রাজ্যের অন্যত্র নিয়োজিত হইয়া থাকে বলিয়া এই সৈন্যবাহিনী দ্বারা সাম্রাজ্যের প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে। এই জন্য চ্যাটফিল্ড কমিটী সুপারিশ করিয়াছেন যে, ভারতের সৈন্যবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিবার ব্যয় ৪৫ কোটি টাকার মধ্যে ৩৩½ কোটি টাকা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন। কিন্তু জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে ভারতের বহিঃসীমান্ত রক্ষায় বৃটেন এবং ভারতের যুক্ত দায়িত্বের উপর চ্যাটফিল্ড কমিটী জোর দেওয়ায়। ভারতের সৈন্যবাহিনী সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে নিয়োগ এবং ভারতের বহিঃসীমান্ত রক্ষায় নিয়োগের মধ্যে পার্থক্য লইয়া সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ কোন সময় ভারতের সৈন্যের ব্যয় শুধু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন এবং কোন সময়ে বা উহা বৃটেন এবং ভারতের যুক্ত দায়িত্ব হইবে?

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ। সুতরাং ভারত রক্ষার ব্যয় সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই কি উচিত নয়? আমরা শুনিতেছি, ভারতের সীমান্ত পূর্ব্বে মালয়, সিঙ্গাপুর এবং পশ্চিমে এডেন, মিশর, ইরাক, ইরাণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু সাইমন কমিশন বলিয়াছেন, 'ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমগ্র সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি।' বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষই সম্মিলিত জাতিবর্গের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছে।

ভারতে সামরিক ব্যয় সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ভিত্তিসহ উল্লিখিত সমস্ত বিষয়টি ভারতীয় সংযুক্ত বণিক ও শিল্পী সমিতির আবেদনে আলোচিত হইয়াছে। ভারতের আর্থিক অবস্থাও এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। ভারতের আর্থিক অবস্থা বিপুল সামরিক ব্যয় বহনে সক্ষম নয়, একথা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দেওয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় উল্লিখিত বিষয়গুলির উপর লক্ষ্য রাখিবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

—

পরলোকে বর্ষীয়ান জননেতা শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ

হরদয়াল নাগ তাঁহার চাঁদপুরস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন দেশসেবার অখণ্ড অনুপ্রেরণা স্বরূপ। বাংলা তাঁহাকে স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগে দেখিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী যখন কংগ্রেসের কর্ম্মনীতিতে বিপুল পরিবর্ত্তন লইয়া আসিলেন তখন বাঙ্গালীর দৃষ্টিতে শ্রীযুত নাগ বৃদ্ধের মধ্যে গণ্য হইলেও আমরা তাঁহাকে মহাত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠ অনুরাগী হিসাবেই দেখিয়াছি। বার্দ্ধক্য তাঁহার তেজস্বিতাকে ম্লান করিতে পারে নাই, যদিও অতিবার্দ্ধক্যের স্বাভাবিক নিয়মে তাঁহার দেহ ক্রমেই অপটু হইয়া উঠিতেছিল।

শ্রীযুত নাগ মহাশয়ের কর্ম্মক্ষেত্র মফঃস্বলেই নিবদ্ধ ছিল। নাম, যশ, খ্যাতির প্রতি কোন দিনই তাঁহার লোভ ছিল না। বস্তুতঃ বাংলার দেশকর্ম্মী এবং নেতার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র যে কলিকাতার মত মহানগরী নয়, মফঃস্বলেই যে তাঁহার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র শ্রীযুত নাগ তাঁহার জীবন দিয়া তাহা প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন।

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বেই তাঁহার নবতিতম জন্মতিথি উৎসব হইয়াছিল। এত দীর্ঘকাল কোন জননেতাকে নিজেদের মধ্যে পাইবার সৌভাগ্য বাঙ্গালীর কোনদিন হয় নাই। মফঃস্বলে থাকিলেও তাঁহার দেশপ্রেম এবং কর্ম্মনিষ্ঠা সমগ্র দেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে [illegible] হইয়াছিল। পরিণত বয়সেই তিনি আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বিয়োগ-ব্যথা সমগ্রদেশ গভীরভাবে অনুভব করিতেছে। বাংলা একজন একনিষ্ঠ আদর্শ দেশসেবককে হারাইল। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

—

কমলালেকচারার পদে মৌলানা আজাদ

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯৪৫ সনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা লেকচারার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় 'মুসলিম ও ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের পরিণতি।' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন মুসলিম সিনেটর তাঁহার এই নিয়োগে আপত্তি করিয়াছিলেন দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট

এই বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করা হয় নাই। মুসলিম সংস্কৃতির জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতির জন্যই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলানা আজাদকে এই সম্মান দানের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেই গৌরবান্বিত হইয়াছে।

—

গবেষক মিঃ আমেরী

সম্প্রতি লণ্ডনের ক্যাক্সটন হলে মিঃ আমেরী ভারত সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, ভারতের সকলেই স্বাধীনতা চায়, বৃটেনও ভারতের বোঝা ঘাড় হইতে নামাইতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু ইহার পথে দুইটি বাধা তিনি দেখিতে পাইতেছেন। একটি বাধা ভারতের উপযোগী শাসনতন্ত্র, অপরটি ভারতের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। ভারতের বহুধা বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায় একযোগে শাসনকার্য্য চালাইতে পারে অথচ এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করিতে পারিবে না, ভারতের জন্য এরূপ একটি শাসনতন্ত্রের তিনি প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন। কিন্তু এইরূপ শাসনতন্ত্র যে কি আকারের হইবে তাহার কোন আভাষ তাঁহার বক্তৃতায় নাই। বোধ হয় উহা তিনি এখনও খুঁজিয়া পান নাই। দ্বিতীয়তঃ ভারতের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হইবে যান্ত্রিক এবং উহার ভিত্তি হইবে উন্নত শ্রমশিল্প। কিন্তু উন্নত শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য চাই অর্থসঙ্গতি এবং রাজস্ব। অতএব এতখানি হইতে অনেক দিন লাগিবে, ইহাই আমেরী সাহেবের অভিমত। কিন্তু ভারতের দাবী সত্ত্বেও ভারতের শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য এতদিন কিছুই করা হয় নাই, অধিকন্তু শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠার পক্ষে শুধু বাধাই সৃষ্টি করা হইয়াছে। ভারতে জাহাজ-শিল্প ও মোটর-শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

বৃটেনের ভারতীয় সমস্যাকে মিঃ আমেরী ভৌগলিক, সংস্কৃতিগত এবং ঐতিহাসিক পরিবেশ দ্বারা রীতিমত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরিণত করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এসিয়াবাসী বলিতে প্রকৃতপক্ষে কিছু নাই। সুতরাং চীন অপেক্ষা ইউরোপের সহিতই ভারতের নৈকট্য বেশী। নৃতত্ত্বের দিক হইতে অবিমিশ্র জাতি আজ আর পৃথিবীর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এসিয়াবাসী বলিয়া যদি কিছু না থাকে, তাহা হইলে ইউরোপীয় বলিয়াও কিছু থাকিতে পারে না। সুতরাং ইউরোপের সহিত ভারতের নিকট সম্বন্ধের কথাটাই অর্থহীন।

মিঃ আমেরী তাঁহার গবেষণার ফলে কমনওয়েল্থের তত্ত্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতাই না পায়, তাহা হইলে স্বাধীন জাতি হিসাবে কমনওয়েল্থের সমান অংশীদার হইবে কিরূপে?

—

ষ্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধ

ষ্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধের তুলনা অতীত ইতিহাসে মিলে না, ভবিষ্যতে মিলিবে কি না কে জানে? দেড় মাস হইয়া গিয়াছে ষ্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধ চলিতেছে। সহরের প্রতি রাস্তায় সংগ্রাম চলিতেছে, প্রতি গৃহ পরিণত হইয়াছে দুর্গে, তথাপি জার্ম্মানী ষ্ট্যালিনগ্রাড দখল করিতে পারে নাই। রাশিয়ার এই বীরত্ব অভূতপূর্ব্ব।

এই শীতের পূর্ব্বে জার্ম্মানী যদি ষ্ট্যালিনগ্রাড দখল করিতে পারে, তাহা হইলে জার্ম্মানী আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। আর যদি দখল করিতে না পারে, তাহা হইলে গত শীত অপেক্ষাও জার্ম্মানী অধিক বিপদে পড়িবে সন্দেহ নাই, কিন্তু আগামী শীতকালে খাদ্য, জ্বালানি কাঠ, গৃহ, বস্ত্র, ঔষধ ও পথ্যাদির অভাবে রাশিয়ার যে কি ভয়ানক অবস্থা হইবে তাহার সজীব চিত্র মিঃ উইল্কী প্রদান করিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উৎপাদক-সচিব ক্যাপ্টেন অলিভার লিটিলটন গত জুলাই মাসে বলিয়াছিলেন, "আগামী আশী দিনের মধ্যে আমরা আমাদের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইব।" অতঃপর ১৬ই সেপ্টেম্বর তিনি বলেন, "উক্ত আশী দিনের আর ১৯ অথবা ২০ দিন বাকী আছে এবং ঐ সময়ের শেষে যুদ্ধ নিশ্চিত ভাবে একটা নূতন স্তরে পৌঁছিবে।" তাঁহার এই উক্তি কোন জ্যোতিষিক ভবিষ্যৎ বাণী নয়, বোধ হয় আসন্ন-শীতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এরূপ অনুমান তিনি করিয়াছেন। বোধ হয় উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই টাইমস পত্রিকার মস্কো সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, 'যদি আরও ছয় বা আট সপ্তাহ ভীষণ যুদ্ধ চলে, তাহা হইলে যদিও উভয়

পক্ষই সম্পূর্ণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, তথাপি ষ্ট্যালিনগ্রাডের ভাগ্যে যাহাই হউক, মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে লাভের বিষয়ই হইবে।'

সামরিক বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা নাই, তবে এইটুকু আমাদের মনে হয় ষ্ট্যালিনগ্রাডের পতন হউক আর না হউক রাশিয়ার উপর চাপ যদি কমান না যায়, তাহা হইলে এবারের যুদ্ধে রাশিয়ার যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহাই রাশিয়াকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিবে।

—

দ্বিতীয় রণাঙ্গন

দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির সম্ভাবনা সম্পর্কে মিত্রপক্ষ এবং রাশিয়ার মধ্যে একটা মতদ্বৈধের আভাস পাওয়া যাইতেছে। ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে প্রকাশিত ইস্তাহারে বলা হয়, "১৯৪২ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির জরুরী কর্ত্তব্য বিষয়ে উভয় পক্ষ একটা মীমাংসায় পৌছিয়াছে।" কি মীমাংসা হইয়াছিল তাহা অবশ্য অপরে জানে না, কিন্তু দেখা যাইতেছে, যে-সব কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহা হইতে রাশিয়া একরূপ সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছে এবং মিত্রপক্ষ পৌছিয়াছে অন্যরূপ সিদ্ধান্তে।

যিনি যে সিদ্ধান্তেই উপনীত হউন, আসল প্রশ্ন হিটলারকে পরাজিত করিবার জন্য দ্বিতীয় ফ্রন্টের গুরুত্ব। রাশিয়াকে যুদ্ধের ভীষণ চাপ হইতে রক্ষা করিতে হইলে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির যে ইহাই প্রকৃষ্ট সময় মিঃ উইল্কীও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আগামী বসন্ত কাল অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া পড়িবে। কিন্তু বৃটিশ ডেপুটী প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি দ্বিতীয় ফ্রন্টওয়ালাদিগকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' এবং 'শত্রুর কথায় নাচ্‌নেওয়ালা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিজস্ব প্রতিনিধি মিঃ উইল্কীকে ঐ দুইটি বিশেষণে বিশেষিত করা যায় কি? দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে মিঃ উইল্কীর মন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় বিলাতের 'ইভনিং ষ্টার' পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন, "এই ধরণের সমালোচনা ও দাবীর অযৌক্তিকতা [illegible] হইতেছে এই যে উহাতে মার্কিন এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অদূরদর্শিতা, মন্থরতা এবং বিশ্বাসভঙ্গের ইঙ্গিত আছে।"

দ্বিতীয় ফ্রন্ট সংক্রান্ত এই সকল বাক্‌বিতণ্ডায় ষ্ট্যালিন এত দিন কিছুই বলেন নাই। জীবন-মরণের সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া বাক্‌বিতণ্ডায় যোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে এখন সম্ভবও নয়। কিন্তু সম্প্রতি দ্বিতীয় ফ্রন্ট সম্বন্ধে ষ্ট্যালিন যাহা বলিয়াছেন তাহা মিত্রপক্ষের প্রণিধানযোগ্য। জনৈক মার্কিন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন, সোভিয়েট রাশিয়া মনে করে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রশ্নই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলিয়াছেন, "জার্ম্মান ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর প্রধান আঘাত নিজের উপর লইয়া সোভিয়েটবাহিনী মিত্রপক্ষীয়দের যতখানি সাহায্য করিতেছে, উহার তুলনায় সোভিয়েট ইউনিয়নকে মিত্রপক্ষের সাহায্য অতি সামান্য রকম কার্য্যকরী হইয়াছে।

এই সঙ্গে লণ্ডনস্থ চীনা সংবাদ বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ জর্জ্জ ইয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য। বিমান ও ভারী অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য চীনের পক্ষে যে কত জরুরী তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, এই সকল সাহায্যের অভাবে আড়াই হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী দুই ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। চীন কি ভাবে জাপানকে রুখিতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি যখন শুনি, প্রতি জাপানী সৈন্যের জন্য পাঁচ হইতে আট জন করিয়া চীনা সৈন্য নিয়োগ করিতে হয়।

—

সংবাদপত্র ও সরকার

গত ৮ই আগষ্ট এবং তাহার পরে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রের উপর যে সকল বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছেন তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সংবাদপত্র-সম্পাদক সম্মেলনের বোম্বাই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে। এই প্রস্তাবে ৮ই আগষ্টের আদেশ এবং অন্যান্য বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং প্রকাশের পূর্ব্বে সংবাদ সেন্সর করার নীতির প্রতিবাদ করিয়া আন্দোলন বা হাঙ্গামাসংক্রান্ত সংবাদ বিনা সেন্সরে প্রকাশের দাবী করা হইয়াছে এবং সম্পাদকদিগকে

অনুরোধ করা হইয়াছে যে তাঁহারা যেন হাঙ্গামার প্ররোচনামূলক, বে-আইনী কাজের ইঙ্গিতমূলক, পুলিশ বা সৈন্যবাহিনীর অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগ সম্পর্কে ভিত্তিহীন বা অতিরঞ্জিত সংবাদ অথবা জনসাধারণের নিরাপত্তা-রক্ষার প্রতিকূল সংবাদ প্রকাশ না করেন।

এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে ৮ই আগষ্টের আদেশ জারীর পরেও সংবাদপত্রসমূহ তাঁহাদের দায়িত্ব পালনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু অনেক বিখ্যাত সংবাদ-পত্র বুঝিতে পারেন যে, বিধিনিষেধগুলি এইরূপ যে, কোন আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান সম্পন্ন সংবাদপত্রের পক্ষে এই বিধি-নিষেধের নিকট আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা সংবাদপত্র বন্ধ করাই ভাল। তদনুসারে অনেক সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ থাকে। এই সময় সম্পাদক সম্মেলনের স্ট্যাণ্ডিং কমিটী এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনায় একটা বুঝাপড়া হয়। গবর্ণমেণ্ট উহা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত করিবেন ভরসায় অনেক সংবাদপত্র পুনরায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু কতক সংবাদপত্র এই বুঝাপড়াটাকে সন্তোষজনক বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। ফলে সম্পাদক সম্মেলনই দ্বিধা বিভক্ত হইবার উপক্রম হয়। এই অবস্থায় সংবাদপত্র-সম্পাদক সম্মেলনের বোম্বাই অধিবেশনে উল্লিখিত প্রস্তাব সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার রেজিনল্ড ম্যাক্সওয়েল অধিকাংশ সংবাদপত্রকেই 'সরকার-বিরোধী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উল্লিখিত প্রস্তাবের পর একথা বলিবার আর উপায় রহিল না। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট সম্পাদক-সম্মেলনের বোম্বাই-প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সংবাদ-পত্রের সমস্যার সমাধান করিবেন, ইহাই আমরা আশা করিতেছি।

—

আসন্ন আর্থিক সঙ্কট

বাংলার সম্মুখে আসন্ন আর্থিক দুর্য্যোগের ঘনান্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। বাংলার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব এই আসন্ন আর্থিক দুর্য্যোগকে বাংলার বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পাটের দাম নাই, কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অগ্নি মূল্য, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তো একেবারেই অচল। এক হিসাবে দুর্য্যোগের আর বাকী রহিল কি? কিন্তু ইহা অপেক্ষাও ভয়ানক দুর্য্যোগ আসন্ন। ইহার প্রতিকার যদি না হয়, তাহা হইলে দেশের ভবিষ্যৎ কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

পাট-সমস্যা বাংলার আর্থিক সমস্যার একটা বৃহৎ অংশ। এই সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টাই প্রকৃত পক্ষে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে পাটের সর্ব্বনিম্ন দাম বাঁধিয়া দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই কাজটিই এ পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল না। সর্ব্বনিম্ন দাম বাঁধিয়া দিলে উদ্বৃত্ত পাট ক্রয় করিবার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টেকে গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলা গবর্ণমেণ্ট পাট ক্রয় করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহা কতকটা আশার কথা। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য ১০ হইতে ১২ কোটি টাকার প্রয়োজন। কাজেই ভারত গবর্ণমেণ্টের সহায়তা ছাড়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় নাই। ইহাও একটি কম সমস্যা নয়।

—

বাংলায় চাউল উৎপাদন

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানাইয়াছেন, আগামী বৎসর বাংলা দেশে ৩.৪ লক্ষ টন অর্থাৎ ৮৪ হইতে ১১২ লক্ষ মণ চাউল উৎপন্ন হইবে। বাংলা দেশের লোকদের জন্য গড়ে প্রতি বৎসর ২৪ কোটি ৬৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৮৮ মণ চাউলের প্রয়োজন হয়। বাংলা দেশে চাউলের এই প্রয়োজন মিটিয়া আরও ৩.৪ লক্ষ টন চাউল বাড়্‌তি হইবে কিনা ডাঃ মুখার্জ্জির উক্তি হইতে তাহা ঠিক বুঝা গেল না। বাংলা দেশে প্রতিবৎসর যে পরিমাণ চাউলের দরকার হয় তাহা অপেক্ষা ৪ কোটি ২৮ লক্ষ ৩২ হাজার ৪৩২ মণ চাউল কম উৎপন্ন হয়। যদি এই কম্‌তিটা পূরণ হইয়া যদি আরও ৩.৪ লক্ষ টন চাউল বেশী উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সত্যই আশার কথা। কিন্তু বরাবর বাংলায় যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহা অপেক্ষা ৩.৪ লক্ষ টন চাউল বেশী উৎপন্ন হইলেও চাউলের অভাব আমাদের মিটিবে না।

—

নড়াইলের পথে

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর অথবা অজন্তা ইলোরা ভ্রমণ যে পরিমাণ আনন্দ ভ্রাম্যমাণকে দান করিতে সমর্থ—মোল্লাহাটী, ভবানীপুর ভ্রমণেও যে প্রায় তদনুরূপ উপভোগ্য বস্তুর সন্ধান মিলিতে পারে তাহার প্রমাণ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'অভিযাত্রিকে' ব্যক্ত করিয়াছেন। অখ্যাত পল্লী নিমতা হইতে যাত্রা সুরু করিয়া ভাগলপুর, দেওঘর প্রভৃতি বিখ্যাত দর্শনীয় অঞ্চল সমূহের বর্ণনা পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করিয়াছে। ছানা চিনি সহযোগে সকল কারিকরই সন্দেশ পাক করিয়া থাকে অথচ সকলের হাতে পাক সমান ভাবে উৎরায় না—সুতরাং লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদিগের লিপিকৌশলে যাহা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে অখ্যাত লেখনীপ্রসূত বাংলার কোন নিভৃত পল্লী-ভ্রমণ যে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে এরূপ আশা হৃদয়ে পোষণ করিবার মত স্পর্দ্ধা অবশ্য আমার নাই। তথাপি যশোহর জেলার নড়াইল ভ্রমণ-বৃত্তান্তটা পাঠকসমাজকে উপহার দিতে সাহসী হইতেছি কেবল মাত্র এই ভরসায় যে পোলাও-মাংসের নিমন্ত্রণের আসরেও শাক-ভাজা বা ছ্যাঁচড়া প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত হয় না। নিঃসঙ্গ অবস্থায় পল্লী-ভ্রমণ অপেক্ষা দুই-চারি জন সঙ্গী থাকিলে তাহা কিয়ৎ-পরিমাণে সার্থক হইয়া উঠে। আমাদের এ যাত্রাটা কেবল মাত্র সেই কারণেই বর্ণিত হইল।

অবিশ্রান্ত বর্ষণ, এবং মেঘমেদুর আকাশ মাথায় করিয়া আমাদের যাত্রার সূচনা ১৯৪১ সনের ২রা জুলাই অপরাহ্নে। উপলক্ষ নড়াইল সাহিত্য-সম্মিলনের নিমন্ত্রণ-রক্ষা। একে ব্রাহ্মণ তায় নিমন্ত্রণ—তা সে সাহিত্যেরই হউক বা ভোজনের হউক! নড়াইলের পথে পা বাড়াইতে ইহাই যে আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিল তাহা অকপটে স্বীকার করিতেছি। সঙ্গী হইলেন মন্মথ-দা, যতীন-দা, এবং সম্মিলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুতরাং আমাদিগের নিকট এ নিমন্ত্রণের বেশ কিছু বিশেষত্ব ছিল।

দৌতলপুর ষ্টেসনে নামিয়া ষ্টীমার ধরিয়া নড়াইল আসিতে সম্মিলনের উদ্যোক্তাগণ আমাদিগকে পূর্ব্বেই পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু সময় ও ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য আমরা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য অপর রাস্তায় রওনা হইলাম।

বৈকাল ছয়টায় বনগাঁ হইতে চারখান সিঙ্গিয়া (ই, বি, রেলের খুলনা শাখা-লাইন) ষ্টেসনের রিটার্ণ টিকিট কিনিয়া বরিশাল এক্সপ্রেস ট্রেনে চাপিয়া বসিলাম। ট্রেনে পূর্ব্ববঙ্গবাসী যাত্রীদিগের অত্যন্ত ভীড়। শারীরিক সাম[illegible] তাঁহাদিগকে আঁটিয়া ওঠা সম্ভব নয় বুঝিয়া বেঞ্চে ছয় জনের আসন নির্দ্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও কেন পাঁচজনে তাহা অধিকার করিয়া আছেন, অথবা বাঙ্কের উপর নিজ নিজ গাঁটরী না রাখিয়া তদ্দ্বারা কেন যাত্রীকে বসিবার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে প্রভৃতি কোন প্রকার কৈফিয়তের দাবী না করিয়া নির্ব্বিবাদী লোকের ন্যায় যে, যেখানে পারিলাম স্থান সংগ্রহ করিলাম। এই প্রকারে দুই একটি ষ্টেসন অতিক্রম করিবার পর পথের পাঁচালীর স্রষ্টা পরিচিত হইলে আমরা সকলে সহযাত্রীদিগের আগ্রহে হাত পা ছড়াইয়া বসিবার সুযোগ লাভ করিলাম। ক্রমশঃ

মাতৃভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী"

চতুর্থ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ | ১১শ সংখ্যা

প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, এম-এ

আদি মানব যখন প্রথম পশুস্তর থেকে মানব পর্যায়ে ত হ'ল তখন তাদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ দেখা ন মস্তিষ্কের উন্নতি। দেহতত্ত্বের দিক থেকে দেখতে ল প্রধানত দুই প্রকারে এই উন্নতি লক্ষিত হয়। প্রথম, ষ্কের পরিমাণ বৃদ্ধি, দ্বিতীয়, মস্তিষ্কের উপরিভাগের বচতা (convolutions) বৃদ্ধি। মনস্তত্ত্বের দিক কেও তাদের চিন্তাশক্তির অনেক উৎকর্ষ সাধিত হ'ল। রণত, পশুরা বার বার পরীক্ষা ক'রে তার আসন্ন টি মাত্র (direct inference) অনুমান করতে পারে; ন অগ্নির নিকটে গেলে দগ্ধ হতে হয়, তাতে দৈহিক শের সম্ভাবনা আছে, সুতরাং অগ্নির নিকটে যেতে ়, এটি সকল পশুই বোঝে। ক্রমে ক্রমে বহুকাল পরে ধারণাটি তাদের instinct-এ পরিণত হয়, অর্থাৎ যে পূর্বে কখনও অগ্নি দেখেনি সেও প্রথম অগ্নি খ পালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু এইখানেই অর্থাৎ অগ্নি খ ভয় পাওয়াতেই তাদের বুদ্ধিবৃত্তির শেষ। তারা রণা করতে পারে না যে, এই অগ্নিকে অন্য প্রবল র বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্বচিৎ কখন নো উন্নতস্তরের পশুর মধ্যে আর একটু বেশি বুদ্ধি র পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন বানরের মধ্যে দেখা , কখন কখন তারা ইট-পাটকেল ছুড়ে মারে, বা লাঠি বা গাছের ডাল দিয়ে মারতে যায়। অর্থাৎ তারা বুঝতে পারে শুধু আঁচড়-কামড়ে শত্রুকে যতটা কাবু করা যায় এবং নিজেকে যতটা বিপন্ন করতে হয়, লাঠি বা ইটের সাহায্যে শত্রুকে তার চেয়ে বেশি কাবু করা যায়, নিজেকেও ততটা বিপন্ন হ'তে হয় না—তা ছাড়া আঘাতের জন্য হাতেও লাগে কম। এটি দ্বিতীয় স্তরের অনুমানসিদ্ধ ব্যাপার (secondary inference), অর্থাৎ লাঠি দেখে শুধু পালিয়ে যাওয়া নয়, প্রবলতর শত্রুর বিরুদ্ধে তার লাঠির ব্যবহারও করতে পারে। কিন্তু এর চেয়ে বেশি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পশুর মধ্যে দেখা যায় না—অবশ্য এ স্থলে বন্যপশুর কথাই বলা হচ্ছে, শিক্ষিত পশুর কথা নয়।

কিন্তু আদি মানবের ক্রমবিকাশের প্রথম যুগে তারা এর চেয়েও অনেক বেশি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিতে পেরেছিল। প্রথমে অবশ্য তারা বানরের মতোই কাঠ বা পাথরের টুকরো যা হাতের কাছে পেত তাই দিয়েই শত্রুকে আঘাত করতে চেষ্টা করত। কিন্তু সব সময়ে সুবিধে মতো পাথর বা কাঠ হাতের কাছে পাওয়া যায় না দেখে, তারা ক্রমশ সেগুলি সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখতে আরম্ভ করে। এই সময়ে তারা আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করে যে, মোটামুটি গোলাকার পাথরের চেয়ে যে সমস্ত পাথরের টুকরোতে তীক্ষ্ণ কোণ বা ধার আছে তাতে বেশি কাজ হয়, অর্থাৎ শত্রু বেশি কাবু হয়। সুতরাং তারা

বেছে বেছে প্রাকৃতিক-কারণে-ভগ্ন তীক্ষ্ণ কোণ বা ধার-বিশিষ্ট পাথরগুলিই কাছে রাখত। গাছের ডাল, জন্তু-জানোয়ারের শিঙ, হাড় বা দাঁতের সম্বন্ধেও তারা এইরূপ বাছাই করত। আরও কিছুকাল পরে তারা দেখলে যে, প্রাকৃতিক কারণে যে সমস্ত পাথর টুকরো হয়ে ভেঙে যায় তাদের ধার ততটা তীক্ষ্ণ থাকে না, সুদৃশ্যও হয় না ততটা, নিজেরা সুবিধে মতো ভেঙে নিলে যতটা হয়; কারণ প্রাকৃতিক-কারণে-ভগ্ন পাথরগুলির তীক্ষ্ণতা কালের প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অনেক কমে যায়। এর পর থেকেই তারা নিজেদের অস্ত্র নিজেরা তৈরি করতে আরম্ভ করলে এবং সর্বদা সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে রাখতে লাগল। প্রথমত অবশ্য সেগুলি তেমন সুদৃশ্য হ'ত না, পরে ক্রমশ সেগুলি অধিকতর সুদৃশ্য ও কার্যকর হয়।

প্রথম দিকের অস্ত্রশস্ত্র অধিকাংশই কাঠ, শিঙ, হাড় প্রভৃতি নশ্বর (perishable) পদার্থে গঠিত হ'ত, তাই সেগুলির সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারি না, বহুকাল পূর্বেই কালের প্রভাবে সেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু পাথরে গঠিত অস্ত্রগুলি আজও পাওয়া যায়—বৈজ্ঞানিকেরা সেগুলি সংগ্রহ করে, বিভিন্ন সময়ের সভ্যতার বিভিন্ন নামকরণ ক'রে, শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। সে কথা পরে বলব।

এই সময়ের কিছু পরেই মানুষ অগ্নির ব্যবহার শিক্ষা করে। ঠিক কোন্ সময়ে মানুষ প্রথম অগ্নির ব্যবহার করতে শেখে তা আজও জানা যায়নি, তবে মুস্টেরীয় সভ্যতায় নীয়াণ্ডারঠাল মানব যে অগ্নির ব্যবহার জানত তার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া গেছে—তবে তার বহু পূর্ব থেকেই যে অগ্নির ব্যবহার প্রচলিত ছিল, বৈজ্ঞানিকেরা এ কথা বিশ্বাস করেন। অগ্নি ব্যবহারের প্রথম যুগে অবশ্য মানুষ অগ্নি উৎপাদন করতে জানত না। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বজ্রাঘাত, উল্কাপাত বা দাবাগ্নি-সঞ্জাত অগ্নি থেকে অগ্নি সঞ্চয় করে সঞ্জীবিত করে রাখতো। তার বহু পরে মানুষ অগ্নি উৎপাদন করতে শেখে।

প্রথম দিকে মানুষ অগ্নিকে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবেই ব্যবহার করত নিশ্চয়। বন্যপশু আগুনকে ভয় করে এ সংবাদ তাদের আগেই জানা ছিল। তাই রাত্রে যখন মানুষ নিজে অনেকটা অসহায় হয়ে পড়ত, তখন অগ্নির সাহায্যে তারা আত্মরক্ষা করত—তা ছাড়া সেই অগ্নি-কুণ্ড থেকে যে আলো পাওয়া যেত, তাও তাদের খুব কাজে লাগত। শীতের রাত্রে শরীর উত্তপ্ত রাখবারও বেশ সুবিধে হ'ত। এই সকল কারণে তারা সর্বদা অগ্নি সঞ্জীবিত রাখতে চেষ্টা করত। অগ্নিতে মাংসাদি দগ্ধ ক'রে খাবার পদ্ধতি সম্ভবত অনেক পরে প্রচলিত হয়। দাবাগ্নিতে নিহত অর্দ্ধদগ্ধ পশুর মাংস ভক্ষণ করে হয়তো তাদের খুব সুস্বাদু লেগেছিল, তাই থেকেই হয়তো মাংসাদি দগ্ধ করে খাবার রীতি প্রচলিত হয়। মৃৎপাত্রে খাদ্যবস্তু সিদ্ধ করে খাবার রীতি অনেক পরে নবশৈল যুগে আরম্ভ হয়, কারণ তার পূর্বে মৃৎপাত্র ছিল না। তবে মৃৎপাত্রের আবিষ্কারের পূর্বেও তারা নানা প্রকারে সিদ্ধ করবার উপায় আবিষ্কৃত করেছিল। কখন কখন তারা নারিকেলের মালায় বা কুমড়ার খোলায় পানীয় নিয়ে তার মধ্যে তপ্ত পাথরের টুকরা ফেলে দিত; কয়েকবার এইরূপ পাথরের টুকরা ফেলবার পর পানীয় বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠত, তখন তারা সেই পানীয় পান করত। এইরূপ প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত করার নাম 'stone-heating' বা শিলোত্তপন। কখন কখন আবার তারা মাংসের টুকরা উত্তপ্ত পাথরের মধ্যে চেপে ধরে সিদ্ধ করে নিত। এ প্রক্রিয়াকে 'stone-roasting' বা শিলাদাহ বলে। কিন্তু এ সকল অনেক পরবর্তী কালের কথা।

এ ছাড়া, লাঠির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ পুড়িয়ে শক্ত করবার জন্যেও তারা অগ্নির ব্যবহার করত।

শীত নিবারণের জন্যে আদিম মানুষ সাধারণত নিহত পশুর চর্ম ব্যবহার করত। প্রথম দিকে যখন মানুষ গুহা-বাস করতে শেখেনি তখন শীতল বায়ুর হাত থেকে আত্ম-রক্ষা করবার জন্যে তারা শুষ্ক লতাপাতা দিয়ে এক রকম সামান্য আচ্ছাদন তৈরি করত, তাকে ইংরেজিতে 'wind-screen' নাম দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া সাধারণত যে দিক থেকে শীতকালে বায়ু প্রবাহিত হয় সেই দিকে পাহাড় আছে এমন স্থান দেখে, অর্থাৎ পাহাড়ের আড়ালে, তারা আশ্রয়-স্থান নির্বাচিত করত, তাতেও শীতের হাত

থকে তারা অনেকটা রক্ষা পেত। মুস্টেরীয় যুগে মানুষ থম পর্বতগুহায় বাস করতে আরম্ভ করে।

চর্ম পরিচ্ছদের ব্যবহার অবশ্য প্রথম দিকে লজ্জা বারণের উদ্দেশ্যে করা হ'ত না। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ত নিবারণ। তার পর প্রসাধন প্রধান উদ্দেশ্যে পরিণত য়। বহু পরে নবশৈল যুগে মানুষ কাপড় বুনতে শেখে।

এই সময়ে মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল শিকারলব্ধ পশু-াংস। এই যুগে মানুষ পাথরের অস্ত্রের সাহায্যে তার নজের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ন্তু শিকার করত; এমন কি তারা শিকারার্থ অধুনালুপ্ত লামশ গণ্ডার ও ম্যামথ নামক অতিকায় জন্তুসকলের ম্মুখীন হতেও কুণ্ঠিত হত না। তা ছাড়া হরিণ, বরাহ, রু, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তু তো তাদের নিত্য আহার্য ছিল।

যদৃচ্ছালব্ধ গাছের ফলও অবশ্য তারা নিশ্চয়ই আহার করত, যদিও ফলের জন্য বৃক্ষ রোপণ করা তখনও তাদের মধ্যে চলিত হয় নি। পশুপালনও সেই যুগে তারা করত না। সেই যুগে তারা যাযাবর জীবন যাপন করত অর্থাৎ তাদের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। কোনও বিশেষ অঞ্চলে আহার্য পশুর অভাব ঘটলেই তারা সেই অঞ্চল ত্যাগ করে অন্যত্র অভিযান করত। সম্ভবত আদিম যুগে মানুষ দলবদ্ধ হয়েই বাস করত।

উল্লিখিত অধিকাংশ ঘটনাই মানুষের অনুমানসাপেক্ষ —নিশ্চিত প্রমাণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু শিলাস্ত্র সম্বন্ধে সে কথা প্রযোজ্য নয়। সেই জন্য বৈজ্ঞানিকেরা এই শিলাস্ত্রকেই ভিত্তি করে আদিম মানব সভ্যতার শ্রেণী-বিভাগ করেছেন। প্রথমত, শিলাস্ত্র-সমূহকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—Eolith বা উষাশিলাস্ত্র, Palaeolith বা পুরা-শিলাস্ত্র, Mesolith বা মধ্যশিলাস্ত্র এবং Neolith বা নবশিলাস্ত্র। এই চারি প্রকার অস্ত্র যে যুগে ব্যবহৃত হ'ত তার নাম দেওয়া হয়েছে 'Stone Age'—প্রস্তর-যুগ বা শৈলযুগ। শিলাস্ত্রের নাম অনুযায়ী এই প্রস্তর-যুগকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—উষাশৈলযুগ, পুরাশৈলযুগ, মধ্যশৈলযুগ ও নবশৈলযুগ।

নবশৈলযুগের পর আসে মিশ্রিত শিলা ও ধাতুর যুগ, ইংরেজিতে তার নাম দেওয়া হয়েছে Calcolithic Age, বা তাম্রশৈলযুগ। এই সময়ে শিলাস্ত্র ও ধাতব অস্ত্র দুই-ই পাওয়া যায়। এই ধাতব অস্ত্র প্রধানত ব্রোঞ্জ (Bronze) নির্মিত হ'ত। ব্রোঞ্জ এক প্রকার মিশ্র ধাতু (alloy); এতে তামা (Copper), দস্তা (Zinc) ও রাঙ (Tin) মিশান থাকে।

এর পরেই আসে ব্রোঞ্জযুগ (Bronze Age)। এই যুগের অস্ত্রশস্ত্র প্রধানত ব্রোঞ্জেই নির্মিত হ'ত। ব্রোঞ্জ শুদ্ধ তামার চেয়ে বেশি শক্ত হয়, সুতরাং তামার অস্ত্রের চেয়ে ব্রোঞ্জের অস্ত্র অধিকতর কার্যকর। ভারতবর্ষে কিন্তু ব্রোঞ্জের পরিবর্তে তামাই ব্যবহৃত হ'ত—তাও কেবলমাত্র উত্তরাপথে। দাক্ষিণাত্যে নবশৈলযুগের পরেই লৌহযুগ দেখা দেয়—সেখানে ব্রোঞ্জ বা তামার যুগ দেখা যায় না। ভারতবর্ষে সম্প্রতি দুই একটি ব্রোঞ্জের কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু তাকে সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় বলেই ধরা হয়।

ব্রোঞ্জ বা তামার যুগের পরে আসে লৌহযুগ বা 'Iron Age'; ইহাও তিন ভাগে বিভক্ত—Hallstatt, La Tene ও আধুনিক লৌহযুগ। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিকের মতে আধুনিক লৌহযুগও ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে। এখন আরম্ভ হচ্ছে এলুমিনিয়মের যুগ। কারণ এই যুগের বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যই এলুমিনিয়মে প্রস্তুত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বাসন-কোসন, এরোপ্লেনের ফিউসিলেজ ও যন্ত্র, হাল্কা মোটরের যন্ত্র ও বডি, পাখার ব্লেড, বোমার বারুদ, প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। অন্য কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক আবার বর্তমান যুগকে পেট্রলের যুগ, কয়লার যুগ, ইলেক্‌ট্রিকের যুগ প্রভৃতি নামকরণ করতে চান। তবে এ সকল নাম এখনও বিজ্ঞানের পরিভাষায় গৃহীত হয় নি। বিজ্ঞানের ভাষায় এখনও আধুনিক লৌহ-যুগ চলছে।

এইবার এই বিভিন্ন যুগগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলে ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যাবে। প্রথমেই ধরা যাক Eolithic Age বা উষাশৈল যুগের কথা। উষাশিলাস্ত্র তাদের গঠনপারিপাট্য, প্রাচীনতা ও পৃথিবীর যে স্তরে

পাওয়া গেছে সেই স্তর হিসাবে আট ভাগে বিভক্ত। এই বিভিন্ন যুগের শিলাস্ত্রগুলিতে এক-একটি সভ্যতার (Culture) নিদর্শন রূপে গণ্য করা হয়। প্রথম বিভাগের নাম Fagnian Culture. এই সভ্যতার শিলাস্ত্রগুলি ফ্রান্সে Ardennes-এর নিকটবর্তী Boncelles নামক স্থানের Oligocene স্তর থেকে পাওয়া গেছে। এত প্রাচীন কালে সম্ভবত নর-বানরেরও উৎপত্তি হয় নি, তাই বৈজ্ঞানিকগণ এই শিলাস্ত্রগুলিকে মানব নির্মিত বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে এই প্রস্তরখণ্ডগুলি উপরিতন ভূপৃষ্ঠের চাপে ভেঙ্গে গিয়ে ঐরূপ আকৃতি গ্রহণ করেছে। মানুষে যখন আঘাত দিয়ে চটা তুলে তুলে শিলাস্ত্র তৈরি করে, তখন সেই আঘাতের ফলে শিলাস্ত্রের গায়ে এক প্রকার অদ্ভুত দাগ পড়ে যায়, তাকে ইংরাজিতে 'bulb of percussion' বলে। প্রধানত এই 'bulb of percussion'-এর উপস্থিতির জন্যেই পূর্বে ফ্যাগনিয়ান্ উষা-শিলাস্ত্রকে মানবনির্মিত বলে স্থির করা হয়েছিল কিন্তু পরে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভূস্খলন (land-slip), ভূপৃষ্ঠের চাপ, প্রবল জলস্রোত প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণেও শিলাখণ্ডের গায়ে bulb of percussion-এর অনুরূপ দাগ পড়তে পারে। তাই আজকাল অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই এই যুগের শিলাস্ত্রকে মানবনির্মিত বলে স্বীকার করেন না।

উষাশৈল যুগের দ্বিতীয় সভ্যতার নাম Cantalian Culture; এই সভ্যতার শিলাস্ত্রগুলি Cantal-এর Le Puy Cournyর উচ্চ মিয়োসীন বা নিম্ন প্লিয়োসীন স্তর থেকে পাওয়া গেছে। এদের মধ্যেও bulb of percussion লক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এত প্রাচীন যুগে অস্ত্র নির্মাণক্ষম মানুষের সৃষ্টি হয়েছে কি না এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ সন্দিহান। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই এগুলিকে প্রাকৃতিক কারণে নির্মিত ব'লে অনুমান করেন। কেউ কেউ বলেন যে, এগুলি অস্ত্রনির্মাণক্ষম পশুর দ্বারা নির্মিত ('made by tool-fashioning animals')।

পরবর্তী তৃতীয় সভ্যতার নাম Kentian Culture; এই সভ্যতার শিলাস্ত্র (hand-axe) ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী Kent নামক মালভূমির প্লিয়োসীন স্তর থেকে পাওয়া গেছে। এগুলিও মানব নির্মিত কি না এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ সন্দিহান।

চতুর্থ সভ্যতার নাম Prestian Culture; এই যুগের শিলাস্ত্র St. Prest নামক স্থানের প্লিয়োসীন স্তর থেকে পাওয়া গেছে। এরাও মানবনির্মিত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

Prestian Culture-এর সমসাময়িক বা ইহার কিছু পরের স্তরে ইংলণ্ডে Rostrocarinate নামক এক প্রকার অদ্ভুত শিলাস্ত্র পাওয়া যায়। এগুলি দেখতে ভারি অদ্ভুত; মুখের দিকটা অনেকটা টিয়া পাখীর ঠোঁটের মতো; উপর দিকটা উল্‌টানো নৌকার মতো শির-উঠা, পিছন দিকটা গোলাকার এবং তলার দিকে প্লেন, সমতল। এগুলি সম্ভবত কাঁচা চামড়া থেকে লোম চেঁচে ফেলবার জন্যে ব্যবহৃত হ'ত। এগুলি মানবনির্মিত বলে প্রায় সকল বৈজ্ঞানিকই বিশ্বাস করেন।

এর কিছু পরবর্তী প্লিষ্টোসীনের নিম্নতম স্তরে ইংলণ্ডে Foxhall-এর নিকটে Foxhall flints নামে কয়েকটি প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গেছে। এগুলি ছোট ছোট চকমকির চটা (flake) থেকে নানা আকারে নির্মিত হত। কয়েক রকমের ভেদকও (borer) এদের সঙ্গে পাওয়া গেছে। Foxhall-flints-এর উপরিভাগ সাধারণত সাদা, ঝকঝকে পোর্সলেনের মতো দেখতে হয়। এগুলিকেও বৈজ্ঞানিকগণ মানব নির্মিত ব'লে স্বীকার করেন।

পরবর্তী পঞ্চম সভ্যতার নাম Reutelean Culture; এই সভ্যতা প্লিস্টোসীন উপযুগের প্রারম্ভ কালে বর্তমান ছিল। West Flanders-এর Reutel নামক স্থানে এই সময়কার শিলাস্ত্র পাওয়া গেছে। কিন্তু আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা এগুলিকে মানব নির্মিত ব'লে স্বীকার করেন না।

ষষ্ঠ সভ্যতার নাম Mafflean Culture; Maffle নামক স্থানের প্লিষ্টোসীন স্তরে এই যুগের শিলাস্ত্র পাওয়া গেছে। এদেরও বৈজ্ঞানিকেরা মানব নির্মিত ব'লে স্বীকার করেন না।

সপ্তম সভ্যতার নাম Mesvinian Culture; বেলজিয়মের Mesvin নামক স্থানের প্লিস্টোসীন স্তরে এই

সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই শিলাস্ত্রগুলি যদিও খুব কুগঠিত (crude) এবং দেখলে খুব প্রাচীন কালের ব'লেই মনে হয়, তবুও বৈজ্ঞানিকগণ এগুলিকে বহু পরবর্তী Acheulian সভ্যতার সমসাময়িক বলে স্থির করেছেন। সুতরাং এগুলিকে উষাশিলাস্ত্র না ব'লে পুরাশিলাস্ত্র বলাই উচিত।

উষাশৈলযুগের অষ্টম এবং শেষ সভ্যতার নাম Strepyan Culture; বেলজিয়মের Strepy নামক স্থানের প্লিস্টোসীন স্তরে এই যুগের শিলাস্ত্র পাওয়া গেছে। এগুলিকে প্রায় সমস্ত বৈজ্ঞানিকই মানব নির্মিত ব'লে স্বীকার করেন। কোন কোন বৈজ্ঞানিক এদের নাম দিয়েছেন Pre-Chellean বা প্রাক্‌চেলীয় শিলাস্ত্র।

বস্তুত তা হ'লে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ উষাশিলাস্ত্রকেই বৈজ্ঞানিকেরা মানব নির্মিত বলে স্বীকার করেন না। কেবল Rostrocarinate, Foxhall flints ও Strepyan শিলাস্ত্রকেই তাঁরা মানব নিমিত বলে স্বীকার করেন। Mesvinianশিলাস্ত্রকে মানব নিমিত ব'লে স্বীকার করেও পরবর্তী Acheulian যুগের সমসাময়িক ব'লে নির্দেশ করেছেন। সুতরাং আজকাল উষাশিলাস্ত্র (Eolith) বলতে আমরা কেবল উপরোক্ত তিন শ্রেণীর শিলাস্ত্রকেই বুঝে থাকি।

উষাশিলাস্ত্রের গঠনপারিপাট্য অত্যন্ত নিকৃষ্ট (crude) ধরণের হ'ত। মোটামুটি এক টুকরা পাথরকে ভেঙ্গে তীক্ষ্ণধার করে নিতে পারলেই এই যুগের মানব যথেষ্ট ব'লে মনে করত। এদের কোনও নির্দিষ্ট আকার থাকত না, এবং সাধারণত পাতলা চকমকির (flint) টুকরার ধার থেকে চটা উঠিয়ে এদের তৈরি করা হ'ত। চটা উঠানো খাঁজগুলি সাধারণত অর্দ্ধচন্দ্রাকার হ'ত। বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট কাজের জন্যেও আলাদা ক'রে এদের তৈরি করা হ'ত না। একই শিলাস্ত্র দিয়ে বহুবিধ কাজ করা হ'ত। সাধারণত উষাশিলাস্ত্র ঘন বাদামী রঙের হয়। তবে অন্য রঙের উষাশিলাস্ত্রও দেখা যায়, যেমন Foxhall flints; সাধারণত উষাশিলাস্ত্র অন্যান্য যুগের শিলাস্ত্রের চেয়ে আকারে বেশ বড় হ'ত।

উষাশিলাস্ত্র চেনবার প্রধান উপায়—এদের গঠন পারিপাট্যের অভাব, নির্দিষ্ট আকারের অভাব, প্রকাণ্ড আকার এবং বাদামী বা সাদা ঝক্‌ঝকে রঙ্।

উষাশৈল যুগের অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে কোন বিশিষ্ট মানব জাতির জীবাশ্ম একত্র দেখা যায় নি বটে, কিন্তু প্রাচীনতার দিক থেকে মনে হয় এগুলি Pithecanthropus ও Sinanthropus জাতীয় আদিমানবের সমসাময়িক।

পরবর্তী পুরাশৈল সভ্যতায় (Palaeolithic Culture) শিলাস্ত্রের গঠন পারিপাট্য অনেক উন্নতি লাভ করে। এই সময় থেকেই বিভিন্ন কাজের জন্যে বিভিন্ন অস্ত্র তৈরি হ'ত, সুতরাং শিলাস্ত্রের নির্দিষ্ট আকার থাকত। পুরাশৈল যুগে আর একটি বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই। এই যুগের প্রথম দিকের চেয়ে শেষের দিকের শিলাস্ত্রগুলি সাধারণতঃ ক্রমশ আকারে ছোট হয়ে আসে; গঠন পারিপাট্যও ক্রমশ উন্নত ধরণের হয়ে আসে।

পুরাশৈল যুগের সভ্যতাকে বৈজ্ঞানিকগণ ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই যুগের প্রথম সভ্যতার নাম Chellean Culture বা চেলীয় সভ্যতা। ফ্রান্সের Chelles-sur-Marne নামক স্থানের প্লিস্টোসীন স্তরে এই যুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। এই যুগের প্রথম দিকের শিলাস্ত্রগুলি আকারে বেশ বড় হ'ত, শেষের দিকে অবশ্য ক্রমশ ছোট হ'য়ে এসেছিল। গঠনপারিপাট্য পরবর্তী যুগের চেয়ে নিকৃষ্ট হ'লেও উষাশিলাস্ত্রের চেয়ে অনেকটা উন্নত ধরণের। এই যুগের শিলাস্ত্রের সাধারণ গঠন প্রায় একই ধরণের—এর নাম দেওয়া হয়েছে হস্ত-ছুরিকা (coup-de-poing বা hand-dagger)। সাধারণতঃ এগুলি দেখতে অনেকটা বাদামের মতো হ'ত। তা ছাড়া, গোলাকার, ত্রিকোণ, বৃত্তাভাস ও পনিয়ার্ডের মতো হস্ত-ছুরিকাও এই সময়ে পাওয়া গেছে। এই সময়েও পূর্বের মতো একটি প্রস্তর খণ্ড নিয়ে তার গায়ের চটা উঠিয়ে উঠিয়ে শিলাস্ত্র তৈরি করা হ'ত কিন্তু প্রথম দিকে সমস্তটাই এই ভাবে চটা উঠিয়ে পরিষ্কার করা হ'ত না। অস্ত্রের পিছন দিকটা, অর্থাৎ হাতলের দিকটা, অনেক সময় বাকি থেকে যেত, অর্থাৎ মূল পাথরের উপরকার নোংরা আস্তরটি থেকেই যেত।

শেষের দিকে (Chellian evolue) কিন্তু হাতলের দিকটাও ছিলে পরিষ্কার করা হ'ত। চেলীয় যুগের চটাগুলি (flakes) উষাশৈল যুগের চটার চেয়ে আকারে অনেক ছোট ক'রে ছাঁটা হ'ত, তাতে অস্ত্রের গঠন অনেকটা সুদৃশ্য দেখাত।

পুরাশৈল যুগের দ্বিতীয় সভ্যতার নাম Acheulean Culture বা আশুলীয় সভ্যতা। ফ্রান্সের অন্তর্গত Amiens-এর নিকটবর্তী St. Acheul নামক স্থানের প্লিস্টোসীন স্তরে এই জাতীয় সভ্যতার শিলাস্ত্র পাওয়া গেছে। এই সময়ের শিলাস্ত্রও বেশির ভাগ একই প্রকার আকারের হ'ত। তাকেও coup-de-poing বা hand-dagger নাম দেওয়া হয়েছে। এই যুগের coup-de-poing-গুলি দেখতে সাধারণত চেলীয় শিলাস্ত্রের মতই হ'ত, কেবল এগুলি ক্রমশ অধিকতর পাতলা হয়ে এসেছিল এবং এদের কিনারার চটাগুলি খুব ছোট ছোট করে ছাঁটা হ'ত, তা ছাড়া গঠন-পারিপাট্যও অনেকটা উৎকৃষ্ট হয়ে এসেছিল।

চেলীয় ও আশুলীয় যুগে সাধারণত শীতের প্রকোপ খুব বেশি ছিল না (Warm inter-glacial period)। এই দুই যুগের সভ্যতার শিলাস্ত্র সাধারণত অধুনালুপ্ত এক জাতীয় জলহস্তীর (Hippopotamus) জীবাশ্মের সঙ্গে একই স্তরে পাওয়া যায়: সেই জন্যে জলহস্তী এই জাতীয় সভ্যতার স্রষ্টা মানবের সঙ্গে সমসাময়িক ছিল এবং প্রধানত তাদের আহার জোগাত, একথা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। চেলীয় যুগে জলহস্তীর সঙ্গে দাক্ষিণাত্য হস্তীও (Southern Elephant) যথেষ্ট পাওয়া যেত, কিন্তু পরবর্তী আশুলীয় যুগে দাক্ষিণাত্য হস্তীর সংখ্যা কমে এসেছিল। চেলীয় এবং আশুলীয় যুগের মানব প্রধানত পশুমাংস দ্বারা জীবিকানির্বাহ করত। কিন্তু ঠিক কোন্ জাতীয় মানব এই দুটি সভ্যতার স্রষ্টা তা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা শক্ত, কারণ কোনও জাতীয় মানবের জীবাশ্ম এই দুটি সভ্যতার শিলাস্ত্রের সঙ্গে একসঙ্গে পাওয়া যায় নি। তবে সাধারণত অনুমান করা হয় হাইডেলবার্গ মানব ও পিল্টডাউন মানবই এই দুটি সভ্যতার স্রষ্টা। কারণ একসঙ্গে না হলেও সমসাময়িক স্তরে তাদের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

চেলীয় ও আশুলীয় সভ্যতার অস্ত্রগুলির গঠনের মধ্যে মূলত অনেকটা ঐক্য বর্তমান আছে।

প্রথমত, এই দুই যুগেরই প্রধান অস্ত্র coup-de-poing বা হাত ছুরি।

দ্বিতীয়ত, এই অস্ত্রগুলি গঠন-প্রণালীর দিক দিয়ে Core-implement পর্যায়ভুক্ত. অর্থাৎ এই সকল অস্ত্র একখণ্ড পাথরের গা থেকে চটা উঠিয়ে উঠিয়ে আকাঙ্ক্ষিত আকারে পরিণত করা হ'ত। পরবর্তী মুস্টেরীয় যুগে কিন্তু সাধারণত এই উপায়ে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করা হ'ত না। তারা সাধারণত এক খণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের এক পাশে তার গায়ের উপর ধীরে ধীরে চটা উঠিয়ে আকাঙ্ক্ষিত আকারের শিলাস্ত্রটি তৈরি করে নিয়ে, তার পরে সহসা একটি প্রবল আঘাতে অস্ত্রটি প্রস্তরগাত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিত। ফলে এই জাতীয় শিলাস্ত্রের তলার দিকটা প্লেন বা সমতল হ'ত, অর্থাৎ যে দিকটা মূল পাথরের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সংযুক্ত ছিল সেই দিকটা সমতল হ'ত। তার পর অবশ্য ছোট ছোট চটা উঠিয়ে অন্যান্য ধারগুলি পরিষ্কার করে নেওয়া হ'ত। এই-রূপ প্রণালীতে প্রস্তুত অস্ত্রের নাম Flaked implements, কারণ এই জাতীয় অস্ত্র শিলাপিণ্ডের বহির্ভাগ থেকে প্রস্তুত হ'ত—মধ্যভাগ থেকে নয়। অবশ্য চেলীয় ও আশুলীয় যুগেও মধ্যে মধ্যে কদাচিৎ Flaked-implement-এর [illegible]ন পাওয়া যায়। মুস্টেরীয় যুগেও কদাচিৎ Core-implement-এর দেখা পাওয়া যায়।

তৃতীয়ত, এই দুই যুগের সভ্যতাই River-drift Culture বা নদীতীরের সভ্যতা নামে খ্যাত, অর্থাৎ এই দুই যুগের অস্ত্রশস্ত্র সাধারণত নদীতীরে নুড়িনোড়ার মধ্যে পাওয়া যায়। ফলে এই দুটি সভ্যতা নদীতীরে উন্নতি লাভ করেছিল, এইরূপ অনুমান করা হয়। এরা নদীতীরের শীতল বায়ু থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে 'wind-screen' নির্মাণ করে তার আড়ালে বাস করত, সে কথা পূর্বেই বলেছি। পরবর্তী মুস্টেরীয় যুগে কিন্তু অতিরিক্ত শীতের জন্যে মানব সভ্যতা পর্বত গুহার মধ্যে আশ্রয় নেয়; যদিও মুস্টেরীয় যুগেও কদাচিৎ নদীতীরের সভ্যতার (River-drift Culture) পরিচয় পাওয়া যায়, তবুও

সাধারণত মুস্টেরীয় সভ্যতার নিদর্শনগুলি গুহামধ্যেই পাওয়া যায় ব'লে এই সভ্যতাকে এবং পরবর্তী তিনটি পুরাশৈল যুগের সভ্যতাকেও Cave Culture বা গুহা-সভ্যতা বলা হয়। এই তিন যুগের মানুষদেরও সেই জন্যে Cave-men বা গুহামানব বলা হয়।

চতুর্থত, এই দুই যুগেই পৃথিবী অনেকটা উষ্ণপ্রধান ছিল, সুতরাং প্রাণী ও উদ্ভিদও অনেকটা একই রকম ছিল।

প্রধানত এই চার বিষয়ে ঐক্য থাকার জন্যে সেলীয় ও আশুলীয় সভ্যতাকে একত্র করিয়া সাধারণত একটি নামে অভিহিত করা হয়—Lower Palæolithic Culture বা নিম্ন পুরাশৈল সভ্যতা।

পরবর্তী মুস্টেরীয় সভ্যতা (Mousterian Culture) প্রায় সব দিক দিয়েই একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা। তাই তার নাম দেওয়া হয়েছে Middle Palæolithic Culture বা মধ্যপুরাশৈল সভ্যতা। পৃথিবীর বহু স্থানেই প্লিস্টোসীন স্তরে এই জাতীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। তবে সর্বপ্রথমে ফ্রান্সের Les Eyzies-র নিকটে Moustier নামক শিলাশ্রয়ে (rock shelter) এই জাতীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছিল, সেই জন্যে এর নাম দেওয়া হয়েছে Mousterian Culture বা মুস্টেরীয় সভ্যতা। যে জাতীয় মানবের দ্বারা এই সভ্যতার বিকাশ হয়, তার নাম নীয়াণ্ডারঠাল মানব (Neanderthal Man); এই জাতীয় মানবের জীবাশ্মের সঙ্গে একসঙ্গে এই জাতীয় শিলাস্ত্র পাওয়া গেছে, তাই নিঃসন্দিগ্ধভাবেই এদের উভয়ের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরা অগ্নির ব্যবহার জানত তারও নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া গেছে। যদিও পূর্বতন সভ্যতায় অগ্নির ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি, তবুও প্রায় সব বৈজ্ঞানিকই স্বীকার করেন যে অগ্নির ব্যবহার মুস্টেরীয় সভ্যতার চেয়ে অনেক প্রাচীন, সে কথা পূর্বেই বলেছি।

মুস্টেরীয় সভ্যতার অস্ত্রশস্ত্র ও নীয়াণ্ডারঠাল মানবের জীবাশ্মের সঙ্গে সাধারণত প্রচুর পরিমাণে ম্যামথ নামক অধুনালুপ্ত এক প্রকার প্রাগৈতিহাসিক হস্তীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে নীয়াণ্ডারঠাল মানব ও ম্যামথ সমসাময়িক এবং সম্ভবত নীয়াণ্ডারঠাল মানব ম্যামথ শিকার করে তার মাংসে জীবিকা নির্বাহ করত—যদিও অন্যান্য অনেক পশুই তারা আহারার্থ শিকার করত নিশ্চয়।

মুস্টেরীয় সভ্যতার প্রধান অস্ত্র scraper বা ঘর্ষক। এগুলি সাধারণত বাদামের আকার বা বৃত্তাভাসের মতো করে গড়া হ'ত। এই শিলাস্ত্রগুলির তলার দিক সাধারণত সমতল হ'ত, কারণ এগুলি flaked implements। কখন কখন লম্বা পিরামিডের আকারবিশিষ্ট hand-dagger বা হস্ত-ছুরিকাও এই সময়ে পাওয়া গেছে। তা ছাড়া নানা আকারের সূক্ষ্মাগ্র pointও এই সময়ের সভ্যতায় পাওয়া গেছে। পূর্বতন আকারের coup-de-poing বা হস্ত-ছুরিকাও অবশ্য ছিল, কিন্তু সংখ্যায় অনেক কমে এসেছিল।

মুস্টেরীয় যুগে পৃথিবীতে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বেড়ে যায়; পর্বতশীর্ষ ও মেরুপ্রদেশ থেকে তুষার নদী (glacier) অনেকটা এগিয়ে আসে, ফলে অধিকাংশ ভূভাগ তুষারাকীর্ণ হয়ে পড়ে। সেই জন্যে মানব আর বাইরে নদীতীরে বসবাস করতে পারতো না। তারা সাধারণত গুহা (cave) বা শিলাশ্রয়ে (rock-shelter) আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এই সময় থেকেই মানুষের গুহাবাস সুরু।

মুস্টেরীয় সভ্যতা সম্ভবত মৃত্যুর পরে মানব-জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত; তা ছাড়া তারা মৃতদেহের এক রকম সংকারও ('some cult of the dead') করত। এ ছাড়া তাদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

পরবর্তী সংখ্যায় উচ্চ পুরাশৈল যুগ ও তার পরবর্তী যুগের সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

মা

(উপন্যাস)

শ্রীসুপ্রভা দেবী

চৌদ্দ

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে বীণার আরো দিন দশেক লাগলো। বীরেশ্বর তার বাপের জন্যে একটি ঠাকুর রেখেছিল। সে এবং পুরানো ঝি দুজনে মিলে বুড়ো মানুষের সেবা-শুশ্রূষা একরকম চালিয়ে যাচ্ছিল। তার নিজের থাকা খাওয়ার কোন ঠিকানা ছিল না। কেউ কিছু বললে বলতো, আমাদের মতো যারা ইনসিওরেন্স-এর দালালি ক'রে বেড়ায় তাদের আবার কোন ঠিকানা থাকে নাকি? বীণাকে ডাক্তার বলেছেন, অনেক দিন বিশ্রাম ও যত্নে থাকা দরকার। বীরেশ্বর সঙ্কল্প করেছে, যে-করেই হোক বীণার অযত্ন হ'তে সে দেবে না। তাদের এক বিধবা মাসীমা এসে থাকতে রাজী হয়েছেন তাদের সঙ্গে। এতকালের বাসা একতলাটা ছেড়ে দিয়ে এবার সে দোতলায় দু'খানা ঘর ভাড়া নিলে, মাত্র দিন কয়েক আগে সে ঘরের ভাড়াটে বিদায় নিয়েছে। একদিন দুপুরবেলা উৎপলের সঙ্গে সবিতা নিজেই গেল বীণাকে তার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসতে। সে দিন বীণা তাকে ছেড়ে ছিল না। তাদের পৌঁছে দিয়ে ফেরার সময় উৎপল হঠাৎ ডাঃ নাগের সামনে পড়ে গেল। একলা গাড়ী হাঁকিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন, উৎপলকে দেখতে পেয়ে গাড়ী থামালেন। অনেক দিন পরে দেখা। সহৃদয় ভাবে কুশল-প্রশ্ন করলেন, মলিনাদের অনেক খবর দিলেন নিজের থেকেই। পাটনায় মলিনার দাদামশায়ের বাস। অনেক দিন ধরে অসুখে ভুগছেন, আর বেশী বাঁচবার আশা নেই। মলিনার মা তাঁর একটি মাত্র মেয়ে। শেষ সময়ে বুড়ো বাপের সেবাযত্ন করবার জন্যে তাই তিনি ছেলে-মেয়ে নিয়ে সেখানেই আছেন। পূজার পরেই তাঁর ছেলে (মলিনার দাদা) বিলেত থেকে ফিরবে। এপ্রিল মে পর্য্যন্ত ছেলেমেয়ের উভয়েরই বিয়ে দেবার আশা রাখেন ডাঃ এণ্ড মিসেস নাগ। পাত্রপাত্রীর অভাব নেই, তবে বাছাই করাই যা হাঙ্গামা।

উৎপল এমন কোন নতুন খবর শুনলো না। দু'দিন আগে মলিনার এক চিঠি এসেছিল, তাতে বিয়ের খবরটি ছাড়া বাকী সব খবরই ছিল। বিয়ের খবরের বদলে হেঁয়ালির ভাষায় দু-একটা বাজে কথা লেখা ছিল অবশ্য। "আমি খুব খাচ্ছিদাচ্ছি, দিব্বি ফুর্ত্তিতে আছি। পড়া-শুনোর বালাই চুকেছে, মা সে জন্যে আপশোষ করেন, আমি কিন্তু বেশ খুসী আছি। আমার বিদ্যের দৌড় সকলেরই জানা আছে। পরীক্ষা দিতে হ'লে কি অবস্থা ঘটতো তাও আন্দাজ করা কঠিন নয়। তবু মাঝে মাঝে মনে পড়ে কলেজে পড়ার দিনগুলি। খাতার পাতায় প্রফেসারদের ছবি আঁকতাম, পাশের মেয়ের সঙ্গে খা[illegible] লিখে কত consequence খেলেছি, এর তার নামে যা খুসী তাই লিখে পদ্য মেলাবার চেষ্টা করেছি মনে প'ড়ে হাসি পায়। তবে কিনা এসব বেশী মনে করি নে। যখন বুড়ো হব, দাঁত পড়বে, চুল পেকে থুড়থুড়ী হবে। তখন ইজিচেয়ারে শুয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শীতের রাত্রে আগুন পোহাতে (নিশ্চয় ভাবছ Browning এর By the Fireside নকল করছি? মোটেই নয়) সে সব দিনের কথা ভেবে ভেবে সময় কাটাব। আপাততঃ সময় কাটানোর নেহাৎ মুস্কিল হলে চিঠিপত্র লিখতে বসি। পাটনার মত সুন্দর সহরে আসতে না পেরে যারা ক'লকাতায় পড়ে পড়ে ছাইপাঁস কবিতা মেলাচ্ছে সেই সব হতভাগা লোকদের দুর্দ্দশায় হা-হুতাশ ক'রে সময় কাটাই।"

উৎপলের দ্বিতীয় উপন্যাসখানাও প্রকাশকের কঠিন হৃদয় বিগলিত ক'রে প্রেসের মুখ দেখতে পায় নি। সম্প্রতি উৎপল ঠিক করেছে, সে নিজের খরচে একটি কবিতার বই ছাপাবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ প্রস্তাবে পাবলিশারদের উৎসাহই দেখা যাচ্ছে। উৎপলের সবই ঠিক আছে শুধু একটি জিনিষেরই যা অভাব। ভরসা আছে শীগ্‌গিরই পুরান টিউশনীটা ফের পাওয়া যাবে। সে-টাকা পেলেই সে ছাপার কাজ সুরু করবে। ফাল্গুন মাসের মধ্যে যদি হয়ে যায় তবে মলিনার বিয়েতে তার নিজের স্বাক্ষর-করা কাব্যগ্রন্থ উপহার দেওয়া যাবে। সে বড় কম কথা নয়। পাত্রপাত্রীর অভাব নেই, বাছাই করাই যা হাঙ্গামা। ডাঃ নাগের কথাগুলি উৎপলের কানে বাজতে থাকে। আচ্ছা ধর, যদি আমি আজ গিয়ে বলি, ডাঃ নাগ, আমি আপনার মেয়ে মলিনাকে বিয়ে করতে চাই। আমি একজন পাত্র এবং প্রার্থী। তিনি কি ভাববেন, কি জবাব দেবেন? ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বিদেয় করবেন না নিশ্চয়? আজকাল আর কেউ অত মেজাজ দেখায় না। মনে মনে উপহাস ক'রে বাইরে বেশ মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে দেবেন যে তার মাথায় ছিট আছে। সামনে পরীক্ষা। বাজে চিন্তা ছেড়ে এখন যেন সে পড়ায় মন দেয়।

নাঃ পরীক্ষা দেওয়া আর হোল না। ফি দাখিল করতে পারে এমন টাকা কোন দিন আর হবে না। আর টাকা যদি হয়ও তবু পড়া তৈরী করতে পারে এমন সময় কই? দুরাশা আর নেই, দুর্লভের স্বপ্নও নেই। ভেবেছিল একদিন বুঝি নামজাদা লেখক হবে, এখন বুঝেছে সে প্রতিভা তার নেই। গড্ডালিকাপ্রবাহে ভেসে ভেসে বহুজনের একজন হ'য়ে কখনও দুঃখে কখনও সুখে এক-ঘেয়ে জীবন কাটিয়ে যেতে হবে তার। ধূসর গোধূলি। 'A common greyness silvers everything," তাই যদি তবে সেই জীবনের সঙ্গিনী হতে কাউকে আমন্ত্রণ করা চলে না। বিয়ে একদিন তারও হয়তো হবে, কিন্তু যার সঙ্গেই হোক এমন কিছু এসে যায় না।

প্রতিভা নেই তার এ কথা অস্বীকার করার আর উপায় কি? পড়াশুনায় ভাল ছিল, কিন্তু এমন ভাল নয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কীর্ত্তি থেকে যাবে। প্রিয়দর্শন চেহারা বটে, কিন্তু এমন রূপ নেই যা বিস্ময় জাগায় মনে। বরং অতসীর প্রতিভা আছে কিছু। যদি গান শিখত, ভালো করে ছবি আঁকা শিখত তবে খ্যাতিলাভ করতে পারতো এ আশা দুরাশা নয়। ভগবান তার চেয়ে অতসীকে গড়ে তুলতে সুক্ষ্মতর তুলিকা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সেই মেয়ে নিজের অন্তর্নিহিত প্রতিভাকে প্রকাশ করতে মোটেই ব্যস্ত নয়, উৎসুকও নয়। নিজকে সে বলি দেবে বলে ঠিক ক'রে ফেলেছে। কি ইস্পাতের মত শক্ত মন। বীরেশ্বরকে কেন মিছে দোষ দেওয়া? বীরেশ্বর না এলে আর কেউ আসতো। উপলক্ষের অভাব ছিল এত দিন, কিন্তু অতসীর সঙ্কল্পের ত্রুটি ছিল না।

বাড়ীতে ঢুকে দেখে শোবার ঘরে তালা দেওয়া, ভাবছে আবার বেরিয়ে যাবে কিনা এমন সময়ে সিঁড়ি দিয়ে ব্যস্ত ভাবে অতসী উঠে এল। তার কেশে বেশের সামান্য পরিপাট্যে বোঝা যায়, এই মাত্র সে রাস্তা থেকে এল। দরজা খুলে দিয়ে বলল, দাদা বোস, চা তৈরী করি।

বীণা এতদিন এঘরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল, আজ সে চলে যাওয়ায় এবং সবিতাও অনুপস্থিত থাকায় ঘর একেবারে নিরালা হ'য়ে গিয়েছে। দু'জনেই চুপচাপ। অনেকদিন পর তারা এভাবে চা খেতে বসেছে। অতসী যেন একটু অন্যমনস্ক। তার বিমনা ভাব লক্ষ্য করে উৎপলও কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত মনে করলে না। একটু পরেই অতসী নিজেই নীরবতা ভঙ্গ করলে—"দাদা, আজ তোমরা চলে যাবার পর বীরেশ্বর বাবুর সঙ্গে আমি আবার গিয়েছিলুম মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে। প্রথমদিন যেসব আলাপ হয়েছিল তা তুমি সেদিন শুনেছ। তোমার সঙ্গে তর্কের পরে বীরেশ্বর বাবু আর এখানে আসেন নি। আজ তাঁর চিঠি পেলাম, শীগ্‌গির আবার তিনি কলকাতার বাইরে চলে যাবেন। যাবার আগে মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে আমার আবার দেখা হওয়া দরকার। তাই আমি আজই গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হোল তাঁর। সংক্ষেপে বলি শোন।

"এ-পথ বড় দুর্গম পথ, কেন আসতে চাও? এ পথের যত দুঃখ লাঞ্ছনা—তার দায়িত্ব আর দ্বিতীয় কেউ নেয় না—নিজেকে নিতে হয়। আমাকে দেখছ ত? আমার ইতিহাস জান? আমার মেয়ে যদি বেঁচে থাকে তবে এতদিনে তোমার মত বড় হয়েছে, আরও ছেলেমেয়ে ছিল আমার। বুড়ো মা, স্ত্রী, ছোট এক ভাই পঙ্গু। এতগুলি প্রাণীর আহার যোগাবার ভার ছিল আমার উপরে। সে কর্ত্তব্য আমি করিনি। কখন কোথায় থাকি, কি খাই, পরি, কাদের সঙ্গে জটলা পাকাই কোন ঠিকঠিকানা নেই। আমি শুধু জানি এই আমার ভাগ্যলিপি। লোকের চোখ এড়িয়ে, সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে 'আউ-টল' হয়ে বেঁচে আছি, তাই থাকতে হবে যতদিন না আমার কার্য্যসিদ্ধি হয় বা যতদিন না ধরা পড়ি। আমার অতীত জীবনের যত গুরুভার কর্ত্তব্য আমি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এসেছি, তার দায়িত্ব আমিই তো বইব আজীবন, আর কেউ ত জবাবদিহি করবে না? তোমাকেও তাই বলছি, তুমি যা সইবে তার জন্য কেউ জবাব দেবে না ইহলোকে। আমি বল্লাম, আমি তো ভেবে দেখেছি। আমাকে এখন পরীক্ষা করুন, নইলে শুধু শুধু ভাবনা ক'রে কেউ কি ঠিকমত বুঝতে পারে?"

"তোমার কোন বন্ধু, তোমার দলের লোক তোমাকে ধরিয়ে দেবে এ সম্ভাবনা আছে জানো ত?"

"জানি।"

"তোমার দ্বারা যদি আমাদের দলের কারো কোন ক্ষতি হয় তোমার প্রাণদণ্ড হবে, জানো?"

"জানি"।

"ধরা পড়লে তোমার কাছ থেকে খবর বার করবার জন্যে তোমার ওপর সব রকম দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন, এমন কি পাশবিক অত্যাচার পর্য্যন্ত হতে পারে।"

আমি বল্লাম, এ সবই আমি জানি।

এর পরেই চট ক'রে আমার হাতে চকচকে ধারাল একটা ছোরা গুঁজে দিলেন। তাঁর গা ঘেঁষে দুধের মত সাদা ধবধবে একটা বেড়াল-বাচ্চা বসে হাত চাটছিল আরাম করে।

আমাকে বল্লেন—ছুরিটা ঐ বাচ্চার গায়ে বসিয়ে দিতে।

প্রথমটায় একটু অবাক হয়েছিলাম কিন্তু আমি আসলে তেমন ঘাবড়াইনি। বল্লাম "বেড়াল-ছানাটির গায়ে ছুরী বসিয়ে দেব কেন মিছিমিছি?"

"দরকার হলে ছুরী বসাতে পারবে কিনা তার ত একটা পরীক্ষা দরকার? আমাদের এ পথে যে পদে পদে মানুষের প্রাণ দেওয়া নেওয়া চলে কিনা? এ যে রক্তপাতের পথ।"

"কিন্তু আমি ত জানি আপনারা এই শিক্ষা দেন যে হিংসামূলক মনোভাব নিয়ে কেউ যেন এ পথে না আসে। মানুষেরও প্রাণ প্রয়োজন হলে নিতে হবে বৈ কি—কিন্তু কখনও ইচ্ছেয় নয়, বাধ্য হয়ে।"

"কিন্তু বাধ্য হয়েও প্রাণ নিতে তুমি পারবে কি? দরকার হোলে আত্মহত্যা করতে পারবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু দরকার হোলে আক্রমণ করতে পারবে কিনা—এ বিষয় সন্দেহ আছে।"

"এ কথার উত্তরে তুই কি বল্লি?"

"আমি বলেছি আরও একটু ভেবে দেখব, কিন্তু তোমাকে বলছি দাদা বেড়াল-ছানাটাকে ছুরী বসিয়ে সাহসের পরীক্ষা দিতে মন কিছুতেই সায় দিল না।"

"তা-ত দেবেই না। তোকে কি আমি জানি? কিন্তু বেড়াল-বাচ্চার প্রাণের মায়া এত বেশী হোলে মানুষ মারবি কি উপায়ে অতসী?"

"সেই তো প্রশ্ন, মাষ্টারমশাই তো তাই বল্লেন। আর আমার মনেও এই খট্‌কা লেগেছে দাদা। যুদ্ধ করতে পারি, কিন্তু লুকিয়ে কাউকে মেরে বসা খুব বড় শত্রু হোলেও এ কি সহজ কথা?"

"দেখ্‌, অতসী, প্রায় চার বছর আগে আমার যখন তোর বয়েস ছিল, ঠিক এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম আমিও। জানিস ত এমনিতেই একটু ভাবপ্রবণ মন আমার। দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা চারিদিকে লোকের মুখে মুখে তখন। কলেজে ছাত্রদের মধ্যে ও ছাড়া আর কথা নেই। রক্ত গরম, সহজেই মন চঞ্চল হয়ে উঠত, ভাবতাম হাতে একটা কিছু পেলেই হয়। বীরেশ্বরকে

ধন্যবাদ দিই। তখন সে আমার সঙ্গে তর্ক করতো, যদি তর্ক না কোরে জেদ করতো তবে আমি হয়তো কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারতাম না। কিন্তু তার স্বভাব হচ্ছে লোককে যুক্তির সাহায্যে তার স্বমতে আনা, জোর করে নয়। তর্ক করতে গিয়ে আমাকেও ভেবে দেখতে হোত। তখন অনেক রাত এসব নিয়ে চিন্তা করে কাটিয়েছি, তন্ময় হয়ে ভাবতাম কোন্ পথ আমার পথ। জন্মভূমির প্রতি আমার কর্ত্তব্য কি, দায়িত্ব কতটুকু। ভেবে দেখে এই হোল যে আমাকে দিয়ে কোন কাজ হোল না। বীরেশ্বরের মতে মত দিতে পারলাম না, তাই ওপথ বন্ধ হোল আমার। দেশের নেতাদের মতের সঙ্গে মিলল না, তাই খদ্দর চরকা পিকেটিং জেল ওসব প্রোগ্রাম থেকেও বাদ পড়লাম। অথচ নিজেও কোন মীমাংসা খুঁজে পেলাম না। স্বাধীনতার সংগ্রাম কোরব, স্বাধীনতা অর্জ্জন কোরব, সুদীর্ঘ সময় নিয়ে নয়, বিদ্যুৎগতিতে। আবার নিরর্থক একটা মানুষও মারা যাবে না এই কল্পনা শুধু আমার কল্পনাতেই রয়ে গেল।"

উৎপলের কথা শেষ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ করে বসে রইল। তাদের দুজনের স্তব্ধ মুখের ওপরে, অতসীর কপালের চূর্ণ অলকে শেষ বেলার রোদ লাল সার্সির ভেতর দিয়ে বাঁকা হয়ে পড়ে আবির ছড়িয়ে দিল। তাদের গভীর চিন্তাগুলি যেন প্রাণ পেয়ে শরীর পরিগ্রহ করে তাদের সামনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেদিন আর তাদের অন্য কাজ করা হোল না।

(২)

পরদিন উৎপল ও বাড়ীতে গিয়ে শুনল বীরেশ্বর চলে গিয়েছে। হঠাৎ যেতে হয়েছে তাই কাউকে জানিয়ে যেতে পারে নি। সে চলে গেলেও বীণার হাতে টাকা দিয়ে গিয়েছে, খরচের ভাবনা নেই। বীণার মাসীমা এসে পৌঁছেচেন। সবিতাকে ছেড়ে দিতে বীণা রাজী নয়, অনেক বুঝিয়ে তবে সবিতা ছুটি পেল। বীণার মাসীমা সবিতাকে নিয়ে গেলেন জল খাওয়াতে।

বীণা অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে। মুখের ওপরে যে কঠিন ভাবটা আগে অতি সহজেই স্পষ্ট হয়ে উঠতো মার মৃত্যুতে এবং নিজের অসুখে সে ভাবটা এখন একেবারেই ঝিমিয়ে পড়েছে। মুখখানা ক্লান্ত, দুটো কথা বলেই এখনও হাঁপিয়ে পড়ে। একটা ইজিচেয়ারে সে শুয়েছিল। জানালার পাশে মাদুর পাতা ছিল, উৎপল সেখানে বোসল। অসুখ হয়ে দুর্ব্বল হয়েছে বটে, কিন্তু তার দরুণ বীণা আরো বেশী আবদেরে হয়ে পড়েছে। অতি সামান্য কথায় চটে যায়, সবাই এখন তার মন যুগিয়ে চলে।

উৎপল বললে, "বীণা, তুমি তো মাকে কেড়ে নিয়েছ, আমাদের চেয়ে এখন তোমার জন্যেই মার টান বেশী। খুকী তো বলেছে মার সঙ্গে আড়ি দেবে।" বলে হাসল।

বীণা হাসল না। বলল, আমার তো আর কেউ নেই কিনা তাই মাসীমা আমাকে যত্ন করেছেন। তাঁর মত মন আপনারা ভাই-বোন কেউ পান নি।

উৎপলের হাসি মিলিয়ে গেল, বুঝল বীণাকে চটিয়ে দিয়েছে, তাড়াতাড়ি বলল "পাগল নাকি? ঠাট্টা বুঝতে পার না, মা তোমাকে এত ভালবাসেন এ কি আমাদের অখুসী হবার কথা? আর তুমি যে তাঁকে ভালবাস, তাঁকে যত্ন কর তার মূল্য কি আমরা বুঝতে পারি নে?"

"উৎপলদা, শুনুন, আপনারা দুজনেই বিদ্যে বুদ্ধি রূপে গুণে যত বড়ই হন মায়ের মন বুঝে চলেন না। আমি বুঝতে পারি যে, মাসীমার মনে একটা কষ্ট আছে। সেটা তিনি বোঝাতে পারেন না কাউকে। আপনারা নিজেদের সুখ-দুঃখ ভাবনা চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, পরের মন বুঝবার অবসর কই আপনাদের?"

বীণাকে উত্তেজিত করে তুলে উৎপল বড় অস্বস্তি বোধ করলে। তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়ল। "বীণা সেরে উঠে কি ফের ইস্কুলে ভর্ত্তি হবে?"

"ইচ্ছে আছে আমার। সবাই আজকাল কত লেখা-পড়া জানে। আমি কি ম্যাট্রিকটাও পাস করতে পারি নে?"

"তুমি একটু চেষ্টা করলেই তা পারবে। তোমার মধ্যে মেধার অভাব নেই তা আমি অনেক দিনই বলেছি।"

হঠাৎ বীণা জিজ্ঞেস করলে, "ডাঃ নাগের মেয়ে মিলির খবর কি উৎপলদা? আজকাল সেখানে যান না?"

"মিলির সঙ্গে ত তোমার আলাপ নেই, অত কৌতূহল কেন তার সম্বন্ধে ?"

"বাঃ কৌতূহল থাকবে না ? আপনাকে অত চিনি জানি কাজেই আপনার বন্ধুবান্ধবদের সম্বন্ধে এক আধটু খবর জানতে ইচ্ছে হয়। লোকে ত বলে মিলিনাগের সঙ্গে আপনার বে হবে।" রাগ করে উৎপল বলল, "লোকে বলে কিনা জানি নে, তবে তুমি বলছ তো তাই যথেষ্ট।"

"কি রে খোকা, কি হয়েছে ? রাগারাগি করছিস যে ?" বলতে বলতে সবিতা ঘরে এল। এক মুহূর্ত্তে বীণার ভাব বদলে গেল। মুখের ওপর অজস্র কোমলতা ফুটে উঠল, করুণ গলায় সে বললে—আবার কবে আসবেন মাসীমা, কি করে আমি থাকবো ?

বীণার ব্যবহারে যে বিরক্তি উৎপলের মনে জেগেছিল তা সহজে মিলিয়ে গেল না। বীণার ব্যবহারে রহস্য কিছু ছিল না, তাকে এখন উৎপল ভাল করেই বুঝেছে। উৎপলকে জয় করবেই এই বীণার স্থিরসঙ্কল্প। আর কোন উপায় না দেখে বুঝি মাকে দলে টেনে নিতে চায়। উৎপলের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে আয়ত্ত করবে ?

দু-এক দিন পরে একদিন সবিতা যখন ঘরে ছিল না, অতসী বলল, দাদা মা তোমাকে একটা কথা বলতে বলেছেন।

"কী কথা রে ?"

"তাঁর ইচ্ছে বীণাকে তুমি বিয়ে কর।"

"সে কি রে অতসী, এরি মধ্যে ভুলে গেলি মা আমার বিয়ের কি রকম কল্পনা করতেন ? এতো রাজকন্যাই নয়, অর্দ্ধেক রাজত্ব তো দূরে থাক্।"

"রাজকন্যে নয় কি জন্যে ? সব মেয়েই রাজকন্যে দাদা। বীণার বাপের ঘরে কদর কি কোন রাজকন্যের চেয়ে কম ?"

"তোরও বীণাকে ভাজ করতে সাধ গিয়েছে নাকি ? তোর মতামত শুনি ?"

"আমার খুব পছন্দ হয় নি দাদা, কিন্তু তাতে কি এসে যায় ? মা সুখী হ'লে তুমি খুসী হলে আমিও আগ্রহ করে ভাজকে ডেকে নেবো, দূরে ঠেলে রাখবো নাকি ?"

"আর রাখলেই বা কি ? দুদিন বাদে নিজেই তো পরের ঘরে রওনা দিবি। এখন মায়ের দ্বিতীয় আদেশ শোন্, তোর যে বিয়ের ঠিকঠাক সব।"

"সত্যি ? সুখবর তা হলে। সব ঠিক বুঝি ?"

"কি নয় ? পাত্র হাজির, পাত্রী 'হ্যাঁ' বললেই হয় ?"

"সুপাত্রটি কে দাদা ?"

"ধর না কেন বীরেশ্বর ?"

"ওঃ মনে মনে এই মতলব আঁটা হচ্ছে বুঝি ? দাদা কবিতা লেখ, নভেল লেখ, ছাপাখানা থেকে ফেরৎ আসে, এই তো তোমার ব্যবসা জানি, এরি মধ্যে ঘটকালী জুড়েছো কখন ?" তারকৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের ভাব দেখে উৎপল হাসতে হাসতে বিষম খেল। বলল—ঘটকালী তো তুই করছিস রে খুকী, আমি তো শুধু ঘটক বিদেয়ের ব্যবস্থা করছি, ভাল করে বিদেয় করতে হবে তো ?"

"নাঃ দাদা, ঠাট্টা তামাসা রাখো। বীণার সম্বন্ধে তোমার যা বলবার আছে বলে ফেল। মা রোজ এ [illegible] য়ে আমায় বলেন।"

"মা যে আমাকেও বলেছেন রমেশ-দার সঙ্গে তোর বিয়ে হয় কিনা চেষ্টা করতে, তা পাত্র তো এক কথায় রাজী হবে জানা কথাই।"

"না দাদা, রমেশ-দা বলে নয়, বিয়ে আমি কাউকে কোরব না।"

"কেন ?"

"ঘর-সংসার করতে মন চায় না আমার।"

ক্রমশঃ

ডি ভ্যালেরা ও আয়র্লণ্ড

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

আরও কয়েকজন বিশিষ্ট দেশনায়কের মতই ইমন্ ডি ভ্যালেরার হাতে যে দেশের শাসনভার সেই দেশের খাঁটি নাগরিকরূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই। আমরা জানি হিট্‌লারকে একজন অষ্ট্রিয়ান হিসাবে; পিলসুদসকিকে (Pilsudski) পোলিশ হিসাবে নয় লিথুএনিয়ানরূপে, কামাল আতাতুর্কের জন্ম গ্রীসের সালোনিকায় এবং অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ডাঃ কার্ট ভন্ স্যুস্‌নিগের জন্ম ইটালীর রিভাতে।

কামাল আতাতুর্কের শৈশবে সালোনিকা তুর্কির একটা অংশ ছিল। স্যুসনিগ যখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, রিভা ছিল তখন অষ্ট্রিয়ার অংশমাত্র। ইমন্ ডি ভ্যালেরার জন্মস্থান রাজধানীতে নয়, যেস্থানে তাঁর জন্ম তা ছিল তিন হাজার মাইল সমুদ্রের ব্যবধান। নিউ ইয়র্কে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ জন্ম হয়। তাঁর পিতা কিউবা (Cuba) থেকে স্পেনে আসেন, মাতা আইরিশ মহিলা, পরে আমেরিকায় বসবাস করেন। ডি ভ্যালেরার জন্ম আমেরিকায়, আমেরিকারই নাগরিকরূপে তিনি বর্দ্ধিত হন, মার্কিন নাগরিকত্বই তাঁর জীবন রক্ষার হেতু হ'য়েছিল।

হিটলার ছিলেন অষ্ট্রিয়ান, এই কারণে অপর রাষ্ট্রের উপর তাঁর বৈধ দাবীর পক্ষে কতকটা বাধা ও বিপত্তির কারণ বটে, তা সত্ত্বেও তিনি আজ সমগ্র জার্ম্মান জাতির ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। ডি ভ্যালেরার জন্ম আমেরিকায় হওয়া সত্ত্বেও আজ তিনি আয়র্ল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট ও নেতা। ইষ্টার বিদ্রোহের পর তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। কিন্তু তাঁর আমেরিকায় জন্ম হওয়ায় আমেরিকার মতকে উপেক্ষা ক'রে ব্রিটিশ মিলিটারী ট্রাইবিউনালে একজন আমেরিকান নাগরিককে গুলির আঘাতে হত্যা করতে সাহস করে নাই। এই বিদ্রোহের অন্যান্য অধিনায়কদের প্রায় সকলকেই গুলি করা হ'য়েছিল। ডি ভ্যালেরার অপর কোন রাষ্ট্রে জন্ম হ'লে, আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের ইতিহাস হয়ত অন্যরূপ দাঁড়াত। এ ধারণা অমূলক হ'ত না যে, আয়র্লণ্ডকে আজ আমরা ফ্রিষ্টেটরূপে দেখতে পেতাম না।

ইমন্ ডি ভ্যালেরা ডিস্‌রেলি ও থিওডোর রুজভেল্টের ন্যায় একজন সূক্ষ্ম রাজনীতিবিদ্। আয়র্ল্যাণ্ডের জনসাধারণ তাকে 'দেব' (Dev) বলে অভিহিত করে। এখানেই তাঁহার গুণাগুণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রকার "ডাক নাম" দিয়ে তারা গর্ব্ব অনুভব করে। প্রিয় "ডাকনাম" (nickname) ব্যবহার করার মধ্যে জাতির আন্তরিকতা ও স্নেহমমতা প্রকাশ পায়। ইহা যেন হাজার ভোটের সমতুল্য, "ডাকনাম" যেন একজন প্রতিভাবান রাজনীতিজ্ঞকে আজ জনসাধারণের তরফ থেকে ভোট্‌দান। হিট্‌লার এবং উড্রো উইল্‌সন্ (Woodrow Wilson) কখনও এরূপ ডাকনামে অভিহিত হন নাই। কিন্তু থিওডোর রুজভেল্টকে বলা হয় 'টেডি' বা "টি", আর (Teddy or T. R.), আর মিঃ লয়েড জর্জ্জকে বলা হয় এল্. জি, (L.G,); মুসোলিনি ও কামাল আতাতুর্ককে তাঁদের দেশবাসী তাঁদের কোন ডাক্‌নামে অভিহিত করতে সাহস পায় নাই। কিন্তু সমগ্র আয়র্ল্যাণ্ডবাসীর নিকট ডি ভ্যালেরা 'দেব' (Dev)! কিন্তু তাই ব'লে সকলেই তাঁর সম্মুখে তাঁকে দেব (Dev) বলে সম্বোধন করে না। তাঁর স্ত্রী কেবল তাঁকে দেব ব'লে সম্বোধন করেন। জনসাধারণ তাঁকে যে খ্রীষ্টীয় নামে সম্বোধন ক'রতে ভালবাসে সেই নামেই তাকে সম্বোধন করে। তাঁর বন্ধুমহল ও সহযোগী সকলেই সাধারণতঃ তাঁকে "প্রধান" (chief) ব'লে সম্বোধন করেন। তিনি নিজে কিন্তু তাঁর কর্ম্মচারীদের মন্দ নাম ধ'রেই ডাকেন। তিনি যখন গৃহে অনুপস্থিত থাকেন তখন এই "দেব" (Dev) নামেই তিনি সকলের নিকট হন প্রিয়।

অন্যান্য রাজনীতিবিদ্ যাঁদের মন একটানা কাজের মধ্যে ডুবে' থাকে তাঁদের মত ডি ভ্যালেরাও অজস্র কাজে ব্যস্ত।

সাধারণতঃ ৯-৩০ মিনিট থেকে ১০টার মধ্যে তিনি গভর্ণমেণ্ট বিল্ডিং-এ তাঁর অফিসে যান। নিয়মানুসারে প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীগণের দপ্তর তিনি নিজে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে থাকেন। সকল রকম খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলির দিকেও তিনি নজর রাখেন। তিনি দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের জন্য গৃহে যান ও কিছুক্ষণ পরে আবার অফিসে ফিরে এসে কাজে মনঃসংযোগ করেন। ছ'টা পর্য্যন্ত কাজ ক'রে চা পানের জন্য বাড়ী যান। তিনি সময় সময় রাত্রিতেও অফিসে কাজে আসেন। কোন লোক গভর্ণমেণ্ট বিল্ডিং-এর সম্মুখপথ অতিক্রম ক'রবার সময় ঐদিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে, মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্টের ঘরে আলো জ্বলছে। রাত্রি-ভোজনের রুটী ও মাখন তাঁর সঙ্গেই থাকে। অসুস্থ না হ'লে তিনি কখনও ছুটি উপভোগ করেন না।

ডি ভ্যালেরা যৌবনে সুদক্ষ খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি ভাল ঘোড়সোয়ার। এখনও তিনি অশ্বারোহণে বিশেষ আনন্দ পান। প্রতি রবিবার ডাবলিন্ থেকে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী পর্ব্বতসঙ্কুল সঙ্কীর্ণ পথে তাঁকে ভ্রমণ ক'রতে দেখা যায়। তাঁর মোটর গাড়ীতে ডিটেক্‌টিভ্ পুলিশ থাকে আর গাড়ী চলে ধীরে ধীরে, তিনি সেই মোটরের পশ্চাতে হেঁটে চলেন। তিনি কালো পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন, মাথায় টুপী পরেন না। তিনি এত দ্রুতগতিতে ভ্রমণ করেন যে তাঁর পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজন তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে অক্ষম হ'য়ে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন। অন্যান্য ডিটেক্‌টিভ্, পুলিশ বাছাই বাছাই দলের কতিপয় সদস্য তাঁর অনুসরণ ক'রে থাকেন।

তিনি কখনও মাদক দ্রব্য স্পর্শ করেন না। এসব তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখেন। মদ্যপানকে তিনি তাঁর দেশের পক্ষে অভিশাপ ব'লে গণ্য করেন। তিনি ধূমপানে অনভ্যস্ত। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি অল্প অল্প ধূমপান ক'রতেন।

শারীরিক পরিশ্রম ছাড়াও তাঁর অপর একটি খেয়াল আছে, রেডিও শোনা। সকলের চেয়ে বড় খেয়াল তাঁর অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে মাথা ঘামান। চোখ যতক্ষণ না ঝলসে যেত ততক্ষণ তিনি বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলতেন না। তিনি বিশেষভাবে সেক্সপীয়র ও গেলিক লেখকদের বই (Gaelic Writers) প'ড়তে ভালবাসেন। তিনি শুদ্ধ আইরিশ ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারেন। অঙ্কশাস্ত্রে মস্তিষ্ক চালনায় তিনি পান সবচেয়ে বেশী আনন্দ। একদা তিনি যখন রোমে গিয়েছিলেন তখন তাঁর সেক্রেটারীকে কোয়ার্টারনারি থিওরেম (quarternary Theorem) সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করেন। সেক্রেটারী প্রত্যুত্তরে বলেন, "কিছুই না"—আরও বলেন, তিনি শুধু সাধারণ অঙ্কই জানেন। সে দিনটিতে খুব গরম প'ড়েছিল; তাঁর দলের সকলেই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে অথচ "দেব" (Dev) পুরো বার ঘণ্টা ধরে তার সেক্রেটারীকে কোয়ার্টারনারি থিয়োরেম সম্বন্ধে বুঝাতে লাগলেন। অতঃপর সেক্রেটারী বলেন, এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বার ঘণ্টা বক্তৃতা তিনি জীবনে কখনও শোনেন নাই। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে ব'সে ডি ভ্যালেরা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এ বিষয়ে তাঁর ব্যুৎপত্তি প্রগাঢ়।

তাঁর স্ত্রী ছিলেন শিক্ষয়িত্রী। ডি ভ্যালেরা যখন আইরিশ ভাষা শিক্ষালাভ ক'রছিলেন তখন গেইলিক লীগ-এর (Gaelic League), সিনিড্ ফ্ল্যানাগেইন (Sinead Fhlaunagain or Jennie O' Flanagan) সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। একটা প্রবাদ আছে যে ডি ভ্যালেরা গেইলিকে সিভিল সার্ভিস (civil service) পরীক্ষায় সফল হ'তে পারেন নাই। এ বিষয়টি প্রচার না হ'তে পারে, কিন্তু যে মহিলাটি তাঁকে শিক্ষা দিতেন ঘটনাচক্রে তাঁর সঙ্গেই তাঁর বিবাহ হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁদের এই বিবাহ হয়। তাঁদের সাতটি সন্তান। ব্রিয়ান (Brian) নামে ছেলেটির ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ডাবলিন সহরের ফোনিক্স পার্কে (Phoenix park) ঘোড়দৌড়ে মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠপুত্র ভিভিয়ান (Vivian) বিজ্ঞানের শেষ ডিগ্রী নিয়ে ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ইনি জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর গেজেটেড্ লেফ্‌টেনাণ্টের পদে নিযুক্ত আছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা ন্যাশানাল ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট। ছোট ছেলে-মেয়েরা এখনও প'ড়ছে।

ডি ভ্যালেরার স্ত্রী ছিলেন অপূর্ব্ব সুন্দরী,—এখন তাঁর মাথার সোনালী রং-এর চুলে পাক ধ'রেছে। স্বামীর মতই তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা। আফিসের সামান্য কাজকর্ম্ম ব্যতীত এই পরিবারের সামাজিক জীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। ডি ভ্যালেরার প্রেসিডেণ্ট হবার আগে তাঁর স্ত্রীর মনে এই ধারণা ছিল যে, তাঁর স্বামীর কাজে উৎসাহ বাড়াবার জন্য অফিসে বসবার অনুমতি গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে তিনি পাবেন। ডি ভ্যালেরা ব্লাক রক (Black rock) অঞ্চলে ক্রস এভিনিউতে সাদাসিধা ধরণের একটি বাড়ীতে বাস করেন। তাদের শুধু একটি চাকর ও একটি ঝি আছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাদের বাড়ীতে কোন ঝি-চাকর ছিল না, সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম তার স্ত্রী স্বহস্তে ক'রতেন। তখন তাঁদের গৃহটিও ছিল খুব ছোট্ট। তাঁরা অতিথি সেবা ক'রতেন ভোজনগৃহে। মিসেস্ ডি ভ্যালেরার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। তাদের ছেলেমেয়েরা খুব চতুর এবং ব্লাক রকে তারা সুপরিচিত। রাজনৈতিক মতবিরোধী ব্যক্তিরাও এই পরিবারকে ভোজনানুষ্ঠানে সাদরে নিমন্ত্রণ ক'রতেন। কিন্তু মিসেস্ ডি ভ্যালেরা তাঁর ছেলেমেয়েরা খুব ব্যস্ত এই অজুহাত দেখিয়ে এ'সব নিমন্ত্রণ বরাবরই এড়িয়ে চ'লেছেন।

প্রেসিডেণ্ট ডি ভ্যালেরা একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্। তিনি বহু রাজনীতিজ্ঞকে আমন্ত্রণ করেন। তাঁর অসংখ্যক বন্ধু আছে। তাঁর একজন বন্ধুর নাম ফারমান (Farman)। ইনি ধনী কৃষক ডাক্তার। ডি ভ্যালেরা কখনও কখনও প্রত্যুষে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ও দু'জনে মিলে ভ্রমণে বের হন। আর একজন আছেন তার সেক্রেটারী ক্যাথ্লিন ও'কনেল (Kathleen O'Connel)। ইনি প্রেসিডেণ্টের সান্নিধ্যে প্রায় ২০ বৎসর আছেন। ইনি তাঁর কর্ম্মের ধারা ও মনের ভাব সব কিছুই জানেন। মেয়েটির দৃষ্টি ডি ভ্যালেরার দিকে খুব বেশী কিন্তু তিনি সেদিকে দৃক্‌পাত করেন না। কোন সভা-সমিতিতে বা কোন অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিত হবার কথা থাক্‌লে মেয়েরা তার অনুসরণ করে, তিনি অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত মৃদু হাসেন। কখনই তিনি তাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করেন না, অথচ তা'দের দূরে সরিয়ে রাখবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর মধ্যে দেখা যায়।

তাঁর ধনলিপ্সা আদৌ নাই। তিনি যখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন ২,৫০০ পাউণ্ড কমিয়ে ১,৫০০ পাউণ্ড তাঁর মাইনে ধার্য্য করেন। অর্থ উপার্জ্জনের অন্য কোন সংস্থান তাঁর ছিল না। তাঁর ব্যয়-বাহুল্যের উৎকট খেয়াল ও জাঁকজমকের নেশা নাই। তিনি সঙ্গীতপ্রিয়। তাঁর শিল্পকলায় বড় একটা মতামত ছিল না। গ্রাফিক শিল্পকলায়ও (Graphic art) তিনি তেমন উৎসাহী ছিলেন না। তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্মের অনুরাগী কিন্তু কোন কিছুতেই তাঁর গোঁড়ামী নাই। তাঁর বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে অধিকাংশই প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। তিনি জীবনে ভগবানের প্রার্থনা থেকে বিচ্যুত হন নাই।

তিনি রসজ্ঞ ব্যক্তি বটে, কিন্তু রসসৃষ্টিতে তেমন ওস্তাদ নন। তিনি ঠাট্টা চাতুরী বড় একটা কাহারও সহিত করেন না। কিন্তু কমিক খুব পছন্দ করেন এবং এতে তিনি এত আনন্দ পান যে, সময় সময় হো-হো ক'রে মনের সুখে হাসেন। একদা তিনি ইনিসে (Ennis) বক্তৃতার মাঝে গোয়েন্দা কর্ত্তৃক ধৃত হন। এক বৎসর পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্ত হ'বার পর তিনি বরাবর ইনিসে চ'লে যান এবং সেখানে পুনরায় বক্তৃতা করা আরম্ভ করেন। বক্তৃতার প্রথমেই তিনি বলেন,—"আমি যখন বক্তৃতা ক'রেছিলাম তখন আমাকে বক্তৃতার মাঝে বাধা দিয়ে, ধৃত করা হয়।" (—As I was saying, when I was interrupted).

আত্মসংযম তাঁর জীবনের মস্ত বড় সম্পদ। খেয়ালের বশবর্ত্তীতে তিনি তাঁর দেশের প্রতি কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন নাই। এজন্য আয়র্লণ্ডবাসীর তাঁর উপর অসাধারণ আস্থা। তিনি চিন্তা ও যুক্তির দ্বারা যা' ভাল বিবেচনা করেন, তা' ফলপ্রসূ করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এটা তার বিশেষত্ব। মনুষ্যোচিত ব্যবহার থেকে কেহই তাঁর নিকট বঞ্চিত হয় না। অনেকে বলেন তিনি জীবনে মাত্র একবার জনমণ্ডলীর সম্মুখে ক্রোধান্বিত হ'য়েছেন। আইরিশ প্রেস বণ্ড (Irish Press Bond) নিয়ে বিতর্কে

এই ঘটনা ঘটে। ভাবপ্রবণতা তার নেই বল্লে অত্যুক্তি হয় না। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ৭টি ভোটে যখন সন্ধি অনুমোদন করা হয়, তখন তিনি দাঁড়িয়ে বলেন,—"গত চারি বৎসর আমরা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে কাজ ক'রেছি"—তারপর হঠাৎ তাঁর বাক্‌রুদ্ধ হয় এবং তিনি তাঁর আসন গ্রহণ ক'রে দুই হাতে তাঁর মুখ চেপে ধরেন। তাঁর পুত্র ব্রিয়ান তাঁর অত্যন্ত প্রিয়-পাত্র ছিল। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুর ঠিক পরেই তিনি পার্টির সভায় উপস্থিত হ'য়েছিলেন। এই মৃত্যুই হ'য়েছিল তাঁর দুঃখের কারণ। তিনি কোন খেলার মাঠে গেলে বিষণ্ণ মনে ব'সে থাকতেন। গাম্ভীর্য্যের সহিত তিনি পথ চ'ল্‌তেন। মনে হ'ত তিনি জনতাকে এড়িয়ে চলছেন।

... ...

ইমন্ ডি ভ্যালেরা দু'বৎসর বয়সে আয়র্লণ্ডে পদার্পণ করেন। নিউইয়র্কে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তারপর তাঁকে আয়র্লণ্ডে তাঁর মাতুলের তত্ত্বাবধানে পাঠান হয়। ব্রুরির (Bruree) নিকটস্থ লিমারিকে (Limarick) তাঁর দিদিমার বাড়ীতে তিনি অবস্থান করতেন। তখন তাঁর মাতা আমেরিকায় ছিলেন। তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। এই শিশু বয়সে মাতা ও পুত্রের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক ছিল তা' কেহ ঠিক ক'রে বলতে পারে না। তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন ও মেধাবী ছাত্র হিসাবে জলপানি পান। অঙ্কশাস্ত্রে কৃতিত্বের জন্যই তাঁর এই সম্মান। এক সময় তাঁর জেস্যুইট (Jesuit) কলেজে ভর্ত্তি হ'বার কথা হ'য়েছিল। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তিনি ডাব্‌লিনের নিকটবর্ত্তী ব্লাক্ রক্ কলেজে (Black Rock College) ভর্ত্তি হন। তাঁর ছেলেমেয়েরা এই কলেজে শিক্ষা লাভ করে। তিনি রয়াল ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। তিনি আইরিশ ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিছুদিন শিক্ষকতাও ক'রেছিলেন। তাঁর দৃষ্টি যখন দেশের পরাধীনতার প্রতি প'ড়লো, তখন তিনি যোগ দিলেন বিপ্লবী দলে।

পরাধীনতার গ্লানি তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রতেন। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা তাঁর নিজের ব'লে বুঝতে পারেন। তাঁর চরিত্র ছিল কঠোর। যৌবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংঘাত এবং ধর্ম্মে গভীর বিশ্বাস তাঁর মনে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার উগ্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিল। এই কারণে তিনি তাঁর জীবন দেশের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন।

ডি ভ্যালেরা রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভকাল থেকেই উগ্রপন্থী ছিলেন। তিনি পিয়ার্স (Pearce), ম্যাকডোনায় (Macdonough), ম্যাক-ডারমট (Mac-Dermott), এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ইষ্টার আইরিশ রিপাব্লিকের অন্যান্য ঘোষণায় যোগদান যে ক'রবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। ইহা ছিল তাঁর উদ্দাম সাহসিকতা। ইহা খুব সম্ভব সফল হ'তে পারে নাই, বরং আত্মহত্যারই সামিল হ'য়ে প'ড়েছিল। তখন চিন্তাশীল ধীরমস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই এই কথা বলতে বাধ্য হ'য়েছিল। ডি ভ্যালেরার এ সমস্ত পরিকল্পনা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক ছিল। সামরিক দমননীতি চালিয়ে এই বিদ্রোহ দু-সপ্তাহের মধ্যে পর্য্যুদস্ত করা হয়। ডি ভ্যালেরা ছাড়া এই বিদ্রোহের অন্য সকলকে মৃত্যুদণ্ডে ও গুলির আঘাতে মারা হ'য়েছে। কিন্তু ইষ্টার বিদ্রোহ নিষ্ফল হয় নি বরং ফলপ্রসূই হয়েছে। ডি ভ্যালেরার মনে এই বিদ্রোহের অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। এই অগ্নি থেকে দেশে রক্তপাতের সূচনা হয়। কয়েক বৎসর রক্ত আন্দোলনের পর আয়র্লণ্ড স্বাধীন হয় এবং ডি ভ্যালেরা সেই স্বাধীন রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হন।

ডি ভ্যালেরা হ'লেন প্রকৃত:সামরিক কর্ম্মকর্ত্তা। ... সহযোগী বন্ধুরা ডাবলিনের নিকটবর্ত্তী বোলাণ্ডস্ মিলস্ (Bolands Mills) নামে কোন অঞ্চলে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই অঞ্চলের গুরুত্ব খুব বেশী ছিল, কারণ সমুদ্র থেকে এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশদের ডাবলিনে প্রবেশ ক'রতে হয়। বোলাণ্ডস্ মিলস্ অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ সৈন্যদের কামানের গোলায় ধ্বংস করা হ'য়েছিল। ডি ভ্যালেরার সৈন্যদল সমরনীতিতে বিশারদ ছিল, সৈন্যচালনায় এই আইরিশ সেনার কৃতিত্ব অসাধারণ। ব্রিটিশ সৈন্যরা অতি সহজেই তা উপলব্ধি ক'রতে পারে। ডি ভ্যালেরার সংগ্রাম-নীতির একটা মস্ত চাল ছিল, তিনি যে স্থানে আইরিশ পতাকা উত্তোলন ক'রতেন সে স্থানে বেশী সংখ্যায় সৈন্য ও কামান সমাবেশ ক'রতেন না। ইহাতে ব্রিটিশেরা ডি ভ্যালেরার সৈন্যদলের আসল ঘাঁটি সম্বন্ধে

সন্দিহান হ'য়ে পড়ত ও দারুণ সমস্যা ঘটত। ডাবলিনে যখন যুদ্ধ হয় তখনও ডি ভ্যালেরা নিজেকে ধরা দেওয়ায় অনিচ্ছুক ছিলেন। ডাবলিন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'ল। ধৃত হ'বার জন্য তিনি বোলাণ্ড্স্ মিল্স্ থেকে এই কথা বলতে বলতে বের হ'য়ে এলেন,—"তোমরা আমায় গুলি কর—"—"আমার সহযোগীদের বেঁচে থাকতে দেও।"

সামরিক ট্রাইবিউনাল কর্তৃক তাঁর মৃত্যু-দণ্ড হয়। কিন্তু যখন আমেরিকায় তাঁর জন্ম একথা প্রচারিত হয় তখন তাঁর মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করে যাবজ্জীবন কারাবাস দেওয়া হয়। এই সময় এই যুদ্ধে আমেরিকার মিত্র পক্ষের সঙ্গে যোগ দেবার সম্ভাবনা ছিল, সুতরাং ব্রিটিশ উদ্‌ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। আইরিশ-আমেরিকান ভোট্ এ যুদ্ধের সমর্থন লাভ করে। ডি ভ্যালেরাকে ১ বৎসর ডার্টমুরে (Dartmoor) রাখা হয়, কারণ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দেবার কথা হয়। এর আগে অন্যান্য প্রায় সকল রিপাব্লিকান নেতাদের সরাসরি গুলিবিদ্ধ করে মারা হয়। ডি ভ্যালেরা সিন্‌ফিন (Sinn Fein) আন্দোলনের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। তিনি ক্লারি (Clare)র জন্য সিন্‌ফিন এম, পি (M,P.) হন। তিনি ওয়েষ্টমিনষ্টারে ব'স্‌বার সুযোগ পান নি; কারণ তাঁকে বহুদিন নির্ব্বাসিত রাখা হ'য়েছিল। পরে তাঁকে লণ্ডনে যাবার অনুমতি দিলেও তিনি তা' উপেক্ষা ক'রতেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি পুনরায় ধৃত হন ও লিনকন্ (Lincoln) জেলে প্রেরিত হন।

কারা-প্রাচীরের অন্তরাল থেকে তিনি পলায়ন করেন। এই পলায়নের মধ্যে একটি গল্প আছে। তা' এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। যা' হোক, একদা সন্ধ্যাকালে দেব (Dev) জেল কর্ত্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে পলায়ন করেন। তাঁর অন্বেষণে সকলেই খুব বেশী তৎপর, এমন সময় তিনি ম্যানচেষ্টারে এসে এক পুরোহিতের ঘরে ফেরারী হ'য়ে লুকিয়ে থাকেন। অতঃপর তিনি লিবারপুলে আসেন এবং বহু দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে আয়র্লণ্ডে পৌছেন। শোনা যায়, তিনি সাধারণ খালাসীর ছদ্মবেশে জাহাজে পুলিশ ও ডিটেক্‌টিভদের চোখে ধূলি দিয়ে লিবারপুল থেকে সমুদ্র পাড়ি দেন। আরও একটি গল্প শুনা যায়, যখন গোয়েন্দা বিভাগ তাঁর অন্বেষণে বিব্রত, তখন তাঁর এক বন্ধু তাঁকে আলুর দোকানে আলুর গাদার নীচে লুকিয়ে রাখেন। গোয়েন্দা বিভাগ অন্বেষণে নিষ্ফল হ'লে জাহাজের চুল্লীর ছদ্মবেশী খালাসী হয়ে তিনি আমেরিকায় পালিয়ে যান। তাঁর নিউইয়র্কে পদার্পণ নয় দিনের বিস্ময়কর ঘটনা। ইউনাইটেড ষ্টেটে তিনি বক্তৃতা করতে সুরু ক'রলেন, আইরিশ জাতির জন্য তিনি অর্থ সংগ্রহ করেন এবং স্বাধীন আয়র্লণ্ডের সর্ব্ববাদিসম্মত নেতা ব'লে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠা ক'রলেন।

তাঁর আয়র্লণ্ডে ফিরে আসার মূলে র'য়েছে প্রচণ্ড সাহসিকতা। তিনি অনেক কৌশলে মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পান। তিনি লিবারপুলে প্রথমতঃ পদার্পণ করেন। এখানে তিনি প্রথমতঃ একটি চলমান ষ্টিমারের অফিসারকে ঘুস দিয়ে তাঁকে আয়র্লণ্ডে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করেন। এ জন্য তিনি ঐ অফিসারকে ১০০ পাউণ্ড ঘুস দেন। এখানে এই অফিসারটি মদ্য পানের জন্য জাহাজযোগে অবতরণ করেন। ইনি ডি ভ্যালেরাকে নিজের কেবিনে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু জাহাজ ছাড়বার সময় হ'লেও অফিসার ফিরে এলেন না। ক্যাপটেন উত্তপ্ত হ'য়ে তাঁর অন্বেষণে তাঁর কেবিনে ঢুকলেন। ডি ভ্যালেরা বুদ্ধি খরচ ক'রে খুব মদ খেয়েছেন এই ভাণ করেন।

ইহা একটি আশঙ্কাজনক শৃঙ্খলাবিহীন ইতিহাস। গোয়েন্দা বিভাগের রক্তপিপাসু দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি যে ভাবে তাঁর জীবন রক্ষা করেন তা' যথার্থই বিস্ময়কর ব্যাপার। ডি ভ্যালেরা অতঃপর দক্ষিণ আয়র্লণ্ড থেকে সিন্‌ফিন আন্দোলনের ডেপুটিদের সহযোগে • ডেইল-আয়রঅ্যানো (Dail Eireano) প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। ডি ভ্যালেরা পল্লীগণ জাতীয় পরিষদ (National Assembly) গঠন করেন। তাঁরা রাজার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে অস্বীকার ক'রে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার পর সিভিল যুদ্ধ (civil war) আরম্ভ

হয়। ব্লাক (Black), ট্যান (Tans) ও আইরিশ (Irish) পরস্পরের ভিতর ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে ও একটা মীমাংসায় সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হয়। এই চুক্তিতে আয়র্লণ্ডকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস (Dominion Status) দেবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এই স্বাধীন রাষ্ট্রকে আলষ্টার (Ulster) থেকে পৃথক রাখা হয়। ডি ভ্যালেরা-পন্থীদের মধ্যে মতান্তর ঘটে। ডি ভ্যালেরা বিশ্বস্ত সদস্যদের (Delegates) লণ্ডনে পাঠালেন এবং তারা সরাসরি এই সন্ধিপত্র অস্বীকার ক'রে বসেন। তিনি অধিক দাবী করেন ও চুক্তিপত্রের ঘোরতর বিরোধিতা করেন। এতে আবার দেশে অশান্তি দেখা দেয়।

এই যুদ্ধে পরস্পর শ্রান্ত হ'য়ে উঠলে যুদ্ধ আপনা হ'তে থেমে যায়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গুলিচালনা ও রক্তপাত বন্ধ হয়। ডি ভ্যালেরার দল এখন সংখ্যালঘিষ্ঠ হ'লেও লয়েড জর্জ্জ যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে এই সন্ধিপত্র জবরদস্তি ক'রে আয়র্লণ্ড-বাসীর উপর চাপিয়ে দেন তাঁর দল থেকে এই অজুহাত দেখান হয়। এ জন্য মেম্বারগণ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের (British Commonwealth)-এর ভিত্তিতে আয়র্লণ্ড গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে এক নাগরিক সূত্রে আবদ্ধ হ'তে যত দিন না রাজার নিকট শপথ গ্রহণ করেন তত দিন পর্য্যন্ত তিনি ডেইলের প্রেসিডেণ্টের পদ অস্বীকার করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কস্‌গ্রেভ (Cosgrave) গভর্ণমেণ্ট একটি বিল পাশ করে, সেই বিলের মর্ম্ম হ'ল, ডেইলে যারা মনোনীত হবেন তাঁরা তাঁদের আসন গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে। এই কারণে ডি ভ্যালেরা এবং তাঁর ৪৩ জন সহকর্ম্মী ডেইলে এলেন। এই নূতন নির্ব্বাচন-প্রতিযোগিতায় ডি ভ্যালেরার শক্তি বেড়ে ৫৭ জনে দাঁড়ায়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে লেবার পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখায় ডি ভ্যালেরার দল শক্তিশালী হয়। তখন কস্‌গ্রেভকে (Cosgrave) প্রেসিডেণ্টের পদ থেকে উৎখাত করেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অধিকাংশ লোকের সমর্থন লাভ করেন এবং তখন থেকেই ক্ষমতা তাঁর হাতে আসে।

* * *

ডি ভ্যালেরার অফিস ঘর ছোট্ট ধরণের। জানালার উপরে কালো কালিতে "প্রেসিডেণ্ট" এই শব্দটি লেখা আছে। ঘরটির ভিতরে জাকজমকের লেশ নেই।

ছবিতে ডি ভ্যালেরাকে দানবের মত মনে হয়, কিন্তু সত্যিকার মানুষটিকে অতটা দেখায় না। তাঁর নাকটি খুব লম্বা এবং গালে লম্বা লম্বা থাক পড়ে। বয়স অনুপাতে তাকে যুবক বলে মনে হয়। তিনি অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী ও উৎসাহপ্রিয়।

বুদ্ধি, কর্ম্মপ্রেরণা, কর্ম্মশক্তি এ সব বাদেও তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ এই যে, তিনি জনসাধারণের সুখদুঃখকে নিজের ব'লে গণ্য করেন। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগের জন্যই দেশবাসী তাঁকে এত শ্রদ্ধা করে। সিনেট থেকে যখন তিনি অপসারিত হন, তখন মনে হয় তাঁর ডিক্টেটরী মনোবৃত্তি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি একজন পুরা গণতন্ত্রী। জনসাধারণের প্রতি তাঁর আস্থা আছে, জনসাধারণেরও তাঁর উপর বিশ্বাস অদম্য। কিছু দিন আগে তিনি ব'লেছিলেন যে, আয়র্লণ্ডের জন্য আর তাঁকে অস্ত্র ধারণ ক'রতে হবে না। কিন্তু যদি অস্ত্র ধারণ ক'রতেই হয় তবে গণতন্ত্রের জন্য অস্ত্র ধারণ করে জীবন পাত ক'রবেন। জনসাধারণের সততা ও যথার্থতায় তাঁর গভীর বিশ্বাস আছে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে নীল কোর্ত্তা (Blue Shirt, i e Fascist) আন্দোলন তড়িৎবেগে দমন করে। কারণ তিনি এটুকু বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে তার ভাল লোকগুলি বিপথে চালিত হ'তে পারে, এবং তা হ'লে গণতন্ত্র রক্ষা করা মুস্কিল হ'য়ে পড়বে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে সহরে খাজনা ও কর আন্দোলন আরম্ভ হয়। ডি ভ্যালেরার কয়েক জন বন্ধু এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার জন্য আবেদন জানায়। এই সকল আন্দোলনকারীরা পথিপার্শ্বের বৃক্ষ ও টেলিগ্রাফের তার কাটায় লিপ্ত ছিল। ডি ভ্যালেরা বললেন,—"না"—এরা যা খুসি করুক,—যারা এ কাজ করছে তারা নিজেরাই এটা বন্ধ করবে।"

ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা তাঁর নেই। আইরিশ জনসাধারণের আত্মসংকল্প ও ঐক্য, এই ছিল তাঁর কাম্য। একদা তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি কি চান, প্রত্যুত্তরে তিনি ব'লেছিলেন, "আমি কি চাই,

এটা একটা প্রশ্নই নয়,—প্রশ্ন হ'ল আইরিশবাসী কি চায়।"

ডেইল (Dail) রাজার নিকট শপথ গ্রহণ রহিত করেন। গভর্ণর-জেনারেলের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া হয়। প্রিভিকাউন্সিলে আইরিশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল (Appeal) অস্বীকার করা হয় এবং জমির খাজনা বন্ধ করা হয়। প্রতি বৎসর এই খাজনার পরিমাণ ছিল আনুমানিক ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড। আইরিশ মালপত্রের উপর ট্যারিফ ডিউটি (Tariff) কমিয়ে দেবার পর থেকে বিশেষ ক'রে গরু, দুধ ও মাখন ব্রিটেনে চালান দেওয়া হয়। আইরিশ রপ্তানী ব্যবসার মধ্যে এই হ'ল প্রধান।

তারপর অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়, এর জের অনেক দিন চলে। তার ফলে আইরিশ আর্থিক জীবনের গতি ঘুরে যায়। ডি ভ্যালেরা আমদানীর (Import) পরিমাণ বহুল পরিমাণে কমিয়ে দিয়ে, চিনির ফ্যাক্টরী, গমের চাষের ব্যবস্থা এবং অতিরিক্ত যে গরু আছে তা নিধন ক'রে চামড়া ও খাদ্যশিল্পের (Leather & Meatmeal Industry) প্রবর্ত্তন করেন। ইহা একটি বড় রকমের প্রচেষ্টা এবং ব্যয়-বহুল।

ডি ভ্যালেরার জীবনের উদ্দেশ্য ও মনোভাব এক,—ঐক্য ও স্বাধীন আয়র্ল্যাণ্ড। তিনি আরও দুটো জিনিস চান, শান্তি ও সময় (peace and time)।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়। জুলাই মাসে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে ডি ভ্যালেরা পুনরায় একজিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের পদে নিযুক্ত হন। তিনি এখন আয়র্লণ্ডের ভাগ্যনিয়ন্তা।

শান্তিময়ী

ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, এম্-বি

আজি মোর বিস্ময়ের নাহি তল, নাহি কোন সীমা
তোমারে হেরিয়া দেবি! শরতের সুস্বচ্ছ মহিমা
জাগে তব তনুশ্রীতে। অপ্রমত্ত প্রশান্ত হিল্লোলে
শ্যাম-শস্প-মধ্যবাহী তটিনীর মৃদু কলরোলে
দীপ্তি তব হারাল উচ্ছ্বাস! হে শোভনে, আজিকার
চন্দ্রোৎসবে নাই ব্যথা, নাই ক্ষোভ, অতৃপ্ত আত্মার
নাই কোন সুগোপন দাহ। শুধু ঊর্মিল বাসনা
ফিরিছে কল্লোল গানে, শান্ত করি যত উদ্দীপনা
সুমধুর আবেগ-প্রবাহে। স্বপ্নস্তব্ধ জ্যোতির্মালা
অনন্ত আকাশপটে দুলাইল স্নিগ্ধ দীপ-জ্বালা!
জ্বলুক সে দীপ্তি প্রিয়, ভেদি সারা অন্তর আমার
মরমের কেন্দ্রস্থলে—শান্ত হোক্ কামনার দাহ!
উত্তরিয়া ঝঞ্ঝামত্ত দুনিরীক্ষ্য বিক্ষুব্ধ পাথার
শরৎ-প্রশান্তি লয়ে বহে যাক্ জীবন-প্রবাহ।

সন্তান

(গল্প)

শ্রীভবেশচন্দ্র দত্ত

বেলা তখন প্রায় দুটো। রোগী দেখে এসে খেতে বসেছি। এমন সময় ও বাড়ীর কেতোর চীৎকার কানে ভেসে আসতে লাগল, "ওরে বাবারে মারা গেলাম, ও কাকাবাবু, ও কাকীমা তোমরা কোথায় আছো আমাকে যে মেরে ফেললে গো।"

অমুলাকে বললাম—অমু, যাও না একটু দেখে এসো—ছেলেটাকে মেরে ফেলবে নাকি!

অমুলা অবজ্ঞার সুরে বললে—না বাপু, ও ছেলেটাই এই রকম, রোজ রোজ মার খায় তবু লজ্জা হয় না।

— তবুও এক বার যাওয়া উচিত।

অমুলা উঠে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম, ওর মারই বা দোষ কি—আট-আটটা ছেলেমেয়ে, একটাও যদি একটু ভালো হয়। জ্বালাতন না হয়ে আর করে কি! এমন সময় অমুলা ক্রন্দনরত কেতোকে ধরে নিয়ে এল।

কেতোর হাতে একটা পাকা আম দিয়ে বলল—হ্যাঁ রে কেতো, তোর আর বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না?

কেতো কান্না ভুলে গিয়ে বলল—মা কেন বারে বারে মারবে আমাকে?

"না মারবে না, তোমাকে ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুজো করবে—ঝাঁটা মেরে বিদেয় করব লক্ষ্মীছাড়া ছেলে", বলতে বলতে কেতোর মা তার গালে সজোরে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

কেতো এবার আর কাঁদল না। ফোঁপাতে ফোঁপাতে আমের আঁটি চাটতে লাগল!

কেতো পাশের বাড়ীর বাদলবাবুর ষষ্ঠ সন্তান, ওর মত ছেলে বোধ হয় এ পাড়ায় আর একটাও নেই। মার খাওয়া ওর একটা ধরাবাঁধা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাদলবাবুই বা কি করবেন! সংসারে অতগুলো ছেলে-মেয়ে। ভদ্রলোক একেবারে বিপর্য্যস্ত—বড়মেয়ে মাস্তুর বিয়েতে গত বছর সব নিঃশেষ হয়ে গেছে—আবার মেজমেয়ে সোনা এই চৌদ্দয় পড়েছে—সেজো মেয়ে বারো পার হ'তে চলল। মানুষ তো, কত ভেবে পারে।

অমুলাকে বলি—আমরা বেশ আছি কি বলো; না আছে ছেলে, না আছে মেয়ে।

অমুলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে—হ্যাঁ বেশ আছি।

কেতোর মা বলতে বলতে বাড়ীর মধ্যে আসে—"কি জ্বালাতনেই যে পড়েছি—হাড়মাস জ্বালিয়ে খেলো। নতুন হ্যারিকেনের চিমনিটা আজ এনেছে আর মেজো মেয়ে আমার কেলো ভূত সোনা সেটাকে ভাঙলেন। আহা রূপ নেই গুণ নেই কেবল গিলতে দাও গিলবে'খন। একটা মরেও না তো।"

আপন মনে বলতে বলতে কেতোর মা চলে যায়।

অমুলাকে বলি—দেখলে তো।

'হুঃ' বলে অন্য কাজে অমুলা চলে যায়।

আমিও নিজের কাজে যাই।

রোগী আসে।

ওষুধ দিতে আরম্ভ করি। একজন বলে—ডাক্তারবাবু ওষুধের দামটাম একটু কমিয়ে না নিলে তো আর চালাতে পারি না, পাঁচ-ছটা ছেলেমেয়ে, নিজে সামান্য টাকা রোজগার করি—কি ক'রে চালাই বলুন তো।

—আর কত কম করি বাপু।

লোকটি আপন মনে বলে—যত ছেলেমেয়ে কি এই গরীবের ঘরে, যাদের খাওয়াবার সংস্থান আছে তাদের ঘরে যাবে না—গরীবের ক্ষুদ-কুঁড়োর ওপর এত লোভ।

ওষুধ তৈরী ক'রে তার হাতে দি!

লোকটি বলে—খোকাকে কেমন দেখলেন, কোন ভয়ের

কারণ নেই তো। কাল সারারাত ছেলেটার জ্বালায় ঘুমুতে পারি নি। লোকটি চলে যায়।

"ডাক্তারবাবু"

"কে ?"

বাইরে এসে দেখি দুই নং মিলের বড়বাবু দাঁড়িয়ে আছেন। হেসে বলি—ব্যাপার কি বিনয়বাবু ?

বিনয়বাবু মুখখানাকে বিকৃত ক'রে বলেন—আর বলেন কেন, গিন্নীর কোলে নতুন অতিথি আসার আয়োজন হয়েছে, চলুন আর দেরী করবেন না !

হেসে উত্তর করি—চলুন !

বিনয়বাবু বলতে থাকেন—এই আর ফাগুনে বড় মেয়ের দিলাম, এর মধ্যে শুনলাম তারও নাকি—

বলেই থেমে গেলেন।

আমি বলি—বেশ তো।

বিনয়বাবুর বাড়ী পৌছাতেই শুনলাম বিনয়বাবুর একটি মেয়ে হয়েছে। ভেতরে গিয়ে দেখলাম বিনয়বাবুর স্ত্রীকে।

বাইরে আসতেই বিনয়বাবু একগাল হেসে বললেন—কেমন দেখলেন, মেয়ে ভালো আছে তো।

"হ্যাঁ"

"বাঁচলাম, যে ভাবনাই হয়েছিল—হ্যাঁ মেয়ে সুন্দর হয়েছে তো বুঝতেই পারছেন আজকালকার ছেলেরা আবার কালো মেয়ে পছন্দ করে না—হেঃ হেঃ হেঃ।"

বিনয়বাবু হাসতে লাগলেন।

বাড়ী এসে দেখি বাদলবাবু চেঁচামেচি সুরু কোরে দিয়েছেন। অমলাকে বলি—ব্যাপার কি ?

—চিরন্তনী !

—তার মানে—

—আজ ঐ সোনাটা বুঝি ওর বাবার পানের ডিবে থেকে দোক্তা, নিয়ে খেয়েছে, তাই ওর বাবা দেখতে পেয়ে সোনার পিঠে ডিবে ছুঁড়ে মেরেছে।

—বলো কি ?

হ্যাঁ, সত্যিই অতবড় মেয়েকে মারা ঠিক হয় নি, আজ বাদে কাল যে যাবে পরের ঘরে ঘর কোরতে তাকে অমনি করে মারা মোটেই উচিত হয় নি।

বাদলবাবু চীৎকার কোরতে কোরতে এলেন—ডাক্তারবাবু দেখুন তো কি সব ব্যাপার—ঐটুকু মেয়ে এখন থেকে দোক্তা খেতে শিখেছে আর ক'দিন বাদে ঐ কেতোটা বিড়ি খেতে শিখবে, তা হলেই আমাকে একেবারে স্বর্গে পৌছে দেবে। বুঝলেন—ইচ্ছে করে ঘর-সংসার ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথায় চলে যাই—হয় ওরা এক একটা মরুক না হয় আমাকে মেরে ফেলুক। আর সহ্য হয় না। বাদলবাবু চলে যান।

অমলাকে বলি—বুঝেছো ব্যাপার কি গুরুতর—উঃ একেবারে নাস্তানাবুদ।

"ডাক্তারবাবু"

বাইরে গিয়ে দেখি সেই লোকটি।

লোকটি আমাকে দেখে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো—বাবু ওষুধটুকুও দিতে পারলাম না—বাড়ী গিয়ে দেখি সব শেষ। গরীবের ক্ষুদ-কুঁড়ো তার পেটে সইল না—তাই চলে গেলো। বাবু আমার কলজে ভেঙে দিয়ে গেছে সে।

লোকটি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

কত ফোঁটা চোখের জল তার পড়েছিল তা গুনি নি, তবে দেখেছিলাম সন্তানহারা পিতার ব্যথা কি জিনিষ। এমন সময় বিনয়বাবু হাসতে হাসতে এলেন ডিস্পেনসারীতে। বললেন—ডাক্তারবাবু, মেয়ের মার জন্যে আর কিছু ওষুধ কিনতে হবে নাকি ?

—না আর দরকার নেই, ওতেই চলবে।

—আচ্ছা ! হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, দেখলাম মেয়ে সত্যিই সুন্দরী হয়েছে—বড় হ'লে মেয়ে আমার রাজকন্তের মতই হবে বোধ হয়।

তিনি চলে গেলেন।

'কল' বড় একটা সেদিন ছিল না। বাড়ীতেই একটু-আধটু পড়াশুনা করছি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

ও বাড়ীতে কেতোর কান্না শুনতে পেলাম, বাদলবাবু তাকে ক্রমাগত মারছেন আর বলছেন—তোকে আজ মেরেই ফেলবো, বল সেই দুপুর থেকে এতক্ষণ কোথায় ছিলি—বল ?

কেতো শুধু চীৎকার করছে আর বলছে—আর মেরো না,—

বই বন্ধ করে তাড়াতাড়ি ওদের বাড়ীতে একবার যেতেই হলো।

বাদলবাবু একটা সরু লাঠি দিয়ে অবিরাম মেরে চলেছেন।

তার হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে বলি—কি কোরছেন, ছেলে যে মরে গেলো।

—মরুক—না মরলে শাস্তি নেই।

আমি কেতোকে তার মার কোলে দিয়ে বাড়ী আসি।

রাত্রি তখন বারোটা হবে। এবার শোব মনে করে বই বন্ধ করে উঠেছি।

এমন সময়ে কে যেন এসে দোরে ঘা দিল।

"কে"

"আমি, বাদলবাবু"

দোর খুলে দেখি বাদলবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

"কি হোল বাদলবাবু"

"একটু আসুন ডাক্তারবাবু—কেতোর ভয়ানক জ্বর—অজ্ঞানের মত পড়ে আছে।

শুতে যাওয়া আর হলো না।

কেতোর সমস্ত শরীর লাল হ'য়ে ফুলে উঠেছে।

বাদলবাবু চীৎকার করে কেঁদে উঠেন—ডাক্তারবাবু, কোন ভয় নে তো বলুন, শীগ্‌গির বলুন—ঐ দেখুন কেমন করছে—ওকে তাড়াতাড়ি ওষুধ দিয়ে ভাল কোরে দিন—ওর যে একটু কিছু হ'লে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি নে।

বাদলবাবু ছোট ছেলের মত কাঁদতে থাকেন।

আমি বলি—না বাদলবাবু—কিছু ভয় নেই।

"ভয় নেই, বাঁচলাম" বলে বাদলবাবু কেতোর গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন।

আমি ঘরে এসে দেখি অমুলা অঘোরে ঘুমাচ্ছে—কিন্তু ওর কোলের কাছে ওটা কি? একটা মোমের পুতুল না?

অমুলা বোধ হয় স্বপ্ন দেখছে—ওর কোলে আসছে নতুন শিশু—ফুটফুটে রাজপুত্তুরের মত। মা মা বলে যখন অমুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে তখন অমুর যে কি আনন্দ হবে—সে তা কি কোরে বোঝাবে।

মনটা কেমন ক'রে উঠল! যেন একটা অব্যক্ত বেদনা মনটাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

সমস্ত আকাশ বাতাসে আমার প্রার্থনা ঘুরে বেড়ায়—সন্তান! সন্তান!! সন্তান!!!

সামনের গোয়ালে মংলী গাইটার সেদিনকার হওয়া ফুলে বাছুরটা মার বুকে শুয়ে চীৎকার করে ওঠে—হাম্বা, হাম্বা।



অন্ধকারের আফ্রিকা

(ভ্রমণ)

[পূর্ব্বানুবর্ত্তী]

ভূ-পর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

ভ্রমণের পর সাধারণতই আমার বেশ ঘুম হয়। আমার সাথীরা চেয়েছিল আমি ঘুমিয়েই থাকি। আমি ঘুমিয়ে ছিলামও, কিন্তু কয়েক জন লোক একসঙ্গে কথা বলায় জেগে উঠলাম। সোহেলী ভাষা আমি অতি কমই শিখেছিলাম। শুধু শুনলাম, সর্দারজী বলছে "সিংহা, সিংহা"। কথাটা আমি বুঝলাম। আফ্রিকাতে আরব, নিগ্রো সবাই শিখদের ভয় করে চলে। ভয় করে চলার কারণও আছে। শিখরা যদিও মানুষ তবুও দরকার হ'লে সিংহেই পরিণত হয়। তবে এদের সিংহে পরিণত করতে চারণ-গীতের দরকার হয়, মদের দরকার হয় না। আফ্রিকাতে বৃটিশ সরকার প্রথম গুজরাতবাসীদেরই ইমিগ্রেণ্ট হিসেবে নিয়ে যান। অহিংসা ধর্ম্ম তাহারা আজ নূতন করে গ্রহণ করে নি,—বহু পূর্ব্বকাল হতেই এদের মধ্যে অহিংসা ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। মিঃ জিন্না শ্রেণীর লোক এবং হিজ হাইনেস আগা খানের চেলাগণই আফ্রিকাতে প্রথম যায়। তারা তখনও পেছন দিক হতে ছোরা মারা শেখে নি. এখনও এ বিষয়ে একদম অজ্ঞ। তারা আরব এবং নিগ্রোদের বেশ ভয় করেই চলত। নির্য্যাতীত হ'ত আগাখানের চেলারাই বেশি। কারণ জিন্না শ্রেণীর লোক আরবদের বুঝিয়ে দিত যদিও আগা খানীরা মুসলমান, তবুও এরা আগাখানকেই পয়গম্বর বলে মানে। আরবরা এ সবের বেশী ধার ধারত না, তবে ভারতবাসীদের মধ্যে দুটি দল থাকায় অত্যাচার করতে তাদের সুবিধাই হয়েছিল।

কালক্রমে শিখরা গিয়ে আফ্রিকায় হাজির হ'ল। শিখরা দেখলে, আগাখানীদের সঙ্গে তাদের বনে বেশ ভালই। তাই তারা আগাখানীদের সঙ্গেই থাকত এবং আগাখানীরা শিখদের তাদের স্বধর্ম্মের লোক বলেই পরিচয় দিত। এতে আরব এবং নিগ্রোরা ভাবল তবে আর কি, এদের প্রতিও সমান ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই একদিন কথা-প্রসঙ্গে একটা আরব একটি শিখকে চাকু মারতে আসে। শিখটি তাকে চাকু মারার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে নিমেষের মধ্যে তলোয়ার দিয়ে তাকে দ্বিখণ্ডিত করেই তার দলের নিগ্রো এবং আরবদের আক্রমণ করে বসল। ফলে অনেক হতাহত হ'ল। তার পর থেকে শিখদের প্রতি নিগ্রো এবং আরবরা ভাল ব্যবহারই করে আসছে।

এখন শিখরা অনেক সময়ই আরব-সংগ পছন্দ করে—কারণ শিখের জুরিদার যদি আফ্রিকায় কেউ থাকে তবে আরব, সোমালী, অর্ধ আরব, সোহেলীরা নয়। বীর বীরের সংগে বন্ধুত্ব করে, অন্যকে করুণা দেখায় মাত্র। শিখরা আফ্রিকাতে সিংগ সিংগা নামেই পরিচিত।

বার বার 'সিংগা সিংগা' কথাটা শুনেই মনে হ'ল, হয়ত কোন বিপদ ঘটেছে নতুবা জাতের নাম বলা দরকার কি? আমি চুপ করেই থাকলাম, তার পর শুনলাম শিলিং-এর গনাগনি হচ্ছে। বুঝলাম বিপদ কেটে গেছে নতুবা শিলিং আদান-প্রদান হ'ত না। তার পর আর কোন সাড়াশব্দ নেই। আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে সাস্থির পরিবর্ত্তনে ঘুম ভাংগত বটে, কিন্তু পরিশ্রান্ত থাকায় বেড়িয়ে আসতাম না।

রাত যখন চারটা তখন সবাই উঠে বসল। মোটর ঘরঘর্ করে উঠল। আমি উঠে এসে সামনে বসলাম। তখনও রাতের অন্ধকার কাটে নি। মাঝে মাঝে দু-একটা নেকড়ে বাঘ পথ ছেড়ে পালাচ্ছে। খরগোসগুলি ঝুপ-

ঝাপ করে সরে পড়ছে। বন-মোরগ এবং ডুবি শ্রেণীর এক জাতীয় পাখী যার মাংস সুস্বাদু এবং ইউরোপে যার দাম সকল মাংস হ'তে বেশি তারা মোটরের শব্দ শুনে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পালাত। আমি তারকারাজিখচিত সুন্দর আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রভাতের সুমিষ্ট বাতাসে ওদের প্রাণভয়ে উড়ে যেতে দেখে যেন স্বপ্নপুরীতে পাখার সাহায্যে বিচরণ করতাম। ড্রাইভার আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কি দেখচ বাবু এসব মুক্তা নয়, হীরা নয়, খাঁটি আকাশ আর খাঁটি মাটি, এই দেখে ভাববার কি আছে?" আমি কিছুই বলি নি, শুধু চুপ করে নির্জন আফ্রিকার নির্জনতার কথাই ভাবছিলাম।

সকাল হ'ল। গাড়ী থামল। কয়জন নিগ্রো চা তৈরীতে মন দিল—আমি গরম জলে হাত-মুখ ধুয়ে চা পান ক'রে সিগারেট ধরিয়ে নিকটস্থ দৃশ্যাবলীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। এমন সময় সর্দারজী বললে, বাবুজী এবার একটু বেড়িয়ে এস আমরা একটু ঘুমাব। আচ্ছা বেশ, বলে আমি নিকটস্থ পাহাড়ের দিকে চললাম। ভাবলাম এরা রাত্রে কি বেচাকেনা করেছে তা আমাকে দেখাতে চায় না। যাক্ গে আমার এসব জেনেও কি লাভ হবে, পাহাড়-পর্বত আর নির্জন প্রান্তর দেখাই ভাল।

নির্জন বলতে যা বুঝায়, সহরের লোক তা অতি অল্পই বুঝতে সক্ষম হয়। পাতাটি নড়লে তার শব্দও কানে আসে। মাটির নীচ হতে পোকা ডাকলে, বেশ ভাল করেই শুনা যায় কি রকম তার শব্দ হচ্ছে। এরূপ নিস্তব্ধতার মাঝে লরী হ'তে প্রায় এক মাইল দূরে গিয়ে ভাবতে লাগলাম, বৈদেশিক পর্য্যটকগণ আফ্রিকা সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখেন তাঁরা নিশ্চয়ই এসব স্থানে আসেন। চারিদিকে পাহাড় এবং উঁচু ভূমি। মাঝে মাঝে যে সকল খাল-বিল সৃষ্টি হচ্ছে তার মাঝে অবশ্য নানারূপ বৃক্ষ, নানা রকমের পাখী এবং জানোয়ার আছে। ওদের দিকে কি তাঁরা দিনের পর দিন ওৎ পেতে বসে থাকেন? বামনদের সম্বন্ধে তাঁরা যে সকল ছবি দেশ-বিদেশে পাঠান তাদের কথা ষ্টান্‌লী, লিভিংষ্টোন লিখেন নি। হটেনটট এক জাতীয় মানুষ ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। নিগ্রোরাই তাদের বংশ লোপ করেছে। তবে কেন ওদের নিয়ে এখনও এত মাথা ঘামান হচ্ছে। দূর্বাদল-শ্যামল ভূমির উপর আমি দাঁড়িয়েছিলাম। ইচ্ছা করলেই এই ভূমিতে চাষ করা যেতে পারে এবং প্রচুর শস্য উৎপাদন ক'রে পৃথিবীর লোকের অভাব পূরণ করা যেতে পারে। যে সকল খালবিল দেখতে পাওয়া যায় তাতে প্রচুর মাছ রয়েছে। বন্যজীব প্রচুর আছে। অভাব শুধু মানুষের। এ সব সুন্দর স্থানকে কেন ইয়েলো ফিভারের জন্মভূমি বলা হচ্ছে, হয়ত তার পেছনে একটা মতলব আছে। সেই মতলব কি তাই আমি ভাবছিলাম। অনেকক্ষণ বসে থেকে একটা ঝোপের কাছে গিয়ে মনে হলো, কি রকমের কতকগুলি জীব তাতে বসে আছে। ভেবেছিলাম হয়ত একটা প্রকাণ্ড সাপ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু একটু ভাল করে দেখেই বুঝলাম এগুলি সাপ নয়, কতকগুলি ধূসর বর্ণের খরগোষ আমার ভয়ে ভীত হয়ে লুকিয়ে আছে। খরগোষগুলি দেখতে বেশ বড়, কিন্তু এতগুলি খরগোষ এত ছোট একটি স্থানে লুকিয়ে থাকতে পারে দেখে অশ্চর্য্য অনুভব হ'ল। আমি খরগোষগুলিকে বিরক্ত না করে নিকটস্থ আর একটা জংগলের দিকে রওয়ানা হলাম। জংগলে একটিও ত্রিশ হাতের বেশি লম্বা গাছ নেই। গাছগুলির ডালপালাও এত বেশি নেই যে যাতে ক'রে দিনের বেলা অন্ধকার দেখায়। বিনা চিন্তায় সেই বনটিতে প্রবেশ ক'রে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। নেকড়ে বাঘ, সিম্পাঞ্জি, সাপ, সিংহ এসবের কথা আমি কখনও চিন্তা করি নি। কিন্তু একটু দূর যাবার পরই একটা গাছে যেন একটা প্রকাণ্ড সাপ বেরিয়ে আছে, দূর থেকে দেখতে পেয়েই প্রাণটা কেঁপে উঠল। মনে হ'ল, আর কি, এবার নিশ্চয়ই মৃত্যু। সাপ কি আমায় ছাড়বে? বুকটা কেঁপে উঠল। জিহ্বা শুকিয়ে গেল। মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। কান দুটা গরম হয়ে উঠল। উষ্ণ নিশ্বাস নাক দিয়ে বইতে লাগল। কিন্তু একটি কথা মাত্র আমাকে সাহস এনে দিল, হয়ত এটা লতা হবে। এটা দেখেই বোধ হয় লেখকগণ সাপের ছবি এঁকেছেন। রংগিন চশমা জোড়া চোখ হতে খুলে নিকটে দেখবার চশমা হাতে রাখলাম। তার পর নিকটে ধীরে আগিয়ে যেতে লাগলাম। হঠাৎ মনে হলো গল্পের

হইয়ে পড়েছি এ-সব সাপ চোখের আকর্ষণে কাছে নিয়ে গিয়ে লোকটিকে আক্রমণ করে। আমি কি সেরূপ ভাবেই মেসমেরিজিম শক্তির প্রভাবে চলছি? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে মনে হ'ল সাপের চোখে প্রভাব থাকলে নিশ্চয়ই আমাকে টেনে নিয়ে যেত, দাঁড়াতে দিত না। তার পর বোধ হয় তিন চেন দূর হ'তে বুঝলাম এটা সাপ নয়—এটা ঠিক ঠিকই লতা। লতার রং সাপের মত। তবে মাটি বের হয়ে গাছটাকে বেড়িয়ে বেড়িয়ে গিয়ে একদম সাপের লেজের মতই হয়েছে।

আরও একটু সাহস করলাম। আরও কাছে গেলাম। তার পর গাছের গোড়ায় গিয়ে লতাটার এক দিকে চাকু বসাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু লতা হলেও সে একটি পুরাতন ঝুনা গাছ। তাতে চাকু প্রবেশ করান শক্ত কাজ।

অতি কষ্ট করে কতকগুলি বাকল কেটে নিয়ে গাছের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, হায় রে টাকা, যদি আমার টাকা থাকত, তবে এই সাহস এবং টাকার সংযোগে আজ পৃথিবীর একটি আশ্চর্য, মানবসমাজে হাজির করতে পারা যেত। টাকার অভাবেই আমি ক্যামেরা কিনতে সক্ষম হই নি। লতা-বৃক্ষটির ছবি মানবসমাজে যদি নিয়ে গিয়ে দেখ্‌তে পারতাম তবে লোক-সমাজের অন্ধকারে আফ্রিকার অনেকটা ধাঁধাঁ চলে যেত।

লতা-বৃক্ষের বাকল পকেটস্থ করে আর একটু এগিয়ে গিয়ে একটা গাছের গোড়ায় বসে ভাবতে লাগলাম, আমার দ্বারা এ-সব গাছের বাকল যোগাড় ক'রে কি লাভ! কে কিনবে এ-সব! লাভ শুধু বয়ে নিয়ে যাওয়া, এই বলেই বাকলগুলি দূরে নিক্ষেপ করলাম। অজগর সাপের মত লতা দেখা হ'ল, এটা কি কম কথা? ভাল কথক বা লেখক হলে একেই একটা প্রকাণ্ড সাপ তৈরী করে, মন্ত্র-শক্তির প্রভাবে হত্যা করে "হিরো" সাজতে আর কতক্ষণ?

আমার সাথীরা বলে দিয়েছিল আফ্রিকাতে মানুষের দুটি শত্রু আছে। প্রথমটি হলো হাতী, দ্বিতীয়টি হলো মোষ। তারা আরও বলে দিয়েছিল হাতী হতে রক্ষা পেতে পার আগুন জ্বালিয়ে কিন্তু মোষ হতে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় হ'ল, মোষটাকে হত্যা করা। এ দুটো জানোয়ারের কথা মনে হতেই শরীরটা শিউরে উঠল। জংগলে বসতে আর ইচ্ছা হ'ল না। জংগল হতে বের হয়ে আসবার বেলাও পেছনের দিকে তাকাতে হলো।

বনের ভয়ে মানুষ মরে না, মানুষ মরে মনের ভয়ে। জংগল হতে বের হয়ে চিন্তা করে দেখলাম এখানে কোন মতেই মোষ অথবা হাতী থাকতে পারে না। জল কাছে নেই, দ্বিতীয় কথা হলো মোষের খাবারের উপযুক্ত মোলায়েম ঘাসও নেই। নিজের প্রতি নিজেরই রাগ হলো। আর জংগলে গেলাম না, লরীর কাছে এসে দেখি, সবাই নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওদের বিরক্ত করাটা পছন্দ করলাম না। শুধু লরী হতে একটা ডাণ্ডা নিয়ে নীচের দিকে যেতে লাগলাম এই ভেবে তথায় হয়ত কোন জলজীব দেখতে পাব। আফ্রিকার নদীতে, হ্রদে, খালে, বিলে সর্বত্র কুমীর কিলবিল করে এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু জল কাছে নয়, অনেক দূরে। জলের দিকেই রওনা হলাম। বলছি অনেক দূর, তা বলে দু-চার মাইল নয়। এক মাইলের একটু বেশি হবে। ডাক দিলে শুনা যায়।

পাহাড় গড়িয়ে এসে এক যায়গায় কিছুটা জল জমে আছে এবং বেশি জল যা পাহাড় হতে নেমে আসছে তা আর একটা ছোট নালা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি সেই জলের কাছে গিয়ে বসলাম। জল পরিষ্কার। জলের দু-হাত নীচে যা আছে তাও দেখতে পাওয়া যায়। জলে মোটা মোটা পুঁটি মাছ খেলছিল। অনেকগুলি পুঁটি জাতীয় মাছ নালার কাছে গিয়ে ফের চলে আসছিল। তারা যেন ডোবা ছেড়ে যেতে চায় না। নালার কাছে একটি বৃহৎ বানর বসেছিলেন। তিনি আমার মতই লম্বা হবেন, শরীরটা আমার চেয়ে মোটা, হাত দুটা বেশ সবল। পা দুটা ছোট বলেই মনে হ'ল। তিনি হাত দিয়ে পুঁটি মাছ ধরবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু মাছগুলি এতই চালাক যে, তারা তার কাছে গিয়েই লেজ দিয়ে জলে আঘাত করে ফের চলে আসছিল। আমি অতিকায় বানর এবং মাছের খেলা দেখছিলাম বটে, কিন্তু মনে ভয় হচ্ছিল যদি বানরটা বিপরীত দিক হতে এসে আমাকে আক্রমণ করে তবে তার মাথায় আঘাত করা ছাড়া আমার বাঁচবার কোন উপায় থাকবে না। কিন্তু বানর মাছ ধরাতেই মন দিয়েছিল, আমার দিকে ফিরেও তাকায় নি।

ক্রমশঃ

কেদার রাজা

(উপন্যাস)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কেদার ও গোপেশ্বর দুজনে মিলে খেটে বাড়ীর উঠানটা অনেকটা পরিষ্কার করে তুলেচেন, কেদার তত নন, বলতে গেলে গোপেশ্বরই খেটেচেন বেশি। শরৎ-কাল পড়েচে, পূজার দেরি নেই, গোপেশ্বর এক দিন উঠানের এক ধার খুঁড়ে কতকগুলো কচুর চারা পুঁতচেন, কেদার মহাব্যস্ত হয়ে এসে বললেন—দাদা, এসো—ওসব ফেলে রাখো—

—কি রাজামশায় ?

—আরে একটা নতুন রাগিণীর সন্ধান পেয়েচি এক-জনের কাছে। মুখুয্যে-বাড়ীতে জামাই এসেচে—ভাল গায়ক। দেওগান্ধার ওর কাছে আদায় করতে হবে। থাকবে এখন কিছু দিন এখানে, চলো দুজনে যাই—

—দেবে কি রাজামশাই ? ও-সব লোক বড় কষ্ট দেয়। আমি কাশীতে এক ওস্তাদের কাছে বড় আশা করে যাই। একখানা ভীমপলশ্রীর আস্তাই দিলে অতি কষ্টে তো মাসাবধি অন্তরা আর দেয় না। কত খোসামোদ, কেবল বলে, অন্তরা এক মিনিটে নাকি হয়ে যাবে। হয়রাণ হয়ে গেলাম হাঁটাহাঁটি করে।

—পেলে ?

—কোথায় পেলাম ? আদায় করা গেল না শেষ পর্য্যন্ত। সেই থেকে নাকে কানে খৎ—ওস্তাদের কাছে আর যাবো না—

—যা হোক চলো দাদা। এ আমাদের গাঁয়ের জামাই —ওকে নিয়ে এক দিন মজলিস করা যাক—অনেক দিন থেকে দেওগান্ধারের খোঁজ করচি। ধরা যাক্ চলো—ওখানে কি হচ্চে ?

—মানকচুর চারা লাগিয়ে রাখলাম গোটাকতক। সামনের বছরে এক-একটা কচু হবে দেখবেন কত বড় বড়। আপনার ভিটের এ জমিতে এক-একটা মানকচু—

—জানি দাদা। ও এখন রাখো, হবে পরে। ও শরৎ—

শরৎ রান্নাঘর থেকে বার হয়ে এসে বললে—কি বাবা ?

—আমাদের দুজনকে একটু তেল দেও মা। রান্নার কতদূর ?

—ওলের ডালনা চড়েচে—নামিয়ে ভাত চড়াবো। তা হলেই হোয়ে গেল—

—হ্যাঁ মা, রাজলক্ষ্মী এসেচে ?

—না আজ আসে নি এখনো। কেন ?

—না, বলছিলাম, মুখুয্যে-বাড়ী জামাই এসেচে, ভদ্রেশ্বর বাড়ী, কেমন লোক তাই তাকে জিগ্যেস করতাম।

—সে খোঁজে তোমার কি দরকার ? সে ভাল হোক মন্দ হোক—

—তুই তা বুঝবি নে, বুঝবি নে। অন্য কাজ আ[illegible] তার কাছে। যদি এর মধ্যে রাজলক্ষ্মী আসে—

—মুখুয্যে-বাড়ীর কোন্ জামাই বাবা ? আশাদিদির বর ? আশাদিদির শ্বশুরবাড়ী তো ভদ্রেশ্বর—

—তাই হবে।

—সে তো বুড়ো মানুষ। আশাদিদিকে বিয়ে করেচে দোজপক্ষে—

—তোর সে সব কথায় দরকার কি বাপু ? বুড়ো হয়, আরও ভালো।

—বল না, কেন বাবা—

—নাঃ, সে তুই শুনে কি করবি ?

—না আমি শুনবো—

—শুনবি ? রাগিণী ভূপালী, বাদী গান্ধার, বিবাদী মধ্যম আর নিখাদ—সম্বাদী ধৈবত—আরও শুনবি ? রাগিণী আশাবরী—বাদী—

—থাক্ আর শুনে দরকার নেই—নেয়ে এসে ভাত খেয়ে আমায় খোলসা করে দিয়ে যত ইচ্ছে রাগিণী শেখো—

বেলা পড়ে গেল। ঘরের তালকাঠের আড়াতে কলা-বাদুর ঝুলচে যেমন শরৎ আবাল্য দেখে এসেচে। কেদার ও গোপেশ্বর আহারাদি সেরে অন্তর্হিত হয়েচেন, মধ্যরাত্রে যদি ফেরেন তবে শরতের সৌভাগ্য। রাজলক্ষ্মীর জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকে সে। তবুও দুজনে গল্প করে সময় কাটে। রোজ রোজ বাবার এই কাণ্ড। ভালও লাগে!

এমন সময় কে বাইরে থেকে ডাকলে—ও শরৎ, শরৎ—

শরৎ বাড়ীর দাওয়ায় উঁকি মেরে দেখে বললে—কে? ও বটুক-দা, ভাল আছেন? আসুন—

বটুককে শরৎ কোনো কালেই ভাল চোখে দেখতো না। সেই বটুক, যে এক সময়ে শরতের প্রতি অনেক অসম্মানজনক ব্যবহার করেছিল, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে যে বটুকের সম্বন্ধে সে যুগে কলকাতায় যাবার পূর্ব্বে শরৎ আলোচনা করেছিল এক বার।

বটুক একটু ইতস্ততঃ করে বললে—শুনলাম তোমরা এসেচ—কাকা এসেচেন, তাই একবার দেখা করতে—

শরৎ আগেকার মত নেই—জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে অনেক সাহসী ও সহিষ্ণু করে দিয়েচে। আগেকার দিন হোলে শরৎ বটুকের সঙ্গে বেশিক্ষণ কথাও বলতো না এ নিশ্চয়। আজ শরৎ দাওয়ায় একখানা পিঁড়ি পেতে বটুককে বসতে বললে।

বটুক একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল, শরতের কাছ থেকে এ আদর সে আশা করে আসেনি এখানে। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে অবশেষে বসলো। শরৎ তাকে চা করে খাওয়ালে। বললে—দুটি মুড়ি খাবে বটুক-দা? আর তো কিছু নেই ঘরে। তুমি এলে এত দিন পরে—

—থাক্, থাক্—সে জন্যে কিছু নয়। আমি দেখতে এলাম, বলি দেখা হয়নি কত দিন। আচ্ছা, শুনলাম নাকি কত দেশ-বিদেশে বেড়িয়ে এলে?

—তা বেড়ালাম বই কি। রাজগির, কাশী—

—কাকা নিয়ে গিয়েছিলেন বুঝি?

—জ্যাঠামহাশয়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম—ঐ যিনি আমাদের এখানে আছেন—

—তা বেশ, বেশ।

এই সময়ে দূরে রাজলক্ষ্মীকে আসতে দেখে বটুক তাড়াতাড়ি উঠে বিদায় নিলে। শরৎ বললে—আর এক দিন এসো, বাবার সঙ্গে তো দেখা হোল না! বাবা থাকতে এসো একদিন—

রাজলক্ষ্মী চেয়ে চেয়ে বললে—ও এখানে কি জন্যে এসেছিল? বটুক-দা তো লোক ভাল না—

—কি মতলব নিয়ে এসেছিল কি করে বলব বল? এলো—বসতে দিলাম, চা ক'রে দিলাম—

—না—না শরৎদি, জানো তো—ওসব লোকের সঙ্গে কোনো মেলামেশা না করাই ভালো। তুমি তো জানো না ওর কাণ্ড। তোমরা চলে যাওয়ার পর ও গাঁয়ে যে-সব কাণ্ড করেচে, সে শুনলে তুমি কানে আঙুল দেবে। অতি বদ লোক। কি মতলব নিয়ে এসেছিল কে জানে?

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমার বাড়ী এলো, আমি কি বলে না বসাই? তা তো হয় না। আমায় আমার কাজ করতেই হবে।

—সেই যে প্রভাস কামার তোমাদের মোটরে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল, সে লোকটাও ভাল না, পরে শুনলাম। বটুক-দা প্রভাসের খুব বন্ধু ছিল আগে—তবে এখন অনেক দিন আর তাকে এ গাঁয়ে দেখি নি। তোমরা চলে গেলে একবার এসেছিল যেন।

শরতের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল, সে তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়লে একথা চাপা দিয়ে। বললে—চল্। দীঘির পাড় থেকে গোটাকতক ধুঁধুল পেড়ে আনি—কিছু তরকারি নেই, বাবাকে বলা না বলা দুই সমান—

রাজলক্ষ্মী বললে—আর কোথাও যেও না শরৎদি, দুটি বোনে এই গাঁয়ে কাটিয়ে দিই জীবনটা। আমারও যা হবে, সে বেশ দেখতেই পাচ্চি। তুমি থাকলে বেশ লাগে।

—খারাপ কি বল্ না? আমি কত জায়গায় গেলাম, কিন্তু তোকে ছেড়ে—কালোপায়রার দীঘি ছেড়ে—

—যা বলেচ শরৎদি। তুমি এসেচ, আমি আর

কোথাও যেতে চাই নে, স্বর্গেও না। দুজনে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করি—

—আর চাল-ছোলা ভাজা খাই—না রে? ভাজি দুটো চাল-ছোলা?

—না না শরৎদি। ঐ তোমার পাগলামি—

—পাগলামি নিয়েই জীবন। আয় আমার সঙ্গে রান্নাঘরে, তার পর আবার দু'জনে এসে বসবো।

রাজলক্ষ্মী আজকাল সর্ব্বদা শরতের সঙ্গে থাকতে ভালবাসে। সন্ধ্যার আগে একাই বাড়ী চলে যায়, শরৎ-দিদির মুখে বাইরের জগতের কথা শুনতে ওর বড় আগ্রহ, যে একঘেয়ে জীবন আবাল্য সে কাটাচ্চে গড়শিবপুরে, যার জন্যে তার মনে হয় এ একঘেয়েমির চেয়ে যে কোনো জীবন বাঞ্ছনীয়, যে কোনো ধরণের—শরৎদিদি আজ কিছু দিন হোল বিদেশ থেকে ফিরে সেই একঘেয়ে আবেষ্টনীর মধ্যে যেন আগ্রহ ও নতুনত্বের সঞ্চার করেচে। তা ছাড়া জীবনে শরৎদিদিই তার একমাত্র ভালবাসার লোক, ও দূরে চলে যাওয়াতে রাজলক্ষ্মীর জীবন শূন্য হয়ে পড়েছিল, এখন আবার গড়বাড়ীতে এসে, ওর সঙ্গে বসে গল্প করে, ওর সামান্য কাজকর্ম্মে সাহায্য করে রাজলক্ষ্মীর অবসরক্ষণ ভরে ওঠে।

শরৎ বললে—রেণুকার চিঠির জবাব দিলাম অনেক দিন, উত্তর তো এল না?

—আসবে। অত ব্যস্ত কেন? দিন দশেক হোল মোটে জবাব গিয়েচে? ঠিকানা লেখা ঠিক হয়েছিল তো?

—ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন জ্যাঠামশায়। উনি কি আর ভুল করবেন? আমার মন বড় কেমন করে খোকনমণির জন্যে। সে যদি চিঠি লিখতে পারতো আমায় নিজের হাতে—

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে—একেই বলে মায়া। কোথাকার কে তার ঠিক নেই—

শরৎ ব্যথা-কাতর কণ্ঠে বললে—অমন বলিস নে রাজি। তুই জানিস নে, সে আমার কি। কেন তাকে ভুলতে পারিনে তাই ভাবি। কখনো অমন হয় নি আমার, কাশীতে থাকবার শেষ একটা মাস যা হয়েছিল। খোকাকে না দেখলে পাগলের মত হয়ে যেতাম, বুঝলি? কষ্টও যা গিয়েচে! আচ্ছা বল্ তো, সত্যিই সে আমার কে? অথচ মনে হোত কত জন্মের আপনার লোক সে, তার মুখ দিনান্তে একবার না দেখলে—ভালই হয়েচে রাজি, সেখানে বেশিদিন থাকলে মায়ায় বড্ড জড়িয়ে পড়তাম। আর তেমনি ছিল মিন্থর মা!

—সে কে শরৎদি?

—যাদের বাড়ী ছিলাম, সে বাড়ীর গিন্নি। বলবো তোকে সব কথা একদিন। এখন না—

—কাশীর কথা শুনতে বড্ড ভাল লাগে তোমার মুখে—কখনো কিছু দেখিনি—যেন মনে হয় এখানে বসে দেখচি সব—আজ একটু ঠাণ্ডা পড়েচে না শরৎদি?

—তা হেমন্ত কাল এসে পড়েচে, একটু শীত পড়বার কথা। একটা নারকেল কুরতে হবে—দা'খানা খুঁজে ভাখ ততক্ষণ—আমি ছোলাগুলো ততক্ষণ ভেজে ফেলি—

—কেন অত হাঙ্গামা করচো শরৎদি? দাঁড়াও, আমি নারকোল কুরে দিই—

শরৎ বললে—দুজনে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করবো আর চালভাজা কি বলিস?

ছেলেমানুষের মত উৎসাহ ও আগ্রহভরা কণ্ঠ তার। এইজন্যই শরৎদিদিকে রাজলক্ষ্মীর এত ভাল লাগে। এই পাড়াগাঁয়ে সব লোক যেন ঘুমুচ্চে, তাদের না আছে কোনো বিষয়ে আগ্রহ, না শোনা যায় তাদের মুখে একটা ভাল কথা। অল্প বয়সে বুড়িয়ে যেতে হয় ওদের মধ্যে থাকলে। শরৎদিদি এসে বাঁচিয়েচে।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ মনে পড়বার সুরে বললে—ভাল কথা, বলতে মনে নেই শরৎদি, টুণ্ডি-মাজদে থেকে তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছিল একবার—

শরৎ চমকে উঠে বললে—টুণ্ডি-মাজদে? কই সে চিঠি?

—আছে বোধ হয় বাড়ীতে, খুঁজে দেখবো। তোমরা তখন এখানে ছিলে না—আমি রেখে দিয়েছিলাম—

—কতদিন আগে?

—তা ছ' সাত মাস কি তার বেশীও হবে। গত

বোশেখ মাসে বোধ হয়। আচ্ছা শরৎদি, ওখানে তোমার শ্বশুরবাড়ী—নয়?

শরৎ অন্যমনস্কভাবে বললে—হঁ্যা।

একটুখানি চুপ ক'রে কি ভেবে বললে—কে দিয়েছিল জানিস?

—খামের চিঠি। আমি খুলে দেখিনি—কে আছে তোমার সেখানে?

শরৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—নিয়ে আসিস্ চিঠিখানা দেখবো।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর রাজলক্ষ্মী বললে—খাও শরৎদি, সন্দে হয়ে আসচে—

—হুঁ—

—নারকোল কেটে দেবো আর একটু?

—না, তুই খেয়ে নে। উত্তর-দেউলে সন্দে দেখিয়ে আসতে হবে—

—এখনও রোদ রয়েচে গাছের ডগায়, অনেক দেরি এখনো। খেয়ে নাও না—

—আমি আর খাবো না এখন।

—তুমি না খেলে আমারও এই রইল—

—না না, আচ্ছা খাচ্চি আমি—নে তুই। কাঁচা লঙ্কা একটা নিয়ে আসি—

উত্তর-দেউল থেকে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিয়ে কিছুক্ষণ পরে ওরা ফিরছিল। কালোপায়রা দীঘির ও পাড়ের ঘন জঙ্গলে সেথায় ছাতিম ফুল ফুটে হেমন্ত সন্ধ্যার বাতাস সুবাসিত করে তুলেচে। শ্যামলতার লম্বা কালো ডাঁটায় কুচো কুচো সুগন্ধ ফুল প্রত্যেক বর্ষাপুষ্ট ঝোপের মাথায়। পায়ে চলার পথ গত বর্ষার ঘাসে ঢেকে আছে, ভাঙা ইঁটের স্তূপে শেওলা জন্মেচে, গড়ের জঙ্গল ঘন কালো দেখাচ্চে আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে। রাজলক্ষ্মীকে বাড়ী ফিরতে হবে বলে ওরা সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখানোর কাজ বেলা থাকতে সেরে এল।

শরৎ বললে—অনেক মেটে আলু হয়ে আছে বনে, আজ দু-বছর এদিকে আসিনি—

—তুলবে একদিন শরৎদি? আমিও আসবো—

বাড়ী গিয়ে শরৎ বললে—চল তোকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি—গড়ের খাল পর্য্যন্ত যাই। জল নেই তো খালে?

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে—কোথায় বর্ষায় সামান্য জল হয়েছিল, শুকিয়ে গেছে।

—থাক না কেন আজ রাতটা? একা থাকবো?

—বাড়ীতে বলে আসিনি যে শরৎদি—নইলে আর কি। আচ্ছা কাল রাত্রে বরং থাকবো। বাড়ীতে বলে আসতে হবে কিনা?

রাজলক্ষ্মীকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসবার পথে শরৎ একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসলো। হেমন্তের সান্ধ্য বাতাস কত কি বন্য পুষ্প, বিশেষতঃ বন-মরচে ও শ্যামলতার পুষ্পের সুবাসে ভারাক্রান্ত—দেউড়ির ভাঙা ইঁটের ঢিবির সর্ব্বত্র এ সময় বন-মরচে লতায় ছেয়ে গিয়েচে, পুরোনো রাজবাড়ীর লক্ষ্মীছাড়া দৈন্য তাদের শ্যামশোভায় আবৃত করে রেখেচে। রাজকন্যার সম্মান রেখেচে ওরা সেভাবে।

কি হবে এখুনি ঘরে ফিরে? বেশ লাগে বাইরের বাতাস। ভয় নেই ওর মনে, যা ছিল তাও চলে গিয়েচে। তা ছাড়া ভয় কিসের? সবাই বলে ভূত আছে, অপদেবতা আছে। তার পূর্ব্বপুরুষের অভ্যুদয়ের দিনের শত পুণ্য অনুষ্ঠানে এ বাড়ীর মাটি পবিত্র, এ বাড়ীর সে মেয়ে, আবাল্য যে এ সব এইখানেই দেখে এসেচে—তার ভয় কিসের?

উত্তর-দেউলের দেবী বারাহী তাদের মঙ্গল করবেন।

সে ঘরে ফিরে ডুমুরের চচ্চড়ি রান্না করবে বাবা আর জ্যাঠামশায়ের জন্যে। জ্যাঠামশায় অনেক ডুমুর পেড়ে এনেচেন আজ কোথা থেকে। জ্যাঠামশায় বেশ লোক। ওঁকে সে আর কোথাও যেতে দেবে না। উনি না থাকলে কে তাকে আনতো কাশী থেকে? বাবার সঙ্গে কে আবার দেখা করিয়ে দিত? যতদিন উনি বাঁচেন, সে ওঁর সেবা-যত্ন করবে মেয়ের মত।

শরতের হঠাৎ মনে পড়লো, রাজলক্ষ্মীকে তার শ্বশুর-বাড়ীর সে পুরোনো চিঠিখানা আনবার জন্যে মনে করিয়ে দেওয়া হয়নি আর একবার। টুঙি-মাজদিয়া! কত দিন সেখানে যাওয়া হয়নি। কেই বা আছে আর সেখানে? চিঠি লিখেচেন বোধ হয় খুড়শাশুড়ী। তাই হবে—তা

ছাড়া আর কে? সেখানকার সব কিছু যখন শেষ হয়ে গিয়েচে, তখন ভাল জ্ঞানই হয়নি শরতের। এক উৎসব-রজনীর চাঁপাফুলের সুগন্ধ আজও যেন নাকে লেগে আছে। কত কাল আগের বিস্মৃত মুহূর্ত্তগুলির আবেদন—আজও তাদের ক্ষীণ বাণী অস্পষ্ট হয়ে যায় নি তো? বিস্মৃতির উপলেপন দিয়ে রেখেচে চলমান কাল, সেই মুহূর্ত্তগুলির ওপর। তবে সে ভালবাসেনি, ভালবাসলে কেউ ভোলে না। এখনও বুঝবার, জানবার বয়স হয়নি তার।

টুণ্ডি-মাজদে তার শ্বশুর বাড়ী। ওখানকার ভাদুড়িরা তার শ্বশুরবংশ—এক সময়ে নাকি ভাদুড়িদের অবস্থা খুব ভাল ছিল। এখন—তাদেরই মত।

টুণ্ডি-মাজদে! নামটা সে ভুলেই গিয়েছিল। রাজলক্ষ্মী আবার মনে করিয়ে দিলে।

বনের মধ্যে কোথায় গম্ভীর স্বরে হুতুম প্যাঁচা ডাকচে, শুনলে ভয় করে—যেন রাত্রিচর কোনো অপদেবতার কুস্বর। শরৎ অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে ঘরে গিয়ে রান্নাঘরে খিল দিয়ে রান্না চড়িয়ে দিলে। অনেক রাত্রে কেদার এসে ডাকাডাকি করেন—ও মা শরৎ, দোর খোলো—ওঠো—

দিন দশেক পরে একদিন রাজলক্ষ্মী এসে বললে—চললাম শরৎদিদি—

শরৎ বিস্ময়ের সুরে বললে—কি রে? কোথায় চললি?

—সব ঠিক। আমার বিয়ে হচ্চে সতেরোই অঘ্রাণ—জানো না?

—তোর? সত্যি?

—সত্যি না তো মিথ্যে?

—বল্ শুনি—সত্যি? কোথায়?

রাজলক্ষ্মী বেশি কিছু জানে না বোঝা গেল। এখান থেকে মাইল দশেক দূরে দশঘরা বলে অজ এক পাড়াগাঁয়ে। যার সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েচে, তার বয়েস নাকি তত বেশি নয়, বিশেষ কিছু করে না বাড়ীতেই থাকে।

শরৎ বললে—তোর পছন্দ হয়েচে?

—পছন্দ হোলেও হয়েচে, না হোলেও হয়েচে—

—তার মানে?

—তার মানে বাবার যখন পয়সা নেই, আমি যদি বলি আমার বর হাকিম হোক, হুকুম হোক, দারোগা হোক, তা হোলে তো হবে না। যা জোটে তাই সই।

—এখন যা হয় হোলে বাঁচি, না কি?

—তোমার মুণ্ডু।

তার পর ওরা বনের মধ্যে মেটে আলু তুলতে গিয়ে অনেক বেলা পর্য্যন্ত রইল। বনের মধ্যে এক জায়গায় একটা পাথরের থামের ভাঙা মুণ্ডুটা মাটিতে অর্দ্ধেক পুঁতে আছে। রাজলক্ষ্মী সেটার ওপরে গিয়ে বসলো। পাথরের গায়ে সামুদ্রিক কড়ির মত বিট কাটা, মাঝে মাঝে পদ্মফুল এবং একটা দাঁড়ি। আবার কড়ি, পদ্ম ও দাঁড়ি—মালার আকারে সারা থামটা ঘুরে এসেচে। নীচের দিকে একরাশ কেঁচোর মাটি বাকি অংশটুকু ঢেকে রেখেচে।

রাজলক্ষ্মী চেয়ে চেয়ে বললে—এই নক্সাটা কেমন চমৎকার শরৎদি? বুনলে ভাল হয়—দেখে নাও।

শরৎ বললে—এর চেয়েও ভাল নক্সা আছে ওই অশথ গাছটার তলায়—একটা থিলেন ভেঙে পড়ে আছে তার ইটের গায়ে। কিন্তু বড্ড বন ওখানে—আর কাঁটা গাছ।

—তোমাদেরই সব তো—একদিন শুনেচি গড়বাড়ীর চেহারা অন্য রকম ছিল। না?

—কি জানি ভাই, ও-সবের খবর আমি রাখি নে। আজকাল যা দেখচি, তাই দেখচি। তেল জোটে তো নুন জোটে না, নুন জোটে তো চাল জোটে না।

তার পর শরৎ কি ভেবে আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে বললে—সত্যি রাজি, খুব খুসি হয়েচি তোর বিয়ের কথা শুনে। কত যে ভেবেচি, কাশীতে থাকতে কতবার ভাবতাম, ভাল সম্বন্ধ পাই তো রাজির জন্যে দেখি। একবার দশাশ্বমেধ ঘাটে একটা চমৎকার ছেলে দেখে ভাবলাম, এর সঙ্গে যদি রাজির বিয়ে দিতে পারতাম, তবে—

রাজলক্ষ্মী চুপ করে রইল। সে যেন কি ভাবচে।

শরৎ বললে—প্রভাস-দা'র দেওয়া সেই মখমলের বাক্সটা আছে রে?

—হুঁ। স্নোটা সব খরচ হয়ে গেছে—আর সব আছে। দ্যাখো শরৎদি, সত্যি সত্যি একটা কথা বলি আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না তোমায় ছেড়ে

আমি একবার বলেচি, আবার বলচি। মনের কথা আমার।

তার পর রাজলক্ষ্মী উঠে ধীরে ধীরে শরতের গলা জড়িয়ে ধরে বললে—শরৎদি, তুমি আমায় ভালবাসো ?

শরৎ তাকে ঠেলে দিয়ে হেসে বললে—যাঃ—

রাজলক্ষ্মীর চোখ দিয়ে হঠাৎ ঝর ঝর ক'রে জল পড়লো। সে অশ্রুসিক্ত স্বরে বললে—তুমি ভালবাসো বলেই বেঁচে আছি শরৎদি। তুমি গরীব হতে পারো, আমার কাছে তুমি গড়বাড়ীর রাজার মেয়ে, এই দেউল, মন্দির, দীঘি, গড়, ঠাকুর-দেবতার মূর্ত্তি সব তোমাদের, আমি তোমাদের প্রজার মেয়ে, একপাশে পড়ে থাকি—তুমি সুনজরে দেখো বলে বার বার আসি—

শরৎ কৌতুকের সুরে বললে—খেপ্‌লি নাকি, রাজি ? কি হয়েচে আজ তোর ?

রাজলক্ষ্মী চলে যাবার কিছু পরে বটুক এসে ডাকলে—ও শরৎ—বাড়ী আছ ?

শরৎ তখন স্নান করতে যাবার জন্যে তৈরি হয়েচে, বটুককে দেখে একটু বিব্রত হয়ে পড়লো।

মুখে বললে—এসো বটুকদা—

হ্যাঁ, এলাম। তুমি বুঝি—

—নাইতে বেরিয়েচি বটুকদা। রাজির সঙ্গে বন থেকে মেটে আলু তুলতে গিয়েছিলাম কি না। না ডুব দিয়ে ঘরে দোরে ঢুকবো না—

—ও, তা আমি না হয় অন্য সময়—

—কোনো কথা ছিল ?

—হাঁ, না—কথা—তা একটু ছিল—তা—

বটুকের অবস্থা দেখে শরতের হাসি পেল। মনে মনে বললে—কি বলবি বল্ না—বলে চলে যা—কাণ্ড দ্যাখো একবার !

মুখে বললে—কি বটুকদা ? কি কথা ?

বটুক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ইতস্ততঃ করে তারপর মরিয়ার সুরে বললে—প্রভাস এসেছিল কাল কলকাতা থেকে।

বলে সে শরতের মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

শরতের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল এক মুহূর্ত্তে। তার সমস্ত শরীর কেমন ঝিম-ঝিম করে উঠলো। কিন্তু তখনি সামলে নিয়ে বললে—তা আমায় এ কথা কেন ? আমি কি করবো ?

বটুক মাথা চুলকে বললে—না—তা—এমন কিছু নয়, এমন কিছু নয়। প্রভাসের সঙ্গে গিরীন বাবু বলে এক ভদ্রলোক ছিল। এই গিয়ে তারা বলছিল—

এই পর্য্যন্ত বলে বটুক একবার চারি দিকে চেয়ে দেখলে।

শরৎ দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে নিজেকে যেন টলে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে বললে—কি বলছিল ?

—বলছিল যে—

—বলো না কি বলছিল ?

—মানে, ওরা—তোমার সঙ্গে একবার লুকিয়ে দেখা করতে চায়। নইলে গাঁয়ে সব কথা নাকি প্রকাশ করে দেবে।

—হুঁ—তোমাকে তারা চর করে পাঠিয়েছে বুঝি ?

শরতের অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বটুক ভয় খেয়ে গেল। সুর নরম করে বললে—আমার ওপরে অনর্থক রাগ করচো তুমি। আমায় তারা বললে, তোমাকে কথাটা বলতে। কেউ টের পাবে না, গড়ের জঙ্গলের ওদিকে হোক, কি রাণীদীঘির পাড়ে হোক্—কি তারা বলবে তোমায়। আমায় বললে, বলে এসো। তারা কলকাতায় চলে গিয়েচে, আবার আসবে। নয় তো কলকাতায় কি হয়েছিল না হয়েছিল, সব গাঁয়ে প্রকাশ করে দিয়ে যাবে—

শরৎ চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ। কোনো কথা নেই তার মুখে। তার মূর্ত্তি দেখে বটুকের ভয় হোল। সে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় শরৎ স্থির গলায় বললে—বটুকদা, তোমার বন্ধুদের বোলো আমি লুকিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা কোনোদিন করবো না। তাদের সাহস থাকে বাবা আর জ্যাঠামশায়ের সামনে এসে যেন দেখা করে। আমরা গরীব আছি তাই কি ? আমাদেরও মান আছে। না হয় তারা বড়লোকই আছে।

বটুক বললে—না—এর মধ্যে আর গরীব বড়লোকের কথা কি ?

—আর একটা কথা বটুকদা ? তুমি না গাঁয়ের ছেলে ? তোমার উচিত কলকাতার সেই সব বখাটে বদমাইসদের তরফ থেকে আমায় এ-সব কথা বলা ? আমি না তোমার ছোট বোনের মত ? তোমায় না দাদা বলে ডাকি ? তুমি এসেচ চর সেজে ?

বটুক আমতা আমতা করে বললে—আমি কি করবো, আমি কি করবো—তোমার ভালোর জন্যেই—

শরৎ পূর্ব্ববৎ স্থির কণ্ঠেই বললে—আমার বাড়ী তুমি এসেচ—আমার বলতে বাধে, তবুও আমি বলছি আমার এখানে তুমি আর এসো না—আমার ভালো তোমায় করতে হবে না।

বটুক ততক্ষণ ভগ্ন দেউড়ির পথে অদৃশ্য হয়েচে।

(ক্রমশঃ)

অগ্রহায়ণ

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফসলের শ্বাস মধু আশ্বাস আনে
ফুর্‌ফুরে হাওয়া ফিকৃফিকে জ্যোছনায়,
হাতাহাতি করে গাছের পাতায় পাতায়
রূপালী জরীর ঝিলিমিলি জাল বোনে।

চেয়ে আছি দূর, হ'ল মায়াতুর রাত,
ফসলের শীষ্ হ'ল যে মধুতে ভার—
অঘ্রাণ আজি আঘ্রাণ দিল তার ;
গন্ধ-মালতী অঙ্গন করে মাত্ ।

এমন নিঝুম ফসলের ঘুম ভাঙাবে কী গুরুপায়ে ?
না না, ওগো বায়ু, রাত ক্ষীণ—আয়ু ধীরে ফেল নিশ্বাস !
চকোরীর বুকে চন্দ্রের তরে জ্বালাময়ী প্রত্যাশ
উদাসিল কোন্ নায়িকার মন ফুল-নিকুঞ্জ-ছায়ে ?

খেয়ালী আলোর দেয়ালীতে আজ হেঁয়ালী হয়েছে মন ;
মিহি মধু সুরে উড়ে যায় দূরে বুঝি কিন্নরদল
বিধূনিত সেই পক্ষগুলির কম্প্রছায়া
দীঘিজলে তোলে নব নব সুরে নবীন মায়া
স্মর-বিমোহিতা বধূটির মত হাসে অম্বরতল।
পিয়াল বনেতে পিয়া নাই শুধু শিয়ালের বিচরণ।

নড়াইলের পথে

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

(ভ্রমণ)

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য সম্মিলনে নিমন্ত্রিত হইয়া যাইতেছি, সুতরাং আমরাও যে নিতান্ত কেওকেটা নয় তাহা আমরা তখন গম্ভীর ও মুরুব্বিয়ানা চালে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করি নাই।

ট্রেনে সামান্য এক দেড় ঘণ্টার রাস্তা। তাহাতে যে পাঁচ সাতটা ষ্টেশন আছে রেলওয়ে কোম্পানী নিযুক্ত হিন্দুস্থানী ষ্টেশন জমাদারের বেনাপোল ষ্টেশনের বেনাপুর, নাভারণের নাভরুণ, ঝিকরগাছায় ঝিঙ্‌রগাছা, ধোপ-খোলার ধোপাখালী প্রভৃতি উচ্চকণ্ঠের বিকৃত উচ্চারণে সচকিত হইয়া অবশেষে সিঙ্গিয়া আসিয়া থামিলাম।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের দিগন্ত জোড়া কাল পর্দা পৃথিবীকে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়াছে। আম, কাঁঠাল, তাল, খেজুর, বাদাম প্রভৃতি বৃক্ষ, বেতসকুঞ্জ ও নানাপ্রকার লতাগুল্ম-পরিবেষ্টিত ঝিল্লীমুখরিত এই নিভৃত ষ্টেশনটি যেন গাম্ভীর্য্যের আবেষ্টনীর মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। ষ্টেসনের উত্তরে প্রবাহিত যে ভৈরব নদ ভীম গর্জ্জনে একসময় উভয় তীরস্থ অধিবাসীদিগের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছে কচুরীপানার চাপে আজ তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ! অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় আপন অস্তিত্বটুকু কোনরূপে বজায় করিয়া লজ্জিতভাবে ক্ষীণ জলধারা গোপনে বহন করিয়া চলিয়াছে।

ষ্টেশন হইতে টিকিট দিয়া বাহির হইবার সময় সামান্য বিভ্রাটের সূচনা হইয়াছিল কিন্তু ক্ষেত্রে কার্য্যে কিঞ্চিৎ মিথ্যা ভাষণ আমাদিগকে বিড়ম্বিত করিতে পারে নাই। আমরা যে চারখান টিকিট কাটিয়াছিলাম গেট পার হইবার সময় তাহার একখান খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না তখন আমি যতীনদা-কে বলিলাম, যতীনদা আপনার টিকিট হারাইয়া গিয়াছে সুতরাং ও-দিক দিয়া পালান।

ইহাতে তিনি মহা আপত্তি জানাইয়া বলিলেন যে টিকিটখান হারাইয়া গিয়াছে তাহাতে কি আমার নাম লেখা ছিল?

যতীনদার আসম্মতির কারণ মন্মথদা আমার কানে কানে বলিলেন, ওহে ও রাত্রে চোখে ভাল দেখ্‌তে পায় না তাই বলে রাতকানা নয় কিন্তু। মন্মথদা এমনভাবে কথাটা বলিলেন যাহাতে সাপও মরিল লাঠিও ভাঙ্গিল না।

সখের থিয়েটারে একসময় অভিনেতা হিসাবে যতীনদার যথেষ্ট সুনাম ছিল। কথাটা মনে পড়াতে তাঁহাকে আমাদিগের অভ্যর্থনাকারীর অভিনয় করিতে বলিলাম। তিনিও রাজী হইয়া গেলেন।

কিন্তু কেন এত করিতে গেলাম ভাবিয়া লজ্জিত হইতেছি। সামান্য এক দেড় টাকা দিয়া অথবা সত্য ঘটনা ব্যক্ত করিলে যখন সব চুকিয়া যাইত। আর ফাঁকি দেওয়াও যখন উদ্দেশ্য ছিল না।

· এইবার তিন মাইল যাইয়া আকুরাঘাটে নৌকা খুলিয়া নড়াইলের দেড় দুই মাইল দক্ষিণে পিয়ারের ঘাটে নামিতে হইবে। পুনরায় ঐ রাস্তাটুকু পার হইয়া রতনগঞ্জে নৌকা চাপিয়া নড়াইল মহাকুমা সহরে পৌছিতে পারিলে যাত্রার বিরতি ঘটিবে।

পূর্ব্বে আমি বহুবার নড়াইল আসিয়াছি সুতরাং এ অঞ্চলের পথ-ঘাট আমার বিশেষ পরিচিত বলিয়া সকলের পথ প্রদর্শক হইয়াছিলাম। সিঙ্গিয়া ষ্টেশনের সম্মুখে যে খাবারের দোকান আছে সেখানে নৈশ ভোজন শেষ করিয়া তদ্দেশ প্রচলিত একখান এক্কা ভাড়া করিয়া আমরা আকুরাঘাটে রওনা হইলাম। কিন্তু এক্কা বলিতে বর্ণ পরিচয়ে যে এক্কাগাড়ী খুব ছুটছে দেখা যায় এ সে ধরণের এক্কা নয়—ইহাকে ঘোড়ার গরুর গাড়ী বলিলে বোধ হয় জিনিষটি সকলের বোধগম্য হইবে। পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত ছৈ দেওয়া গরুর গাড়ীর মার্জ্জিত সংস্করণ

অশ্বচালিত হইয়া এক্কা নামে অভিহিত হইয়াছে। নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া জঙ্গলাবৃত অসংস্কৃত ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তা বহিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক চলিবার পর বিপরীত দিক হইতে তিনজন ভদ্রলোককে আসিতে দেখা গেল। বেশ বোঝা গেল ঘাটে নৌকা হইতে নামিয়া যানবাহনের অভাবেই তাঁহারা চরণতরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অন্ধকারে লোক ভাল চেনা যায় না কিন্তু কণ্ঠস্বরে তিন জনেই আমার বিশেষ পরিচিত বলিয়া মনে হইল। ইঁহাদিগের মধ্যে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মৌলবী সৈয়দ নৌশের আলী ছিলেন। বিখ্যাত অথবা প্রতিষ্ঠাবান অথবা ধনী ব্যক্তিদিগের সহিত যে পরিচিত তাহা সঙ্গীদিগের নিকট প্রকাশ করিবার যে সহজাত প্রবৃত্তি মানব-মনে জাগিয়া থাকে এ ক্ষেত্রে আমি তাহার সুযোগ সেখানে পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিতে তড়াক করিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া নৌশের আলি সাহেবের সহিত দুই চারটি আলাপ করিলাম এবং তাঁহাদিগকে সেখানে সামান্য কিছু সময় অপেক্ষা করিতে অনুরোধ জানাইলাম যাহাতে আমাদের জিনিষপত্র ঘাটে নামাইয়া দিয়া ঐ এক্কা তাঁহাদিগকে ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিতে পারে। কিন্তু নৌশেরআলি সাহেব ধন্যবাদ জানাইয়া পদব্রজেই রওনা হইলেন। আকুরাঘাটে নৌকায় উঠিয়া আমরা ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিলাম এবং মন্মথদা ও যতীনদা অচিরে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

বিভূতিবাবু আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—মিতে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? চল বাইরে গিয়ে বসা যাক্!

আমার ঘুম আসিতেছিল না তাই চট করিয়া তাঁহার প্রস্তাবে রাজী হইয়া গেলাম।

তমসাচ্ছন্ন রজনীর বিরাট নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বর্ষার খরস্রোতের উপর দিয়া নৌকাখানি ধীর মন্থরগতিতে উজাইয়া চলিতেছিল। উপরে লঘু ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ম্লান নক্ষত্ররাজি, মাঝিদিগের তাল-লয়পূর্ণ আলোড়িত জলে শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া যেন দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। বিরাট রহস্যাবৃত সে এক এক অপরূপ দৃশ্য! নৌকায় ধাক্কা খাইয়া জলস্রোতের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, তীরভূমির বৃক্ষরাজি হইতে আগত নৈশ বিহঙ্গের কর্কশধ্বনি দূর পল্লী সারমেয়দিগের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, শিবারবের রাত্রিযাম ঘোষণা, জলকণাবাহিত স্নিগ্ধ সমীরণ প্রভৃতি মিলিয়া যেন কেমন আনমনা করিয়া তুলিল। প্রকৃতি-পাগল বিভূতি বাবুর চিন্তাধারা যে কোন সুদূরে পাড়ি দিতেছিল তাহা নির্ণয় করিবার সাধ্য আমার ছিলনা, তবে তাঁহার তুষ্ণীভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন তিনি প্রকৃতির বিরাট শুদ্ধ-রূপে মজিয়া রহিয়াছেন। একই দৃশ্যপট বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর দরুণ মানব-মনে বিভিন্ন চিন্তাস্রোত বহাইয়া থাকে। আকাশ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘাবৃত হইলে বিরহীমনে সজল কাজল আঁখি উঁকি দিয়া বিরহক্ষত সৃষ্টি করে আর শিখীদম্পতি মিলেনোৎসবের আনন্দে আপন আপন পক্ষপুট বিস্তার করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। অপর ক্ষেত্রে আসন্ন বর্ষণের আনন্দে দরিদ্র কৃষক সোনার ফসলের আশায় আশান্বিত হইয়া উঠে আর বর্ষার প্রকোপে নানাপ্রকার ব্যাধির সূচনায় চিকিৎসকদিগের চিন্তাধারা বিভিন্নমুখী হয়, তাই বোধ হয় মানব-মনের নাগাল পাওয়া দুঃসাধ্য! এইভাবে নীরবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর মাঝিদিগের আহ্বানে আমাদিগের সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল।

আপনারা ভিতরে আসুন বাবু, আমরা বাদাম তুলব। আর রাতও অনেক হয়েছে শুয়ে পড়ুন।

শুয়ে পড়ুন কথাটা শুনিয়াই যেন আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল। ছাদের উপর হইতে নামিয়া উভয়ে শুইয়া পড়িলাম। প্রত্যুষে নৌকা পিয়ারের ঘাটে লাগাইয়া মাঝিরা আমাদিগকে ডাকিয়া তুলিয়া দিল। সেখানে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া নিজ নিজ সুটকেশ ও ছাতা লইয়া রাস্তায় উঠিলাম। কিন্তু সে কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ ভদ্রবেশের উপযোগী ধোপদস্ত পাঞ্জাবী ও লম্বা কোঁচা দুলাইয়া চলিবার পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না। অগত্যা যে পর্য্যন্ত কাপড় টানিয়া তুলিলে লজ্জা নিবারণের ব্যাঘাত না হয় আমাদিগকে তাহাই করিতে হইল। যশোহর জেলার এই অঞ্চলের যে সকল সদ্গোপ জাতীয় গো-চিকিৎসক পল্লী অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ায় অথবা মফঃস্বল কোর্টের সমনজারীর পেয়াদাদিগের যে চিত্র সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয়, অপরিচিত পথিক হয় তো আমাদিগকে গো-চিকিৎসক অথবা সমনজারীর পিয়ন বলিয়া অনুমান করিয়া লইতেছিল—কারণ আমাদের জুতা পদযুগলকে বঞ্চিত

রিয়া হস্তে উঠিয়াছিল, পরিধেয় বস্ত্র জানু অতিক্রম রিয়া কটিদেশ পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উত্থিত, গাত্রাবরণ দ পাঞ্জাবী ম্রিয়মান অবস্থায় স্কন্ধে বিলম্বিত এবং দণ্ডাগ্রভাগে সমারূঢ় সুটকেস পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন। থাপি আমাদের ভাগ্য ভাল বলিতে হইবে যে, সে ঞ্চলে তখনও বোধহয় গোজাতির ভিতর কোলা অথবা সে রোগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই নতুবা পথিপার্শ্বস্থ পক্ষী তে গো-ব্যাধির চিকিৎসা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া তো বিড়ম্বিত হইতে হইত। অপর দিক হইতেও গো সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে যে, আমাদিগকে অভ্যর্থনা রিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকের দল এ পথে কেহ আগুয়ান নাই। বাণীমন্দিরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূজারী এবং দের সহচরগণ যে এরূপ বিকৃত রুচিসম্পন্ন হইতে রেন তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইলে বোধকরি সে যাত্রা মাদিগের সাহিত্য সভায় প্রবেশ লাভ করা দুরূহ হইত।

প্রায় একমাইল এইভাবে চলিবার পর নড়াইল মিদারবাবুদিগের পূর্ব্বপুরুষ প্রবল প্রতাপান্বিত রতন বুর নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত রতনগঞ্জে চিত্রা বক্ষে নরায় নৌকা আরোহণ করিলাম। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই মরা নড়াইল পৌঁছিব। সুতরাং রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের র্ব্বে প্রেক্ষাগৃহে অপেক্ষমান সুসজ্জিত অভিনেতার ন্যায় মরা পরিষ্কার ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়া ও জল টেরি কাটিয়া ড়াইল ঘাটে অভ্যর্থিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইলাম। র্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বে আমরা নড়াইল পৌঁছিয়াছি তরাং আমাদিগের আগমন বার্ত্তা সম্মিলনের উদ্যোক্তা থবা স্বেচ্ছাসেবক কাহারও নিকট পৌঁছায় নাই।

অগত্যা নৌকা হইতে নামিয়া আমাদের পরিচিত সেখানকার সাবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সুকবি ও প্রবন্ধকার শ্রীযুক্ত অজিত কুমার সেন, যাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় ও ত্নে সাহিত্য সম্মিলন সম্ভব হইয়াছিল তাঁহার বাসায় আসিয়া উঠিলাম।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভাধিবেশনের পর অনিবার্য্য কারণে আমাদিগকে সেই রাত্রেই পুনর্যাত্রা করিতে হইল। নদীমাতৃক দেশ নড়াইল; সেখানে স্থল পথের উপযুক্ত যানবাহনের একান্ত অভাব। কিন্তু কর্দ্দমাক্ত পথে বিশেষতঃ অন্ধকার রাত্রে দুই আড়াই মাইল চলিয়া পিয়ারের ঘাটে নৌকা ধরা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য; তাহা ব্যতীত অজিত বাবুর আতিথেয়তায় আমাদের প্রত্যেকের দৈহিক ওজনও সাময়িকভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। অবশেষে বহু অনুসন্ধানের পর একখানি খোলা গরুর গাড়ী যোগাড় হইলে আমরা সকলকে ধন্যবাদ দিয়া রওনা হইলাম। গরুর গাড়ী চড়িয়া সে দিন যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাহা বোধহয় রোল্‌স রয়েসেও দিতে পারে না।

নড়াইল আসিবার সময় যে এক্কায় আমরা আকরা-ঘাটে আসিয়াছিলাম যতীনদা তাহাতে পিছনের দিকে বসিয়াছিলেন। তাহার ঝাঁকানীতে নাকি তাঁহার পেটের নাড়ীতে বেদনা অনুভব করিয়া ছিলেন তাই এবার গরুর গাড়ীতে সকলের আগে উঠিয়া সম্মুখের দিকে চালকের পশ্চাদ্‌ভাগে স্থান সংগ্রহ করিলেন কিন্তু—

রমজান যান বঙ্গে!

কপাল যায় সঙ্গে॥ যতীনদারও হইল তাই। রাজবর্ত্মের কর্দ্দম বলীবর্দ্দদ্বয়ের পুচ্ছ সঞ্চালিত হইয়া তাঁহার শুভ্র ধুতি ও পাঞ্জাবী চিত্রিত বিচিত্রিত করিল, অধিকন্তু শকটবাহকদিগের লাঙ্গুলাঘাতে তাঁহার দেহ পাঠশালার গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাত অথবা পুলিসের মৃদুযষ্টি সঞ্চালনের প্রসাদ লাভও করিতেছিল। তাঁহার এ দুর্দ্দশায় আমাদিগকে আমোদ উপভোগ করিতে দেখিয়া যতীনদা রাগে গজ্‌ গজ্‌ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি এটা কিছুতেই বুঝিতে স্বীকৃত হইলেন না যে, আমরা দুইবাহু ক্রমাগত সঞ্চালিত করিয়াও বর্ষাকালের দংশমশকাদি কীট বিতাড়নে যে পরিমাণে বিরক্ত হইতে-ছিলাম তিনি বিনা আয়াসে সে উৎপাত হইতে রক্ষা পাইতেছিলেন। আমরা তিনজন আনন্দে এবং যতীনদা বিরক্তিতে এ পথটুকু অতিবাহিত করিয়া সকলে পিয়ারের ঘাটে নিযুক্ত নৌকায় আরোহণ করিলাম আর যতীনদা নৈশভোজনের গুরুভার কিঞ্চিৎ লাঘব করিবার জন্য রাস্তার অপর পার্শ্বে নৌকার সন্নিকটে আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও বসিলেন—সর্প-ভয়ে কিছুতেই দূরে যাইতে রাজী হইলেন না।

গত রাত্রি প্রায় একপ্রকার বিনিদ্র অবস্থায় কাটিয়াছিল সে কারণ নৌকা ছাড়িলে সর্ব্বাগ্রে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। গভীর রাত্রে হঠাৎ হুড়ুম হুড়ুম দুড়ুম দুড়ুম শব্দ এবং বিভূতি বাবুর ত্রস্ত তাগিদ আমার গাঢ় নিদ্রা ভঙ্গ করিল। কিন্তু ব্যাপার কি অনুমান করিতে না পারিয়া কেমন যেন হতবাক্ হইয়া গেলাম। হস্তদ্বারা নিদ্রাজড়িত নয়ন মার্জ্জনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি, এত হট্টগোল কিসের?

মন্মথদা ব্যস্তভাবে বলিলেন—আরে সর্ব্বনাশ হচ্ছিল আর একটু হলে যতীন জলে পড়ে যাচ্ছিল আমি পা ধরিয়া না টানিলে মহা বিপদ ঘটিত হে।

যাক্ বাঁচা গেল বিপদ তাহা হইলে ঘটে নাই। উপক্রমণিকাতে এত কাণ্ড!

মাঝি বলিতেছে—আপনি পেচ্ছাপ যাবেন তা বললেই হ'ত না হয় ডাঙ্গায় নামিয়ে দিতাম—ঘুমচোখে অত ধারে কেউ বসে।—

যতীনদা যে লজ্জিত হইয়াছেন তাহা চাপা দিবার জন্য তিনি মাঝিকে অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন—নাও নাও তোমার আর ওস্তাদি কত্তে হবে না—যা কচ্ছ তাই কর—মন্মথদা ও বিভূতি বাবু কি যেন বলিবার উপক্রম করিলেন কিন্তু যতীনদা রাগিয়া উঠিলেন বলিয়া তাঁহারা আর ঘাঁটাইলেন না। কিছুক্ষণ পরে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা হইত না তাহার তালিকা বিভূতি বাবু মন্মথ-দা ও মাঝি যখন পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত করিতেছিলেন তখন যতীনদা প্রায় মারমুখো হইয়া উঠিতেছিলেন। প্রসঙ্গটা মাত্রা ছাড়াইয়া যখন তিক্ততায় পর্য্যবসিত হইবার উপক্রম করিল তখন আমি মধ্যস্থ হইয়া সকলকে থামাইয়া দিলাম। ঝড়ের পর যেন প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিল। আমরা নির্ব্বাক হইয়া শুইয়া পড়িলাম। আকরার ঘাটে নৌকা ভিড়াইয়া মাঝি যখন আমাদিগকে ডাকিয়া তুলিল পূর্ব্বগগনে তখন উষার অবতরণিকা প্রকাশিত হইতেছে।

ঘাটে উঠিয়া আমরা প্রমাদ গণিলাম। যে এক্কা আমাদিগকে শিজিয়া ষ্টেশন হইতে পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছিল, পুনরায় ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তাহারই নিযুক্ত করিয়া বার বার অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার তো ট্রেন ধরিবার তাগিদ ছিল না তাই সে নিশ্চিন্ত আরামে আপন কুটীরের ছিন্ন মলিন শয্যায় প্রভাতের আলস্যজড়িত নিদ্রাটুকু উসুল করিতেছিল।

অগত্যা আমাদিগকে অসি ছাড়িয়া বাঁশী ধরিতে হইল অর্থাৎ বেশ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক গোদাগা বেশে সুটকেস কাঁধে ঝুলাইয়া ষ্টেশনের পথে রওনা হইলাম। পথে চলিবার সময় যে সমস্ত আলাপ চলিল বলা বাহুল্য তাহার সবটুকুই যতীনদার গত রাত্রের ঘটনা কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু ঘটনার পর তিনি যে মৌন অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাই রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু আমাদের বাক্যবাণ ও সদুপদেশ মধ্যে মধ্যে তাঁহার ব্রত ভঙ্গ করিতেছিল। মন্মথদা মাঝির সতর্কতা বাক্যের পুনরুল্লেখ করিয়া বলিলেন—আচ্ছা তুই নৌকার অত ধারে বসতে গেলি কেন? জলের ব্যাপার, মানুষ একটু সাবধান হয়ে চলে তো—বিরক্তভাবে যতীন-দা উত্তর করিলেন—নে নে তোর আর আমাকে নৌকোর ব্যাপার শেখাতে হবে না—ছোট বেলায় যশড়ার গঙ্গাই ছিল আমাদের বাড়ীঘর, সে সব খবর তুই কি জানবি—বলে চোদ্দ বছর গাড়ী চালিয়ে এলাম—উনি আবার আমায় গাড়োয়ানী শেখাতে এলেন—

বিভূতি বাবু বলিলেন—তা আপনি অত রা...ছেন কেন? মন্মথদা অন্যায় কথাটা কি বলেছেন?

—নেন মশায় খুব হয়েছে আপনার আর ফোড়ন দিতে হবে না, আপনাদের চিনতে আমার বাকী নেই। কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার বিভূতি বাবু বলিলেন—বিষ্ণুপুর সাহিত্য সম্মিলনে যাওয়ার জন্য বোধ হয় নিমন্ত্রণ আসবে—মন্মথদা যাবেন তো? মিতে?

আমরা উভয়ে সম্মতি জানাইলাম। যতীনদা কোন কথা বলিতেছেন না দেখিয়া তিনি যেমন জিজ্ঞাসা করিলেন—যতীনদা—

ঝাঁঝিয়া উঠিয়া যতীনদা বলিলেন—গুখুরি হয়েছে মশায় আপনাদের সঙ্গে এসে। আর জ্বালাবেন না খুব শিক্ষা হয়েছে—আপনাদের সঙ্গে স্বর্গে নিয়ে গেলেও আর যাব না, তা তো বিষ্টপুর দেখাচ্ছেন—বলে এখন ভালয় ভালয় বাড়ী পৌঁচতে পাল্লে বাঁচি।

চায়ের দোকানে

(গল্প)

শ্রীপ্রসাদ রায়

আমাদের গলিটা যেখানে বাজেশিবপুর রোডের সঙ্গে শেছে ঠিক তার বাঁ-হাতি মোড়ের উপর "কাল হাজরা"র য়ের দোকান। (আমার ঘরের পূবের জানালাটা খোলা কলে—কালর দোকানটা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, থাবার্ত্তাও শোনা যায়।) আধুনিক কেতার দোকান হলেও আশেপাশের সমস্ত লোকের কাছেই কাল-জরার দোকান খুব পরিচিত। বহুকালের পুরাতন কান, আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। র কাকা নরেন হাজরা যখন এই দোকান প্রতিষ্ঠা করে খন এ অঞ্চলে চায়ের দোকান আর ছিল না। কাল কটু বড় হতেই স্কুল ছেড়ে দিয়ে কাকার দোকানে বয়-গিরিতে বাহাল হ'ল। এখন কাকা মারা যাওয়ায় সে-ই দাকানের মালিক।

তখনও অন্ধকার সম্পূর্ণ কাটেনি, কাল দোকান খুলে থমেই উনুন ধরালে। ইতিমধ্যে দোকানের বয় কানাই সে গেল। তার নিত্য কর্ম—প্রথমে দোকানের আল-মারীর পিছনে রক্ষিত ঝাঁটাটি বার ক'রে ঘর ঝাট দেওয়া বং বহুদিনের পুরাতন একখণ্ড অতি মলিন বস্ত্রখণ্ড বার রে টেবিল চেয়ারগুলো মুছে ভাঙ্গা একখানা পাখা নয়ে উনুনে হাওয়া দিতে লাগল। তার পর উনুন সম্পূর্ণ রে উঠবার আগেই এলুমিনিয়মের জলের হাঁড়িটা তার পর বসিয়ে দিয়ে কাল চা চিনি ইত্যাদি বার করে এবং াঠের বেঞ্চি দুখানাকে নামিয়ে প্রথমে দোকানের সামনে াস্তার উপর একধারে বসিয়ে রাখল।

এর মধ্যে ২।১ জন করে লোক আসতে আরম্ভ করেছে। রা রোজের খরিদ্দার, কাজেই কোন অর্ডার না দিয়ে ক একটি টীনের বা চীনে ফেরীওলার কাছে কেনা সস্তা মের কাঠের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। কেউ অধৈর্য্য হয়ে পাখা নাড়তে ব্যস্ত কানাইকে উদ্দেশ ক'রে বললে "একটু হাতটা চালা না বাবা! বেলা যে গড়িয়ে গেল।

বক্তার পাশে উপবিষ্ট প্রৌঢ় ব্যক্তিটি এতক্ষণ চোখ বুজে বোধ করি দুর্গানাম জপ করছিলেন। বলে উঠলেন —কি হে উপেন তোমাদের কটায়?

—আর কেন বল দাদা! এই এক বেঙ্গল টাইম নাকি করলে, তার ঠেলাতেই অস্থির তার পর আবার নোটিশ দিয়েছে ১০টার জায়গায় ৯টায় হাজির দিতে হবে। এবার হয়ত কোন্‌দিন বলবে সন্ধ্যার সময় খেয়ে এসে আপিসেই শুয়ে থাকতে হবে। নাও, বোঝো একবার।

—আরে ভাই বুঝি ত সব। কি করি বল, তোমার বৌদির একে বেতো শরীর তার উপর ভোরবেলা উঠে রান্না বসাতে হচ্ছে। মেজাজ যা হয়ে উঠেছে, ছেলেপুলে ভয়ে কেউ কাছে ঘেঁসে না। তাই সব ঝালটা আমার ওপর দিয়েই ঝাড়ছে। উঠতে বসতে সায়েবকে বাপান্ত করছে। শেষে দেখছি একটা ফ্যাসাদে না পড়তে হয়। সেদিন রবিবারে আপিসের কজন বন্ধু তাস খেলতে এসেছিল। তারা শুনে বলে, "ওহে গিন্নি কার পিতৃপুরুষকে অমন মধুর সম্ভাষণ করছেন।" অগত্যা বলতে হল আমার, আর কার। কি জানি ভায়া কার মনে কি আছে? শেষে গিয়ে সায়েবকে লাগাগ, তখন চাকরীটা নিয়ে টানাটানি।

এতক্ষণে চা তৈরি হয়ে গেছে। কানাই সকলের সামনেই এক এক কাপ ধরে দেয়।

কেউ বললে দুখানা নেড়ো আন্। কেউ বা হুকুম করলে একখান মাখন-বিস্কুট দিয়ে যা। একজন যুবক বলে উঠল আস্তে আস্তে, ডিম আছে নাকি কাল?

—ছোট না বড় ?

—ছোট, থাকে যদি একটা হাফবয়েল কর্।

—একটু দেরী হবে ভাই, এই চাটা নামিয়ে দিচ্ছি।

প্রায় সকলেই কথাবার্ত্তার মাঝে চায়ে চুমুক দিতে আরম্ভ করল কেবল সেই যুবক বসে রইল হাফবয়েলের অপেক্ষায় আর মাঝে মাঝে সম্মুখস্থ কাপে ঠোঁটে লাগিয়ে দেখে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল কি না? এবার দাদা বলে উঠলেন, "কাল তুই একটা হোটেল কর্, সকালে চা খেতে এসে একেবারে ভাত খেয়ে যাব, না হ'লে তোর বৌদির যে বেতো শরীর, চাকরী রাখা দায়—সেদিন মাত্র বলেছিলুম দেখ যুগলের অমন কচি বউটা; সে ত খুব সকাল রান্না করে; আপিসের খাতায় যুগলের এক দিনও লেট নেই। বাপরে আর যায় কোথা, কি বলে জানিস, তোরা সব ছোট ভাইয়ের মত তবু শোন—বলে কচি বউয়ের নামে যে নোলায় জল পড়ে, আঠাশ বছর ঘর ক'রে আমি বুড়ো হয়ে গেছি নয়? কুলীনের পুত্তুর ত, না হয় কচি দেখে আর একটা বে কর না, খুব সকাল সকাল পাঁচ ব্যঞ্জন রান্না করে দেবে। খেয়ে সেই মুখপোড়াদের গুষ্টির পিণ্ডি দিতে যাবে।

একজন প্রশ্ন করে ওঠে—মুখপোড়ারা কারা? আপিসের সাহেবরা বুঝি?

—আরে ভায়া চুপ চুপ—বলে দাদা এদিক ওদিক তাকায়, মেয়েমানুষের আবার কাণ্ডজ্ঞান আছে? বলে দশ হাত কাপড়ে যারা কাছা দিতে পারে না।

এমন সময় ফেরীওলা 'আনন্দবাজার' নিয়ে এল; দোকানের খরচেই একখানি কাগজ রাখা হয়। রাস্তার উপর বেঞ্চিতে যারা বসেছিল তারাই ব্যস্ত হয়ে কাগজখানা হকারের হাত থেকে নিয়ে খুলে বসল, দোকানের ভেতরে চেয়ারে যারা ছিল দু-এক জন থাকতে না পেরে উঠে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। বাকি যারা উঠল না তাদের মধ্যে কেউ বলে উঠল, "আরে একটু চেঁচিয়েই পড় না ভাই, সকলেরই হোক।" এই উৎসাহ-বাক্য পেয়ে যারা পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল তাদের মধ্যে একজন ফস্ ক'রে একখানা পৃষ্ঠা ছিনিয়ে নিয়ে টেবিলের উপর রেখে চেঁচিয়ে পড়তে আরম্ভ করলে। পড়া যা হয় টীকাটিপ্পনি হয় তার চেয়ে ঢের বেশী।

এবার দোকানে ঢুকল আমাদেরই পাশের বাড়ীর বিজয়বাবু। হাতে ভাঁজ-করা একটা ছোট থলে, উদ্দেশ্য চা খেয়ে একেবারে বাজার করে ফিরবেন। দোকানে ঢোকবার আগে প্রায় রাস্তা থেকে অর্ডার করলেন, "কাল! ভাই তাড়াতাড়ি এক কাপ চা দে।"

এদিকে দোকানের মধ্যে মস্কোর উপর বোমাবর্ষণ নিয়ে প্রবল বিতণ্ডা চলেছে। কেউ কেউ বলছে জার্মানদের এই দাবী একেবারে মিথ্যা না হ'লে কাগজে বিস্তৃত বিবরণ থাকত। কেউ বলে "বিস্তৃত বিবরণ কি আর বেরোয় ভাই।" আর একজন বলে ওঠে "কেন বেরুবে না? ইংলণ্ডের উপর বোমাবর্ষণের সমস্ত সংবাদ এমন কি ছবি পর্য্যন্ত দিচ্ছে।"

এবার বিজয়বাবু থাকতে না পেরে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বলে, আরে মস্কোর কথা যদি জানতে চাও তবে শোন—আমার এক ফ্রেণ্ড আছে আমাদের আপিসের ইন্‌স্পেক্টর, খুব বড় ফ্যামিলীর ছেলে, খোদ টিপু সুলতানের সাক্ষাৎ 14th generation. যুদ্ধের আগেই সে বিলেত গিয়েছিল। তার পর আর ফিরতে পারে না—শেষে রুশ কর্তৃপক্ষের অনেক খোসামোদ করে মস্কো হ'য়ে ব্লাডিভষ্টক থেকে জাহাজে ক'রে সম্প্রতি ফিরেছে। Condition ছিল মস্কোয় নামতে পারবে না। সেই বলে—আরে ভাই—মস্কোয় যখন গাড়ী থামল, তখন দিনের বেলা জানালা দরজা সব আগে থেকেই বন্ধ ক'রে দিয়েছে। শুধু পাইখানার শার্সিটা একটু খোলা ছিল।—সে যা দেখলুম ভাই, এক বিরাট ব্যাপার, ঐ যে নূতন হাওড়ার পোলের চারটা বড় বড় পোষ্ট হয়েছে ওর প্রায় কমসে-কম ৮।১০ গুণ উঁচু হবে, এই রকম জয়েষ্টের পোষ্ট সারা মস্কো জুড়ে পোঁতা আছে। ডাইভ-বোম্বারের পর্য্যন্ত তার ভেতর মাথা গলাবার উপায় নাই।"

—সেই হাফবয়েল ছোকরা কৌতূহলী হ'য়ে প্রশ্ন করে —তা হ'লে রুশ-বিমান কি ক'রে মস্কোর মধ্যে যাতায়াত করে?

—আরে ভাই শোনই না আগে সবটা, মস্কোর মধ্যে কি আর কোন বিমান ঘাঁটি আছে? সমস্ত মস্কোর বাইরে—আশেপাশে।

এমন সময় রাস্তা দিয়ে এক জন মাছ নিয়ে যাচ্ছিল, বিজয়বাবু মস্কোর বিবরণ ছেড়ে তাকে প্রশ্ন করলেন—কি মাছ হে?

—আজ্ঞে মৌরলা।

—দেখি দেখি নামাও না হে, কত ক'রে?

আট আনা, তাড়াতাড়ি আসুন বাবু বলে বেঞ্চিতে এক ছোকরার সাহায্যে সে ঝুড়ি নামালে।

দোকানের ভিতর থেকে অনেকেই উঠে গিয়ে—ঝুড়ির চার পাশ ঘিরে দাঁড়াল, রাস্তার পথিকও দু-একজন থেমে গেল।

—পুকুরের ত হে?

—আজ্ঞে হাঁ মশায়, মৌরলা কি আবার গাড়ীর হয়? এই পদ্মপুকুর থেকে আনছি।

—আট আনার কম নয়? সাত আনা করে হবে না?

—না মশায়, বলে ১৯৷৷০ টাকা করে আমার কেনা! নিন ত নিন, না হ'লে আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। বলে সে ঝুড়ি ধরে মাথায় তোলবার চেষ্টা করে।

—আহা-হা থাম না হে, আধ পো দাও দেখি—বলে একজন এগিয়ে গেল।

—মাছওলা তাড়াতাড়ি দাঁড়িপাল্লা বার করে আধ পো ওজন ক'রে ব্যস্ত ভাবে বলে ওঠে, ধরুন ধরুন কিসে দেব।

—আহা ও যে সব ছোট ছোট—বলে ভদ্রলোক নিজেই ঝুড়ির ধারে বসে পড়ে মাছ বাছতে সুরু করে।

—ও কি করেন মশায়, অত বেছে কি মৌরলা মাছ দেওয়া যায়। এই মাছটার কি হয়েছে মশায়? এটা যে আপনি ফেললেন?

বলে সে একটা মাছ দর্শকদের সামনে তুলে ধরে।

—নাও নাও, আমাকে এক পো দাও বলে আর একজন এগিয়ে আসে।

—আরে ধরুন না মশায়—আর পাঁচ জনকে দোবো নাকি? বলে মাছওলা রাস্তার উপরেই মাছ ঢালতে যায়।

ক্রেতা ব্যস্ত হয়ে আরে থাম থাম ক'রে কালর দিকে তাকিয়ে বলে, একটা ছেঁড়া কাগজ-টাগজ কিছু দে না ভাই।

কালর ইঙ্গিতে কানাই আলমারীর মাথা থেকে একটা পুরাতন ঠোঙ্গা এনে দেয়—ভদ্রলোক আধ পো মাছ তাতে ঢেলে নেয়।

আরও ২।১ জন বলে ওঠে—আরে আমাকে একটু কিছু দেনা ভাই।

কিনলে না কেবল বিজয়বাবু, প্রথম যে ডেকে নামালে ওকে। বলে—বাজারে যখন যেতেই হবে তখন আর এখানে কিনে লাভ কি?

উপস্থিত অনেকেই এক পো আধ পো করে মাছ কিনে ফেলে। কালু নিজেও আধ পো কিনে একটা ঠোঙ্গায় করে আলমারীর পাশে রেখে দেয়—খদ্দেরের ভিড়টা একটু কমলেই কানাইকে দিয়ে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবে।

মাছ কেনা হ'তে অনেকেই বাড়ী চলে গেল। ২।৪ জন যাদের চা খাওয়া হয় নি তখনও বা তেমন যাবার তাড়া নেই তারা পুনরায় এসে বসল।

আমাদের সেই দাদা এতক্ষণ বসে বসে মাছ কেনা দেখছিল। অমন টাটকা মৌরলা মাছগুলি দেখে দাদার লোভ যথেষ্ট হচ্ছিল কিন্তু উপায় নাই। তা হ'লে গিন্নি মুখ ঝামটা দিয়ে উঠবে "কি আমার ১০টা দাসীবাঁদী রেখে দিয়েছেন যে এক কাঁড়ি কুচো মাছ এনে হাজির। বলে আমার নিজের রোগের জ্বালায় মরছি।"

বিজয়বাবু চা খেতে খেতে দাদাকে জিজ্ঞাসা করলে "কই দাদা, মাছ কিনলে না যে?"

—না ভাই, তোমার বৌদি কুচো মাছ পছন্দ করে না—দাদা উত্তর দেয়।

—আর তাই দাম দেখো, শালার চুনো মাছ বলে কিনা আট আনা, বিজয়বাবু বলে ওঠে।

—আর ভাই মাছ-ফাছ কি আর আছে? আমাদের ছেলেবেলায় দেখিছি আমতার বাজারে এমন দিনে চার পয়সা করে ঐ সব মাছ বিক্রী হ'ত। তাই কেনে ক'জনে? শুনেছি পূর্ববঙ্গে এখনও কিছু কিছু পাওয়া যায় আমাদের আপিসের এক ভদ্রলোক বলছিল। •

"আরে মশাই কিছু কিছু কি বলছেন" এক ভদ্রলোক বলে ওঠেন। আমার এক ফ্রেণ্ডের বিয়েতে গেলুম যশোরে। হাঁ, মাছ বটে! যতগুলি পাত সবেতে একটা করে ৫ সের মাছের মুড়ো। বিয়ের পরের দিন সকালে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। দেখি কি বাজারে তোমাদের মত ঘুনকুঁচি ক'রে ক'রে এক পো আধ পোর ভাগা বিক্রী হয় না। বড় বড় রুই কাতলা গোটা গোটা নাও ত নাও না হ'লে নিরমিষ্যি খাও গিয়ে।

রাস্তায় বেঞ্চে বসে আমার দূর সম্পর্কের এক ভাই রবীন তার এক বন্ধুর সঙ্গে International team selection নিয়ে তর্ক করছিল। বড় বড় রুই কাতলার কথা কানে গেলে বাঙালীর মেছো ধাত কি ঠিক থাকে?—International থামিয়ে কোথায় মশায়, ব'লে তারা বক্তার মুখের দিকে চাইলে।

—সে এখানে নয়, এই ইষ্টবেঙ্গলের কথা হচ্ছিল।

—ইষ্টবেঙ্গলের কোথায়?—

—যশোরে।

রবীন টাটকা B. Com. পাস করে একজামিন দিয়ে চাকরীতে ঢুকেছে, ভূগোলে তার বেশ দখল আছে ব'লে গর্ব অনুভব করে, সুতরাং সাধারণের কাছে সেটা প্রকাশ করবার এমন সুযোগটা ছাড়তে পারে না। বলে বসল যশোর ইষ্টবেঙ্গল আপনাকে কে বললে মশায়? যশোর ত প্রেসিডেন্সি ডিভিসনে। ইষ্টবেঙ্গল ডিভিসনে মাত্র আপনার এই চারটা জেলা, ধরুন ঢাকা, মৈমনসিং, বরিশাল···

—আরে যে ডিভিসনেই হোক্ বাঁকা কথা হলেই আমরা ইষ্টবেঙ্গল বলে জানি। তার কথা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোক বলে উঠেন, কিছুক্ষণ আগে এক অপরিচিত ভদ্রলোক একধারে বসে এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে গেছে তখন সকলেই মাছ কিনতে ব্যস্ত ছিল। এখন অবসর পেয়ে দাদা প্রশ্ন করলেন—ঐ ভদ্রলোক যে কোণে বসে চা খেয়ে গেল ও কে হ্যা কাল?

—উনি নূতন ভাড়াটে এসেছেন আমাদের গলিতে ক্ষীরোদ ঘোষের বাড়ীতে, চাঁদপুরে না কোথায় ঢাকায় বাড়ী।

রবীন ফট করে বলে উঠল—আরে কোথায় ঢাকা একটা ডিভিসনের Head quarter আর কোথায় চাঁদপুর ত্রিপুরার একটা Sub-Division. তাও আবার একটা হল ঢাকা ডিভিসন্ আর একটা তোমার গিয়ে এই—

আরে কে জানে ভাই তোমার চাঁদপুর আর ঢাকা, তবে ইষ্টবেঙ্গলে বাড়ী এই পর্য্যন্ত জানি, কাল জবাব দেয়। এবার বিজয়বাবু বললেন আরে তাই বল। তাই দেখি সেদিন বিকেলে দুটি মেয়েমানুষ চটি পায়ে দিয়ে তোমাদের গলিতে ঢুকল। আমি ভাবি এ আবার বালিগঞ্জ কোথা থেকে আমদানী হল রে বাবা!

বিড়িতে একটা জোর টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দাদা বল্লেন—আরে ওরাই ত আমাদের দেশটাকে খেলে, তোমার দিদি বলে···

তার কথা শেষ না হইতেই সেই হাফবয়েল ছোকরা বলে উঠে—এ ওদেরও দোষ নয়—কারো দোষ নয়—এ হ'ল প্রগতি।

—বলি এ প্রগতি আনলে কে হ্যাঁ?

সেই ফ্রেণ্ডের বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিটি কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু রবীনের চোখে চোখ পড়ায় থেমে গেল।

ইতিমধ্যে একজন শাকওয়ালা রাস্তায় শাক নামিয়েছে দেখে অনেকেই উঠে সেদিকে চলল।

—দাদা চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে হিঞ্চে আছে নাকি হে?

—কে একজন উত্তর দিলে—"আছে।"

অগত্যা দাদাও উঠে গিয়ে আধ পয়সার কিনলে, কারণ গিন্নির সম্প্রতি অরুচি হয়েছে, হিঞ্চেটা খুবই ভালবাসে।

কেউ পুঁই, কেউ কলমি, কেউ হিঞ্চে ইত্যাদি এক আধ পয়সার কিনে ফেললে এবং আপিসের বেলা হওয়ায় অনেকেই আর দোকানে না ঢুকে বাড়ী চলে গেল।

এদিকে রবীনদের International খুব জমে উঠেছে; ডি, ব্যানার্জ্জিকে না দিয়ে সোমানাকে দেওয়া হ'ল কেন? পরিতোষ সিরাজদ্দিনের চেয়ে এমন কি খারাপ খেলে।

কাল হাজরা এক কালে ফুটবল খেলত এবং ভালই খেলত। আমাদের এদিককার দেশী টীমগুলির মধ্যে

(অর্থাৎ যারা Unregistered) ওর মত হাফ-ব্যাক অল্পই ছিল। সুতরাং এখনকার পড়ুয়া ছেলেরা বিশেষতঃ যারা ওর খেলা দেখেনি কেবল শুনেছে মাত্র ফুটবলের কথা উঠলে কালুর মতামতকে প্রামাণ্য বলে মনে করে। আপিসের বেলার জন্য বয়স্করা অনেকে চলে যাওয়ায় এবার জনকয়েক সম্প্রতি পাঠে ইস্তফা দেওয়া বেকার ছাত্র ও তাদের দলস্থ পাঠরত এমন কয়েকটি ছাত্র এসে জুটেছে।

তর্ক করতে করতে ওদের একজন কালুকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে—আচ্ছা কালুদা আমাদের "মণিদাস"কে কি classic player বলব না? (আমাদের কথাটা ব্যবহার করা হল এইজন্য যেহেতু "মণিদাস" হাওড়ার লোক)। কালু জবাব দেয় নিশ্চয়ই, মণিদার (মণিদাসের পরিবর্তে মণিদা কথাটা কালু ঘনিষ্ঠতাসূচক অর্থে ব্যবহার করে থাকে) মত হাফ্-ব্যাক তখনকার দিনে কোন ক্লাবে ছিল? আর এই যে তোমার সব হাফ্-ব্যাক International-এ প্লেস পেয়েছে লাগে ওরা মণিদার কাছে?

—শুনলি? ফুটবলের খবর রাখিস কিছু?

প্রতিপক্ষের মুখের অবিশ্বাসের ভাব তখনও কাটেনি দেখে কালুকে প্রশ্নকারী সেই ছেলেটি পুনরায় বলে উঠল—আচ্ছা কালুদা তুমি ত মণিদাসের কাছে training নিতে; নয়?

—আরে ভাই এই দোকানের ঝঞ্ঝাটে পড়ে খেলাটা ছেড়ে দিতে হ'ল, না হলে মণি-দা আমাকে বলেছিল মোহনবাগানে ভর্ত্তি ক'রে দেবে। পয়সা-কড়ি কিছুই লাগত না।

প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে সকলে কালু হাজরার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, আত্মপ্রসাদে বুকটা ফুলে ওঠে—নাহলে আজ হয়ত ও কুমার গোষ্ঠপালের মত একজন হয়ে উঠতে পারত।

এবার রবীনরাও উঠে পড়ল। কানাই বাড়ীতে পারলা মাছ পৌছে দিতে গেছে। যে দু-চার জন খদ্দের ছিল কালু নিজেই তাদের চা দেওয়া এবং টেবিল ও কাপ পরিষ্কারের কাজ করতে লাগল। ছাত্র ও বেকার ছাত্ররা পত্রিকাটিতে দু-ভাগ করে নিয়ে একদল বসেছে দোকানের মধ্যে—তাদের আলোচনার বিষয় ফুটবল ও ইন্টারন্যাশনাল এবং দু-তিনজন রাস্তায় বেঞ্চে বসে রেডিও প্রোগ্রাম এবং সিনেমা নিয়ে মেতে উঠেছে। বুঝলুম ওদের সিনেমার আলোচনা ফিল্ম থেকে ফিল্মষ্টারদের জীবনী ও চরিত্রে এসে পৌছেছে। একজন বলছে যতই তোরা ছায়া ছায়া করিস সবদিক দিয়ে cultured star যদি বলতে হয় ত 'শান্তিদেবী', কত বয়স ওর জানিস? আমার বড় জামাইবাবুর পিসীর বাড়ী টালিগঞ্জে; শান্তিদেবী ঠিক তাদের সামনের বাড়ীতে থাকে। বড়দির কাছে শুনলুম ওর বয়স ৪১ বছর। ১৮ বছরের ছেলে আছে ওর, কলেজে পড়ে। কিন্তু চেহারাটা কি রকম রেখেছে বল দিকি?

মেজাজটা বড় চড়া হয়ে উঠল—কে ঐ বকাটে ছোঁড়াটা? নগেন বাঁড়ুয্যের ছেলে নয়? দেব নাকি গিয়ে একটা থাবড়া কষিয়ে। শুনেছি ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ে; পাশ যা করবে ও তা মা-সরস্বতীই জানে। কেলোর চায়ের দোকানটাও হয়েছে যেন একটা আড্ডাখানা। Public nuisance, যত সব বকাটে ছোঁড়ার আড্ডা; ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একটা দরখাস্ত দিতে হবে দেখছি।

ক্রমে ওদের দলেরও দু-একজন করে উঠে যেতে লাগল, একটা কালু মত ঝাঁকড়া চুলওয়ালা ছেলে হাতকাটা গেঞ্জি গায়ে দোকানে এসে ঢুকল।

কালু তাকে জিজ্ঞাসা করলে "হ্যাঁরে কাত্তিকে, আজ কাজে যাসনি কেন?"

—ওখানে কাজ ছেড়ে দিয়েছি।

—কেন?

—ও শালা মিস্ত্রী বড় ছোটলোক। ২৮৲ মাইনে দেবে বলে নিলে, এখন বলে ২২ টাকা।

ছেলেটা বোধ হয় কালুর আত্মীয়, তাই কালু ওর সম্বন্ধে এত আগ্রহশীল, তাই পুনরায় বললে তা একটা কাজ যোগাড় না ক'রে ওটা ছাড়লি কেন?

সেও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, "দেখি কালু ত টানা-মোর্সে'মে যেতে বলেছে।"

আর লোকজন বিশেষ নাই, শুধু একজন বেকার, ইন-

সুয়োরের এজেণ্ট বসে খবরের কাগজের Wanted column পড়ছে। বেঞ্চি দুখানা রাস্তা থেকে তুলে ভিতরে রাখতে রাখতে কাল তাকে উদ্দেশ করে বললে—নগেনদা এবার উঠতে হয়।

—এই যে ভাই উঠি, বেলা কত হ'ল?

প্রায় ১২টা বলে কাল এক আঁটি পুঁই শাক ও একটা ঠোঙ্গায় কতকগুলো ঢেঁড়শ নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে রইল। ওর তরিতরকারী ও মাছ ইত্যাদির প্রাত্যহিক কেনাকাটা দোকানে বসেই সারতে হয়, বাজারে যাবার সময় হয় না। কানাই আঁচের কয়লাগুলো নাবিয়ে দিয়ে দোকানের দরজা তালাবন্ধ করে চাবিটা কালর হাতে দিলে। ও তখন চলতে আরম্ভ করেছে। বাঁ হাতে পুঁইশাকের আঁটির সঙ্গে চাবিটা ধরে নিয়ে কানাইকে উদ্দেশ করে বললে, বিকেলে আসবার সময় লেকের দোকান থেকে ২॥০ সের নেড়ো আনতে হবে।

একটা বুভুক্ষু কুকুর এতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, এবার উঠে এসে একধারে পড়ে থাকা কতকগুলো সিদ্ধ চায়ের পাতা শুঁকে শুঁকে বোধ করি কোন খাদ্যের আস্বাদ না পেয়ে লেজ গুটিয়ে রকের উপর শুয়ে পড়ল। ক্রমে রাস্তায় লোকজন কমে আসে। কালো রং মাখান দোকানের দরজায় খড়ি দিয়ে লেখা "এই ঘর ভাড়া দেওয়া যাইবে ইতি শ্রীকালিপদ হাজরা" এই কথাগুলি পথিকের চোখে পড়ে মনে হয় ঘরখানা বোধ হয় ভাড়া দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবিকই কাল একথা লেখেনি। খড়ি নিয়ে খেলা করবার সময় পাড়ার কোন দুষ্ট ছেলে হয়ত খেলাচ্ছলে লিখে থাকবে।

চৈত্রের দুপুর, পিচের রাস্তা আগুন হয়ে উঠেছে, একটা বুড়া হিন্দুস্থানী ফেরীওলা কলা চা-া-া-া-ই বলে একবার হাঁক দিয়ে বাজরা নামিয়ে রকের একধারে বসে পড়ে।

মাইকেল মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্য

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়

"যশোর আমার, যশোর আমার,
জন্মিল যেথায় সাহিত্য-বীর
যাহার জন্য তীর্থ হইল
বঙ্গে কপোতাক্ষ-তীর;
কাব্যে সৃজিল যে মধু-চক্র,
সে বরপুত্র ভারতীর
গৌড়বৃন্দ, চির আনন্দে
করিছে পান সুধার ক্ষীর
বাজুক যশোরে মিলন শঙ্খ
কম্পিত করি পবন ধীর
নৃত্য করুক দিব্য রঙ্গে
কপোতাক্ষ যমুনা নীর।"

(ললিতচন্দ্র মিত্রের যশোর-সঙ্গীত)

"জননী আমার
ভুলিলে কি আজি
কপোতাক্ষ-তীরে
ঝঙ্কার উঠিল কার?
সে যে রহিয়াছে
এ গৌড় জুড়িয়া
চির মধু-চক্র তার;
ওই কপোতাক্ষ
পুলিনে তোমার
মুরলী রবেতে তার
নাচিল আবার, কদম্বের মূলে
ব্রজের রতন সার।"

(বঙ্কিমচন্দ্র মিত্রের যশোর-মঙ্গল)

আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতি আমরা—আমরা আমাদের অতীত গরিমা ও আমাদের অতীত-যুগের কবিদিগকে ভুলিয়া গিয়াছি। আধুনিক এবং আধুনিকাগণ "ভারত-চন্দ্রকে খুব কমই পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বর গুপ্তকেও আমরা ভুলিয়াছি। ঈশ্বর গুপ্তের "প্রভাকরে"র রশ্মি এক সময় বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল প্রভৃতি কবিগণকে তাঁহাদের কাব্য-জীবনের পথে আলোকপাত করিয়াছিল। সেই ঈশ্বরগুপ্তকেও যেন আমরা আর স্মরণপথে আনিতে পারি না। বর্ত্তমান যুগে স্কুলপাঠ্যের মধ্যে কদাচিৎ তাঁহাদের দুই-একটি কবিতা দেখা যায় মাত্র। দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী জাতি আমরা—আমাদের জীবনে এমন এক দিন আসিবে, যেদিন আমরা বাঙ্গলার কাব্যজগতের সব্যসাচী রথী মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এমন কি রবীন্দ্রনাথকেও ভুলিব না তা কে জানে?

আজ হইতে প্রায় ১১৮ বৎসর পূর্ব্বে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে এক বিরাট প্রতিভা আমাদিগের এই অতীত গরিমা-আলোক-দীপ্ত যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই আমাদের বিদ্রোহী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। যে সময় মধুসূদন সাগরদাঁড়ীর দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন দত্ত-বংশের বিশেষ সমৃদ্ধির সময়;—মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত কলিকাতায় তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের একজন অতি প্রতিষ্ঠাবান ব্যবহারজীবী ছিলেন। মধুসূদনের জীবনচরিতকার যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন—"যেরূপ আদরে এবং প্রশ্রয়ে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল, কোটীশ্বরের সন্তানেরও বোধ হয় সেরূপ হয় না।"—কিন্তু ঐশ্বর্য্যের মন্দিরে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াও মধুসূদনের অধ্যয়নের আসক্তির কখনও বিরতি ছিল না; ভবিষ্যতে যে যুবক বাঙ্গলা, সংস্কৃত, তেলেগু, তামিল, হিব্রু, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজী, জার্ম্মাণ, ল্যাটীন প্রভৃতি ভাষাতে পারদর্শী হইয়াছিলেন, বাল্যে ও কৈশোরে তাঁহার সে প্রতিভার আভাস দেখা গিয়াছিল। জীবনের কোন সময়েই বিদ্যা উপার্জ্জনে তিনি কখনও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। মধুসূদন যখন মাদ্রাজে শিক্ষকতা করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine—6 to 8 Hebrew, 8 to 12 School, 12 to 2 Greek, 2 to 5 Telugu and Sanskrit, 5 to 7 Latin and 7 to 10 English."

যৌবনে মধুসূদন যখন কলিকাতায় হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, হিন্দু কলেজের শিক্ষা তখন বাঙ্গলা দেশের গৌরবস্থানীয় ছিল। মহামতি **D'Rozio**, Captain Richardson, Ridge, Halford, রামচন্দ্র মিত্র, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ তখন হিন্দু কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই পাদ-মূলে বসিয়া মধুসূদন শিক্ষালাভের অবসর পাইয়াছিলেন। ইঁহারাই অকৃপণ করে মধুসূদনের সম্মুখে জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, জগদীশনাথ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, ভোলানাথ চন্দ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক প্রভৃতি সেই সময়কার হিন্দু কলেজের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী মধুসূদনের সহপাঠী এবং সমসাময়িক ছিলেন।

এই সময়েই মধুসূদনের কবিত্ব শক্তির বিকাশ আরম্ভ। যে প্রকৃতি-দত্ত গুণে মধুসূদন আজ "মেঘনাদ বধ" এবং "বীরাঙ্গনা কাব্যে"র অমর কবি, হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন অবস্থায় তার আরম্ভ। হিন্দু কলেজের কাব্যের অধ্যাপক Captain Richardson স্বয়ং কবি ছিলেন। Richardson-এর Shakespear এবং Milton আবৃত্তি, Rechardson-এর কাব্য অনুশীলন, সমস্তই যুবক মধুসূদনের জীবনে এক অভিনব আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। অতি শৈশবের পঠদ্দশায় নির্ম্মল-সলিল কপোতাক্ষ-নদ-বিধৌত কানন-কুন্তলা সাগরদাঁড়ী গ্রামের বটবিটপীর স্নিগ্ধচ্ছায়ায় বসিয়া বালক মধুসূদন ব্যাস এবং বাল্মীকির যে মহাকাব্যদ্বয় পাঠ করিতেন এবং যাহার প্রভাব মধুসূদনের অন্তরে কবিত্ব-শক্তির অঙ্কুর আনিয়া দিয়াছিল, কৈশোরে এবং যৌবনে হিন্দু কলেজে মহামতি Richardson-এর শিক্ষায় এবং দীক্ষায় সে শক্তি ক্রমশঃ বিকশিত হইতে লাগিল। এই সময়ে England গমনে তাঁহার বাসনারও উন্মেষ হইয়াছিল। তাঁহার প্রিয় কবি Milto

Shakespear, Byron, Dante-এর জন্মভূমি দর্শন, তাঁহার জীবনের একটি লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বাঙ্গলার সেই নবযুগের পুনরভ্যুদয় কালে বাঙ্গলার যুবকেরা—বিশেষতঃ কলেজের ছাত্রেরা সাহেবী ভাবাপন্ন হইবার বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা পাইতেন। ইংরেজী শিক্ষার নূতন চাকচিক্যে মোহিত হইয়া সে যুগের শিক্ষিত যুবকেরা অনেকে "উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত, অমিতব্যয়ী, বিলাসী, ধর্ম্মহীন এবং সমাজনীতি জ্ঞানহীন" হইয়াছিলেন। সেই স্রোতে যাঁহারা গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন, ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহাদের অনেককেই অনুতপ্ত হইতে হইয়াছিল। মধুসূদন সেই স্রোতকে এড়াইতে পারেন নাই—কিন্তু তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায় সেই স্রোতের সম্মুখে অটল হিমাদ্রির মত দাঁড়াইয়াছিলেন। ভূদেবকে সেই স্রোত স্পর্শ করিতে পারে নাই—কিন্তু মধুসূদন তাহাতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মধুসূদন তাঁহার স্নেহময়ী মাতা জাহ্নবী দাসীকে এবং স্নেহময় পিতা রাজনারায়ণ দত্ত মহাশয়কে কাঁদাইয়া হঠাৎ খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। খৃষ্টান হইবার সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের নামের পূর্ব্বে "মাইকেল" শব্দ যোজিত হইল। পিতা-মাতার অজ্ঞাতসারে এবং তাঁহাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম গ্রহণে মধুসূদন নিজের হৃদয়েও শান্তি পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। মাদ্রাজে গেলে সুখী হইতে পারিবেন মনে করিয়া (সম্ভবতঃ ১৮৪৮ সালে) হঠাৎ এক দিন সকলের অজ্ঞাতসারে মধুসূদন বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিলেন। মাদ্রাজে তিনি প্রায় ৮ বৎসর ছিলেন; তথায় তিনি প্রথমে Mactavis Rebecca নাম্নী একটি Scotch বালিকাকে বিবাহ করেন। কয়েক বৎসর পরে বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মধুসূদন Madras Presidency College-এর অধ্যক্ষের কন্যা Marry Henriettaকে পত্নী ভাবে গ্রহণ করেন। এই পতিপরায়ণা সাধ্বী ইংরাজ-মহিলা মধুসূদনের শেষ জীবন পর্য্যন্ত সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, অভাবে-অভিযোগে হিন্দু রমণীর ন্যায় স্বামীর সেবাই করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদনের এই স্ত্রীর গর্ভেই তাঁহার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা এবং পুত্র Milton Dutta (মিলটন দত্ত) জন্মগ্রহণ করেন।

মাদ্রাজেই মধুসূদনের সাহিত্য জীবনের প্রারম্ভ। মাদ্রাজ হইতেই তাঁহার ইংরেজী কবিতা এবং কাব্য Visions of the Past এবং Captive Lady সর্ব্বপ্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া মধুসূদনকে তথাকার কৃত-বিদ্য পণ্ডিতসমাজে এক অতি বিশিষ্ট স্থান দান করিল। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই মধুসূদন বুঝিলেন যে, বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরেজীতে কবিতা বা কাব্য লিখিয়া ইংরাজ কবিদিগের তুলনীয় হইতে যাওয়া একটা মরীচিকার পিছনে ধাওয়া মাত্র। মহামতি বেথুন মধুসূদনের ইংরাজী কাব্যের অতীব প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মধুসূদনকে ইহাও বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর পক্ষে মাতৃভাষার সেবাই প্রশস্ত। মহামতি বেথুনের উপদেশে মধুসূদনের হৃদয়ে বাঙ্গলা ভাষার প্রতি অনুরাগ উদ্দীপ্ত হইল, তাই উত্তরকালে মধুসূদন আমাদের শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"I should scorn the pretensions of that man to be called educated who is not master of his own language."

সুদীর্ঘ আট বৎসর কাল মাদ্রাজে অবস্থানকালে মধুসূদন বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা এবং ভাষাতত্ত্ব এক রূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন, তাই মাতৃভাষার সেবায় দীপ্ত মধুসূদনকে বাঙ্গলা দেশ হইতে পুনরায় রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ চাহিয়া পাঠাইতে হইয়াছিল এবং এই সময়েই তিনি তাঁহার বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—

"Those books have fired my imagination. * * * I fully concur with Mr. Bethune. * * * I am preparing for the great object of embellishing the tongue of my father."

বহু দিন মাদ্রাজে অবস্থানের পর, বাঙ্গলা দেশে প্রত্যাগমন করিয়া মাইকেল মধুসূদন বঙ্গবাণীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিলেন। সেই সময়ে বঙ্গদেশে বঙ্গ-ভাষার এক পরিবর্ত্তনের নবযুগ আসিতেছিল। শুধু বঙ্গ-ভাষার নহে, ইংরাজের সংস্পর্শে বাঙ্গলার রাজনীতি ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে এবং বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্মজীবনে, সর্ব্ব ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র,

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি প্রতিভাবান পণ্ডিতগণ বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ঠিক এই সময়েই মাদ্রাজ হইতে মধুসূদনের বাঙ্গলা দেশে আবির্ভাব। সেই পরিবর্ত্তনের যুগে—বাঙ্গলার কাব্যাকাশের প্রভাকর ঈশ্বর গুপ্তের অন্তর্দ্ধানের যুগ শেষে—মধুসূদনের যুগ আরম্ভ হইল। এই যুগসন্ধিক্ষণে মধুসূদনের অপূর্ব্ব সৃজনী-প্রতিভা, বাঙ্গলার সাহিত্য-ক্ষেত্রকে এক অভাবনীয় ভাবধারায় প্লাবিত করিল। নূতনের বন্যায় পুরাতন ভাসিয়া গেল; বাঙ্গলা সাহিত্যে পূর্ব্ব সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি কোথায় চলিয়া গেল। 'মেঘনাধবধে"র গম্ভীর ঝঙ্কার বাঙ্গলা সাহিত্য-গগনে ঝঙ্কৃত হইল। বিজয়ী মধুসূদন কাব্যে, নাটকে, প্রহসনে বঙ্গবাণীর চরণে নিত্য নব নব পুষ্পাঞ্জলি দিতে আরম্ভ করিলেন।

আজ যে রঙ্গমঞ্চ বাঙ্গালার সহরে সহরে পল্লীতে পল্লীতে বিরাজ করিতেছে ইংরাজী ১৮৫৭।৫৮ সালে সহর কলিকাতাতে তাহা ছিল না বলিলেও চলে। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির উদ্যোগে কলিকাতা বেলগাছিয়ার বাগানে যে রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তথায় শ্রীহর্ষের "রত্নাবলী" নাটক বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়। কিন্তু সাহেবেরা "রত্নাবলী" বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া মধুসূদন উহার ইংরাজী অনুবাদ করিলেন। বেলগাছিয়ার নাট্যশালা হইতেই বাঙ্গালী, বাঙ্গলা নাটকাভিনয়ের রসাস্বাদ গ্রহণ করিয়াছিল এবং মাইকেল মধুসূদনই বাঙ্গলার আধুনিক কালের প্রথম নাটক-রচয়িতার ভার লইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম নাটক 'শর্ম্মিষ্ঠা" এবং তার পর ক্রমে ক্রমে তাঁহার "পদ্মাবতী" ও "কৃষ্ণকুমারী" নাটক দেখা দিল। পুরাণ হইতে 'শর্ম্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী" আখ্যায়িকা গ্রহণ করিয়া, তাহাই মধুসূদন তাঁহার সুনিপুণ এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ তুলিকা স্পর্শে নাটকে রূপায়িত করিয়াছিলেন এবং মহামতি Todd-এর রাজস্থান হইতে কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস আহরণ করিয়া বাঙ্গলার নাট্য সাহিত্যে নূতন যুগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নাটকের সঙ্গে সেই সময়কার সামাজিক নক্সা "একেই কি বলে সভ্যতা?" এবং "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া" রচিত হইল—নাট্য-সাহিত্যের সহিত সামাজিক প্রহসন আঁকিতেও মধুসূদন সিদ্ধহস্ত, শেষোক্ত পুস্তক দুইখানির দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল। বর্ত্তমান রুচির কষ্টিপাথরে যদি মধুসূদনের নাটকগুলিকে এখন বিচার করা যায় তবে এখন তাহা সুপাঠ্য অথবা অভিনয়ের বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয় না—কারণ ঐ সমস্ত নাটক কৃত্রিমতাপূর্ণ, অযথা আড়ম্বর এবং নানাস্থান অতি সাধু ভাষায় ও অযথা অলঙ্কারে পরিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাঙ্গলার নাট্য সাহিত্যের যে অন্ধকার যুগে উহা রচিত হইয়াছিল সে-যুগে সুধী সমাজের নিকট উহা অতীব আদরণীয় হইয়াছিল। মধুসূদন নাট্য-সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম যে পথ দেখাইয়াছেন সেই পথেই এখনও বঙ্গীয় নাটক-রচয়িতাগণ চালিত হইয়া নূতন নূতন দৃশ্যকাব্য ও নাটকে বাঙ্গলার নাট্য-সাহিত্য সমৃদ্ধ করিতেছেন। মধুসূদনের নাটকের চরিত্রাবলী অভিনয়ে নটকুলচূড়ামণি গিরিশচন্দ্রের নাট্য জীবন আরম্ভ এবং মধুসূদনের নাটকসমূহ হইতেই গিরিশচন্দ্রের নাট্য-সাহিত্য জীবনের প্রেরণা আরম্ভ হইয়াছিল।

মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন। আনুমানিক ১৮৫৮ সালে মধুসূদন তাঁহার "পদ্মাবতী" নাটক রচনা কালে সর্ব্বপ্রথম তাহাতেই তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। পদ্মাবতী নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কঞ্চুকীর এবং চতুর্থাঙ্কের প্রথম ও দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে "কলির" "মুরজার" "শচীর" এবং শেষ অঙ্কে শেষ দৃশ্যে "নারদের" কথোপকথনে কিছু কিছু অমিত্রাক্ষর ছন্দ দেখা যায়। আমাদের মনে হয় পরীক্ষামূলকভাবেই মহাকবি "পদ্মাবতী' নাটকে ঐ নূতন ছন্দ প্রবর্ত্তিত করেন। তারপর প্রায় এক বৎসর ধরিয়া উক্ত ছন্দ নাটকের আয়ত্তে আসিলে ১৮৬০ সালে যখন "তিলোত্তমা-সম্ভব" কাব্য রচিত হয়, তাহার সমস্ত সর্গগুলিই অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি "তিলোত্তমা"র অনেক স্থল দুর্ব্বোধ্য শব্দে, এবং কষ্টকল্পিত অর্থে পরিপূর্ণ—কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাঙ্গলার তদানীন্তন বহু মনস্বী এবং মনীষিগণ ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরগুপ্তের মিত্রাক্ষর, পয়ার ও ত্রিপদী

ছন্দ অপেক্ষা বীর-রসাশ্রিত গুরুগম্ভীর অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গলার সাহিত্যে অধিকতর উপযোগী ছন্দ বলিয়া প্রকাশ করেন। এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গালার সাহিত্যে বিপ্লব আনিয়া এক নূতন যুগ সৃষ্টি করিল। এই যুগ-স্রষ্টাই বিপ্লবী কবি মধুসূদন। "তিলোত্তমা"র পর ১৮৬১ সালে মধুসূদনের "মেঘনাদবধ কাব্য" এবং ১৮৬২ সালে তাঁহার "বীরাঙ্গণা" কাব্য প্রকাশিত হয়। আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ বিশ্বাসী মধুসূদন সমগ্র "মেঘনাদবধ" এবং "বীরঙ্গনা" অমিত্রাক্ষর ছন্দেই বিরচিত করেন। "মেঘনাদ" ও "বীরাঙ্গনা" বীর-রসপূর্ণ অমিত্রাক্ষর ছন্দে এবং মধুর পদবিন্যাসে ও লালিত্যে পূর্ণ। "তিলোত্তমা"র দোষগুলি "মেঘনাদ" ও বীরাঙ্গনা"র কোন স্থানেই পরিদৃষ্ট হয় না। "মেঘনাদবধ" কাব্য মধুসূদনের সাহিত্য রসক্ষেত্রের বিজয়-বৈজয়ন্তী, "মেঘনাদ বধে"ই মধুসূদনের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ। সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় যে গম্ভীর ভাষা এবং ভাবধারা "মেঘনাদবধের" প্রতি ছত্রে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, বঙ্গ-ভাষাতে মধুসূদনের তাহা অপূর্ব্ব দান। মহাকবি "মেঘনাদবধ" এবং"ব্রজাঙ্গনা" কাব্য এক সঙ্গেই আরম্ভ করিয়াছিলেন। মেঘনাদের বীর-রসপূর্ণ গম্ভীর ভেরী নিনাদের সঙ্গে "ব্রজাঙ্গনা"য় সুললিত, কোমল, কান্ত এবং কমনীয় বাঁশরীর স্বর-লহরী মহা-কবির অপূর্ব্ব ক্ষমতার পরিচায়ক। ইউরোপীয় কবিশ্রেষ্ঠ Ovid-এর Heroic Epistles-এর অনুকরণে মহাকবি তাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। "সহস্র দলে বিকশিত মধু দিয়া ভরা" আমাদের এই বাঙ্গলা ভাষার "বীরাঙ্গনা কাব্য" যখন আমরা পড়ি, তখন সত্য-সত্যই মনে হয় "এমন অমৃত এদেশে কে এনেছিল?" উচ্চস্তর সঞ্চালিনী কল্পনার লীলায়িত তরঙ্গ-ভঙ্গের সহিত মধুসূদনের অতি তেজস্বী এবং স্পন্দনশীল বীর-রসপূর্ণ ভাষা তাঁহার এই নবসৃষ্টি বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রসূতি।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তিত করিবার পর মধুসূদনের ভাগ্যে এক দিক হইতে যেমন প্রশংসা ও স্তুতিবাদ আসিয়াছিল, অপর দিক হইতে নিন্দা ও বিদ্রূপের বাণীও তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল। ইদানীং বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকেও উহার সম্মুখীন হইতে হইয়া-ছিল। যাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে নতন কিছু প্রবর্ত্তনের পরিপন্থী, তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া মধুসূদন বলিয়া-ছিলেন—"প্রত্যেক গ্রন্থের সঙ্গে যদি আমি জনসাধারণের নিকট উত্তরোত্তর সম্মানভাজন হইতে না পারি তবে আমি আমার গ্রন্থ ভস্মসাৎ করিতেও কুণ্ঠিত হইব না।"—কিন্তু প্রতিভা কখনও চাপা থাকে না। মধুসূদনের জ্বলন্ত অনলবৎ প্রতিভা তাঁহাকে বাঙ্গলার Milton-আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছিল।

মধুসূদন তাঁহার ইউরোপ-প্রবাসের অগ্রে রায় বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত "নীলদর্পণ" নাটক ইংরাজীতে ভাষান্তরিত করেন—উহাই ভারত হইতে ইউরোপে প্রেরিত হইয়া তদানীন্তন নীলকর সাহেবদিগের এদেশের অত্যাচার সর্ব্বপ্রথম ইউরোপে প্রকাশিত করিয়াছিল। মধুসূদনের ইউরোপ-প্রবাসের সময় তাঁহার আর্থিক অভাব করুণাসাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে প্রশমিত হইয়াছিল। ইউরোপে বসিয়াই মধুসূদন তাঁহার "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" প্রণয়ন করেন। ইউরোপ হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া মধুসূদন হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি "হেক্টর বধ", "বিষণাধনুর্গুণ" এবং "মায়া কানন" নামে তিনখানি পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু "হেক্টর বধে"র সঙ্গে সঙ্গে "মেঘনাদ ও "বীরাঙ্গনা"য় কবির অপূর্ব্ব ক[illegible] শক্তি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিয়াছিল।

এদিকে তাঁহার স্বাস্থ্যও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিলেও মধুসূদনের পক্ষে তাহা কোনমতে যথেষ্ট হইত না। অমিতব্যয়ে দারুণ অর্থাভাব আসিয়া মধুসূদনকে ঘিরিল। তার উপর অবিরত মদ্যপানে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তাহা নানা ব্যাধির আগার হইয়া দাঁড়াইল। অর্থাভাব নিবারণের জন্য ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া মধুসূদন পঞ্চকোট রাজষ্টেটে চাকুরী লইয়া গেলেন, কিন্তু উহাও মধুসূদনের অতৃপ্ত জীবনকে কিছুতেই পরিতৃপ্তি দান করিতে পারিল না। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার শেষজীবনের বিষাদময় ইতিহাস আরম্ভ। সে ইতিহাস লেখক, পাঠক এবং শ্রোতা সকলেরই পক্ষে সমান কষ্টদায়ক। মধুসূদনের জীবনীলেখক বিখ্যাত যোগেন্দ্রনাথ বসু, নগেন্দ্রনাথ সোম,

এবং "শ্রীমধুসূদন" নাটক লেখক "বনফুল" (বলাইচাঁদ) তাঁহাদের অনবদ্য লেখনীমুখে মহাকবির জীবনের শেষ অঙ্ক যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন এ প্রবন্ধে আমরা তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না। সে দৃশ্য বড়ই শোকাবহ। দারুণ রোগযন্ত্রণায় তাঁহার দেহ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার সাধ্বী পত্নী মেরী হেনরীয়াটাও সাংঘাতিক পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। মধুসূদনের মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। এইবার তাঁহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার দিন হইয়া আসিয়াছে—ক্রমে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। কথা কহিবার শক্তি ক্রমে লুপ্ত হইতে চলিল। মধুসূদনের জীবনচরিতকার বলেন, মৃত্যুর দিন প্রাতে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন—তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিয়াছিলেন—"ত্রৈলোক্যমোহন, জীবনের কোন আশা পূর্ণ হয় নাই—অনেক আক্ষেপ লইয়া মরিতেছি। এখন কথা বলিবার শক্তি নাই, তুমি আর এক সময় আসিও। অনেক কথা বলিবার আছে তোমায় বলিব।" আর বলা হইল না—সেই দিন সেই ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন রবিবার দ্বিপ্রহরে সেই ন মাতা, ন পিতা, ন বন্ধু, ন বান্ধববিশিষ্ট আলিপুর হাসপাতালে অতি সাধারণ রোগীর মত বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি প্রাণত্যাগ করিলেন। যে মহাকবি তাঁহার "তিলোত্তমা সম্ভব" কাব্যে ব্রহ্মপুরীর অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পদ শ্রেষ্ঠ ভাষায় বর্ণনা করিয়া অমর হইয়াছেন, যে প্রতিভাপ্রদীপ্ত কবি তাঁহার "মেঘনাদবধ" কাব্যে রাক্ষসরাজ রাবণের স্বর্ণ-সৌধ-কিরীটিনী স্বর্ণলঙ্কার রাজশ্রী অতি মহান এবং গরিমাপূর্ণ ভাষায় পাঠকের মানস চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন, বাল্যে, কৈশোরে, এবং যৌবনে যে মধুসূদন ধূলি-মুষ্টির মত অর্থমুষ্টি ব্যয় করিয়াছিলেন, আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে দীনদরিদ্রের মত তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গলায় ক্রন্দনের রোল উঠিল। অবহেলায়, অযতনে, লোকচক্ষুর অগোচরে বাঙ্গলার এবং বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ কবির মৃত্যু সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে লজ্জায় অভিভূত করিল। বাঙ্গালী বুঝিল এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাই মহাকবির মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধুগণ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা দিগম্বর মিত্র, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু গৌরদাস বসাক, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি বাঙ্গলার তদানীন্তন মনীষিগণ মধুসূদনের সমাধিভূমে এক সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ স্তম্ভনিম্নে বঙ্গবাণীর দুরন্ত সন্তান মধুসূদন চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি মধুসূদন মৃত্যুর পূর্ব্বেই লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। সমাধিক্ষেত্রে মহাকবির পার্শ্ব দিয়া গেলে এখনও মনে হয়—যেন সমাধিস্তম্ভ কার্য্যনিরত বাঙ্গালীকে মৃত কবির সমাধিপার্শ্বে ক্ষণেকের নিমিত্ত দাঁড়াইবার জন্য বলিতেছে,—

"দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব বঙ্গে
তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধি স্থলে।
জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম, মহীর পদে মহা-নিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন
যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।"

বস্তুতপক্ষে বাঙ্গলা ভাষার খণ্ডকাব্যে, গীতিকাব্যে, মহাকাব্যে, নাটকে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন যে সুরে ঝঙ্কার দিয়াছেন, বঙ্গবাণীর পদপ্রান্তে যে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন, যত দিন বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালী জাতি জীবিত থাকিবে ততদিনই সমস্ত রত্নরাজী অমর অক্ষয়রূপে বঙ্গসাহিত্যে বিরাজ করিবে।*

---

* যশোহর সাহিত্য-সঙ্ঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত মাইকেল মধুসূদন মৃত্যু-তিথি অনুষ্ঠানে পঠিত।

সঞ্চয়ন

পার্ল এস, বাক্

[১৩৪৭।আশ্বিন সংখ্যা 'গতি' হইতে উদ্ধৃত]

নানকিং শহর।

১৯২৭ সালের মার্চ মাসের অপরাহ্ণ। কম্যুনিষ্ট সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করেছে। ম্লান দিনের আলোয় পর্য্যপ্ত লুণ্ঠন ও হত্যা চ'লছে। বিচার নেই, নেই কোনো বিবেচনা। আত্মরক্ষার উপায় নেই। বৈদেশিক প্রভাবে জর্জরিত হ'য়ে এতদিন পরে চীন হঠাৎ জেগে উঠেছে। জলন্ত প্রতিক্রিয়ার মতো গণবিপ্লব জেগেছে। অত্যাচারী বিদেশীদের কি আর বেঁচে থাকতে দেওয়া উচিত? যারা সত্যিকারের ক্ষতি ক'রেনি কারো, তাদেরও মরতে হ'ল। পার্ল বাকের বিবৃত সেই ফাদার এ্যাণ্ড্রিয়ার কাহিনী মনে পড়ে। প্রতি নিস্তব্ধ নিশীথ সে কাটিয়ে দিত আকাশের উজ্জল নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে, পৃথিবীর দৈনন্দিন হট্টগোলের মধ্যে সে নিজকে হারিয়ে ফেলে নি কখনো, কিন্তু তবুও তাকে ম'রতে হ'ল বিপ্লবীর গুলীতে; হতচেতন হ'য়ে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ল তা'র দেহ—

"But the boy cocked his gun and pointed it at Father Andrea. 'We are the revolutionists!' he cried His voice was rough and harsh as if he had been shouting for many hours, and his smooth, youthful face was botched and red as if with drinking. 'We come to set every one free!'

'Set every one free?' said Father Andrea slowly, smiling a little. He stopped to pick-up his cross from the dust.

But before his hand could touch that cross, the boy's finger moved spasmodically upon the trigger and there was a sharp report and Father Andrea fell upon the ground, dead."

এ-বিপ্লবের সময় পার্ল বাক নানকিং শহরেই ছিলেন। বাড়ীর দরজায় বিপ্লবীরা এসে পড়লো ব'লে। পেছনের ছোট দরজা দিয়ে স্বামী এবং পুত্র-কন্যাদের নিয়ে তিনি তাঁ'র চৈনিক প্রতিবেশীর বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। কেটে গেল পুরো রাত। পরদিন প্রাতে গোপনে এক মার্কিণ জাহাজে উঠলেন দেশে ফিরে যাবেন ব'লে।

সব প'ড়ে রইলো পেছনে—তাঁ'র এতদিনকার আবাস, তাঁ'র আত্মার লালনক্ষেত্র, পরিচিত-অপরিচিত সব-কিছু।

এক বছর পর তিনি আবার ফিরে এলেন। চীনের তখন অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে।

চীনের এই কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের স্পর্শ রঞ্জিত হ'য়ে পার্ল বাকের অনেক গল্প উজ্জল হ'য়েছে। "The First Wife" গল্পগ্রন্থের অনেক গল্পই এই বিপ্লবের স্মৃতি বহন ক'রে আছে। প'ড়তে প'ড়তে চমক লাগে। এক একটা চিত্র চিরদিনের জন্য মনে গেঁথে থাকবার মতো। উদ্‌ভ্রান্ত জনতা ছুটে চ'লেছে নবমুক্তির আস্বাদনে! Wang Lung ভেবে পাচ্ছে না কি এদের কাম্য। বারবার ভাববার চেষ্টা ক'রছে, সর্বশেষে সে মেনে নিচ্ছে সবার কথা সত্যিকারের স্থির সত্যের অভিব্যক্তি হিসাবে। সবার সাথে মিশে সেও লুঠ করতে যাচ্ছে, কিন্তু ভাগ্যে তা'র জুটছে না বিশেষ কিছুই। সবাই নিয়ে যাচ্ছে মূল্যবান অনেক-কিছু, সে নিয়ে আসছে পুরানো ফেলে-দেওয়া জামা কাপড় আর দুটো শক্ত মলাটের বই। অদ্ভুত! "The Communist" গল্পের সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ে, মৃত্যুকে যে বরণ করছে হাসিমুখে। যূপকাষ্ঠের দিকে সে এগিয়ে যাচ্ছে গান গেয়ে গেয়ে। আরও অনেক চিত্র আছে। সবই সুন্দর।

The Young Revolutionist গ্রন্থের বিপ্লব চিত্রগুলিও সুন্দর।

শুধু এই বিপ্লবই নয়, চীনের সবকিছুই তাঁ'র মনে সাড়া জাগিয়েছে। অপরিসীম করুণার দ্বারা তিনি তাঁর গল্প উপন্যাসের ভিতর দিয়ে চীনকে বেশ শোভনভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন:

"My chief pleasure and interest has always been people, and since I live among Chinese, then Chinese people. When I am asked what they are like I do not know. They are not this and that, but people. I cannot describe them any more than I can my own blood kin. I am too near them and have shared too closely their lives."

এ যে কত বড় সত্য, তা তাঁ'র বইগুলো প'ড়লেই বোঝা যায়। তিনি সত্যাশ্রয়ী—ভাববিলাসী নন।

চীনকে তিনি ভালোবাসেন। তাঁ'র মানস জীবন পরিপুষ্ট হ'য়েছে চৈনিক ভাব-রসে।

চীনের সঙ্গে তাঁ'র আচারগত বা সান্নিধ্যগত যোগ নয়, সুগভীর প্রেমের যোগ। এই প্রেমের ভূমিকায় তিনি তাঁ'র কীর্তিসৌধ নির্মাণ ক'রেছেন অভিনব নৈপুণ্যে!

সত্য তাঁর উপজীব্য, তাই তাঁর সৃষ্টি যথার্থ।

Good Earth-এর নায়িকা অতি সাধারণ এক নারী, কিন্তু অপরিসীম করুণা ও অপরিমিত স্নেহে তিনি তা'র মধ্য থেকে নারীত্বের অপরূপ মহিমা ফুটিয়ে তু'লেছেন। সন্তানকে যখন সে স্তন্য দিচ্ছে, তখন তা'কে মাতৃত্বের আশ্চর্য সুন্দর ভূমিকায় দেখি—

"But out of the woman's great brown breast the milk gushed forth for the child, milk as white as snow, and when the child sucked at one breast it flowed like a fountain from the other, and she let it flow. There was more than enough for the child, greedy though he was, life enough for many children, and she let it flow out carelessly, conscious of her abundance. There was always more and more. Sometimes she lifted her breast and let it flow out upon the ground to save her clothing and it sank into the earth and made a soft, dark, rich spot in the field. The child was fat and good-natured and ate of the inexhaustible life his mother gave him."

এই নারীকেই আবার অন্য এক ভূমিকায় দেখি দেশে যখন দুর্ভিক্ষ লেগেছে আর বুভুক্ষু জনগণ আক্রমণ করেছে ধনীর প্রাসাদ, তখন—।

এও লুট করতে গিয়েছে সবার সাথে।

গুটি কয়েক মুক্তা কুড়িয়ে পেয়ে সে বুকে চেপে ধরেছে।

দু' চোখে তার দু' ফোঁটা জল মুক্তাবিন্দুর মতই।

কাঁদছে সে ব্যথায় নয়, আনন্দে। রিক্ততার দিন কি তাঁর শেষ হয়ে এলো, সত্যিই শেষ হ'য়ে এলো?

অনেকে ব'লে থাকে যে পার্ল বাকের নারী-চরিত্রগুলি প্রাণস্পন্দে বেপথুমান নয়, তারা অনেকটা পুরুষের হাতের ক্রীড়ার সামগ্রী কিন্তু এ যে অসত্য কতদূর, ত'ার প্রমাণ র'য়েছে এখানে ওখানে অজস্রভাবে ছড়ানো। "This Proud Heart" উপন্যাসের নায়িকা সুসান এক আশ্চর্য নারী। পৃথিবীর কর্মব্যস্ততার মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি। সন্তানের জননী সে, তবুও গৃহধর্মই তা'র একমাত্র ধর্ম নয়, তার যে প্রতিভা আছে, বিকাশ লাভের জন্য তাও উন্মুখ হয়ে আছে। সংঘাত লেগেছে শিল্পী নারী ও গৃহকর্মনিপুণা জননীর মধ্যে। শিল্পীই জয়ী হ'য়েছে শেষপর্যন্ত। আশ্চর্য এ ইতিহাস! তা'র যে প্রতিভা র'য়েছে ত।' কি ব্যর্থ হবার? স্বামী যখন বলছে তাকে "আমার কথা শোনো সু। পাথর কেটে মূর্তি গড়া তোমার কাজ নয় ওর জন্য প্রয়োজন বিরাট প্রতিভার। মর্মর প্রস্তরকে প্রাণময় করে তুলতে পেরেছে পৃথিবীতে ক'জন?—তখন Her proud heart reared its head like a lion in her woman's body. 'How do you know I am not great?' it demanded. সাধারণের মতো গতানুগতিক জীবন তার জন্য নয়, সে চায় বিকাশ, সে চায় স্ফূর্তি।

Sons উপন্যাসের সেই বিদ্রোহিণী নারীর কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। পুরুষের শক্তিকে পর্যুদস্ত ক'রবার জন্য সে যুদ্ধে নেমেছে-Wang the Tiger-এর বিরুদ্ধে। শৃঙ্খলিত হ'য়েছে, তবুও নতি স্বীকার করেনি।

East Wind : West Wind উপন্যাসের সেই মার্কিণ রমণীর কথা মনে পড়ে। বিদেশে এসেছে, অনাত্মীয়, অপরিচিত আশ্রয়ে। কেউ তাকে আপন ক'রে নিতে চাচ্ছে না, সবাই দেখছে তাকে সন্দেহের চোখে। তবুও সে কোলাহল ক'রছে না, বরঞ্চ তা'র বিদেশী স্বামী যখন স্বজনদের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হ'য়ে ঘরে ফিরে আসছে তখন সে তাকে দিচ্ছে সান্ত্বনা, দিচ্ছে অভয়।

আরো আছে ছোটো-খাটো সুন্দর নারী-চরিত্র এখানে ওখানে। The Mother উপন্যাসটিও সুন্দর। চিরন্তনী নারীর চারিত্রিক দুর্জ্ঞেয়তা প্রকাশ পেয়েছে এখানে অনবদ্যভাবে।

পার্ল বাকের নারী-চরিত্রগুলো মনে রাখবার মতো। ওদের মধ্যে অনেকে বেশ শক্তিশালী, অনেকে আবার দুর্বল। দুর্বল বলে তাদের কিন্তু আবার সরিয়ে দেওয়া যায় না। দুর্বলতার মধ্যেও তাদের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। সবার প্রতিই পার্ল বাকের অনুরাগ সুগভীর। এ অনুরাগে অন্ধতা নেই, আছে অনির্বাণ প্রীতি।

ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া প্রদেশের হিল্‌স্-বোরো শহরে ১৮৯২ সালে পার্ল বাকের জন্ম হয়। তাঁর পিতার পূর্বপুরুষেরা মধ্য-য়ুরোপ থেকে এসেছিলেন এখানে। মানুষের প্রতি অপরিসীম করুণা তাঁরই একান্ত বৈশিষ্ট্য নয়, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যেও এটা ছিলো। তাঁর পিতামহের সময়ে

আমেরিকায় দাস ব্যবসা চলতো, কিন্তু তিনি এটাকে ঘৃণা করতেন। মানুষের স্বাধীনতায় তাঁর বিশ্বাস ছিলো। মানুষকে মানুষ হিসাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা পার্ল বাক পেয়েছিলেন তাঁর পিতা-পিতামহের কাছ থেকে—So from my ancestors I have the tradition of racial equality.

নিতান্ত শৈশবাবস্থায় তাঁ'কে চীন দেশে নিয়ে আসা হয়। তাঁ'র বয়স তখন ছিলো মাত্র চার মাস। অনেকটা নিঃসঙ্গ ভাবেই তাঁ'র শিশু বয়সটা কেটে যায়। ইয়াংসিকিয়াং নদীর ধারে চৈনিক ধাত্রীর হাত ধ'রে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। যে শহরে তাঁ'রা ছিলেন, তা'র নাম সিন্‌কিয়াং।

ইংরেজীর আগেই চীনা ভাষা তাঁর আয়ত্তে এসে যায়। এ ব্যাপারে তাঁর ধাত্রী ছিলো তাঁর সহায়কারিণী। এই ধাত্রী সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

"She is one of the two clear figures in the dimness of my early childhood. Foremost stands my mother, but close beside her, sometimes almost seeming a part of her, I see, when I look back, the blue-coated figure of my old chinese nurse."

এর কাছে তিনি অজস্র রূপকথা শুনতেন। বুদ্ধ-জাতকের গল্পগুলো তাঁর ভালো লাগতো। ন্যায়কারীদের জন্য স্বর্গ থেকে আলো নেমে এসেছে, সুন্দরের ধ্যানে যারা নিমগ্ন তাদের জন্য এসেছে অফুরন্ত আশীষ, প্রীতি-নিষিক্ত অন্তর নিয়ে যারা মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিয়ত তাদের জন্য ঝরে পড়েছে আনন্দের ধারা। আরও কত গল্প।

এ সব গল্প শেষ হ'য়ে গেলেই ধাত্রীর কাছে নতুন আবেদন যেত এখন তোমার নিজের ছেলেবেলার গল্প বল।

গল্প বলা সুরু হ'ত আবার।

মায়ের কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তিনি, পরবর্তী জীবনে তা খুব কার্যকরী হয়েছিলো।

সঙ্গীত, শিল্পকলার প্রতি তাঁর অনুরাগ, তাঁর মায়ের কাছ থেকেই পাওয়া।

যখনই সময় হ'ত মেয়েকে কাছে ডেকে নিয়ে তিনি নানা কথা বলা সুরু ক'রতেন। মায়ের শিক্ষা ও উৎসাহ না থাকলে পার্ল বাক এত বড় হ'তে পারতেন কিনা সন্দেহ। তিনি নিজেই ব'লেছেন, "আমি আমার মাকে পেয়েছিলাম, তাই আর কিছু আমার পাবার প্রয়োজন ছিলো না। সত্যকে জানবার, সুন্দরকে ভালোবাসার অদম্য আগ্রহ আমার জন্মেছিলো তাঁরই কল্যাণে। তিনিই আমাকে দিয়ে গল্প লিখিয়েছেন। তিনি তো শুধু আমার মা ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমার আত্মার শুশ্রূষাকারিণীও।"

পনর বছর বয়সে এক বোর্ডিং-স্কুলে তিনি ভর্তি হন। এখানে বছর দুই কাটে। সতর বছর বয়সে তাঁ'কে মাতৃভূমি আমেরিকায় যেতে হয় কলেজে প'ড়বার জন্য। কলেজের জীবনটা তিনি উপভোগ করতে পারেন নি। অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিলো সেটা।

কলেজ-জীবন শেষ হ'য়ে গেল। সময় হয়ে এলো চীন-দেশে ফিরবার।

ফিরে এসে জীবনকে তিনি আবার সহজভাবে গ্রহণ ক'রলেন। এ সময়েই তাঁর বিয়ে হ'ল জনৈক আমেরিকানের সাথে। জীবনে নতুন এক অধ্যায় আরম্ভ হ'ল। নতুন অনেক-কিছু তিনি দেখলেন, শিখলেনও অনেক-কিছু।

তারপর আরও এক পর্যায়।

তিনি লিখেছেন,

"Then we came to Nanking, my husband to take the department of Rural Economics in the University of Nanking. Here life was different again. We came out of the country and from country people into student life. Here during these ten years we have watched the nation in revolution, have seen the old day defeated and the new day, struggling and weak, but living, come to birth."

১৯২২ সাল থেকে আরম্ভ হয় তাঁর সাহিত্যিক জীবন।

চীন দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন নতুন জীবনের সাড়া জেগেছে। এ নিয়ে তিনি এক প্রবন্ধ লিখলেন Atlantic মাসিক-পত্রে In China, Too.

East Wind, West Wind তাঁর সর্বপ্রথম উপন্যাস। এর আগে যে সমস্ত প্রবন্ধ কি গল্প তিনি লিখেছেন, তা' সবই আত্মকথার সগোত্র; অনেকটা স্মৃতির উদ্ধৃতি।

এ-সময় তাঁ'কে নানকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী পড়াবার ভার নিতে হ'ল।

একদিন তিনি বাইবেলের একটি সূত্র সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি তরুণী পেছন থেকে বলে উঠলো, "আমরা শুনতে চাই আশার কথা, আনন্দের সংবাদ, আপনি আমাদের তাই জানতে দিন।" পার্ল বাক বুঝতে পারলেন, তরুণ-মনে সাড়া জেগেছে, নতুন আশার আলো ব্যাপ্তি লাভ করছে পৃথিবীতে ধীরে ধীরে। তরুণীর সেই আগ্রহ অধীর কণ্ঠের কথা তাঁকে আকুল করলো। অনেক পরে এ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তিনি বললেন,

"It is the wistful cry of youth; a heart breaking cry to those who hear it, for who has a right to hope if youth has not?"

The Good Earth ছাপা হ'য়ে বই আকারে বের হ'ল ১৯৩১ সালে। একুশ মাসে এ'র ন'টা এডিশন বেরিয়ে যায়। পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার Quo-Vadis গ্রন্থ ছাড়া আমেরিকার অন্য কোন গ্রন্থের এত বিক্রী হয় নি। আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে Pultizer Prize এর ভাগ্যে ঘটে। এ বই-ই ১৯৩৮ সালে পার্ল বাকের জন্য নোবেল পুরস্কার নিয়ে আসে। এ সময়ই তাঁর খ্যাতি সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হ'ল।

সেলমা লাগেরলফ, গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা, পার্ল বাক এই তিনজন নারীই নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন আত্মসৃষ্ট শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক পুস্তকের জন্য।

এদের মধ্যে দেলেদ্দার খ্যাতির ব্যাপ্তি নেই।

সেল্‌মা লাগেরলফের নাম অবশ্য চারিদিকে ছড়িয়েছে খুব বেশী।

বর্তমানে পার্ল বাক পাচ্ছেন সমস্ত বিশ্বের অকুণ্ঠিত অজস্র শ্রদ্ধা নিবেদন।

কলম্বিয়ার এক সাংবাদিক সভায় উপন্যাস লেখা নিয়ে তিনি যে সমস্ত উক্তি করেছিলেন, তাতে তাঁ'র সংবেদনশীল মনের অপরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

নিজেকে তিনি বলতে চান হতভাগিনী, ব্যথাতুরা দুর্বল নারী। এ জন্যে নয় যে, তাঁর সংসারে শান্তি নেই অথবা প্রীতির অর্ঘ দিচ্ছে না তাঁকে কেউ কিন্তু এ জন্যে যে, অজস্র কল্পিত নায়ক-নায়িকার দুঃখ তাঁকে আকুল করে তোলে, তাদের ব্যথায় তিনি ব্যথিত হন, তাদের কান্নায় তাঁর চোখেও জল জমে ওঠে।

ঔপন্যাসিকের জীবন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের জীবন নয়—তার জীবনে সহজতা নেই।

"He lives a thousand lives besides his own, suffers a thousand agonies as really as though they were what is called actual, and dies again and again. He is doomed to be possessed by spirits until he cannot tell what is himself, what are his real soul and mind. He is thrall to a thousand masters. He is exhausted bodily and spiritually by creatures alive and working through his being, using his one body, his one mind, to express their separate selves, so that his one poor frame must be the means of all these living energies. It is no wonder that much of his time he sits bemused silent and spent."

অন্য কারো সম্পর্কে এ কথাগুলো কতদূর প্রযোজ্য, তা' অবশ্য বিচারসাপেক্ষ কিন্তু পার্ল বাক সম্পর্কে এ কথাগুলো অযথার্থ নয়।

মানুষকে তিনি ভালোবাসেন, তাই মানুষের বেদনায় তাঁর বেদনার অবধি নেই।

তাঁর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার বেদনা সত্যিকারের মানব মনের বেদনারই মূর্তরূপ।

সার্থক শিল্পী তিনি!

(সৈয়দ আলী আহ্‌সান)

ভারতের মূক শিক্ষা

[১৩৪৯ ভাদ্র সংখ্যা 'বাংলার শিক্ষক' হইতে উদ্ধৃত]

পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ ও ইতিহাসে মূক-বধির-দিগের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থার নিদর্শন পাওয়া যায় না। বরং সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশের কোন কোন স্থানে—যথা, লাইকারগাস আইনে এবং এথেন্স ও রোম নগরে ইহাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার, এমন কি ইহাদিগকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যার কথার উল্লেখ আছে। অবশ্য ভারতবর্ষে ঐ প্রকার অত্যাচারের কথা কোথাও শোনা যায় না। তবে ইহাদের শিক্ষারও কোন ব্যবস্থা এখানে ছিল না।

খৃষ্টের জন্মের পর, তাঁহার ভ্রাতৃপ্রেম প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মূক-বধিরদের প্রতি অত্যাচারের উপশম হইতে থাকে। অষ্টম শতাব্দী হইতে এই অসহায়দের শিক্ষা বিষয়ে যৎসামান্য চেষ্টার সূত্রপাত হয়। এই সময় হইতে যে সকল মহাত্মা মূক-বধিরদিগের শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন এবং যাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহারা নিজ নিজ শিক্ষা-প্রণালী সাধারণের নিকট হ

গোপন রাখিতেন। সুতরাং এই সময় বা ইহাদের মৃত্যুর পরবর্ত্তীকালে মূক-শিক্ষার বিস্তারের কোন বিশেষ সুবিধা হয় নাই।

পাশ্চাত্য দেশে সর্ব্বপ্রথম সাধারণভাবে মূক-বধির-দিগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের জন্য যে সকল মনীষী পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন আজ তাঁহারা কেহই ইহলোকে না থাকিলেও তাঁহাদের জীবনের কর্ম্মধারা হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া নব নব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশকে সমৃদ্ধ করিতেছে। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, মূক-বধিরেরা অবজ্ঞার পাত্র নহে, তাঁহারাও জাতীয় জীবনের একটি বিশিষ্ট অংশ। তাঁহাদের ভিতর নিম্ন-লিখিত মহাপুরুষদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আবে ডিলাপে—১৭৬০ খৃষ্টাব্দে প্যারিস নগরে পৃথিবীর মধ্যে মূক-বধিরদের জন্য সর্ব্বপ্রথম বিদ্যালয় ইনিই স্থাপন করেন।

সেমুয়েল হাইনিকা—১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর ড্রেসদেন নগরে দুইটি মূক-বধির বালককে শিক্ষা দিতে থাকেন। তিনি এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়া ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে লাইপজিক নগরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

টমাস ব্রেইডউড—১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা নগরে একটি মূক-বধির বালককে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী হেকনি গ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ ওয়াটসনের সঙ্গে মিলিত হইয়া লণ্ডন সহরে মাত্র ৬টি ছাত্র লইয়া অধুনা সুবিখ্যাত দি ওল্ড কেণ্ট রোড ইন্‌ষ্টিটিউসন নামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

এইচ্‌ গ্যালোডেট—১৮১৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ডাঃ ই, এম, গালোডেট মূক-বধিরদিগের উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকার অন্তর্গত ওয়াসিংটন নগরে একটি কলেজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর বহু মূক-বধির বালক-বালিকা এই কলেজ হইতে বি-এ ও এম্‌-এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতেছে।

উল্লিখিত মহাত্মাদের স্বার্থত্যাগ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। তাঁহারা যথার্থই আর্ত্তের বন্ধু ছিলেন। ইহাদের দান যুগ যুগ ধরিয়া দেশবাসী সম্ভ্রমে স্মরণ করিবে সন্দেহ নাই।

আন্দোলনের ফলে আজ ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মাণী প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশে মূক-বধিরের শিক্ষা নানাভাবে যথেষ্ট উন্নতি ও বহু প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত হইয়াছে এবং সাধারণ ছেলেমেয়েদের ন্যায় ইহাদের শিক্ষাও বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে মূক-বধিরের সংখ্যা পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা কম নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাদের শিক্ষার আজও তেমন সুব্যবস্থা হয় নাই। ভারতে প্রথম মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বোম্বাই সহরের প্রধান ধর্ম্ম-যাজক ডাঃ লিউ মিউরিণ। অধুনা বোম্বাই প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে নয়টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

বাংলা দেশে প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা নগরীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের যৎসামান্য প্রচেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু উহা কার্য্যকরী হয় নাই। পুনরায় উক্ত প্রচেষ্টার প্রায় ১৫ বৎসর পর ভারতে মূক-বধিরের জন্য কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই জ্ঞাত হইয়া বিলাতের একটি শিক্ষিত মূক-বধির মিঃ ফ্রান্সিস ম্যাগিন, বি-এ ভারতে এই অসহায়দের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দে[illegible] তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তখন তাঁহার সাধু ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বোম্বাই প্রদেশের বিদ্যালয় স্থাপনের পর কলিকাতা পটলডাঙ্গা নিবাসী বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় গিরীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিস্তর চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন; কিন্তু জনসাধারণের নিকট হইতে উপযুক্ত সমর্থন ও সহানুভূতির অভাবে তাঁহার প্রচেষ্টাও কার্য্যকরী হয় নাই।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে স্বর্গীয় শ্রীনাথ সিংহ মহাশয় সিটি কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহযোগিতায় উক্ত কলেজের একটি ঘরে মাত্র দুইটি মূক-বধির বালক লইয়া একটি ক্লাস খোলেন। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার এই

মহৎ কার্য্যে স্বর্গীয় যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মজুমদার যোগ দেন। এই তিনজন নগণ্য যুবকের আপ্রাণ চেষ্টায় ও উমেশবাবুর সৎপরামর্শে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে উপরোক্ত ক্ষুদ্র ক্লাসটি কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় নামে অভিহিত হয়। বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ৺ যামিনীনাথ ইংলণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড ও আমেরিকা হইতে মূক-বধিরদের আধুনিক উন্নততর প্রণালী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আসেন। তিনিই প্রথম ভারতবাসী যিনি পাশ্চাত্য দেশ হইতে মূক-বধিরদের শিক্ষা-প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়া আসেন।

তিনটি নগণ্য যুবকের প্রচেষ্টায় একদিন ক্ষুদ্র ও অনাড়ম্বরভাবে যে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল আজ তাহা ভারতের শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

অধুনা বাংলায় এগারটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

বোম্বাই ও কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় সংস্থাপনের পর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে মাদ্রাজের অন্তর্গত পালামকোটা নগরে চার্চ্চ অব ইংলণ্ড অব জেনানা মিশনের অন্যতম শিক্ষয়িত্রী কুমারী সোয়ান সন মহোদয়া মাদ্রাজ প্রদেশে প্রথম মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কুমারী সোয়ান সন বিলাত হইতে শিক্ষা-প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসেন।

অধুনা মাদ্রাজ প্রদেশে ৮টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ৬৮ বৎসর কাল ভারতে মূক-বধির শিক্ষার সূত্রপাত হইয়া আজ বিভিন্ন প্রদেশে ইহাদের জন্য মোট ৪০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নে বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা দেওয়া গেল।

মূক-বধিরদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের জন্য যে সমস্ত পরহিতব্রতী প্রতিষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জাতি সংগঠনের নিমিত্ত ইহাদের প্রয়োজনীয়তা কোন অংশে তুচ্ছ বা উপেক্ষণীয় নহে। মূক-বধির আজ সমাজের গলগ্রহস্বরূপ নয়, উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে তাহারাও সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিপোষকতা করিতে পারে। মূক-বধিরের শিক্ষা আন্দোলনের মত একটি সমাজহিতকর কার্য্যে দেশবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মূক-বধির বিদ্যালয়ের সংখ্যা—

আসাম—১; বাংলা—১১; বিহার—২;
উড়িষ্যা—১; যুক্তপ্রদেশ—২; দিল্লী—১;
বোম্বাই—৯; মধ্যপ্রদেশ—২; মাদ্রাজ—৮;
কোচিন—১; মহীশূর—১; হায়দ্রাবাদ—১;

(শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার)

—

সমাজ বীমা বা সোস্যাল ইন্সিওরেন্স

[১৩৪৯ ভাদ্র সংখ্যা 'জীবন-বীমা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধের সারাংশ]

শিল্পসভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীকে নির্ম্মম নিষ্পেষণ ও শোষণের দ্বারা এক শ্রেণীর অতিলোভী পুঁজিপতিগণ যখন জগতের সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন তখন অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল ও হৃদয়বান্ ধনিকগণ এবং সেই সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত চেতনাশীল অংশ তাহা রোধ করিতে যে সকল প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাহার ফলে নানা প্রকার শ্রম-কল্যাণ আইন ও বিবিধ শ্রেণীর সামাজিক বীমার আবির্ভাব হয়। সামাজিক বীমা প্রকৃতপক্ষে সমাজ সংরক্ষণেরই নামান্তর মাত্র। শোষণের দানবীয় মোহ এক দিকে যেমন শ্রমিকশ্রেণীর সহ্যের অতীত হইয়া উঠিতে লাগিল অপর পক্ষে তেমনই অপেক্ষাকৃত দূর দৃষ্টিসম্পন্ন ধনিকেরাও বুঝিতে লাগিলেন যে শ্রমিকদের শ্রম-ক্ষমতায় এই অপচয় প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের বিশেষ হানিজনক হইয়া দাঁড়াইবে এবং পরিণামে সক্ষম শ্রমিকের অল্পতার দরুণ শ্রমের মূল্য চড়িয়া গিয়া তাহাদের উৎপাদনের লাভের পরিমাণ কমিতে থাকিবে। সমাজের এই ক্ষয় প্রতিরোধ করিবার জন্য রাষ্ট্রশক্তিও ক্রমে নানা প্রকার আইন-কানুন ও পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্ম্মাণীই প্রথম উন্নত ধরণের সমাজ-বীমা প্রবর্ত্তনের পথ প্রদর্শন করে।

জার্ম্মাণীতে এই সত্য প্রথম উপলব্ধি হয় যে, বর্ত্তমান জগতের শিল্পবহুল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে, যেখানে ব্যবসা-সমূহ অতিকায় শিল্প সমিতিগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে

বিবিধপ্রসঙ্গ

মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণায় প্রকৃতির মর্ম্মন্তুদ ধ্বংসলীলা

গত ১৬ই অক্টোবর বাংলার উপর দিয়া এক প্রচণ্ড ঝড় প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই ঝড়ের ফলে মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জিলায় যে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সংবাদ প্রকাশ হইতে সপ্তাহাধিককাল বিলম্ব হইয়াছে। যখন প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার বিবরণ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল, তখনও উহার বিপুল ব্যাপকতা সম্বন্ধে দেশের লোক ধারণা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ধ্বংসের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমা এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে।

প্রবল বাতাস বহিতে আরম্ভ করে ১৬ই অক্টোবর প্রাতঃকাল হইতে। মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হইতেছিল। ক্রমে বাতাসের বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নদীর জল দ্রুত-গতিতে ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নদীতীরবর্ত্তী অঞ্চলে প্লাবনের জলোচ্ছ্বাস এত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় যে অধিবাসীরা আত্মরক্ষার সময় ও সুযোগ পর্য্যন্ত পায় নাই। নদীর প্রবল স্রোতে মানুষ এবং গৃহপালিত পশু বৃক্ষপত্রের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে থাকে। সন্ধ্যার সময় ঝড় ও বৃষ্টির প্রচণ্ডতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং চরম সীমায় উঠে রাত্রিতে। অসংখ্য বৃক্ষমূল উৎপাটিত হইয়া বাড়ী-ঘরের এবং রাস্তার উপরে পড়ে। এই আঘাতে বহু লোক ঘর ও দেওয়াল চাপা পড়িয়া জীবন্ত সমাধি লাভ করে।

কত লোক যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা এখনও করা যায় নাই। প্রথম শুনা গিয়াছিল মেদিনীপুরে অন্ততঃ দশ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে। মাড়োয়ারী সেবা-সমিতির ঝটিকা রিলিফ কমিটির অনারারী সেক্রেটারী বলিয়াছেন, মৃত্যুর সংখ্যা ৪০ হাজারের কম হইবে না। শতকরা ৭৫টি গৃহপালিত পশুর মৃত্যু হইয়াছে। ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে শৃগাল-কুকুর পর্য্যন্ত দেখা যায় না। নদীবক্ষ এবং উন্মুক্ত প্রান্তরসমূহ মানুষ ও পশুর মৃতদেহে সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। মেদিনীপুরের ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের চরম দুর্দ্দশার শেষ এখানেই হয় নাই। গবাদি পশু এত অধিক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়াছে যে, উক্ত অঞ্চলে কয়েক বৎসরের মধ্যে কৃষিকার্য্যের জন্য গবাদি পশুর অভাব হইবে। বন্যার লবণাক্ত জল পুষ্করিণীগুলিতে প্রবেশ করিয়া পুষ্করিণীর জল পানের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। খাদ্যশস্য, বীজশস্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিনষ্ট হইয়াছে অথবা ভাসিয়া গিয়াছে। কত শস্যের গোলা জল ও কাদার নীচে চাপা পড়িয়াছে। বিধ্বস্ত অঞ্চলে কোন কোন স্থানে কলেরা দেখা দিয়াছে। অধিকাংশ হাট-বাজার দোকান-পাটের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই।

কি ভয়াবহ মর্ম্মন্তুদ অবস্থা! বিধ্বস্ত অঞ্চলে এখনও যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের সেবাকার্য্যের জন্য কয়েকটি সেবাপ্রতিষ্ঠান অগ্রসর হইয়াছেন। সাহায্য দানের জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্টও একজন স্পেশাল কমিশনার এবং তিনজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছে। কিন্তু সরকারী রিলিফ ব্যবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ অভিযোগ যে শোনা যাইতেছে না তাহা নয়। সেবাকার্য্যকে সার্থক করিতে হইলে সহানুভূতি ও আন্তরিকতার প্রয়োজন। কর্ত্তব্যের সহিত সহানুভূতি ও আন্তরিকতা মিশ্রিত না হইলে আর্ত্তসেবা কোনদিনই সার্থক হয় না।

বিধ্বস্ত অঞ্চলে বর্ত্তমানে অন্নবস্ত্র প্রদান, নূতন গৃহ নির্ম্মাণ, পানীয় জল ও চিকিৎসা-ব্যবস্থার যেমন প্রয়োজন তেমনি দীর্ঘকাল ধরিয়া এইরূপ সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বিষয়ে দেশবাসীর যেমন কর্ত্তব্য আছে তেমনি কর্ত্তব্য আছে গবর্ণমেণ্টেরও। সাহায্য দানের ব্যবস্থা ছাড়াও বিধ্বস্ত অঞ্চলে পাইকারী জরিমানা আদায়ের নীতি পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছি। দুর্গত জনগণের সেবাকার্য্যের জন্য জনসাধারণের আন্তা-

ভাজন নেতা ও কর্ম্মীদিগকে মুক্তিদান করাও গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

—

মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা

গত ২২শে কার্ত্তিক রবিবার অপরাহ্ণ পৌনে চারি ঘটিকার সময় উত্তর-কলিকাতায় পরেশনাথ মন্দিরের নিকটস্থ হাল্‌সীবাগান কালীপূজা প্যাণ্ডেলে যে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা যেমন ভয়াবহ তেমনি মর্ম্মান্তিক! সহস্রাধিক নরনারী ব্যায়মবীর বিষ্ণু ঘোষ এবং তাঁহার দলের ব্যায়াম-কৌশল দেখিবার জন্য উক্ত প্যাণ্ডেলে সমবেত হইয়াছিল। এইরূপ যে একটা শোচনীয় মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে কাহারও মনে তাহার আশঙ্কার ছায়াপাত পর্য্যন্ত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। সকলেই নিশ্চিন্ত মনে ব্যায়াম কৌশল-দর্শনের আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ হোগলার তৈয়ারী প্যাণ্ডেলে আগুন লাগায় সমগ্র প্যাণ্ডেলটি জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয় এবং ১১৯ জন নরনারী জলন্ত হোলগার স্তূপের নীচে চাপা পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক ব্যাপার এই যে, মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক, শিশু এবং বালক-বালিকা।

এইরূপ মর্ম্মন্তুদ ঘটনা ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া শোনা যায় না। বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক, শিশু ও বালক-বালিকার অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুর কারণ জলন্ত প্যাণ্ডেল হইতে তাহারা বাহিরের খোলা যায়গায় আসিতে পারে নাই। প্যাণ্ডেলটির তিন দিকেই ছিল ইঁটের দেওয়াল এবং বাহির হইবার গেট ছিল মাত্র দুইটি। হোগলার প্যাণ্ডেল বলিয়া মুহূর্ত্তে সমগ্র প্যাণ্ডেলটি জ্বলিয়া উঠায় প্রাণ লইয়া বাহির হইবার জন্য এই দুইটি গেটে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের পক্ষে এই ভীড় ঠেলিয়া বাহির হওয়া বোধ হয় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। এই মর্ম্মান্তিক ঘটনার আর একটি শোচনীয় দিক এই যে, স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা-দিগকে জলন্ত প্যাণ্ডেল হইতে বাহিরে আনা সম্ভব হয় নাই।

কিরূপে প্যাণ্ডেলে আগুন লাগিয়াছিল তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। কলিকাতার মত সহরে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে অগ্নি নির্ব্বাপণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারা বাহির হইতে না পারায় একান্ত অসহায়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই শোচনীয় দুর্ঘটনা বহু পরিবারকে প্রিয়জনের অপ্রত্যাশিত আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যুতে গভীর শোকসাগরে ভাসাইয়া দিয়াছে। এই শোকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোন ভাষা নাই। এই শোচনীয় মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনার ফলে যাঁহারা প্রিয়জনকে হারাইয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা আমাদের অন্তরের গভীরতম সমবেদনা জানাইতেছি।

—

মিঃ আম্বেদকারের উক্তি

ভারতীয় সমস্যা সমাধানে সাহায্যের জন্য আমেরিকা, রাশিয়া এবং চীনের নিকট আবেদনকে ডাঃ আম্বেদকর সম্প্রতি 'রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ডাঃ আম্বেদকর পণ্ডিত ব্যক্তি হইলেও তাঁহার উক্তির মধ্যে পণ্ডিতসুলভ বুদ্ধিমত্তা ও শালীনতার একান্ত অভাব দেখা যায়। কিছু দিন পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বক্তৃতার সময়, উক্ত পরিষদকে ব্যধিগ্রস্ত বলিয়া অভিহিত করিয়া তিনি যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতেও শালীনতার অভাব দেখা গিয়াছিল। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সুদীর্ঘ আয়ুঃকালের জন্য যে পরিষদ দায়ী নয় এবং ভারতবাসী যে পুনঃপুনঃই কেন্দ্রীয় পরিষদের সাধারণ নির্ব্বাচনের জন্য দাবী করিয়া আসিতেছে ডাঃ আম্বেদকর তাহা ভাল করিয়াই জানেন। বড়লাটের শাসন-পরিষদ যখন প্রথম সম্প্রসারিত হইল তখন তপশীলভুক্ত জাতির কাহাকেও শাসন-পরিষদে গৃহীত হয় নাই বলিয়া তিনি রীতিমত চটিয়া গিয়া বড়লাটের নিকট যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, সে-কথা দেশবাসীরা যে আজও ভুলিয়া যায় নাই, ডাঃ আম্বেদকারের তাহা মনে থাকা উচিত।

ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্য করিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের নিকট আবেদন করিলে উহা রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি হয় না। এখানে আত্মসম্মান বা আত্মমর্য্যাদার কোন প্রশ্ন নাই, গঠনমূলক ... করিতে

সহিত ভারতের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সম্বন্ধ নিবিড় বলিয়াই সকলে মনে করেন। রাজনৈতিক সমস্যা যখন যুদ্ধজয়ের সমস্যার সহিত সংযুক্ত হয়, তখন উহা শুধু রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাই থাকে না, উহা সামরিক সমস্যায় পরিণত হয়। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং চীনের ভারতীয় সমস্যা সমাধানে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সহিত ভারতের স্বাধীনতার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। মিত্রশক্তিবর্গ যখন বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই যুদ্ধ করিতেছেন, তখন ভারতকে স্বাধীনতা দিবার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের মহান উদ্দেশ্যকে সাহায্যের পথে পরিচালিত করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে না কেন?

ভারতীয় সমস্যা সমাধান সম্পর্কে ডাঃ আম্বেদকারের নিজের পরিকল্পনা নাই, কিন্তু যাঁহারা এই সমস্যা সমাধানের উপায় চিন্তা করিতেছেন, তাঁহাদের উপর শ্লেষোক্তি তিনি যথেষ্ট বর্ষণ করিয়াছেন। মিঃ উইল্কী প্রভৃতি মার্কিন সমালোচকদিগকে অনধিকারচর্চ্চাকারী বলিয়া মনে করিলে রাজনৈতিক বুদ্ধির দৈন্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

—

উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদ

উড়িষ্যা ব্যবস্থা-পরিষদের স্পীকার উক্ত পরিষদকে প্রতিনিধিমূলক নহে বলিয়া যে রুলিং দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সঙ্গত হইয়াছে। উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৬০ জন। তন্মধ্যে ২৯ জনই কংগ্রেসী। যে দুই জন নূতন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারাও কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী। সুতরাং ৩১ জনই কংগ্রেসী সদস্য। মোট ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ২৯ জন সদস্যই হয় জেলে না-হয় বন্দী, ৩ জন রাজনৈতিক কারণে পরিষদে যোগ দিতেছেন না। সুতরাং বাকী রহিল ২৮ জন মাত্র। এই ২৮ জনের মধ্যে একজন স্পীকার স্বয়ং। অবশিষ্ট ২৭ জনের ১৪ জন মন্ত্রিসভার পক্ষে এবং ১৩ জন বিরোধী দলভুক্ত।

যাঁহারা বন্দী হইয়াছেন বা জেলে আছেন, ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থিত হইবার স্বাধীনতা তাঁহাদের নাই। কবে সেই স্বাধীনতা তাঁহারা লাভ করিবেন কে জানে? এই ব্যাপারে সদস্যদের কোন দোষ নাই। প্রায় অর্দ্ধেক সদস্যই যখন অনুপস্থিত সেখানে পরিষদ প্রতিনিধিমূলক হইতে পারে না। পরিষদে যাঁহারা উপস্থিত হইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে মন্ত্রিসভার সমর্থক অর্দ্ধেকের বেশী নয়। যে সকল সদস্য বন্দী হইয়াছেন বা জেলে আছেন, তাঁহারা উপস্থিত হইলে এই মন্ত্রিসভা পাঁচ মিনিটও টিঁকতে পারে না। সুতরাং ইহা স্থায়ী মন্ত্রিসভা হওয়া তো দূরের কথা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ দলের মন্ত্রিসভাও নহে।

—

ভারতবর্ষ—এসিয়ার প্রতীক্

মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্কীর ভ্রমণ-তালিকায় ভারতবর্ষ স্থান পায় নাই—ভারতে তিনি আসেন নাই ভারতবাসীর শত আগ্রহ সত্ত্বেও। কিন্তু কায়রো হইতে চীন পর্য্যন্ত তাঁহার পরিভ্রমণের সময় সর্ব্বত্রই তাঁহাকে ভারতীয় সমস্যা-সংক্রান্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তাঁহার এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিয়াছেন, ভারতীয় সমস্যা আজ শুধু একা ভারতবর্ষেরই নয়—ভারত আজ সমগ্র এসিয়ার প্রতীক্। ভারতের সমস্যা সম্পর্কে কোন আলোচনা করিতে তিনি স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, ভারতীয় সমস্যা আজ প্রাচীর সমস্যার একটি প্রধান দিকে পরিণত হইয়াছে।

প্রাচী ভ্রমণের সময় মিঃ উইল্কীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, "প্রাচীর লোকদের জন্য স্বাধীনতার সনদ বলিয়া কিছু থাকিবে না? স্বাধীনতা কি শুধু শ্বেতকায় জাতির—শুধু পাশ্চাত্য জগতেরই অমূল্য সম্পদ? প্রাচীর লোকদের কি উহার কোন প্রয়োজন নাই?" যুদ্ধের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রাচীর লোকদের মনে গভীর সন্দেহের সূচনা করিতেছে। আফ্রিকায়, মধ্যপ্রাচ্যে, সমগ্র আরব জগতে, চীনে, সুদূর প্রাচীতে স্বাধীনতার অর্থ ঔপনেবেশিক ব্যবস্থার অবসান। এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া মিঃ উইল্কী আমেরিকাবাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "আপনাদিগকে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, এক জাতির উপর আর এক জাতির শাসন কখনই স্বাধীনতা হইতে পারে না, এই

শাসনকে রক্ষা করিবার জন্য নিশ্চয়ই আমরা যুদ্ধ করিতেছি না।

প্রাচী ভ্রমণে উইল্কীর মনে এই প্রশ্ন সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, যুদ্ধোত্তর স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সমগ্র প্রশ্ন ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করিয়াই হইতেছে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমেরিকার মনোভাব কি হওয়া উচিত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতেই মিঃ উইল্কীই তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষ আমাদেরই সমস্যা। এই বিশাল দেশটি জাপান যদি দখল করিয়া বসে, তাহা হইলে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইব। এই সরল সত্যের প্রতি আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে এবং এই সত্য প্রকাশও করিতে হইবে উচ্চৈঃস্বরে।"

মিঃ উইল্কীর মন্তব্যের মধ্যে সমগ্র প্রাচীর সুদৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৃটেনের নীতি কি ভাবে মিত্রশক্তির আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে, শুধু প্রাচীর মনোভাব দ্বারাই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মনোভাব দ্বারাও তাহা প্রমাণিত হইতেছে। সাম্রাজ্যবাদের মোহে বৃটেন যদি এখনও জাগিয়া ঘুমায়, তবে কে তাহাকে জাগাইতে সমর্থ?

—

রাজাজীর ব্যর্থ-প্রয়াস

বড়লাট মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজাজীকে অনুমতি না দেওয়ায় অনেকে বিস্মিত হইলেও ইহা অপ্রত্যাশিত নহে। ইতিপূর্ব্বে হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দও মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী এবং মিঃ জিন্না একমত হইলেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাওয়া যাইবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর সহিত রাজাজীকে সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইল না কেন, এই প্রশ্নের আলোচনা উপেক্ষার বিষয় নহে।

বৃটেনের উপর আস্থা রাখিতে রাজাজী তাঁহার দেশবাসীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মীমাংসা করিয়া এমন অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারিবেন বলিয়া তিনি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করিতেন যে, বৃটেন অনন্যোপায় হইয়া ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন দিতে বাধ্য হইবে। এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়াই তিনি দুই দিন ধরিয়া মিঃ জিন্নার সহিত আলোচনা করেন। আলোচনার ফল কি হইয়াছে তাহা অবশ্য আমরা জানি না। তবে রাজাজীর নিজের কথা হইতে আমরা জানিতে পারি, মিঃ জিন্নার সহিত আলোচনায় এমন একটা আশার আলোক তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, যাহার ফলে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হইয়াই তাঁহাকে বড়লাটের প্রাসাদ হইতে ফিরিতে হইয়াছে। তাঁহার সুদৃঢ় আশাবাদেও যে কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ব্যর্থতার পরে এক বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন, "মীমাংসার সামান্য আশাও যদি আমি দেখিতে না পাইতাম, তাহা হইলে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতির জন্য ব্যস্ত হইতাম না। ...বড়লাট অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় রাজনৈতিক অচল অবস্থার সমাধান বাধাপ্রাপ্ত হইল।"

ব্যর্থতার পরেও রাজাজী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন এই ভাবিয়া যে, মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত বড়লাট তাঁহার নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করিয়াছেন, শাসন-পরিষদের সহিত এই সিদ্ধান্তের সংস্রব নাই। রাজাজী শাসন-পরিষদের সদস্যদিগকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের গৌরব হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিলেও নয়াদিল্লী হইতে ১৩ই নবেম্বর শুক্রবারের প্রেস কমিউনিকে প্রকাশ, সাক্ষাতের অনুমতি না দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে বড়লাট তাঁহার শাসন পরিষদের সদস্যদিগের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন, এই সত্য দ্বারা আসল সমস্যা সমাধানে কোন সাহায্যই হইতেছে না। বরং এই ব্যাপারে ইহাই কি বুঝা যাইতেছে না যে, শাসন-পরিষদের সমস্ত সদস্য ভারতীয় হইলেও উহা জাতীয় গবর্ণমেণ্টের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না?

বৃটিশ প্রচারকগণ আমেরিকায় প্রচার করিয়া থাকেন, ভারতের উপর আধিপত্য বৃটেন পরিত্যাগ করিতে রাজী নয় বলিয়া ভারতীয়গণ জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে

পারিতেছে না, একথা সত্য নয়। ভারতীয় নেতারা স্বায়ত্তশাসন দাবী করিলেও, তাঁহারা এমন কোন সর্ব্বসম্মত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই, যাহার ফলে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে পারে। কিন্তু ভারতবাসীর তিক্ত অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে, মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধ করিবার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষাই কংগ্রেস জানাইয়াছিল এবং মহাত্মা গান্ধী-প্রস্তাবিত আন্দোলন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলোচনা করিতেও রাজী ছিলেন। সে-সুযোগ তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই কেন? কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেফ্‌তারের পর হিন্দু-মহাসভার নেতৃবৃন্দকে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় নাই কেন? রাজাজী অনুমতি পাইলেন না কেন? সরকারী কমিউনিকে প্রকাশ, মীমাংসার সঙ্গত প্রচেষ্টাকে সাহায্য করিতে বড়লাট সর্ব্বদাই ব্যগ্র। এই ব্যগ্রতা বশতঃ রাজাজীকে তিনি অনুমতি দিতে পারেন নাই, কারণ কংগ্রেসের মনোভাবের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ তিনি পান নাই এবং গত তিন মাস ধরিয়া যে নীতি হিংসা, অপরাধ এবং রক্তপাতের জন্য দায়ী তাহার জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দুঃখ প্রকাশ করেন নাই।

দেশব্যাপী এই অশান্তির জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করিতে পারা যায় না। ইহা কংগ্রেসের প্রস্তাবিত আন্দোলন নহে। বহুবার এ-কথা বহু জনেই বলিয়াছেন। সুতরাং কংগ্রেস যদি নগণ্য প্রতিষ্ঠানই হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসকে বাদ দিয়াই অচল অবস্থার সমাধান করা উচিত। আর কংগ্রেস যদি মীমাংসার জন্য অপরিহার্য্যই হয়, তবে মীমাংসার জন্য বড়লাটের ব্যগ্রতা সত্ত্বেও যে-যুক্তিতে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত রাজাজীকে সাক্ষাতের অনুমতি দেন নাই, তাহার সারবত্তা বুঝিতে পারা অসম্ভব।

—

ব্যর্থতার অন্তরালে

কংগ্রেস শেষমুহূর্ত্তে শাসনপরিষদের অধিকাংশের সুপারিশ অগ্রাহ্য করিতে বড়লাটের ক্ষমতা বিলোপের দাবী করায় ক্রিপস-মিশন ব্যর্থ হইয়াছে ইহাই মিঃ চার্চ্চিল ও মিঃ আমেরীর অভিমত। কিন্তু নবনগরের জাম সাহেব বৃটিশ সংবাদপত্র "সাণ্ডে এক্সপ্রেসে" প্রকাশিত ভিতরের কথা'য় এই ব্যর্থতা সম্বন্ধে এক চমকপ্রদ গল্প বলিয়াছেন। তাঁহার গল্পের সারমর্ম্ম হইল এই যে, ক্রিপস-আলোচনার সময় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মনে হইয়াছিল জাপান শীঘ্রই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে। ক্রিপস-প্রস্তাব গ্রহণ করিলে বৃটেনের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় তাহাদের যোগদান করিতে হইত, আর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে তাঁহারা আক্রমণকারীকে বলিতে পারিত যে, গোড়া হইতেই তাঁহারা যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। জাম সাহেব আরও বলিয়াছেন, "কংগ্রেস ভারতের প্রকৃত স্বার্থরক্ষার জন্য কাজ করে নাই, করিয়াছে নিজেদের স্বার্থ এবং সুবিধার জন্য।" কংগ্রেস সম্বন্ধে সত্যের এইরূপ অপলাপ করিতে বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদগণও ত্রুটি করেন নাই। কংগ্রেসের প্রভাব সম্বন্ধে জাম সাহেব বলিয়াছেন, "কংগ্রেসের প্রভাব শুধু সহরগুলিতেই নিবদ্ধ।" জাম সাহেব এই তথ্য কোথায় পাইলেন? জাম সাহেবের সত্যের অপলাপ এইখানেই শেষ হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, "কিন্তু আমি জানি, আগামীকল্য যদি আমাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে পর দিনই আমরা তাহা হারাইব।" কি করিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীনতা রক্ষা করিবে জাম সাহেব তাহা ভাবিয়া পান নাই, কারণ ভারতীয় সৈন্যদলে ভারতীয় অফিসার মেজরের ঊর্দ্ধপদে উন্নীত হয় নাই। জাম সাহেবের খুড়তুতো ভাই একজন মেজর বটেন। তাঁহার মেজর ভাইকে ঊর্দ্ধতনপদে উন্নীত করা হয় নাই কেন এবং আরও কয়েকজন খুড়তুত ভাইকে মেজর করা হয় নাই কেন, নিরাশাবাদীরা জাম সাহেবকে অবশ্যই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে।

কিন্তু ক্রিপস-মিশনের ব্যর্থতা সম্পর্কে, বিখ্যাত মার্কিন লেখক মিঃ লুই' ফিশার 'নেশান পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে এই ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে নূতন আলোক সম্পাত হইয়াছে এবং জাম সাহেব যে সত্যের অপলাপ কতখানি করিয়াছেন তাহাও এই প্রবন্ধ পড়িলে বুঝিতে পারা যায়। মিঃ লুই ফিশার কর্ত্তৃক ব্যর্থতার প্রকৃত রহস্য

উন্মোচিত হওয়ার পর মিঃ গ্রেহাম স্প্রাই স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে সমর্থন করিতে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, মিঃ লুই ফিশার যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। মিঃ স্প্রাই বলেন, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট দিবার কোন প্রতিশ্রুতি স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতের রাজনৈতিক নেতাদিগকে দেন নাই কিম্বা ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দিবার কোন উপদেশও পান নাই। বৃটিশ মন্ত্রিসভার নিকট হইতে কি উপদেশ তিনি পাইয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু ভারতবাসী জানে, স্যার ক্রিপস প্রথমে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং যে কারণেই হউক পরে তিনি তাহা প্রত্যাহার করেন। শুধু মিঃ লুই ফিশারই নয়, ক্রিপস-মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর পরই মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত নেহরু এই তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

সত্যের অপলাপ যাঁহারা করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান, প্রকৃত সত্য কখনও চাপা থাকে না। ক্রিপস-মিশনের ব্যর্থতা সম্বন্ধও থাকিবে না।

মিঃ আমেরীর ভাষ্য

আটলাণ্টিক সনদ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য কি না, এই প্রশ্ন যখন উঠিয়াছিল, তখন মিঃ চার্চ্চিল স্বয়ং তাহার ভাষ্য প্রদান করিলেন। আটলাণ্টিক সনদ যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে এই ভাষ্যে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আমেরী বুঝাইতে চাহিয়াছেন, ভারতবর্ষকে আটলাণ্টিক সনদের অন্তর্ভুক্ত করিতে মিঃ চার্চ্চিল অস্বীকৃত হন নাই। তিনি শুধু জানাইয়াছেন যে, আটলাণ্টিক সনদ রচনার সময় নাৎসী-অধিকৃত ইউরোপের দেশগুলির কথাই তাঁহাদের মনে উদিত হইয়াছিল। মিঃ আমেরী আরও বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ভারত সম্পর্কে বৃটেন যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে আটলাণ্টিক সনদের নীতির সহিত তাহার মিল আছে।

আমাদের মনে পড়িতেছে, আটলাণ্টিক সনদের চার্চ্চিল ভাষ্যের পর মিঃ আমেরী বলিয়াছিলেন, আগষ্টের ঘোষণা আটলাণ্টিক সনদ হইতেও উৎকৃষ্টতর। কিন্তু আটলাণ্টিক সনদে স্বায়ত্তশাসনের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়ার কথা নাই। ১৯৩৭ সনের ২০শে আগষ্টের ঘোষণায় আছে "প্রত্যেক অগ্রগতির সময় এবং কি ভাবে অগ্রসর হইবে, তাহা কেবল পার্লামেণ্টই নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।" আটলাণ্টিক সনদের ৩নং ধারায় সহিত ইহার কোথাও মিল আছে কি? বৃটেনের ভারতীয় নীতি এবং আটলাণ্টিক সনদের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য তাহা আমরা জানি। কিন্তু প্রচারকার্য্যের দ্বারা পৃথিবীর লোক ভুল বুঝুক, তাহাও আমাদের বাঞ্ছনীয় নয়।

মিঃ আল্লাবক্সের পদচ্যুতি

গবর্ণর কর্ত্তৃক সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী মিঃ আল্লাবক্সের পদচ্যুতি ভারতের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। তাঁহার পদচ্যুতির প্রকৃত কারণ, অস্পষ্টতার আবরণের মধ্যে আবৃত থাকিলেও উপাধি-ত্যাগই যে তাঁহার পদচ্যুতির কারণ, তাঁহার নিকট বড়লাটের লিখিত পত্র হইতে তাহা অনুমান করা যায়। মিঃ আল্লাবক্স যখন পদচ্যুত হন, তখনও তিনি ব্যবস্থা-পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন। অধিকাংশ সদস্যের এই আস্থা তাঁহাকে পদচ্যুতি হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।

ভারত-শাসন আইনের ৫১ ধারায় মন্ত্রী নিয়োগ এবং মন্ত্রীদিগকে বরখাস্ত করা গবর্ণরের বিবেচনাধীন করা হইয়াছে। অবশ্য মন্ত্রী নিয়োগ সম্বন্ধে রাজকীয় উপদেশ-পত্রে গবর্ণরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়াই মন্ত্রিসভা গঠনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বরখাস্ত করা সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট উপদেশ নাই। কিন্তু মন্ত্রী-সভা গঠনের ন্যায় বরখাস্ত করার ব্যাপারেও গবর্ণরগণ পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এইরূপ মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু গবর্ণরদের এ সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। বরং উক্ত উপদেশপত্রে এমন কথা আছে যে, গবর্ণরের কোন কাজ উপদেশপত্রানুযায়ী নহে, এই অজুহাতে উহা অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। সুতরাং গবর্ণরের বিবেচনায় মন্ত্রীকে বরখাস্ত করা প্রয়োজন হইলে, তাহা করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই।

ভারত-শাসন আইনে মন্ত্রিত্ব বজায় রাখিতে হইলে ব্যবস্থাপক সভার সমর্থন ব্যতীত তাহা সম্ভব নহে। শুধু গবর্ণরের আস্থা কাহাকেও মন্ত্রিত্বের গদীতে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারে না। কিন্তু দেশের লোকের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের আস্থা কাহাকেও মন্ত্রিত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে অসমর্থ যদি তিনি গবর্ণরের আস্থাভাজন না হন। ভারত-শাসন আইন যে একটা ভূয়া জিনিষ সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী মিঃ আল্লাবক্সের পদচ্যুতিতে তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

—

সাম্রাজ্যের মহিমা কীর্ত্তন

বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকা বৃটিশ সাম্রাজ্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে এই প্রবন্ধে সাম্রাজ্য শব্দের বিভিন্ন অর্থ এবং পরস্পর বিপরীত অর্থ থাকার কথাও আলোচিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'টাইমস' ইউরোপের নাৎসী সাম্রাজ্য এবং এসিয়ার জাপানী সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল সাম্রাজ্য শক্তি এবং লোভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইগুলির ধ্বংস অনিবার্য্য। 'টাইমসে'র মতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটা স্বতন্ত্র বিশেষত্ব আছে। 'টাইমস' বলিয়াছেন, "বিবর্ত্তনশীল 'কমনওয়েলথ অব নেশানে'র ধারণার মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মূল নিহিত রহিয়াছে এবং ইহার আশা এই যে, ব্যাপকতর অংশীদারিত্বের মধ্যে ইহার শেষ পরিণতি ঘটিবে এবং ইহার নমুনা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছে বলিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্য দাবী করিতে পারে।"

ডোমিনিয়নগুলি অনেকদিন হইল বৃটেনের রাষ্ট্রনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বাহিরে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়া বৃটিশ কমনওয়েলথের সমান অংশীদাররূপে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়াছে, এ কথা সত্য। কিন্তু একথাও সত্য যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য যে ভাবেই গড়িয়া উঠুক, উহা প্রকৃত-পক্ষে দুই অংশে বিভক্ত। একটি প্রকৃত সাম্রাজ্য অর্থাৎ বৃটেনের অধীন দেশগুলি। ভারতবর্ষ ইহার অন্যতম। অপর অংশ বৃটিশ কমনওলেথ অব নেশান। ডোমিনিয়ন-গুলি ইহার অন্তর্গত। এইগুলি পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসিত দেশ। পরস্পর সমান মর্য্যাদাবিশিষ্ট, কি আভ্যন্তরীণ, কি পররাষ্ট্র বিষয়ে কেহ কাহারও অধীন নহে এবং একমাত্র রাজানু-গত্যের বন্ধনে তাহারা আবদ্ধ। বৃটিশ রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব সম্পর্কিত আইন-অনুসারে কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ডোমিনিয়নগুলিরও সম্মতি আবশ্যক। ডোমিনিয়নগুলি অনুরোধ করিলেই শুধু পার্লামেণ্ট উহাদের সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। ইচ্ছা করিলে বৃটেনের সহিত সকল সম্পর্ক তাহারা ছিন্ন করিতে পারে।

বৃটিশ কমনওয়েলথ কথাটা নূতন নয়। লর্ড রোজবেরি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই কথাটি ব্যবহার করেন। ১৯০৭ সালে ঔপনিবেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে ডোমিনিয়ন শব্দটির সৃষ্টি হইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অধীন দেশগুলি হইতে স্বায়ত্ত-শাসিত দেশগুলিকে স্বতন্ত্র করিয়া বুঝাইবার জন্য ডোমিনিয়ন শব্দটি ব্যবহৃত হইতেছে। 'টাইমস' বলিতে চান, যে সকল দেশ এখনও পিছনে পড়িয়া আছে তাহারাও ডোমিনিয়নের পথেই অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দিবার কথা কাগজে-কলমে কোথাও আছে কি? ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইনে ডোমিনিয়নের কথা নাই, ক্রমে ক্রমে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট অর্জ্জনের কথা আছে। ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনেও ডোমিনিয়নের কথা নাই। আটলাণ্টিক সনদ ভারতে প্রযোজ্য নহে। সর্ব্বোপরি ভারতের বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম্ম ও জাতির অজুহাত ত আছেই। 'টাইমস' কর্ত্তৃক বৃটিশ সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা কীর্ত্তনের পরেও ভারতের অচল অবস্থা কিন্তু দূর হইতেছে না।

মার্কিন সংবাদপত্র 'লাইফে'র সম্পাদকমণ্ডলী ইংলণ্ডের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে একখানি খোলা চিঠিতে লিখিয়াছেন, "আমাদের দেশের অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোক মনে করে যে, আমরা আদর্শ নির্দ্দেশ করিলেও সেই আদর্শের জন্য আপনারা সংগ্রাম করিবেন কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতবর্ষের কথা বলা

যাইতে পারে। ভারতের সমস্যা যে আপনাদের পক্ষে কত গুরুতর তাহা আমরা বুঝি। কিন্তু সেই সমস্যা সমাধানের জন্য এ পর্য্যন্ত আপনারা কোনরূপ নীতি বা আদর্শ ধরিয়া চলিতেছেন, এমন কোন পরিচয় আমরা পাই নাই। ভারতে আপনারা যাহা করিতেছেন, তাহাতে কেমন করিয়া নীতি বা আদর্শের কথা আমাদের মুখে শুনিবেন বলিয়া আশা রাখেন।" বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে উক্ত পত্রিকায় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, "ইংলণ্ডের কাছে টাকা, সৈন্য, ট্যাঙ্ক বা যুদ্ধ-জাহাজ আমেরিকা চাহিতেছে না। আমেরিকাই সে-সকল সরবরাহ করিবে। কিন্তু আমেরিকা আজ জানিতে চায়, ইংরেজই কি সাম্রাজ্য-নীতি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।"

'লাইফ' পত্রিকার এই খোলা চিঠির পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটা ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা হইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্য যে শুধু সাম্রাজ্য নয়, উহা কমনওয়েলথ অব নেশানস্ এবং উহা বর্জ্জন করা যাইতে পারে না, তাহাও শুনাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বৃটিশ কমনওয়েলথ অব নেশান্সের দোহাই দিয়া বৃটেন সাম্রাজ্যবাদ পরিত্যাগ করিতে রাজী নয়। ১০ই নবেম্বর তারিখে এক বক্তৃতায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন, "আমরা আমাদের সাম্রাজ্য দখলে রাখিতে চাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন দেখিবার জন্য আমি সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী হই নাই।" বর্ত্তমান যুদ্ধ কি তাহা হইলে শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব রক্ষা করিবার জন্যই? বৃটেনের অধীন দেশগুলি এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিতে পারে।

খ্যাতনামা মার্কিন গ্রন্থকার মিঃ গান্থারের পত্নী মিসেস্ গান্থার মিঃ চার্চ্চিলের এই উক্তির উচিত উত্তর দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বৃটেন ভারতের সম্বন্ধে যাহা করিতেছে, তাহা শুধু রাজনৈতিক দুর্নীতি নহে, তাহা রাজনৈতিক বাতুলতা।" তাঁহার এই স্পষ্ট উক্তির জন্য মিসেস্ গান্থার ভারতবাসীর ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন, কিন্তু সাম্রাজ্য-বাদের মোহ এই স্পষ্ট উক্তিতে কাটিবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না।

—

সাংবাদিকের একমাত্র সন্তান বিয়োগ

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র নিয়োগীর একমাত্র সন্তান শ্রীমতী বীণাপাণির মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে অকালমৃত্যুতে আমরা আত্মীয় বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি। বীণাপাণি অসাধারণ তীক্ষ্ণধীসম্পন্না মেয়ে ছিল। এই বয়সেই তাহার পিতার সাংবাদিক ও সাহিত্যিক কাজে সে সেক্রেটারীর মতই সাহায্য করিয়াছে। তাহার স্বদেশ-প্রীতি, সাহিত্য



(মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বের ফটো)

সেবা, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি উদার ব্যবহার, আমরা যাহারা তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছি তাহাদের সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে। গোপালবাবুও তাহার অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত আশাই না পোষণ করিয়াছেন। গোপালবাবুর মনের গভীর স্তরে এই উচ্চাশা সম্বন্ধে যে বাসনা, যে কামনা লুকাইয়া বাসা বাঁধিয়াছিল, তাহাদেরই গোপন টানে না জানিয়া তিনি যে আশা পোষণ করিয়াছেন, তাহা আজ আর তাঁহার নিকট আত্মপ্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। মৃত্যু তাহার নিকট কালো রূপ লইয়া অলক্ষিত আবির্ভাবে স্নেহময় পিতার কোল হইতে একমাত্র সন্তানকে ছিনাইয়া লইল। এই মর্ম্মান্তিক শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। মঙ্গলময় ভগবান গোপালবাবু এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে এই নিদারুণ শোকে সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলাইয়া দিন, ইহাই কায়মনোবাক্যে কামনা করি।

—

পরলোকে শ্রীযুত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি শ্রীযুত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের মৃত্যুতে আমরা গভীর ব্যথা অনুভব করিতেছি। তাঁহাকে যে এত শীঘ্র হারাইব তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই।

শ্রীযুত মিত্র তরুণ বয়স হইতেই দেশসেবার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ রহিতের পর বাংলা দেশে দেখা দিল বিপ্লবী আন্দোলন। শ্রীযুত মিত্র এই আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯১৬ সাল হইতে চারি বৎসর তাঁহাকে অন্তরীণ থাকিতে হইয়াছিল। মুক্তির পর দেশবন্ধুর নেতৃত্বে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। স্বরাজ্য দল গঠিত হইলে তিনি উহার বাংলা শাখার সম্পাদক হইয়াছিলেন। স্বরাজ্য দলের প্রার্থীরূপে ১৯২৪ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু ঐ বৎসরেই তিনি তিন আইনে বন্দী হন। বন্দী অবস্থাতেই তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইলে শ্রীযুত মিত্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মনোনীত হন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ পদেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্রীযুত মিত্র মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন। তাঁহার জীবন ছিল দেশসেবার অখণ্ড সাধনাস্বরূপ। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিরূপে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। সকল দলই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা একজন আজীবন স্বরাজসাধক হারাইল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে এই গভীর শোকে সমবেদনা জানাইতেছি।

যুদ্ধের নূতন গতি

বিশ্ব-সংগ্রামের গতি এবার নূতন দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। রুশ রণাঙ্গনে নাৎসীবাহিনীর অগ্রগতি যখন মন্থর হইয়া উঠিতেছে সেই সময় মিশরে অবস্থিত বৃটিশ অষ্টম বাহিনী আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিয়া রোমেলের বাহিনীকে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে। এই সময় হইতেই যুদ্ধের গতি নূতন পথে চলিতে সুরু করিয়াছে। এই আক্রমণের সম্মুখে কয়েক ডিভিসন ইতালীয় বাহিনী আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় এবং রোমেল অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া পশ্চিম দিকে পশ্চাৎ অপসরণ করিতে থাকেন। রোমেলের পশ্চাৎ অপসরণ যখন আরম্ভ হইল, সেই সময় উত্তর আফ্রিকাস্থিত মাসারী অধিকারে মার্কিন বাহিনী অবতরণ করে এবং বৃটিশ বাহিনী ও রাজকীয় বিমান-বহর তাহাদের সহিত যোগ দেয়। ইঙ্গ-মার্কিন সম্মিলিত বাহিনী দ্রুতগতিতে মরক্কো, আলজিরিয়ায় কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিয়াছে। রোমেল বাহিনী পশ্চাৎ হটিয়া উত্তর আফ্রিকার ফরাসী অধিকারে আশ্রয় বা সাহায্য পাইবেন, সে পথ এখন বন্ধ হইল। আফ্রিকার যুদ্ধের এই নূতন গতিকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট দীর্ঘ প্রতীক্ষিত দ্বিতীয় রণাঙ্গন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

বিজয়ী নাৎসীবাহিনী রুশ রণাঙ্গনে প্রবল আঘাত পাইতেছে, এই অবস্থা আফ্রিকার যুদ্ধের এই নূতন গতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই হিটলার অনধিকৃত ফ্রান্সের উপর দিয়া সৈন্য পরিচালনের আদেশ দিয়া ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগ পর্য্যন্ত পথ করিয়া লইয়াছেন। জার্ম্মাণ সৈন্য টিউনিসে অবতরণ করার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মিত্র শক্তি বাহিনীও ইতিমধ্যেই টিউনিসের দিকে অভিযান করিয়াছে। যুদ্ধের এই নূতন গতি ভূমধ্যসাগরে জার্ম্মাণী ও ইতালীর প্রভাব প্রভূত পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিবে এবং যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ক্রমেই মিত্রশক্তির অধিকতর অনুকূল হইবে।

গল্প প্রতিযোগিতা

(সর্ব্বসাধারণের জন্য)

মাত্র ১টি পুরস্কার—কেদার-স্মৃতি স্বর্ণ-পদক

ফলাফল যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে এবং গল্পটি 'আমরা'য় (হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা, যশোহর জিলার ইতনা গ্রাম থেকে প্রকাশিত) বের হবে।

ফুলস্কেপ্ কাগজের ৮ পৃষ্ঠার মধ্যে গল্প হওয়া চাই।

গল্প পাঠাবার শেষ তারিখ—১লা পৌষ, ১৩৪৯।

গল্প পাঠাবার ঠিকানা :—

সম্পাদক 'আমরা'

মাতৃভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী"

চতুর্থ বর্ষ | পৌষ, ১৩৪৯ | ১২শ সংখ্যা

প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার ক্রমবিকাশ

(পূর্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, এম-এ

মুস্টেরীয় যুগের ভীষণ শীতের পর ধরিত্রী ক্রমশ বহু সহস্র বৎসর ধরে ধীরে ধীরে উষ্ণপ্রধান হয়ে আসে; তুষার নদী সকল উচ্চ পর্ব্বত চূড়ায় ও মেরু-প্রদেশে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়—সাধারণ সমতল প্রদেশ তুষার শূন্য তৃণ-ভূমিতে (Steppe) পরিণত হয়। এ সময়ে খুব অল্প বৃষ্টিপাত হ'ত, তাই বড় বড় বৃক্ষলতা বিশেষ জন্মাত না।

এই যুগে এক নূতন দীর্ঘকায় বুদ্ধিমান্ মানব জাতি পৃথিবী বক্ষে আধিপত্য বিস্তার করে; পুরাতন নিয়াণ্ডার-ঠাল জাতীয় মানব সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই নূতন মানবের নাম ক্রোম্যাগনন মানব (Cro-Magnon Man)। এই ক্রোম্যাগনন মানব বর্ত্তমান মানব জাতির নিকট জ্ঞাতি। হিমালয়ের পাদদেশে পাঞ্জাব প্রদেশে এবং ইয়োরোপের কোন কোন স্থানে এখনও এই জাতীয় মানবের বংশধরদের দেখা যায়। এ সময়ে আরও দুই জাতীয় মানবের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথম, গ্রিমাল্ডি মানব (Grimaldi Man)—বর্ত্তমান নিগ্রো জাতীয় মানবের সহিত সম্পর্কিত ও দ্বিতীয়, চান্সিলেড্ মানব (Chancelade Man)—বর্ত্তমান মোঙ্গোলীয় জাতির সহিত সম্পর্কিত।

এ যুগের প্রধান পশু বল্গা হরিণ (Rein-deer)*। এই সময়ে প্রাচীন কালের ম্যামথ প্রভৃতি অতিকায় জন্তু বিলুপ্ত হয়ে যায় ও অনেকটা আধুনিক ধরণের জীবজন্তু পৃথিবীতে বাস করতে থাকে। বল্গা হরিণ এ যুগের প্রধান পশু এবং এই যুগের মানবের প্রধান খাদ্য ব'লে অনেক সময় এ যুগের সভ্যতাকে রেনডিয়ার সভ্যতা বলা হয়।

এই রেন্‌ডিয়ার সভ্যতা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—অরিগ্‌নেসীয় (Aurignacian), সলুট্রীয় (Solutrean) ও ম্যাগডেলেনীয় (Magdalenian) সভ্যতা। কিন্তু এই তিন শ্রেণীর সভ্যতার মধ্যে বহু বিষয়ে একটা সাধারণ ঐক্য আছে বলে এদের এক সঙ্গে নাম দেওয়া হয়েছে উচ্চ পুরা-শৈল সভ্যতা (Upper Palaeolithic Culture)।

মোটামুটি ম্যাগডেলেনীয় সভ্যতাকে অরিগ্‌নেসীয় সভ্যতার উচ্চ বিকশিত উন্নত সংস্করণ বলে গ্রহণ করা

* উত্তর মেরু প্রদেশে সাধারণত Rein-deerকে বল্গা পরিয়ে স্লেজ প্রভৃতি টানবার কাজে ব্যবহৃত হয়; সেই জন্যে Rein-deerএর বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে বল্গা হরিণ, কিন্তু ইংরেজী rein বা বল্গার সহিত Rein-deerএর কোন সম্বন্ধ নেই। Anglo Saxon 'Hran' (Wild goat) শব্দ থেকেই এই 'rein' শব্দের উৎপত্তি—(A. S. 'Hran Deor = Rein-deer)। Icelandic 'Hreinn' শব্দ এর জ্ঞাতি। Rane-deer বা Rain-deer বানানও ইংরেজীতে প্রচলিত আছে।

(Azilian) সভ্যতার নামের উৎপত্তি। এইখানেই প্রথম এই জাতীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সময়ের শিলাস্ত্রগুলি আকারে খুব ছোট (microlith) হত। তা ছাড়া এক রকম ছোট ছোট চিত্রিত নুড়ি পাওয়া যেত, যাদের গায়ে আল্‌ফা-বেটা ধরণের নানারূপ চিত্র-বিচিত্র করা থাকত। প্রথমে এই চিত্রগুলির অর্থ ঠিক ধরা যায় নি, কিন্তু পরে অষ্ট্রেলিয়ার চুরিঙ্গার চিহ্নের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে এগুলিকে মানুষের চিত্র বলে ঠিক করা হয়েছে। পিতৃপুরুষের অর্চনার জন্যেই এগুলি আঁকা হত, মনে হয়।

সমসাময়িক তার্দিনৈশীয় (Tardenoisian) সভ্যতার নামের উৎপত্তি ফ্রান্সের Fere-en-Tardenois এর নাম থেকে, কারণ এইখানেই প্রথম এই সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই সময়ের শিলাস্ত্রগুলিও আকারে খুব ছোট (microlith) হত; তা ছাড়া এদের একটি বিশিষ্ট জ্যামিতিক আকার থাকত। চিত্রিত নুড়ি এ সভ্যতায় পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে, বিন্ধ্যপর্বতে ও ছোট নাগপুরে এই জাতীয় শিলাস্ত্র পাওয়া গেছে।

আজিলীয় ও তার্দিনৈশীয় এই দু'টি সভ্যতা সমসাময়িক, এবং এই দুটি সভ্যতাতেই অস্ত্রশস্ত্র খুব ছোট আকারের হ'ত বলে এদের একত্রিত করে Azilo-Tardenoisian সভ্যতা নাম দেওয়া হয়েছে।

এদের পরেই আসে ম্যাগ্‌ল্‌মোজীয় (Maglemose) সভ্যতা। ডেন্‌মার্কের Maglemose-এর নাম থেকেই এই নামের উৎপত্তি।

এই সময়ে ডেনমার্ক অঞ্চলের ভূমির উত্থান হেতু স্কাণ্ডিনেভিয়ার সঙ্গে ডেনমার্ক ভূমির দ্বারা সংযুক্ত হয়ে যায়, ফলে বল্টিক সাগর একটি প্রকাণ্ড অন্তর্দেশীয় হ্রদে পরিণত হয়। এই হ্রদের নাম দেওয়া হয়েছে অ্যানশাইলাস্ হ্রদ (Ancylus Lake)। এই সময়ে ডেনমার্ক অঞ্চলে শীত খুব কমে এসেছিল, এবং বায়ুর আর্দ্রতাও একটু বেড়ে গিয়েছিল। ফলে উচ্চ পুরাশৈলযুগের তৃণভূমি (steppe) এই সময়ে ভূর্জপত্র, (birch), পাইন (pine), অ্যাসপেন (aspen) প্রভৃতি বৃক্ষের অরণ্যে পর্য্যবসিত হয়েছিল। এই সময়ের গ্রীষ্মকালে এক জাতীয় লোক গৃহপালিত কুকুর এবং হরিণের হাড়ের ও নেইস্ (gneiss) পাথরের ভারি ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই হ্রদের তীরে মাছ শিকার করতে আসত। তাদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে সূক্ষ্মাগ্র যষ্টি ও হরিণের শিঙের হাতল-বাঁধা কুঠার পাওয়া গেছে।

এর পরে ডেনমার্ক অঞ্চলের ভূমি আবার ধীরে ধীরে নেমে যেতে থাকে, ফলে ডেনমার্ক এবং স্কাণ্ডিনেভিয়া পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অ্যানশাইলাস লেক লুপ্ত হয়ে পুনরায় বাল্‌টিক সাগর বহিঃসমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এই সময়কার সাগর তীরের সভ্যতার নাম দেওয়া হয়েছে Littorina Phase বা সৈন্ধবাবস্থা। এই সময়ের অরণ্যে পাইন ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে ও ওক বৃক্ষ তার স্থানে প্রাধান্য লাভ করে। আবহাওয়াও আর একটু উষ্ণপ্রধান হয়ে আসে। এই যুগের মানুষ প্রধানত সমুদ্রের শামুক, গেঁড়ি, গুগ্‌লি প্রভৃতি খেয়ে জীবন ধারণ করত। সমুদ্রের তীরে তাদের ভুক্তাবশিষ্ট শামুক প্রভৃতির খোলার বড় বড় স্তূপ (shell-mounds) আজও দেখতে পাওয়া যায়, ইংরাজীতে তার নাম দেওয়া হয়েছে Kitchen midden বা পাকশালার আবর্জনা। এই সব স্তূপ অনুসন্ধান করে অনেক নূতন তথ্য জানা গেছে। তারা সংবৎসরই এইরূপ সাগর তীরে বসবাস করত এবং চকমকির (flint) অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। এখানে কয়েকটি এই যুগের কবরও আবিষ্কৃত হয়েছে।

এর পরেই আসে মধ্য শৈলযুগের চতুর্থ এবং শেষ সভ্যতা—ক্যাম্পিগ্‌নীয় সভ্যতা (Campignian Culture), এই সভ্যতার নামকরণ হয় ফ্রান্সের Campigny থেকে কারণ সেখানেই প্রথম এই জাতীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সভ্যতা ডেনমার্কের Kitchen Midden সভ্যতার প্রায় সমসাময়িক হলেও এখানে মৃৎপাত্র ও গৃহপালিত পশুর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে বলে নবশৈলযুগের সভ্যতার সঙ্গে এর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর বলে অনুমিত হয়। সেই জন্যে এই সভ্যতাকে কেউ কেউ নবশৈল যুগেরই আদিমতম সভ্যতা বলে মনে করেন, কিন্তু তা ঠিক নয়, কারণ নবশৈল যুগের ন্যায় এই সময়কার শিলাস্ত্র পালিস করে গড়া হত না। এই সময়েও সূক্ষ্মাগ্র যষ্টি ও হাতল-বাঁধা কুঠার (hafted celt) প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে।

ক্যাম্পিগ নীয় সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যশৈল যুগ শেষ হয়ে, নবশৈল যুগের অভ্যুদয় আরম্ভ হয়। নবশৈল যুগের মানব আমাদেরই পূর্বপুরুষ। তারা বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে নানাদিকে অনেক উন্নতি লাভ করে, এবং বর্তমান সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে। এই সময়ে সামাজিক জীবনের এবং শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

এই যুগে আবহাওয়া, পশু ও উদ্ভিদ অনেকটা আধুনিক ধরণের হয়ে আসে। মানব মৃগয়া বৃত্তি পরিত্যাগ করে কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে আরম্ভ করে এবং তার ফলে যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে স্থায়ী ভাবে একস্থানে বসবাস করতে বাধ্য হয়, ফলে গ্রাম বা পল্লীর উৎপত্তি হয়। এই সময়েই তারা প্রথম পশুপালন, মৃৎপাত্র নির্মাণ, বস্ত্র বয়ন প্রভৃতি কার্য করতে শেখে। এই সময় থেকেই শিলাস্ত্র ঘর্ষণ করে অর্থাৎ পালিশ করে সুদৃশ্য ও তীক্ষ্ণধার করে নেবার প্রথা প্রচলিত হয়। সোণা ছাড়া আর কোনও ধাতুর জ্ঞান এই যুগের মানুষের ছিল না; ব্যবসা-বাণিজ্যও এই সময়ে প্রথম প্রচলিত হয়। এই সময়ের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর-স্তম্ভাদি (megalith) নির্মাণ। এই সময়ে মানুষ গুহাবাস পরিত্যাগ করে জলে স্থলে কিংবা বৃক্ষশাখায় ছোট ছোট কুটির নির্মাণ করে বাস করতে আরম্ভ করে। ধর্ম-সংক্রান্ত নানারূপ জটিল বিশ্বাসও এই সময় থেকে মানুষের মনে আধিপত্য বিস্তার করে।

এখন থেকে মাত্র দশ বার হাজার বৎসর পূর্বে এই যুগের আরম্ভ। সেই জন্যে এদের সম্বন্ধে জ্ঞানও আমাদের অনেকটা বেশি। সবিস্তারে তার বর্ণনা দেবার স্থান এখানে নেই—সংক্ষেপেই সারতে হবে।

নবশৈলযুগের উৎপত্তি ঠিক কোথায় এবং কি ভাবে আরম্ভ হয়েছিল তা' নির্দেশ করে বলা শক্ত। তবে পূর্ব গোলার্ধে মনে হয় মিসর, মেসোপোটেমিয়া, পারস্য, তুর্কীস্থান ও উত্তর পশ্চিম ভারতের মধ্যে কোনো দেশেই এর প্রথম অভ্যুদয় হয়। পশ্চিম গোলার্ধে কিন্তু মধ্য আমেরিকাতেই প্রথম নবশৈল যুগের বিকাশ হয়।

নবশৈল যুগের নারীই সম্ভবত কৃষিকার্যের আবিষ্কর্ত্রী। নবশৈল যুগের অনেক পূর্বেই স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে আপনা হতেই একটা কাজের প্রভেদ বা বিভাগ (Division of Labour) সৃষ্ট হয়ে গেছিল; পুরুষ সাধারণত মৃগয়াদি বলসাপেক্ষ বাহিরের কার্য্যাদি নির্বাহ করত; নারী শিশু পালন ও গৃহস্থালীর কাজকর্ম করত। ভুক্তাবশিষ্ট আবর্জনার সঙ্গে নানা বৃক্ষের বীজ ইতস্তত নিক্ষিপ্ত হলে কালক্রমে তা থেকে যে পূর্ণ বয়স্ক বৃক্ষ জন্মাতে পারে, নারীই সম্ভবত তা প্রথম লক্ষ্য করে, তাই অবসর সময়ে বীজবপন ও অল্প স্বল্প জমীর পাটও তারাই করত প্রথম দিকে, অভাবের সময়ে সুবিধা হবে বলে। কখন কখন মৃগয়া-কালে পুরুষ নিহত হলে, নারী তার শিশুদের এবং তার নিজের আহার্যও এই উপায়ে উৎপাদন করত। এই ভাবেই কৃষিকার্যের প্রথম গোড়া পত্তন হয়। পরবর্তীকালে যখন রীতিমত লাঙ্গল দিয়ে চাষের কাজ করা হত, তখনও সম্ভবত নারীকেই হল-কর্ষণ করতে হত—বলদের পরিবর্তে। পরে অশ্ব বা বলদ প্রভৃতি জন্তুর ব্যবহার প্রচলিত হয়।

চীন, ভারতবর্ষ, শ্যাম, আনাম, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলে ধান্যই প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, নবশৈল যুগ থেকে, কিন্তু ইয়োরোপ প্রভৃতি অঞ্চলে গম (split wheat), যব (barley of the six-rowed type), মিলেট *, রাই † প্রভৃতি শস্যই ব্যবহৃত হত। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ সমূহে কিন্তু এদের পরিবর্তে এক জাতীয় কচু ('Taro' arum) ব্যবহৃত হত। ভারতবর্ষ থেকেই সম্ভবত এই কচুর ব্যবহার সেখানে প্রচলিত হয়। কারণ এই জাতীয় কচুর আদি নিবাস পূর্ব ভারতবর্ষ। ধান্য, গম এবং যবের আদি নিবাস সম্ভবত যথাক্রমে পূর্ব ভারতবর্ষ প্যালেস্টাইন ও সীরিয়া। আমেরিকায় কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে

---

* Millet কোনও বিশেষ এক জাতীয় শস্য নয়। ক্ষুদ্র দানা বিশিষ্ট বহু প্রকার ধান্য পরিবার ভুক্ত শস্যের নাম মিলেট। জোয়ার বা দেধান (Andropogon sp.), বাজরা (Pennisetum sp.), শ্যামা ধান (Panicum sp.), চীনা বা ভুরা ধান (Panicum sp.) গোঁদলি (Panicum sp.), কোদো (Paspalum sp.), মড়ুয়া (Eleusine sp.) প্রভৃতি সকল জাতীয় শস্যই মিলেট নামে অভিহিত।

† Rye (Secale cereale) রাশিয়ার কোনও কোনও অঞ্চলে এখনও অন্যতম প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাও ধান্যপরিবার ভুক্ত।

কৃষিকার্য প্রবর্তিত হয়েছিল। মেক্সিকো, কলম্বিয়া, ইকুয়াডর, পেরু প্রভৃতি মধ্য আমেরিকার প্রদেশ সমূহেই প্রথম কৃষিকার্য প্রচলিত হয়েছিল মনে হয়। এরা আলু ও ভুট্টাকেই প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহার করত। এ দু'টি উদ্ভিদেরই আদি নিবাস আমেরিকা।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে কুকুরই সর্বপ্রথম মানুষের পোষ্য ভুক্ত হয়। নবশৈল যুগের প্রারম্ভে—এমন কি মধ্য শৈল যুগের শেষের দিকেও—কুকুর মানুষের দ্বারা পালিত হত। তিব্বতেই সম্ভবত কুকুর প্রথম গৃহপালিত হয়, কারণ আধুনিক প্রায় সমস্ত গৃহপালিত কুকুরের পূর্বপুরুষ তিব্বতীয় কুকুর জাতি থেকে উৎপন্ন বলে অনুমিত হয়।

চট্টগ্রাম, আসাম, মালয়, বর্মা প্রভৃতি অঞ্চলের একজাতীয় বন্য কুক্কুট গৃহপালিত কুক্কুটের পূর্বপুরুষ। ঐ সকল অঞ্চলে বহু প্রাচীনকাল থেকে মানুষ কুক্কুট পালন করত। নবশৈল যুগেও মানুষ কুক্কুট প্রতিপালন করত—এ প্রথা অত্যন্ত প্রাচীন। কাকাতুয়া প্রভৃতি পাখীও তারা পুষত —এ সবই অবশ্য প্রধানত শখের জন্যে—মাংসের বা ডিমের জন্যে নয়।

এর অনেক পরে নবশৈল যুগের শেষের দিকে মানুষ, গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর, ঘোড়া প্রভৃতি অন্যান্য পশু প্রতিপালন করতে শেখে। প্রথম দিকে কিন্তু এই সমস্ত জন্তু তারা পুষত প্রধানত শখ করে বা ভারবাহী জন্তু হিসাবে—কখন কখন মাংসের জন্যেও বটে—কিন্তু দুগ্ধের জন্যে কখনই নয়। আধুনিক বহু অসভ্য জাতিও এই সকল জন্তু পোষে অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু এদের দুধ মোটেই পান করে না। প্রাচীন মিসরেও করত না, তার প্রমাণ আছে। ঘোড়া মানুষের সভ্যতার উন্মেষে কি রকম সহায়তা করে তা পূর্বেই বলেছি। আমেরিকার প্রধান গৃহপালিত পশু আলপাকা ও লামা। গুয়ানাকো নামক একজাতীয় বন্য পশু বহু যুগ ধরে গৃহপালিত হয়ে লামা ও আলপাকায় পরিণত হয়েছে। বস্তুত লামা এবং আলপাকা একই জাতীয় জন্তু।

বর্তমানকালে গৃহপালিত পশু আমাদের নানা কাজে লাগে। পশম, মাংস, দুগ্ধ, প্রভৃতি জোগান দেওয়া, ভার বহন করা, গৃহ চৌকি দেওয়া প্রভৃতি এই সকল কাজের মধ্যে পড়ে। নৃতত্ত্ববিদেরা কিন্তু বলেন মানুষ প্রথম গৃহপালিত পশু পোষণ করতে আরম্ভ করে এই সকল সুবিধার জন্যে নয়—শুধু শখের জন্যই তারা প্রথম পশুপালন আরম্ভ করেছিল। কিন্তু আমাদের মনে হয় শখ ছাড়াও অন্য প্রয়োজন তাদের ছিল। প্রথমত অবশ্য তারা মাংসের জন্যেই পশু শিকার করত—তাতে কখন কখন তারা প্রচুর মাংস সংগ্রহ করতে পারত, আবার কখন বা কয়েকদিন কোনও শিকার মিলত না—বাসি ও পচা মাংস খেতে হত। নবশৈলযুগের আবহাওয়া উষ্ণপ্রধান হওয়াতে মাংস শীঘ্রই পচে যেত—এবং সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পচা মাংস ক্রমশ অপ্রীতিকর হওয়াতে তারা কখন কখন পশুকে একেবারে মেরে না ফেলে আহত করে ঘরে এনে বেঁধে রাখত—অবশ্য যখন ঘরে প্রচুর মাংস মজুদ থাকত তখনই। তাতে আরও একটা সুবিধা হত—আহত পশুকে টেনে হিঁচড়েই ঘরে নিয়ে আসা চলত—মৃত পশুর মতো কাঁধে করে বয়ে আনতে হত না। তার পর ক্রমশ সময় হলে তারা সেই আহত পশুকে হত্যা করে আহার করত। কখন কখন বেশি দিন এই ভাবে জিইয়ে রাখতে হলে তারা অল্পস্বল্প ঘাস-জলও দিত। আমাদের মনে হয় এই ভাবেই প্রথম পশু পালন সুরু হয়। অবশ্য কুকুরের কথা আলাদা। সে অনেকটা নিজে থেকেই মানুষের সঙ্গ বেছে নিয়েছিল।

নবশৈলযুগের প্রারম্ভ থেকেই বা তার কিছু পূর্বেই মানুষ মৃৎপাত্র নির্মাণ করতে শেখে। প্রথম দিকে অবশ্য কুম্ভকারের চাক ছিল না। মৃৎপাত্র হাতে গড়ে বা ছাঁচে ফেলে নির্মাণ করা হত। সাধারণত ঝুড়ির মধ্যে মাখা মাটী গোল করে পাকিয়ে পাকিয়ে (ধামার বেতের মতো) মৃৎপাত্র প্রস্তুত করা হত। পরে সেগুলি পিটিয়ে সুদৃশ্য করে নিয়ে পোড়ান হত। চাকার আবিষ্কার মৃৎশিল্পের যুগান্তর নিয়ে আসে—শুধু মৃৎশিল্প কেন—যাতায়াতের দিক দিয়ে যান নির্মাণ, সূতা কাটার দিক দিয়ে চরকা নির্মাণ প্রভৃতি অনেক কার্যই মানুষের পক্ষে সহজ ও সুগম করে দেয়। চাকা সম্ভবত যান নির্মাণের কাজেই প্রথম ব্যবহৃত হয়। তার পূর্বে গাছের গুঁড়ি প্রভৃতি স্তম্ভাকার বস্তু দিয়েই ভারি জিনিষ টানার কাজ করা হত। স্তম্ভের

পরে নিরেট চাকা এবং সর্বশেষে অর-বিশিষ্ট চাকা আবিষ্কৃত হয়। সম্ভবত চীন দেশেই প্রথম চাকা উদ্ভাবিত হয়েছিল; মিসর, ভারত বা মেসোপোটেমিয়ায় হওয়াও অসম্ভব নয়। চাকা মানব জীবনে বহু দিক দিয়ে একটা যুগান্তর নিয়ে আসে।

বস্ত্র বয়নও নবশৈলযুগের একটা বৈশিষ্ট্য। বস্ত্র বয়নের কৌশল মানব প্রথম আবিষ্কার করে মাদুর বা ঝুড়ি বুনতে গিয়ে; পরে শণ, পশম ও তুলায় অনুরূপ বুনতে শেখে।

সমুদ্রের উপর দিয়ে বড় বড় নৌকায় করে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনাও এই সময় থেকে আরম্ভ হয়। বাণিজ্যের প্রধান সামগ্রী ছিল—অ্যাম্বার (amber), জেড (jade), সুবর্ণ, প্রবাল (coral) প্রভৃতি বস্তু। তা ছাড়া আফ্রিকার মরুভূমিতে উটের পিঠে বহুদ্রব্যের আদানপ্রদান হত, কারাভান চলবার পথ দিয়ে। অন্যত্র ঘোড়াও এ বিষয়ে মানুষের খুব সহায়ক হয়েছিল।

এই যুগের অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যে প্রধান হল পাথরের কুঠার (celt), তীরের ফলা, বর্শার ফলা, ভেদক, ছোরা, রিং-স্টোন * (Ring-stone), হাতুড়ির মাথা, খল, নোড়া প্রভৃতি। এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ঘর্ষণ করে পালিশ করে নেওয়া হত, পূর্বেই বলেছি। এই পালিশ নবশৈল যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

নবশৈলযুগের কেল্ট-কুঠার সাধারণ আকৃতিতে অনেকটা প্রাচীনকালের coup-de-poing-এর মতো হলেও, এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ প্রচুর। Coup-de-poing-এর চওড়া দিকটাই হাতলের দিক সে দিকে ধার থাকৃত না। সরু দিকের দুপাশে ধার থাকত। এতে কোনো রকম কাঠের ডাণ্ডা পরান হ'ত না। কেল্ট-কুঠারের কিন্তু তা নয়। এর সরু দিকটাই হাতলের দিক, চওড়া দিকে ধার থাকৃত, যেমন আধুনিক কুড়ুলের থাকে। সাধারণত সরু হাতলের দিকটায় কাঠের ডাণ্ডা (haft) তাঁত দিয়ে বেঁধে নিয়ে কেল্ট-কুঠার তৈরি করা হ'ত। কাঠের ডাণ্ডার মাথার কাছে একটা ছিদ্র থাকত, তারি মধ্যে কুঠারের হাতলের দিকটা গলিয়ে দিয়ে বেঁধে নেওয়া হ'ত। কুঠারের হাতলের দিকে ছিদ্র করে, তার মধ্যে ডাণ্ডা বাঁধার রীতি বহু পরে নবশৈলযুগের শেষের দিকে প্রচলিত হয়। কখন কখন গাঁতির মত দু-মুখো কুঠার বা এক দিকে কুঠার এক দিকে adze দেওয়া যুক্ত-কুঠার তৈরি করা হ'ত। Adze সাধারণ কুঠারেরই মতো একপ্রকার যন্ত্র, কেবল তার ফলা কোদালের মতো ডাণ্ডার সঙ্গে লম্বভাবে বসান হ'ত। সূত্রধরদের মধ্যে আজও adze-এর ব্যবহার দেখা যায়।

নবশৈল যুগের মানব মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। তারা মৃতদেহ সমাধি দিত। ধর্ম সম্বন্ধেও তাদের নানারূপ বিশ্বাস ও পূজা প্রচলিত ছিল। প্রায় সর্বত্রই উর্বরতার প্রতীক হিসাবে তারা ধরিত্রী দেবীকে (Mother Goddess) পূজা করত। বহুস্থানেই মৃন্ময়ী ধরিত্রী দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে।

নবশৈলযুগের সভ্যতাকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়—রোবেনহজীয় (Robenhausian) ও মেগালিথীয় (Megalithic) সভ্যতা। রোবেনহজীয় সভ্যতার নাম সুইজারলাণ্ডের Robenhausen নামক স্থানের নাম থেকে উৎপন্ন। সেইখানেই এই জাতীয় সভ্যতার নিদর্শন বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সুইজারল্যাণ্ডে অনাবৃষ্টির দরুণ খুব জলাভাব হয়। তাতে জুরিক (Zurich) হ্রদের জল বহু পরিমাণে শুষ্ক হয়ে যায়। তখন সেই হ্রদগর্ভে জলের ধারে সহস্র সহস্র খোঁটা পোঁতা রয়েছে দেখা যায়। তা দেখে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে প্রাগৈতিহাসিক কালে নিশ্চয়ই কোনো জাতি এই হ্রদের উপর কাঠের গৃহ নির্মাণ করে বাস করত। হ্রদের তলার মাটিতে অনুসন্ধানের ফলে উক্ত সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। Robenhausen নামক স্থানের নিকটেই এই সময়ের সভ্যতার নিদর্শন সব চেয়ে বেশি পাওয়া যায়। এই রকম জলের উপর বাসস্থানকে ইংরেজিতে Lake-dwelling (হ্রদাবাস) বলে। এইরূপ খোঁটার উপর এক সঙ্গে বহু গৃহ বা গ্রাম নির্মিত হ'ত বলে একে Pile-village বা স্তম্ভগ্রাম নাম দেওয়া হয়েছে। ব্রোঞ্জ-যুগেও এই

* মোটা ও ভারী বলয়াকার এক রকম প্রস্তর খণ্ড। ঠিক কোন কাজে ব্যবহৃত হত সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

রকম স্তম্ভগ্রামের প্রচলন ছিল। আয়ারল্যাণ্ডেও অনেকটা এই ধরণের আবাস ছিল দেখা যায়। বর্তমান কালে বোর্নিয়োতেও অনেকটা এই ধরণের স্তম্ভাবাস দেখা যায়।

ইটালীতেও এক সময়ে এই ধরণের স্তম্ভাবাস ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি জলের উপর না হয়ে সাধারণ শুষ্ক জমির উপর নির্মিত হ'ত। এ ছাড়া এই যুগের মানব নদীতীরে বা সাগরতীরে সাধারণভাবে জমীর উপরও বসবাস করত তা'তে সন্দেহ নেই।

রোবেনহজীয় সভ্যতায় প্রত্যেক গৃহে তার নিজস্ব তাঁত থাকত, তাতে তারা আপনাদের পরিধেয় বস্ত্র বয়ন করত। সুতা কাটবার জন্যে চরকাও অবশ্য থাকত। গরু, ভেড়া, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত পশুও তারা পালন করত। অস্ত্রশস্ত্রও সাধারণ ভাবে নবশৈলযুগের মতোই হ'ত।

দ্বিতীয় সভ্যতার নাম মেগালিথীয় সভ্যতা। এই সময়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের নানারূপ মনুমেণ্ট বা স্মৃতিচিহ্ন নির্মিত হ'ত দেখতে পাওয়া যায়। তাই এই যুগের নাম মেগালিথীয় সভ্যতা বা মহাশৈল সভ্যতা। এই বিশাল প্রস্তরখণ্ডগুলি ছোট বড় নানা বিভিন্ন আকারের হ'ত এবং বিশেষ ভাবে পরিষ্কৃত করে কাটা হ'ত না মোটেই। তা ছাড়া এগুলি বহু বিভিন্ন প্যাটার্নে সাজান হ'ত, সেই হিসেবে এদের নানারূপ নামকরণ করা হয়েছে।

Dolmen বা Stone-table (শিলাচ্ছদ)—এতে দুই, তিন বা চারটি খাড়াভাবে পোঁতা পাথরের উপর ছাদের মতো একটি পাথর চাপান থাকে। সাধারণত পাশের একটি পাথরের মাঝখানে একটি গর্ত থাকে—কখন কখন থাকেও না। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন প্রথমে এগুলি মাটি বা পাথরের টুকরো দিয়ে ঢাকা ছিল, পরে প্রাকৃতিক কারণে অনাবৃত হয়ে পড়েছে।

যদি পাশাপাশি এক সারি dolmen এমন ভাবে সাজান যায় যাতে একটি আচ্ছাদিত বীথি রচনা করে, তা হলে তাকে Allecouverte শিলাবীথি বলে।

Menhir বা Long-stone (শিলাস্তম্ভ)—ইহা এক খণ্ড প্রস্তর নির্মিত প্রকাণ্ড একটি স্তম্ভ, খাড়াভাবে মাটিতে পোঁতা থাকে। অনেকগুলি শিলাস্তম্ভ যদি কয়েক সারে সমরেখায় সমান্তরালভাবে প্রোথিত থাকে তা হলে সেই শিলাস্তম্ভসমূহকে ইংরেজিতে Alignment (শিলা-স্তম্ভালি) বলে। যদি বৃত্তাকারে সাজান থাকে তা হলে তার নাম হয় Cromlech বা শিলাচক্র। ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে শিলাস্তম্ভ ও শিলাচ্ছদ দুইই পাওয়া যায়।

দক্ষিণ-ইংলণ্ডে 'Stone-henge' নামে আর এক প্রকার মহাশৈলস্থাপত্য দেখা যায়, তা আর কিছুই নয় কেবল মধ্যে একটি শিলাচ্ছদ আর তার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে একটি শিলাচক্র বা শিলাবীথি। এগুলি সবই নবশৈলযুগের মানবের সমাধির উপরকার স্থাপত্য-চিহ্ন।

মহাশৈলস্থাপত্য ব্রোঞ্জ-যুগ ও লৌহ-যুগের প্রথম দিক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। শেষের দিকে উক্ত স্থাপত্য নানা রকম বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে, যেমন Kist বা Cist অর্থাৎ মৃতদেহের জন্য শিলাকক্ষ, Barrow বা মৃত্তিকাবৃত শিলাচ্ছদ, Cairn বা উপলাবৃত শিলাচ্ছদ, Souterrain বা ভূগর্ভস্থ শিলাবীথি ইত্যাদি। শেষেরটী লৌহ-যুগের আগে পাওয়া যায় না।

বর্তমান কালেও অনেক অসভ্য জাতি শিলাস্তম্ভ নির্মাণ করে—উদাহরণস্বরূপ ছোটনাগপুরের মুণ্ডা ও আসামের কোন কোন অসভ্য জাতির উল্লেখ করা যেতে পারে। আসামের নাগা প্রভৃতি জাতিরাও শিলাস্তম্ভ নির্মাণ করে, কিন্তু তাকে ঠিক শিলাস্তম্ভ বলা উচিত নয়, কারণ এগুলি সমাধির স্থাপত্যচিহ্ন নয়—জীবন্ত লোকেরাই একরকম উৎসব সম্পন্ন ক'রে এগুলি স্থাপন করে, তাতে তাদের সামাজিক পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায় বলে। এগুলিকে জেন্না-স্তম্ভ (Genna-stones) বলে।

নবশৈলযুগের শেষের দিকে এক শীতের রাত্রে হয় তো একদল শ্রান্ত মানবসন্তান একটি প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে তার চরদিকে ঘিরে শুয়ে রাত কাটিয়েছিল। অগ্নিকুণ্ড থেকে আগুন ছিটকে যাতে বাইরে না আসতে পারে তার জন্যে তার চারপাশে বড় বড় পাথরের চাঁই দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল। পর দিন প্রভাতে তারা আশ্চর্য হয়ে দেখলে এক অদ্ভুত পদার্থ

তাদের অগ্নিকুণ্ডের পাশে জমে পড়ে রয়েছে—তার সঙ্গে তাদের পূর্ব পরিচিত তাম্রধাতুর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। বস্তুত সেটা তামা ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবীতে যেমন সামান্য পরিমাণে অযৌগিক ধাতব তাম্র পাওয়া যায়, তেমনি যৌগিক অবস্থায় তাম্রিক প্রস্তরের (Copper ore) মধ্যেও অনেক তামা থাকে, আগুনের উত্তাপে তা গলে নিষ্কশিত হয়ে এসেছিল। সেই তামা নিয়ে তারা মধ্যে মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্মাণ করতে লাগল, কিন্তু প্রথম দিকে তা বিশেষ জনপ্রিয় হয় নি, কারণ এই সময়ে তামাকে তারা ভয় মিশ্রিত অবিশ্বাসের চোখে দেখত। এই ভাবে বহুকাল ধরে ধীরে ধীরে অস্ত্রনির্মাণে তামার ব্যবহার চকমকির সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল, তারও অনেক পরে তামার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেল। কিন্তু ইতিমধ্যে তারা আরও একটা নূতন তথ্য আবিষ্কার করে ফেললে, সেটা হচ্ছে শুধু তামার চেয়ে রাঙ্ মিশান তামা অনেক শক্ত—সুতরাং অস্ত্র নির্মাণের পক্ষে অনেক বেশি যোগ্যতর পদার্থ। সেই থেকে তামার পরিবর্তে রাঙ্ ও অল্প দস্তা মিশিয়ে ব্রোঞ্জের ব্যবহারই বেশি প্রচলিত হ'ল। অবশ্য সেই সঙ্গে চকমকির প্রচলনও অল্পাধিক পরিমাণে বর্তমান ছিল।

তামা সর্বপ্রথমে সম্ভবত সিনাই পর্বতের আশেপাশে কোথাও আবিষ্কৃত হয়েছিল।

সুতরাং নবশৈলযুগের পর আমরা পর পর কিন্তু মিশ্র-ভাবে তিনটি সভ্যতার বিকাশ দেখতে পাই—প্রথম, Calcolithic Age বা তাম্রশৈল-যুগ; দ্বিতীয়, Copper Age বা তাম্রযুগ এবং তৃতীয়, Bronze Age বা ব্রোঞ্জ-যুগ। এই তিন যুগের সভ্যতাই মোটামুটি ভাবে শেষের দিকের নবশৈলযুগের সভ্যতার অনুরূপ। ব্রোঞ্জ-যুগে কিন্তু ধীরে ধীরে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে লাগল—সে কথা পরে বলছি।

তাম্র-যুগ কিন্তু ইয়োরোপে মিসরে বা মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয় না—অতি দ্রুত ওরা ব্রোঞ্জের ব্যবহার আয়ত্ত করে নিয়েছিল। ভারতের উত্তরাপথে কিন্তু ব্রোঞ্জের ব্যবহার কোন দিনই বিশেষ প্রচলিত হয় নি—তার পরিবর্তে তামাই ব্যবহৃত হ'ত।

তাম্রশৈলযুগের সভ্যতার নিদর্শন আমরা মিসরে মেসোপোটেমিয়ার ও ভারতের মহেন-জো-দাড়ো, হরপ্পা, নাল প্রভৃতি স্থানে দেখতে পাই।

এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য লিপিসৃষ্টি। এর পূর্বে মেগালিথীয় যুগের শেষের দিকে কিংবা তার কিছু পরে মিসরে চিত্রলিপি (Hieroglyphics) প্রচলিত ছিল। মিসরের পুরোহিতদের সংক্ষিপ্ত চিত্রলিপি (Hieratics), মেসোপোটেমিয়ার কীলকলিপি (Cuneiform Character), মহেন-জো দাড়োর অপঠিত লিপি প্রভৃতি এই যুগেই প্রচলিত ছিল। মিসরের ডিমোটিক (Demotic) লিপি সম্ভবত আরও পরবর্তী। পঞ্জিকা ও অঙ্কশাস্ত্রের মূল সূত্রও এই সময়ের আবিষ্কার বলে মনে হয়।

প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে ব্রোঞ্জ-যুগ প্রথম আরম্ভ হয়। এই যুগে বহু প্রদেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করে। তার মধ্যে ক্রীটদ্বীপের Knossos, গ্রীসের Mycenae, Tiryns, এসিয়া মাইনরের ট্রয় (Hissarlik) প্রভৃতি নগরই অগ্রগণ্য। এই সময়ে কলাশিল্প, স্থাপত্য, চিত্রবিদ্যা মৃৎশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে প্রভূত উন্নতি লাভ করে। সমুদ্র অভিযানও দ্রুত প্রসার লাভ করে। স্ত্রী-পুরুষের বেশ-ভূষা, অলঙ্কার, বর্ম, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতিও এই সময়ে বেশ উন্নত শ্রেণীর হ'ত দেখা যায়।

এই সময়ের ধর্মের মধ্যে বহু দেবদেবীর আবির্ভাব দেখা যায়। তা ছাড়া, স্বস্তিকা, সূর্য-চিহ্ন, কুঠার প্রভৃতি প্রতীকও ধর্মকার্যে বেশ ব্যবহৃত হ'ত। মাদুলী বা কবচের প্রচলন ছিল। মৃতদেহ কবর দেবার প্রথা বর্তমান ছিল। কিন্তু ব্রোঞ্জ-যুগের শেষের দিকে দাহ করবার প্রথা ক্রমশ বর্ধিত হতে থাকে। নবশৈলযুগের Collected Burial বা বহু মৃতদেহ একসঙ্গে সমাধিস্থ করার প্রথা এই সময়ে লোপ পেয়ে এসেছিল। সমাধিস্তূপের আকৃতিও অনেকটা ছোট ও গোলাকার হয়ে এসেছিল। অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট পাথরে এই সমাধিগৃহ নির্মিত হ'ত। মৃতদেহ দাহ করবার পর ভস্ম রাখবার জন্যে এক প্রকার বিশেষ ভস্মাধার (Cinerary Urn) নির্মিত হ'ত। তা ছাড়া কোনো কোনো স্থানে আবার মৃতদেহ দাহ না করেই জোর

করে ঠেসে জারের মধ্যে পুরে কবর দেওয়া হ'ত। এর নাম দেওয়া হয়েছে Jar-burial বা কুম্ভ-সমাধি।

ব্রোঞ্জ-যুগের পরেই আসে লৌহ-যুগ। এই সময় থেকেই মোটামুটি ইতিহাসের আরম্ভ—সুতরাং তা নিয়ে এখানে আর বিশদ আলোচনা করবার প্রয়োজন নেই।

লৌহ সম্ভবত এসিয়া মাইনরের হালিস (Halys) নদীর ধারেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়। লৌহের অস্ত্র-শস্ত্র ব্রোঞ্জের চেয়ে অনেক শক্ত, সুতরাং যে সমস্ত জাতি লৌহের ব্যবহার প্রথমে আয়ত্ত করেছিল, তারাই সেই সময়ে যুদ্ধবিগ্রহে সাফল্য লাভ করত; সেই থেকে লৌহের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে।

লৌহ-যুগকেও বৈজ্ঞানিকেরা তিন ভাগে ভাগ করেছেন, সে কথা পূর্বেই বলেছি। Hallstatt বা হালস্টাটীয় যুগের সভ্যতা মোটামুটি ব্রোঞ্জ যুগের শেষের দিকের সভ্যতার অনুরূপ, কি আর একটু বেশি উন্নত, এই মাত্র। La Tene লা টীনীয় যুগে কিন্তু নানা দিক দিয়ে অনেক উন্নতি লক্ষিত হয়। এই সময়ে নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর 'সেফটিপিন' প্রস্তুত হ'ত—অস্ত্রশস্ত্রের গঠনও Hallstatt যুগের চেয়ে অনেকটা উন্নতি লাভ করেছিল।

আধুনিক লৌহ-যুগ এখনও চলছে—এ যুগের সভ্যতার কথা আমরা সকলেই জানি।

এইবার আমরা বিভিন্ন সভ্যতা ও তাদের বৈশিষ্ট্যের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করব।

স্থানাভাব বশতঃ সংক্ষিপ্ত তালিকাটি পর পৃষ্ঠায় (৭১৫ পৃঃ) দেওয়া গেল।

এগিয়ে চলা

শ্রীজয়ন্তকুমার রায় চৌধুরী

ওই যে দূরে গগন'পরে
রাতের আঁধার আসছে হয়ে ম্লান,
ওরে পথিক, একটুকু আর
চলরে গেয়ে সেই বিজয়ের গান।
কাটিয়ে এলি এতখানি
কত আঘাত প্রাণে হানি
ফুরাল পথ, একটুখানি—
চল জাগিয়ে প্রাণ;
ওরে পথিক একটুকু আর—
চলরে গেয়ে সেই বিজয়ের গান।

প্রদীপটি ওই আসছে নিভে,
সেই প্রদীপে জেলে—
একটুখানি চল এগিয়ে—
ক্লান্তি-ছায়া ফেলে;
বায়ুর মত হালকা বেশে

শ্রান্তিশেষে শান্তি হেসে
আসবে দু'হাত মেলে
চলরে পথিক চল এগিয়ে
ক্লান্তি-ছায়া ফেলে।

অন্ধকারের অন্তরালে অন্ধ হয়ে কেন?
বন্ধ দুয়ার দে না রে ভাই খুলে;
আসুক ছুটে মুক্ত আলো পাগলপারা হয়ে
ঝড়ের মত মুক্তি-হাসি তুলে
পথের শেষে ওই সে দুয়ার
চল এগিয়ে দাঁড়াস না আর
ছুটিয়ে হাসির পুলক আবার
সব অবসাদ ভুলে;
চলরে তোরা চল এগিয়ে
মুক্তি-হাসি তুলে।

স্তর			আনুমানিক বয়স*		বৈশিষ্ট্য		উদ্ভিদ	
হলোসীন বা আধুনিক স্তর	লৌহ	আধুনিক লা-টীনীয় হাল্স্টাটীয়	২,৫০০	আধুনিক	ধাতব অস্ত্রশস্ত্র, তলোয়ার, বর্ম, অলঙ্কার ইত্যাদি। মৃতদেহ দাহ, মহাশৈল স্থাপত্য।	আধুনিক	আধুনিক বনভূমি	উষ্ণ
	ব্রোঞ্জ	ব্রোঞ্জযুগীয়	৪,০০০					
	তাম্রশৈল	তাম্রশৈলযুগীয়	৪,০০০					
	নবশৈল	মেগালিথীয় রোবেনহজীয়	৫,০০০ ১০,০০০		পালিস করা কুঠার (celts), রিং-স্টোন, হাতুড়ী, শলনোড়া ইত্যাদি, কৃষিকার্য পশুপালন, বয়ন, মৃৎশিল্প, মহাশৈল স্থাপত্য।			
	মধ্যশৈল	কাম্পিগ্নীয় কিচেন মিডেন ম্যাগলমোজীয়	১৫,০০০ ১৫,০০০ ১৮,০০০		বিবর্তমান (transitional)			
		এজিলো-তার্দিনৈশীয়	২০,০০০		অতিক্ষুদ্র শিলাস্ত্র			
প্লিস্টোসীন	পুরাশৈল	ম্যাগ্ডেলেনীয় সলুট্রীয় অরিগ্নেসীয়	৩০,০০০ কীলকাকারে প্রবিষ্ট ৪০,০০০	ক্রোম্যাগনন	সূক্ষ্মক (points) ভেদক, উৎকারক (engravers) হার্পুন, বেটন-ডি-কমাণ্ডমেণ্ট। সুন্দর-গুহাচিত্র।	বল্গাহরিণ	তৃণভূমি	শীতল
		মুস্টেরীয়	৬০,০০০	নিয়াণ্ডারঠাল	ঘর্ষক (scraper). Flaked implements	ম্যামথ	তুন্দ্রাভূমি	অতি শীতল
		আশুলীয় চেলীয়	১,০০,০০০ ২,০০,০০০	? { পিল্টডাউন হাইডেলবার্গ	হস্তকুঠার (coup-de-poing)	জলহস্তী দাক্ষিণাত্য হস্তী	পরিবর্তনশীল তুন্দ্রা ও বনভূমি	উষ্ণ ও শীতল এইভাবে পরিবর্তনশীল (glacial and interglacial periods)
	উষাশৈল	প্রাক্চেলীয়	৩,০০,০০০		হস্তকুঠার (,,)	দাক্ষিণাত্য হস্তী, এট্রুস্কান গণ্ডার		
		ফক্সহল ফ্লিন্টস্	৫,০০,০০০	? { সাইনানথ্রোপাস পিথেকানথ্রোপাস	অবিশিষ্টাকার শিলাস্ত্র	হরিণ (Cervidae)		
প্লিয়োসীন		রোস্ট্রোকেরিনেট	?	?	রোস্ট্রোকেরিনেট	প্রাচীন পশু	প্রাচীন বনভূমি	উষ্ণ

নৃতাত্ত্বিক সভ্যতার তালিকা (নীচের দিক থেকে পাঠ্য)

* প্রচুর মতভেদের অবকাশ আছে।

দুঃখের দিনে

(গল্প)

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিভা···

কাজ করতে করতে হঠাৎ থেমে যায়, সারাদেহ-মনে কেমন যেন একটা অবসাদ···কেমন যেন কাজে একটা অনিচ্ছা···কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা! ক্লান্ত, নিজেকে সে ভারী ক্লান্ত অনুভব করে···রাজ্যের অলসতা যেন তাকে পেয়ে বসেছে। ইচ্ছা করে বসে বসে শুধু ভাবতে, কোন কাজ নয়—একনাগাড়ে শুধু ভাবা আর ভাবা। কিন্তু ভাবতেও যেন সে পারে না, বড় পরিশ্রম মনে হয়, বড় কষ্ট বোধ করে সে, শিউরে উঠে প্রতিভা! একাদিক্রমে রঙীন দিনগুলো যখন সে স্বামীর সঙ্গে উপভোগ করছিল—তখন হঠাৎ স্বামীর সুরাপান আরম্ভ হ'ল। কানাই বলেছিল, ওষুধ হিসেবে খাচ্ছি,—প্রতিদিন এক চামচ।···

কিন্তু ক্রমশঃ এক চামচ আধ বোতলে ঠেকল—শেষে পুরাপুরি একটা।

'এ হচ্ছে কি?'

'কেন, খারাপটা কি?'

'বুঝতে পারছ না? ছিঃ, ছিঃ, এই রকম জঘন্য হয়েছ তুমি?'

'চুপ্! আর লেকচার মারতে হবে না, আমার টাকা, যেভাবে ইচ্ছে উড়োব।' বলেই কানাই এমনভাবে মাতাল হাসি হেসে উঠেছিল যে শুনে প্রতিভার সে কি মাথা-ঘোরা!

সে কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আজও প্রতিভার মাথা ঘুরে উঠে···শিউরে ওঠে সে।

না, প্রতিভা আর ভাববে না। বরঞ্চ কাজের মধ্যে ডুবে যাওয়া অনেক—অনেক ভাল,—সে ছেঁড়া, তুলো-বের-হওয়া, বিড়ালের গা'র মতন, অপরিষ্কার, তেল চিটচিটে তোষকটায় সূঁচ বসায়। কয়েকটা ফোঁড় দেবার পরই কেন প্রতিভার কপালের দুই রগ টনটন করতে থাকে. চোখ জ্বালা করে, কেমন অন্ধকার দেখে,—সূঁচটা আলগোছে তার হাত থেকে খসে পড়ে। যে-আবেষ্টনীর মধ্যে সে রয়েছে ট্যালার মতন সেদিকে সে তাকায়: দারিদ্র্যের চরম প্রতীক! দুর্গন্ধ, মালিন্য, নৈরাকার, বীভৎসতা··· মানুষের চরম অবনতি—সব কিছুই যেন তার চারপাশে হা-হা করে হাসছে! কোণের ঐ ফুটো মেটে কলসীটা এমনভাবে কাৎ হয়ে রয়েছে যে. মনে হয় শ্মশান,—তার পাশে ছোট খোকার শতছিন্ন কাঁথাটা!! ওঃ, দৃশ্যটা যেন আরও বীভৎসভাবে সুপরিস্ফুট হয়েছে! প্রতিভা কেঁপে উঠে। কলসীটাকে সোজা করে বসিয়ে রাখা কিংবা দূর করে টান দিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া আর কাঁথাটাকে ওখান থেকে উঠিয়ে নেওয়া—ব্যাস্, তাহলেই ও-বীভৎস দৃশ্য এখনই ধ্বংস হয়ে যায়! কিন্তু তা করবে কে?···

প্রতিভার সারা দেহটাই যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে,—তার কিছুতেই মন বসে না—কিচ্ছু ভাল লাগে না। ঐ সামান্য কাজটুকু করলেই কি দারিদ্র্যের নিঃশ্বাস, বীভৎস দৃশ্য চতুর্দ্দিকের আবেষ্টনী থেকে উবে যাবে?—মোটেই না। চতুর্দ্দিক কি আবার হাস্যমুখর হয়ে উঠবে?—মোটেই না।—এ কথা মনে করাই পাগলামী। প্রতিভা হেসে উঠে,—কিন্তু চোখ দিয়ে তার জল পড়তে থাকে।···

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যে-পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে এই সংসারের মধ্যে প্রবেশ করে ঘনীভূত হয়ে পাথর বনে গেছে তাকে ধূলিসাৎ করবে প্রতিভা?

হঠাৎ প্রতিভার মনে হয়: আচ্ছা, এ পরিবর্ত্তন কবে থেকে দেখা দিল? প্রত্নতাত্ত্বিকের মতন সে তার পিছনে ফেলে-আসা দিনগুলোর দিকে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। —কিন্তু দৃষ্টি কেমন বিভ্রম হয়ে যায়, স্পষ্ট কিছু দেখতে পায় না. কেমন আবছা-আবছা: কানাই-এর মদের

পিছনে অর্থব্যয়…রেস্,…দেনা…প্রতিভার গয়নায় হাত। তার পর একদিন এই জীর্ণ কুটীরে ভারাটে হ'য়ে এল তারা …কানাই-এর অতি অকিঞ্চিৎকর মাইনের চাকরী গ্রহণ আর দিনের পর দিন একটি করে নূতন শিশুর আগমন।…

না না,—একি করছে প্রতিভা? সে ভাবছে? না না.—সে আর ভাবতে পারে না, আর ভাববে না—প্রতিভা জীর্ণ তোষকটার উপর এলিয়ে পড়ে। আর এলিয়ে পড়ামাত্রই বর্ষাকালের কেন্নর মতন জট পাকিয়ে ওঠে আর এক ধরণের ভাবনা: কেন সে এরকম এলিয়ে পড়ে? নিজেকে এরকম দুর্ব্বল অনুভব করে কেন? সহজেই কেন তার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীগুলো ঝিম্-ঝিম্ করে উঠে? নিজের শরীর নিজের বশ ছাড়া হ'ল কবে? এত অসহায় এত দুর্ব্বল কবে থেকে সে হ'ল?

আচম্কা তার স্মরণ হয়: তিলে-তিলে কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেই না তার এ-অবস্থা! বিশ্রাম-বিহীন ভাবে অগণিত আঘাত একাদিক্রমে তাকে জর্জ্জরিত করে আসছে সেই কবের থেকে,—আর সে-ও আসছে সয়ে। সুখের দিনগুলোর উপর হঠাৎ যেদিন থেকে বিষাক্ত হাওয়া বইতে সুরু করল—সে কি আজকের কথা! বহুদিন, হ্যাঁ বহুদিন গত হয়ে গেছে। আর সেই থেকে প্রতিভার কুজ্ঝটীকাময় জীবনের আরম্ভ। প্রতিদিনকার এই বীভৎস জীবনের একঘেয়েমি প্রতিভাকে থাঁক্ করে দিয়েছে, দিচ্ছে। সূর্য্যোদয় থেকে আর সেই আবার সূর্য্যোদয় হবার ঘণ্টা তিন আগ পর্য্যন্ত যে ভীতিপ্রদ, ধিক্কারজনক, কুটীল, কুৎসিৎ নাটকের অভিনয় এই সংসারে হয়, তার মধ্যে প্রতিভাকেও কতদিন ধরেই না একনাগাড়ে অবতীর্ণা হতে হচ্ছে! অর্থানটন, রোগ, শোক, কানাই-এর দুর্ব্যবহার বন্যার মতন যেন এই গৃহকে প্লাবিত করেছে—তবু প্রতিভার তারই মধ্যে নাক উঁচু করে থাকবার কি আপ্রাণ চেষ্টা!…

কিন্তু এত কিছুর বদলে প্রতিভা পাচ্ছে কি? পাচ্ছে ঘৃণা, অবহেলা, কটাক্ষ!

বন্ধুবান্ধবরা,—যারা একদিন প্রতিভার গৃহে নিত্য এসে উপস্থিত হ'ত,…খাওয়া দাওয়া…হাসি হল্লা,—কত আনন্দের সেই দিনগুলি!

আর এখন? এখন সবাই তাকে ত্যাগ করেছে—প্রতিভাকে অনেকে চিনতেই পারেনা যেন,—যারা দয়া করে চিনে, তাদেরও প্রতিভার সঙ্গ যথাশীঘ্র ত্যাগ করবার কি কায়দা!…

এই তো আজ যখন প্রতিভা উনুনের ছাইগুলো রাস্তার নর্দ্দমার কাছে ফেলে বাড়ীর ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করতে যাবে—এমন সময় চোখাচোখি হয়ে গেল তার পুরাতন এক বান্ধবী এবং ব্যারিষ্টার সি, ম্যাকেঞ্জির (চারু মুখার্জ্জী) পত্নী সুষমার সঙ্গে……পাশে ছিল তার আর একজন কে পুরুষ!

প্রতিভা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠেছিল, 'সুষি, কোথায় যাচ্ছিস্ রে? কতদিন পরে দেখা হয়ে গেল! আয়, আয়!' প্রতিভার মুখে হাসির জোয়ার উদ্গত হয়ে উঠেছিল। সব কিছু ভুলে যাওয়া মন তার তখন সুষমার সাক্ষাতে টুনটুনির মত চাঞ্চল্য প্রকাশে উন্মত্ত।

আর সুষমা!

একবার প্রতিভার মুখের দিকে, একবার প্রতিভার অপরিচ্ছন্ন দেহের দিকে, একবার বাসার দিকে চেয়ে যেন কেন্ন দেখেছে—এমনি ভাবে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছিল। নাকে সেণ্টেড্ রুমালখানা ধরে মেমসাহেব-দের মত কণ্ঠস্বরে 'সরি, টাইম নেই' বলে সুষমার অবহেলাভরে চলে যাওয়ার সে কি দৃপ্ত ভঙ্গি…অহঙ্কারে ও টাকার ঝাঁঝে সুষমা বুঝি শূন্য দিয়েই চলতে চায়।

প্রতিভাকে তুচ্ছ ও ঘৃণার চোখে দেখে গেল সে। ধনের চাবুক দিয়ে সে প্রতিভার দারিদ্র্যকে কি ভাবে কষাঘাত করে গেল।

প্রতিভা সে কষাঘাতের আঘাতে যেন এক কোপে না-কাটা পাঁঠার মতন ছট্ফট্ করে উঠল…সে ছটফটানি থেকে এখন পর্য্যন্ত সে মুক্তি পায় নি। সে আঘাতের যে কি জ্বালা!…

উঃ, অসহ্য অসহ্য। একের পর এক ··এত আঘাত একটা জীবনে কত সহ্য হয়।

ক্রেনে করে মাল উঠাবার মত প্রতিভা নিজের দেহটাকে হঠাৎ উঠিয়ে বসায়: নাঃ, আর সে এই অসহনীয় জীবন কাটাবে না…সংসারের প্রতিদিনকার

কদর্য্য এই নাটকে সে কার অবতীর্ণা হবে না⋯সে কিছু পারবে না⋯কোন কাজ সে করবে না! যা হয় হোক্, বয়ে যাক্ সবকিছু⋯সে কোন'দিকেই চাইবে না। সব ভেসে যাক্, ভূমিকম্প হয়ে যাক্। সে কেন এমন করে দগ্ধে দগ্ধে মরবে?—কি হবে তার এই বিড়ালের গা'র মতন তোষকটাকে সেলাই করে? কি হবে ঐ মেটে কলসীটাকে আর ছোট ছেলেটার ঐ কাঁথাখানাকে ঠিক করে রেখে?

তোষকটা ঠিক করলে তার স্বামী, তার ছেলেমেয়েরা শুতে পারবে? মেটে কলসীটা আর কাঁথাটাকে ঠিক করে রাখলে শ্মশানের মত দৃশ্যটা দূর হয়ে যাবে? কিন্তু তাতে প্রতিভার কি? প্রতিভার কিছুই আসে যাবে না তাতে। কোন দিকে সে ভ্রুক্ষেপ করবে না, সে ছুটি নেবে। এই অভিশপ্ত জীবন সে আর বইতে পারে না। সে ভেঙ্গে গেছে⋯টুকরো টুকরো হয়ে জলস্পর্শে চির-খাওয়া গরম চিমনির মত এতদিনে ভেঙ্গে গেছে। প্রতিভা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হ'ল—সে আজ থেকে কিছু করবে না।

তার বড়ছেলে স্কুল থেকে এল, বলল, 'মা, ভাত দাও, ভয়ানক খিদে পেয়েছে।'

প্রতিভা মনে মনে বলে উঠল: পারব না।

কিন্তু ধীরে ধীরে রান্নাঘরে গিয়ে সে ভাত বাড়তে বসল।

বড় ছেলের সামনে ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে প্রতিভা বলল, 'খেয়ে উঠে দেখিস্ তো অন্ততঃ পাঁচসের কয়লা ধারে পাস কি-না, নইলে রাত্রে রান্না হবে না।'

অন্ধকারের আফ্রিকা

(ভ্রমণ)

[পূর্ব্বানুবর্ত্তী]

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

বানরের মাছ ধরার ফন্দি অনেকক্ষণ দেখে কোনরূপ শান্তি ভঙ্গ না করে চুপচাপ আবার মোটরের কাছে চলে এলাম। তখনও লোকগুলি ঘুমাচ্ছিল। ক্ষুধা হওয়ায় ভাবছিলাম কিছু পাক করে খাব, কিন্তু এদের ঘুমে বিঘ্ন হতে পারে এই ভেবে আবার বেরিয়ে পড়লাম। যাই আর কোথায়? একটু পরিষ্কার স্থান দেখে টুপিটাতে মাথা রেখে আফ্রিকার নীল আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম আর নানা কথা ভাবতে লাগলাম। কতক্ষণ পর ড্রাইভার ঘুম থেকে উঠল এবং চাকরদের পাক করতে আদেশ দিল। পাক করতে বেশিক্ষণ লাগ্‌ল না। আমরা খেয়ে দেয়ে আবার রওয়ানা হলাম।

এবার পথ বড়ই কঠিন। কখন বা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলতে হ'ল, কখন বা সমতল ভূমি হঠাৎ উঁচু হয়েছে তারই ওপর দিয়ে ঝাকানি দিয়ে চলতে হ'ল। পথে একটিও নিগ্রো গ্রাম পড়লো না। মাঝে মাঝে সিসেলের বাগান, কোথাও বা তুলার ক্ষেত দেখে মনে হ'তে লাগল, এদিকে ইণ্ডিয়ান নয় ইউরোপীয়ান কোথাও আছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা একটি গ্রামে এসে পৌঁছলাম। গ্রামে কয়েকজন ইণ্ডিয়ান একটি ঘরেতে বাস করেন, একটু দূরে নিগ্রোগ্রাম।

ইণ্ডিয়ানদের কাছে বেশিক্ষণ না বসে আমি নিগ্রো-গ্রামে বেড়াতে গেলাম। গ্রামখানা ছোট হ'লেও তাতে বেশ লোকজন আছে। তারাই বোধ হয় চাষের কাজও করে। গোল গোল ঘরগুলি ঠিক লাইনে অবস্থিত। একটি

লাইন উত্তরে অপরটি দক্ষিণে। মাঝ দিয়ে একটি পথ। পথটি পরিষ্কার। ঘরের পেছনে দুর্গন্ধ বেজায়। যে-সকল বন্য জীবের মাংস এরা খায়, তার হাড় এবং চামড়া ঘরের পেছনে ফেলে দেয়। এসব হাড় এবং চামড়াতে আলো বাতাস লেগে পচা সুরু হয়। তাতেই এত দুর্গন্ধ। দুর্গন্ধ সহ্য করতে আমি অভ্যস্ত। তাই এত দুর্গন্ধসত্ত্বেও গ্রামটা বেড়িয়ে আসতে পেরেছিলাম।

গ্রামের লোক তখনও বিশ্রামার্থ ঘরে প্রবেশ করে নি, এমন কি ঘরের মাঝে সান্ধ্য আগুনও প্রজ্বলিত করে নি। আমরা সন্ধ্যার সময় যেমন বাতি জ্বালি, তারা কিন্তু বাতি প্রজ্বলিত করে না। মশা দূর করিবার জন্য বন হতে কাঠ এনে তাই প্রজ্বালিত করে। এদের মাঝে ভূতের ভয়ও আছে, সে জন্য একা এক ঘরে কেউ কখনও শোয় না। ঘরের দরজা দিনের বেলা কখনও বন্ধ করে না, কিন্তু রাত্রের বেলা দরজা বন্ধ করলে সহজে কখনও খোলে না। এরূপ করার একমাত্র কারণ হ'ল বন্যজন্তুর ভয়। বন্যজন্তুর মধ্যে ছোট ছোট অজগরই ভয়ানক শত্রু। এই অজগর ঘরে প্রবেশ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে আক্রমণ করে। অনেক সময় সুযোগ পেলে গিলেও ফেলে। এরূপ শত্রু হ'তে রক্ষা পাবার জন্যই শক্ত ছিদ্রহীন দরজা ব্যবহার করা হয়। এদিকে আর এক শত্রু আছে, তা হ'ল বন মানুষ। বনমানুষ স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই পারলে ধরে নিয়ে যায়। মেয়েলোককে পুরুষ বনমানুষ হত্যা করে না, তবে স্ত্রী বনমানুষ পুরুষকে যদি ধরে নিয়ে যেতে পারে তবে আর ছেড়ে দেয় না। মেয়ে বনমানুষ ভয়ানক হিংসুক এবং হিংস্র হয়।

গ্রামের লোক গ্রামেতে সবাই উলংগ। উলংগ মানুষ দেখে আমি আর লজ্জা অনুভব করতাম না, তাই তাদের কাছে গিয়ে আলাপ করতে দ্বিধা বোধ করি নি। এরূপ জংলী গ্রামেতেও শিক্ষিত নিগ্রো থাকতে দেখে আমি তাজ্জব হয়েছিলাম। শিক্ষিত লোকটিও উলংগ অবস্থায়ই আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছিল। এই লোকটিই এই গ্রামের মোড়ল। সে বেশ ইংরেজি ও আরবি বলতে পারে। আমাকে বললে যে, জার্মাণ ভাষাও সে জানত, তবে এখন ভুলে গেছে। আমি তাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমি ডায়রীতে সেই প্রশ্ন ও তার উত্তর লিপিবদ্ধও করেছিলাম। ডায়রীর পাতায় যেরূপ ভাবে কথাগুলি লিখা আছে তারই বাংলা অনুবাদ দিলাম।

—আপনার নাম কি?

—আমার নাম ইয়ানজী।

—আপনি লিখা-পড়া জেনেও গ্রামে আসলেন কেন?

—বিদেশীর প্রতারণা এবং অত্যাচার দেখতে ভালবাসি না।

—আপনি কোন্ ধর্ম মেনে ছিলেন?

—কোন ধর্মই মানি না।

—কেন?

—আমাদের দেশের লোকের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন প্রফেট হয় নি। পরের দেশের শ্বেতকায় প্রফেট মানতে মোটেই ইচ্ছা হয় না।

—আপনাদের মাঝে কোনও ধর্ম প্রচলিত আছে?

—নিশ্চয়ই আছে।

—তার নাম কি?

—তার কোন নাম নেই। নামের দরকারও নেই। চুরি-ডাকাতি না করা, মিথ্যা না বলা, অপরকে না ঠকান এ সবই আমাদের ধর্ম। তবে বিদেশীরা এসে আমাদের ধর্মে আঘাত দিচ্ছে। মিথ্যা কথা কি করে বলতে হয় তা শিখাচ্ছে। জন্ম হবার পর থেকেই লোক পাপী হয় বৈদেশীক ধর্মযাজকরা শুনাচ্ছে। এসব যত বাজে কথা ক্রমশই আমাদের মাঝে এসে পড়ছে, লোক খারাপের দিকেই চলছে।

—আপনারা যখন শিক্ষিত হবেন তখন কিরূপ সভ্যতা গ্রহণ করবেন?

—আমার মনে হয় ইউরোপীয় সভ্যতাই সকল সভ্যতা হতে ভাল হবে।

—এশিয়াটিক কোন সভ্যতা কি আপনার ভাল লাগে না?

—এশিয়া, ইউরোপ সবই আমাদের জন্য সমান। আজ আপনি এখানে কেন আসছেন নিশ্চয়ই জানেন, তবে আর এশিয়া ইউরোপ চিন্তা করে লাভ কি? সবই আমাদের ঠকাতে চায়, কেউ আমাদের কথা চিন্তাও করে না। সুরাত্র মহাশয়, সকালে দেখা হবে।

এই বলেই লোকটি তার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। আমিও মোটরে ফিরে এলাম।

এখানে আমরা এসেছি কেন তা বাস্তবিকই জ্ঞাতব্য বিষয়। আমরা কেন এসেছি তার সংবাদ আমার সঙ্গীদের কাছ হতে নেবার চেষ্টা করলাম না, কিন্তু দেখতে লাগলাম এরা এখানে কি করে।

বিকালের খাওয়া হ'য়ে গেল। অন্ধকারে আফ্রিকার ঘন অন্ধকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দেখবার মত কিছুই নেই। আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম একটা বিছানায়। সঙ্গের নিগ্রোরা কোথায় চলে গিয়েছিল। দু'জন ইণ্ডিয়ান বসে অতি সংগোপনে কথা বলছিল যাতে করে একটা কথাও আমি শুনতে না পারি। তখন বোধ হয় গভীর রাত্রই হবে। হঠাৎ শুনলাম একজন লোক ইংরেজীতে কথা বলছে। লোকটি বলছিল "তোমাদের সঙ্গে যে ট্রেভেলার এসেছে সে কোথায়?" সর্দ্দারজী বলছিল "সে এখন শুয়ে আছে।"

—"আচ্ছা কাল তাকে নিয়ে এস" বলেই লোকটি বিদায় নিল।

সিশেল, ভুট্টা, তুলা, শুকনা চামড়া হাতীর দাঁত, সোনা, নানারূপ ফুল, নানারূপ গাছের পাতা এবং চামড়া এসব ছাড়াও আফ্রিকার জঙ্গলে নানারূপ জিনিস আছে যার সন্ধান পেলে লোক রাজা হতে কতক্ষণ! এখনও লোকে বলে জেনারেল ক্রুগারের ধনরত্ন কোথায় আছে যদি বের করতে পারা যায় তবে তার পরিমাণ যা হবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীরও তা জমাবার ক্ষমতা হয় নি। ভারতের ধনরত্ন বোঝাই করে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে একখানা জাহাজ ইষ্ট লণ্ডন পোর্টের কয়েক শত মাইল দূরে ডুবে যায়, তার সন্ধানে আজ লোক ডুবুরিয়া নিযুক্ত করছে। এর পরেও আফ্রিকার জঙ্গলে অন্য আর কিছু আছে যার সন্ধানে অনেক লোকই ঘুরাফেরা করে। আমার সঙ্গীরা সেই দলভুক্ত। তারা চায় একদম যথের ধন সংগ্রহ করে সুখেস্বচ্ছন্দে জীবনটা কাটিয়ে দিতে। সেই উদ্যমের অপব্যবহার হচ্ছে না দেখে আমি দুঃখিত হই নি, সুখীই হয়েছিলাম।

সকাল বেলা একজন যুবক ইউরোপীয় ভদ্রলোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি হয়ত ভাবছিলেন, যে হেতু আমি এশিয়াটিক, আমার মাথা নত হবে প্রথম। কিন্তু এ মাথা সহজে নত হয় না। আমার কাছে তুমি এসেছ, তুমি আমাকে নমস্কার করবে, আমি তোমার গোলাম নই, তোমার কেরাণী নই, তোমার বয়-বাটলার নই যে আমি তোমার কাছে মাথা নত করব। আমি মুখ ফিরিয়ে বসেছিলাম। লোকটি আমার কাছে এসে বলল,—আপনার নামই বিশ্বাস?

—হাঁ, আমার নামই মিষ্টার বিশ্বাস। আপনি এদেশে কতদিন আছেন?

—বৎসর দুয়েক মাত্র।

—আপনার জিজ্ঞাস্য কিছু আছে?

—নিশ্চয়ই।

—আপনি অভদ্রলোক, আপনি কোন কথার জবাব পাবেন না আমার কাছ থেকে, ভদ্রতা প্রথম শিখুন তারপর ছাত্র হবার আর্জ্জি পেশ করুন।

—সুপ্রভাত মিষ্টার বিশ্বাস, রাগবার কিছুই নেই।

—That's alright now; এখন কাজের কথায় আসা যাক। কাজের কথা বলবার পূর্বে আপনাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, সেই কথাটি হ'ল যদিও আমরা পরাধীন, যদিও আমাদের লোকের মাঝে প্রায়ই অশিক্ষিত, যদিও অর্থের বিনিময়ে আমরা অনেক কাজই করে বসি, কিন্তু সকলে সমান নয় একথাটা আপনার জানা উচিৎ। যদি না জেনে থাকেন তবে এখন হতে জেনে রাখুন।

লোকটি জাতে চেক। এদেশে ব্যবসা করতে এসে ফতুর হয়েছে, তাই নানারূপ আজগবি গল্প বলে সময় কাটাতে ভালবাসে। সে আমাকে তার ঘরে নিয়ে বসাবে এটা তার সহ্য হয়নি। আমরা যেমন একটা ছোট জাতের লোককে অথবা গরিবকে ঘরে নিয়ে বসাতে ভালবাসিনা, এই লোকটিও সেই ধারণা পোষণ করে। আমাকে তার ঘরে নিয়ে যেতে পছন্দ করে নি। কিন্তু আমার কথা শুনে তার হুঁস হ'ল। সে আমার হাত ধরে তার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'ল। আমি বিনা আপত্তিতে তার সংগে চললাম।

একটি ছোট টিলা, তারই ঢালু অংশ কেটে একখানা কেবিন করা হয়েছে। কেবিনে পাকটি ঘর। একটি ঘরে

বয় বাবুর্চি থাকে, অন্যান্য রুমগুলি চেক লোকটি ব্যবহার করে। তার টেবিলের ওপর টেংগাণিয়াকা ষ্টেণ্ডার্ড, অপিনিয়ণ, হেরল্ড প্রভৃতি দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা-গুলি সন্নিবেশিত ছিল। ঘরে প্রবেশ করে আমি এক-খানা চেয়ারে বসলাম, অপর একখানাতে চেক যুবক বসলেন। পাঞ্জাবী দু'জন দাড়িয়ে রইলেন।

এই দুজনকে দেখিয়ে বললাম—"দেখুন এদের মাঝে কত হীন প্রবৃত্তি। আপনাকে এরা ইচ্ছা করলেই যা তা করতে পারে, কিন্তু ঐ যে শ্বেতকায় ভীতি, তাই এদের সর্বনাশ করছে। চেয়ার খালি থাকা সত্ত্বেও বসছে না।" মনে মনে ভাবলাম এটা এদের দোষ নয়। যে সমাজে এরা জন্মেছে, সেই সমাজের দোষ। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন পন্থী জাপান এবং বৃটেনেও এরূপ কুপ্রথা প্রচলিত নেই, যেমনটি আছে ভারতে, জাতিভেদের কল্যাণে।

নিগ্রো বয় এনে চা টেবিলের ওপর রাখল, আমি এবং চেক ভদ্রলোক চা খেলাম। এরা দু'জন দাঁড়িয়ে তাই দেখল। তারপর কথা হতে লাগল। সেই কথা বড়ই আজগবি। শুনতে শুনায় বেশ, কিন্তু তার পেছনে কি আছে তার স্থিরতা পাঠক করবেন, আমি এসব তথ্যের মাঝে নিজকে আবদ্ধ রাখতে চাইনা, কারণ আমি এসব তথ্য মোটেই পছন্দ করিনা।

এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে বলতে হবে। আমি মাইনিং বেশ ভাল জানি, এবং ইচ্ছা করলে ভারতের যে কোন মাইনিং ইনষ্টিটিউসনে কাজ করতে পারি। মাইনিং আমি সিংগাপুরে শিখেছিলাম। চেক ভদ্রলোক আমাকে এক টুকরা সোণা দেখিয়ে বললেন, "এরূপ সোণা মাইনে কখনও দেখেছেন?"

সোণা গলিত এবং পেটা। শাবলের আঘাতে এরূপ ভাবে কোন মতেই চেপ্‌টা হতে পারে না। সোণার টুকরাটি পরীক্ষা করে বললাম, "এটা নিশ্চয়ই কেউ গালিয়েছে। মাইন-এ যে "ওর" পাওয়া যায় তা কখনও এরূপ হয় না। সোণার খনিতে যে স্বর্ণ পাওয়া যায় তা হয় দু'রকমের। ফাইন এবং দানা দানা। দানাদার টুকরা পাওয়া যায় ভেইন-এর মাঝে আর ফাইন সোণা পাওয়া যায় "চলতি পথে"—between bottom and fine sand-এর মাঝে ধূসর রংগের যে গ্রেভেল থাকে তারই ফাঁকে ফাঁকে।"

স্থির হ'ল এটা গলিত স্বর্ণ। এরূপ গলিত স্বর্ণ পূবে কোন ও রাজার থাকবার সম্ভব ছিল কিনা তাই নিয়ে কথা হতে লাগল। আমরা পাণ্ডিত্যপূর্ণ তর্কে নিমজ্জিত হলাম। চেক ভদ্রলোক যা বলতে চান তা আমি স্বীকার করতে চাইনা, আর আমি যা বলতে চাই তিনিও তা স্বীকার করতে চান না। তবে এটা আমার ধারণা হ'ল লোকটি অনেক বই পড়েছে। আমাদের বাক্যালাপ তিন দিন ক্রমাগত চলেছিল। তাতে যা ফল হয়েছিল তা একটু পরই বলা হবে। কিন্তু এই বাক্যালাপের মাঝে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যে-ইতিহাসের সন্ধান আমি রাখি সে-ইতিহাস চেক ভদ্রলোকের মতে আধুনিক।

ক্রমশ



মা

(উপন্যাস)

শ্রীসুপ্রভা দেবী

পনেরো

ঠিক সন্ধ্যেবেলা সবিতা লক্ষ্মীর ছবির কাছে নিত্যকার মত প্রদীপটি জ্বেলে দিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম ক'রে উঠে ভাবল, এবার রাত্তিরের রান্নার যোগাড় ক'রে রাখতে হবে, এমন সময় তাকে অবাক ক'রে দিয়ে বীরেশ্বর এসে ঢুকল ঘরে। সবিতা বলল, একি, তুমি কোথা থেকে? তুমি না অনেকদিনের জন্য বাইরে চলে গিয়েছিলে?

বীরেশ্বর উত্তর দিল, জরুরী কাজের জন্য ফিরে আসতে হয়েছে আমাকে। উৎপল এরা সব কোথায়?

সবিতা বলল—খোকা তো রাত করে ফেরে আর খুকী ওই পাশের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছে, এখুনি আসবে। তুমি ততক্ষণ বোস।

বীরেশ্বর চুপ ক'রে বসল।

সবিতা বীণার কথা দু'একটা জিজ্ঞেস ক'রে আর কথা খুঁজে না পেয়ে কুটনো নিয়ে বসল। এই বীরেশ্বর ছেলেটিকে সবিতা ভাল বুঝতে পারে না, তাকে তেমন ভালও লাগে না তার, যদিও কেন যে সে তা ভেবে দেখেনি। খুকীর সঙ্গে তার মেশামেশিও পছন্দ করে না সে। অথচ খুকীকে তার পক্ষপাতী বলেই তো মনে হয়। বীণাকে সে সাগ্রহে দু'হাত বাড়িয়ে তার জীবনে গ্রহণ করেছিল। কলকাতায় এসে ছেলে আর মেয়ে যখন পর হয়ে গেল, আশ্রয় পাবার মত, আঁকড়ে ধরার মত কেউ রইলো না, তখন মা-হারা পরের মেয়েটি তার উপরে শুধু নির্ভর করেই যেন কৃতার্থ করে দিলো তাকে। ছেলে ও মেয়ে দূরে চলে যাওয়ায় অন্তরে যে অভিমান সুপ্ত হয়েছিলো সেই অভিমানের সুযোগ নিয়ে এত সহজে সে আপন হয়ে উঠল। কিন্তু বীরেশ্বর তার জীবন-পথের নানা লোকের মধ্যে একজন মাত্র। তার জন্য কোন আগ্রহ নেই সবিতার মনে। এর চেয়ে রমেশ তা'র অনেক আপনার। কলকাতায় পা দিয়েই রমেশ তা'কে মা বলে ডেকে কাছে এসেছিলো। সস্নেহে সবিতা অভিনন্দিত করেছিলো তাকে। সেই স্নেহ রমেশের নিরহঙ্কার, সহৃদয়, আত্মীয়বৎ ব্যবহারে দিনে দিনে দৃঢ়তর হয়েছিলো। মনে মনে তা'কে জামাই করবার সাধ হয়েছে তার। ভগবান যদি সহায় হন আর ছেলে ও মেয়ে সম্মতি দেয় তবে একই সঙ্গে দুটো বিয়ে তার বাড়ীতে হোতে পারে।

আজকাল সে অনেক সময় এই সব কল্পনা নিয়ে সময় কাটায়। কলকাতায় নয়, কলকাতা তার কেউ নয়, রাজগঞ্জে ফিরে যাবে। জীবনের প্রথমে এই কলকাতা সহর তার মা ও বাবাকে কেড়ে নিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো, এখানে তার কোন সুখস্মৃতি নেই। কোনদিন জীবনে পিছু ফিরে তাকায় নি সবিতা—আজকাল ...তা বয়স হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মনটাও দুর্ব্বল হয়েছে বলে কখনও কখনও অনেক দিনের আগেকার ভুলে যাওয়া অতীতকে বিস্মৃত প্রায় স্বপ্নের মত তার মনে পড়ে।

"কিছু বা কোন্ চৈত্র মাসে
বকুল-ঢাকা বনের ঘাসে
মনের কথার টুকরো আমার
কুড়িয়ে পাবে কোন উদাসীন—"

চাপা গলায় গুঞ্জরণ করতে করতে অতসী এসে ঘরে ঢুকলো। ঢুকেই বীরেশ্বরকে দেখে বলে উঠলো—"সেকি—আপনি? কোথা থেকে এলেন?"

বীরেশ্বর কেমন একটু অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে একটু চেয়ে রইলো। তার পর বলল—"বলছি, কেন এসেছি সে কথা বলতেই তো এসেছি, বসুন।"

তার দৃষ্টির সম্মুখে অতসী একটু অস্বস্তি বোধ করলে। আজ বলে নয়, এর আগেও দুই একবার বীরেশ্বরের সঙ্গে একলা কথা কইতে কইতে হঠাৎ সে থেমে গিয়েছে। সে লক্ষ্য না করে পারে নি যে, বীরেশ্বর তার কথা ততটা শুনছে না—তাকে দেখছে তার চেয়ে বেশী। তার পর দুজনেই সঙ্কোচ কাটাবার জন্যই খুব সোরগোল করে আলাপ-আলোচনা করে ব্যাপারটাকে চাপা দিয়ে যেত। অবকাশের সময় অতসী এ-নিয়ে মনে মনে একটা জল্পনা করেনি এমন নয়।

কেন বীরেশ্বর এমন আত্মহারা হয়ে তার মুখে তাকিয়ে থাকে, কি সে দেখতে পায়? অতসী চিরকালই জানে সে রূপসী, কিন্তু সেই সংবাদ এতকাল তার মনে কোন চেতনা জাগায় নি। সে যে সুন্দর, সবাই তাকে দেখে খুসী হয় একথা জেনে সেও খুসী হোত, মাঝে মাঝে মনে মহা স্ফূর্ত্তি হোত তার। ভাবতো, এই বা কি, যদি কতগুলো ভালো ভালো গহনা প'রে বাহারে একখানা শাড়ী পরতে পারতাম —দেখতো সবাই কেমন দেখায় আমাকে। ক্রমশঃ একটু একটু ক'রে বড় হোল, মনটা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল, নিজের শারীরিক সৌন্দর্য্যের প্রতি নিবদ্ধ না থেকে মন চাইল নিজের জোরে নিজে বড় হ'তে। রোখ চাপল লোকে যেন শুধু আমার রূপের তারিফ ক'রে চলে না যায়, রূপ তো আমার সৃষ্টি নয়, ভাগ্যক্রমে সুন্দর হয়েছি, এমনও হ'তে পারতো কুৎসিত হ'য়ে জন্মাতাম কেউ তাকিয়েও দেখতো না। কিন্তু মনটাকে বড়-করা সুন্দর করা সেতো অনেকটাই আমার নিজের হাতে, তাই আমি কোরব।

কুঁড়ি যেমন আপন অস্তিত্বের রহস্য জানে না, কিন্তু যেমনি সে কুসুমিত হয়, ভ্রমর এসে তার স্তুতিগান করে সেই মুহূর্ত্তে সে অসীম রহস্যময় হ'য়ে ওঠে; কোন্ গোপন কক্ষ থেকে খবর আসে তার মর্ম্মকোষে মধু আছে, সে মধুময়। বীরেশ্বরের দৃষ্টি অতসীকে আপন নারীত্বের রহস্য সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তুলল। এর আগেও সে রমেশের সঙ্গে মিশেছে, বীরেশ্বরের চেয়ে অনেক বেশী অন্তরঙ্গতা ছিল তার সঙ্গে। অনেক সুখ-দুঃখের মিলিত উপলব্ধিতে রমেশের সঙ্গে তার যে আত্মীয়তা হয়েছে।

বীরেশ্বর সেই তুলনায় নিতান্ত বাইরের লোক, কিন্তু তবু অতসী, যে রমেশকে লজ্জা করে নি, কোন সঙ্কোচের আড়াল রাখে নি, আজ বীরেশ্বরের দৃষ্টির সম্মুখে সে মাথা-নীচু ক'রে চুপ ক'রে রইল।

বীরেশ্বর বলল, "দরকারী কাজ আছে আপনার সঙ্গে। কিন্তু তার আগে একটা বাজে কাজ করবেন?"

"কী কাজ?"

"একটা গান শোনান।"

"সেকি, এখন গান গাইব কি?"

"গাইলেনই বা। কত বাজে কাজ লোকে করে, আপনিও আমাকে খুসী করার জন্যে আজ একটা করুন না।"

অতসী কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না, কিন্তু তার মনে ঘোর আপত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বীরেশ্বরের সামনে গান? নিদারুণ জটিল সব সমস্যা ছাড়া যার সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত একটাও ঘরোয়া কথা সে বলে নি।

হঠাৎ অতসী একটা ছুতো খুঁজে পেল। "আপনার কাজের কথা আগে সেরে নিন, কারণ দাদা এসে পড়তে পারে এখুনি। ও এলে তো আর বলতে পারবেন না? এখন নিরিবিলি আছে. মাও রাঁধতে বসেছেন ও ঘরে, এখানে আসবেন না। কাজের কথা সারা হ'লে অকাজের পালা সুরু করা যাবে। এখন গান জমবে না।"

বীরেশ্বরের দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো।

"আচ্ছা থাক্ গান, উৎপল এসে পড়বার আগেই আমার কথাটা সেরে নি। শুনুন, এ ঘরে কথা বললে কেউ শুনতে পাবে না তো?"

অতসী চট্ ক'রে উঠে চারদিক একটু ঘুরে এসে বলল, "না কেউ কোথাও নেই। তবু কি জানি যদি কিছু মুস্কিল ঘটে। শ্লেট পেন্সিল আনি?"

"না, লিখতে গেলে দেরী হবে, মুখেই বলি শুনুন— সময় হয়েছে। আজ এক আরজেন্ট টেলিগ্রাম পেয়ে আমি এসেছি এখানে।"

অতসীর রক্ত মুহূর্ত্তে গরম হ'য়ে উঠল। মুখ লাল হ'য়ে গেল। গলা খুব নামিয়ে সে উচ্চারণ করলো—"কি কাজ?"

"লুঠ, ডাকাতি।"

"ব্যাঙ্ক?"

"না—একটি বিশেষ বাড়ীতে।"

"আমার ডাক পড়েছে ?"

"না। এ কাজের ভার আমার ও আরো তিন জনের ওপরে দেওয়া হয়েছে। এই আমার প্রথমে হাতে কলমে কিছু করা।"

"আর আমি ?"

"আপনার ওপরেও হুকুম আছে। ডাকাতির পরে চারদিকে ব্যাপক পুলিশ খানাতল্লাসি হবে। আমাদের মাষ্টার-মশাইয়ের জিম্মায় সম্প্রতি কতকগুলো জিনিষ আছে যেগুলো পুলিশের হাতে পড়লে ভয়ানক বিপদ হবে। সেগুলো আপনি সামলাবেন, এই আপনার কাজ। আজ রাত্রি ৯টায় শিয়ালদা স্টেশনে সুর্মা মেলে আপনার এক বন্ধুর যেন আসার কথা—তাকে আনতে স্টেশনে গেলেন। সেই মেয়েটি এল না, তার দাদা এসেচেন। বললেন, শেষটায় একটা বাধা পড়াতে আপনার বন্ধু আসতে পারেন নি। আপনি চলে আসছিলেন, এমন সময় তিনি ভদ্রতা ক'রে বললেন, তাঁর গাড়ী স্টেশনে এসেছে তাঁকে নিতে, সেই সঙ্গে আপনাকেও আপনার বাড়ীতে পৌছে দিতে পারেন। আপনি রাজী হ'লেন এবং লিফ্‌ট পেলেন। এই সব ব্যাপার শিয়ালদা স্টেশনে অনেক লোকের সামনে ঘটলো, বুঝতে পারলেন ?"

"বুঝেছি, যাবো ঠিক সময়ে বন্ধুকে আনতে।" কথা বলতে মুখটা খুব গম্ভীর ক'রেই বলল বটে, কিন্তু মুখে কৌতুক উছলে উঠল। "যাই বলুন না কেন, এসব ব্যাপার রীতিমত এ্যাডভেঞ্চার আছে, কার না উত্তেজনা হবে এসব থ্রিলিং ব্যাপারের কথা শুনলে ?"

তার কথা শুনে বীরেশ্বর হেসে উঠল, কিন্তু তক্ষুণি পাশের ঘর থেকে সাড়া এল সবিতার। "খুকী, এ ঘরে একটু আয়তো. শুনে যা।"

বীরেশ্বর আর দাঁড়াল না। গানের কথা হয়তো বা ভুলেই গিয়ে থাকবে, সে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

অতসী এ ঘরে এসে দেখল, সবিতা কড়া নামিয়ে চুপ ক'রে এঁটো হাতে বসে রয়েছে। অতসীকে দেখে বলল "আমার শরীরটা বেশী ভাল ঠেক্‌ছে না খুকী, আমি একটু শুয়ে থাকি। উৎপল এলে খেতে দিস। ভাতটা তুই-ই ফুটিয়ে নে আজ, আমার ইচ্ছে হচ্ছে একটু শুয়ে থাকি, তাই থাকি একটু কি বলিস ?"

তাকে ভালো করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এ ঘরে এসে আধ ঘণ্টার মধ্যে অতসী রান্নার কাজ সেরে ফেলল। তার পরে শাড়ী-জামা বদলে চুলটা ঠিক করে সবিতাকে এসে বলল, "মা, দাদা তো এখনও ফেরেনি, আমি সব গুছিয়ে রেখে দিইছি, যদি এখুনী ফেরে, বোল নিয়ে খায় যেন, আমি একবার বেরুবো এখন।"

সবিতা ক্লান্ত স্বরে বলল, "এত রাত্তিরে কোথায় বেরুবি ?"

তাকে একটু আদর ক'রে খুব মিষ্টি গলায় অতসী বলল, "মা লক্ষ্মীটি, অমত কোর না, তুমি অসুখ ক'রে শুয়েচ বিছানায় তবু আমি বেরুচ্চি বুঝতেই পারছ কত দরকার। আমার এক বন্ধু এখুনী ট্রেণে আসবার কথা, আমাকে শিয়ালদা যেতে হবে তাকে নিয়ে আসতে, নইলে সে ভারী মুস্কিলে পড়বে।"

"কে বন্ধু ? সেই যে একবার রেলগাড়ীতে কোথায় গেল ?"

"কে মা ?"

"ওই যে সেই মেয়েটি—হিমানী বুঝি নাম ?"

"হ্যাঁ মা সেই হিমানী ; এখন যাই আমি ?"

"সে এসে এখানেই তো উঠবে ?"

বার বার মায়ের কাছে মিথ্যে বলতে মুখে আটকে যাচ্ছিল। একটা ঢোক গিলে ম্লান মুখে বলল, "এলে তো এখানেই উঠবে।" বলে তাড়াতাড়ি সে বাইরে এসে সিঁড়ি বেয়ে নামতে সুরু করলে।

হিমানী, হিমানী, হিমানী·········অতসী বার বার উচ্চারণ করলো নামটা। মা তাকে এখনও মনে ক'রে রেখেছেন। একদিন সে রেলগাড়ীতে চড়ে চলে গিয়েছিল, অতসী স্টেশনে তাকে তুলে দিতে গিয়েছিল। আজ আবার সে রেলগাড়ী ক'রে আসছে ? কোথায় হিমানী ? বিপুল পৃথিবী কোন্ অন্ধকার বিবরে তাকে গোপন করেছে, বেঁচে আছে কি সে এখনো ? প্রায় একমাস আগে হিমানীর স্বামীর ফাঁসীর সংবাদ সে কাগজে পড়েছিল! স্বামীর মৃত্যুর পরে বিধবা হিমানীর অস্তিত্ব কল্পনাই যে করা যায় না।

শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে লোকের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুর্মা মেলের অপেক্ষা করতে করতে অতসী ভাবতে লাগল, হিমানী আসবে, হিমানী। এই ট্রেণে যদি হঠাৎ সে নেমে পড়ে, হিমানী রায় ?

* * * *

হঠাৎ যদি এই সন্ধ্যেবেলায় দোকানের সামনে সে এসে দাঁড়ায়, হাসি মুখে সকৌতুক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলে, দেখান তো ভালো রাইটিং প্যাড—যদি সামনের খদ্দেরটি যে অনেকক্ষণ ধরে এক গাদা রাইটিং প্যাড নিয়ে বসে কেবলই বাছাই করছে, কিন্তু কিছুতেই যার কাগজের রং-এর সেড পছন্দ হচ্ছে না—যদি এই খদ্দেরটি সহসা হ'য়ে যেত মলিনা নাগ ?

একটি অল্প বয়সী ছেলে দোকানে ঢুকে চাইল এক টিন ক্যাপস্টেন সিগারেট, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক ভদ্রলোক এসে 'জবাকুসুম' তেল চাইলেন। তাঁদের দুজনকে জিনিষ দিয়ে হরিপদবাবুকে ক্যাশমেমো করতে ব'লে উৎপল পুরণো খদ্দেরটির কাছে দাঁড়াল। মেয়েটির প্যাড বাছাই করা তখনও শেষ হয় নি, সে বারে বারে বলছে, আর কোন ভ্যারাইটি নেই, দেখুন না দয়া ক'রে ? উৎপল তার হুকুম তামিল করতে করতে মনে ভাবল, মেয়েটি পছন্দসই প্যাড কিনে কার কাছে চিঠি লিখবে, কি লিখবে সে চিঠিতে ? যে পড়বে সেই চিঠি, তার কি মনে হবে দিগন্ত পেরিয়ে ছোট পাখী এল উড়ে, ডানায় বয়ে নিয়ে এল নীল আকাশের অঞ্জন ? অথবা চিঠি পড়ে বেদনায় চারি দিকের পৃথিবী বিবর্ণ হ'য়ে উঠবে, জীবনকে দুঃস্বপ্ন ব'লে মনে হবে, কোন্‌টা ?

নিজের পকেটে হাত দিল সে, আজই সন্ধ্যেবেলায় পাওয়া একখানা চিঠি খস্‌খস্‌ ক'রে উঠ্‌ল। মলিনা লিখেছে :

যাক্‌ এত দিন পড়ে মৌনভঙ্গ ক'রে একখানা চিঠি যে লিখতে পেরেছ সে জন্যে অনেক ধন্যবাদ। শুনে খুসী হলাম, তুমি এক সঙ্গে স্কুল মাষ্টারি ও দোকানদারী দুটো কাজ করছ—অর্থাৎ ছেলেদের ও ছেলের বাপদের একই সঙ্গে প্রাণপণে ঠকাচ্ছ। আমি কলকাতায় থাকলে নিশ্চয়ই একদিন তোমার দোকানে জিনিষ কিনতে যেতাম ও তোমাকে ঝাড়া দু-ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়ে দোকানের সব জিনিষ নেড়ে চেড়ে দেখে এক পাতা সেফ্‌টি পিন কিনে চ'লে আসতাম। কেমন জব্দ হ'তে ? আর তোমার সেই টিউসানী কি হোল ? একদিন সেই ছাত্রের বাড়ী গিয়ে কেমন তোমাকে কিডন্যাপ ক'রে আলিপুরে নিয়ে গিয়েছিলাম মনে আছে ?

তুমি লিখেছ, পাটলিপুত্র সহরে থেকে থেকে আমিও পাথরে পরিণত হ'য়ে গিয়েছি কি না। সত্যিই তাই, এখানে দেখবার বস্তু যা যা আছে সব দেখে দেখে পুরণো হ'য়ে গিয়েছে, রাস্তা-ঘাট, দোকান-পাট সব মুখস্থ। বাদল, খুকু-আমি সবাই এখন পালাতে পারলে বাঁচি, আমি তো রাত-দিন ঘরে বসে ডিটেকটিভ নভেল পড়ি।

তবে সুখবর আছে, রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পাষাণ প্রাণ পেয়েছিল জানোতো ? আমারও সেই দশা। বাবা কলকাতায় বসে বসে বিয়ের সব ঠিক করে ফেলেছেন, এখন আমরা দাদুকে নিয়ে নামতে পারলেই হয়। দাদার ও আমার দুজনের এক সঙ্গে। রামচন্দ্রটি কে জানতে নিশ্চয় তোমার কৌতূহল হচ্ছে ? সেই দেবপ্রিয় বোস্‌, দু'একবার তুমিও তাকে আমাদের বাড়ী দেখেছ হয়তো, সে গভর্ণমেণ্টের বনবিভাগে বড় চাকুরে। গভর্ণমেণ্টের এত ডিপার্টমেণ্ট থাকতে বনবিভাগটাই আমি কেন পছন্দ করলাম ভাবছ ? কারণ হচ্ছে, নানা দুর্গম জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার বিদঘুটে সখটা আমার বিয়ের কল্যাণে যদি পূর্ণ হয়, কলকাতায় বসে সারাজীবন কাটবে কি ক'রে ?

তার পরে আর কি ? আমার কথাটি ফুরুলো, নটে গাছটি মুড়ুলো, কেনরে নটে মুড়ুলি ? কিন্তু এর সদুত্তর কেউ কি কখনো পেয়েছে ? তাই তো রূপকথা ফুরোয় না। মানুষের জীবনেও কি তাই নয় ? নটে গাছটি কখন যে অযত্নে বিনা চেষ্টায় গজিয়ে উঠেছিল কেউ তা জানে না, কিন্তু যখন মুড়িয়ে যায় তখন ?

তাই ভাবি, নটে গাছটি কেন মুড়লো উৎপল ?

বাংলার ভূমি-ব্যবস্থা

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল

বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সম্যক পরিচয় জানা না থাকিলে উহার কোন প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করা সম্ভব হয় না। আবার বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিচয় জানিতে হইলে উহার উৎপত্তি এবং কি কি পরিবেশের মধ্য দিয়া উহা বর্ত্তমান আকারে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা জানাও একান্তভাবে অপরিহার্য্য। যে-কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেই একথা সত্য। বাংলার ভূমি-ব্যবস্থা একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। উহাকে বুঝিতে হইলে উহার উৎপত্তি, ভূমি-সম্পর্কিত আইন-প্রণয়ন এবং উহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের ধারা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তা-ছাড়া সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার যে সকল প্রভাব বাংলার বর্ত্তমান ভূমি-ব্যবস্থা গঠনে সহায়তা করিয়াছে, তাহারও পরিচয় লইতে হইবে।

বাংলায় শুধু বৃটিশ রাজত্বের আমলেই যে ভূমি-ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, একথা বলিলে ভুল বলা হয় না। প্রকৃতপক্ষে বাংলার ভূমি-ব্যবস্থার বর্ত্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে। ঐ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন করিয়া তদানীন্তন রাজস্ব-আদায়কারীদিগকে ভূ-স্বামীতে পরিণত করিলেন। বর্ত্তমানে এইরূপ একটা মতবাদ প্রচারের চেষ্টা চলিতেছে যে, বাংলার জমিদারগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের সৃষ্টি নয়, উহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই বাংলাদেশে জমিদারী প্রথা চলিয়া আসিতেছে। বৃটিশ রাজত্বের পূর্ব্বে বাংলা-দেশে কোন রাজা বা জমিদার একেবারেই ছিল না, এমন নয়। এই সকল রাজা বা জমিদার ছিলেন প্রাচীন সামন্ত-তন্ত্রের ভগ্নাবশেষ। বর্ত্তমান বাংলায় যে-সকল জমিদার বংশের ইতিহাস প্রাক্‌-বৃটিশকাল হইতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের সংখ্যা আঙ্গুলে গণনা করা যায়। কিন্তু [illegible] জমিদারী-প্রথাকে প্রাক্‌-বৃটিশ যুগের প্রতিষ্ঠান [illegible] চান, তাঁহারা উল্লিখিত রাজা বা জমিদারগণ যে ভূস্বামী ছিলেন তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। মিঃ ডি, এন ব্যানার্জ্জি তাঁহার Early Land Revenue System in Bengal and Bihar ((Vol 1) গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"The Diwan used to collect the revenues by farming them out, either to the Rajas or Zamindars who were considered as having had a sort of hereditary right or at least a right of preference to the lease of the revenues of the province or district to which they respectively belonged—or 'to other farmers under the name of Izodars and other appellations' or to officers appointed by Government under the names of 'Fouzdars' 'Amils' and 'Tassildars' with all of whom the Government would enter, generally, into *annual* engagements for the revenues of the several district." (p. 13).

মিঃ ব্যানার্জ্জি রাজা বা জমিদারদের এক প্রকার উত্তরাধিকার স্বত্বের কথা বলিয়াছেন। হয় ত প্রাচীন সামন্ত-তন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ হিসাবে কাহারও কাহারও উত্তরাধিকার স্বত্ব ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান জমিদারদের ন্যায় তাঁহারা সংখ্যা বহুল ছিলেন না। এমনও হয় ত হইতে পারে যে, পূর্ব্বে যাঁহারা ইজারাদারা ছিলেন পরবর্ত্তী বৎসরে ইজারা দিবার সময় সকলের আগে তাঁহাদিগকেই সুবিধা দেওয়া হইত বলিয়া বাহ্যত: দেখিতে কতকটা উত্তরাধিকার স্বত্ব বলিয়াই মনে হইত।* নদীয়ার রাজার খাজানা যখন বাকী পড়িয়াছিল তখন দেওয়ান হিসাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নদীয়া জেলার রাজস্ব আদায়ের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে পুণ্যাহ দিনে সুবে বাংলার সমগ্র ভূমির বন্দোবস্ত হইত। এই বন্দোবস্ত হইত ইজারাদারদের সঙ্গে—রায়তদের সঙ্গে নয়। ইজারা-

* লেখকের অন্য প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। যথাসময়ে ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

দারগণ অবশ্য পরে রায়তদের সঙ্গে নূতন বন্দোবস্ত করিতেন, কিন্তু রায়তগণ কখনও তাহাদের দখলীয় জমি হইতে বঞ্চিত হইত না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন তখন বাংলার রাজস্ব আদায়ের ইহাই ছিল ব্যবস্থা। দেওয়ানী গ্রহণের পর হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক পরীক্ষাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী করিয়াছিলেন। কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল দুইটি:—একটি রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি, আর একটি প্রজা নিপীড়ন বন্ধ করা। এই দুইটি উদ্দেশ্যই এমন যে, এক সঙ্গে উভয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাফল্য লাভ করা কঠিন। অবশেষে পরীক্ষামূলক ভাবে দশশালা বন্দোবস্তের পর উহাকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত করা হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারের রাজস্ব হইল চিরকালের জন্য অপরিবর্ত্তনীয়, জমির মালিক হইলেন জমিদার, জমিদারীতে তাঁহার জন্মিল নির্ব্যূঢ় স্বত্ব—পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিসান ক্রমে ভোগদখল ও তচ্ছ্রূপ করিবার ও দান বিক্রয়ের অধিকার। তাঁহার একমাত্র প্রধান দায়িত্ব হইল যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে রাজস্ব দাখিল করিবার। ঐটুকু করিতে পারিলেই তাঁহার স্বত্ব-স্বামিত্ব অব্যাহত রহিল—তাঁহার আর কিছু করিবার রহিল না। যথাসময়ে রাজস্ব দিতে না পারিলেই বিপদ—জমিদারী নিলামে উঠে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করাই হইল গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য। কাজেই রাজস্বের জন্য 'সূর্য্যাস্ত আইনের' মত কড়া ব্যবস্থা না করিলেই বা চলিবে কেন? জমিদারদের স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে সব কথাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রেগুলেশনে বলা হইয়াছে; কিন্তু ভূমিতে চাষ করিয়া যাহারা জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি করে, ভূমিতে তাহাদের কি অধিকার, কি স্বত্ব সে-সম্বন্ধে কোন কথাই উহাতে নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রজা-পীড়ন না হয়, কোম্পানীর উহাও লক্ষ্য ছিল। এই জন্য প্রজার সুখ-সুবিধা ও উন্নতির দিকে জমিদার লক্ষ্য রাখিবেন, গবর্ণমেণ্টের এইরূপ একটা ইচ্ছা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে সন্নিবেশিত করা হয়। কিন্তু উহা আদেশাত্মক ছিল না, জমিদারগণ প্রজার সুখ-সুবিধা ও উন্নতির জন্য কিছু না করিলেও তাঁহাদিগকে উহা করিতে বাধ্য করিবার মত কোন বিধান ঐ আইনে নাই। সাবেক জমিদারদের প্রজার প্রতি পুত্রোপম স্নেহের কথা অনেকের কাছেই আমরা শুনিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে কাহারও স্বীকার-অস্বীকারে কাহারও কিছু আসে যায় না। জমিদারগণ তাঁহাদের উপর ন্যস্ত বিশ্বাস কিভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন,—প্রজার সহিত জমিদারের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন কথা না থাকার সুবিধাটুকু নিজেদের স্বার্থ সাধনে কি ভাবে তাঁহারা পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছিলেন, শুধু আইন প্রণয়ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

প্রজার নিকট হইতে জমিদার কত অধিক খাজনা আদায় করিতে পারিবেন, ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে-সম্বন্ধে কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। ভূমি হইতে প্রজাকে উচ্ছেদ করিবারও কোন বাধা জমিদারের ছিল না। জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজার অধিকারও সুবিধা রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা না থাকার সুবিধাগুলি জমিদারগণ নিজেদের স্বার্থ সাধনে গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। এ বিষয়ে সুবিধাও তাহারা যথেষ্ট পাইয়াছিলেন। জমিদারগণ যাহাতে সহজে প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া রাজসরকারে যথাসময়ে রাজস্ব দাখিল করিতে পারেন তাহার জন্য জমিদারদের সুবিধাজনক অনেকগুলি বিধান পর পর বিধিবদ্ধ হয়। ফলে কৃষককে শোষণ করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা জমিদারদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ কৃষক ও জমিদারের মধ্যে বহু সংখ্যক মধ্যস্বত্বাধি-কারী সৃষ্টি হওয়ায় কৃষকদের দুঃখ-দুর্দ্দশা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছিল।

বাংলার ভূমি-ব্যবস্থায় জমিদারের স্থান সকলের উপরে আর রায়ত, যাহারা জমি চাষ করে তাহাদের স্থান সর্ব্ব নিম্নে। মধ্যখানে রহিয়াছেন পত্তনীদার, তালুকদার এবং মধ্যস্বত্বাধিকারী। এই মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর মধ্যেও বিভিন্ন স্তর আছে। জমিদার এবং রায়তের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই একাধিক স্তরের মধ্যবর্ত্তী তালুকদার রহিয়াছেন। বাখরগঞ্জ জেলার কোন কোন স্থানে জমিদার এবং

রায়তের মধ্যে প্রায় ১০।১২ শ্রেণীর মধ্যস্বত্বাধিকারী আছে। এই মধ্যস্বত্ব সৃষ্টির মূলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে যথেষ্ট প্রভাব আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। জমিদার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পাইয়াছেন বলিয়াই তিনি নিজেও আবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিতে সমর্থ হইয়াছেন। অর্থনৈতিক কারণই মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করিতে জমিদারকে বিশেষ ভাবে প্ররোচিত করিয়াছে। পত্তনী গ্রহণের আগ্রহের মূলেও অর্থনৈতিক কারণ বর্ত্তমান। প্রথমতঃ পত্তনের সময় নজরানারূপে জমিদারগণ যথেষ্ট লাভ করিতেন; দ্বিতীয়তঃ, একসঙ্গে বহু লোকের নিকট হইতে খাজানা আদায়ের অর্থনৈতিক ক্ষতি ও অসুবিধা হইতেও তাঁহারা মুক্তি পাইলেন। পত্তন গ্রহণের কারণও অর্থনৈতিক। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই বাংলার নিজস্ব শিল্পবাণিজ্য লুপ্ত প্রায়—বাণিজ্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহাও বাংলার লোকদের হাতে ছিল না। কাজেই অনেককেই বৃত্তিহীন হইয়া জীবিকা-অর্জ্জনের পথের সন্ধান করিতে হইয়াছে। কিন্তু ভূমি ছাড়া মূলধন নিয়োগের দ্বিতীয় পথ আর তাঁহাদের সম্মুখে খোলা ছিল না। বাংলার ভূমি তখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়া গিয়াছে। সুতরাং একমাত্র পথ রহিল জমিদারীর অধীনে কায়েমী স্বত্বে ও মোকররী জমায় পত্তনী গ্রহণ করা। বস্তুতঃ এই পত্তন দেওয়া ও লওয়ার অর্থ জমিদার ও প্রজার মধ্যে নূতন মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করা। যাঁহারা পত্তন গ্রহণ করিলেন তাঁহারা পত্তনীদার, তালুকদার প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছেন। পত্তনী দেওয়ার কাজটা এইখানেই শেষ হইল না। জমিদারের নিকট হইতে যাঁহারা কায়েমী ও মোকররী বন্দোবস্ত পাইলেন তাঁহারাও আবার তাঁহাদের স্বত্ব-দখলীয় ভূমি কায়েমী-মোকররী বা অন্য স্বত্বে পত্তন করিলেন। পত্তনীদারের অধীনে যাঁহারা পত্তন গ্রহণ করিলেন তাঁহারা হইলেন দরপত্তনীদার। দরপত্তনীদারের অধীনেও আবার নূতন মধ্যস্বত্ব সৃষ্ট হইল। এই ভাবে মধ্যস্বত্বের ধারাবাহিকতা গড়িয়া উঠিবার সঙ্গে খাজানার পরিমাণও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। প্রত্যেক স্তরের মধ্যস্বত্বাধীকারীই অধিক খাজানায় পরবর্ত্তী মধ্যস্বত্বাধী-কারীকে পত্তন দিতেন। এই খাজানা হইতেই তাহাকে মনিবের খাজানা পরিশোধ এবং জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয়। পত্তনের ফলে এই ভাবে খাজানার বোঝা ক্রমে ভারী হইয়া সর্ব্বশেষ সবটুকু চাপিয়াছে কৃষকের মাথায়। সকলের খাজানার বোঝা বহিতেছে কৃষক।

পত্তনী দেওয়ার অর্থনৈতিক কারণের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই অর্থনৈতিক কারণের অন্য একটি জঙ্গলাকীর্ণ পতিত জমিকে আবাদ করা। বরিশাল জেলা—বিশেষতঃ ঐ জেলার দক্ষিণাংশে পতিত জমি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। ঐ সকল জঙ্গলাকীর্ণ পতিত জমিকে পরিষ্কার করিয়া চাষাবাদ করিবার জন্য জমিদার প্রথমতঃ একজনকে কতক জমি পত্তন করিতেন। এই পত্তনীর নাম হাওলা এবং যিনি পত্তন গ্রহণ করিলেন তিনি হাওলাদার। এই হাওলাদার আবার কতক জমি নিজে আবাদ করিয়া বাকী জমি এক বা একাধিক লোকের নিকট পত্তন করিলেন। এইরূপে বরিশাল জেলায় হাওলাদার, ও-সাত হাওলাদার, নিম হাওলাদার, প্রভৃতি বহু স্তরে মধ্যস্বত্ব সৃষ্ট হইয়াছে। মেদিনীপুরের আবাদকারী ও মণ্ডলী স্বত্বও বরিশালের হাওলা স্বত্বের অনুরূপ। জমিদার একজন বিত্তশালী প্রজাকে কতকটা অনাবাদী জমি প্রদান করিতেন। এই প্রজার নাম হইল আবাদকার বা আবাদকারী। আবাদকারী এই পতিত জমি আবাদ করা এবং মোটা টাকা খাজানা দেওয়ার স[illegible] এই পত্তন গ্রহণ করিয়া কতক নিজে বা লোক রাখিয়া আবাদ করিতেন এবং কতক অন্য লোকের নিকট পত্তন করিতেন। এইভাবে ঐ অনাবাদী জমিতে একটা গ্রাম গড়িয়া উঠিল এবং আবাদকারী হইলেন ঐ গ্রামের মণ্ডল। মেদিনীপুর জেলার যে-সকল অঞ্চলে সাঁওতাল, ভূমিজ, মাহাতো প্রভৃতি আদিম জাতির বাস সেখানে মণ্ডলী প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে পিতৃপ্রধান গ্রাম্য পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল। সুতরাং অনাবাদী জঙ্গলাকীর্ণ পতিত জমি কোন ব্যক্তি বিশেষকে দেওয়া হইত না, দেওয়া হইত মণ্ডলকে। মণ্ডল তাহার পঞ্চায়েতের মধ্যে ঐ জমি বণ্টন করিয়া দিত। প্রথমে মণ্ডল এবং তাঁহার সমাজের অন্যান্য সকলে সমপর্য্যায়ভুক্ত প্রজা ছিল। পরে তাহারা মণ্ডলের অধীনস্থ প্রজা এবং মণ্ডল স্বয়ং মধ্যস্বত্বাধীকারীতে পরিণত হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে জমিদারকে দশ বৎসরের অধিককালের জন্য এইরূপ মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। কিন্তু জমিদারগণ আইনের এই বিধান উপেক্ষা করিয়া নজরানা লইয়া পত্তনী দিতে লাগিলেন। আইনের উক্ত বিধান কার্য্যকরী হইতেছে না দেখিয়া ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ঐ আইন উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং আরও কয়েক বৎসর পরে ১৮১৯ সালে ১৮১২ সালের পূর্ব্বে সৃষ্ট মধ্যস্বত্বগুলিকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। সুতরাং মধ্যস্বত্ব সৃষ্টির পথে জমিদারের যেটুকু বাধা ছিল তাহাও আর রহিল না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ৬৬ বৎসর পরে ১৮৫৯ সালে সর্ব্বপ্রথম খাজানা আইন বিধিবদ্ধ হয়। জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজার অধিকার রক্ষা করিবার কোন বিধান চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে না থাকার সুযোগ জমিদারগণ যদি ব্যাপকভাবে গ্রহণ না করিতেন, এবং তাহার ফলে কৃষকদিগের দুর্দ্দশা যদি বৃদ্ধি না হইত, তাহা হইলে হয়ত এই খাজানা আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার তারিখ আরও পিছাইয়া যাইত। প্রজার স্বত্বাধিকারকে একটা নির্দ্দিষ্ট আকার দিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম এই আইনের প্রবর্ত্তন করা হয়। জমিদারগণ পুত্রোপম স্নেহে প্রজা পালন করিতেন কিনা এই আইনের বিধানগুলি বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫৯ সালের বঙ্গীয় খাজানা আইনে রায়তদিগকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়:

১। যে সকল প্রজা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে একটা একটা নির্দ্দিষ্ট জমায় জোত দখল করিয়া আসিতেছে।

২। জমা স্থায়ী হউক আর না হউক যে-সকল প্রজা বার বৎসর যাবৎ জমি দখল করিতেছে।

৩। যে-সকল প্রজার জমি দখলের কাল বার বৎসরের কম।

প্রথম শ্রেণীর প্রজারা যদি প্রমাণ করিতে পারিত যে গত ২০ বৎসরের মধ্যে তাহাদের খাজানা বৃদ্ধি হয় নাই, তাহা হইলে তাহাদের ঐ জমা বৃদ্ধির অযোগ্য বলিয়া ধার্য্য হইত। নিরক্ষর প্রজার পক্ষে উহা প্রমাণ করা বড় সহজ ছিল না। কাজেই এই প্রজার সংখ্যা যে নাম মাত্র হইবে তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি! দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রজাদিগকে দেওয়া হইল দখলীস্বত্ব। অর্থাৎ নিজে কিম্বা পূর্ব্ববর্ত্তীগণ ক্রমে কোন জমি একাদিক্রমে বার বৎসর বা তাহার অধিককাল দখল করিলে ঐ জমিতে প্রজার দখলীস্বত্ব জন্মিবে, ইহাই হইল আইনের বিধান। প্রজা যতদিন দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট জোতের খাজানা যোগাইবে ততদিন তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না। খাজানা সম্বন্ধে এই বিধান হইল যে, তর্কিতস্থলে প্রজা পূর্ব্বে যে-হারে খাজানা দিয়াছে তাহাই ন্যায্য জমা (fair and equitable rent) বলিয়া ধরা হইবে। অবশ্য প্রজার প্রমাণকে অ-প্রমাণ করিবার অধিকার জমিদারের ছিল। উচ্ছেদ সম্বন্ধে বিধান ছিল যে, বাকী খাজানার জন্য দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট প্রজা উচ্ছেদযোগ্য হইলেও আদালতের সাহায্য ছাড়া উচ্ছেদ করা যাইবে না। তাহার খাজানা কি ভাবে বৃদ্ধি করা যাইবে তাহারও কয়েকটি বিধান এই আইনে করা হইয়াছিল। প্রজাকে জমিদারের কাছারীতে উপস্থিত হইতে বাধ্য করাও জমিদারের পক্ষে বে-আইনী বলিয়া এই আইনে ঘোষণা করা হইয়াছিল।

উল্লিখিত ১৮৫৯ সালের খাজানা আইন প্রণয়নের মূলে প্রজার স্বত্বাধিকার রক্ষা করিবার যে সদিচ্ছা গবর্ণমেণ্টের ছিল জমিদারদের প্রজাবাৎসল্যবশতঃ তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। দখলী জমিতে যে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিয়াছে তাহা প্রমাণ করিতে হইলে প্রজাকে দেখাইতে হইত যে ঐ জমি সে একাদিক্রমে বার বৎসর যাবৎ দখল করিতেছে। কিন্তু উহা প্রমাণ করা প্রজার পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। খাজানার দাখিলায় জমির উল্লেখ ও তাহার পরিচয় না থাকিলে একই জমি যে প্রজা বার বৎসর ধরিয়া চাষ করিতেছে তাহা প্রমাণ করা খুবই কঠিন ছিল। প্রজা কোন জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে দখল করিলেও তাহা প্রমাণ করিবার কোন উপায় প্রজার ছিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ প্রজাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা ভারত গবর্ণমেণ্টকে দিয়াছিলেন। কিন্তু জমিদারগণ জোতের পরিমাণ, পরিচয় এবং খাজানা উল্লেখ করিয়া প্রজাকে পাট্টা দিবেন

এইরূপ নির্দ্দেশ থাকা স্বত্বেও জমিদারগণ এই নির্দ্দেশ প্রতিপালন করেন নাই। বরং অনেকস্থলেই তাঁহারা প্রজাকে উচ্ছেদ করিয়াছেন, অথবা খাজানা বৃদ্ধি করিয়াছেন। জমিদারদের প্রজা পীড়নের ফলে প্রজাদের মধ্যেও অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছিল। ফলে জমিদারদের পক্ষে খাজানা আদায় করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কর্ণাটিক যুদ্ধ পরিচালনের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই জন্য জমিদারগণ যাহাতে সহজে খাজানা আদায় করিতে পারেন তাহার জন্য ১৭৯৯ সালে ৭নং রেগুলেশন প্রবর্ত্তিত হয়। উহা 'হপ্তম' নামে পরিচিত। 'হপ্তম' নামটি প্রজার মনে এখনও ভীতির সঞ্চার করে। এই বিধানের বলে জমিদার প্রজার শস্য, গরু বাছুর এমন কি প্রজার নিজের জিনিষপত্র পর্য্যন্ত ক্রোক নীলাম করিতে পারিত, ইহার জন্য আদালতের সাহায্য লইতে হইত না। জমিদারদের রাজস্ব প্রদানের সুবিধার জন্যই এই বিধান করা হইয়াছিল, কিন্তু উহার অপব্যবহারে প্রজার যে ক্ষতি হইতে পারে তাহা বিবেচনা করা হয় নাই। 'হপ্তমে'র কুফল ফলিতে বিলম্ব হয় নাই। প্রতিকারের জন্য আইন প্রবর্ত্তিত হইতে প্রায় ২৩ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ১৮২২ সালের ৫নং রেগুলেশন দ্বারা 'হপ্তমে'র কুফলের প্রতিকার আংশিক ভাবে হইয়াছিল মাত্র। এই রেগুলেশন অনুসারে প্রজার নিকট জমিদারের দাবীর পরিমাণ লিখিত ভাবে না জানাইয়া জমিদার প্রজার ফসল ইত্যাদি ক্রোক করিতে পারিতেন না। এই ব্যবস্থা বিদ্যুৎ চমকের মতই ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। ঐ বৎসরই ১১নং রেগুলেশন পাশ হইয়া প্রজার অবস্থা ১৭৯৩ সালের পরবর্ত্তী অবস্থার মতই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

১৮৫৯ সালের খাজানা আইন পাশ হইবার পর প্রজা যাহাতে তাহার জমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিতে না পারে তাহার জন্য বার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই জমিদার ঐ জমি হইতে প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে লাগিলেন অথবা বিশেষ দয়া করিয়া ঐ জমির পরিবর্ত্তে অন্য জমি প্রজাকে

খাজানা আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে উৎপীড়িত কৃষকগণ অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সকল কারণে ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ হয়।

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে প্রজাদিগকে মোট তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়: (১) মধ্যস্বত্বাধীকারী (২) রায়ত এবং (৩) কোর্ফা প্রজা। পত্তনীদার, দর পত্তনীদার, সে-পত্তনীদার প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের মধ্যবর্ত্তিগণ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। রায়তকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইল: (১) দখলের স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত এবং (২) দখলের স্বত্ববিহীন রায়ত। রায়তী স্বত্ব হইতে তালুক ও মধ্যস্বত্ব জোতকে পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করিবার বিধান এই আইনে দেওয়া হইয়াছে। জমি কি উদ্দেশ্যে পত্তন লওয়া হইয়াছিল, তাহাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিবার উপায়। প্রজাপত্তন করিয়া খাজানা আদায় করিবার জন্য জমি পত্তন লওয়া হইয়া থাকিলে উহা মধ্যস্বত্ব জোত বলিয়া গণ্য হইবে, রায়তী জোত বলিয়া গণ্য হইবে না। নিজে অথবা লোক দ্বারা চাষ আবাদ করাইবার জন্য জমি পত্তন লওয়া হইয়া থাকিলেই শুধু উহা রায়তী জোত বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু জোতের অন্তর্গত জমির পরিমাণ এক শত বিঘার উপরে হইলেই উহা আর রায়তী জোত বলিয়া গণ্য হইবে না, উহা মধ্যস্বত্ব বলিয়া গণ্য হইবে। রায়তীস্বত্বের অধীনে যে প্রজা তাহারই নাম কোর্ফা প্রজা।

প্রজাকে দখলীস্বত্ব হইতে জমিদার যাহাতে বঞ্চনা করিতে না পারেন সেই জন্য ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজা-স্বত্ব আইনে নূতন বিধান বিধিবদ্ধ করা হয়। দখলীস্বত্ব লাভ করিবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট জমি একাদিক্রমে বার বৎসর চাষ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কোন রায়ত যদি বার বৎসর কোন গ্রামে জমি চাষ করে—একই জমি হউক আর ভিন্ন জমি হউক তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না—তাহা হইলে ঐ গ্রামের যে কোন জমি সে চাষ করিবে তাহাতেই তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিবে। জমিদার যাহাতে প্রজাকে বঞ্চনা করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই

হইয়াছে যে, রায়তের জোতের জমিতে তাহার দখলীস্বত্ব আছে, প্রথমে ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে। জোতের জমিতে প্রজার দখলীস্বত্ব নাই, তাহা প্রমাণ করিবার ভার জমিদারের উপর।

কি কি কারণে জমিদার রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন তাহা এই আইনের ৩০ ধারায় বলা হইয়াছে। অবশ্য প্রজা যদি প্রমাণ করিতে পারে যে গত ২০ বৎসরের মধ্যে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হয় নাই, তাহা হইলে ধরা হইবে যে তাহার খাজানা বৃদ্ধির অযোগ্য। নিম্নলিখিত কারণে ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে রায়তের খাজানা বৃদ্ধির বিধান আছে :

(১) রায়তের খাজানা প্রচলিত খাজানার হার অপেক্ষা কম হইলে,

(২) খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে,

(৩) জমিদারের ব্যয়ে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাইলে,

(৪) প্লাবনের ফলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাইলে।

রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিবার এই যে অধিকার জমিদার পাইলেন তাহার মূলে কি অর্থনৈতিক নীতি অনুসৃত রহিয়াছে সে সম্বন্ধে এই লেখকের লিখিত পৃথক প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে দখলী স্বত্ব-বিশিষ্ট রায়ত বাকী খাজানার জন্য উচ্ছেদ যোগ্য নয়। দখলী স্বত্ব-বিশিষ্ট জোত দান বিক্রয় সম্বন্ধে উক্ত আইন নীরব। স্থানীয় প্রথার উপর উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু রায়ত কোথাও তাহার রায়তীস্বত্ব দান বিক্রয় করিবার অধিকারের প্রথা প্রমাণ করিতে পারে নাই। কাজেই ১৯২৮ সালে প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত দখলী স্বত্ব-বিশিষ্ট জোত দান বিক্রয় করিবার কোন অধিকার প্রজার ছিল না। জোতের জমিতে পুকুর খনন, বা ইমারত ইত্যাদি নির্ম্মাণেরও কোন অধিকার তাহার ছিল না। সারবান ও ফলবান বৃক্ষ রোপণ ভিন্ন কর্ত্তন করিবার কোন অধিকার তাহার ছিল না। দখলী স্বত্ব-বিশিষ্ট জোত দান-বিক্রয়ের অধিকার না থাকিলেও বাংলার সর্ব্বত্রই ব্যাপকভাবে জোতের জমি বিক্রয় করা চলিতেছিল। ইহাতে জমিদার-গণই লাভবান হইতে লাগিলেন। আইনতঃ বিক্রয়ের অধিকার না থাকায় ক্রেতার কোন অধিকার ক্রীত জোতের জমিতে জন্মিত না। সুতরাং খরিদা জোত জমিদারের নিকট হইতে পত্তন গ্রহণ করিবার জন্য জমিদারকে প্রচুর টাকা নজরানা দিতে হইত।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হইবে)

সনাতন বাংলার মেয়ে

(গল্প)

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আবাল্য সহরেই মানুষ, কাজেকাজেই গ্রামের স্বাদ কবির কাব্যে পাইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে হইত। তবে সময়ে সময়ে সাধ যাইত, দিন কতক গ্রামে কাটাইয়া আসিয়া সত্যকার বাংলার সহিত পরিচিত হইয়া আসি। ঠিক্ এই সময়ে সুযোগও আসিয়া উপস্থিত হইল। জ্যেঠা-মহাশয় বলিলেন, তাঁহার দেশে যাওয়া ঘটিয়া ওঠে না, কাজেই দেশের বাড়ীও আজ কয়েক বৎসর পড়-পড় অবস্থাতেই রহিয়াছে। আমি যদি একবার দেশে যাইতে রাজী হই, তাহা হইলে তিনি আমাকে গৃহসংস্কারের ভার প্রদান করেন। বলিবামাত্রই আমি রাজী হইয়া গেলাম।

গ্রামে প্রকৃতি ছাড়া সাথী নাই। সারাদিন আপন মনেই থাকিতে হইত। হয় কোনো কাব্যগ্রন্থ লইয়া বসিয়া থাকিতাম, নয় তো মাছের প্রত্যাশায় ছিপ লইয়া বসিয়া কাটিত। কখনো কখনো বা আগানে-বাগানে

ক্যামেরা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। মনে হইত, দিন বুঝি আর কাটে না! কারণ এখানকার অলস দিনগুলি অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলে। সহরের ন্যায় এখানে ঢালা পিচের রাস্তা নাই যে হাওয়া গাড়ীর চাকায় হু হু শব্দে সময় গড়াইয়া চলিবে। বরং এখানকার সময় আঁকা-বাঁকা উচ্চাবচ গ্রাম্য পথে খঞ্জের মত নেংচাইতে নেংচাইতেই চলে। আর মাত্র কয়েকটা দিন হইলেই আমার যাবতীয় কার্য্য সমাধা হইয়া যায়। তাই এক-একবার ভাবিয়া সান্ত্বনা পাই যে, আর মাত্র এই কয়টা দিন কোনোমতে কাটাইয়া দিলেই পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া বাঁচিব। আর নয়, এবার গ্রামের মোহ ফুরাইয়াছে। রাত্রে ম্যালেরিয়ার বিভীষিকায় ও মশার কামড়ে ঘুম নাই, পানা-পুকুর আর পচা পগার এই তো গ্রাম? কোথায় সে সুজলা-সুফলা-মলয়জশীতলা বঙ্গভূমি, তাঁর সন্ধান এখানে মিলিবে কি? কে জানে আমরা হয়তো কবির সহানুভূতিশীল চোখ দিয়া দেশকে দেখি না, তাই এরূপ মনে হয়।

বৃথা হা-প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিয়া লাভ নাই ভাবিয়া ছিপ্ তুলিয়া লইলাম। দেখি ওপারের ইট-বাঁধানো ঘাটে একটি ছেলে, বোধ হয় বছর ছয়েকের হইবে, আমের আঁটি ঘষিয়া ভেঁপু তৈয়ার করিতেছে। দেখিয়াই মনে হইল, বাঃ বেশ ছেলেটি তো! এরূপ একটি ছেলে তো আসিয়া অবধি কই দেখি নাই? ডাকিয়া কথা কহিতে ইচ্ছা করিতেছিল। এমন সময়ে নয়-দশ বছরের একটি মেয়ে ছেলেটিকে ডাকিতে ডাকিতে পুকুর-ঘাটে আসিল। অনুমানে নয়-দশ বছরই বলিলাম, কারণ আঁচলখানি গায়ে উঠিবার সময় এইবার আসিতেছে, কিন্তু এখনও ওঠে নাই, অঙ্গে অঙ্গে যেন কোমল পল্লীশ্রী মাখানো! ছেলেটিকে ডাকিতেছিল মেয়েটি—রুণু, রুণু! বড় মিষ্টি আওয়াজটি, আরও মিষ্টি তাহার লাবণ্যখানি!

ছেলেটি সাড়া দিল—কি? যাই দিদি।

তারপর মেয়েটি ঘাটে আসিয়া ছেলেটিকে পুকুর-পাড়ে বসিয়া আমের আঁঠি ঘষিতে দেখিয়া বলিল—পাজি ছেলে, আবার জলের ধারে গেছিস্? বলে দিয়ে আসি মাকে। আমি কোথায় এদিকে হায়রাণ হচ্ছি চিটি খুঁজে খুঁজে…

ছেলেটির ভেঁপু ততক্ষণে তৈয়ারী হইয়া গিয়াছিল, সে তাহার ভেঁপুটি জলে ধুইয়া লইয়া উঠিয়া আসিতে আসিতে বলিল—'দিদি নুণ দিয়ে কামরাঙা খাবি? কি রকম মিষ্টি খেয়ে দেখ্।'

কাছে আসিয়া রুণু তাহার কোঁচার খুঁটের পুটুলি-বাঁধাটি দিদির হাতে তুলিয়া দিল। মেয়েটি পুটুলি খুলিতে খুলিতে বলিল—কামরাঙা দিয়ে আমায় ভোলান হচ্ছে? দুষ্টু, আমি কিছু বুঝি না যেন? কেউ কোথাও নেই, একলা এমন করে আর পুকুর-ঘাটে আস্‌বি? যদি ডুবে যাস্?'

'কেন, ঐ তো লোক রয়েছে!'—ছেলেটি দেখাইয়া দেয় আমার দিকে। নইলে মেয়েটি আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ ছিল না। মেয়েটি আমার দিকে চাহিয়া দেখিবামাত্রই কামরাঙা ফেলিয়া দৌড় দিল। ছুটিতে ছুটিতে চীৎকার করিয়া ডাকিল—'রুণু, শীগ্‌গির বাড়ী আয়, মা ডাকছেন।'

ছেলেটি কামরাঙাগুলি কুড়াইয়া লইয়া আমের আঁটির ভেঁপু বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে দিদির অনুসরণ করিল। আমাকে দেখিয়া মেয়েটির দৌড়াইবার কারণ বোধ হয় সম্পূর্ণ নূতন লোক দেখিয়া একটুখানি নারীসুলভ লজ্জা, আর একটুখানি বালিকাসুলভ চাপল্য।

এই তো সামান্য ব্যাপার, কিন্তু এতেই মনে হইল, এতদিন অন্ধ কারাবাসের পর একটুখানি সূর্য্যালোক দেখিতে পাইলাম।

মন সিক্ত হইয়া উঠে, ভাবি এখানেও এমন সুষমা আছে, কোমলতা আছে, এখানেও এমন মাধুর্য্য আছে, রোমাঞ্চ আছে, এতদিন তো কই অনুভব করি নাই? ঝোপের আড়ে অমন কত ফুল ফোটে আমরা জানি না, সন্ধানী মধুকর জানে। মক্ষিকার মধ্যে যেমন মধুকর আমাদের মধ্যে তেমন কবি। কিন্তু যাক সে কথা, আহা কি সুন্দর মেয়েটি! কি চমৎকার সনম্র লাজুকতা, সুস্নিগ্ধ চাপল্য! গৌরব আছে অথচ গর্ব নাই, সৌন্দর্য্য আছে অথচ ঝলকানি নাই! খাঁটি বাংলার মাটির জিনিষ, অন্য কোনো প্রভাবে দুষ্ট নয়! কবির কথায় ভাবিলাম—

'কোন্ অজানিত গ্রামে, কোন্ দূর দেশে
কার ঘরে বধূ হবে, মাতা হবে শেষে,
তার পরে সব শেষ—তারো পরে হায়,
এই মেয়েটির পথ চলেছে কোথায়!'

সত্যি, কোথায় তা কি জানি? নিয়তির গূঢ় গহন প্রবাহে ওকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে তাহা কি ভাবিতে পারি? তবু ভাবি…

ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হইয়াছে। ওরা আমাদের বাগানের পূব পার্শ্বে থাকে—কেশব পণ্ডিতের বাড়ী। মেয়েটি কেশব পণ্ডিতের কন্যা, নাম তুলসী। আর ছেলেটির নাম অরুণ, সকলে রুণু বলিয়াই ডাকে। ছেলেটি কেশব পণ্ডিতের পুত্র নয়; দূর সম্পর্কিত কোনো আত্মীয়-পুত্র, হঠাৎ মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া পড়ায় তাহাকে আনিয়া কেশবের অপুত্রকা বিধবা পত্নী পুত্রটিকে পালন করিতেছেন।

ইহারই দিন কয়েক পরে একদিন বাগানের পূর্ব্বদিকের জঙ্গল সাফ করাইতে গিয়া দেখিলাম, বাগানের সীমানা-জ্ঞাপক ইটের পাঁচীলের খানিকটা যায়গা ধ্বসিয়া যাওয়ায় সেখান হইতে কেশব পণ্ডিতের বাড়ীর আঙিনা দেখা যায়। মাত্র খান চার-পাঁচ জীর্ণ ঘর, জীর্ণতাকে ঢাকিবার জন্যই নানা রকম শাকসব্জী লতাপাতা যেন তাহার উপর কিছুটা মায়া বিস্তার করিয়াছে। পরিচ্ছন্ন সম্মার্জ্জিত একটুখানি আলিম্পন-চিত্রিত অঙ্গন, তুলসী সেখানে 'পুণ্যি পুকুর' ব্রত করিতেছে ও রুণু বসিয়া দেখিতেছে।

তুলসী মন্ত্র পড়িল—পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা
কে পূজে রে সকাল বেলা
আমি সতী লীলাবতী, ইত্যাদি…

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল—তুই কে রে দিদি?

তুলসী হাসিয়া বলিল—আমি সতী লীলাবতী
মোরা ভাই-বোন ভাগ্যবতী
হয়ে পুত্তুর মরবে না
পিরথিবীতে ধরবে না…

মজার মন্ত্র শুনিয়া রুণু হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। ছুটিয়া মাকে গিয়া বলিল—'ওমা, দিদি কি সব বল্‌চে মা।'

মা হাসিয়া বলিলেন—'ওখানে দিদিকে এখন জ্বালাতন করিস্‌নি বাবা। দিদি যে বের্‌তো কচ্ছে।'

'কেন বের্‌তো কচ্ছে মা?'—রুণু জিজ্ঞাসা করিল।

মা বলিলেন—'বাঙালীর ঘরে মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেচে, বের্‌তো নিয়ম কর্‌বে না? যদ্দিন কুমারী আছে ভাইয়ের কল্যেণ কর্‌বে, তবে তো ভাল থাকবি। তার পর ঘর-বর হলে স্বামী-পুত্তুরের কল্যেণ কর্‌বে। মেয়ে মানুষকে যখন যেখানে থাক্‌তে হয় তখন সেখানকার কল্যেণ করতে হয়।'

রুণু মার কাছ হইতে ফিরিয়া গিয়া দেখে তুলসী গলায় কাপড় দিয়া নমস্কার করিতেছে।

তুলসীর পিঠের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সোহাগভরে রুণু বলিল—দিদি সতী লীলাবতী।

নমস্কারান্তে তুলসী উঠিয়া রুণুর চিবুক স্পর্শ করিয়া বলে—ভারী মজা না রে?

ব্রতাবশিষ্ট একটি পেয়ারা চিবাইতে চিবাইতে রুণু বলে—হুঁ—উ। কাল আবার বের্‌তো করবে?

তুলসী বলিল—হুঁ। এখন রোজ করব।

শুনিয়া রুণু জো পাইয়া বসে, বলিল—আমি রোজ দেখ্‌ব, পাঠশালে যাব না।

তুলসী বলিল—ছিঃ ওকথা বলতে নেই, দুষ্টু হতে নেই। ব্যাটাছেলে বিদ্বান পণ্ডিত হবি বাবার মত, তাই জন্যে তো আমি বেরতো কচ্ছি।

রুণুর মন না উঠিলেও দ্বিরুক্তি করিল না।

দেখিয়া আমি ভাবি পল্লীর এ চিত্র বাংলার একান্ত নিজস্ব। আজ এতকাল এ ভাবেই তো বাংলার ঘরে ঘরে চির-বঞ্চিতা, চির-নির্য্যাতিতা মাতা-ভগিনীরা তাঁহাদের সর্ব্বান্তরিক কল্যাণ-কামনা দিয়া সর্ব্বহারা বাঙালীদের শেষ সম্বল তাহাদের গৃহটুকু শত শত বিঘ্ন-বিপদ, অনাচার-অবিচার হইতে দূরে রাখিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণ পণ করিয়া আসিয়াছেন। বাংলার সর্ব্বৈশ্বর্য্য বাদ দিলেও মনে হয় অন্ততঃ এক বিষয়েও বাংলা সারা জগৎকে শিক্ষা দিতে পারে এবং আমাদের অন্ততঃ একটি জিনিষ বিশ্বের দরবারে গর্ব্ব করিবার মত আছে তাহা হইতেছে বাংলার নারী-সমাজ।

ইহার প্রায় বছর পনেরো পরে জরীপের হাঙ্গামার জন্য আমাকে আবার দেশে যাইতে হইল। অবশ্য ইতিমধ্যে গ্রামের তথাকথিত অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পাশের গ্রামে পোষ্টাপিস হইয়াছে, আমাদের বাগানের পাশ দিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেশব পণ্ডিতের বাড়ী ঠিক তেম্নিই আছে; জীর্ণ, বরং জীর্ণতর হইয়াছে। দেখিলে মনে হয়, তাহাদের জীবন-যাত্রা একটুও বদলায় নাই। কেশব পণ্ডিতের পত্নী বৃদ্ধা হইয়াছেন, তবে আজও বাঁচিয়া আছেন শুনিয়াছি। শুনিয়াছি রুনু কলিকাতার কোন্ আপিসে চাকুরী পাইয়াছে, সে মাসে মাসে যে কয়টি টাকা পাঠায় তাহাতেই ওদের বেশ চলিয়া যায়। তবে সম্প্রতি ওদের বাড়ি একটা ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।

তুলসীর মা তুলসীকে একটি বেশ প্রিয়দর্শন কুলীনের ছেলের হাতে দিয়া কুল করিয়া মেয়ে-জামাইকে ঘরেই রাখিয়াছিলেন। জামাতা বাবাজী বেশ ছিলেনও ভাল, কিন্তু ক্রমশঃ কুসঙ্গে পড়িয়া ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাইতে শিখিলেন। জামাতার পরিণতি দেখিয়া তুলসীর মা তো মাথা চাপড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু আর মাথা চাপড়াইলেই বা কি হইবে? তার পর যতই দিন যাইতে লাগিল তিনি প্রকাশ্যে মাতলামি সুরু করিলেন ও ঘরে আসিয়া টাকা বা গহনার জন্য তুলসীকে ঠেঙাইতেন। ঠেঙাইবার দিক হইতে কিছু অসুবিধা ছিল না, কারণ বাঙালীর ঘরের মেয়ে মুখ বুজিয়াই মার সহিয়া থাকে, কিন্তু অসুবিধা ছিল টাকার বেলায়। গরীবকে ঠেঙাইলেও টাকা বাহির হয় না। টাকা চাহিয়া না পাইলে স্ত্রীকে উত্তম-মধ্যম ঠেঙাইয়া বাহির হইয়া গেলেও চাহিদা মেটে না। তুলসীর যাও দু'চারখানি গহনা ছিল তাহাও জামাতা বাবাজীবনের উৎপাতে তাহার গায়ে উঠিবার জো ছিল না। পরা দূরে থাকুক তাহাকে সব কিছু সব সময়ে লুকাইয়া রাখিতে হইত। ইহাতে জামাতা বাবাজীর আরও বিরক্তির কারণ ঘটিত। হঠাৎ একদিন সকালে দেখা গেল, তুলসীর বাক্স-পেঁটরা ভাঙিয়া গহনা-পত্র লইয়া জামাতা বাবাজী ফেরার হইয়াছেন এবং তৎসহ শ্বশ্রূর আজীবন সঞ্চিত বিধবার সম্বল ন্যূনাধিক একশত টাকা লইয়া চম্পট দিয়াছেন। সেই হতেই আর এ মুখো হন নাই।

শুনিয়া তুলসীর জন্য বড় কষ্ট হইতে লাগিল, আহা অমন মেয়ে! তাহার জীবনটা এমন ব্যর্থ হইয়া গেল! আবার সেই পুকুর-ঘাটে বসিয়াই ভাবিতেছি বহুদিন পূর্ব্বেকার কথা—সেই কবে কত বৎসর পূর্ব্বে তুলসীকে দেখিয়াছিলাম এই পুকুর ঘাটেই, তখন সে কিশোরী কন্যা।

এমন সময় একটি বধূ কলসী কাঁখে করিয়া জল লইতে আসিল। অপরের কুলবধূর দিকে বেশিক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকা যায় না, তবু যতটুকু দেখিলাম তাহাতেই মনে হইল যেন উহাকে চিনিয়াছি, তুলসী না?

জল ভরিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইব ভাবিতেছিলাম, কিন্তু কার্য্যতঃ পারিলাম না। পল্লী-সমাজ সম্বন্ধে আমার কিছু ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতা না থাকিলেও সাহিত্যে এ বিষয়ে অনেক পড়িয়াছি বলিয়া সাহস করিলাম না। কি জানি কি ভাবে লইবে! পৃষ্ট না হইলে পথে-ঘাটে কোনো কুলবধূর সহিত আপনা হইতে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে নাই। চেনাশোনা থাকিলেও নয়, তা ছাড়া আমার সহিত চেনাশোনা বলিতে যা বোঝায় তাও যখন ছিল না কোনোকালে। এরূপ রকম ভাবিয়াই নিরস্ত হইলাম. কিন্তু পরে দেখিলাম আমার অনুমান মিথ্যা নয়। কারণ বধূটি পথ সংক্ষেপ করিয়া লইবার নিমিত্ত আমাদের বাগানের মধ্য দিয়া কেশব পণ্ডিতের বাড়ীর দিকেই চলিল। ইদানীং দেখি যে আমাদের বাগানের পাঁচীল ভূমিসাৎ হইয়া যাওয়ায় কেশব পণ্ডিতের বাড়ী হইতে পুষ্করিণী পর্য্যন্ত বেশ একটি অন্দর-রাস্তার মত হইয়া গিয়াছে।

আমিও তার পরেই উঠিয়া পড়িলাম এবং বেড়াইতে বেড়াইতে বাগানের পূর্ব্বপ্রান্তে গিয়া পড়িলাম। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, চতুর্দ্দিকে ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

দেখিলাম বধূটি তুলসী-মঞ্চে দেউটি দিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিতেছে, প্রণামান্তে বহুক্ষণ গললগ্নীকৃতবাসে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কি যেন প্রার্থনা করিতেছে। ভর-সন্ধ্যার আলো-আঁধারী সত্ত্বেও প্রদীপের আলোকের এক ঝলক ওর অনবগুণ্ঠিত মুখে পড়াতে চমকাইয়া উঠিলাম। নববর্ষার উচ্ছল খরস্রোতা নয়, ভাদ্রের ভরা নদী প্রশান্ত

স্থির। পিছনে একটি বছর-পাঁচেকের ছেলে ওর পিঠে হাত দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটি তুলসীরই না? শুনিয়াছি তুলসীর একটি ছেলে আছে।

কিন্তু এতক্ষণ ধরিয়া কি প্রার্থনা করিল ও? স্বামী-পুত্রের কল্যাণ-কামনা করিল বোধ হয়। স্বামীর কল্যাণ-কামনা? ঐ স্বামীর কল্যাণ লইয়া ওর আর কি হইবে? তা হোক ঘর-বর হইলে স্বামী-পুত্রের কল্যাণ কামনা করিতে হয়, এই মহান্ সংস্কারে ও শিক্ষায় মানুষ হইয়া উঠিয়াছে না ও? তুলসীর ভাগ্যক্রমে বর হইলেও ঘর হয় নাই। বর নামমাত্র একটা হইলেও না হওয়ারই সামিল। তা হোক তুলসীর স্বামী যেমনই হোক, যেখানেই থাক ভাল থাক, বাঁচিয়া থাক, তাহার কল্যাণ হোক। তুলসী তবু তাহাকে স্মরণ করিয়া মাথায় এক রাশ সিন্দুর লেপিয়া বুক ফুলাইয়া সধবা-সমাজে বেড়াইতে পারিবে, এয়োতীর কাজ করিতে পারিবে, পান খাইয়া ঠোঁট রাঙাইতে পারিবে, হাজা হইলে আল্‌তা দিয়া পা রাঙাইতে পারিবে ও দুটি বেলা মাছের গ্রাস মুখে তুলিতে পারিবে। তাহা হইলেই আর ওর নারীজন্ম বৃথা হইবে না। হে ঈশ্বর, এই মূঢ়া নির্য্যাতিতা, বঞ্চিতা বঙ্গনারীর এই তুচ্ছ প্রার্থনাটুকু যেন মঞ্জুর করিও!

ভারাক্রান্ত মন লইয়া সেখান হইতে দ্রুত পদে বাড়ি চলিয়া আসিলাম। যাক্ তবু সুখের বিষয় অরুণ লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়াছে এবং মাতা-ভগিনীকে মনে রাখিয়াছে। বাঙালীর মেয়ে এরূপেই যুগে যুগে নীলকণ্ঠের মত সকল অকল্যাণ নিজে বহন করিয়া নিত্য সকাল-সন্ধ্যা সকলের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকে। ভগবান তাহার নীল স্বভাবোজ্জ্বল দুটি চোখ ভরিয়া অফুরন্ত লোনা জল দিয়াছেন, তাই দুঃখ হইলে ফেলে, স্রষ্টা তাহাকে বাংলার মাটির মত করুণায় আর্দ্র একখানি বুক দিয়াছেন, তাই সকলের ভাল না চাহিয়া পারে না।

ভবিষ্যতের সাহিত্য

প্রশ্ন ও উত্তর নিয়েই জ্ঞান। প্রথমে প্রশ্ন হচ্ছে, 'ভবিষ্যতের সাহিত্যে'র অর্থ কী?

'ভবিষ্যতের সাহিত্যে'র অর্থ কেবলমাত্র সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নয়। ভবিষ্যৎ কথাটিকে কেবলমাত্র সময়ের মাপজোপের একটি অঙ্ক হিসাবে না নিয়ে আরো সত্যতর ভাবে ভাবা যেতে পারে। যখন বলি ভবিষ্যৎ তখন কেবলমাত্র আগামী কাল বা আগামী বৎসর বোঝায় না, বোঝায় একটি নতুন জগৎ, একটি নতুন পরিস্থিতিকে। বর্তমানের পরিস্থিতি যতকাল পর্যন্ত না রূপান্তর গ্রহণ করছে ততকাল পর্যন্ত আগামী কালও বর্তমানেরই কোঠায় পড়ে, কারণ তার চেহারা বর্তমানেরই অনুরূপ। সাহিত্য-বিচারেও তাই। কিন্তু পরিবর্তন তো বাইরের জিনিস নয় — বিকাশেরই একটি পর্যায়। সুতরাং ভবিষ্যতের পৃথিবী ও ভবিষ্যতের সাহিত্যের সমালোচনায় বর্তমান পৃথিবী ও বর্তমান সাহিত্যের সমালোচনা অপরিহার্য।

জীবন সাহিত্যের মুখাপেক্ষী নয়, কিন্তু সাহিত্য একান্ত ভাবেই জীবনের মুখাপেক্ষী। প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও জীবন হতে বিচ্ছিন্ন কল্পলোকাভিসারী সাহিত্য যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হতে পারে না তার বহু উদাহরণ আছে। শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বোধ হয় অস্কারওয়াইল্ড। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য চিরকালই সাধারণের বোধগম্য, কারণ সাধারণের অনুভূতিই তার উপজীব্য, বিশিষ্ট অনুভূতিসম্পন্ন কোনো কোটেরির নয়। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের দ্বিতীয় দিক্ হচ্ছে এই যে, তা একটি সমগ্র যুগকে প্রতিফলিত করে ও সেই যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তা দ্বারা মানুষের চিরন্তন সমস্যাগুলির যে নূতন সমাধান

চিহ্নিত হয়েছে, আপনার জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারেই সেই সমাধান সকলকে রূপায়িত করে। মানুষের চিরন্তন সমস্যার সেই সকল সমাধান আজ গৃহীত না হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সাহিত্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই থেকে যায়। যেমন বুদ্ধ সর্বমানবিক প্রশ্ন-সকলের যে উত্তর দিয়েছিলেন সেই উত্তর আজ সর্ব গ্রাহ্য না হলেও বুদ্ধের মহামানবত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হবার কোনো কারণ ঘটে না। সেক্সপীয়র দ্বিতীয় রিচর্ডের ও পঞ্চম হেন্‌রীর চিত্রাঙ্কণে, 'রাজার' যে আদর্শ উপস্থাপিত করেছিলেন পরবর্তী কালে তাঁর দেশ সেই আদর্শকে গণতন্ত্রের আদর্শের সম্মুখে বলিদান করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেক্‌স্পীয়রের গৌরব তাদের কাছে অক্ষুণ্ণ।

সাহিত্যের সঙ্গে সমসাময়িক জীবনের কী সম্বন্ধ থাকা উচিত এ নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক আছে। ক্রোচে ও তাঁর মতাবলম্বীরা বলেন, আর্ট কেবলমাত্র নিজের খাতিরেই সত্য, জীবনের খাতিরে নয়। কিন্তু সাহিত্য তো জীবনের প্রতিভাস, সাহিত্যকে বাদ দিয়েও জীবন গড়ে উঠতে পারে, তা সে যেমন জীবনই হোক্, কিন্তু জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য অসম্ভব। জীবনের সঙ্গে মূলগত সংযোগ রক্ষা না করে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কখনো রচিত হয় নি। জীবন সম্বন্ধে যে জিনিসের কোনো Significance নেই তাকে নিয়ে মানুষ খেলা করতে পারে, তাকে হৃদয়ের সামগ্রী করতে পারে না।

ধনীর বাগানের ফোয়ারা থেকে ঝর ঝর করে নির্মল জল ঝরে পড়ে, দেখতে সে ভারী সুন্দর। কত লোকের গা ধোয়া জল, কত হাসপাতালের মড়া ভাসিয়ে জাহাজ নৌকো বুকে করে যে গঙ্গা চলেছে তার জল অত নির্মল নয়। কিন্তু তার শক্তি অনেক বেশী। অস্কারওয়াল্ডীয় যুগে সাহিত্য ছিল এই ধনীর বাগানের ফোয়ারার মতো, তার পিছনে কোনো প্রবল শক্তি নেই, কোনো বিরাট্ সর্বানুভূ কল্পনা নেই, কেবল আছে সূক্ষ্মতর হতে সূক্ষ্মতমকে নিয়ে মনোবিলাস। এই মনোবিলাস অল্পাধিক পরিমাণে পরিবর্তিত হতে হতে টিকে ছিল গত মহাযুদ্ধ পর্যন্ত। মহাযুদ্ধের বোমা ফাটিবার সঙ্গে সঙ্গে এই আত্মপ্রবঞ্চিত মনোবিলাসের যুগ শেষ হয়ে গেল। মানুষের আত্ম-সচেতনতা বহু পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোলো। এতদিনকার প্রচলিত ধর্ম, রাজনীতি ইত্যাদির মধ্যে নানারকম ছিদ্র অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। মার্কস্ প্রমাণ করলেন যে, প্রচলিত ধর্ম কেবল প্রচলিত রাজনীতির সহযোগী শোষক, ফ্রয়েড দেখালেন যে, মানবের তথাকথিত নিন্দনীয় প্রবৃত্তিগুলি দমন করার ফল—নিউরোসিস্—কেবল শারীরিক ও মানসিক রোগ। কিন্তু ফ্রয়েড ভবিষ্যৎ সৃষ্টির কোনো আশা দিতে পারলেন না, এবং মার্কসের সমাধান সকলে বিশেষতঃ বুদ্ধিজীবী ও ধনজীবীরা গ্রহণ করতে পারলে না। অথচ প্রচলিত ধর্মের অর্থহীনতা, প্রচলিত রাজনীতির শোষণ সম্বন্ধে সমস্ত শিক্ষিত মানব-সমাজ সচেতন হয়ে উঠল। ফলে হতাশার যুগের আরম্ভ। এলিয়ট স্পেংলার প্রভৃতির এই হতাশার মুখপাত্র। Prufrock কবিতার মধ্য দিয়ে পার্থিব জীবনের অর্থ খুঁজতে খুঁজতে দিশাহারা হয়ে এলিয়ট্ পৌঁছলেন wasteland-এর মরুভূমিতে ও কষ্টক্লিষ্ট হয়ে সেই মরুভূমি পার না হতে পেরে ফিরে আসলেন ash-wednesday'র পুরাতন ক্যাথলিক ধর্মের ঠাকুরঘরে। অথচ অত্যাধুনিকের এই ভাবে পুরাতন ক্যাথলিক বিশ্বাসে আস্থাস্থাপনটা সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট চমকপ্রদ। এলিয়টের অভি[illegible] এই বাইরের চাকচিক্যেই পর্যবসিত হলো। এবং পর্যবসিত হবার পর হতে তাঁর প্রতিভা নিস্তেজ হতে আরম্ভ করলে। হুবহু এই ভাবে হাক্সলি গেলেন বুদ্ধের শরণে এবং জয়েস এলিয়টীয় নব ক্যাথলিসিজ্‌মে। তা সত্ত্বেও এঁরা সকলেই ভিক্টোরীয় সাহিত্যিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ এঁরা কেউই বিশেষের বিশেষ ক্ষমতা এবং অনুভূতিকে নিয়ে কোণায় বসে থাকেন নি, প্রত্যেকেই সমস্ত জগৎ, সমস্ত মানব-সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। ডিকেন্স এমন কি কিছু পরিমাণ বার্নার্ড শ'রও সাহিত্যের মূলগত দোষ হচ্ছে এই যে, তাঁরা কেবলই সমাজের বিশেষ দোষগুলিকে বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন, কিন্তু মানব-সভ্যতার যে সকল মূলগত ত্রুটির জন্য এই সকল বিশেষ বিশেষ সামাজিক অন্যায়ের সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলিকে ঠিক ধরতে পারেন নি এবং সত্যকারের ভবিষ্যৎ সত্যকারের [illegible] আভাস দিতে

পারেন নি। Back to Methuselah-র সমাধান অত্যন্ত অমানবিক, Brave New World-এর ব্যঙ্গচিত্রেরই গা-ঘেঁষা, সে-ভবিষ্যতের সম্বন্ধে উৎসাহিত হবার বিশেষ কোন কারণ নেই। বার্ণার্ড শ'ও সংস্কারক, বিপ্লববিরোধী, সুতরাং শেষ পর্যন্ত পুরাতনেরই ডঙ্কাবাদক।

যুদ্ধোত্তর সাহিত্যিকদের পক্ষে সাহিত্যের দৃষ্টি থেকে একটি কথা বলবার আছে, সে হচ্ছে তাঁদের আঙ্গিক। নতুন পৃথিবীকে যে পুরাতন আঙ্গিক রূপ দিতে পারে না এ কথা তাঁরাই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করেন ও নতুন আঙ্গিকের সৃষ্টি করতে সক্ষম হন, এ হিসাবে সাহিত্য তাঁদের কাছে ঋণী। এলিয়ট ও জয়েস যে মানুষের প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন দিক খুলে দিয়েছেন তাতে কোনো সন্দেহ নাই। এবং মনে হয় ভবিষ্যতের সাহিত্য এই ধরণের আঙ্গিকের মধ্যেই তার আত্মপ্রকাশের পন্থা খুঁজে পাবে। কিন্তু এলিয়টও অন্যান্য নতুন সাহিত্যিকেরা যে আঙ্গিক ছাড়া পৃথিবীকে আর নতুন কিছু দান করতে পারেন নি তা একটি কথা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এলিয়ট WasteLand-এ যে সাঙ্গীতিক আঙ্গিক (musical technique) সংযোজনা করেছিলেন তা তিনি পরবর্তী কাব্যে পরিত্যাগ করেন। হাক্সলে Eyeless in Gazaতে অনুরূপ সাঙ্গীতিক আঙ্গিকের আর পুনরাবর্তন করেন নি। জয়েস উপন্যাসের আঙ্গিকের এক শ্রেষ্ঠ শিখরে পৌছলেন সত্য, কিন্তু তাঁর বিষয়বস্তু অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে তিনি মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন গ্রীক ইউলিসিস্ ও রোমান্টিক মধ্যযুগীয় ক্যাথলিসিজমের দিকে। নিখুঁত কোটপ্যাণ্ট টাই পরে ভোর বেলা হাঁটুগঙ্গায় নেমে সূর্য্যোপসনার মতো। নিজের শক্তিহীনতাকে ঢাকবার জন্য এরূপ ব্রিলিয়াণ্ট ধাপ্পাবাজি অনেক আধুনিকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে।

আমাদের সাহিত্যে যুদ্ধোত্তর হতাশার সংক্রামণকে অনেকেই সন্দেহের চক্ষে দেখেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে এই হতাশার সত্যকার কারণ আমাদের দেশে নেই, ও-দেশে যুদ্ধোত্তর পটভূমিকায় এই হতাশা আপনা হ'তে ফুটে উঠেছিল, আমাদের দেশে সেটা নেহাৎই নকল হতাশা। সুতরাং এলিয়ট সত্য এবং বিষ্ণু দে ভাবের ঘরে চুরি। কিন্তু নকলের দ্বারা ভালো হাতের লেখা ভালো করা যেতে পারে, পদধ্বনির মতো কবিতা সৃষ্টি করা যেতে পারে না। কিন্তু ফ্রয়েড ও মহাযুদ্ধকে বাদ দিলেও আমাদের দেশের পরাধীনতা, অন্নসমস্যা, বেকার-সমস্যা, ধর্মের বৈকল্য, বিদেশী আক্রমণের ভয় এ সমস্ত অলীক? আমাদের সভ্যতা কি স্বর্গের পারিজাতের মতন নির্মল, সুগন্ধময়? দেশের অবস্থা ও দেশের চিন্তাধারার সমস্ত দুর্গতি থেকে মুখ ফিরিয়ে চারিদিকে রঙীন আলোক দেখতে পাওয়াই কি এখন সাহিত্যের আদর্শ সুর? হতাশা নিয়ে গর্ব করা চলে না, কিন্তু অলীক আশার চাইতে তাও শ্রেয়। কারণ সন্দেহ ও আত্ম-সচেতনাতেই জ্ঞানের আরম্ভ, এবং হতাশা হচ্ছে নতুন আশার পূর্বাবস্থা।

প্রতিক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া নিয়ে সাহিত্যের ক্রম-বিকাশ। সৌখীন সাহিত্যের ক্রমবিকাশ পুরোণো ফ্যাশনের উপর নতুন ফ্যাশনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে। একদল সাহিত্যিক নাম কেনেন নতুন ফ্যাশনের আমদানী করে, আরেক দল পুরাতন সাহিত্যিক নাম বাঁচিয়ে রাখেন নতুন ফ্যাশনে ব্যঙ্গ করে। নতুন সাহিত্যের নোংরামিকে ব্যঙ্গ করবার ছলে নিজেরা অনেক নোংরামিকে প্রশ্রয় দেবার সুযোগ খোঁজেন। তার দ্বারা দুই দলেরই সাহিত্যের বাজারে টিকে থাকবার সুবিধা হয়। কিন্তু এই দু-দলের সংঘর্ষের মধ্যে নিজের আন্তরিকতায় অবিচলিত থাকেন সত্যকার খাঁটি সাহিত্যিক। প্রতিষ্ঠালব্ধদের মধ্যে সব চেয়ে নিঃসঙ্কোচে নাম করা যেতে পারে বোধ হয় বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (অমৃতস্য পুত্রাঃকে বাদ দিয়ে) এবং উদীয়মান লেখকদের মধ্যে শ্রীযুত সুবোধ ঘোষের। অবশ্য আন্তরিকতার সঙ্গে ফ্যাশন অনেক ক্ষেত্রেই অঙ্গাঙ্গী হয়ে থাকে, তাকেও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না। এঁদের কোনো কোনো বই পড়ে আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠি, ভাবি সত্যিকার কিছু পেলাম বুঝি, কিন্তু তার পরের বইটা দেখেই নিরাশ হই। কখনো কখনো এমন ঘটে যে, এক-একটা উঁচু দরের পরিচ্ছেদের পরেই নিকৃষ্ট জিনিস পেয়ে মনটা দমে যায়। Stunt-বহুল বই ট্রেণে বসে পড়তে

ভালো লাগতে পারে, কিন্তু তাকে সত্যিকারের সাহিত্য বলি কি করে? এই সকল উপন্যাসের নায়কদের প্রাণের ভয় নিয়ে গর্ব, কায়দা করে নিজের নিন্দা করা ও পিশুর কামড় খেয়ে হিমালয়ের মহত্ব বিস্মৃত হয়ে পরমুহূর্তে গেরুয়ার ভাববিলাস—এগুলি অত্যন্ত বেশী স্পষ্ট রকমের পুরোণো, অত্যন্ত বেশী সস্তা ষ্টাণ্ট, এগুলি সরাসরি ইংরেজি বাজারের বস্তাপচা মাল আমদানী করে মূর্খদের মন ভোলাবার প্রয়াস। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এই সকল ষ্টাণ্টকে ছাড়িয়ে ওঠে সত্যকার জীবন-দৃষ্টির স্তরে। টলষ্টয়, রোলাঁ, এমন কি শোলোকফের মধ্যে এ সবের স্থান নেই। বাংলায় অনেক শক্তিশালী লেখকদের যখন এরূপ দুর্দশা দেখি তখন মনে হয় ইংরেজীর নিগড় থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই।

আমারা বিষয়বস্তু থেকে কিঞ্চিৎ পিছনে পড়েছি। যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে, ইংরেজী সাহিত্যে যে হতাশার কথা বলা হ'ল সম্প্রতি তার প্রতিক্রিয়ায় কয়েকজন নতুন কবি একটি জাগরণের সুর এনেছেন। এঁরা হলেন Spender, Audem ও Cecil Day Lewis.

কোনো কবির রাজনৈতিক মতামত তাঁর কাব্যকে কতদূর প্রভাবান্বিত করে বা করা উচিত এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আমি চেষ্টা করবো না। কিন্তু দেশের হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার মূলে যদি রাজনৈতিক কারণ আছে বলে স্বীকৃত হয়, তবে রাজনীতির কোনো কোনো দিক তাঁকে প্রভাবান্বিত করতে বাধ্য। মননশীল কবি কখনো টেনিসন বা ব্রাউনিংয়ের মত সাম্রাজ্যবাদ ও খৃষ্টধর্মের ও দোকানদারী মনোবৃত্তি ও শিল্পসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার এমন হতাশাব্যঞ্জক, superficial সমন্বয়কে চোখের সাম্নে রেখে বলতে পারতেন না God's in His heaven and all's right with the world.

শ্রেষ্ঠ কবিতা, বিশেষতঃ গীতি-কবিতা (আমাদের যুগ মহাকাব্যের যুগ নয়) কবির মধ্যে হ'তে আবির্ভূত হয় একটি তীব্র সংঘর্ষ একটি মর্মগত মন্থনবেদনার পর। সেই মন্থন ঘটে কবির মনের ভাবাবেগ ও সেই ভাবাবেগ প্রকাশ করবার উপযুক্ত আঙ্গিকের মধ্যে। ভাবাবেগ ক্রমাগতই আঙ্গিককে ছাপিয়ে আত্মহারা হ'তে চায় এবং আঙ্গিক ক্রমাগতই তাকে সংহত করে একটি সুসংবদ্ধ রূপ দেবার চেষ্টা করে। এই সংঘর্ষ যতো তীব্র হয় কবিতার শক্তি তত বাড়ে। এমন নয় যে কোনো একটি বিশেষ চিন্তা, একটি আইডিয়াকে অবলম্বন করে কবিতা দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু সেই চিন্তা—সেই আইডিয়াকে ঘিরে একটি প্রগাঢ় ভাবাবেগের পরিমণ্ডল থাকা চাই। পরিমণ্ডলের কেন্দ্রের আইডিয়াটি সেই পরিমণ্ডলের মধ্য হ'তেই জন্ম লাভ করবে। এ ক্ষেত্রে যদি একটি বিশেষ আইডিয়াকে ঠিক করে নিয়ে তার উপযোগী আবেগ-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করবার প্রচেষ্টা আসে তবে সে রচনা আর যাই হোক্ না কেন তার পক্ষে কবিতা হয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব। মনের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে যদি ঔচিত্য বোধ অনুসারে অথবা ভাব ও চিন্তার সমতারক্ষার প্রয়োজন অনুসারে কবিতার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় তবে কাব্যের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। রোমাণ্টিক কবিতাকে জীবন হ'তে নির্বাসিত করা হোক, কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি ঔচিত্য বোধের নজির দেখিয়ে রোমাণ্টিক কবিকে দিয়ে বামপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করানো হয় (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) তবে সে সাহিত্য সম্বন্ধে বেশী কিছু আশা করা চলে না। রাজনৈতিক সাহিত্য বিশেষ কোনো সাহিত্যিকের সাহিত্যে সার্থক হয়ে উঠতে পারে, কোন সাহিত্যিকের একটি রচনায় সার্থক হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তার সম্বন্ধে ব্যক্তি বিশেষেরই হোক্, সাহিত্য জগতেরই হোক্—কোনো বিশেষ consistency দাবী করাতে সাহিত্যের মর্য্যাদা লঘু করা হয়। রাশিয়ার Rapp-এর মতামত যত কঠিনই হোক্ না কেন, তার দ্বারা যত Mayakorskyরই মৃত্যু হোক্ না কেন, তাকে আমি ভালো বলি, কারণ সেটা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। যে দেশে Rapp-এর মত কোনো সরকারী সংগঠন নেই সে দেশের Rapp মনোবৃত্তির সংগঠিত পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ আরো ভয়ংকর, কারণ তাতে বহুতর প্রবঞ্চনা ও আত্ম-প্রবঞ্চনার সূচনা করে।

Spender, Auden, Day Lewis—প্রত্যেকের সম্বন্ধেই বলা চলে যে তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক সাহিত্য

কখনো সফল হয়েছে, কখনো হয়নি, কখনো সাহিত্যপদচ্যুত হয়েছে তাঁদের ভাবসাম্য রাখবার আপ্রাণ আত্মসচেতন চেষ্টার ফলে। বহুল উদ্ধৃতি এখানে সম্ভব নয়—কিন্তু স্পেণ্ডরের দুটি লাইন নিন—

"Man shall not hunger, Man shall
spend equally"

এগুলি খবরের কাগজের হেডলাইন করে ছাপালে খবরের কাগজের অমর্য্যাদা হয়। স্পেণ্ডরের মধ্যে এই ধরণের পতন অনেক দেখতে পাওয়া যায়, অডেন অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, ডে লুইস ভাবসাম্য সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত কম সচেতন, তাঁর কবিতা মাত্রেই 'রাজনৈতিক কবিতা নয়'। স্পেণ্ডরের আঙ্গিকের মধ্যেও সময়ের খাতিরে পুরাতন ও নতুন আঙ্গিকের সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বাপেক্ষা পীড়াদায়ক হচ্ছে তাঁর কন্‌সিস্‌টেন্সি রাখবার চেষ্টার আত্মসচেতনতা।

ইংরিজীতে এই বামপন্থী প্রতিক্রিয়ার প্রতিভাস আমরা বাংলায়ও আজ পাচ্ছি। বামপন্থী কবিতা ক্রমশঃই ফ্যাশানেব্‌ল হয়ে উঠছে। স্পেণ্ডরের আত্মপ্রবঞ্চনা আরও তীব্ররূপ নিয়ে আমাদের দেশের সত্যকার কবিত্ব শক্তিকে লাঞ্ছিত করবে এই ভয় আমাদের মনে। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটি শক্তিশালী কবি বামপন্থী হবার পর তাঁদের শক্তির অবনতি হতে দেখা গেল। তাদের মধ্যে বিষ্ণু দে অন্যতম। এ কথা স্বীকার্য যে রবীন্দ্রোত্তর যুগে শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা শ্রীযুত বিষ্ণু দের। কিন্তু সেই জন্যই সেই প্রতিভা অসময়ে ম্লান হ'লে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি। 'পদধ্বনি'র মতো কবিতা তিনি বামপন্থী পথ ধরবার পর যে সৃষ্টি করতে পারেন নি এ কথা আজ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শ্রীযুত সমর সেন এখনকার কবিদের মানসিক অবস্থাটিকে সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন। ভারতের ভাগ্যাকাশে ঝড় ঘনায়,—

"এ অবস্থায় বৃন্দাবনী বাঁশী যদি চকিতে শুনি
তাহলে বলবে লোকে : রোমান্টিক ভূঁইফোড়
অত্যধিক পরিশ্রমে হা-হুতাশ চাপি,
কেননা ব্যক্তিগত গান গাওয়া কর্তব্য নয় ;
যদিচ পৈত্রিক আশ্রয়ে এখনো বসবাস,
যদিচ বেকার, নিঃসঙ্গ, মনে মনে প্রেমিক
তথাপি বামপন্থী পত্রিকায়
আসন্ন বিপ্লবের গান অবশ্য উচিত।"

কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা যদি এতো স্পষ্ট রূপ নিয়ে আসে তবে বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান্ ব্যক্তি তাকে ত্যাগ করেন। যখন সে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরোক্ষভাবে আক্রমণ করে তখনই ঘটে বিপদ। তখন শক্তিশালী লেখককে এক অদৃশ্য Rapp. এর কবলে পড়ে আত্মহত্যা করতে হয়। সেই আত্মহত্যা Mayakorskyর আত্মহত্যা হতেও ভয়ংকর। ভয়ংকর কারণ তাতে প্রাণ নেই অথচ প্রাণের ভনিতা আছে। এত কথা বলার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক সাহিত্যের নিন্দা নয়, তার সম্বন্ধে একটি সাবধানবাণী উচ্চারণ করা। কবির কাছে জীবনের একটি দাবী আছে, কবির মনে আছে সেই দাবী পূরণ করবার একটি স্বাভাবিক ইচ্ছা। কিন্তু সেই ইচ্ছাই শক্তি নয়। সেই দাবী পূরণের ইচ্ছা যদি আর সকল ইচ্ছাকে আপনা হতে ছাপিয়ে কবির অন্তরকে উদ্বুদ্ধ করে তবেই সেই ইচ্ছা শক্তিতে পরিণত হয়। কী রাজনৈতিক কর্মে, কী রাজনৈতিক সাহিত্যসৃষ্টিতে, এই শক্তি অন্তরের কেন্দ্র হতে উৎসারিত হওয়া চাই। তাকে বাইরে থেকে চাপানো চলে না, কোনো ঔচিত্যবোধ, কোনো যুক্তি দিয়ে নয়।

ভাগ্যাকাশে ঝড় যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই যাঁরা সত্যকার শক্তিধারী তাঁরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হচ্ছেন, ও যাঁরা দুর্বল তাঁরা দুঃখবিলাসে তৃপ্তি পাবার চেষ্টা করছেন। ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে না। থার্মোডাইনামিক সমতার জন্য সৃষ্টির অবসান ঘটতে পারে, কিন্তু তার পূর্বেই পৃথিবীর উজ্জ্বল ভবিষ্যত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, সে আপনি এসে ধরা নিশ্চয়ই দেবে না, তার জন্য বহু রক্তপাত, বহু নির্দয়তা, বহু অন্যায় চাই, তবেই সেই যুগের সৃষ্টি হবে যে যুগে অহিংস নীতিবাদের প্রয়োজন নেই, দয়ার প্রয়োজন নেই, অন্যায় পাপ নেই, কারণ সেখানে স্বার্থের সজ্ঘাত নেই। অন্যায় আপনাকে আপনিই বিনষ্ট করে, কারণ তার মধ্যে বেঁচে থাকবার জীবনীশক্তি নেই। এবং এতে সন্দেহ নেই যে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ

আসবে সাম্যবাদেরই পথ দিয়ে। কিন্তু সাম্যবাদ যে বিশ্বসৃষ্টির শেষ সীমা নয়, এ কথা আমরা কিছুতেই নিজেদের বোঝাতে পারছি না। যেটা উপায় সেটাই ক্রমাগত মানসিক জগতের কাছে উদ্দেশ্য হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। আমাদের দেশে এমন কি সমস্ত পৃথিবীতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবার পরও পৃথিবী থাকবে এবং মানুষ থাকবে। হতে পারে আমাদের এখানকার বহু চিন্তাধারা তখন ভুল প্রতিপন্ন হবে। বিজ্ঞান হয়তো বা প্রমাণ করবে যে বস্তুই বিশ্বসৃষ্টির মূল সত্তা নয়। বিজ্ঞানের গতি এখন সেই পথে। আইনষ্টাইনের স্পেস্-টাইমের ধারণা আমাদের সমস্ত জীবনধারা চিন্তাধারাকে কী ভাবে পরিবর্তিত করবে কে বলতে পারে? পৃথিবীকে চ্যাপ্টা ভাবা হতে কমলালেবুর মতন ভাবাতে চিন্তাজগতে যে আলোড়ন ঘটেছিল তা অপেক্ষা এই আলোড়ন কিছুমাত্র কম হবে না। আইনষ্টাইনের মত চিন্তাজগত মেনে নিয়েছে বটে, কিন্তু চিন্তাধারার উপর তার সক্রিয় প্রভাব এখনো সত্যভাবে আরম্ভ হয় নি। পৃথিবীর সমস্ত ভবিষ্যতকে কোনো 'ব্যাস', কোনো মার্কস ছক এঁকে রেখে দিতে পারে না। শেষ বা সম্পূর্ণ জ্ঞান বলে কিছুই হতে পারে না। সাম্যবাদীদের মধ্যে সাম্যবাদকে পৃথিবীর চরম উন্নতির শেষ সীমা বলে ভাববার একটা প্রবণতা আছে, বিরুদ্ধ তত্ত্ব সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞান সত্ত্বেও। সাম্যবাদের পরের আন্দোলন নৈরাজ্যবাদের অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাধীনতার হবে বলে অনেকে মনে করেন। তার চেহারা ঠিক কী দাঁড়াবে আজ বলা শক্ত।

যতক্ষণ কোনো মানুষ কোনো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য, বিশেষতঃ কোনো পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনে রত থাকে ততক্ষণ তার সম্পূর্ণ মনের সম্পূর্ণ সহজ বিকাশ সম্ভবপর হয় না। ততক্ষণ তার মনের সমস্ত দিকগুলির ঝোঁক পড়ে ঐ বিশেষ উদ্দেশ্যটির দিকে। সেই জন্য এমিয়েল বলেছেন, যখন কোনো মানুষ বিশেষ ভাবে কিছু করে না, তখনই তার ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ সহজ সুস্থ প্রকাশ ঘটে। সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠার পর সেই উদ্দেশ্যবাদের নিপীড়ন হতে মানুষ অন্ততঃ কিছুকালের জন্য কিছু পরিমাণে রেহাই পাবে। সাম্যবাদী বলেন, the state will wear out its own necessity. ষ্টেটের ব্যক্তিমনের উপরে প্রকোপটি কমলেই ব্যক্তিমন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে উঠবে। বুদ্ধি [illegible]

হতে শ্রেষ্ঠত্বদাবী করবার নীতিসমর্থিত উপায়। বুদ্ধি এবং কায়িক পরিশ্রম এই দুটির ভারসাম্য নেই বলে এবং এই দুটিকে সম্পূর্ণ দুই দলের লোকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে বলে দুটো মিলিয়ে যে মানবজীবন, সেই জীবনের অবনতি ঘটছে। যাঁরা বুদ্ধিজীবী তাঁদের কাছে জীবনের সমস্ত সহজ প্রক্রিয়া জগতের সঙ্গে সমস্ত সহজ সম্বন্ধই বুদ্ধির কোপে পড়ে কুটিল হয়ে উঠছে। মাটির সঙ্গে মানুষের যে সহজ যোগ তাকে দিচ্ছে বিনষ্ট করে। লরেন্স বলেছেন—we have even our sex in our heads. এখনকার সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী বলেই তিনি সাধারণ জীবন হতে, মাটির উষ্ণ স্পর্শ হতে এত দূরে। সেই জন্য তাঁর সাহিত্যে এত হতাশা, এত নকল আশা, এত কুটিলতার আত্মপ্রসাদ। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে দেহকে আরো সম্মান দিতে হবে। দেহ ও মনের ভারসাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

ভবিষ্যতের দিকে নানানদিক দিয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন এখনকার বহু সাহিত্যিক। জয়েস্, এলিয়ট ভবিষ্যৎ সাহিত্যের আঙ্গিকের দ্বার আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটন করেছেন। জয়েস্ অপেক্ষাও কাফ্‌কার নাম এখানে উল্লেখযোগ্য বেশী। কাফ্‌কার Sur-realism কাণ্ট ও আইনষ্টাইনের কাল ও স্থান সম্বন্ধে ধারণা[illegible] কিছু পরিমাণে সমর্থন করেছে। জয়েস সে ক্ষেত্রে [illegible]র মধ্যেই আটকা পড়েছেন। এখন Sur-realism রোমান্টিক বর্বরতা বলে বোধ হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে হবে না। লরেন্স ভবিষ্যৎ সাহিত্যের, সাধারণ জীবনের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে সহজ গভীর যোগস্থাপনের পথ দেখিয়েছেন। পৃথিবীর জীবনে স্বার্থের সঙ্ঘাত বিদূরিত হবার ফলে যে শান্তি আসবে ব্যক্তির স্বাধীনতা, চিন্তাধারার যে স্বাধীনতার সূচনা করবে, দেহ মনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা মানুষের অনেক কম্‌প্লেক্সকে বিতাড়িত করে, যে সুস্থ সবল মনের জন্ম দেবে, যে সহজ গতিশীলতা দেবে, তারই সবুজ মাটির ওপর দাঁড়াবে পৃথিবীর নতুন সাহিত্য। নিছক্ সাহিত্যের বিচার দিয়ে সাহিত্যের ভবিষ্যৎকে নির্দ্ধারিত করা যাবে, কিন্তু ভবিষ্যতের সাহিত্যকে নয়। ভবিষ্যতের সাহিত্য নির্ভর করবে ভবিষ্যতের জীবনের ওপর। দেশে দেশে পড়ন্ত প্রাচীর। কিন্তু পরজীবী পঙ্গপাল হাতুড়িতে পিষ্ট হবার পর, পড়ন্ত প্রাচীরের আবর্জ্জনা সরাবার পর যে সুস্থ অবকাশ, সেই অবকাশেই [illegible]

কেদার রাজা

(উপন্যাস)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎ কাঠের পুতুলের মত শুব্ধ হয়ে বসে রইল কতক্ষণ—এখন সে কি করবে? গড়শিবপুরের রাজবংশে সে কি অভিশাপ বহন করে এনেচে, তার বংশের নাম, বাবার নাম ডুবতে বসেচে আজ তার জন্যে।

মানুষ এত খারাপও হয়!

এই পল্লীগ্রামের বনে বনে হেমন্তকালের কত বনকুসুম, লম্বা লতার মাথায় থোবা থোবা মুকুল ধরেচে বন্য মাখম সিম ফুলের, শিউলির তলায় খই-ছড়ানো শুভ্র পুষ্পের সমারোহ, সুমুখ জ্যোৎস্না রাতের প্রথম প্রহরে ছাতিমবনের নিবিড়তায় চাঁদের আলোর জাল-বুনুনি। ছাতিম ফুলের সুবাস—এ সবের আড়ালে লুকিয়ে আছে প্রভাসের মত, বটুকের মত ভয়ানক প্রকৃতির লোক, যাদের অসাধ্য কাজ নেই, যাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই। এত কষ্ট দিয়েও ওদের মনোবাঞ্ছা মিটলো না? এত দিন পরে আবার এখানেও এসে জুটলো তার জীবনে আগুন জ্বালাতে?

আচ্ছা, সে কি করেচে যার জন্যে তার এত শাস্তি?

সে কি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কিছু করেচে? সে কি স্বেচ্ছায় কমলাদের পাপপুরীর মধ্যে ঢুকেছিল? হতে পারে সে নির্ব্বোধ, কিছু বুঝতে পারে নি, অত খারাপ কাউকে ভাবতে পারে নি বলেই তার মনে কোনো সন্দেহ জাগে নি, যখন সন্দেহ সত্যই জাগলো—তখন ওরা তো তাকে বেরুতে দিলে না। সে যদি সব কথা খুলে বলে গ্রামে, কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না।

প্রভাসের ও গিরিনের বদমাইসির কথা শুনে ওদের কেউ শাস্তি দেবে না? ভগবান সত্যের দিকে দাঁড়াবেন না?

না হয়—সে কালোপায়রা দীঘির জলে ডুবে মরে বাবার ও বংশের মুখ রক্ষা করবে। তা সে এখুনি করতে পারে—এই দণ্ডে।

শুধু পারে না বাবার মুখের দিকে চেয়ে।

আচ্ছা, সে শ্বশুরবাড়ী দু'দিনের জন্যে চলে যাবে? টুঙিমাজদে গ্রামে খুড়শাশুড়ীর আশ্রয়ে এখন থাকবে গিয়ে কিছুদিন? কার সঙ্গে পরামর্শ করা যায়? জ্যাঠা-মশায় বা বাবাকে এ সব কথা বলতে বাধে।

তার চেয়ে জলে ডুবে মরা সহজ।

সকলে মিলে অমন ভাবে তাকে যদি জ্বালাতন করে, বনের মেটে আলু, বুনো সিম-ভাতে-ভাত এক বেলা খেয়েও যদি শান্তিতে থাকতে না দেয় তবে মায়ের মুখে শোনা তারই বংশের কোন্ পুরোনো আমলের রাণীর মত—তারই কোন্ অতি-অতি-অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহীর মত নিজের মান বাঁচাবার জন্যে কালোপায়রা দীঘির শীতল জলের তলায় আশ্রয় নিয়ে সব জ্বালা জুড়ুতে হবে, যদি তাতে হতভাগারা শান্তিতে থাকতে দেয়!...চোখের জলে শরতের গালের দু' পাশ ভেসে গেল।

কতক্ষণ পড়ে তার যেন হুঁস হোলো—কত বেলা হয়েচে! রান্না চড়ানো হয় নি—বাবা জ্যাঠামশায় এসে ভাত চাইবেন এখুনি।

উঠে সে স্নান করে এল—তেল আগেই মেখে বসে ছিল। বটুক আসবার আগেই।

রান্না চড়িয়ে দিয়ে আবার সে ভাবতে বসলো। সব সময়েই ভাবচে, বটুক চলে যাবার পর থেকে। কত বার চোখের জল গড়িয়ে পড়েচে, কতবার আঁচল দিয়ে মুছেচে। কি সে করে এখন?

তার কি কেউ নেই সংসারে?

কেউ তার দিকে দাঁড়িয়ে, তার হয়ে দুটো কথা বলবে না? প্রভাস ও গিরিন যদি তার নামে কুৎসা রটিয়ে দেয় গ্রামে, তবে তাদের কথাই সবাই সত্য বলে মেনে নেবে? তার কথা কেউ শুনবে না?

এমন সময় কেদার ও গোপেশ্বর এসে পৌঁছে গেলেন। তাঁরা মুখুয্যে-বাড়ীর জামাই সোমশ্বরের কাছে নতুন রাগিণীর সন্ধানে গিয়েছিলেন, বোধ হয় খানিকটা কৃতকার্য্যও হয়েচেন, তাঁদের মুখ দেখলে সেটা বোঝা যায়।

গোপেশ্বর খেতে খেতে বললেন—গলাটা ভাল লোকটার।

—বেশ। ভৈরবীখানা গাইলে, বড় চমৎকার—অবরোহীতে একবার যেন ধৈবৎ ছুঁয়ে নামলো—

—না না। আমার কানে তো শুনলাম না। কোমল ধৈবৎ তো লাগবেই অবরোহীতে—

—সেটা আমার খুব ভাল জানা আছে—শুনবে? এই শোনো না—আচ্ছা খেয়ে উঠি। অবরোহীতে কোমল নিখাদ, তার পরেই কোমল ধৈবৎ আসচে। যেমন—

শরৎ বললে—বাবা খেয়ে নাও দিকি। এর পর ওর অনেক সময় পাবে।

—এটা কিসের চচ্চড়ি মা?

—মেটে আলু। রাজলক্ষ্মী আর আমি তুলে এনেছিলাম আজ ওই বনের দিকে থেকে—

—রাজলক্ষ্মী এসেছিল নাকি?

—কতক্ষণ ছিল। এই তো খানিকটা আগে গেল—

—ওর বিয়ের কথা শুনে এলাম কিনা—তাই বলচি—

—আমার সঙ্গে অত ভাব, ও চলে গেলে গাঁয়ের আর কেউ এদিক মাড়াবে না। ওকে একটা কিছু দিতে হবে বাবা—

—কি দিবি?

—তুমি বলো বাবা—

—আমি ও সব বুঝি নে। যা বলবি, কিনে এনে দেবো—ও সব মেয়েলি কাণ্ডকারখানার আমি কোনো খবর রাখি নে—

আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে দুজনে হাটে চলে গেলেন, আজ পাশের গ্রামের হাট। পূর্ব্বে হাট ছিল না, দুই জমিদারে বাদাবাদির ফলে আজ বছরখানেক নতুন হাট বসেচে। হাটের খাজনা লাগে না বলে কাপালীরা তরিতরকারি নিয়ে জমা হয়—সস্তায় বিক্রি করে।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহ শেষ হয়ে দ্বিতীয় সপ্তাহ পড়েচে। অথচ এবার শীত এখনও তেমন পড়ে নি। বাবা ও জ্যাঠামশায় চলে গেলে শরৎ রোদে পিঠ দিয়ে বসে আবার সেই একই কথা ভাবতে লাগলো।

গড়ের খাল পার হয়ে দেখা গেল রাজলক্ষ্মী আসচে। ওর জীবনে যদি কেউ সত্যিকার বন্ধু থাকে তবে সে এই রাজলক্ষ্মী, ও এলে যেন বাঁচা যায়, দিন কাটে ভাল।

রাজলক্ষ্মী আসতে আসতে বললে—আজ একটু শীত পড়েচে শরৎদি—না?

—আয় আয়, তোর কথাই ভাবচি—

—কেন?

—তুই চলে গেলে যেন সব ফাঁকা হয়ে যায়, আয় বোস্—

শরৎ ভাবছিল বটুকের কথাটা বলা উচিত হবে কি না। কিন্তু তা হোলে অনেক কথাই ওকে এখন বলতে হয়—রাজলক্ষ্মী তাকে কিছু যদি মনে করে সব শুনে? শরৎ তা হোলে মরে যাবে—জীবনের মধ্যে দুটিমাত্র বন্ধু সে পেয়েচে—অন্ধ রেণুকা আর এই রাজলক্ষ্মী। এদের কাউকে সে হারাতে প্রস্তুত নয়।

আর একটি মেয়ের কথা মনে হয়—হতভাগিনী কমলার কথা—কে জানে সেই পাপপুরীর মধ্যে কি ভাবে সে দিন কাটাচ্চে?

সরলা শরৎ জানতো না—পাপে যারা পাকা হয়ে গিয়েচে, তাদের পাপপুণ্য বলে জ্ঞান অল্প দিনেই তারা হারিয়ে ফেলে, পাপে ও বিলাসে মত্ত হয়ে বিবেক বিসর্জ্জন দেয়। কোনো অসুবিধাতে আছে বলে নিজেকে মনে করে না। পুণ্যের পথই কণ্টকসঙ্কুল, মহাদুঃখময়—পাপের পথে গ্যাসের আলো জ্বলে, বেলফুলের গড়ে মালা বিক্রি হয়, গোলাপ জলের ও এসেন্সের সুগন্ধ মন মাতিয়ে তোলে। এতটুকু ধুলো কাদা থাকে না পথে। ফুলের পাপড়ির মত কোঁচা পকেটে গুঁজে দিব্যি চলে যাও।

রাজলক্ষ্মী বললে—দিন ঘুনিয়ে এল তাই তো তোমায় ছাড়তে পারি নে—

—হুঁ—

—কি ভাবচো শরৎদি?

শরৎ চমক ভেঙে উঠে বললে—কই না—কিছু না। হ্যাঁ রে, তুই আশাদিদির বরের গান শুনেচিস্? খুব নাকি ভাল গায়। বাবা আর জ্যাঠামশায় সেখানে ধন্না দিয়ে পড়ে আছেন আজ ক'দিন থেকে। দিন দশেক থেকে দেখচি—

—ও। তাই শরৎদি! মুখুয্যে-বাড়ীর দিকে যেতে দেখেচি বটে ওঁদের আজ সকালে—

—রোজ সেখানে পড়ে আছেন দুজনে—কি সকাল, কি বিকেল—কেমন গান গায় রে লোকটা?

—হিন্দি-মিন্দি গায়—কি হা হা করে, হাত-পা নাড়ে, আমার ও ভাল লাগে না।

দুজনে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গল্প করলে, সন্ধ্যার আগে প্রতিদিনের মত রাজলক্ষ্মী চলে গেল, শরৎ এগিয়ে দিতে গেল। অল্প অল্প অন্ধকার হয়েচে, ভারি নির্জ্জন গড়বাড়ীর জঙ্গল। শরৎ ভয় পায় না একটুও, বরং এতকাল পরে তার বড় ভাল লাগে। এ সব জিনিস তার হারিয়ে গিয়েছিল, আবার সে ফিরে পেয়েচে। চিরদিনের গড়-বাড়ীর জঙ্গল তার পল্লব প্রচ্ছায় বীথিপথে কত কি বনপুষ্পের সুবাস ও বনবিহঙ্গের কলকাকলী নিয়ে বসে আছে, পিতৃপিতামহের পায়ের দাগ আজও যেন আঁকা আছে সে পথের ধুলোয়, মায়ের স্নিগ্ধ স্নেহদৃষ্টি কোন্ কোণে—সেখানে যেন লুকিয়ে আছে আজও—তাই তো মনে হয়, তার যদি কোনো পাপ হয়ে থাকে নিজের অজ্ঞাতে—সব কেটে গিয়েচে এখানে এসে, ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েচে।

রাজলক্ষ্মীর বিবাহে বেশি ধুমধাম হবে, না গ্রামের সকলকে ওরা বিবাহ-রাত্রে নিমন্ত্রণ করতে পারবে না বলে বেছে বেছে নিমন্ত্রণ করচে। কেদার ও গোপেশ্বর দুজনেই অবিশ্যি নিমন্ত্রিত—এ সব খবর কেদারই আনলেন।

শরৎ বললে—বাবা, ওর বিয়েতে কি একটা দেওয়া যায় বলো না—

—তুই যা বলবি, এনে দেবো।

—তুমি যা ভাল ভাবো, এনো।

—আমি তো তোকে বললাম, ও সব মেয়েলি ব্যাপারে আমি নেই—

—টাকা আছে?

—আড়তে চাকরী করার দরুণ টাকা তো খরচ হয় নি। সেগুলো আছে একজনের কাছে জমা। কত চাই বলে দে—

—আইবুড়ো ভাতের একখানা ভাল শাড়ী দাও আর এক জোড়া দুল—ও আমায় বড় ভালবাসে, আমার ছোট বোনের মত। আমার বড় সাধ—

—তা দেবো মা। কখনো তোর কাউকে কিছু হাতে করে দেওয়া হয় না—তুই হাতে করে দিয়ে আসিস্—হরি সেকরাকে আজই দুলের কথা বলে দিই—

বিবাহের দু-তিন দিন আগে কেদার শাড়ী ও দুল এনে দিলেন। শরৎ কাপড়ের পাড় পছন্দ না করাতে দুবার তাঁকে ও গোপেশ্বরকে ভাজনঘাটের বাজারে ছুটোছুটি করতে হোল। শরৎ নিজে ওদের বড়ী গিয়ে রাজলক্ষ্মীকে আইবড়ো ভাতের নিমন্ত্রণ করে এল। সকাল থেকে শাক, সুক্তুনি, ডালনা, ঘণ্ট অনেক কিছু রান্না করলে। গোপেশ্বর চাটুয্যে এ সব ব্যাপারে শরৎকে কুটনো কোটা ফাইফরমাস খাটা—নানা রকম সাহায্য করলেন।

শরৎ বললে—জ্যাঠাশমায়কে বড় খাটিয়ে নিচ্চি—

—তা নেও মা। আমি ইচ্ছে করে খাটি। আমার বড় ভাল লাগে—এ বাড়ী হয়ে গিয়েচে নিজের বাড়ীর মত। নিজে যা খুসি করি—

ইতিমধ্যে দুবার গোপেশ্বর চাটুয্যে চলে যাবার ঝোঁক ধরেছিলেন, দুবার শরৎ মহা আপত্তি তুলে সে প্রস্তাব না-মঞ্জুর করে।

শরৎ বললে—সেই জন্যেই তো বলি জ্যাঠামশায়, যত দিন বাঁচবেন, থাকুন এখানে। এখান থেকে যেতে দেবো না।

—সেই মায়াতেই তো যেতে পারি নে—সত্যি কথা বলতে গেলে যেতে ভালও লাগে না। সেখানে বৌমারা আছেন বটে, কিন্তু আমার দিকে তাকাবার লোক নেই মা—তার চেয়ে আমার পর ভাল—তুমি আমার কে মা? কিন্তু তুমি আমার যে সেবা যে যত্ন করো—তা কখনো নিজের লোকের কাছ থেকে পাই নি—বা রাজামশায় আমায় যে চোখে দেখেন—

শরৎ ধমকের সুরে বললে—ও সব কথা কেন জ্যাঠামশায় ? ওতে পর ক'রে দেওয়া হয়। সত্যিই তো আপনি পর নন ?

রাজলক্ষ্মী খেতে এল।

শরৎ বললে—দাঁড়া কাপড় ছাড়তে হবে—

রাজলক্ষ্মী বিস্ময়ের সুরে বললে—কেন শরৎদি ?

—কারণ আছে। ঘরের মধ্যে চল্—

পরে কাগজের ভাঁজ খুলে শাড়ী দেখিয়ে বললে—পর এখানা—পছন্দ হয়েচে ?—তোর কান মলে দেবো—কান নিয়ে আয় এ দিকে—দেখি—

—দুল ? এ সব কি করেচ শরৎদি ?

—কি করলাম। ছোট বোনকে দেবো না ? সাধ হয় না ?

রাজলক্ষ্মী গরীবের মেয়ে, তাকে এমন জিনিস কেউ কোনোদিন দেয় নি। সে অবাক হয়ে বললে—এই সব জিনিস আমায় দিলে শরৎদি। সোনার দুল—

শরৎ ধমক দিয়ে বললে—চুপ। বলি নি আমাদের রাজারাজড়ার কাণ্ড, হাত বাড়ালে পর্ব্বত—

রাজলক্ষ্মীর চোখের জল গড়িয়ে পড়লো। নীরবে সে শরতের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে। বললে—তা আজ দিলে কেন ? বুঝেচি শরৎদি—তুমি যাবে না বিয়ের রাতে।

—যাবো না কেন—তা যাবো—তবে পাড়াগাঁ জায়গা বুঝিস তো—

—তোমার মত মানুষ আমার বিয়েতে গিয়ে দাঁড়ালে আমার অকল্যাণ হবে না শরৎদি। এ তোমায় ভাল করেই জানিয়ে দিচ্ছি, তুমি না গেলে আমার মনে বড্ড কষ্ট হবে। আর তুমি গেলে যদি অকল্যাণ হয়, তবে আমার অকল্যাণই সই—

—ছিঃ ছিঃ—ও সব কথা বলতে নেই মুখে—আয়, চল্ রান্নাঘরে—কেমন গোটা দিয়ে সুক্তুনি রেঁধেচি খেয়ে বলবি চল্—

বিকেলের দিকে শরৎ পুকুর থেকে গা ধুয়ে বাড়ী গিয়ে দেখলে রান্নাঘরের দাওয়ায় ইটচাপা একখানা কাগজের কোণ বেরিয়ে রয়েচে। একটু অবাক হয়ে কাগজটা টেনে [illegible] লেখা আছে :—

"আজ সন্ধ্যার পরে রাণীদীঘির পাড়ে ডুমুর তলায় আমাদের সঙ্গে দেখা করিবা। নতুবা কলিকাতায় কি হইয়াছিল প্রকাশ করিয়া দিব। হেনাবিবি আমাদের সঙ্গে আছে ভাজনঘাটের কুঠীর বাংলায়। সেও তোমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। দেখা করিলে তোমার ভাল হইবে। এ চিঠির কথা কাহাকেও বলিও না। বলিলে যাহা হইবে দেখিতেই পাইবে। সাবধান।"

শরৎ টলে পড়ে যেতে যেতে কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিলে। মাথাটা যেন ঘুরে উঠলো। আবার সেই হেনাবিবি, সেই পাপপুরীর কথা—যা মনে করলে শরতের গা ঘিন্ ঘিন্ করে! এ চিঠিখানা ছুঁয়েচে, তাতেই তাকে নাইতে হবে এই অবেলায়।

এরা তাকে রেহাই দেবে না ? তাদের গড়বাড়ীতে কলকাতার লোকের জোর কিসের ?

সব সমস্যার সে সমাধান করে দিতে পারে এখুনি, এই মুহূর্ত্তেই, কালোপায়রা দীঘির অতল জলতলে।

কিন্তু বাবার মুখের অসহায় ভাব মনে এসে তাকে দুর্ব্বল করে দেয়। নইলে সে প্রভাসেরও ধার ধারতো না, গিরিনেরও না। নিজের পথ করে নিতো নিজেই। তাদেরই বংশের কোন রাণী ঐ দীঘির জলে আত্মবিসর্জ্জন দিয়েছিলেন মান বাঁচাতে। সেও ঐ বংশেরই মেয়ে। ঠাকুরমারা যা করেছিলেন, সে তা পারে।

বাবাকে এ চিঠি দেখাবে না। বাবার ওপর মায়া হয়, দিব্যি গানবাজনা নিয়ে আছেন, ব্যস্ত হয়ে উঠবেন এখুনি। গোপেশ্বর জ্যাঠামশায়কে দেখাতে লজ্জা করে। থাকৃগে, আজ সে এখুনি রাজলক্ষ্মীদের বাড়ী গিয়ে কাটিয়ে আসবে অনেক রাত পর্য্যন্ত। উত্তরদেউলে পিদিম আজ সকাল সকাল দেখাবে।

রাজলক্ষ্মীর মা ওকে দেখে বললেন—এসো এসো মা—শরৎ, আচ্ছা পাগলী মেয়ে, অত পয়সাকড়ি খরচ করে রাজিকে দুল আর শাড়ী না দিলে চলতো না ?

রাজলক্ষ্মীর কাকীমা বললেন—গরীবের ওপর ওদের চিরকাল দয়া অমনি—কত বড় বংশ দেখতে হবে তো, বংশের নজর যাবে কোথায় দিদি ?

শরৎ সলজ্জ সুরে বললে—ও সব কথা কেন খুড়ীমা ?

ক এমন জিনিস দিয়েচি—কিছু না—ভারি তো জিনিস—রাজি কোথায় ?

রাজলক্ষ্মীর মা বললেন—এই এতক্ষণ তোমার কথাই বলছিল, তোমার দেওয়া কাপড় আর দুল দেখতে চেয়েচেন গাঙ্গুলিদের বড়বৌ, তাই নিয়ে গিয়েচে দেখাতে। শরৎদি বলতে মেয়ে অজ্ঞান, তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলে, মা—শরৎদি'কে ছেড়ে কোথায় গিয়ে সুখ পাবো না। বসো, এলো বলে—

একটু পরে গাঙ্গুলি বৌকে সঙ্গে নিয়ে রাজলক্ষ্মী ফিরলো, সঙ্গে জগন্নাথ চাটুয্যের পুত্রবধূ নীরদা। নীরদা শরতের চেয়ে ছোট, শ্যামবর্ণ, একহারা গড়নের মেয়ে, খুব শান্ত প্রকৃতির বৌ বলে গাঁয়ে তার সুখ্যাতি আছে।

গাঙ্গুলি-বৌ বললেন—এই যে মা-শরৎ তোমার কথাই হচ্ছিল। তুমি যে শাড়ী দিয়েচ, দেখতে নিয়েছিলাম—ক' টাকা নিলে ? ভাজনঘাটের বাজার থেকে আনানো ? বট্‌ঠাকুর কিনেচেন বুঝি ?

শরৎ বললে—দাম জানিনে খুড়ীমা, বাবা ভাজনঘাট থেকেই এনেচেন। দুবার ফিরিয়ে দিয়ে তবে ঐ পাড় পছন্দ—

নীরদা বললে—দিদির পছন্দ আছে। চলুন দিদি, ও ঘরে একটু তাস খেলি আপনি আমি রাজলক্ষ্মী আর ছোট খুড়ীমা—

রাজলক্ষ্মীর মা শরৎকে পাশের ঘরে নিয়ে বললেন—মা, কাল তুমি আসতে পারো আর না পারো আজ সন্দের পর এখান থেকে দুখানা লুচি খেয়ে যেও—রাজলক্ষ্মী আমায় বার বার করে বলেচে—

সবাই মিলে আমোদ স্ফূর্তিতে অনেকক্ষণ কাটলো—বেলা পড়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বিয়ে বাড়ীর ভিড়, গ্রামের অনেক ঝি-বৌ সেজেগুজে বিকেলের দিকে বেড়িয়ে দেখতে এল। মুখুয্যে-বাড়ীর মেজবৌ পেতলের রেকাবে ছিরি গড়িয়ে নিয়ে এলেন। রাজলক্ষ্মীর মা বললেন—বরণ-পিঁড়ির আলপনাখানা তুমি দিয়ে দ্যাও দিদি—তুমি ভিন্ন এ সব কাজ হবে না—এক হৈম-দিদি আর তুমি—তারকের মা তো স্বর্গে গেছেন—আলপনা দেবার মানুষ আর নেই পাড়ায়—তারকের মা কি আলপনাই দিতেন!

শরৎ বললে—বাবাকে একটু খবর দিন খুড়ীমা কালীকান্ত কাকার চণ্ডীমণ্ডপে গানের আড্ডায় আছেন। যাবার সময় আমাকে যেন সঙ্গে নিয়ে যান এখান থেকে। অন্ধকার রাত, ভয় করে একা থাকতে।

পরদিন সকাল আটটার সময় শরৎকে আবার রাজলক্ষ্মীদের বাড়ী থেকে ডাকতে এল। নিরামিষ দিকের রান্না তাকে রাঁধতে হবে, গাঙ্গুলিদের বড়বৌয়ের জ্বর কাল রাত্রি থেকে। তিনিই রান্না করে থাকেন পাড়ার ক্রিয়াকর্ম্মে।

রাজলক্ষ্মী প্রায়ই রান্নাঘরে এসে শরতের কাছে বসে রইল।

শরৎ ধমক দিয়ে বলে—যা রাজি, দধিমঙ্গলের পরে হটর্‌ হটর্‌ করে বেড়ায় না। এখানে ধোঁয়া লাগবে চোখে মুখে—অন্য ঘরে বসগে যা—

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে—কারো ধমকে ভয় খাইনে। এই বসলাম পিঁড়ি পেতে—দেখি তুমি কি করো।

নীরদা এসে বললে—শরৎ-দি, একটা অর্থ বলে দাও তো ?

আকাশ গম গম পাথর ঘাটা
সাতশো ডালে দুটি পাতা—

শরৎ তাকে খুন্তি উঁচিয়ে মারতে গিয়ে বললে—ননদের কাছে চালাকি—না? দশ বছরের খুকিদের ও সব জিগ্যেস্ করগে যা ছুঁড়ি—

গরীবের বিয়ে-বাড়ী, ধূমধাম নেই, হাঙ্গামা আছে। সব পাড়ার বৌঝি ভেঙে পড়লো সেজেগুজে। প্রথম প্রহরের প্রথম লগ্নে বিবাহ। শরৎ সারাদিন খাটুনির পরে বিকেলের দিকে নীরোদাকে বললে—গা হাত পা ধুয়ে আসবো এখন। বাড়ী যাই—কাউকে বলিস্ নে—

বাড়ী ফিরে সে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাতে গেল। শীতের বেলা অনেকক্ষণ পড়ে গিয়েচে, রাঙা রোদ উঠে গিয়েচে ছাতিমবনের মাথায়, ঈষৎ নীলাভ সাদা রঙের পুঞ্জ পুঞ্জ ছোট এড়াঞ্চির ফুল শীতের দিনে এই সব বন-ঝোপকে এক নির্জ্জন, ছন্নছাড়া মূর্ত্তি দান করেচে। শুকনো বাদুড়-

নখী ফল তাদের বাঁকানো নখ দিয়ে কাপড় টেনে ধরে। থমথমে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর অন্ধকার রাত্রি।

এক জায়গায় গিয়ে হঠাৎ সে ভয়ে ও বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। একটি লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে উত্তর-দেউলের পথ থেকে সামান্য দূরে বাদুড়নখীর জঙ্গলের মধ্যে। শরৎ কাছে দেখতে গিয়ে চমকে উঠলো—কলকাতার সেই গিরিনবাবু!

মরে কাঠ হয়ে গিয়েচে অনেকক্ষণ। ওর ঘাড়টা যেন শক্ত হাতে কে মুচড়ে দিয়েচে পিঠের দিকে, সেই মুণ্ডুটা ধড়ের সঙ্গে এক অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেচে। গিরিনের দেহটা যেখানে পড়ে, তার পাশেই মাটিতে ভারি ভারি গোল গোল কিসের দাগ, হাতীর পায়ের দাগের মত।...শরতের মাথা ঘুরে উঠলো, সে চীৎকার করে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে গেল। হাত থেকে সন্ধ্যাপ্রদীপ ছিট্‌কে পড়লো বাদুড়নখীর জঙ্গলে।

* * * *

এই অবস্থায় অনেক রাত্রে কেদার ও গোপেশ্বর তাকে বিয়ে বাড়ী থেকে ডাকতে এসে দেখতে পেলেন। ধরাধরি করে তাকে নিয়ে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হোল।

লোকজনের হৈ হৈ হোল পরদিন। পুলিশ এল, রাণীদীঘির জঙ্গলে এক চালকবিহীন মোটর গাড়ী পাওয়া গেল। কি ব্যাপার কেউ বুঝতে পারলে না। সবাই বললে, গড়বাড়ীর সবাই সারা রাত বিয়ে বাড়ীতে ছিল। মৃতদেহের ঘাড়ে শক্ত, কঠিন পাঁচটা আঙুলের দাগ যেন লোহার আঙুলের দাগের মত ঘাড়ের মাংস কেটে বসে গিয়েচে। গোল গোল হাতীর পায়ের মত দাগগুলোই বা কিসের কেউ বুঝতে পারলে না।

* * * *

গড়ের জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকচে। সন্ধ্যাবেলা। কেদার ঘোর নাস্তিক, কি মনে করে তিনি হস্তপদভগ্ন বারাহী দেবীর পাষাণ মূর্ত্তির কাছে মাথা নীচু করে দণ্ডবৎ করে বললেন—গড়ের রাজবাড়ী যখন সত্যিকার রাজবাড়ী ছিল, তখন শুনেচি তুমি আমাদের বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলে। আমাদের অবস্থা পড়ে গিয়েচে, অনেক অপরাধ করেছি তোমার কাছে, কিন্তু তুমি আমাদের ভোল নি। এমনি পায়ে রেখো চিরকাল মা—অনেক পূজো আগে খেয়েচ সে কথা ভুলে যেও না যেন।

সমাপ্ত

বর্ত্তমান চীন-যুদ্ধের পূর্ব্বাধ্যায়

শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায়

ওয়াংপাওসান ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন হইতে মাঞ্চুরিয়াতে পুরাদমে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া ১৯৩২ খৃঃ ২৪শে সেপ্টেম্বর মাঞ্চুরিয়া নূতন মাঞ্চুকুয়ো ষ্টেটে পরিণত হইয়া গেল। এই ব্যাপারে জাপানের কূটনৈতিক চাল লক্ষ্য করিবার বিষয়। পরবর্ত্তী কালে ইটালীর আবিসিনিয়া বিজয়ের সময় মুসোলিনী যে ভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন, জাপানও প্রায় সেই উপায়েই রাষ্ট্রসঙ্ঘকে ফাঁকি দিয়া কার্য্য হাসিল করিয়া নিয়াছিল। সেই ঘটনা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ১৯৩১ খৃঃ ২৪শে সেপ্টেম্বর জাপান রাষ্ট্রসঙ্ঘকে জানাইয়াছিল যে, তাহার বেশীর ভাগ সৈন্যই রেল-লাইনের এলাকায় সরিয়া আসিয়াছে এবং বাকী সৈন্যও অনতিবিলম্বেই সরিয়া আসিবে। অথচ সেই দিনই জাপান সেই এলাকা হইতে প্রায় ১২৫ মাইল দূরবর্ত্তী টুংলিয়াও (Tungliao) নামক স্থান আক্রমণ করে। কৌপণ্টেজে (Kaupantze) এবং চিনচাও (Chinchow) নামক দুইটি স্থানেও তাহারা বোমা নিক্ষেপ করে। এই দুইটি স্থানও দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া রেলপথের এলাকা হইতে যথেষ্ট দূরে অবস্থিত। চাংচুন (Changchun) নামক আরও একটি স্থান দখল হইয়া যাইবার কয়েক দিন পর জাপানী গবর্ণমেণ্ট একটি বিবৃতিতে সেই স্থানে কোন সৈন্য প্রেরণ করিবার কথা অস্বীকার করেন। এই সময় জাপান রাষ্ট্রসঙ্ঘকে আরও

জানাইয়াছিল যে, সে সাপেংকাই-চেনচিয়াটাং রেলপথ Ssapengkai-Chenchiatung Railway) দখল করিবে া এবং ৩০শে সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভায় জাপানের এই প্রতিশ্রুতির কথা আলোচিত ও গৃহীত হয়। কিন্তু এ দিকে জাপানের অগ্রগতি পূর্ব্ব পরিকল্পনার পথেই চলিতেছিল এবং ক্রমশঃ চীনের ভূ-সম্পত্তি নিজের অধীনে আনিতেছিল। এই সকল ব্যাপারে জাপানকে তাহার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইলে সে চীনের সৈন্যদের অগ্রগতির দোহাই দিয়া অবাধে চলিতে থাকে। এ দিকে চীন রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দ্দেশ মানিয়া ক্রমেই সরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু জাপান অনবরত তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া চলিতেছিল। জাপানের এবম্বিধ কার্য্য যে ন্যায়সঙ্গত হয় নাই তাহা পরবর্ত্তী সময়ে লিটন-রিপোর্টেও প্রকাশিত হইয়াছে। চীন যে বিশেষ কোন যুদ্ধ করে নাই তাহা লোকক্ষয়ের আনুপাতিক হিসাব হইতেই কতকটা বুঝিতে পারা যায়। লোকক্ষয়ের ব্যাপারে চীনের ক্ষতি জাপানের তুলনায় খুবই অসাধারণ। ১৮ই সেপ্টেম্বর পুরাপুরি যুদ্ধ বাধিবার সময় হইতে যুদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের মোট ৯২৬ জন নিহত হইয়াছে এবং সাংহাই সহরে ঊনবিংশতি রুট আর্ম্মীর (19th Route Army) প্রতিক্রিয়ার ফলে সেখানে জাপানের ৬৫১ জন সৈন্য নিহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। চীনের সৈন্য নিহত হইয়াছে ২০,২১৫ জন, ভলাণ্টিয়ার ২৫,৬১৮ জন এবং সাধারণ অধিবাসী ১২,৯৩৬ জন এবং পুলিশ নিহত হইয়াছে ৩৯০ জন। মোট নিহতের সংখ্যা—

চীনের—৫৮,২৪৮ জন

জাপানের—১,৬৫০ জন মাত্র।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিলে চীন জাপানের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে পারিত এবং রাশিয়ার সহায়তাও হয়ত পাইত। কারণ, মাঞ্চুরিয়াতে রাশিয়ার স্বার্থও জাপানের স্বার্থের অপেক্ষা কম ছিল না। কাজেই এ কথা বলা চলে যে, চীনের ব্যাপারেই রাষ্ট্র-সঙ্ঘের দুর্ব্বলতা প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এইরূপ দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া হয়ত পরবর্ত্তী কালে ইটালী আবিসিনিয়াকে ঘায়েল করিতে সাহস পাইয়াছিল।

এই বিজয়ে জাপানের সাম্রাজ্য-পিপাসা কিন্তু আরও বাড়িয়া গেল—মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়াও জাপানের পিপাসা চরিতার্থ হইল না। সাম্রাজ্যবাদকে দৃঢ় করিবার জন্য তাহারা 'কোডো' (Kodo) বাদের প্রচারে লাগিয়া গেল। এই কোডো 'সিণ্টোবাদে'রই অংশবিশেষ এবং সিণ্টোকে যে ভাবে দেবমার্গ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, কোডোকে সেই ভাবে রাজমার্গ (The way of the Emperor) বলা চলে। তাহারা দেবতার জাতি, তাহাদের সম্রাট দেবতার বংশধর, কাজেই পৃথিবীতে তাহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি। অন্য কোন জাতির প্রাধান্য তাহারা মানিতে রাজী নয়। দেবপ্রতিম সম্রাটের জন্য তাহারা যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া অধিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে। ইহাই হইল এই নবপ্রবর্ত্তিত 'কোডো-বাদে'র সার মর্ম্ম।

মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধের অল্পকাল পরই জেনারেল আরাকী স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন—"চীনের মারফতে আমদানী পাশ্চাত্য বিকৃত বস্তুতান্ত্রিকতা জাপানের জাতীয় সত্তা ও নৈতিক আদর্শ বিকৃত করিয়া দিয়াছে। জাপানীরা খুন-খারাবিকে ভয় করে না—ন্যায়ের জন্য তাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত নয়।" তিনি আরও বলিয়া-ছিলেন, "যে আদর্শের উপর এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক জাপানী যদি সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহা হইলে জগতে এমন সময় আসিবে যখন প্রত্যেক জাতিই আমাদের 'কোডো'র প্রতি চাহিয়া থাকিকে বাধ্য হইবে। আমাদের 'কোডো'—আমাদের জাতীয় আদর্শ এমনই জিনিষ যে, প্রয়োজন হইলে অসির সাহায্যেও সমস্ত বাধাবিঘ্নের নিরসন করিয়া ইহাকে সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। প্রাচ্যের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ? ত্রিশ কোটি লোকের বাসস্থান ভারতবর্ষ বৃটেনের অত্যাচারে শাসিত হইতেছে, মধ্য-এশিয়া ও সাইবেরিয়ার সমতল ভূমিতে স্বাধীনতার বিন্দুমাত্রও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, শান্তিপ্রিয় মঙ্গোলিয়া দ্বিতীয় মধ্য-এশিয়ায় রূপান্তরিত হইয়াছে—সুদূর প্রাচ্যের দেশসমূহ শ্বেত-জাতির নির্য্যাতনের আবাসস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু জাগ্রত জাপান তাহাদের হাতে কোনরূপ উৎপীড়ন বা

নির্য্যাতন সহ্য করিতে পারে না। যত বড় শক্তিই হউক না কেন, আমাদের কোডোর বিরোধী হইলে আমাদের সম্রাটের দেশের পক্ষে তাহা দৃঢ়তার সহিত দমন করিতে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। * * পূর্ব্ব-সাগরে ঐশ্বরিক দেশ হিসাবে এবং এশিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে জাপানের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও খুব বেশী ও দায়িত্বও খুব গুরুতর। বন্দুকের প্রত্যেকটি গুলি কোডোর আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত—বেয়োনেটের প্রত্যেকটি অগ্রভাগ জাতীয় মহত্বে সমৃদ্ধ থাকিবে।"

[What is the present state of the East? India with its population of 300,000,000 lives in dire misery under Britain's oppressive rule. There is not a vestige of liberty left in the fertile plains of Central Asia and Siberia. Mongolia, that land of peace, has become a second Central Asia. The Countries of the Far East are the object of pressure on the part of the white races. But awakened Japan can no longer tolerate further tyranny and oppression at their hands. It is the duty of the Emperor's Country to oppose, with determination, the actions of any power, however strong if they are not in accord with Kodo. * * As a divine Country in the Eastern Seas and the senior nation of Asia, Japan's aspirations are great and her responsibility is heavy. Each single shot must be impregnated with Kodo and the point of every bayonet tempered with the national virtue."]

ঠিক এই সময় নাকানো নামক জনৈক ব্যক্তি "জাপানের মনরো আদর্শ ও বিশেষ অধিকারে"র উপর পাশ্চাত্যদের আক্রমণের কথাও প্রচার করিতে কসুর করিলেন না। তিনি আরও বলিলেন, "জাপান যখন বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তখন সুদূর প্রাচ্যে তাহার এমন ভাবে অবস্থান করা উচিত যাহাতে সম্ভাবিত সকল শত্রুরই সে সম্মুখীন হইতে পারে। তাহা হইলে অন্যান্য জাতি জাপানকে সমীহ করিয়া চলিবে এবং জাপান সম্বন্ধে তাহাদের ধারণার পরিবর্ত্তন হইবে। উত্তর-মাঞ্চুরিয়া যখন জাপানের হাতে চলিয়া আসিয়াছে, এবং সেই সীমান্ত যখন জাপানী সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত তখন সেখানে রাশিয়ার প্রভাব একেবারেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন যখন বৃটেনের পক্ষে কিছু করাও অসুবিধাজনক এবং রাশিয়াও যখন চাপ দিতে অক্ষম তখন আমেরিকাও একা জাপানের প্রতিকূলতা করিতে ভরসা পাইবে না।"

এইরূপ ভাবধারায় সাম্রাজ্যবাদ আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এ দিকে ইউরোপের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চেও নূতন অভিনয়ের সমাবেশ হইতেছিল। জার্ম্মানী ও ফ্রান্সের অবস্থা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছিল এবং রাশিয়াও ছিল আভ্যন্তরিক গোলযোগে বিপর্য্যস্ত। ইউরোপে এই সময় শান্তি বৈঠক, অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ বৈঠক হইল—কিন্তু ফল কিছুই হইল না। সমর-দেবতা ক্রমশই সেখানে প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন এবং শেষকালে ইটালীর আবিসিনিয়া আক্রমণে ও জার্ম্মানীর অসামরিক অঞ্চল রাইনল্যাণ্ড পুনরধিকারের ফলে ও সময় যুদ্ধের ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল। জাপান কিন্তু এত দিন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না—সেও পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। বিমান-বহর ও নৌ-বহরের পুনর্গঠন করিয়া জাপান প্রায় প্রস্তুত হইয়া পড়িল এবং এই প্রস্তুত হইবার কারণ সম্বন্ধে প্রচার করিতে আরম্ভ করিল যে, "প্রাচ্যের একমাত্র শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে তাহার একটা মস্ত বড় দায়িত্ব আছে—এই দায়িত্ব ৮০ কোটি এশিয়াবাসীকে শ্বেত-জাতীয় দাসত্ব হইতে মুক্ত করা।"

মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধের অল্পকাল পর হইতে কিন্তু ইউরোপের অবস্থা জটিল হইয়া উঠিতেছিল এবং জাপান প্রস্তুত হইবার অনুকূলে সেই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৩৩ খৃঃ হইতেই ইউরোপের অবস্থা জটিলতর হইয়া উঠিতেছিল। ঐ বৎসর এক দিকে হিটলার যেমন জার্ম্মানীতে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন অন্যদিকে ফ্রান্সে ষ্টাভিস্কি হাঙ্গামার (Stavisky Riot) ফলে উর্দ্ধতন রাজপুরুষদের মধ্যে অনাচার (Corruption) পরিস্ফুট হইবার পর হইতে সেখানেও স্থায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছিল না। ১৯৩৮ খৃঃ পর্য্যন্ত সেখানে স্বল্পকাল স্থায়ী গবর্ণমেণ্ট কার্য্য করিতেছিল, ফলে দেশে দলাদলির অন্ত ছিল না। এ দিকে জার্ম্মানী বাধ্যতামূলক সামরিক-শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল এবং ১৯৩৫ খৃঃ তাহার অসীম বিমান-বলের কথা প্রকাশিত হইবার পর হইতেই সমস্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যেই সামরিক শক্তিবৃদ্ধির যেন প্রতিযোগিতা পড়িয়া যায়। তৎপর ১৯৩৬ খৃঃ জার্ম্মানী রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করিয়া ও রাইনল্যাণ্ড পুনরধিকার করিয়া পরিস্থিতি আরও জটিল করিয়া তুলে। কিন্তু ১৯৩৫ সালেই ইউরোপে সমর-

দেবতার নৃত্য আরম্ভ হইয়া যায়—ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করে ও বৎসর-খানেকের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৩৬ সালেই তাহা নিজ অধিকারে আনিতে সমর্থ হয়। এই সময় হইতেই ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতেছিল—ইটালীর উপর রাষ্ট্রসঙ্ঘের নানারূপ অর্থনৈতিক চাপ ব্যর্থ হওয়ায় তাহারা নিরুপায় হইল। ইহার পরই ১৯৩৬ সালে স্পেনে গৃহবিবাদ আরম্ভ হয় এবং ইটালী ও জার্ম্মানীর সহযোগিতায় ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত যুদ্ধের পর জেনারেল ফ্রাঙ্কো জয়ী হইলেন। এই সময় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট স্পেনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ-নিরোধ কমিটি (Non-Intervention Committee) গঠন করিয়া দুর্ব্বলতার পরিচয় দেন এবং এই দুর্ব্বলতার সুযোগে চক্রশক্তি ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিল। এই স্থানে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, জার্ম্মানী ইটালীর সহিত মিত্রতা করিয়া ইতিমধ্যেই কমিউনিষ্ট-বিরোধী একটি চক্রশক্তি গঠন করিয়াছিল এবং এই চক্রশক্তিতে পরবর্ত্তী কালে জাপানও যোগদান করে। তখন হইতেই হিটলারের নানারূপ দাবী উত্থাপিত হইতে থাকে এবং ইউরোপের বড় বড় রাষ্ট্র তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সচেষ্ট হন। জাপান এই সুযোগ ব্যর্থ হইয়া যাইতে দিল না। সমগ্র চীন দখল করা এখনও তাহাদের বাকী, রাশিয়ার বিরুদ্ধে বৈরীভাব থাকাও তাহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক এবং সে যে ক্রমেই সুদূর প্রাচ্যে "মনরো-নীতি" অবলম্বন করিতেছিল তাহারও আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে চীনকে গ্রাস করাই সে প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিল। চীনের অগাধ সম্পদ হাতে আনিতে পারিলে তাহার যে ক্ষমতা অসীম হইয়া দাঁড়াইবে সে ধারণা তাহার ছিল। কাজেই পাশ্চাত্য শক্তিগুলির সঙ্গে তাল ঠুকিতে হইলে এই সম্পদ তাহাকে এই সুযোগে অধিকার করিতেই হইবে—ইহাই হইল তখনকার জাপানের মনোভাব।

এই মনোভাবের উপর তাহারা চীনে নানারূপ গোপন ও ষড়যন্ত্রমূলক জাল বিস্তার করিয়া অবশেষে ১৯৩৭ সালের শেষের দিকে ওয়াংপিং ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। এই ওয়াংপিং ঘটনাও ওয়াংপাওসান ঘটনার মতই একটি নগণ্য ব্যাপার এবং এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া এত বড় একটা যুদ্ধ বাধিতে পারে, সাধারণ অবস্থায় ইহা বিশ্বাস করিতেও দ্বিধা বোধ হয়। ঘটনাটি এইরূপ: জাপানের রক্ষীদল ৮ই জুলাই রাত্রিকালে স্থান পরিবর্ত্তন করিবার সময় কতিপয় সৈনিককে হারাইয়া ফেলে। এই সৈনিক হারাইয়া যাওয়ার ব্যাপারটাও একটি আশ্চর্য্য রকমের। কারণ তাহারা জীবন্ত মানুষ এবং সেই অঞ্চলের রক্ষী। কাজেই পথঘাট তাহাদের সুবিদিত ছিল, এরূপ অনুমান করা চলে। তাহা ছাড়া, তাহারা আবার সৈনিক—সশস্ত্র মানুষ। কাজেই এ হেন লোকদিগকে গোপনে চুরি করিয়া নেওয়া খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার। কিন্তু জাপানীরা মনে করিল যে, তাহাদিগকে চীনেদের শিবিরে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। এই ধারণায় তাহারা সদলবলে সেই সকল লোককে সন্ধান করিতে বাহির হইয়া চীনের কতিপয় শিবির খানাতল্লাস করিতে চেষ্টা করে। চীনের সৈন্যগণ তাহাদিগকে সেখানে প্রবেশ করিতে দেয় নাই—কিন্তু জাপানীরা জোর করিয়াই সেখানে প্রবেশ করে। ফলে অল্পবিস্তর ধস্তাধস্তি হয়—কিছু গোলাগুলীও চলিয়াছিল, তাহার পর চলিয়াছিল লিপি-বিনিময়, ক্ষমা-প্রার্থনার দাবী, এবং তাহার পরই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল।

এই ব্যাপারটিও হয়ত আপোষেই মিটিতে পারিত, কিন্তু সে ভাবে মিটান জাপানের উদ্দেশ্য ছিল না। জাপান সকল সময়ই চীনের সঙ্গে বিরোধ বাধাইবার সুযোগ খুঁজিতেছিল এবং চীনে জাপানের যে সকল প্রতিষ্ঠান সামুরাই দল ও সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগিতায় গুপ্ত ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছিল, এই ব্যাপারে তাহাদের কারসাজি থাকা অস্বাভাবিক নয়। কারণ এই সকল প্রতিষ্ঠান সামরিক প্রভুদের যথেচ্ছাচারের সুযোগ-সুবিধা করিয়া দিত তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; এবং জাপান যে এই সময় এইরূপ একটি সুযোগই খুঁজিতেছিল, তাহা তাহার তদানীন্তন পরিস্থিতি হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

অনেকে এই ব্যাপারটিকে জাপানের আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রের গোলমাল মিটাইবার একটা ফন্দী বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। কারণ জাপানের আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রে এই সময় সামরিক ও অসামরিক দলগুলির মধ্যে ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার জন্য একটা প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। ১৯৩৬ সালে দুই দলের মধ্যে একটা চরম বিবাদও হইয়া গিয়াছিল। জাপানে এই ক্ষমতা লইয়া রেষারেষির ফলে সেখানকার মন্ত্রিমণ্ডলীকে কিরূপ বিপদের মধ্যে কাজ করিতে হইত তাহা নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। সম্রাট নিজে তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর জীবন রক্ষার জন্য কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে নির্দ্দেশ দেন এবং ফলে সেখানে অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর একটি হত্যাপ্রতিশেধক গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ১৯৩৭ সালে এক সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কনোয়ের এই গৃহ দূর হইতে কিন্তু অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় না। ইহা একটি আড়ম্বরহীন ধনীগৃহ বলিয়াই মনে হয়। এই অতি বৃহৎ প্রাসাদকে দূর হইতে কিন্তু শূন্য আবাসের মতই মনে হয়—শুধু মাত্র কয়েকটি পর্দ্দা ও সুসজ্জিত চীনে মাটির কয়েকটি ফুলদানিই বাহির হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা সামরিক, শিল্প ও বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকল প্রকার নৈপুণ্যের সমন্বয়ে নির্ম্মিত। সমস্ত মহলটি গোপন রাস্তা, পরিবর্ত্তনশীল প্রাচীর, স্প্রিং-এর বন্দুক এবং দুর্দ্ধর্ষ ফাঁদ দ্বারা পরিবেষ্টিত—এই সকল ফাঁদ আততায়ীদিগের পায়ে লাগিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। একটি বোতাম টিপিলে কিংবা হাতল ঘুরাইলে এই সুদর্শন কক্ষ নিঃশব্দে রূপান্তরিত হইয়া লৌহশলাকাময় এক অন্ধকার কক্ষে পরিণত হইয়া যাইবে এবং আততায়ী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে। প্রিন্স কনোয়ের নিজের শয়নগৃহ, পরিচ্ছদ-কক্ষ ও স্নানাগার বোমা-প্রতিশেধক। ক্রোম-ষ্টীলের বিভাগপ্রাচীর প্রধান মন্ত্রীকে তাহার টেবিলে নিরাপদ রাখে। এই গৃহের আক্রমণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সকল জানিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত প্রিন্স কনোয়েকে এখানে বাস করিতে হয়। কারণ যদি কখনও অত্যধিক ব্যস্ততায় তিনি ভুল বোতাম টেপেন বা ভুল হাতল ঘুরাইয়া দেন তবে তিনি নিজেকে এবং বন্ধু-বান্ধবকে চল্লিশ ফুট নীচে নিক্ষিপ্ত করিয়া মৃত্যুর কারণ ঘটাইবেন। এই সকল ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবহিত প্রহরীগণই এই দুর্গের প্রহরায় নিযুক্ত থাকে।

সে যাহাই হউক, এই সকল গোলমালের ফলে বেসামরিক দল সামরিক দলের প্রভুত্ব অনেকটা খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই গোলযোগের সময় রাজা প্রিন্স কনোয়েকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেন এবং কনোয়ের কর্ম্মকুশলতায় দেশে ক্রমে শান্তি ফিরিয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু সামরিক দলের মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না—তাহারা পূর্ব্ব ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবার জন্য গোপনে চেষ্টা করিতেছিল। অনেকে মনে করেন যে সামরিক দল ভাবিয়াছিল যে, চীনে একটা গোলমাল লাগাইয়া সেখানে যদি তাহারা একটা নাটকীয় বিজয় লাভ করিতে পারে তবে তাহাদের ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে। আর তাহাদের মতে এই বিজয় লাভ করাও বিশেষ কঠিন ব্যাপার ছিল না—অনেক ব্যাপারেই তাহারা জয়লাভ করিয়াছে, কাজেই এই ব্যাপারে বিশেষ কোন যুদ্ধও হয়ত করিতে হইবে না। অবশ্য ১৯৩১ সালের চীন হইতে ১৯৩৬ সালের চীন যে অনেক শক্তিশালী তাহা তাহারা জানিত; কিন্তু সেই অনুপাতে জাপানের শক্তি আরও বেশীগুণ বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছিল এবং এই জন্য জাপানী মনে করিয়াছিল যে তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার মত সাহস চীনের তখনও হয় নাই—চীন তখনও ততটা প্রস্তুত হয় নাই। বর্ত্তমান চীনের অধিনায়ক মার্শাল চিয়াং কাই-শেক নানারূপ হুমকী দেখাইতে পারেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বড় রকম কোন যুদ্ধে লিপ্ত হইতে রাজী হইবেন না এবং এই অবস্থায় তাহারা চীনের হোপেই ও চাহার নামক প্রদেশ দুইটি যাহাতে জাপানের প্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হয় সেইরূপ একটি প্রস্তাব করিয়া অনুরূপ সুবিধা আদায় করিয়া লইতে সমর্থ হইবে। তাহা হইলেই সামরিক দলের প্রভুত্ব আবার ফিরিয়া আসিবার আনুকূল্য লাভ করিবে।

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাপানীদের কার্য্যতার ফলে পিকিং-এর সন্নিবেশিত হোপেই প্রদেশের

অবস্থান অনেক দিন হইতেই বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯০০ খৃঃ বক্সারের বিদ্রোহের পর একটি চুক্তিতে সমগ্র শক্তিগুলিই তাহাদের দূত এবং সহচরগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পিকিং, টিয়েনসিন এবং তন্মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সৈন্য রাখিবার অধিকার পাইয়াছিল। সেই চুক্তি অনুসারেই অন্যান্য শক্তিগুলির ন্যায় জাপানী সৈন্যও সেখানে অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু জাপানীরা সেখানে চুক্তি-নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া অনাবশ্যকরূপ বেশী সংখ্যক সৈন্য অনাবশ্যক স্থানসমূহেও রাখিতেছিল। কারণ মাঞ্চুরিয়া বিজয়ের পরই সাম্রাজ্যলোলুপ জাপানের দৃষ্টি হোপেই এবং তৎসংলগ্ন চাহার প্রদেশের উপর পড়িয়াছিল। এই দুইটি প্রদেশকে চীনের হাত হইতে ছিনাইয়া আনিয়া জাপানের কর্ত্তৃত্বাধীনে স্বাধীন বা অর্দ্ধস্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল এবং এই উদ্দেশ্যেই জাপান অনবরত নানারূপ পরিকল্পনা, ষড়যন্ত্র ও বিবাদ ইত্যাদি করিয়া আসিতেছিল। জাপানের এই মনোভাবের পরিচয় সেই সকল স্থানের চীনা অধিবাসী এবং সৈন্যগণের অবিদিত ছিল না। কাজেই কালক্রমে এমন একটা যুদ্ধ বাধিয়া উঠিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

কিন্তু যুদ্ধ বা বিবাদ বাধাইবার পক্ষে একটা কারণ চাই—বিনা কারণে বিবাদ করা কঠিন ব্যাপার। এই উদ্দেশ্যে তুচ্ছতম হইলেও একটা ঘটনাকে অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ বাহিরের লোকের নিকট নিজেদের কার্য্যকারিতাকে সমর্থন করাইবার মত একটা যুক্তিতর্কের অবতারণার সুযোগ সকল সময়ই রাখিতে হয়; এবং এই ওয়াংপিং ঘটনা তাহাদিগকে এই সুযোগ দিয়াছিল বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস।

ওয়াংপাওসান ঘটনার পশ্চাতে যেরূপ টায়ামা দলের ষড়যন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে, এই ওয়াংপিং ঘটনার পশ্চাতেও সেইরূপ জেনারেল ইটাগাকীর অদৃশ্য হস্তচালনা আছে বলিয়া অনেকে সন্দেহ করেন। এই ইটাগাকীকে লোকে অগ্রগামী শ্রেণীর বীর বলিয়াই বিবেচনা করে। এই শ্রেণীর অনেকেই এমন কি সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গেও যুদ্ধে বিজয়ের আশা পোষণ করিয়া থাকে বটে, তবে চীনে উত্তর উত্তর সাম্রাজ্য বিস্তারই ইহাদের প্রধান পরিকল্পনা। সেইজন্য জেনারেল আরাকীকে যেরূপ বলা হইত, তাহাকেও সেইরূপ জাপানের ভাগ্যবিধাতা বলা হইয়া থাকে। ১৯৩৭ সালের প্রারম্ভে পাল্লা যখন তাহাদের দিকে কিঞ্চিৎ ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল, তখন ইটাগাকী প্রায় সমর-সচীবের পদে আসীন হইতে চলিয়াছিলেন। কিন্তু 'একটা কিছু' ব্যাপার সংঘটিত হয়—প্রধান সচীব এই নিয়োগ সমর্থন করিলেন না। ফলে ইটাগাকীকে আবার কোয়ানটাং ফিরিয়া আসিতে হইল। এই 'একটা কিছু' যে কি তাহা এখনও রহস্যাবৃত, তবে খুব সম্ভব ইহা এই ব্যাপারে সম্রাটের নিজের হস্তক্ষেপ।

যুদ্ধপ্রিয় সামুরাই শ্রেণীর জাপানীরা যখন রাজনীতিবিদগণের আচরণে বিব্রত হইয়া পড়ে, তখন তাহারা কোনরূপ গোলমাল সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিতে অভ্যস্ত। সম্প্রতি উত্তর-চীনেও তাহারা সেইরূপ সুযোগ পাইল। সুতরাং স্থানীয় সামুরাই দল এই ঘটনাকে কাজে লাগাইতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল।

ওয়াংপিং ঘটনায় প্রকৃত প্রস্তাবে কি হইয়াছিল, তাহা এখনও সঠিক বলা যায় না। ওয়াংপাওসান ঘটনার ন্যায় ইহার বিশেষ কোনরূপ তদন্তও হয় নাই। জাপানীরা হয়ত ইচ্ছা করিয়াই এরূপ ঘটনা সৃষ্টি করিয়াছে, অথবা এরূপ পরিকল্পনা অনুযায়ী তাহাদের সৈন্য চালনা করিয়াছে যে এরূপ একটা ঘটনা ইহার পরিণতিস্বরূপই ঘটা সম্ভবপর হইয়া পড়িয়াছে, কিংবা এমনও হইতে পারে যে প্রকৃতই ঘটনাচক্রে এরূপ একটা দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে এবং জাপানীরা পূর্ণমাত্রায় এই সুযোগ সদ্ব্যবহার করিতে অবহেলা করে নাই। সে যাহাই হউক এই সামান্য ঘটনা হইতেই ক্রমে অসামান্য মহাসমরের সূত্রপাত হইয়া পড়িল এবং বহুকালের পরিকল্পিত অভিষ্ট সিদ্ধির আশায় জাপান পূর্ণ-বিক্রমে চীনের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল বটে, কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় নাই।

চীন এই সময় তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত ছিল—

নানকিনে চিয়াং কাইশেক, কোয়াটাং প্রদেশে কাইশেকের বিরুদ্ধবাদী দল এবং উত্তর-পশ্চিম চীনে তৃতীয় দল—চীনের কমিউনিষ্ট দল—বিরাজমান ছিল এবং চীনে সার্ব্বভৌম ক্ষমতালাভের জন্য পরস্পর বিবাদ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু জাপানের আক্রমণের ফলে এই বিপদের সময় চীনের বিভিন্ন দলের মধ্যে সংহতি ফিরিয়া আসিয়াছিল। কাজেই সংখ্যার দিক দিয়া চীন বিপুল সৈন্যবাহিনী সন্নিবেশিত করিয়া ফেলিল—চীনের মোট ১৬০ ডিভিসন বাহিনীতে ১৫ লক্ষেরও অধিক সৈন্য সংগৃহীত হইয়া গেল। ইহাদের মধ্যে উত্তর-চীনে ছিল ১৮ ডিভিসন, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ২৭, পশ্চিম প্রদেশে ১১, দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশে ১৫, দক্ষিণ প্রদেশে ২২, মধ্যপ্রদেশে ২৭, ও নানকিন গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎতত্ত্বাবধানে ছিল ৪০ ডিভিসন। এতদ্ব্যতীত চীনের ৫।৬ লক্ষ সুশিক্ষিত কমিউনিষ্টও বর্ত্তমান সংঘর্ষে চিয়াং কাইশেকের সহিত যোগদান করিল। কাজেই জাপানের এই অভিযানে চীনের বর্ত্তমান অধিনায়ক চিয়াং কাইশেক দমিলেন না—তিনি শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইবার সঙ্কল্প লইয়া জাপানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই সংকল্প লইয়া তিনি যুদ্ধ করিয়াও আসিতেছেন।

কৃষাণী-বধূ

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

ওগো জীবনের জীবন আমার! দয়িত দেবতা স্বামী,
দিবা সাথে রাত পোহাইছ কোথা হৃদয় করিয়া যামী?
দুঃখের কূলে অবহেলে রাখি চলে গেছো কত দূর,
বিদায়-বেদনা স্মরি' যে গো সদা শরীর শীর্ণাতুর।
কত সে আশায় ব্যক্ত করেছ পরিচয়ে একদিন
তোমার আমার মিলন যেমন ধ্রুবতারা ক্ষয়হীন,
যেমন রক্ষো রাবণের চিতা-অনল নিত্য জ্বলে
নিভিবে না কভু টুটিবে না আর এই ধরণীর তলে।
কোথা সে ভাষণ শুধু অকারণ ঘনাইলে ব্যবধান,
সে যে কত কথা চিত্তে উদয়ে বিষাইছে সারা প্রাণ।
কয়দিন আগে ঝড়-সাপটের ধাক্কা সহিতে নারি
পূর্ব্ব-দুয়ারী ঘর রচিয়াছে শয্যা বাঁধন ছাড়ি।
আটচালা সাথে দোচালার ঘর হেলে গেছে একদিক,
বাকীখানা আত্ত পথ ঠাঁই হ'তে বাঁচায়েছে দিয়া ভিখ্।
জোত-জমা আজ পরের কবলে শস্যে শ্যামল সাজে,
পঁাড়াবে মরুর বসতি তরুচ্ছায়াহীন ধূ ধূ রাজে।
বাছার দুগ্ধ যোগাড়ে নিত্য হই সামর্থ্যহীন,
অকর্ম্মণ্য লাঙল পচিয়া মাটিতে হয়েছে লীন।
শূন্য গোয়াল পড়ে রয় শুধু, বিকাই বলদ পরে,
দারিদ্র্য শত ধূলির মতন জড়ায় বাহির ঘরে।
সাধের মরিচ, বেগুনের গাছ পোড়ামুখী কোন্ ছাগে,
জীবনের মত মুড়িয়াছে সব শেষ করে পেয়ে বাগে।
বড় কথা কারো মুখে বলিবার এতটুকু বল নাই,
ভরসা আমার বাসনা যে সব পুড়ে হইয়াছে ছাই।
শান্তি-জীবন শফরী-লীলায় ঝরেছে ক্ষণিক ফুটে,
আজো মনে পড়ি অনুকম্পায় শরীর শিহরি উঠে।
রক্ত-বমনে সহসা কেন যে হইলে গো প্রপীড়িত,
মুহূর্ত্তকাল যেতে নাহি যেতে হ'ল শ্বাস স্তম্ভিত।
বান্ধব! আর দাও নিকো সাড়া, কহ নাই কোন কথা,
সেই জীবনের শেষ দিবসের কুসুমিত বুকে ব্যথা।
তোমা বিনা লাগে সকলি শ্রীহীন, সকলি অসাড় মোর,
স্বপ্নে কেবল রাতদিন তব কেঁদে করি নিতি-ভোর।
বিরহ-বিধুরা জাগিয়া ঘুমাই তোমার মাঝারে হায়,
সকল কর্ম্মে ধর্ম্মেতে আর বিশ্রাম শয্যায়।

সঞ্চয়ন

রুশিয়ায় কৃষি-বিপ্লব

[১৩৪৯। অগ্রহায়ণ সংখ্যা বণিক হইতে উদ্ধৃত]

বিপ্লবের পূর্বে রুশিয়া ছিল কৃষি-প্রধান দেশ। বর্তমান সোভিয়েট ইউনিয়নের শতকরা ৮২.৪ জন অধিবাসীই তখন কৃষিকার্যে নিরত ছিল। কৃষিকার্যের উৎকর্ষসাধনে ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় রুশিয়া নিতান্তই পশ্চাৎপদ ছিল। রুশিয়ার প্রত্যেক কৃষিজীবীর আয় তখন গড়ে অন্য যে কোন বৃহৎ ইউরোপীয় দেশের তুলনায় অর্ধেকেরও কম, আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ⅙ ভাগেরও কম ছিল। ১৯০৬—১৯১০ সালে ইংলণ্ড কিম্বা জার্মানিতে যে হারে গম উৎপন্ন হইত, ইউরোপীয় রুশিয়ায় উৎপাদনের হার তাহার ⅓ ভাগের অপেক্ষাও কম ছিল। অন্যান্য শস্যও ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম পরিমাণে উৎপন্ন হইত।

১৮৬১ সালে দাসদিগের মুক্তিসাধনের সঙ্গে সঙ্গেই রুশিয়ার কৃষকদিগের ভূমিগ্রাস করিবার যে কুপ্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা ১৯১৭ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই প্রথার ফলে কৃষকদিগের অধিকৃত ভূমির পঞ্চমাংশ বৃহৎ ভূম্যধিকারীদিগের করায়ত্ত হয়। ১৮৬০ সাল হইতে ১৯০০ সাল পর্যন্ত রুশিয়ায় কৃষিজীবীর সংখ্যা শতকরা ৭২ হারে বর্ধিত হইল, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তথাকার কৃষকের অধিকৃত ভূমির পরিমাণ জনপ্রতি ১২ একরের স্থলে ৭ একরে পরিণত হইল। রুশিয়ার প্রসিদ্ধ অর্থ-নীতিবিদ্‌গণ বলিয়াছেন যে, এই জমিদ্বারা অন্য প্রয়োজন নির্বাহিত হওয়া দূরে থাকুক, কৃষকের আহার্যের প্রয়োজনও নির্বাহ হইতে পারে না। সুতরাং কৃষকদিগকে আত্মরক্ষার জন্য আরও জমির বন্দোবস্ত লইতে হইল; ইহার ফলে কৃষকদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতাও খুব বাড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে খাজানার পরিমাণও অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ১৮৮১ হইতে ১৯০৬ সালের মধ্যে অনেক জিলায়ই খাজানার হার তিনগুণ হইতে দশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইল।

জারের রাজত্বকালে রুশিয়ায় কৃষকদিগের দুর্গতির আর একটি কারণ এই যে, তখন কৃষকেরা আদিমকালে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারেই চাষ-বাস করিতেছিল। কৃষকদিগের জোত-জমি ভিন্ন ভিন্ন মাঠের নানাস্থানে খণ্ডে খণ্ডে অবস্থিত ছিল। এক একজন কৃষকেরই ২০ হইতে ৬০ খণ্ড পর্যন্ত এরূপ জমি ছিল। কৃষকের বাড়ী বা কৃষিশালা যে গ্রামে ছিল, অনেক জমি তাহা হইতে তিন মাইল হইতে ছয় মাইল পর্যন্ত ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন ত্রি-ক্ষেত্র চাষ পদ্ধতিই রুশিয়ার সর্বত্র প্রচলিত ছিল। এই পদ্ধতি অনুসারে পশুদিগের আহার্য কোন প্রকার তৃণ-শস্যের চাষ হইত না। ইহার ফলে পশুচারণ ভূমি ও ময়দানের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে খুব কমিয়া গেল; অথচ পশু রক্ষার জন্য ইহাদের প্রয়োজন ছিল। আবার লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চারণভূমিগুলির কিয়দংশও চাষের জমিতে পরিণত হইতে লাগিল। ইহাতে উপযুক্ত পশুপালন-ব্যবস্থার অভাবে পশুর সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইল, আর সারের অপ্রাচুর্য বশতঃ জমির উৎপাদিকা শক্তিও ক্ষয়প্রাপ্ত হইল।

কৃষকদিগের দারিদ্র্য বশতঃ ও তাহাদের ভূসম্পত্তি অপরের হস্তগত হওয়ায় তাহাদিগকে আদিমকালের কাঠের যন্ত্রপাতিই ব্যবহার করিতে হইত। তাহাদিগের পক্ষে উন্নতধরণের হলযন্ত্রাদি ব্যবহার করা অসম্ভব ছিল। তাহাদিগকে এই সকল কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্রের ব্যবহার করিয়া নিজের ও পরিজনবর্গের অন্নের সংস্থান করিতে হইত। শীতকালে বহুসংখ্যক কৃষক শ্রমজীবীর কার্যদ্বারা জীবন ধারণের উদ্দেশ্যে সহরে যাইত। কিন্তু শ্রমশিল্প কার্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ ঘটিত। বহুসংখ্যক কৃষক তাহাদের ট্যাক্স আদায় করিতে না পারায় বাকী ট্যাক্স ক্রমেই জমিয়া যাইতে লাগিল। ১৯০২ সালে লেখক Bekhteyev কৃষকদের অবস্থা বর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:—কৃষকেরা তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি এবং যাহা কিছু হাতের কাছে পায়, তাহার সমস্ত বিক্রয় করিয়া ট্যাক্স আদায় করে। মধ্যপ্রদেশে কৃষকদিগের অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে, তাহাদের বর্তমানে

যে সম্পত্তি আছে, তাহা অপেক্ষা কম সম্পত্তি কিরূপে হইতে পারে, তাহা কল্পনাই করা যায় না, কারণ তাহাদের বিক্রয় করিবার আর কিছুই নাই। শিলাবৃষ্টি, পশু-পীড়া অথবা অন্য কোনপ্রকার বিপদ আপতিত হইলেও তাহাদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইতে পারিত না।

কৃষকদিগের অধিকাংশই অনশনে মৃতপ্রায় হওয়া সত্বেও জারের রাজত্বকালে রুশিয়া হইতে ১২০ লক্ষ টন শস্য প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানী হইত।

১৮৬১ সালের 'সংস্কারে'র ফলে অনেক কৃষকই ভূসম্পত্তিহীন হইল; অপরেরা এত অধিক পরিমাণে ঋণ-গ্রস্ত ছিল যে, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইল, কতকগুলি কৃষক ট্যাক্স কিম্বা 'কৃষক-ব্যাঙ্ক' হইতে গৃহীত ঋণ আদায় করিতে না পারায় তাহাদের জমি বাড়ী সব বাজেয়াপ্ত হইল। এই সকল ও অন্যান্য কারণে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এক শ্রেণীর ভূমিহীন কৃষক-কর্মীর সৃষ্টি হইল। তাহাদিগকে ভূস্বামী কিম্বা কুলকদের জন্য কাজ করিতে বাধ্য করা হইত। তাহাদিগকে কিরূপ পারিশ্রমিক দেওয়া হইত, তাহা ট্রট্স্কী খাসন প্রদেশে প্রদেশে অবস্থিত তাঁহার পিতার কৃষিক্ষেত্রের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার আত্মচরিতে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়। ঐ কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ ৬৫০ একর ছিল এবং তথায় অশ্ব, শূকর-শাবক ও অন্যান্য পশু রক্ষিত হইত। ট্রট্স্কী লিখিয়াছেন :—

যাহারা শস্য কর্তন করিত, তাহারা গ্রীষ্মের চারি মাসে ৪০ হইতে ৫০ রুবল পর্যন্ত (৪ হইতে ৫ পাউণ্ড) পারিশ্রমিক এবং আহার পাইত। স্ত্রীলোকেরা ২০ হইতে ৩০ রুবল পর্যন্ত পাইত। দিনের অবস্থা ভাল থাকিলে তাহারা উন্মুক্ত প্রান্তরেই বাস করিত, কিন্তু দিনের অবস্থা ভাল না থাকিলে তাহারা খড়ের গাদার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিত। মধ্যাহ্নে তরকারীর স্যুপ এবং এক প্রকার নিরামিষ ঝোল আহার করিত, রাত্রে ভুট্টার ঝোল খাইত। তাহারা কখনও মাংস খাইতে পাইত না, কেবল অল্প পরিমাণ উদ্ভিজ্জ-ঘৃত খাইতে পাইত। এইরূপ খাদ্য খাওয়ায় সময়ে সময়ে অভিযোগের কারণ উপস্থিত হইত। শ্রমিকেরা জমি ছাড়িয়া আসিয়া প্রাঙ্গণে সমবেত হইত। তাহারা মুখ নীচু করিয়া এবং অনাবৃত, ফাটা ও খড়বিদ্ধ পা সঞ্চালিত করিতে করিতে গোলাঘরের ছায়ায় শুইয়া, কি হয় তাহা দেখিবার জন্য প্রতীক্ষায় থাকিত। তখন আমার পিতা তাহাদিগকে কতকগুলি তরমুজ কিম্বা আধ থ'লে শুষ্ক মৎস্য দিতেন। তাহারাও তাহা পাইয়া আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে আবার কাজে প্রবৃত্ত হইত। তখন সকল কৃষি-শালার অবস্থাই ঐরূপ ছিল।

একবার গ্রীষ্মকালে সমস্ত শ্রমিকের মধ্যেই রাত্র্যন্ধতা রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। তাহারা প্রদোষের অস্পষ্ট আলোকে হস্ত প্রসারিত করিয়া চলাফেরা করিত। পরিদর্শক তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া স্থির করিলেন যে, খাদ্যদ্রব্যে চর্বি না থাকায়ই এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং প্রদেশের সর্বত্রই শ্রমিকদিগের মধ্যে এই রোগ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, সর্বত্রই শ্রমিকদিগকে এক প্রকার খাদ্য দেওয়া হয়, কোন কোন সময়ে উক্ত খাদ্য অপেক্ষা আরও নিকৃষ্ট খাদ্যও দেওয়া হইয়া থাকে।

রুশিয়ার কৃষক-বিদ্রোহের মূলে উক্ত কারণসমূহ বিদ্যমান ছিল। এই বিদ্রোহ ১৯০৫ সালে পল্লী-অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু বিদ্রোহ নিবারণের জন্য সৈন্যদল প্রেরিত হওয়ায় ইহা কিছুকালের জন্য স্থগিত ছিল। কিন্তু ১৯১৭ সালে পুনরায় প্রবলভাবে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। রুশীয় গবর্ণমেণ্ট কৃষক-সমস্যা সমাধানের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটির ফলেই পল্লী-অঞ্চলে শ্রেণীগত পার্থক্য বর্ধিত হইতে লাগিল এবং ইহাতে এক দিকে কৃষক-সাধারণের যেমন শক্তি ক্ষয় হইতে লাগিল, অপর দিকে ভূস্বামী ও কুলকদিগের শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সুতরাং তখন দরিদ্র ও ভূসম্পত্তিহীন কৃষকগণকে বাধ্য হইয়া এই বুঝিতে হইল যে, বিপ্লবের মধ্যেই তাহাদের একমাত্র আশা নিহিত আছে। ১৯১৭ সালের নবেম্বর মাসে যে সহরের নিম্ন-শ্রেণীর জনসাধারণ বিদ্রোহে লিপ্ত হইল, তাহাতেই ভবিষ্যতে সমগ্র রুশিয়ায় জনসাধারণের বিদ্রোহের সূচনা পরিলক্ষিত হইল। কৃষকেরা ভূস্বামিগণকে বিদূরিত করিয়া ভূমি অধিকার করিল। এইরূপে ধনিক ভূস্বামীদিগের

স্বার্থসাধনের জন্য অনুষ্ঠিত অত্যাচার এককালে রহিত হইল এবং কৃষকেরা এই বিপ্লবে সর্বতোভাবে বিজয়ী হইল।

কৃষকেরা যে ভূস্বামীদিগের ভূমি অধিকার করিল, তাহা সোভিয়েট সরকার কর্তৃক অবিলম্বে অনুমোদিত ও আইন-সঙ্গত বলিয়া গণ্য হইল। ব্যক্তিবিশেষের ভূমির মালিকত্ব রহিত হইয়া গেল এবং পূর্বে যে লক্ষ লক্ষ একর জমি ভূস্বামী ও কুলকদিগের অধিকারে ছিল, তাহা কৃষিকার্যের জন্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত কৃষকদিগের হস্তগত হইল।

১৯১৭ সালের বিদ্রোহের ফলে কৃষকদিগের জমির অভাব দূরীভূত হইল। বড় বড় ভূস্বামীদিগের ভূসম্পত্তি ব্যতীত কৃষিকার্যের উপযোগী পশু ও কৃষিযন্ত্রাদিও তাহাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। দরিদ্র কৃষকেরা জার কর্তৃক ধার্য ট্যাক্সের গুরুভার হইতে এবং মহাজনও ব্যাঙ্ক হইতে গৃহীত ঋণের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া নিজেরাই স্বকৃত পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে সমর্থ হইল।

ইহার ফলে কৃষকদিগের অবস্থার সাতিশয় উৎকর্ষ সাধিত হইল। তাহারা এতদিন যে অত্যাচারের ভারে নিষ্পিষ্ট হইতেছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল এবং সর্বাপেক্ষা দরিদ্র কৃষকেরও জীবনযাত্রা-পদ্ধতির দ্রুত উন্নতি সাধিত হইল। কিন্তু বড় বড় ভূস্বামীদিগের সম্পত্তি খণ্ডশঃ ভাগ ভাগ হইয়া যাওয়ায় এবং ধনিকদিগের অর্থ দ্বারা কৃষিকার্য পরিচালনের প্রথা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হওয়ায় উৎপন্ন শস্যের পরিমাণও বহুল পরিমাণে কমিয়া গেল। এইরূপে দ্রুত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কৃষক ও শ্রমিকদিগের জীবন-যাপনের প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনের ফলে সোভিয়েট-সরকারের সমক্ষে এক নূতন কৃষি-সমস্যার উদ্ভব হইল।

রুশিয়ার শ্রমশিল্পের পুনর্গঠনের ফলে বিপুল উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। কৃষিকার্যেও এইরূপ পুনর্গঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল, কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড লইয়া কৃষিকার্য করিবার যে পদ্ধতি আদিমযুগ হইতে প্রচলিত ছিল, তাহা দ্বারা নিয়ত পরিবর্ধনশীল শ্রমিকদিগের আহার্যের উপযোগী প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইবে না, সোভিয়েট সরকার অবিলম্বেই ইহা স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিলেন।

আর একটি কারণে কৃষিকার্যের দ্রুত পুনর্গঠনের বিশেষ প্রয়োজন হইল। একমাত্র সোভিয়েট রুশিয়াই কর্মীদিগের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। ইহা চারিদিকে শত্রুবেষ্টিত ছিল। সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে জগতের অন্যান্য বণিকদিগের বিরুদ্ধাচরণ, সৈন্যদিগের আক্রমণ, পণ্যদ্রব্য বর্জন এবং প্রচারকার্যের ফলে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তাহার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ভীষণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইল। এই সকল ব্যাপার নিত্যই অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এইজন্য সোভিয়েট নেতৃগণ রুশিয়াকে যত সত্বর সম্ভব, সম্পূর্ণ স্বাধীন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রুশিয়া পৃথিবীর অন্য সকল দেশ হইতে বিযুক্ত হইলেও যেন কোন প্রকার অসুবিধায় পতিত না হয়, তজ্জন্য তাহারা আবশ্যক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, শিল্প-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কার্যকর জ্ঞান সঞ্চয়, যথোচিত সরঞ্জামের বন্দোবস্ত এবং অভিজ্ঞ উপদেষ্টার ব্যবস্থা করিয়া সোভিয়েট রুশিয়াকে একটি কারিকরী শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করিতে এবং ইহার প্রাকৃতিক সম্পদরাশির পরিবর্ধনে মনোনিবেশ করিল।

সুতরাং কেবল কারিকরী শ্রমশিল্পে নিয়োজিত কর্মীদিগের আহার্যের সংস্থানের জন্য নহে, পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে রপ্তানীর জন্যও প্রচুর পরিমাণে পণ্য শস্য সঞ্চয় করার প্রয়োজন হইল। পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ প্রচুরভাবে বর্ধিত না করিলে যে বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির মূল্য প্রদান ও আমেরিকা, জার্মানি ও ইংলণ্ড হইতে আনীত ইঞ্জিনিয়ারদিগের বেতন প্রদান সম্ভবপর হইবে না, তাঁহারা ইহা স্পষ্টরূপেই উপলব্ধি করিলেন। পূর্বপ্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে সামান্য পরিমাণ শস্যাদি উৎপন্ন হইত। এই পদ্ধতিতে কৃষিকার্য করিয়া যে দেশের কৃষিসম্পদ বর্ধিত করা সম্ভবপর হইবে না এবং সামাজিক সাম্যবাদের নীতি অনুসারে কৃষিকার্যের পুনর্গঠন যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাঁহারা তাহাও উপলব্ধি করিলেন।

নবগঠিত রুশিয়া অধিবাসীদিগের কর্মশক্তির অর্ধেকই বৃথা ব্যয়িত হইতে দিতে পারিল না, আর দেশবাসীর অধিকাংশই যে অশিক্ষিত ও অনিরাপদ অবস্থায় থাকিবে, ইহাতেও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। যে দেশের ১২০ কোটি ৮০ লক্ষ লোক পল্লীগ্রামে কৃষিকার্যে ~~ব্যাপৃত~~ এবং সেই সকল লোকের প্রত্যেকে যখন শক্তিশালী ধনিক

হিসাবে ব্যক্তিগত ভাবে কার্য করে, সেই দেশে সামাজিক প্রতিষ্ঠান নিরাপদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

বিপ্লবের অল্পকাল পরেই কৃষকগণ ইহা উপলব্ধি করিতে লাগিল যে, তাহাদের সমশ্রেণীস্থ লোকদের সহিত সহযোগিতা দ্বারাই তাহাদের জীবনযাত্রার আদর্শ অধিকতর পরিমাণে উন্নত হইবে। শীতকালে কৃষকেরা যখন সহরে যাইত, তখন শ্রমিকদিগের সহিত মিশিয়া বড় বড় সহরের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিত। শ্রম-শিল্প কার্যে যন্ত্রশক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ফলোপধায়কতা দেখিয়া তাহারা কৃষিকার্যেও ইহাদের ব্যবহার দ্বারা সাফল্য লাভের সম্ভাবনা সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিচার-বিতর্কে প্রবৃত্ত হইত। কৃষক ইহা স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিল যে, তাহাকে অন্যের পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে দেওয়া হইবে না এবং সে নিজেও যন্ত্রপাতি এবং কৃষিকার্যের জন্য উৎকৃষ্ট বীজ ক্রয় করিবার উপযোগী অর্থ কখনও সঞ্চয় করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে যে সকল কৃষক পরস্পর সমবায় প্রথায় কার্য করিতে অভিলাষী ছিল, রাষ্ট্র ও সমবায়সমিতি তাহাদিগকে সর্বদাই ঋণ, যন্ত্রপাতি এবং অভিজ্ঞতাপ্রসূত উপদেশ দ্বারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং যে সময়ে সরকারী কৃষিক্ষেত্র ও ট্রাক্‌টরের আড্ডাসমূহ পল্লী-অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল, তখন অনেক কৃষকই বিশেষতঃ তরুণ কৃষকগণ ঐ সকলের সহিত সহযোগিতা স্থাপন পূর্বক কার্য করিতে প্রস্তুত হইল।

ইহার ফলে বিগত কতিপয় বৎসরের মধ্যে রুশিয়ায় এক কৃষি-বিপ্লব সংঘটিত হইল। এই বিপ্লবের ফল নবেম্বরের বিপ্লবের ন্যায় দূরগামী ও গুরুত্বপূর্ণ হইল। সমগ্র পল্লী-অঞ্চলে নূতন জীবনস্রোত প্রবাহিত হইল। রুশিয়ার কৃষক ও কৃষিকর্মীরা সকলেই নূতন নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে, কৃষিকর্মে অধিকতর নৈপুণ্য লাভ করিতে, যন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে এবং কৃষিকার্য উন্নত প্রণালীতে সম্পাদন করিতে ব্যগ্র হইল। প্রত্যেক সোভিয়েট কৃষিক্ষেত্র এবং যন্ত্র বা ট্রাক্‌টরের আড্ডার সংস্পর্শে আসিয়া চতুষ্পার্শ্বর্তী পল্লীবাসীরা নূতন নূতন আলোক লাভ করিতে লাগিল। নূতন জীবন লাভও জীবনের প্রসার বৃদ্ধির জন্য এবং শিক্ষা ও প্রচারকার্যের জন্য এই সকল কৃষিক্ষেত্রই কেন্দ্রস্বরূপ। সর্বাপেক্ষা অজ্ঞ ও অনুন্নত কৃষকও কোন-না-কোন প্রকারে এই নবভাবের বিপুল আহ্বানে সাড়া না দিয়া পারে না। লেনিন যথার্থই বলিয়াছেন :—"কৃষক ও শ্রমজীবীদিগের মধ্যে গণন-ক্ষমতা বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। এই মাত্র ইহাদের এই ক্ষমতা সম্বন্ধে চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া ইহাদিগের মধ্যে নবজাগরণের ভাব, মহৎজীবন যাপন ও নব নব সৃষ্টির অভিলাষ এবং স্বাধীনভাবে সমাজ সংগঠনের প্রয়াস উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।"

রুশিয়ার পল্লী-অঞ্চলের সামাজিক গঠনকার্য বাস্তবিকই একটি বৃহৎ ব্যাপার। ১৯২৮-১৯২৯ সালে অতি সুন্দর ভাবে এই গঠনকার্য আরম্ভ হয়, কিন্তু তৎপর উৎসাহের আতিশয্য ও বিচার-বুদ্ধির অভাব বশতঃ ইহাতে অন্তরায় উপস্থিত হইল। ইহার ফলে পূর্বানুষ্ঠিত কার্য এবং নূতন উন্নতিজনক কার্যকে এক দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হইল এবং এই নীতির সার্থকতা প্রচুর শস্য-সম্পদের উৎপাদনে এবং যে সকল কৃষক সমবেত ভাবে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল। বর্তমানে সমবায় পদ্ধতিমূলক কার্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। এখনও অনেক বিঘ্ন-বিপদ অতিক্রম করিতে হইবে, অনেক কুসংস্কার উন্মূলিত করিতে হইবে। কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়ার প্রধান প্রচেষ্টা যে সাফল্যমণ্ডিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

[১৩৪৯। ভাদ্র সংখ্যা 'উত্তরা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধের সারাংশ]

কাশীতে হিন্দুদের জন্য একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা একই সময়ে অনেকের মাথায় খেলিতে থাকে। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে উহা ক্রমশঃ রূপ পরিগ্রহ করে। মিথিলেশ দ্বারবঙ্গের মহারাজা স্যর রমেশ্বর সিংহ বহুকাল হইতে এ সঙ্কল্প পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। ভারতধর্ম মহামণ্ডলের সাধুরা নানা

আলোচনা করেন। প্রয়াগে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য পণ্ডিত শ্রীমদনমোহন মালবীয়ের সঙ্গে অনেক পরামর্শ করেন।

কাশী তত্ত্ব-সভার সদস্য এবং সমগ্র জগতের থিওসফিকাল সোসাইটির সভানেত্রী মিসেস্ এনীবেসাণ্ট ভারতে তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র করিয়া কাশীবাসিনী হইলে বিষয়টি অবিলম্বে তাঁহার গোচরে আসে, তিনি সকলকে প্রভূত উৎসাহ দিয়া পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সভানেত্রী করিয়া একটি বোর্ড গঠিত হয়, এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসুর উপর উপনেতৃত্বের ভার পড়ে। সৌভাগ্যের বিষয় এই অশীতিপর বৃদ্ধ এখনও বর্তমান আছেন।

প্রথমে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত বোর্ডের চেষ্টায় সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ নাম দিয়া একটি বিদ্যায়তন মাত্র ছয়জন শিক্ষক লইয়া খোলা হয়। স্কুল বিভাগের শেষ দুই শ্রেণী এবং কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র লইয়া কার্যারম্ভ হয়। প্রধানতঃ কাশীবাসী ত্যাগী থিওসফিষ্টগণ কেহ-বা বিনা বেতনে, আবার কেহ কেহ বা ক্ষুন্নিবৃত্তিভৃতি লইয়া শিক্ষকতা করিতে থাকেন। কলেজের অধ্যক্ষ হইলেন ডাঃ আর্থার রিচার্ডসন্, এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে এইচ্ বাণবেরী সাহেব ব্রতী ছিলেন। তাঁহার পর প্রধান শিক্ষক হইলেন ডাঃ এরুণ্ডেল—যিনি পরে কলেজের অধ্যক্ষরূপেও কার্য করিয়াছিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই কামাচ্ছা অঞ্চলে কাশীনরেশ একটি বাড়ী ও উদ্যানসহ যথেষ্ট ভূমি দান করেন। (আজকাল সেখানে সেণ্ট্রাল হিন্দু বয়েজ স্কুল চলিতেছে।) কাশ্মীরের মহারাজা তাঁহার সংস্কৃত চতুষ্পাঠী 'রণবীর সংস্কৃত পাঠশালা' সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের অঙ্গীভূত করিয়া দেন। বিংশ শতক আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১লা জানুয়ারী ১৯০১ তারিখে মিসেস্ বেসাণ্ট 'সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ ম্যাগাজিন' নামক শিক্ষা-বিষয়ক ছাত্রদের মাসিক পত্র নিজ সম্পাদনায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

ত্রয়োদশ বর্ষকাল স্বয়ং উহা সম্পাদন করিয়া অবশেষে তিনি যখন সমগ্র জগতের থিওসফিকাল হেড কোয়ার্টার্স মাদ্রাজের উপকণ্ঠে আড্যার নদীতটে গিয়া কায়েমী ভাবে বসবাস করিতে থাকেন, তখন হইতে কলেজের পরিচালনা দেশবাসী নেতৃবৃন্দের হাতে পড়ে। ইতিমধ্যে কলেজ এবং স্কুল পূর্ণাঙ্গ হইয়া যায় এবং দেখিতে দেখিতে আরো অনেক ত্যাগী শিক্ষক ও পরিচালক যোগদান করেন। মেয়েদের জন্যও সেণ্ট্রাল হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ই কামাচ্ছা অঞ্চলে স্থাপিত হয়।

এই সময় হইতে পণ্ডিত শ্রীমদনমোহন মালবীয় সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজা স্যর রমেশ্বর সিংহের সভাপতিত্বে 'হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়-সোসাইটী' গঠিত হয়; ইঁহারা প্রথমতঃ দেশীয় হিন্দু-রাজন্যবর্গের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতে থাকেন। ১৯১৫ সালে সোসাইটীর স্বপ্ন সফল করিয়া হিন্দু ইউনিভার্সিটি বিল পাশ হয়। কিছু দিনের মধ্যে পরবর্তী সরস্বতী পূজার দিন (৪ ফেব্রুয়ারী ১৯১৬) কাশীর দক্ষিণ দিকের উপকণ্ঠ লঙ্কা নামক মহল্লার সন্নিকটে নাগোয়া অঞ্চলে, তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের হাতে বিশ্ববিদালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তদবধি তিন চারি দিন যাবৎ প্রতিষ্ঠার মহোৎসব চলিতে থাকে, সেই সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সার্বজনিক ব্যাপক-বক্তৃতা (এক্স্‌টেনশন লেকচার) সুরু হয়। আহূত বক্তাদের মধ্যে বিদেশ হইতে আগত প্যাট্রিক গেডেজ, পূর্বদেশ হইতে আচার্য্য জগদীশ বসু, আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, পশ্চিম হইতে শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ৺লালুভাই সমলদাস, দক্ষিণ হইতে মিসেস বেসাণ্ট প্রভৃতি নেতৃবর্গ ছিলেন।

প্রথমে কামাচ্ছায় সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হয়। তখন স্কুলটি স্থানান্তরিত হইল। ইতিপূর্বেই নাগোয়াতে বাড়ীঘর প্রস্তুত আরম্ভ হইয়া যায় এবং প্রথমে সেখানে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ খোলা হয়। ক্রমশঃ সকল কলেজ সেখানেই চলিতে থাকে, কেবল মাত্র টীচার্স ট্রেনিং কলেজ ও সেণ্ট্রাল হিন্দু স্কুল ও গার্লস স্কুল কামাচ্ছায় থাকিয়া যায়। এই সময় যে সকল অধ্যাপক ছিলেন তন্মধ্যে স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, ডাঃ গণেশপ্রসাদ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রথম ভাইস্‌চ্যান্সের ডক্টর স্যর সুন্দরলাল; পরে মাদ্রাজের স্যর শ্রী প, স, শিবস্বামী আয়ার তৎস্থলাভিষিক্ত হইয়া আসেন। মাত্র তিনি তেরো মাস পরেই চলিয়া গেলে, মহামনা পণ্ডিত- শ্রীমদমোহন মালবীয় কায়েমী ভাবে ভাইস্ চান্সেলর হইয়া প্রায় বিশ বৎসর ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। সংপ্রতি তিন বৎসর যাবৎ স্যর স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ তৎস্থলে কার্য করিতেছেন। সৌভাগ্যের বিষয় মালবীয় এখনো বিদ্যমান থাকিয়া পুরোধা (রেক্টর) রূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন। ঐ পদ

প্রথম অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাঁহার শিক্ষাগুরু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য। প্রথম প্রো-ভাইস্-চান্সেলরের কার্যও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়ই করিয়াছিলেন। তাহার পর ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দুই বার প্রো-ভাইস্-চান্সেলরের কার্য করেন। বর্তমানে পণ্ডিত শ্রীইকবাল নারায়ণ গুরটু কাশীর প্রো-ভাইস্-চান্সেলর।

বর্তমানে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের (অর্থাৎ আর্টস কলেজের) প্রিন্সিপাল এবং ইংরাজীর প্রধান অধ্যাপক ডাঃ উপেন্দ্রচন্দ্র নাগ। দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র; পূর্বে শ্রীফণিভূষণ অধিকারী এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

অধ্যাপক শ্রীপ্রসন্নকুমার দত্ত-ও পদার্থ বিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ এবং বিজ্ঞান-কলেজের প্রিন্সিপালের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেই বাস করিতেছেন। সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যাপক ছিলেন পণ্ডিত হরিহর শাস্ত্রী; তাঁহার অকাল-মৃত্যু হইলে পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ঐ পদ অলঙ্কৃত করেন; তাঁহার কাশী প্রাপ্তির পর অধ্যাপক শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র ভট্টাচায সেই পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

চৌধুরী শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু বহুকাল অপ্রতিগ্রাহী সেবকরূপে বিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার অনুজ বিখ্যাত সঙ্গীতকলাবিশারদ বীণাকার শ্রীশিবেন্দ্রনাথ বসু সঙ্গীত বিভাগের উন্নতি করিয়াছেন। বিখ্যাত চিত্রকলাবিৎ শ্রীরণদা উকিল মহিলা কলেজে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন। বর্তমানে বিজ্ঞান-ফ্যাকাল্টীর ডীন্ অধ্যাপক ডাঃ শ্রীসনৎকুমার বসু। সেন্ট্রাল হিন্দুস্কুলের বর্তমান হেডমাষ্টার শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বে শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী কিছুকাল ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ বহুকাল প্রাচ্যবিদ্যা কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়া কিছুকাল হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন আরো অনেক বাঙ্গালী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন। সম্প্রতি ইতিহাসের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাহান্ন বৎসর বয়সে এবং অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজী অধ্যাপক বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিরাশী বৎসর বয়সে কাশীলাভ করিয়াছেন।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নোক্ত মহাবিদ্যালয়গুলি রহিয়াছে—১. ধর্মতত্ত্ব মহাবিদ্যালয় (কলেজ অব থিওলজী); ২. প্রাচ্য মহাবিদ্যালয় (ওরিএন্টাল লার্ণিং)। ৩. সেন্ট্রল হিন্দু কলেজ; ৪. টীচার্স ট্রেণিং কলেজ। ৫. মহিলা মহাবিদ্যালয়; ৬. ইঞ্জিনীয়রিং কলেজ। ৭. আয়ুর্বেদিক [মেডিকাল] কলেজ; ৮. বিজ্ঞান কলেজ; ৯. টেক্‌নলজী কলেজ; ১০. ল কলেজ; কৃষিগবেষণা বিদ্যায়তন। মধ্যশিক্ষার জন্য দুইটি বিদ্যালয় (হাইস্কুল) রহিয়াছে যথা: সেন্ট্রাল হিন্দু বয়েজ স্কুল ও সেন্ট্রাল হিন্দু গার্লস স্কুল। এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধির মধ্যে একটি শিশু পাঠশালা আছে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় একটি সর্ব-ভারতীয় বিদ্যাকেন্দ্র। ভারতের সকল প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য হইতে ছাত্রছাত্রী আসিয়া এখানে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। নেপাল, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এবং মালয় দেশ হইতেও শিক্ষার্থী আসিয়া হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। হিন্দু ব্যতীত অন্য ধর্মের ছাত্রেরও এখানে অবারিতদ্বার। বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতিকে হিন্দু হইতে আলাদা বলা যায় না। মুসলমান, খৃষ্টান ছাত্রও এখানে অধ্যয়ন করিয়া যায়।

এখানকার ইঞ্জিনীয়রিং কলেজ বিখ্যাত। মেকানিকাল ও ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়রিং প্রভৃতি শিক্ষার সুবন্দোবস্ত আছে। আয়ুর্বেদিক মেডিকাল কলেজের বিশেষত্ব এই যে এখানে পাশ্চাত্য মেডিকাল সায়েন্সের অতিরিক্ত আয়ুর্বেদ ও য়ুনানী বিদ্যা শিক্ষা করা যায়। টেকনলজি বিভাগে মাইনিং মেটালাজী, ফার্মাসৌউটিকাল কেমিষ্ট্রি প্রভৃতি বিষয়েও ডিগ্রী কোর্স রহিয়াছে। কাচ ও সাবান প্রস্তুত প্রভৃতি কার্যকরী বিদ্যা লাভের ব্যবস্থা আছে। টীচার্স ট্রেণিং কলেজে নয় মাসের কোর্স।

এখানকার লাইব্রেরীতে ভারতের প্রায় সকল ভাষার পুস্তক আছে। তদ্ভিন্ন ইংরাজী, সংস্কৃত, পালি, পার্শী, আরবী, লেটিন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, জাপানী, চীনা, রাশিয়ান প্রভৃতি ভাষার পুস্তকাদি রহিয়াছে। মোট প্রায় দুই লক্ষ পুস্তক এখানে আছে। কিছুদিন হইতে লাইব্রেরী ট্রেণিং কোর্স খোলা হইয়াছে। ছয় মাসে ডিপ্লোমা পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসে মনোটাইপে দ্রুত কাজ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত প্রায় সকল পুস্তকাদি এখানেই ছাপা হয়। পোষ্টগ্রজুয়েট কোর্স নানা রকমের আছে। ডক্টরেট ডিগ্রী লইবার ব্যবস্থা প্রথমাবধি এখানে রহিয়াছে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া ছাত্রেরা ভারতের নানা স্থানে ভাল ভাল কাজে ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলার অর্থসচিবের পদত্যাগ

বাংলার অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ সম্বন্ধে সরকারী ইস্তাহারে শুধু বলা হইয়াছে যে, "মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গবর্ণরের মন্ত্রিসভার সদস্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। গবর্ণর ১৯৪২ সালের ২০শে নবেম্বর অপরাহ্ন হইতে তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন।" পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধে সরকারী ইস্তাহারে কিছুই বলা হয় নাই। তবে ডাঃ মুখার্জ্জী পদত্যাগ প্রসঙ্গে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে পদত্যাগের কারণ বিবৃত হইলেও তিনি বলিয়াছেন যে, গবর্ণরের সহিত তাঁহার যে পত্রালাপ হইয়াছে এবং ১২ই আগষ্ট তারিখে বড়লাটের নিকট তিনি যে পত্র দিয়াছেন, তাহা হইতে যে অবস্থাধীনে তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপে উপলব্ধি হইবে। ঐ সকল পত্র এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। হয়ত প্রকাশের পথে বাধা আছে। তবে বিবৃতি হইতেও পদত্যাগের কারণ অনেকটা অনুমান করা যায়।

গত আগষ্ট মাসে সরকারী দমননীতির প্রতিবাদে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী এবং মিঃ সামসুদ্দীন আহ্‌মদের পদত্যাগের সম্ভাবনার কথা শোনা গিয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত সম্ভাবনার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয় নাই। তিন মাস পূর্ব্বে তিনি কেন পদত্যাগ করেন নাই, এই বিবৃতিতে তাহারও কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে। বাংলার অস্বাভাবিক পরিস্থিতিই তৎকালে তাঁহার পদত্যাগ না করিবার কারণ। সেই পরিস্থিতির পরিসমাপ্তি এখনও হয় নাই। দারুণ সঙ্কটকালে কোন গবর্ণমেণ্টই গুরুতর হাঙ্গামার প্রশ্রয় দিতে পারেন না, ডাঃ মুখার্জ্জী তাহা অস্বীকার করেন না। কিন্তু তিনি মনে করেন, কেবল মাত্র অসন্তোষের বাহ্যিক অভিব্যক্তি দমন করাই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এই বিষয়ে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সহিত সকলেই একমত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু দমননীতির প্রতিবাদই তাঁহার পদত্যাগের একমাত্র কারণ নহে।

বাংলার প্রধান মন্ত্রী, অথবা তাঁহার কোন সহকর্ম্মী কিম্বা প্রগতিশীল কোয়ালিশন দলের কোন সদস্যের সহিত মতদ্বৈধতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগের কারণ নয়। গত একবৎসর যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার মনোভাব লইয়া তিনি এবং তাঁহার সহকর্ম্মীরা কাজ করিয়াছেন তাহা যে সকলের পক্ষেই কাম্য তাহাও তিনি জানাইয়াছেন। ডাঃ মুখার্জ্জী তাঁহার বিবৃতিতে সাধারণ ভাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনে এবং বিশেষভাবে পাইকারী জরিমানা এবং মেদিনীপুরের ব্যাপারে মন্ত্রীদের অসহায় অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের নামে বাংলায় যে শাসনতন্ত্র চলিতেছে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ তাহাকে 'একটা বিপুল পরিহাস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থা অনুমান করিয়াই কংগ্রেস প্রথমে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। সিন্ধুর ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ আল্লাবক্সের পদচ্যুতিতেও এই পরিহাসের বিরাটত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,

"প্রাদেশিক মন্ত্রীহিসাবে আমার এগার মাসের অভিজ্ঞতায় আমি সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে ইহা ব্যক্ত করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছি যে, মন্ত্রীদের উপর গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইলেও আর সেজন্য তাঁহারা জনসাধারণ এবং আইন-সভার নিকট দায়ী ও জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকিলেও তাঁহাদের ক্ষমতা যৎসামান্য। জনসাধারণের অধিকার ও স্বাধীনতা-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহাদের কোন ক্ষমতা নাই বলিলেও চলে। গত এক বৎসর বাংলাদেশে দ্বৈত-শাসন চলিতেছে। মন্ত্রিগণের অভিপ্রায় ও পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া বহুতর বিষয়ে গবর্ণর স্বয়ং হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ঐ সকল ব্যাপারে তিনি স্থায়ী সরকারী কর্ম্মচারীদের পরামর্শের উপর নির্ভর করিয়াছেন।"

সাধারণ ভাবে মন্ত্রীদের অক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়া

ডাঃ মুখার্জ্জী দুইটি বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন যাহার আংশিক প্রতিকার করিতেও তাঁহারা সমর্থ হন নাই। এই দুইটির একটি পাইকারী জরিমানা, অপরটি মেদিনীপুরে অবলম্বিত ব্যবস্থা। মেদিনীপুরে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সংঘটিত হইবার পর সাহায্য দান কার্য্যে কেন বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহার কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছেন,

"আমরা যে কোন প্রতিকার করিতে পারি নাই, তাহার কারণ কতকগুলি সরকারী কর্ম্মচারীর বিলম্ব ঘটাইবার প্রবৃত্তি ও সহানুভূতির অভাব···আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, এই অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে মেদিনীপুরের রিলিফের কাজ করা নিরর্থক হইয়া পড়িবে।"

পাইকারী জরিমানা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "দোষী কি না তাহা বিবেচনা না করিয়া হিন্দুদের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হইয়াছে।"

রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সহিত আমরা একমত নহি। তিনি কংগ্রেসী নহেন এমন কি কংগ্রেসের অনুরাগীও নহেন। কিন্তু বিবৃতিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তৎপ্রতি বৃটিশ রাষ্ট্রের কর্ণধারগণেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

—

সেবাকার্য্য ও সরকারী বিবৃতি

মেদিনীপুরে ঝটিকা ও বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে যথাসময়ে সরকারী সাহায্য কেন করা যায় নাই তাহা বিবৃত করিয়া বাংলা গবর্ণমেণ্ট গত ৬ই ডিসেম্বর একটি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সরকারী কর্ম্মচারিগণের পক্ষে যেরূপ সীমাবদ্ধ ভাবে কাজ করিবার সম্ভাবনা ছিল তদনুযায়ী ১৭ই অক্টোবর তাঁহারা সেবাকার্য্য আরম্ভ করেন। সেই সঙ্গে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, মেদিনীপুর জেলায় যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে তাহারই ফলে তথায় সরকারী সাহায্য বিতরণের ব্যবস্থা সুচারু রূপে পরিচালিত হইতে পারে নাই এবং এখনও হইতে পারিতেছে না।

ঝটিকা ও বন্যার ফলে মেদিনীপুরে যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে, সে সংবাদ প্রকাশিত হইতে যে বিলম্ব হইয়াছে তাহা সকলেরই জানা কথা। এই বিলম্বের কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, সাহায্য দান কার্য্য যে সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতে পারে নাই এবং এখনও পারে নাই গবর্ণমেণ্টও তাহা স্বীকার করেন, সরকারী কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক সেবাকার্য্য পরিচালন সম্পর্কে সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "গবর্ণমেণ্ট দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সাহায্য বিতরণের ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশ মন্তব্যেই সরকারী কর্ম্মচারিগণকে যেরূপ অবস্থায় বিধ্বস্ত অঞ্চলে কাজ করিতে হইয়াছে তৎসম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট উপলব্ধি করিতেছেন যে, একান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই অভূতপূর্ব্ব সমস্যার সমাধানকল্পে স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ যে সমস্ত কাজ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বিবেচনা করা হয় নাই।" সরকারী ইস্তাহারের এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উক্তিও লোকের মনে পড়িবে। তাঁহার পদত্যাগ সম্পর্কিত বিবৃতিতে মেদিনীপুরের বিধ্বস্ত অঞ্চলের সেবাকার্য্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "আমরা যে কোন প্রতিকার করিতে পারি নাই তাহার কারণ কতকগুলি সরকারী কর্ম্মচারীর বিলম্ব ঘটাইবার প্রবৃত্তি ও সহানুভূতির অভাব।" অতঃপর শ্রদ্ধানন্দ পার্কের জনসভায় তিনি বলিয়াছেন, "এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কোন বিশেষ রাজকর্ম্মচারীর নিকট আসন্ন ঝটিকার পূর্ব্বাভাষের সংবাদ পৌঁছা সত্ত্বেও তিনি এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। বন্যার পরেও মেদিনীপুরে সাঁজবাতি আইন ও অন্যান্য বিধিনিষেধ পূর্ব্বের ন্যায় বলবৎ ছিল এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা যারপরনাই সীমাবদ্ধ ছিল। ঝটিকার পর মেদিনীপুরে পানীয় জল সরবরাহ, খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ, এমন কি কেরাসিন তৈলের কোন বন্দোবস্তই ছিল না।"

সরকারী ইস্তাহারকে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের উল্লিখিত উক্তির প্রতিবাদ বলিয়া মনে হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে কি? সরকারী ইস্তাহার এবং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ

উভয় পক্ষের পরস্পরবিরোধী উক্তির মধ্যে সত্য নির্ণয়ের উপায় কি? এ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সম্পূর্ণ রূপে নিঃসন্দেহ করিতে হইলে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

৯ই ডিসেম্বর বুধবার ভারতীয় খৃষ্টান এসোসিয়েসনের সভায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ সরকারী ইস্তাহারের প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। এই প্রত্যুত্তরে তিনি দাবী করিয়াছেন, হয় তদন্ত নয় বিচার। বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্য্য সম্পর্কে সরকারী কর্ম্মচারীদের আচরণ সম্বন্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা মিথ্যা হইলে প্রকাশ্য আদালতে তাহার বিচার হওয়া উচিত। গবর্ণমেন্টের দিক হইতেও ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুই থাকিতে পারে না। বিচার ব্যতীত আর এক পন্থা আছে প্রকাশ্য তদন্ত। ইহাতেও সরকারের আপত্তি করিবার কিছু নাই। আর্ত্ত-ত্রাণের মধ্যে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই। মানবতার জন্যই বিচার অথবা তদন্তের ব্যবস্থা করা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য।

—

যুদ্ধোত্তর আন্তর্জ্জাতিক পুনর্গঠন

গত ২রা ডিসেম্বর মিঃ এন্থনি ইডেন কমন্স সভায় যুদ্ধোত্তর আন্তর্জ্জাতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে যে আভাস প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, তাঁহার চিন্তাধারা গত মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী খাতেই প্রবাহিত হইতেছে। গত মহাযুদ্ধের পরেও যুদ্ধাপরাধ এবং বিজিত জাতিকে নিরস্ত্র করিবার নীতির প্রভাব দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তখন উহা পুরাপুরি মাত্রায় অনুসৃত হয় নাই। এবার যাহাতে কোন ত্রুটি না থাকে মিঃ ইডেন তাহার কথাই বলিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন:

"The disarmament of aggressor powers must be complete."

"আক্রমণকারী শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র করিতে হইবে।" গত ২রা ডিসেম্বরের বক্তৃতায় তিনি নূতন করিয়া জার্ম্মাণ আক্রমণ আশঙ্কার বিরুদ্ধে স্থায়ী আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার কর্ত্তব্যের কথা বলিয়াছেন। তিনি মনে করেন, "কোন অ-নাৎসী জার্ম্মাণ গবর্ণমেন্ট গড়িয়া তুলিতে দিয়া অবশেষে উহাকে অদৃষ্টের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া অনুচিত হইবে।" কি করিয়া নূতন আক্রমণ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা হইবে সে সম্বন্ধে মিঃ ইডেন বলিয়াছেন, "যুদ্ধ শেষ হইলে বৃটেন, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সমস্ত অস্ত্রশক্তির একচেটিয়া অধিকারী হইয়া উঠিবে এবং পৃথিবীতে আবার আক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য সম্মিলিত শক্তিবর্গের নামে সেই শক্তিকে অবশ্যই তাহারা প্রয়োগ করিবে।"

রাশিয়াও এই অস্ত্রশক্তির অংশীদার হইবে ভাবিয়া কেহ কেহ হয়ত আশ্বস্ত হইবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইঙ্গ-সোভিয়েট বিংশ বর্ষিক চুক্তির মধ্যে কড়া সর্ত্ত আছে যে সোভিয়েট রাশিয়া কাহারও সাম্রাজ্য-ব্যবস্থায় কোন কথা বলিতে পারিবে না। গত মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তিবর্গের যে সমরলক্ষ্য ও শান্তির আদর্শ ছিল এবার যে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে মিঃ ইডেনের বক্তৃতায় তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। বরং status quo বজায় রাখাই যে উদ্দেশ্য মিঃ ইডেনের বক্তৃতায় তাহারই পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়। 'বিরাট্ সাম্রাজ্যিক কমনওয়েলথের কেন্দ্রে বৃটেনের স্থানে'র উপর তিনি যেরূপ জোর দিয়াছেন, তাহা হইতে সাম্রাজ্যরক্ষার মনোবৃত্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও শিথিল হওয়ার সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় কি?

রাশিয়ার সহযোগিতার কথায় মিঃ ইডেন বলিয়াছেন, "আমাদের সহযোগিতার উপরই এক নূতন এবং শ্রেষ্ঠতর আন্তর্জ্জাতিক সমাজ গড়িয়া তোলার প্রকৃষ্টতম সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে।" কিরূপে এই সহযোগিতা সম্ভব তাহা তিনি বলেন নাই। বৃটেন গণতান্ত্রিক দেশ হইলেও এই গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে কায়েমী স্বার্থবাদী ধনীকশ্রেণীরই রাজত্ব। ইঙ্গ-সোভিয়েট মৈত্রীর পর মিঃ চার্চ্চিল রক্ষণশীল দলকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং সমাজ তাঁহার সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। ধনতন্ত্রের যদি উচ্ছেদ না হয় তাহা হইলে, এক দেশের ধনীদের কাঁচা মাল আরেক দেশের ধনীদিগকে দিবার ব্যবস্থা করিতে গেলে উহা কি জবরদস্তিরই নামান্তর হইবে না? যুদ্ধের পরেও যদি সাম্রাজ্যবাদের অবসান না হয় তাহা

হইলে বর্ত্তমান যুদ্ধকে কি সাম্রাজ্য লোভীর সহিত সাম্রাজ্য রক্ষীর যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু বলা যায়? বিশ্বসংগ্রামের পরে আন্তর্জ্জাতিক পুনর্গঠনের যে আভাস মিঃ ইডেন দিয়াছেন তাহা কি সাম্রাজ্যবাদ এবং ধনতন্ত্র রক্ষারই নামান্তর নয়?

—

বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতি

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ঔপনিবেশিক সচিবের কার্য্যভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া লর্ড ক্র্যানবোর্ণ গত ৩রা ডিসেম্বর পার্লামেণ্টের লর্ড সভায় বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান দেখিবার জন্য তিনি রাজার প্রধান মন্ত্রী হন নাই। লর্ড ক্র্যানবোর্ণেরও সুনিশ্চিত বিশ্বাস, শুধু যে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অবসান হইবে না তাহা নয়, তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের কাজ মাত্র আরম্ভ হইয়াছে।" তাঁহার মতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাগরিক হিসাবে তাঁহাদের একটা উদ্দেশ্য আছে এবং এই উদ্দেশ্য জগতের কল্যাণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সুতরাং জগতের কল্যাণের জন্য বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যকে বাঁচাইয়া না রাখিয়া তাঁহারা পারেনই বা কি করিয়া?

অতীতে শুধু পরোপকারের জন্যই বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য রক্ষার নীতি পরিচালিত হইয়াছে লর্ড ক্র্যানবোর্ণ তাহা মনে না করিলেও, তিনি বলিয়াছেন, "কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে সেই প্রাচীন শোষণ-নীতি অচল হইয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট স্থানের 'অছি' হিসাবে থাকিবার নীতি গৃহীত হইয়াছে।" 'অছি' হিসাবে বৃটেনের নীতি ব্যাখ্যা করিয়া লর্ড ক্র্যানবোর্ণ বলিয়াছেন, "হয়ত অনেক উপনিবেশের জনসাধারণ ঔপনিবেশিক নীতির প্রতি কিছু কালের জন্য অসন্তুষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের এই নীতির উদ্দেশ্যই হইল স্থানীয় জনসাধারণের হাতে তাহাদের শাসন ভার ছাড়িয়া দেওয়া।" বৃটেনের অধীন দেশগুলি বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতির প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেই 'অছি'র দায়িত্ব তাঁহারা কি ছাড়িতে পারেন? ছাড়িয়া দেওয়া কি এত সহজ? বৃটিশ সাম্রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে কত বিভিন্নতা আছে, বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে এই সকল দেশের শাসন কার্য্য চালাইতে হয়। 'সামাজিক কাঠামো, ঐতিহ্য ও আচার-ব্যবহার মানিয়া চলাই' তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম এখানে চলে কি করিয়া? কাজেই 'অছি' থাকিবার অনির্দ্দিষ্ট কাল যে কত দীর্ঘ হইতে পারে সে জন্য তিনি মাথা ঘামান নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছেন।

লর্ড ক্র্যানবোর্ণ বলিয়াছেন, "সমস্ত উপনিবেশই এখন নির্দ্দিষ্ট দিকে পরিচালিত হইতেছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে উন্নতি খুব তাড়াতাড়ি হইয়াছে, আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে ইহা খুব ধীরে ধীরে পরিলক্ষিত হইতেছে।" কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার কথা মনে করিয়াই বোধ হয় খুব তাড়াতাড়ি উন্নতির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এইগুলি এখন আর উপনিবেশ নয়,—ডোমিনিয়ন—বৃটিশ কমনওয়েলথের সমান অংশীদার। বৃটিশ সাম্রাজ্য বলিতে এখন শুধু বৃটেনের অধীনস্থ দেশগুলিকেই বুঝায়। এই অধীন দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষই সর্ব্বপ্রধান—বৃটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি। লর্ড ক্র্যানবোর্ণের বক্তৃতায় ভারতবর্ষের কোন কথা নাই। ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ প্রতিনিয়তই [illegible] অনুভব করিতেছি। পৌনে দুই শত বৎসর বৃটিশ রাজত্বের পর ভারতের শতকরা ১২ জন লোক মাত্র সামান্য লিখিতে পড়িতে জানে। ভারতবর্ষকে শিল্পপ্রধান করিয়া গড়িয়া তুলিবার পক্ষে কেবল বাধাই সৃষ্টি করা হইয়াছে।

বৃটেন যখন তাহার অধীনস্থ দেশগুলির অভিভাবক তখন এই যুদ্ধের সময় অভিভাবকত্ব বৃটেন ছাড়িতে পারে কি করিয়া। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য অধীন দেশগুলির জনগণের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা খণ্ডন করিয়া লর্ড ক্র্যানবোর্ণ বলিয়াছেন, "ইংলণ্ড ও বাহিরের বাহিরে অনেক লোক ধারণা করিয়া লইয়াছেন যে, মালয়বাসীরা সেই দেশের গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করে নাই বলিয়া আমরা মালয় হারাইয়াছি। অথচ

ায়ত্তশাস স্থিয়্যাম রাজ্য বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ রিল।" মা... কয়ি পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, মালয় আ... হারাইলাম কারণ ইউরোপে অক্ষশক্তির হিত তখ... আমরা জীবন-মরণ-সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া ড়িয়াছিলাম সেই কারণেই সেখানে আমরা পর্য্যাপ্ত অস্ত্র-স্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারি নাই।" যুদ্ধ জয়ের জন্য ভারতের স্বাধীনতার দাবী যাঁহারা করেন, এই উত্তরটা কি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই দেওয়া হইয়াছে? শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী লর্ড ক্র্যানবোর্ণের এই অপযুক্তির উত্তর দিয়াছেন। একটি খেলায় ভাল গোল-কীপার থাকা সত্ত্বেও যখন দলটি খেলায় হারিয়া গেল, তখন পরবর্ত্তী খেলায় আর ভাল গোলকীপারের প্রয়োজন নাই। লর্ড ক্র্যানবোর্ণের যুক্তিটা এই রকমই। যুক্তি যত অপযুক্তিই হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। কারণ লর্ড ক্র্যান-বোর্ণের আসল কথা যুদ্ধের পরেও সাম্রাজ্যবাদ অটুট থাকিবে।

—

স্যার মির্জ্জা ইসমাইলের বাণী

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে জয়পুর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী স্যার মির্জ্জা ইসমাইল ভারতীয় ঐক্যের বাণী প্রদান করিয়াছেন। পাটনায় তিনি বলিয়াছেন, "আপনাদিগকে বিশেষ করিয়া যুবকদিগকে—যাহাদের উপর আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে—প্রকৃত পক্ষে যদি কোন বাণী দিবার থাকে তবে তাহা এই যে, দেশের যে কোনও দিক দিয়াই দেখা যাউক, আমরা কখনও স্বতন্ত্র হইব না। এক-জাতীয়তার ধর্ম্ম, শক্তি এবং গৌরব আমাদিগকে অর্জ্জন করিতেই হইবে।" স্যার মির্জ্জা ইসমাইল উপযুক্ত পাত্রের নিকটেই এই বাণী প্রচার করিয়াছেন—দেশের যুবকবৃন্দই দেশের প্রকৃত ভরসাস্থল।

বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একটা অবিশ্বাস, একটা অস্থিরতা, একটা ভীতির ভাব দেখা দিয়াছে। এইগুলি আমাদের এই দুর্ভাগাদেশে যত বেশী পৃথিবীর আর কোথাও তত নয়। মির্জ্জা ইসমাইল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে বলিয়াছেন, দেশকে এই দুর্ভাগ্য হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব দেশের তরুণবৃন্দের। তিনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু দেশের তরুণবৃন্দের শুধু সত্য ও স্বাধীনতার আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেই চলিবে না, তাঁহাদের এই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যে তাঁহাদের দৃষ্টি দিতে হইবে জনসাধারণের দিকে সে কথাও তিনি তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, "ভারতে কোন নেতৃত্বই সাফল্য লাভ করিতে পারে না, যদি না ভারতের জনগণের ভয়াবহ দারিদ্র্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া না যায়।" অতি সত্য কথা। কিন্তু দরিদ্রের প্রতি দৃষ্টি দিলেই শুধু চলিবে না, শুধু অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের দুঃখ লাঘব করিবার চেষ্টা করিলেই চলিবে না, তাহাদিগকে বঞ্চনা হইতে মুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু স্যার মির্জ্জা ইসমাইল এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। আধুনিক বিজ্ঞানের বিজয়যাত্রা অতুলনীয়, এবিষয়ে স্যার মির্জ্জা ইসমাইলের সহিত কাহারও মতভেদ নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কার জনগণের মুক্তির জন্য আজও নিয়োজিত হয় নাই। মূদুর্ভাগ্যের মূল কারণ এইখানেই।

পাটনায় বৈষম্য ও বিরোধ দূর করিবার উপর স্যার মির্জ্জা ইসমাইল বিশেষ জোর প্রদান করিয়া বলিয়াছেন, "এই সকল বৈষম্য ও বিরোধ দূর করিয়া আমাদিগকে এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্ব্বসমন্বয়মূলক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যেখানে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, পারস্পরিক সুবিচার এবং পরস্পরের মধ্যে ন্যায়বিচার সম্বন্ধে বিশ্বাস থাকিবে।" এ সম্বন্ধে স্যার মির্জ্জা ইসমাইলের সহিত আমাদের মতভেদ নাই। কিন্তু রাষ্ট্র বৃহত্তর সমাজ-ব্যবস্থার একটি অঙ্গ মাত্র। বৃহত্তর সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এমন পরিবর্ত্তন আনা দরকার যাহাতে রাষ্ট্রের কাঠামো আমরা নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হই। স্যার মির্জ্জা ইসমাইল সংস্কৃতির মধ্য দিয়া এই সমন্বয় সাধনের কথা বলিয়াছেন। এই সমন্বয় সাধন করিতে হইলে যে হিন্দু, মুসলমান বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা অভিন্ন হইতে হইবে তাহা তিনি মনে করেন না, আমরাও মনে করি না। ... যুগ হইতেই হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি মিলিয়া এক

ভারতীয় সংস্কৃতিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে আমরা চিনিয়াও চিনি না। বিশ্ববিদ্যালয় দেশের তরুণ-দিগকে পাঠ্যপুস্তকের ভিতর দিয়া এই সংস্কৃতির পরিচয় লাভের সুবিধা করিয়া দিতে পারেন। জাতীয় চরিত্র-গঠনে ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। স্যার মির্জ্জা ইসমাইল এই প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া ঢাকা কনভোকেশনে বলিয়াছেন, "যিনি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই ক্ষমতার উৎস নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন।" কিন্তু আমাদের দেশে যেভাবে শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহাতে জাতীয় চরিত্রগঠনে কোন সহায়তা হইতেছে না কেন? ত্রুটি কোথায়? যে-শ্রেণী আজ শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন তাঁহারা উহাকে নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থের উপযোগী করিয়াই পরিচালন করিতেছেন। ইহাই কি শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ নহে? ইহার প্রতিকারের একমাত্র পথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন। কিন্তু কি উপায়ে তাহা সম্ভব স্যার মির্জ্জা ইসমাইল সে-সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

—

ব্যাপক অন্ন-সঙ্কট

অন্ন-সঙ্কট যে ব্যাপকভাবেই সমগ্র দেশে দেখা দিয়াছে, তাহার ফল দেশের প্রত্যেকটি লোকই ভুক্তভোগী। চাউলের দাম ১৬৲, ১৭৲, ১৮৲ টাকা। কোথাও কোথাও ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। কোন কোন স্থলে চাউল শুধু দুর্ম্মূল্যই নয়, দুষ্প্রাপ্যও হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ কি? প্রতিকারের উপায়ই বা কি?

চাউলের মূল্য বৃদ্ধি এবং দুষ্প্রাপ্যতা সম্বন্ধে লোকের মনে নানারূপ সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় শ্রীযুত মদনমোহন বর্ম্মণ এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, "খাদ্য সরবরাহ বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারীদের সহযোগে ব্যক্তি-বিশেষ অথবা ব্যবসায়ী ফার্ম্মগুলি খাদ্যদ্রব্যের মজুত পরিমাণ ও মূল্য লইয়া কারসাজি করিতেছেন বলিয়া লোকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য অবিলম্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে তদন্ত হওয়া উচিত।" বস্তুতঃ ব্যবসায়ীরা যে অতিলাভের বশবর্ত্তী হইয়া কৃত্রিম উপায়ে চাউলের অভাব [illegible] করিয়া মূল্য বৃদ্ধি করিতেছেন, পাবনায় তাহার [illegible] দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে।

পাবনার স্থানীয় ব্যবসায়িগণ চাউলের মণ [illegible] হঠাৎ ১৫ টাকায় চড়াইয়া দেয়। কর্ত্তৃপক্ষ তদন্তের পর ৯ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয়ের আদেশ দিলে ব্যবসায়ীরা দোকানে তালাবন্ধ করিয়া দেয় এবং বলে যে চাউল নাই। ফলে যখন একটা হাঙ্গামা আসন্ন হইয়া পড়ে, তখন কিছু চাউল বিক্রয় করায় হাঙ্গামা নিবারিত হয়। ১১ই ডিসেম্বর প্রাতেও ব্যবসায়িগণ দোকান তালাবন্ধ করিয়া রাখে। দুপুরে বহু লোক চাউল কিনিবার জন্য বাজারে উপস্থিত হয় এবং দোকান ব[illegible] দেখিয়া তালা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে। সংবাদ পাইয়া মহকুমা হাকিম এবং পুলিশ আসিয়া ক্রেতা-দিগকে মাথাপিছু টাকায় চারি সের করিয়া চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। সুতরাং হাঙ্গামা ঘটিবার আর কোন কারণ থাকে না। এই ব্যাপারে দেখা যাইতেছে ব্যবসায়ীদের অতি লাভের লোভে শুধু দুর্ম্মূল্যতা [illegible] দুষ্প্রাপ্যতাই সৃষ্ট হইতেছে না, অপরাধ করিবার প্ররোচনা যোগাইতেছে।

আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, গবর্ণমেণ্ট কোন জিনিষের দাম বাঁধিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে বাজা[illegible] হইতে সেই জিনিষ একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। ই[illegible] লোকের মনে সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

একথা কেহই অস্বীকার করে না যে, আমাদের দেশে যে-পরিমাণ চাউল ও গম উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা দেশের প্রয়োজন মিটে না। এ বৎসর প্রায় ২৪ লক্ষ বিঘা কম জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। তার পর নানা কারণে অনেক স্থানে ভাল ফসল উৎপন্ন হয় নাই। কোথাও বন্যা ও অনাবৃষ্টিতে নষ্ট হইয়াছে, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ায় পোকায় অনেক ধান নষ্ট করিয়াছে, মেদিনীপুরে, চব্বিশ-পরগণায় প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে ধানের বিপুল ক্ষতি হইয়াছে। চাউলের এই অভাব সত্ত্বেও ১৫ হাজার টন চাউল বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছে। শুধু রপ্তানী বন্ধ হইলেও আমাদের খাদ্যসমস্যা মিটিবে না; মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। সস্তা-

পে।

গণ্ডার

পায় না

মূল্য-নিয়

হইলে অচি

গরীব-মার্কা

যাইতেছে। সম্প্র

ভাইসরি-প্যানেলের অধিবে

পরিকল্পনা অনুমোদিত হইয়াছে।

ইংরেজী নূতন বৎসরের প্রথম ভাগেঃ

ভাগ্যে গরীব-মার্কা কাপড় জুটিয়া যাইবে। দাম সাধারণ কাপড় অপেক্ষা শতকরা ৩৫ হইতে ৪০ ভাগ কম হইবে। একবার যে-মূল্য ধার্য্য হইবে, অন্ততঃ তিন মাস তাহা স্থায়ী থাকিবে এবং প্রতি তিন মাস অন্তর মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। ধুতি, শাড়ী এবং সার্ট এই তিন শ্রেণীর কাপড় তৈয়ার করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে দেড়শত লক্ষ গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের জন্য মিলগুলিকে অর্ডার দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

পরিকল্পনাটি এখনও চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয় নাই। বিভিন্ন মিল-মালিক সমিতিকে তাহাদের কোন প্রস্তাব থাকিলে তাহা জানাইবার জন্য ঐ পরিকল্পনা পাঠান হইয়াছে। জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে প্যানেলের পূর্ণ অধিবেশনে ঐ পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে।

গরীব-মার্কা কাপড় বিক্রয়ের জন্য প্রত্যেক প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট, ব্যবসায়ী সমাজ এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া এক একটি সমিতি গঠিত হইবে। কোন প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এই ভার না লইলে সেখানে একজন দালালের উপর এই ভার দেওয়া হইবে। দালালের ব্যবস্থাটা আমরা পছন্দ করি না, বরং আশঙ্কার চক্ষে দেখি। দালালের নজর থাকিবে লাভের দিকে, জনসাধারণের স্বার্থের দিকে নয়। কাজেই দালালের ব্যবস্থায় গরীব-মার্কা কাপড়ের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষা করা যায় না। প্রায় দেড় বৎসর হইতে চলিল গরীব-মার্কা কাপড়ের কথা জনসাধারণ শুধু শুনিয়াই আসিতেছে। সত্বরেই যাহাতে গরীবরা গরীব-মার্কা কাপড় পরিতেও পারে তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

কাগজের সমস্যা

অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা অপেক্ষা কাগজের সমস্যাও আমাদের বড় কম নয়। কাগজের সঙ্গে অন্ন-সমস্যা ঘনিষ্ঠ ভাবে

মধ্যে

ণমেণ্টেই গ্রহণ করেন তাহা ...সাধারণের জন্য থাকিবে মাত্র ১০ হাজার টন অর্থাৎ পূর্ব্বে ব্যবহৃত কাগজের প্রায় শতকরা ৫ ভাগ।

সরকারী প্রয়োজনের গুরুত্ব আমরা সকলেই বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছি। কিন্তু জনসাধারণের প্রয়োজনও উপেক্ষার বিষয় নহে। সরকার যে ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছেন তাহাকেই আমরা একমাত্র পথ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। বিদেশ হইতে কাগজের আমদানী বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সেই সঙ্গে কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও উদ্যোগী হইতে হইবে। কাগজ-উৎপাদন-সংক্রান্ত কমিশনার কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধির যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে শতকরা ১৫ ভাগ কাগজ বেশী উৎপন্ন হইবে বলিয়া সরকারী মহলের বিশ্বাস। জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে হাতে তৈয়ারী কাগজ বেশী পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থাও হওয়া উচিত।

—

লর্ড বেভারব্রীজের পরিকল্পনা

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে স্যার উইলিয়ম বেভার-ব্রীজ বৃটিশ জনগণকে অভাব হইতে মুক্ত করিবার একটি পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন। স্যার বেভারব্রীজ স্বয়ং এই পরিকল্পনাকে আংশিক ভাবে বৃটিশ বিপ্লব এবং প্রধানতঃ অতীতের স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও তাঁহার নিজের মতে এই পরিকল্পনা মূলতঃ আয়ের পুনর্বণ্টনের একটা ব্যবস্থা এবং সামাজিক বীমা ব্যাপক নীতির একটা অংশমাত্র, তথাপি তাঁহার পরিকল্পনার যে-সার মর্ম্ম আমরা পাইয়াছি তাহাতে সামাজিক বীমাই তাঁহার পরিকল্পনার প্রধান স্তম্ভ বলিয়া মনে হইতেছে।

বেভারব্রীজ-পরিকল্পনার প্রধান সুপারিশ, ব্যক্তিগত অভাব এবং নিরাপত্তাহীন অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার

[illegible] ণিজ্য
[illegible] তাহার
[illegible] ন মনে

[illegible] ন সহরের
[illegible] মজতুর,—
[illegible] গত আগষ্ট মাস
[illegible] কার্য্য করিতেছেন।
[illegible] জতুর সদস্যের মধ্যে ৬ জন
[illegible] হিন্দু। যিনি মিউনিসিপ্যালিটির
[illegible] জন গাড়োয়ান। দিবারাত্র একখানি
[illegible] (এক প্রকার তুই ঘোড়ায় টানা গাড়ী) চালাইয়া অতি কষ্টে তাঁহাকে জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়। মিউনিসিপ্যালিটীর যিনি সহকারী সভাপতি তিনি এক মুদীর দোকানে কাজ করেন। বাকী দশ জনের কেহ গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, কেহ ফিরিওয়ালা, কেহ আইসক্রীম বিক্রেতা, কেহ টোঙ্গাচালক, কেহ হোটেলওয়ালা ইত্যাদি। ইহাদের কাহারও মাসিক উপার্জ্জনই ৩০ টাকা হইতে ৪০ টাকার বেশী নয়।

এই মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে উচ্চ শ্রেণীর সদস্য আছেন চারি জন। কিন্তু তাঁহারা কেহই কমিটির সভায় উপস্থিত হইতেছেন না। কোন না কোন কারণে এ পর্য্যন্ত ছুটিতেই আছেন। উচ্চ শ্রেণীর এই চারিজন সদস্য হয়ত মজতুরদের সহিত সময়পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করিতে চান না; কিন্তু তাঁহাদের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও মজতুর সদস্যগণ সুচারুরূপে মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই বহু প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছেন।

এই মজতুর সদস্যগণ সহরের যেখানেই যখনই কোন আবর্জ্জনা দেখেন, তখনই নিজেরা ঝাটা লইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলেন। কাজেই মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মচারীদিগকে সহরটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই তৎপর থাকিতে হয়। অলসতা বা দীর্ঘসূত্রিতার প্রশ্রয় তাঁহারা মোটেই পান না। বস্তুতঃ এই বারজন মজতুর সদস্যকে আদর্শ পৌরকর্ত্তা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

স্যার [illegible]
পরিকল্পনা দানের ভিত্তির উপর প্রা[illegible]
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনায় ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের কোন কথা নাই। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই বৃটেনের জনগণকে যথাসম্ভব অভাব হইতে মুক্তি দিবার জন্য এই পরিকল্পনা গঠন করা হইয়াছে। কাজেই তিনি যাহাকে অধিকারের ভিত্তি বলিতেছেন, উৎপাদনের উপায়কে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করিয়া রাখিলে এই অধিকারের ভিত্তিই আসলে পুঁজিপতিদের দয়ার দানের ভিত্তিতে পরিণত হইয়া যাইবে। নিম্নতম মজুরী দেওয়ার ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহিত খাপ খায় বলিয়া আজও প্রমাণিত হয় নাই। বরং তাহার বিপরীতটাই প্রমাণিত হইয়াছে। বেকারদিগকে ভাতা দেওয়া ছাড়া বেকার সমস্যা সমাধানের আর কোন উপায় তিনি খুঁজিয়া পান নাই। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পাওয়াও সম্ভব নয়।

স্যার উইলিয়ম বেভারীজের পরিকল্পনা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাও অবশ্যই থাকিবে। কারণ বাড়তি পণ্য বিক্রয়ের বাজার না থাকিলে উহা বিক্রয় হইবে কোথায়? আর বাড়তি পণ্য বিক্রয় না হইলে রাষ্ট্রীয় জীবন বীমার প্রিমিয়মই ব[illegible] আসিবে কোথা হইতে? আর প্রিমিয়ম না আসিলে, বেকার, অশক্ত এবং রোগীদিগকে সাহায্যই বা কি ভাবে করা সম্ভব?

যুদ্ধোত্তর যুগে ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ থাকিবে এই ধারণার ভিত্তিতে স্যার বেভারীজ বৃটেনের জনগণের অভাব মুক্তির পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন। যুদ্ধের পরেও যদি ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্য বজায় থাকে, তাহা হইলে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃটেনের জনগণ হয়ত কতক পরিমাণে অভাব হইতে মুক্তি লাভ করিবে। কিন্তু পরাধীন দেশগুলির জনগণের নানা অভাব হইতে মুক্তি পাওয়ার

মিঃ জিন্নার জাতিতত্ত্ব

মিঃ জিন্নার মতে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান তুই নেশান অর্থাৎ তুইটি রাষ্ট্রজাতি। সম্প্রতি জলন্ধরে মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে তিনি এই মতবাদের কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের সম্বন্ধে তিনি, বলিয়াছেন,

"যুক্তপ্রদেশের মুসলমানগণ একটা নেশান বা রাষ্ট্রজাতি নহে। তাহারা ছড়াইয়া রহিয়াছে। সুতরাং শাসন তান্ত্রিক ভাষায় তাহাদিগকে সাব নেশান বা উপরাষ্ট্রজাতি বলা যাইতে পারে।" তাহা হইলে মুসলমানগণ নেশান বা রাষ্ট্রজাতি কোথায়? মুসলমানগণ তাহাদের নিজের দেশ এবং যেখানে তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানেই শুধু তাহারা স্বতন্ত্র নেশান, ইহাই মিঃ জিন্নার অভিমত।

ভারতীয় মুসলমানদের হোমল্যাণ্ড কোথায় সে সম্বন্ধে মিঃ জিন্না নীরব। কিন্তু যুক্তপ্রদেশের মুসলমানগণ যদি সাব নেশান হয়, তাহা হইলে ঐ প্রদেশের হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া এক রাষ্ট্রজাতি হইতে বাধা কোথায়।

Race অর্থাৎ গোত্রমূলক জাতি এবং নেশান বা রাষ্ট্রমূলক জাতির সংজ্ঞা লইয়া মতভেদ আছে। গোত্র-জাতির দিক হইতে ভারতবাসীরা ইংরেজের মতই একটা মিশ্রজাতি। কিন্তু ভারতের মুসলমানগণ এক রাষ্ট্রজাতি এবং হিন্দুগণ আর আর এক রাষ্ট্রজাতি তাহা স্বীকার করিবার মত কোন প্রমাণ নাই। দেশগত সান্নিধ্যই রাষ্ট্রমূলক জাতিগঠনের প্রধান উপাদান। পুরুষানুক্রমের পরিচয়ে তাহা গড়িয়া উঠে। গোত্রগত এবং রাষ্ট্রগত উভয় দিক দিয়াই ভারতের হিন্দুমুসলমান এক জাতি হইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে।

—

বড়লাটের কার্য্যকাল বৃদ্ধি

ভারতের বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর কার্য্যকাল আরও ছয়মাস বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার কার্য্যকাল ১৯৪৩ সনের অক্টোবর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার এই কার্য্যকাল বৃদ্ধিতে এ-দেশে ও সে-দেশে অনেকে আনন্দিত হইলেও বিলাতের টাইমসের মত গোড়া রক্ষণশীল পত্রিকাও এই কার্য্যকাল বৃদ্ধিতে যেন খুব খুসী হইতে পারেন নাই। টাইমসের আশা ছিল, নূতন মন লইয়া নূতন বড়লাট ভারতের শাসন-তরণীর কর্ণধার হইবেন। তাঁহার আশা ব্যর্থ হওয়ায় টাইমস পত্রিকা ভারতবাসীর হাতে আরও অধিক ক্ষমতা যাহাতে দেওয়া যাইতে পারে তাহার জন্য ভারতীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো যাহাতে অগ্রসর হন তদনুরূপ উপদেশ দিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন।

মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকা বড়লাটের কার্য্যকাল বৃদ্ধিতে আশ্চর্য্য হইবার কোন হেতু দেখিতে পান নাই। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত-সচিব এবং বড়লাটের মধ্যে যদি সম্পূর্ণ মতৈক্য থাকে, তাহা হইলে বৃটেনের ভারতীয় নীতি সহজে কার্য্যকরী হওয়া সম্ভব। মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকা লিখিয়াছেন, "কি নূতন প্রস্তাব আনয়ন, কি নূতন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান উভয় ব্যাপারেই তিনি (লর্ড লিনলিথগো) বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতির সহিত একমত বলিয়া এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে।" উক্ত পত্রিকা মনে করেন বর্ত্তমানে ভারতে যে সরকারী নীতি অনুসৃত হইতেছে যত দিন তাহা অনুসৃত হইতে থাকিবে ততদিন কোন নূতন লোক ভারতের বড়লাটের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না। ঠিক এই কারণেই কেহ ভারতের বড়লাট হইতে অস্বীকার করিয়াছেন কিনা তাহা জানা যায় না তবে বিলাতের ইভিনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা বলিয়াছেন মিঃ চার্চ্চিল স্যার আর্চ্চিবল্ড সিনক্লেয়ারকে ভারতের বড়লাটের পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। এই প্রত্যাখ্যানের কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে, তিনি বিমান-মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিতে রাজী নহেন এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি উদারনৈতিক দলের নেতারূপেই থাকিতে চান।

ভারতের বড়লাটের পদ গ্রহণে স্যার আর্চ্চিবল্ডের অস্বীকারের কারণ যাহাই হউক, ভারতের বড়লাট হইয়া যিনি আসুন না কেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত ভারতীয় নীতি তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং বড়লাট যদি একই মতাবলম্বী হন, তাহা হইলে কাজ সহজেই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকা বড়লাটের কার্য্যকাল বৃদ্ধিতে মন্তব্য করিয়াছেন, "লর্ড লিনলিথগো, মিঃ আমেরী ও গবর্ণমেণ্ট মিলিয়া একটি স্বল্পভাষী 'সুখী পরিবার'ই রহিয়া গেলেন এই পরিবারের নীতি হইল কেহ বাধা দিতে আসিলে তাহাকে 'না' বলিয়া দেওয়া।"

লর্ড লিনলিথগোর পরিবর্ত্তে ভারতের বড়লাট হওয়ার উপযুক্ত লোক না পাওয়াই কি তাঁহার কার্য্যকাল বৃদ্ধির কারণ? ডেইলী হেরল্ড পত্রিকা মনে করেন, ভারতের জন্য উপযুক্ত বড়লাট না পাওয়ার কারণ ভারতের বড়লাট হওয়ার গুণপণা সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন, "ভাল বড়লাট নিযুক্ত করাই যথেষ্ট নয় নিযুক্ত ব্যক্তিকে ভাল আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করিতে দিতে হইবে।"

এই 'ভাল আবহাওয়াটা'ই আমরা প্রধান সমস্যা মনে করি। কিন্তু বৃটেনের ভারতীয় নীতির পরিবর্ত্তন না হইলে আবহাওয়ার কোন পরিবর্ত্তনের আশা করা যায় না। নীতির পরিবর্ত্তন যতদিন না হইতেছে; ততদিন লর্ড লিনলিথগোর কার্য্যকাল বৃদ্ধি হইলে বা না হইলে উল্লসিত বা দুঃখিত হইবার কোনই কারণ নাই।

—

জাপ আক্রমণের এক [redacted]

৭ই ডিসেম্বর (গ্রীণ উইচ সময় অনুসারে ৮ই ডিসেম্বর)

াচীতে জাপ আক্রমণের এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। জাপ াষ্ট্রদূত মিঃ কুরুসু যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করিয়া াপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মীমাংসার কথাবার্ত্তা ালাইতেছিলেন, সেই সময় জাপান অতর্কিত ও প্রত্যাশিত ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌঘাঁটি পার্ল বন্দর এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করে। পরের দিন াপান মালয় আক্রমণ করে। ১০ই ডিসেম্বর জাপ াক্রমণে বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ 'প্রিন্স অব ওয়েলস' এবং রিপালস' জলমগ্ন হয়।

বড়দিনের মধ্যেই হংকং জাপানের নিকট আত্মসমর্পণ রিল। ফেব্রুয়ারী মাসে সিঙ্গাপুরের পতন প্রাচীর যুদ্ধের কটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মার্চ্চ মাসের মধ্যেই জাভা ও ঙ্গুণের পতন হইল। দীর্ঘকাল জাপ বাহিনীকে প্রবল- াবে বাধা দিবার পর এপ্রিল মাসে বাটানের পতনের ঙ্গ সঙ্গে ফিলিপাইনের জাপ অভিযান একরূপ শেষ হইয়া য়। যুদ্ধ ক্রমশঃ ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে গিল। অষ্ট্রেলিয়াতে প্রথম বোমাবর্ষণ হয় ফেব্রুয়ারী সে, মার্চ্চ মাসে জাপান আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অধিকার রিয়া বসে। ৫ই এপ্রিল কলম্বোতে জাপ বিমান হানা য়, ৬ই এপ্রিল ভিজাগাপট্টমের পোতাশ্রয়ে এবং কাকনদে জাপ বিমান হইতে বোমা বর্ষিত হয়। সুদূর াচীতে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ভারতের উপর ইহাই থম বিমান হানা। মে মাসের মধ্যভাগে ব্রহ্মদেশে াপ অভিযানের পরিসমাপ্তি হয়।

ব্রহ্ম দেশের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জাপ অভিযানের তীয় পর্ব্ব আরম্ভ হয়। এই পর্ব্বে জাপ আক্রমণ চীনের তি কেন্দ্রীভূত হইল। কিন্তু চীনে জাপান তেমন সাফল্য- াভ করিতে পারে নাই। সলোমন দ্বীপপুঞ্জেও মিত্র- ক্তিবর্গের অবস্থার উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল।

এপ্রিল মাসেই টোকিওতে প্রথম বোমা বর্ষিত হয়। হাকে মার্কিন বিমানবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির দ্যোতক লিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। মে মাসে কোরাল সাগরের দ্ধ, জুন মাসে মিডওয়ের যুদ্ধ এবং আগষ্ট মাস হইতে সালেমান দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধ প্রাচীর যুদ্ধের গতির মোড় ফিরাইয়া দিয়াছে। অতর্কিত জাপ আক্রমণের সাফল্য নেকের মনে জাপানের শক্তি সম্বন্ধে একটা বিস্ময় সৃষ্টি রিয়াছিল, সেই বিস্ময়ের ঘোর এখন কাটিয়া গিয়াছে। াপান আক্রমণাত্মক নীতির পরিবর্ত্তে আত্মরক্ষামূলক ীতি গ্রহণে বাধ্য হইয়াছে।

—

পরলোকে স্যার মন্মথনাথ

একজন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, একজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় এবং একজন শ্রেষ্ঠ দেশসেবকের জীবনাবসান হইল।

স্যার মন্মথনাথ প্রতিভাবান ব্যবহারজীবী ছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। বিচারপতির আসন হইতে আইনের ব্যাখ্যায় তিনি অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ১৯৩৫ সালে তিনি স্যার উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদে আইন সচিব হইয়াছিলেন। তিনি বাংলার গবর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্যও হইয়াছিলেন।

সামাজিক দিক হইতে তিনি গোঁড়া হিন্দু এবং রাজনৈতিক দিক হইতে তিনি মডারেট মতাবলম্বী ও হিন্দু মহাসভা পন্থী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা এবং অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তি জাতীয় জীবনের সর্ব্বস্তরেই ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি যেমন পণ্ডিত ও মনীষাসম্পন্ন ছিলেন। বাংলার শিক্ষাসংক্রান্ত, সামাজিক ও মানবসেবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার নিবিড় সংযোগ ছিল। স্বদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

—

চট্টগ্রামে জাপ-বিমানের হানা

গত ১৬ই ডিসেম্বর (৩০শে অগ্রহায়ণ) জাপানী বিমান চট্টগ্রাম ও ফেণীর উপর হানা দিয়া বোমাবর্ষণ করে। ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বে ৫ই ও ১০ই ডিসেম্বর জাপ বিমান চট্টগ্রামের উপর হানা দিয়াছিল।

এত অল্পদিনের ব্যবধানে চট্টগ্রামে জাপ বিমানের হানা এই প্রথম। সর্ব্বপ্রথম চট্টগ্রামের উপর জাপ বিমানের আক্রমণ হয় ৮ই মে—ব্রহ্ম অভিযান শেষ হইবার দিন কুড়ি পূর্ব্বে। ঐ দিনই জাপবাহিনী কর্ত্তৃক আকিয়াব অধিকৃত হয় বলিয়া প্রকাশ। পরের দিন প্রাতে অর্থাৎ ৯ই মে জাপ বিমান চট্টগ্রামে হানা দিয়া পুনরায় বোমাবর্ষণ করে। ইহার পর কয়েক মাস বাংলার উপর জাপ বিমানের আর আক্রমণ হয় নাই, যদিও ১০ই ও ১৬ই মে পূর্ব্ব-আসামে জাপ বিমান হানা দিয়াছিল। অতঃপর চট্টগ্রামের উপর জাপ বিমান হানা দেয় ২৫শে অক্টোবর। তারপর এই ৫ই, ১০ই ও ১৬ই ডিসেম্বরের বিমান হানা।

ব্রহ্মদেশে জাপান আক্রান্ত হইলে ভারতের পক্ষে এইরূপ জাপ বিমানের হানা এড়ান সম্ভব না-ও হইতে পারে। কিন্তু শুধু বিমান হানা দিয়া একটা দেশকে যেমন পরাজয় করা যায় না, তেমনি উপযুক্ত প্রতিরোধের এবং সাবধানতার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে, বিমান হানার ক্ষতির পরিমাণও কম হয়। ইহার জন্য জনগণের মধ্যে ... ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।